পরিপাটিক

9/23/99

ক্রান্তিক

মাসিক সাহিত্য সঙ্কলন

২৬ বর্ষ, আষাঢ় (১৪০৬)

UNIVERSITY OF CALCUTTA
CENTRAL LIBRARY

প্রবন্ধ

নোবেল জয়ী অমর্ত্য কুমার সেন

এই বিলম্বিত অমর্ত্য বিস্ফোরণ কি কোন প্রকার অনুযোগ প্রত্যাশায় থেমে থাকা উচিত। একথা ঘোপে টেকে না। যত দিন যাবে অমর্ত্যকে ঘিরে নিত্য নতুন আলোচনা ঠাঁই করে নেবে সাহিত্যে। ক্রান্তিকের এই বিলম্বিত পদক্ষেপ পাঠকের সমাদর কুড়োবেই।

গল্প

৯ ছোট গল্প

নটি বিভিন্ন স্বাদের ছোট গল্প একসঙ্গে এই সংখ্যার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। একসঙ্গে এতোগুলো ছোট গল্প পাঠককে এক ভিন্ন স্বাদের জগতে নিয়ে যাবে।

চিঠিপত্র □ ৩

প্রবন্ধ

নোবেল জয়ী অমর্ত্য কুমার সেন □ ৬. কুমারজিৎ ঘোষ □ ৭
জনমানস অন্বেষিতে অমর্ত্য কথা □ অশোক বেরা □ ১৪
অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার লাভের তাৎপর্য □
ড. প্রণবেশ মল্লিক □ ১৬

কবিতা

বিশ্বু সাহানা □ নিমাই সাহানা □ গঙ্গাপ্রসাদ খাঁড়া □ উমা পাত্রী □
এজাজ উল ইসলাম □ উপাসনা বিশ্বাস □ কল্যাণ সরকার □
প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় □ ভিমাম আলী □ ১৯-২১

অনুবাদ কবিতা

অনুবাদ সেন সেনগুপ্ত □ অজিত কুমার বসু □ ২২

অনুবাদ উপন্যাস

আজাদ কুসুম □ বিমলেন্দু চক্রবর্তী □ ২৫
অপারেশন থ্রীল □ নীলেশ চট্টোপাধ্যায় □ ২৮

অনুবাদ গল্প

নিশাত □ গোপীনাথ মোহান্তি □ অনুবাদ সমুহ সেন □ ২৯

গল্প

আলো আলো □ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় □ ৩১ প্রধান □ নির্মলেন্দু
গৌতম □ ৪০ সুরেশ □ কবিরাজ সাহা □ ৪২ পদ্য □ রাসবিহারী
মন্ত □ ৪৪ চোখা চোখে □ মোহন নন্দর □ ৪৭ নিঃশেষ □ অশোক
চট্টোপাধ্যায় □ ৫০ নদীর ঘুমে কী দেখা যায় □ ঘনশ্যাম চৌধুরী □ ৫২
খোলা চোখ □ কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী □ ৫৭

বিশ্ব সাহিত্য

বিশ্বায়নে নিগ্রো : অভিনব বিশ্ব বৈচিত্র্য □ সমীরণ মজুমদার □ ৬০

গ্রন্থ-পরিচয় □ ৬২-৬৩

প্রচ্ছদ : বিমলেন্দু চক্রবর্তী

সম্পাদক : কবিতীর্থ মণ্ড

● আলোকপাত : অনি সরকার, অজয় সাহানা, মনীষ দাস ও পার্থ মৈত্র ● মূল্য : ৮ টাকা

কবিতীর্থ মণ্ড কর্তৃক ৪৭/১, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৪ থেকে প্রকাশিত ও সুদীপ্ত প্রেস, ৪৭/১, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

Krantik is published from Kavitirtha group of publications for an annual subscription Rs. 150 in registered post and by hand delivery Rs. 100 Akshar Prakashani Stall-31, Block-A, Bansura Chattopadhyay St., Calcutta-700 073 Ph-32756/78 Ph. 561-4007

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন-
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. পি. এ—D. O. No. 633-ICA \ Advt dt. 12.2.99

শুধু ঘর নয়, ঘরের সাজসজ্জাই আসল

রুচিসম্মত ফার্ণিচার (কাঠ ও স্টীল)
পরিবেশনায়

শ্রী বিষ্ণু ফার্ণিচার

১ নং রেলগেট যশোহর রোড
হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

আধুনিকাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়

পদ্মা জুয়েলারী ওয়ার্কস

স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার জগতে
বিশেষ সপরিচিত।

৭৭নং, পাইওনিয়ার পার্ক
বারাসত, উঃ ২৪ পরগণা।

With Best Compliments From

KHAZANA AGRICULTURAL EQUIPMENTS LTD.

63 Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-700016

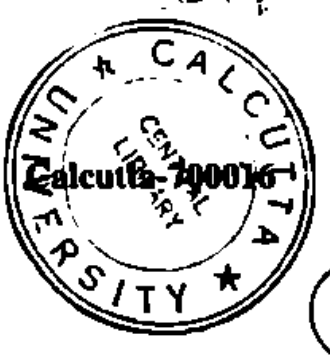

Canon

With Best Wishes From

ATUL AUTOMATION (P) LTD.

ONLY AUTHORISED BUSINESS AFFILIATE OF CANON INDIA PVT. LTD.

With Best Compliments From

NEO PIPES & TUBES CO. LTD.

(Wholly Owned by the Govt. of West Bengal)

MANUFACTURERS OF NON-FERROUS BARS, TUBES, SECTIONS, SHEETS ETC. BY EXTRUSTION PROCESS

REGISTERED OFFICE
"NICCO HOUSE"
1 & 2, HERE STREET,
CALCUTTA-700001.
220-8421
220-8427

WORKS
SHYAMNAGAR
P.O. AUTHPUR,
DIST. NORTH 24 PARGANAS
581-2847
581-2683

GRAM : INDIPIPE, CALCUTTA
TELEX : 021-02240 NPT

Phone 81-3522

VENUS ELECTRONICS

103, PADMAPUKUR ROAD.
24 PGS. (N), PIN-743129

MANUACTURER OF SOLID STATE SURGICAL DIATHEMY & SHORT WAVE DIATHERMY (VALVE)

With Best Wishes from

SAHOO ENTERPRISE

Vill—DEVLPOTA
P. O—BARBASUDEBPUR
Dist—MIDNAPUR

Space donated by

A Well Wisher

সংগ্রহ করার মত সাম্প্রতিক কালের কিছু উল্লেখযোগ্য বই

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ভূতের দেশে হঠাৎ এসে (গল্প) বোকারাম চোখারাম (গল্প) ডুডুম ডুম (ছড়া)	**আনসার উল হক-এর** কু ঝিক ঝিক রেলের গাড়ি (ছড়া) আইকম বাইকম (ছড়া) চিরন্তন (কবিতা)
মনোরঞ্জন পুরকাইত-এর আয় ছুটে আয় (ছড়া) দাঁড় ছপ ছপ নৌকো (ছড়া) এ নদী শঙ্খচিলের (কবিতা)	**হান্নান আহসান-এর** ছড়ার গাড়ি (ছড়া) ঝিকির ঝিকির (ছড়া) রহস্যময় রশ্মি (গল্প)
সুখেন্দু মজুমদার-এর ইচ্ছে নদীর গান (ছড়া) স্বপ্নের ঝুলি (গল্প) টাপুর এবং টুপুর (গল্প)	**কল্পনা ভট্টাচার্য-র** এসো কিছু ছড়া শিখি (ছড়া) ছোট মামার ট্রাজেডি (গল্প) হুড়ুম রাজার বাঁশি (গল্প)
প্রণবকুমার পাল-এর পঞ্চ পুরুষ ও পাঞ্চালী (কাব্যগ্রন্থ) গোপাল দরজা ছুঁয়ে (কবিতা) ডাম্পি (ছড়া)	**বিশ্বনাথ রাহা-র** নিধু খুড়োর ঢাক (ছড়া) টুনটুনির পাঠশালা (ছবি ও ছড়া)
চন্দ্রচূড় ঘোষ-এর জিরাফ বুড়ো (গল্প) বোকারাম চোখারাম (গল্প)	**মানসী বালা-র** উড়লো টিয়ে জানলা দিয়ে (ছড়া)

● প্রতিক্ষণ ● ক্রান্তিক প্রকাশনী, স্টল নং ৩১, ব্লক-৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

নোবেল জয়ী অমর্ত্য কুমার সেন

ড. তুষারকান্তি ঘোষ

১৯৯৮ এর ১৪ই অক্টোবর অমর্ত্য কুমার সেনের বহু প্রতীক্ষিত নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবর প্রচারিত হওয়ার মুহূর্তে এমন এক পুলকের শিহরণ অনুভব করেছিলাম যা হৃদয়ের গভীরতম তন্ত্রীতে স্পন্দন জাগিয়েছিল। সারা দেশবাসীর আনন্দের অংশগ্রহণ থেকে তা একটু আলাদা।

স্বাধীনতার ঠিক পরেকার বছরগুলিতে—১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অকালে পিতৃবিয়োগ, ময়মনসিংহ জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে পড়ালোনা ও স্বপ্ন দেখা, দেশবিভাগের বিপর্যয়, স্বাধীনতার ঠিক পরেকার ওই উত্তাল অনিশ্চিত মুহূর্তগুলির পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে উত্তরণ সৌভাগ্যের কথা বই কি। আজ সেই সৌভাগ্যের সরণি ধরেই আর এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে এসে পৌঁচেছি এবং উদ্বেলিত হয়েছি বিশ্বজয়ী অমর্ত্যের প্রতিভাত আলোকরশ্মির ছটায়।

একটু পিছন ফিরে দেখি। একদিকে পার্থসারথি গুপ্ত, সুখময় চক্রবর্তী, ঘতিকুমার সেনগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুধীর রায়চৌধুরী, জ্যোতির্ময় দত্ত, বরুণ দে, ত্রতীন মুখার্জির মত সহপাঠী, অন্যদিকে তারক নাথ সেন, ভবতোষ দত্ত, সুশোভন সরকার, ধীরেন ভট্টাচার্য, সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অমিয় কুমার মজুমদারের মত অধ্যাপকদের পরিমণ্ডলে প্রথম দুটি বছর কাটল। অমর্ত্যর উজ্জ্বল আবির্ভাব হল ১৯৫১ সালে, আই. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে আমাদের অর্থনীতি অনার্স ক্লাসে সহপাঠী হয়ে এল। আই. এ. ক্লাসের অনেক বন্ধুরাই অন্য বিষয়ে ছিটকে গেল, অর্থনীতি অনার্সে রয়ে গেল সুখময় চক্রবর্তী, ঘতি কুমার সেনগুপ্ত, যোগ দিল জয়ন্ত কুমার রায় ও অমর্ত্য কুমার সেন।[১] আজ পেছন দিকে তাকিয়ে দেখছি—আমাদের অর্থনীতি অনার্সের ব্যাচটা ছিল সর্বকালের সেরা—নোবেল জয়ী অমর্ত্য—যদিও তখন নোবেল পুরস্কারের স্বপ্ন দেখার প্রশ্নই ছিল না, কারণ অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের প্রচলন হয়েছে অনেক পরে, ১৯৬৯ সালে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ সুখময় চক্রবর্তী, এবং আর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক—ঘতিকুমার সেনগুপ্ত, যদিও সে অর্থনীতি থেকে খানিকটা আলাদা বিষয়ে চলে গেছে। আমাদের প্রবাদ-প্রতিম অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত আজ থেকে এগার বছর আগে লিখে গেছেন—তাঁর রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত 'আট দশক' গ্রন্থে—"তখনকার ছাত্রদের মধ্যে.....সর্বাগ্রে নাম করতে হয় অমর্ত্য সেনের। আমি যে বছর অধ্যাপক হয়ে এলাম তার পরের বছর বিশ্বভারতী থেকে আই. এস. সি. তে প্রথম হয়ে অমর্ত্য এসে ভর্তি হল অর্থনীতির অনার্স ক্লাসে। তারই সঙ্গে ছিল ছাত্র সুখময় চক্রবর্তী আর ঘতিকুমার সেনগুপ্ত। অমর্ত্য বা সুখময় সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন হবে না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে এ পর্যন্ত যাঁদের অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অনেকের চেয়ে অনেক ভাল কাজ করেছেন অমর্ত্য সেন ও সুখময় চক্রবর্তী।"[২] অত্যুক্তি মিথ্যা হবার নয়, শুধু দুঃখের কথা—এক ছাত্র তাঁর আগেই প্রয়াত হল (সুখময়ের অকাল মৃত্যু দিন ২২. ৮. ১৯৯০), অন্য জনের বিশ্বজয়ের গৌরব দেখে যাবার জন্য তিনি বেঁচে রইলেন না।

ইতিহাসে বিরল ঘটনা-সমাবেশ। তোল এক বিষাদদৃষ্টিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনকে নির্বাচিত করেছিলেন তাঁর আশ্রম স্থাপনার জন্য, সেই শান্তিনিকেতনেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম স্নেহভাজন ক্ষিতিমোহন সেনের নাতির নামকরণ করলেন 'অমর্ত্য', আর সেই শান্তিনিকেতন থেকেই আবির্ভূত হলেন দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেন। একে স্থান-মাহাত্ম্য ছাড়া আর কি বলব পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় নি একই স্থানে দুই নোবেল-জয়ীর আবির্ভাব। কাশীর বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মাত্র ২৮ বছর বয়সে এসে যোগ দেন বিশ্বভারতীর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে, এবং কর্মজীবন সমাপ্ত করেন বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে নাম করা যায়—হিন্দু ধর্ম কবীর (চার খণ্ড), ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা, দাদু, ভারতের সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতে নারী প্রভৃতি। তিনি ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মেসিকোত্তম, এবং পরবর্তীকালে তাঁর নাতি অমর্ত্য সেনও হয়েছিলেন মেসিকোত্তম, যা ইতিহাসের আর এক বিরল ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের পরম প্রিয় ক্ষিতিমোহন ছিলেন সুরসিক, সুবক্তা ও সু-অভিনেতা। ১৯৩৩ সালের ওরা নভেম্বর অমর্ত্যর জন্ম হয় শান্তিনিকেতনে। ক্ষিতিমোহনের কন্যা রবীন্দ্রস্নেহকন্যা শ্রীমতী অমিতা সেন ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি-রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আশুতোষ সেন অমর্ত্যর মা-বাবা। বাবা কৃষি-সচিবের পদ নিয়ে মান্দালয়ে চলে যাওয়ায় অমর্ত্য মান্দালয়ের একটি কনভেন্ট স্কুলে প্রথম পড়া আরম্ভ করে, তারপর পড়ে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। বাবা বিদেশে চলে যাওয়ায় ১৯৪২ এর প্রথম দিকে মা ওকে নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে এবং ভর্তি করিয়ে দেন পাঠভবনে, ক্লাস ফোরে। তারপর একটানা বেশ কয়েকটি বছর অমর্ত্যর জাটে শান্তিনিকেতনের পরিবেশে, দাদু ক্ষিতিমোহন সেনের স্নেহ সজাগ দৃষ্টিতে। ১৯৪৯ সালে ও মেট্রিক পরীক্ষা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কলেজ থেকে নন্-কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে

অর্থনীতি অনার্স ক্লাসে ভর্তি হল। বিজ্ঞান ছেড়ে অর্থনীতির অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে নির্বাচনের পেছনে কাজ করেছিল অমর্ত্যর আত্মীয় প্রখ্যাত অর্থনীতির অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্তের সক্রিয় পরামর্শ।

আরেকবার একটু পেছনে ফিরে দেখা যাক কলেজের দিনগুলোর দিকে। ম্যাট্রিকে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছিলেন পার্থসারথি গুপ্ত (পরবর্তী জীবনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক) ও সুখময় চক্রবর্তী দুজনেই বালিগঞ্জ গবর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল। পারিবারিক বা সামাজিক দিক থেকে দুজনের মধ্যে মিল ছিল—দুজনের পিতা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। আই. এ. পড়ার সময় বন্ধুত্ব ও রেষারেষি দুইই বেশ দেখা গেছে দুজনের মধ্যে। আই. এ. পরীক্ষার ফল যখন বেরোল দেখা গেল প্রথম হয়েছে বিমলেন্দু চৌধুরি (পরবর্তীকালে কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক), সুখময় আবার দ্বিতীয়। পার্থ ও বিনয় ইতিহাসে চলে যাওয়ায় মনে হল অমর্ত্যের মধ্যে পেল সুখময় তার মনের মত প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য দুজনে ছিল দুই বিপরীত মেরুর ছাত্র—দুজনেই উজ্জ্বল ব্যক্তির, দুজনেরই হাসিমুখ, কিন্তু অমর্ত্যর মেলামেশা ছিল নির্বাচিত, সুখময়ের হিসেবী। সুখময় সাধারণতঃ মিশত উঁচু ক্লাসের ভাল ছাত্রদের সঙ্গে, এবং অধ্যাপকদের কাছেকাছি থাকত। অমর্ত্য ছিল আড্ডাবাজ, ছেলে ও মেয়েদের সঙ্গে সমানে জমিয়ে আড্ডা দিত। গুরুগম্ভীর সুখময়ের হাতে প্রায় সবসময়ে থাকত ভারী বই, আশেপাশে দৃষ্টি ফেলে অন্য ছাত্রদের থেকে সে দূরত্ব বজায় রেখে চলত। ইংরেজির প্রখ্যাত অধ্যাপক তারক সেনের পরিচালনায় প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরির পুস্তক ভাণ্ডার ছিল সর্বাধুনিক ও অফুরন্ত—অমর্ত্যকে তেমন দেখি নি বসে বসে বই পড়তে বা নোট নিতে। সুখময় লাইব্রেরিতে প্রায়ই আসত, হবে সে বই নিত ভেতর থেকে, তারপর আমরা কি বই পড়ছি বা নোট নিচ্ছি একবার পেছন থেকে টহল দিয়ে দেখে যেত। নিজের বই বা নোট কিন্তু সে কখনো কাউকে দেখাত না। অমর্ত্য কলেজের প্রায় সব কাগজেই যোগ দিত, ডিবেট কম্পিটিশনে বাইরেও যেত, কলেজের বার্ষিক স্টিমার পার্টিতেও যোগ দিত,—পড়াশোনায় মেতে থাকতে কখনো দেখি নি। পড়াশোনার আসল ব্যাপারটা ও সারত সকালে ও রাত্রে।

নবাগত ছেলেও প্রেসিডেন্সি কলেজে সকলের সঙ্গে পরিচিত হতে ও বন্ধুত্ব পাতাতে বেশি সময় নেয় নি। আমাদের সময়ে ইকনমিক্স অনার্সে পলিটিক্যাল সায়েন্সেও অন্তর্ভুক্ত ছিল—পরে দুটি বিষয় আলাদা হয়ে গেছে। আমাদের ক্লাসের জন্য তিরিশ ছাত্রের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ। আমাদের থিয়োরি পড়াতেন ইউ. এন. ঘোষাল, তত্ত্বতোষ বাবু ও নবীন অধ্যাপক তাপস মজুমদার। ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স পড়তেন ধীরেশ বাবু (ভট্টাচার্য) ও পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়াতেন রমেশ বাবু (ঘোষ)। এঁদের মধ্যে এখন জীবিত আছেন একমাত্র ধীরেশ বাবু ও নিরী-প্রবাসী তাপস বাবু। ক্লাসে দেখেছি সুখময় ও অমর্ত্য দু জনেই অধ্যাপকদের মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করত। সুখময়ের বক্তব্য দুর্বোধ্য ঠেকত, কিন্তু অমর্ত্যর ছিল ধারালো। মাঝে মাঝেই হত ক্লাস টেস্ট, সেমিনার। বিশ্লেষণে দুজনেই সমান দক্ষ ছিল, কিন্তু বিতর্কে অমর্ত্য ছিল অদ্বিতীয়। কলেজের পরীক্ষায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুখময় অমর্ত্যর চেয়ে বেশি নম্বর পেত। আমরা ধরে নিয়েছিলাম অনার্সের ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হবে সুখময়, দ্বিতীয় হবে অমর্ত্য। কিন্তু অমর্ত্যই হল প্রথম।

বি. এ. পাস করেই অমর্ত্য চলে গেল কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। ট্রাইপসে হল প্রথম। দ্বিতীয় হয়েছিলেন পাকিস্তানের মেহবুব-উল-হক, যাঁর সঙ্গে পরবর্তী জীবনে অমর্ত্যর হয় সুগভীর বন্ধুত্ব। দুজনে একসঙ্গে অনেক বিশ্বস্তরসারী কাজ করে গেছেন। বস্তুতপক্ষে এই বন্ধুর অকাল মৃত্যু উপলক্ষে ইউনাইটেড নেশনস্ এর পক্ষ থেকে আয়োজন করা এক স্মরণ সভায় যোগ দিতে অমর্ত্য এসেছিল নিউ ইয়র্কে গত ১৪ই অক্টোবর, যখন সে প্রথম খবর পায় টেলিফোনে যে সে এবছরের নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। ট্রিনিটি কলেজে প্রথমে অমর্ত্য ভর্তি হতে পারে নি সিট খালি না থাকায়। পরে এক জন ছাত্র ভর্তি না হওয়াতে অমর্ত্য সুযোগ পেয়ে যায়। অল্প দিনের মধ্যেই সে বুঝিয়ে দিল তার যোগ্যতা। পর পর তিন বছর পেল তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—১৯৫৪ সালে পেল অ্যাডাম স্মিথ প্রাইজ, ১৯৫৫ সালে পেল বেনবেরি স্কলারশিপ ও ১৯৫৬ সালে পেল সিডজেমন্ড প্রাইজ। সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতির ছাত্র হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করার পর তাকে নির্বাচিন করা হল একটি অত্যন্ত সম্মানজনক পদে—ট্রিনিটি কলেজের প্রাইজ ফেলোশিপ দেওয়া হল তাকে। এই সুবর্ণ সুযোগের সদব্যবহার করল অমর্ত্য। তার অনেক দিনের ইচ্ছা সে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে। সেই সুযোগ এসে গেল। সে লজিক, এপিস্টেমলজি ও এথিক্সের ওপর পড়াশোনা আরম্ভ করল। একজনের লেখা ও সাক্ষাৎ পরিচয়ে অমর্ত্য সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল—তাঁর নাম জন রলস্, একজন দার্শনিক। তাঁর গ্রন্থ-দ্য থিয়োরি অব্ জাস্টিস—অমর্ত্যকে প্রভাবিত করে। অমর্ত্য স্বীকার করেছে কল্যাণকারী অর্থনীতির বিশ্লেষণে জন রলস্এর প্রভাবের কথা। দুঃখের বিষয়, জন্ রলস্ও তাঁর গ্রন্থে অমর্ত্য সেনের প্রভাব স্বীকার করেছেন। আসল ব্যাপার হল -এই দুই মেধাবী পুরুষই একসঙ্গে মত-বিনিময় করতে পেরেছিলেন।

অমর্ত্য ট্রিনিটি কলেজে ছিল ১৯৬০ সাল পর্যন্ত, যদিও এরই মধ্যে এক ফাঁকে সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির পূর্ণ অধ্যাপক রূপে কাজ করেছিল মাত্র ২৩ বছর বয়সে—১৯৫৬ সালে, ছিল ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। ট্রিনিটি কলেজের পর সে যোগ দেয় দিল্লি স্কুল অব্ ইকনমিক্সে, যেখানে তার জীবনের এক বড় অধ্যায় অতিবাহিত হয় (১৯৬৩-৭১)। অধ্যাপক হিসাবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। প্রথা ভেঙে সে রোল কল্ করা তুলে দিল, যাতে বৃথা সময় নষ্ট না হয়। এরপর অমর্ত্য যোগ দেয় লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্সে, এবং এখানে তার জীবনের আর একটি স্মরণীয় অধ্যায় কাটে (১৯৭১-৭৭)। এরপর সে যোগ দেয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার পদের নাম ছিল—স্ট্রামণ্ড প্রফেসর অব্ পলিটিকাল ইকনমি, সে অক্সফোর্ডে অল্ সোলস্ কলেজে, ফেলো হিসাবে কাজ করেছে। অক্সফোর্ডে তার মোট ১১ বছর কেটেছে (১৯৭৭-৮৮)। এরপর সে সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, যার ঠিকানাও কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস্। ওখানে তাকে যুগপৎ অর্থনীতি ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হল। একই ব্যক্তির পক্ষে দুটি বিষয়ের অধ্যাপনার নজিরও বিরল। তার পদের নাম হল—লামণ্ট ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, ডিপার্টমেণ্ট অব্ ইকনমিক্স (লিটয়ের সেন্টার) ও ডিপার্টমেণ্ট অব্ ফিলজফি, (এমারসন হল)। এখানেও তার দীর্ঘ দশ বছর কাটে, এবং এখানে থাকার সময়েই সে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়, যার জন্য তার পুরস্কারের ওপর ট্যাক্স্ দিতে হবে আমেরিকার আইন অনুযায়ী। ১৯৯৮ এর শেষ দিকে সে আবার ফিরে আসে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে, হার্ভার্ডের অর্ধেক পারিশ্রমিকে, কিন্তু অতি সম্মানজনক রাজকীয় নিযুক্তি 'মাস্টার'—পদে। অমর্ত্য ভারতের নাগরিক। সেজন্য এ এক অনন্য সম্মান। মাস্টার অব্ ট্রিনিটি কলেজ হিসেবে যোগ দেওয়ার পরেই তার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। নোবেল প্রাইজের সঙ্গে ট্রিনিটি কলেজের যেন রক্তের সম্বন্ধ—এ পর্যন্ত এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত ৩১ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, এবং গত চারজন মাস্টারের মধ্যে তিন জনই (অমর্ত্যকে নিয়ে) নোবেল বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন। এখনকার বিধি অনুযায়ী অমর্ত্য এই পদে ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত থাকতে পারবে, এবং তার পরেও ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত থাকতে পারে যদি কলেজের ১৫০ জন ফেলো সম্মতি দেন।

অমর্ত্যর বয়স এখন ৬৫, এর মধ্যে প্রায় ৪২ বছর ধরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ও অর্থনীতি-গবেষণার পীঠস্থানগুলিতে সে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অধ্যাপনা করে, অগণিত মেধাবী ছাত্রের সৃষ্টি করেছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে সে নিরলসভাবে অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক

প্রকাশনা করেছে। কেমব্রিজে যখন সে ট্রাইপসের অধ্যয়ন করত, তখন তার গাইড ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ জোন রবিনসন। এবং যাঁদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল তাঁরা হলেন তার শিক্ষক মরিস ডব্ এবং অন্যান্যদের মধ্যে পিয়েরো স্রাফা ও ডেনিস রবার্টসন। অমর্ত্য যখন দর্শন শাস্ত্রে, বিশেষ করে এথিক্সে, আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তার গাইড জোন রবিনসন তাকে মৃদু ধমকের সুরেই বলেছিলেন—ফরগেট অ্যাবাউট সোজ্ রবিশ অব্ এথিক্স, কনসেনট্রেট অন ইকনমিক্স। অমর্ত্যর মত হয়ে বলেই সে গাইডের কথা শোনে নি, এবং তার জন্য সারা পৃথিবী উপকৃত হয়েছে। অমর্ত্য বহু গ্রন্থ ও অসংখ্য জার্নালের লেখক। গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে :

১। চয়েস অব্ টেকনিক্স (১৯৬০)
২। গ্রোথ ইকনমিক্স (সম্পাদনা-১৯৭০)
৩। কালেকটিভ চয়েস অ্যাণ্ড সোশাল ওয়েলফেয়ার (১৯৭০)
৪। অন্ ইকনমিক ইনইকোয়ালিটি (১৯৭৩)
৫। এমপ্লয়মেন্ট, টেকনলজি অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (১৯৭৫)
৬। পভার্টি অ্যাণ্ড ফেমিন্স (১৯৮১)-যেটা হয় সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ
৭। চয়েস, ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (১৯৭৫)
৮। অন এথিক্স অ্যাণ্ড ইকনমিক্স (১৯৮৭)
৯। দ্য স্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং (১৯৯৩)
১০। হাংগার অ্যাণ্ড পাবলিক অ্যাকশন (জাঁ দ্রেজের সঙ্গে-১৯৮৯)
১১। দ্য পলিটিকাল ইকনমি অব্ হাংগার (জাঁ দ্রেজের সঙ্গে-১৯৯১)
১২। ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড সোশাল অপরচুনিটি (জাঁ দ্রেজের সঙ্গে-১৯৯৬)

তার আরো দুটি গ্রন্থ যন্ত্রস্থ একটির নাম—ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড ফ্রিডম, আর অন্যটির নাম—ফ্রিডম, র‍্যাশনালিটি অ্যাণ্ড সোশাল চয়েস।

আরো একটি দিক লক্ষ করবার মত। আর কোন অর্থনীতিবিদই অমর্ত্যর মত এতগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থার সভাপতি হতে পারেন নি। অমর্ত্য সেন যে সব সংস্থার সভাপতি, তাদের মধ্যে বিখ্যাত কতকগুলির নাম—

- ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশন
- ইকনমেট্রিক সোসাইটি
- ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস্ অ্যাসোসিয়েশন
- অ্যামেরিকান ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশন
- ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স অ্যাসোসিয়েশন

অমর্ত্যর লেখনীচারণ অর্থনীতির বাইরেও অনেক বিষয়-যেমন দুর্ভিক্ষের ওপর, যা প্রকাশিত হয়েছিল বিখ্যাত সাময়িকী—নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব্ বুক্স-এ। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর তার একটি যুক্তিপূর্ণ লেখা বেরিয়ে ছিল আমেরিকাতে। তার প্রতিক্রিয়া একটি সুন্দর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বেরিয়েছিল ভারতের সাম্প্রতিক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর। এ পর্যন্ত তার ২২৫ টির বেশি গবেষণামূলক রচনা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় অমর্ত্যর একটি গ্রন্থ বেরিয়েছে—'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি' (অন্যের অনুবাদ)। এ ছাড়া আরো দুয়েকটি বাংলার প্রকাশিত ওর লেখা (অনূদিত) চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে আর একটি গ্রন্থের উল্লেখ করব—তা হচ্ছে তার হাতেই তার মাতামহ কিতিমোহন সেনের বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ—যা হিন্দুইজম্ নামে পেঙ্গুইন প্রকাশ করেছে।

১৯৯৭ সালে কলকাতায় কনফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিজ বা সি. আই. আই.-এর তরফ থেকে অমর্ত্য সেনকে তার সারা জীবনের কৃতির জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছিল। সেই সভায় কৃতিত্বাবধে অমর্ত্য যা বলেছিল প্রথমার একটি লেখার অংশ থেকে উদ্ধৃত করছি, যা থেকে অমর্ত্যর মৌলিক চিন্তাধারার খানিক পরিচয় পাওয়া যাবে—

এক কালে রাজা আচার্যের আশ্রমে এসে উপদেশ নিয়ে যেতেন। এখন আচার্যদেরই মাঝে মাঝে আসতে দেখি লোকালয়ে, কারণ মানুষ তাঁর কথা শুনতে আগ্রহী। আচার্যের উপদেশের জন্য আজকালকার রাজা ও রাজপুরুষদের যেন মাথাব্যথা নেই। তবু অমর্ত্য সেনের মত অধ্যাপকদের কথা যদি কোন মতে কোন রাষ্ট্রনেতার শুভবুদ্ধি জাগাতে পারে তবে জনসাধারণেরই মঙ্গল। ...আচার্য অমর্ত্য সেন এবার ভারত সফরে এসে ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কিছু ভাবনা প্রকাশ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, বাসগৃহ একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়ালেই শুধু চলবে না, তা শুভাকাঙ্ক্ষীর হয় তখনি যখন তার অধিবাসীরা সেই শুভের অংশভাগী হয়। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র মোটামুটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু আচার্য মুখবন্ধ করে বলেছেন—তিনটি বিষয়ের ওপর ভারত উপেক্ষা করেছে—এই বিষয়গুলি হল—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমিসংস্কার। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হলেও এই তিনটি বিষয়ে সরকার বিশেষ কিছু করতে পারে নি এবং বিরোধী পক্ষও এসব বিষয়ে সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা করে নি বলেই তাঁর অভিযোগ করেছেন কেরালা রাজ্যের, যেখানে এই তিনটি বিষয়েই সরকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আচার্যের মতে জনসাধারণ যদি উন্নয়নে অংশগ্রহণ না করে তবে সে উন্নয়ন স্থায়িত্ব পায় না। আর একটি অতি স্পর্শকাতর বিষয়ে তিনি মুখর হয়ে উঠেছেন যা আগে কেউ তখনো এত স্পষ্টভাষায় বলে নি। তাঁর মতে, দুরন্তের ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ওপর তখনো সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ হয় নি,—প্রতিরক্ষা বিষয়টিকেই যেন এক মহত্তত্ত্বের ঘেরাটোপে ঢেকে রাখা হয়। অথচ যখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অর্থযোগান অকুলান হয়ে পড়ে, তখন সরকারের মোট খরচে ব্যয়সংকোচের কথা ভাবতেই হবে।"

অমর্ত্যকে এবার অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার যে কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে তা আলোচনা করার আগে সাধারণভাবে নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে ও বিশেষভাবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সুকৃতদার মানবতাবাদী সুইডিশ রসায়নবিদ্ ও উদ্ভাবক আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল ১৮৯৬ সনের ১০ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর এক বছর আগে তিনি তাঁর বিত্তসম্পদ মানব কল্যাণের জন্য উইলের মাধ্যমে দান করে যান। বহুদিন আন্তরীয়স্বজন মামলা চালান প্রায় চার বছর ধরে। শেষ পর্যন্ত নোবেলের উইল আদালতের স্বীকৃতি পেল এবং ১৯০০ সালে গঠিত হল নোবেল ফাউণ্ডেশন। নোবেল নিজের হাতে অন্য কারো সহায়তা ছাড়াই তাঁর উইলের বয়ান লিখেছিলেন। উইল থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি।

"...The whole of my remaining realisable estate shall be dealt with in the following way : the capital shall be invested by my executors in safe securities and shall constitute a fund. the interest on which shall be annually distributed in the form of prizes to those who, during the preceding year, shall have conferred the greatest benefit on mankind. The said interest shall be divided into five equal parts, which shall be apportioned as follows : one part to the person who shall have made the most important discovery of invention within the field of physics . one part to the chemical discovery or improvement ; one part to the person who shall have made the most important discovery within the domain of physiology or medicine ; one part to the person who shall have produced in the field of literature the most outstanding work of an idealistic tendency ; and one part to the person who shall have done the most or the best work to promote fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses".

"The prizes for physics and chemistry shall be awarded by the Swedish Academy of Sciences, that for physiological or

medical) works by the Karolinska Institute in Stockholm, and that for champions of peace by a committee of five persons to be elected by the Norwegian Storting (Parliament). It is my express wish that in awarding the prizes no consideration whatever shall be given to the nationality of the candidates, but the most worthy shall receive the prize, whether he be a Scandinavian or not."

বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকমের পুরস্কার চালু থাকলেও সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে নোবেল পুরস্কার বিশে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার সন্দেহ নেই। উইলে আছে, বিগত বছরের কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে, কিন্তু যখন নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য বিধি-নিয়ম তৈরি হল, তখন উইলের ওই অংশটিকে কিছুটা বদলে নিয়ে স্থির করা হল যে বিগত এক বছরের কাজের জন্যই শুধু পুরস্কার বিবেচিত হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, আগেকার কাজের জন্যও পুরস্কার বিবেচিত হতে পারে যদি পূর্বেকার সেই কাজের মাহাত্ম্য সম্প্রতি প্রতীয়মান হয়ে থাকে। অনেকবার নোবেল প্রাইজ একাধিক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে একই বিষয়ের জন্য, কিন্তু বিধি-নিয়মে এ সম্বন্ধে কোন কিছু না থাকলেও এ পর্যন্ত তিনজনের বেশি কোন পুরস্কারের ভাগীদার হয় নি। এই তিনের অনধিক সংখ্যাটা ঐতিহ্য হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

সাহিত্য ও শান্তি পুরস্কার নিয়ে মাঝে মাঝে কথা উঠলেও বিজ্ঞানের জন্য পুরস্কারের যোগ্যতা নিয়ে গত একশ বছরে তেমন কথা ওঠে নি। সারা পৃথিবীর মানুষ নোবেল পুরস্কারকে একটি শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে মেনে নিতে পেরেছে। তার জন্য যে পদ্ধতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তার প্রশংসা করতেই হয়। নোবেলের উইলে যদিও পুরস্কার প্রদানের জন্য চারটি সংস্থার নাম করা হয়েছে, ১৯০০ সালে যখন বিধি-নিয়ম চূড়ান্ত করা হয়, তখন আরো তিনটি সংস্থার সৃজন হয়েছে—এগুলি হল—নোবেল ফাউণ্ডেশন, পাঁচটি নোবেল কমিটি (প্রতি বিষয়ের জন্য একটি), ও চারটি নোবেল ইন্‌স্টিট্যুট (উইলে উল্লিখিত চারটি সংস্থার প্রত্যেকের জন্য একটি)।

এই বিরাট কর্মকাণ্ডের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে—একটি প্রশাসনের জন্য, অন্যটি পুরস্কার নির্বাচনের জন্য। একটির সঙ্গে অন্যটির কোন সম্বন্ধ নেই। প্রশাসনের জন্য আছে নোবেল ফাউণ্ডেশন, পাঁচ সদস্যের বোর্ড অব্ ডাইরেক্টার (যার সভাপতি রাজার দ্বারা নির্বাচিত), এবং ১৫ সদস্যের ট্রাস্টি (যাঁরা নির্বাচিত হন পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থাগুলি দ্বারা)।

এই নির্বাচনের পদ্ধতিটি বৈজ্ঞানিক এবং খাঁটো-পাঁটো। প্রথম পদক্ষেপ হল—প্রার্থীর নামের প্রস্তাব আহ্বান করা। রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেস এর ১৪০ জন সুইডিশ ও ১০০ জন বিদেশী সদস্য আছেন। নামের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন এই সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেসের সদস্যরা, আর পারেন অ্যাকাডেমি নির্বাচিত ৪০ থেকে ৫০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা। এ ছাড়াও, নাম পাঠাতে পারেন ভূতপূর্ব নোবেলজয়ী, আটটি স্ক্যানডিনেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা, এবং বিশেষের বাছাই গবেষণা সংস্থার ও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা। সব মিলিয়ে এই ৬০০-৭০০ জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠানো হয় প্রতি বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। চেয়ে না পাঠানো নাম বাতিল হয়ে যায়। ৩১শে জানুয়ারি সব কমিটিগুলির সদস্যরা মিলে প্রস্তাবিত নাম চূড়ান্ত করার জন্য। এই তালিকা চূড়ান্ত হওয়া থেকে বছরের শেষে পুরস্কার প্রদানের নাম ঘোষণাকরা পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটিগুলির সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে যায় প্রস্তাবিত প্রার্থীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেওয়ার। সেপ্টেম্বরের শেষে এই সব কমিটিগুলোকে তাদের রিপোর্ট দিতে হয় সমস্ত অ্যাকাডেমিকে। চূড়ান্ত নির্বাচন হয় ভোটাভুটিতে। ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির মতো সেক্টিসিসের বেলাতেও একই রকম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। বলা বাহুল্য, প্রতিটি পদক্ষেপ চূড়ান্ত গোপনীয়।

একটা কথা উঠতে পারে—নোবেল বিজ্ঞানের মাত্র তিনটি শাখাতেই কেন বেছে নিলেন? গণিতকে এই পুরস্কারের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য নোবেল সম্বন্ধে একটি গল্প চালু আছে। নোবেলের সমসাময়িক দুর্ধর্ষ গাণিতিক ছিলেন গস্টা-ছিটাগ-লেফলার। নোবেল ঘৃণা করতেন মিটাগ-লেফলারকে তীব্রভাবে—তার কারণ ছিল এক নারী, যাকে দুজনেই পছন্দ করতেন। ওই নারীর নাম-ঠিকানা পাওয়া যায় না। পুরস্কারের বিষয় হিসাবে গণিত থাকলে পাছে ওই লোকটি ভবিষ্যতে নোবেল প্রাইজ পায়, তাই নোবেল গণিতের উল্লেখ করেন নি। এ গল্পের সারবত্তা যাই হোক না কেন, ১৯০০ সালের পর একশ বছরে বিজ্ঞানের অনেক শাখার অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে, এবং নোবেল ফাউণ্ডেশনের ওপর অনেক চাপও এসেছে অন্য কয়েকটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে, কিন্তু এ পর্যন্ত সে সব প্রচেষ্টা সফল হয় নি। ব্যতিক্রম হয়েছে মাত্র একটি ক্ষেত্রে। তার কথাই এবার বলছি।

অর্থনীতিকে বিজ্ঞানের মর্যাদা প্রথম দিকে দেওয়া হয় নি। আমরা যখন অর্থনীতির ছাত্র, তখনো অর্থনীতিতে এম. এ. ডিগ্রি দেওয়া হত। কিন্তু ধীরে ধীরে অর্থনীতিশাস্ত্রে পঠন-পাঠনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগে যে শাস্ত্রে আলোচ্য বিষয় ছিল কেমনভাবে জিনিষপত্র ও পরিষেবা উৎপন্ন হয় এবং কেমনভাবে তার বিতরণ হয়, সেই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে যাকে বলে বিহেভিয়ারিয়াল সায়েন্স বা কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সমষ্টির প্রতিক্রিয়া। অর্থনীতিবিদেরা এখন অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন মানুষের আচরণ ও প্রতিক্রিয়া, এবং ব্যাখ্যা করেন মানুষের ব্যবহারিক মানচিত্রটি, এবং কি হওয়া উচিত ততটা না ভেবে কি আছে কি ঘটছে তারই বিশ্লেষণের প্রতি অধিক মনোযোগী। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই অর্থনীতির প্রতি একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে, এবং ১৯৩০ এর বিশ্বব্যাপী মন্দা —যাকে বলা হয় গ্রেট ডিপ্রেশন—কালেই অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড চাহিদা এল কিছু করে দেখাতে যাতে রাষ্ট্র শুধু দর্শকের ভূমিকায় না থেকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করতে প্রয়াস চালাতে পারে। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ জন্ মেনার্ড কেইনসের আবির্ভাব হল। তিনি খোলা বাজারের ওপর আক্রমণ চালালেন, রাষ্ট্র যাতে ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মন্দা কাটাতে পারে তার উপদেশ দিলেন। রাগনার ফ্রিশ, সাইমন কুজনেটস্ প্রভৃতি বিকপাল অর্থনীতিবিদেরা বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি করলেন যা দিয়ে জাতীয় আয় ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উৎপাদকগুলিকে সন্তোষজনকভাবে পরিমাপ করা যায়। ১৯৬০ সাল নাগাদ গণিত ও সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে শক্ত বনিয়াদে আবির্ভূত হল একটি নতুন শাখা ইকনমেট্রিক্স্, যা মানুষের কল্যাণের জন্য অন্য যে কোন বিজ্ঞানের শাখার মতোই বৈজ্ঞানিক। অর্থনীতিশাস্ত্র পেল এক নববিজ্ঞানের মর্যাদা। ১৯৬৮ সাল তাই অর্থনীতি শাস্ত্রের পক্ষে এক পরম গৌরবের সময় যখন নোবেল ফাউণ্ডেশন তাদের বন্ধ দরজা খুলে দিল এই নবতম বিজ্ঞানের জন্য। ওই বছর সুইডেনের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্ক অব্ সুইডেন (Sveriges Riksbank)-এর তিনশত বছর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব নোবেল ফাউণ্ডেশন গ্রহণ করলেন। পুরস্কারের নাম হল The Alfred Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেস এর ওপর দায়িত্ব পড়ল এই পুরস্কার প্রদানের। এই পুরস্কার প্রদানের পদ্ধতি ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে পুরস্কার প্রদানের মতো সমান এবং আর্থিক মূল্য ও সম্মানের দিক থেকেও এই পুরস্কার অন্যান্য নোবেল পুরস্কারের অনুরূপ।

অর্থনীতিতে পুরস্কার দেওয়ার জন্যও আর একটি নোবেল কমিটি গঠিত হয়েছে। অর্থনীতিতে নোবেল মেমোরিয়াল প্রাইজ দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের মনোনয়ন পাঠাতে পারেন—

১। রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমির ২৪০ জন সদস্য

২। অর্থনীতির জন্য নোবেল কমিটির সদস্যরা

অর্থনীতিতে যাঁরা আগে নোবেল স্মারক পুরস্কার পেয়েছেন
সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ও নরওয়ের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির অর্থনীতির স্থায়ী অধ্যাপকেরা

৫। বিদেশের কমপক্ষে ছটি বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের (যে গুলোকে বছর বছর নির্বাচন করবেন রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেস) অনুরূপ পদাধিকারী।

অন্য বিজ্ঞানীরা, যাঁদের অ্যাকাডেমি প্রয়োজন বোধে মনোনয়নের আমন্ত্রণ করবেন।

১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছে, এবং এ পর্যন্ত প্রতিবছর এক বা একাধিক অর্থনীতিবিদ এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। প্রথম পাঁচ বছরের পুরস্কার প্রাপকেরা ছিলেন—

১৯৬৯	১।	নরওয়ের রাগনার ফ্রিস্
	২।	হল্যাণ্ডের জান্ টিন্বার্জেন
১৯৭০	—	আমেরিকার পল্ এ. স্যামুয়েলসন
১৯৭১	—	আমেরিকার সাইমন এস্. কুজনেটস্
১৯৭২	১।	আমেরিকার কেনেথ জে. অ্যারো
	২।	ব্রিটেনের জন্ আর. হিক্স্
১৯৭৩	—	আমেরিকার ওয়াসিলি লিয়নটিয়েফ্
১৯৭৪	১।	ব্রিটেনের ফ্রিডরিশ্ ফন্ হায়েক্
	২।	সুইডেনের কার্ল গুনার মির্ড্যাল্

এঁরা প্রত্যেকেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিকল্পাল ও নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। ১৯৯৭ সালে এই পুরস্কার পেয়েছেন যুগ্মভাবে দুজন আমেরিকান—রবার্ট মের্টন ও মাইরন্ শোলস্। ১৯৯৮ সালের পুরস্কার একক্ভাবে পেয়েছে অমর্ত্য। এবারের পুরস্কারের অর্থমূল্য ৭৬ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনার অর্থাৎ নয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় চার কোটি টাকার কিছু বেশি)। জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশে বাস করলেও অমর্ত্য ভারতের নাগরিকত্ব রেখেছে। ভারতীয় নাগরিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ, সি. ভি. রমন্ ও মাদার টেরেসার পরেই চতুর্থ ভারতীয় অমর্ত্য কুমার সেন। জন্মসূত্রে ভারতীয় কিন্তু ভারতের নাগরিকত্ব রক্ষা করেন নি দুজন নোবেল প্রাপক হলেন হরগোবিন্দ খুরানা ও এস্. চন্দ্রশেখর।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রখ্যাত লেখিকা নবনীতা দেবের সঙ্গে অমর্ত্যর প্রথম বিবাহ ও দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম—নাম : অন্তরা ও নন্দনা। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত অমর্ত্যর বিখ্যাত এই 'অন্ ইকনমিক্স ইনইকোয়ালিটি'র উৎসর্গপত্রে অন্তরা ও নন্দনার নাম উল্লেখ করে সে আশা ব্যক্ত করেছিল—'তোমরা যখন বড় হবে, আশা করব পৃথিবীর অসাম্য কম দেখবে।' বছর চোদ্দ বাদে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। দ্বিতীয় বিবাহ থেকে তার আর একটি মেয়ে ও একটি ছেলে হয়, যাদের নাম। ইন্দ্রাণী ও কবীর। অমর্ত্যর তৃতীয়া স্ত্রীর নাম এমা রথস্চাইল্ড সেন। তিনি কিংস কলেজের ফেলো, এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর্ হিস্টরি অ্যাণ্ড ইকনমিক্সের ডাইরেক্টর। অমর্ত্যর একটি মাত্র বোন, সুপর্ণা (এ নামটিও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া)। মা অমিতা সেন অশীতিপর বৃদ্ধা, কিন্তু সন্তানের বিশ্বজয়গৌরব দেখে যেতে পারছেন। মাতৃবৎসল অমর্ত্য প্রায় প্রতি বছরই সাধারণতঃ শীতের সময় শান্তিনিকেতনে পৈতৃক বাড়ি 'প্রতীচী'তে আসে। উল্লেখ্য, অমর্ত্য ঘোষণা করেছে যে সে পুরস্কারের অর্থের অংশ দিয়ে একটি ট্রাস্ট করবে, তার নাম দিয়েছে এই বাড়ির নামেই—'প্রতীচী ট্রাস্ট'।

অমর্ত্যর ও আমার কর্মক্ষেত্র অভিন্ন, কিন্তু যোগাযোগ আছে। তার জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। একবার একটা আশ্চর্য যোগাযোগ হয়েছিল। সে কথা আমি কখনো ভুলবো না। ১৯৮০ সাল। সরকারী কাজ সেরে দিল্লী থেকে ফিরছি। দিল্লী এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে দেখি সুখময় ও অমর্ত্য গল্প করছে। আমিও যোগ দিলাম। কলকাতা আসা পর্যন্ত এক সঙ্গে কলেজ জীবনের তিন বন্ধু বহু বছর পরে একসঙ্গে কিছু অনন্ত মুহূর্ত অতিবাহিত করলাম। আমি সরকারি চাকরি সূত্রে ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের, ভূমি-সংস্কার রূপায়ণের কাজে জড়িত ছিলাম, আর অমর্ত্যও ভূমি-সংস্কার নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। শান্তিনিকেতনের কাছে এমনি একটি গবেষণার কাজে ওর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল, সে কথা ভাবতে ভাল লাগছে। আশির দশকে ওর সঙ্গে পত্রালাপ ও যোগাযোগ হয় বেশি। ওর একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কিছু সহায়তায় এসেছিলাম বলে নিজেকে ধন্য মনে করি। তার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। ১৯৮৮ সাল। ওর আমন্ত্রণে ওদের শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' বাড়িতে গিয়েছি। সে এক মজার ব্যাপার। নিমন্ত্রিত হয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছি, মাসিমা সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু অমর্ত্য বাড়ি নেই শুনলাম পোস্টাপিসে গেছে, তাও অনেকক্ষণ হল। আমি মাসিমাকে ব্যস্ত হতে নিষেধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ বাদে অমর্ত্য সাইকেলে চেপে এসে হাজির, মুখে হাসি, দেরির জন্যে ব্রিটিশ ভদ্রতায় দুঃখ প্রকাশ। মনে পড়ে, বহুদিন পরে ছেলেকে কাছে পেয়ে মা অনেক কিছু খাবার করেছিলেন, যার ভাগ আমারও জুটে গেল। সব শেষে পায়েস ও লুচি। অমর্ত্য নাকি দারুণ ভালবাসে, কিন্তু বিদেশে জুটবে কোথায়! বিশ্বখ্যাত অক্সফোর্ড প্রফেসরের সরল সাধারণ নিত্যাহার জীবন যারা দেখে মনে হয়েছিল—সার্থক ওর শান্তিনিকেতনের শিক্ষা, সার্থক ওর শান্তিনিকেতনের পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা। আমার কাছে লেখা চিঠিগুলি আমি যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছি। অমর্ত্য ইংরেজিতে বলতে ও লিখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু আমার কাছে বাংলাতে নিজের হাতে লেখা দুএক খানা চিঠিও আছে। নোবেল প্রাইজ পাবার আগের বছর অমর্ত্য যখন কলকাতায় এসেছিল, তখন একটি সভায় ওর সঙ্গে আমার ছবি তুলেছি। সে সভায় আমার ও অমর্ত্যের একমাত্র জীবিত অধ্যাপক ধীরেন ভট্টাচার্য ও দিল্লীপ্রবাসী তাপস মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। সে সভাই বোধ হয় কলকাতার শেষ বড় সভা, যখন অনেকেই অমর্ত্যকে কাছের মানুষ হিসাবে পেয়েছে, কথা বলেছে ও করমর্দন করেছে, যখন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার খ্যাতির বিড়ম্বনা তাকে সিকিউরিটির থেরাটোপে দূরে সরিয়ে রাখে নি।

বিশেষ কোন থিয়োরি বা গ্রন্থ বা উদ্ভাবনের জন্য অমর্ত্যকে এবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নি, পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তার সারা জীবনের কর্মকৃতির জন্যে, যার ফল সাম্প্রতিক কালে বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি, আলফ্রেড নোবেলের উইলে 'বিগত বছরের' কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়ার কথা থাকলেও বিধি-নিয়মে দ্বিরীকৃত হয়ে যে পূর্বেকার কাজের জন্যও পুরস্কার বিবেচিত হতে পারে যদি তার প্রভাব সাম্প্রতিককালে প্রতীয়মান হয়। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে বিধি-নিয়মে এই পরিবর্তন নোবেলের ইচ্ছাকেই বাস্তবায়িত করেছে। জনকল্যাণের জন্য যুগান্তকারী আবিষ্কার বা উদ্ভাবন এক বছর সময়কালের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায় না। ১৯৯৭ সালের অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার দেওয়া নিয়ে কথা উঠেছে। মের্টন ও শোলস্ কে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল মুল্য ও লগ্নী বাজারে বিশেষ কাজের জন্য (valuing risky "derivatives")। যে প্রখ্যাত আর্থিক সংস্থায় তাঁরা কাজ করতেন এবং যার কাজে তাঁরা তাঁদের পুরস্কার জয়ী ব্যানধারণা প্রয়োগ করেছিলেন, সেই সংস্থার প্রায় ডুবাডুবি হয়েছিল ধরে ধরে না আসতেই। অ্যামেরিকান ঘরানার এমনি গণ্ডীবদ্ধ ব্যানধারণার জন্য অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারটা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। অমর্ত্যকে বহু বছর ধরেই নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেও তার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত পুরস্কার জোটে নি। বলা যাবে না ১৯৯৭-এর অভিজ্ঞতার পরেই রয়্যাল অ্যাকাডেমি ১৯৯৮ সালের জন্য এমন একজন অর্থনীতিবিদকে বাছাই করলেন যাঁর কর্মকীর্তি অর্থনীতির প্রথাগত গণ্ডী ছেড়ে

বেরিয়ে এসে এক বিকল্প দৃষ্টির সন্ধান দিয়েছে। অমর্ত্যর কাজের সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক আলোচনা ও লেখা হয়েছে। আমার মনে হয়, অমর্ত্যর যে কাজের জন্য রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেস তাকে অর্থনীতিতে নোবেল-স্মারক পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেছেন তার সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যাবে অ্যাকাডেমি ঘোষণাপত্রে। নিচে তার ঈষদ্ ভাবানুবাদ দেওয়া হল :

"জনকল্যাণমূলক অর্থনীতির কতগুলো মৌল সমস্যার ওপর গবেষণার দরজা খুলে দিয়েছেন অমর্ত্য সেন—একদিকে যেমন সামাজিক যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁর অনন্য তাত্ত্বিক আলোচনায়, অন্যদিকে জনকল্যাণের ও দারিদ্র্যসূচকের সংজ্ঞা-নির্মাণে ও মূর্তিফলের ওপর তাঁর মূলিত গবেষণায়। এ সব কিছুর মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে আছে সাধারণভাবে বন্টন—সমস্যার প্রতি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিগত পছন্দ ও মূল্যবোধকে কেমন করে সামাজিক যৌথ সিদ্ধান্তে মিলিয়ে নেওয়া যায়, সে সম্বন্ধে অমর্ত্য সেন তাঁর মৌলিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে শর্তগুলি পূরণ না হলে সামাজিক যৌথ সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের প্রতি অবিচার করে, অমর্ত্য সেন সেগুলি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে ব্যক্তি-বিশেষের পছন্দ ও মূল্যবোধের বিভিন্নতার ওপর তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয় সে সম্বন্ধে অমর্ত্য সেন সমস্ত তথ্য আহরণ করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন, এবং সামাজিক কল্যাণ সাধনের তাত্ত্বিক কাঠামোর অনেক উন্নতিসাধন করেছেন। তাঁর গবেষণায় বিভিন্ন সমাজের জনকল্যাণ তুলনা করবার ও দারিদ্র নিরূপণের নতুন ও অনেক অর্থবহ এবং সন্তোষজনক সূচক আবিষ্কৃত হয়েছে।"

"ব্যক্তির বিভিন্ন পছন্দ-অপছন্দ ও মূল্যবোধগুলির যোগফল কি সমাজের সামগ্রিক পছন্দ ও সামগ্রিক মূল্যবোধ নির্মাণ করতে পারে, যাতে তা একদিকে হবে ন্যায়সঙ্গত, অন্যদিকে হবে তাত্ত্বিক দিক থেকে গ্রহণীয়?"

"সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত কি সব সময় ন্যায়সঙ্গত কর্মপন্থার নির্দেশ দিতে পারে?"

"কখন ও কেমন ভাবে আমরা অভিন্ন সমাজের জনকল্যাণের স্তর তুলনা করতে পারি?"

"আয়ের বৈষম্য কিভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে?"

"দারিদ্র প্রকৃতপক্ষে নিম্নমুখী হয়েছে কি না তা পরিমাপ করার নির্ভুল পন্থা কি?"

"কোন্ কোন্ শর্তের প্রভাবে মূর্তিফলের জন্ম হয়?"

"এমন সব প্রশ্নের অর্থবহ উত্তর দিয়ে অমর্ত্য সেন অর্থনীতিশাস্ত্রের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছেন ও উদ্রেখনীয় কাজ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষকদের কাছে নতুন দিক উন্মোচন করেছেন। অর্থনীতি শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র সমূহের তুল থেকে শাস্ত্র সংগ্রহ করে জীবনমুখী সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি অর্থনীতিতে এক মানবিক মূল্যবোধের মাত্রা যোগ করেছেন।"

"সর্বসম্মতি থাকলে ব্যক্তির ও সমষ্টির সিদ্ধান্তের মধ্যে বিরোধ থাকে না। যখন সর্বসম্মতি থাকে না, তখনই প্রয়োজন হয় ব্যক্তিমতের বিভিন্নতার যৌথমতের মধ্যে সন্তোষজনক ভাবে বাপ খাওয়ানো। অমর্ত্য সেনের 'থিয়োরি অব্ সোশ্যাল চয়েস' ঠিক এই সমস্যারই মোকাবিলা করেছে এবং আপাত অসম্ভবকত্বকে সম্ভাব্য সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়েছে।"

"সংখ্যাগুরুর ভোট নিয়ে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি অতি প্রচলিত ব্যবস্থা। অনেক দিন আগে দেকেই অবশ্য এই ব্যবস্থার বিরোধ দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, এই ব্যবস্থায় সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুকে দাবিয়ে রাখতে পারে। মনে করা যাক—ক, খ ও গ এই তিনটি বিকল্প আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে একটি দল ধরুক খ এর বদলে ক পছন্দ করবে, অন্য একটি দল গ এর বদলে খ পছন্দ করবে, আবার তৃতীয় একটি দল ধরুক গ এর বদলে ক বিকল্প পছন্দ করতে পারে। এই ধরণের ঘটনায়, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কোন বিকল্পই সন্তোষজনক ভাবে সবচেয়ে গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত হয়ে উঠে বেরিয়ে আসে না। অমর্ত্য সেন ও তাঁর সহযোগী প্রশান্ত পট্টনায়ক এই বিষয়ে মৌলিক কাজ করেছেন এবং গাণিতিক প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে এসেছেন কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ করা হলে সংখ্যাগুরুর মতভিত্তিক যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় হতে পারে।"

"পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের তত্ত্ব নিয়ে ১৯৭২ এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ্ কেনেথ্ অ্যারো আকৃষ্ট হন, এবং তাঁর গবেষণার ফল হয়েছিল একাধারে অদ্ভুতভাবে চমকপ্রদ ও অদ্ভুতভাবে মৌলিক। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের পছন্দ করার স্বাধীনতা প্রভৃতি পাঁচটি সর্বজনগ্রাহ্য স্বতঃসিদ্ধ শর্তকে পূরণ করতে পারে এমন কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত সম্ভব নয় এই ছিল অ্যারোর গবেষণালব্ধ ফল। একেই অর্থনীতিতে বলে-'অসম্ভবের উপপাদ্য' বা 'Impossibility Theorem'। এই তত্ত্বকে না মেনে খণ্ডন করা, না মেনে গ্রহণ করা। ষাটের দশকে অমর্ত্য সেন গবেষণা শুরু করেন এই 'অসম্ভবের উপপাদ্য'কে কেমন ভাবে পরিমার্জন করা যায়। তাঁরই প্রচেষ্টায় সমাধান সূত্রের হদিস পাওয়া গেল। ১৯৭০ সালে লেখা অমর্ত্য সেনের গ্রন্থ 'Collective Choice & Social Welfare' অর্থনীতির জগতে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং তার বিভিন্ন লেখায় সংখ্যা পরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিগত অধিকার ও জনকল্যাণের জন্য তথ্যসংগ্রহের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচনার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।"

"চিরাচরিত সামাজিক সিদ্ধান্ত তত্ত্ব বা সোশাল চয়েস থিয়োরিতে ধরে নেওয়া হয় যে একজন ব্যক্তি তার পছন্দের বিকল্পগুলিকে মানের ক্রমানুযায়ী সাজাতে সক্ষম। কিন্তু এক ব্যক্তির পছন্দের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পছন্দের তুলনা করা সম্ভব কিনা—এ বিষয়ে চিরাচরিত থিয়োরি নিশ্চুপ: ব্যক্তি সাধারণ তাদের পছন্দের বিকল্পগুলির জন্য যখন মানের ক্রম অনুযায়ী সাজায়, তখন সত্যি সত্যি সেগুলি তুলনাযোগ্য? এই শক্ত প্রশ্নটি এতদিন ধরে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সোশাল চয়েস্ থিয়োরিতে অমর্ত্য সেন সম্পূর্ণ একটি নতুন ক্ষেত্রের তৈরি করলেন, এবং তিনিই প্রথম দেখালেন—ব্যক্তিসাধারণের মানগুলি যদি তুলনাযোগ্য ধরা হয় তবে যৌথ সামাজিক সিদ্ধান্ত একরকমের হবে, আর যদি তা তুলনাযোগ্য না ধরা হয় তবে যৌথ সামাজিক সিদ্ধান্ত অন্য রকমের হবে, আর যদি তা তুলনাযোগ্য না ধরা হয় তবে যৌথ সিদ্ধান্ত অন্য রকমের হবে। অমর্ত্য সেন নৈতিক দর্শনেও (Moral Philosophy) উদাহরণ টেনে এনে দেখিয়েছেন। আমেরিকান দার্শনিক জন রলস্ এর ভাবধারা থেকে—জন রলস্ বলেছিলেন—যদি কোন বিশেষ সামাজিক অবস্থায় মূল্যায়ন করতে হয়, তবে সেই সমাজের দরিদ্রতম বা সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ব্যক্তির নিরিখে করতে হবে। অমর্ত্য সেন দেখালেন, শুধু দারিদ্রসীমার নিচে শুধু নয়, দারিদ্রসীমার একেবারে নিচের বর্গে সমাজের নেকেদের অবস্থা বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রেও তুলনাযোগ্য। পরবর্তীকালে সোশাল চয়েস থিয়োরির যা এগতি হয়েছে, তা অমর্ত্য সেনের বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়েই হয়েছে।"

"এই চিন্তাধারা থেকেই অমর্ত্য সেনের দারিদ্রসূচক নির্মাণের নতুন সংকেত দিয়েছেন যা পূর্বেকার সংজ্ঞা থেকে অনেক বেশি সন্তোষজনক। দারিদ্র পরিমাপের এক সাধারণ উপায় হচ্ছে-ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় এক দারিদ্র সীমার রেখা, যার পেছনে কোন তাত্ত্বিক সমর্থন থাকে না। তা ছাড়া, দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানকারীদের মধ্যেও ভিন্ন অবস্থার লোক রয়েছে-কেউ কম দরিদ্র, কেউ বেশি দরিদ্র। তাই দারিদ্রসীমারেখা দ্বারা দারিদ্র পরিমাপ সন্তোষজনক নয়। অমর্ত্য সেন পাঁচটি সর্বজনগ্রহণযোগ্য নীতির ভিত্তিতে তাঁর নতুন দারিদ্র-পরিমাপক সূচক নির্মাণ করেছেন, যা অনেকেই বিস্তারিতভাবে

ব্যবহার করেছেন।"

"তেমনি জনকল্যাণ পরিমাপের সূচক অমর্ত্য সেনের হাতে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। সিডিত দেশের আর্থিক অবস্থার তুলনা করার একটি অতি ব্যবহৃত সূচক মাথা পিছু জাতীয় আয়। এটি সন্তোষজনক নয় এই কারণে যে এর দ্বারা শুধু গড় অবস্থার চিত্রটিই ভেসে ওঠে। অমর্ত্য সেন একটি নতুন মনোগ্রাহিক সূচক আবিষ্কার করেছেন যার ব্যবহারিক প্রয়োগ উন্নততর।"

"অমর্ত্য সেন জোর দিয়ে বলেছেন—জনকল্যাণ মানে কতকগুলো বস্তুর উৎপাদন নয়, জনকল্যাণের প্রকৃত অর্থ হল যাদের জন্য সেই বস্তু সৃষ্ট হল তাদের তা গ্রহণের ক্ষমতা-তিনি যাকে বলেছেন—capabilities. অমর্ত্য সেনের মৌলিক অবদান-তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ভূমি সংস্কার এসব দরিদ্রতম মানুষদের গ্রহণক্ষমতা বাড়ায়, এগুলিকে বাদ দিয়ে জনকল্যাণ অর্থহীন। তাঁর অবদানের প্রতিফলন ফলশ্রুতি-তাঁরই সূচকের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নতুন Human Development Index নির্মাণ"।

"অমর্ত্য সেন তাঁর সারা জীবন ধরে যে কাজ করেছেন তার লক্ষ্য ছিল দরিদ্রতম মানুষের কল্যাণ। জীবনের সর্বপ্রথম রচনায় অমর্ত্য সেন উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি ধরণের প্রযুক্তি বা কৌশল (techniques) গ্রহণ করা উচিত তা বিশ্লেষণ করেছেন। আসলে, অমর্ত্য সেনের সারা জীবনের কর্মকৃতির অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট ছিল উন্নয়নের অর্থনীতির সঙ্গে, কারণ তাঁর বেশির ভাগ চিন্তাধারাই সমাজের দরিদ্রতম মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত। তিনি সরেজমিনে দুর্ভিক্ষের ওপরে প্রত্যক্ষ ফলিত কাজ করেছেন, যা তাঁর কল্যাণমূলক তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায়।"

"এই পটভূমিতে অমর্ত্য সেনের সবচেয়ে খ্যাতনামা গ্রন্থ হচ্ছে ১৯৮১ সালে লেখা : 'Poverty and Famines—An Essay on Entitlement and Deprivation'। এই গ্রন্থে তিনি চলিত ধারণা যে খাদ্যাভাবের জন্যই প্রধানতঃ দুর্ভিক্ষের জন্ম হয়—তাকে খণ্ডন করেছেন। ভারত, বাংলাদেশ ও আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের অনেকগুলি দুর্ভিক্ষের দৃষ্টান্ত বিস্তর সঙ্গে বিচার করে তিনি দেখিয়েছেন যে দুর্ভিক্ষের কারণ শুধু খাদ্যাভাব নয়, কারণ দুর্ভিক্ষ-কবলিত অনেক অঞ্চলে দেখা গেছে খাদ্যের যথেষ্ট মজুত ছিল, এমন কি সেখান থেকে বাইরে খাদ্যের চালান পর্যন্ত হয়েছে। তাঁর মতে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ দরিদ্রতম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার অভাব। অমর্ত্য সেনের পরবর্তী কাজগুলিতে (১৯৮৯ তে তাঁ দ্রেজের সঙ্গে লেখা গ্রন্থে) দেখানো হয়েছে কেমন ভাবে দুর্ভিক্ষের জন্ম রোধ করা যায়, অথবা একবার দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়ে গেলে কেমন করে তার কুফলের ওপর রাশ টেনে ধরা যায়। যদিও কয়েকজন সমালোচক অমর্ত্য সেনের Poverty and Famines গ্রন্থের কিছু ফলিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন, উন্নয়ন অর্থনীতির ওপর নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থটি অমর্ত্য সেনের একটি বিশ্বস্ত উন্মোচনকারী অবদান। এই গ্রন্থে বণ্টন সম্পর্কিত ও দারিদ্র সম্পর্কিত বিষয়গুলির ওপর অমর্ত্য সেন যে জোর দিয়েছেন, তা তাঁর সারা জীবনের গবেষণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।"[২]

নোবেল পুরস্কারের পাদপ্রদীপে এসে আজ অমর্ত্য সেনের বক্তব্য সারা পৃথিবীর—বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের—চোখ খুলে দিয়েছে। প্রথাগত অর্থনীতির বাইরে অমর্ত্য বাইবেলের মত সহজ সরল ভাষায় এমন সব বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছেন যা শুধু অর্থনীতি সনাক্তকেই নয়, চিন্তাশীল সব মানুষকে এবং উন্নয়ন নীতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রভাবান্বিত করেছে। অমর্ত্য সেনের একটি বৈশিষ্ট্য হল—যা আমি ছাত্রজীবন থেকেই দেখে আসছি-তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাগুলির একদিকে যেমন অপূর্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অন্যদিকে তার বেশিরভাগ লেখাই সহজবোধ্য। অমর্ত্যর কাছে অর্থনীতি মানে পৃথিবীকে আরো সহজ করে বোঝা, আর পৃথিবীকে বোঝা মানে শুধু তার অর্থনৈতিক জগৎকে বোঝা নয়, তার সামাজিক জগৎকে বোঝা, এবং সেই সঙ্গে মূল্যবোধের দার্শনিক জগৎটাকেও কিছু বোঝা—কারণ মানুষ এসবের মধ্যেই বাস করে। অমর্ত্যকে নোবেল পুরস্কারের ভূষিত করে নোবেল ফাউণ্ডেশন শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে তৃতীয় বিশ্বের প্রতি সারা পৃথিবীর যে একটা দায়বদ্ধতা আছে তাকেই সনাক্ত করেছে, এবং তার জন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। অমর্ত্যর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে অভিনন্দনবাণী দেশ-বিদেশে উচ্চারিত হয়েছে। ভারতবাসী হিসাবে আমরা সকলেই অমর্ত্য সেনের জন্য গর্বিত, এবং সহপাঠী হিসাবে সে কথা শোনাতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।।

ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫১ সালের আই. এ. ও আই. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম দশজন ছাত্র-ছাত্রীর নাম ঃ

আই. এ.

প্রথম	বিনয়ভূষণ চৌধুরী (সিটি কলেজ)
দ্বিতীয়	সুখময় চক্রবর্তী (প্রেসিডেন্সি কলেজ)
তৃতীয়	বঙ্কিমকুমার সেনগুপ্ত (প্রেসিডেন্সি কলেজ)
চতুর্থ	অমিতাভ চক্রবর্তী (স্কটিশ চার্চ কলেজ)
পঞ্চম	অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় (সিটি কলেজ)
ষষ্ঠ	পার্থসারথি গুপ্ত (প্রেসিডেন্সি কলেজ)
সপ্তম	শ্রীমতী মনিকা বসুয়া(বহরমপুর গার্লস্ কলেজ)
অষ্টম	জয়ন্তকুমার রায় (সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ)
নবম	তুষার কান্তি ঘোষ (প্রেসিডেন্সি কলেজ)
দশম	সুধীর কুমার সরকার (বেলুড় রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির)

আই. এস. সি.

প্রথম	অমর্ত্য কুমার সেন (নন্-কলেজিয়েট স্টুডেন্ট, বিশ্বভারতী কলেজ)
দ্বিতীয়	দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (ঐ)
তৃতীয়	প্রশান্ত কুমার নন্দী (বেলুড় রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির)
চতুর্থ	নিখিল চন্দ্র দাশগুপ্ত (ঐ)
পঞ্চম	বিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য (প্রেসিডেন্সি কলেজ)
ষষ্ঠ	কে. গণেশন্ (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
সপ্তম	জি. এল্. নরসিংহেম্ (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
	কালভূষণ কুরি (নন্-কলেজিয়েট স্টুডেন্ট, বঙ্গবাসী কলেজ)
নবম	সি. এস. সিদ্ধার্থ (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
দশম	প্রসবানন্দ সাহু (সি. কে. কলেজ, কাঁথি)

২. শুভতোষ দত্ত—'আট দশকে' (১৯৮৮), পৃঃ-১৬০

৩. Poverty and Famines গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে অমর্ত্য লিখেছিল : To Amiya Dasgupta—Who introduce me to economics and taught me what it is about.

৪. 'সবল যুদ সংবাদ', বিধাননগর, ১৬ই জুলাই, ১৯৯৭, পৃঃ-১৪

৫. Science Today. নভেম্বর, ১৯৬৯, পৃঃ-৪০
ঐ পৃঃ-৪১। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য—Nobel Laureates All by P. T. Rajasekharan (1991)

৬. মূল ঘোষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে ১৬ই অক্টোবর, ১৯৯৮ তারিখের The Telegraph দৈনিক পত্রে।

জনকল্যাণ অর্থনীতি অমর্ত্য কথা

অশোক বেরা

সালের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ-এর ডোরাবজি অধ্যাপক ডি সি পণ্ডে এই বছরের বাধাকৃষ্ণ স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পূর্ব নির্ধারিত বক্তা নোবেল জয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নাম বাদ দিয়ে সে জায়গায় দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী কে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ। হতে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন খুশীই হয়েছেন। কারণ এখন তার যে ব্যস্ততা চলেছে তিনি একটু বিশ্রাম পাওয়ার সুযোগ পেলেন।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তার সারাজীবন কল্যাণ মুখী অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়ে কাজের সূত্রে ১৯৯৮ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার ফলে অধ্যাপক সেনের যা গৌরব বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি গৌরব বেড়েছে নোবেল পুরস্কারের।

প্রথমত : বিশ্বের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ বাস করে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলিতে। এই সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণের জন্য যিনি সমস্ত জীবন অর্থনীতির বাঁধাধরা তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে কল্যাণ মুখী অর্থনীতি, ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়ে কাজ করলেন তাঁরই তো অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাওয়া উচিত। এই উচিত কাজটি নোবেল কমিটি খুব দেরীতে করলেন।

দ্বিতীয়ত : আজ পর্যন্ত নোবেল কমিটি বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদেরই (ব্যতিক্রম ১৯৭৫ সালে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবক্তা সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ কান্তারোভিচ্ -এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি) পুরস্কারে সম্মানিত করেছে। বাজার অর্থনীতি দিয়ে সমাজের কতখানি মঙ্গল করা যায় তা বোঝা যায় পৃথিবীতে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস কারী মোট জনসংখ্যা থেকে।

গত ১৯৯৭ সালের নোবেল পুরস্কার প্রাপক দ্বয় রবার্ট মারটন্ এবং মিরন স্কোরস্ শেয়ার বাজারে ঝুঁকির ক্ষেত্রে সার্থক ভবিষ্যদ্বাণী করার নতুন তত্ত্বের সূত্রে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন, তারা যে সংস্থা Long term Capital Management-এর সঙ্গে যুক্ত তার ব্যবসা ভরাডুবি হয়েছে এবং ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহায়তায় এ যাত্রায় বেঁচে গেছে। এই ঘটনায় নোবেল কমিটি লজ্জায় পড়ে গেছে। এবং বিশ্বের অর্থনীতি বিদদের কাছে ১৯৯৭ সালের অর্থনীতি নোবেল পুরস্কারের গৌরব হ্রাস পেয়েছে।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অর্থনীতির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ঠিক কিন্তু তিনি শুধুমাত্র একজন অর্থনীতিবিদ্ নন তিনি একই সঙ্গে একজন বড় দার্শনিক। তিনি তার পূর্বসূরীদের থেকে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। তার কাজের বিস্তার এবং গভীরতা অনেক বেশি। তাঁর মুখ্য কাজ গুলি পরিবর্তনা তত্ত্ব, কৃষি অর্থনীতি, সামাজিক চয়ন, কল্যাণমুখী অর্থনীতি, উপকার এবং ব্যয়ের বিশ্লেষণ, (Cost Benefit Analysis) দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, সমবায়, কৃষক, অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রকৃত জাতীয় আয়, লিঙ্গ বৈষম্য প্রভৃতি।

অধ্যাপক সেনের চিন্তার মূল বিষয় হল বাজার অর্থনীতির বাইরে সমাজের কল্যাণ সাধনের যে সব উপায় আছে তাদের চরিত্র নিরূপণ এবং সামাজিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে সেই সব উপায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নের নীতি প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে উন্নয়ন বলতে শুধু খাদ্য, পানীয়, বিলাস বহুল বাড়ি, জাতীয় আয় ও গার্হস্থ্যপণ্য উৎপাদন এবং তার বৃদ্ধি বোঝায় না। প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়ে তার কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সমাজের সামগ্রিক বিকাশের যে স্থায়ী বুনিয়াদ তৈরি হবে তার উপরেই নির্ভর করে সমাজের আর্থিক উন্নয়ন।

কামাতম করণ (optimisation theory) তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে অর্থবিদ্যাকে স্বার্থ পরতার শাস্ত্র বলা যায়। কারণ এখানে বলা হচ্ছে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিও উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সবাই মুনাফা সর্বাধিকিকরণের (Profit maximisation goal) লক্ষ্যে স্থির থাকলে তবেই তাকে এই শাস্ত্রের ভাষায় যুক্তিবাদী (rational) বলা হবে। বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা এই শাস্ত্রে দয়া, দাক্ষিণ্য, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবিক গুণ গুলোর বিকাশের কোন অবকাশ রাখেন নি। অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন যে বাজারের কেনা বেচার মধ্যে সংকীর্ণ স্বার্থের ভূমিকা যথেষ্ট থাকলে ও সমাজে মানুষ অন্য মানুষের কথা ভাবে অন্যের বিপদে মানুষ সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য এগিয়ে যায়। কোন মানুষ যদি পারিপার্শ্বিক আত্মীয় স্বজন কিংবা যে রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশ তাকে ঘিরে আছে সে দিকে না তাকিয়ে কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের কথা ভাবে তাহলে অধ্যাপক সেন তাদের 'যুক্তিবাদী বোকা' (Rational fool) বলেছেন। কারণ মানুষ যে সমাজে বাস করে সে যদি সেই সমাজের কল্যাণের কথা না ভেবে শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভাবে তাহলে সমাজ গভীর সংকটের মধ্যে পড়বে এবং স্বার্থপর ব্যক্তি তখন সেই সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারবে না। তাই অধ্যাপক সেনের বক্তব্য সমাজ যখন তার নিজের পছন্দ ঠিক করে তখন সব ব্যক্তির সব পছন্দকে সমান গুরুত্ব না ও দিতে পারে, এইটাই র‍্যাশনাল বোধ। এই বোধ যে ঐকমত্য তৈরি করে তা সমাজকে তার কাঙ্খিত অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে এবং এইভাবেই ব্যক্তির ইচ্ছে এবং সমাজের মঙ্গল একসূত্রে বাঁধা যেতে পারে।

অমর্ত্য সেনের যে কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা একটা তাত্ত্বিক

সমস্যা যার ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম। সমস্যাটা সামাজিক চয়নের সমস্যা। সমাজের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র অনেক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। রাষ্ট্র কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিমান টাকা খরচ করবে, যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, বিভিন্ন শিল্পের পরিকাঠামো এবং পরমানু বোমা ইত্যাদি।

সমস্যাটা হচ্ছে সমাজের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র যে এইসব কাজ করে তাতে ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কি কি ভূমিকা থাকে। রাষ্ট্র কিন্যালয় এবং হাসপাতাল তৈরি করবে, না পরমানু বোমা তৈরি করবে, এই সমস্যাটাকে বলা হচ্ছে 'সামাজিক চয়নের' সমস্যা এবং এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বাস্তবে আমরা প্রায় ক্ষেত্রে দেখি এমন কি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সামাজিক পছন্দ ও আসলে ব্যক্তির ওপর নীতি নির্ধারকদেরই চাপিয়ে দেওয়া পছন্দ। অমর্ত্য সেনের মূখ্য কাজ এই ব্যক্তির ইচ্ছা এবং সমাজের মেল বন্ধনের সমস্যা নিয়ে।

তিনি তার সামাজিক চয়ন (Social choice) সংক্রান্ত আলোচনায় দেখিয়েছেন ব্যক্তি মানুষ কিভাবে এক সঙ্গে মিলে সামাজিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে এবং ঐ মূল্যায়নের ব্যাপারে ব্যক্তি মানুষের ঐকমতে পৌঁছাতে না পারলে কি হবে? এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কতটা ভালো হবে?

এই সকল সমস্যা সমাধানের উপায় অধ্যাপক সেনের মতে যুক্তিবোধ (rational) তৈরি করা, সমাজের ভালোর জন্য নিজের ইচ্ছাকে সংযত করা, সমাজ তার পছন্দ নির্বাচনে আমার পছন্দকে অন্যের পছন্দের সমান গুরুত্ব না দিতেই পারে একথা সকল ব্যক্তি মানুষের জেতা। এই যুক্তি বোধ বিকাশের জন্য চাই ব্যক্তির পাঁচ প্রকার স্বাধীনতা বা অধিকার সুনিশ্চিত করা—(১) চিন্তার ও যুক্তির স্বাধীনতা (২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (৩) বাজার এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (৪) নিয়মকানুনের (procedure) সুবিধা লাভের স্বাধীনতা (৫) নিরাপত্তা লাভের স্বাধীনতা।

চিন্তা ও যুক্তির স্বাধীনতার জন্য চাই শিক্ষা ও লিঙ্গ ভিত্তিক বঞ্চনার অবসান। নিরাপত্তার জন্য চাই খাদ্য ও স্বাস্থ্যের অধিকার। এগুলির অভাবে দেখা যায় অশিক্ষা, অনাহার, দুর্নীতি, লিঙ্গভিত্তিক বঞ্চনা যার ফলে মানুষের সক্ষমতা (capability) কমে যায় এবং যুক্তি বোধের বিকাশ বাঞ্ছিত অবস্থায় পৌঁছাতে পারে না, এবং সামাজিক চয়নে ও উৎকর্ষের অভাব দেখা দেয়।

ব্যক্তি মানুষের এই সকল স্বাধীনতা বা অধিকার বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে শুধু বাজার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করলে চলবে না। এই সব কাজে রাষ্ট্রকেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশ গুলিতে মানুষের অধিকার নির্ণায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবারের অবস্থাকে বিচার করা অমর্ত্য সেনের একটি বিরাট কাজ। বেশিরভাগ পরিবার মেয়েদের ক্ষেত্রে অত্যাচারী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশে দরিদ্র পরিবারে বাচ্চা ছেলে বা মেয়েকে খুব ছোট বেলা থেকেই কাজ লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের রোজগার পরিবার নিয়ে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে তিন বছরের বড় বাচ্চারা তাদের ভাই বোনেদের সামলায়। অধিকাংশে পরিবারে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিশুকন্যার মৃত্যুর হার শিশু পুত্রের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণ শিশু পুত্ররা শিশু কন্যার চাইতে বেশি খাবার ও ঔষধ পায়।

অধ্যাপক সেনের কাজের সূত্র ধরে উন্নয়নশীল দেশের পুরুষ, নারী এবং শিশুদের জৈবিক অবস্থানের নানা বিষয় নিয়ে অসংখ্য গবেষণা প্রকল্প হয়েছে। ১৯৯০ সালে জাতি সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম জাতিসংঘের বিকাশ কর্মসূচীতে (UNDP report 1990) যে মানব উন্নয়ন সূচকের উপস্থাপনা করা হয়েছে তা অমর্ত্য সেনের চিন্তা প্রসূত।

অধ্যাপক সেন দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে খাদ্যের প্রয়োজনের উৎপাদনের জন্য সর্বত্র খাদ্য সংকট তৈরি হয় না। অনেক ক্ষেত্রে বিপন্ন মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা না থাকার ফলে সংকটের সৃষ্টি হয়। ধনীরা খাদ্য অপচয় করে অথচ দরিদ্র মানুষেরা খাদ্যাভাবে প্রাণ হারায়। ১৯৪৩ সালের বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার অভাবে মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে। ঐ সময় ভারত থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী হয়েছে ফলস্বরূপ মাথাপিছু খাদ্যের যোগান খুব কমে গেছিল বিশেষ করে বঙ্গদেশের।

অধ্যাপক সেন দারিদ্র দূরীকরণ নিয়ে বহু চিন্তাভাবনা করেছেন। যারা দরিদ্র তাদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ পান না বলে দরিদ্র। তাদের জন্য নতুন কাজ অথবা বেকার ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার এমন কিছু দরিদ্র মানুষ আছে যারা কাজের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে শারীরিক অক্ষমতার কারণে অথবা বয়স বাড়ার ফলে সেক্ষেত্রে সমাজকেই এদের দায়িত্বভার নিতে হবে।

অধ্যাপক সেন তার প্রযুক্তি চয়ন (choice of technology) আলোচনা প্রসঙ্গে দরিদ্র শ্রমিক যোগান যুক্ত দেশে অর্থনীতি বিকাশের প্রয়োজনে শ্রমিকদের কাজে লাগানোর জন্য মূলধন নিবিড় (Capital intensive) উৎপাদন কৌশলের বদলে শ্রম নিবিড় (Labour intensive) উৎপাদন কৌশলের স্বপক্ষে বলেছেন। এই শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল কাজে লাগাতে হলে প্রথমিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপন শ্রমিকদের সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বিশেষত। ভারতের মতো জনবহুল এবং বেকার সমস্যায় জর্জরিত দেশে আর্থিক বিকাশের জন্য শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশলই কাম্য।

আবার ভারতের মতো দেশে চাষীর ভূমির চাহিদার কথা ভেবে তিনি ব্যাপক ভূমি সংস্কারের সুপারিশ করেছেন, চাষীর হাতে জমি গেলে যে তার পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে সর্বোচ্চ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। এবং এইভাবে ছদ্ম বেকারত্ব (disguised unemployment) উৎপাদনশীল হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থিক উন্নতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ সাম্প্রতিককালে তাদের জাতীয় উৎপাদনের যে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে তার পুরোটাই কেবল সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে হয় নি। অন্যান্য কারণ ও রয়েছে তার মধ্যে কর্মীদের দক্ষতার মান বৃদ্ধি, কর্মী গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতার বিকাশ এবং শিল্প পরিচালকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সহমত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। তাই অনুন্নত দেশ গুলির প্রতি তার পরামর্শ উৎপাদন প্রক্রিয়াতে শুধু যন্ত্রপাতি বাড়ালে হবে না যন্ত্র ব্যবহারে কারীদের শিক্ষার মান ও সমবেতভাবে কাজ করার প্রবণতা বাড়াতে হবে।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি দুটি দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথমতঃ ভারতবর্ষে কল্যাণমুখী অর্থনীতির চর্চার ক্ষেত্রে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অমর্ত্য সেন যে এই প্রথম কল্যাণমুখী অর্থনীতির কথা বললেন তা নয় কিন্তু এই বিষয়ে কাজ করার সুবাদে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে অর্থনীতির এই শাখাটির চর্চা নিঃসন্দেহে বেড়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র নায়করা রাষ্ট্রের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণ কিভাবে করা যায় তা ভাবছেন এবং এই বিষয়ে অধ্যাপক সেনের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপক সেনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি বিশ্বের সংখ্যা গরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের প্রাথমিক চাহিদার (Basic need) কথা বিশ্ববাসী কর্তৃক স্বীকার করা। সম্মান জানানো এবং বিশ্ব বিবেকের জন্ম সূচিত করেছে।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের প্রাথমিক চাহিদার (Basic need) কথা বিশ্ববাসী কর্তৃক স্বীকার করা, সম্মান জানানো এবং বিশ্ব বিবেকের জন্ম সূচিত করেছে।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার জয়ের তাৎপর্য

ড. জলধর মল্লিক

১৯৬৮ সালে ব্যাঙ্ক অব্ সুইডেন একটি অর্থভাণ্ডার তুলে দেয় সুইডিশ রয়াল একাডেমি অব্ সাইন্সেসের হাতে। এই অর্থভাণ্ডার তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল ঐ অর্থভাণ্ডারের আয় থেকে আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেলের স্মৃতিতে অর্থনীতি শাস্ত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিবছর একটি পুরস্কার প্রদান করা। মূল্যে, মানে ও মর্যাদায়, গরিমা এবং মহিমায় এই পুরস্কার প্রচলিত নোবেল পুরস্কারের থেকে কোন অংশেই কম নয়। সমমানে এবং সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ১৯৬৯ সাল থেকে প্রতিবছর সুইডিশ রয়াল একাডেমি অব্ সায়েন্সের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার প্রতি বছরই দিয়ে আসা হচ্ছে। সুইডিশ রয়াল একাডেমি অব্ সায়েন্সেসের পক্ষে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি অভিসংগোপনে পুরস্কার প্রাপককে নির্বাচন করে থাকেন। প্রতিবছর ১০ ই ডিসেম্বর আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন অন্যান্য বিষয়ে নির্বাচিত নোবেল পুরস্কার প্রাপকের সাথে অর্থনীতি শাস্ত্রের জন্য নির্বাচিত পুরস্কার প্রাপকের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি সম্মানসূচক মেডেল, প্রশস্তি পত্র এবং অর্থ।

অর্থনীতি শাস্ত্রে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বিশেষ অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে রয়াল সুইডিশ একাডেমী অফ্ সায়েন্সেস বলছেন—কল্যাণকর

অর্থনীতিতে অধ্যাপক সেনের অবদান এবং তত্ত্বগত দিক থেকে তার প্রয়োগ দুর্ভিক্ষের পিছনে থাকা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। অর্থনীতি বিজ্ঞানের মূল ক্ষেত্রগুলিতে তিনি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকদের জন্য খুলে দিয়েছেন গবেষণার নতুন নতুন দিগন্ত। অর্থনীতি এবং দর্শনের পদ্ধতিগুলি একত্রিত করে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের আলোচনার ক্ষেত্রে এক ধরণের নৈতিক মাত্রা প্রদান করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, ব্যক্তিগত অধিকার এবং তত্ত্বের লঙ্ঘাতা জাতীয় সমস্যাগুলি নিয়ে অধ্যাপক সেন গবেষণা করেছেন।

অধ্যাপক সেনের প্রায় সমস্ত কাজই উন্নয়নমূলক অর্থনীতির সাথে জড়িত, যেহেতু এই বিষয়গুলি সমাজের দারিদ্রতম মানুষদের কল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার সব থেকে বেশি পরিচিত কাজের পরিচয় পাওয়া যায় "দারিদ্র এবং দুর্ভিক্ষ : পাওনা এবং বঞ্চনার উপর একটি নিবন্ধ" শীর্ষক পুস্তকে, যেখানে তিনি দুর্ভিক্ষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ (কখনও-বা একমাত্র) ব্যাখ্যা হিসাবে খাদ্যাভাবের সাধারণ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। বেশ কিছু সংখ্যক বিপর্যয়ের সতর্ক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনি দেখান যে পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় খাদ্যের সরবরাহ চোখে পড়ার মতো কম না হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ হয়েছে অথবা দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকা থেকে কখনো কখনো খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হয়েছে।

মোদ্দা কথা, কল্যাণকর অর্থনীতির প্রবক্তা হওয়ার কল্যাণেই অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার জয়। এই জয় কণ্টকশূন্য নয়, নয় বাধাবিপত্তিহীন। অধ্যাপক সেনের কাছে অর্থনীতি কেবলমাত্র নীতিহীন ভাবে অর্থ উপার্জনের পথ বা পদ্ধতি মাত্রই নয়। তার কাছে অর্থনীতি সমাজের দরিদ্রতম মানুষের মুক্তির দূত। তাই তাকে কোন কোন অর্থনীতিবিদ এবং কিছু পত্র-পত্রিকা রহস্যাচ্ছলে বর্ণনা করে থাকে 'দারিদ্রতার দার্শনিক' বলে।

এক সেরা অর্থনীতিবিদ হিসাবে মানুষের প্রতি এই মমত্ববোধ একদিনে গড়ে ওঠেনি। জন্ম এবং শিক্ষাগত পরিবেশ আর কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাই অধ্যাপক সেনকে করে তুলেছে কল্যাণকর অর্থনীতির প্রবক্তা হিসাবে।

১৯৩৩ সালের ৩ রা নভেম্বর শান্তিনিকেতনের ওরুপল্লীতে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের জন্ম হয়। সারা এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেল জয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই অধ্যাপক সেনের নামকরণ করেছিলেন 'অমর্ত্য' বলে। ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—এক অতি ব্যতিক্রমী মানুষ হিসাবে পরিচিত হবে একদিন ও। কিন্তুকবির সেই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নি। বরং অক্ষরে অক্ষরে সার্থক। ঢাকার মানিকগঞ্জ ছিল অধ্যাপক সেনের পৈত্রিক আবাস ভূমি। বাবা ড. আশুতোষ সেন ছিলেন বিখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী। অধ্যাপক সেনের জন্মকালীন সময়ে তিনি ছিলেন বিশ্বকবির সচিব। পরবর্তীকালে কর্মোপলক্ষে উনি দিল্লীবাসী হলেও পুত্র অমর্ত্যকে নিয়ে মা অমিতা সেন রয়ে যান শান্তিনিকেতনে। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন হলেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মাতামহ। মানবিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে বিশ্বকবিসহ এই সমস্ত মানুষগুলির ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়। ৮৭ বছর বয়স্কা মা অমিতা সেন আজও শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' নামাঙ্কিত শান্তিপুরে গৃহবাসিনী। অধ্যাপক সেনের বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের উষাকাল কাটে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশে। প্রকৃতি ছিল তার প্রিয় সাথী। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টনে ছিল অনুরাগ। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের ছাত্রহিসেবে নাচে, গানে, নাটকে অংশ নিয়েছেন। স্কুলের সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে এসেছেন শান্তিনিকেতন সংলগ্ন গ্রামগুলির সাঁওতাল অধিবাসীদের সংস্পর্শে। যার তখন থেকে দেখেছেন শিক্ষা আর স্বাস্থ্য-পরিষেবা রহিত সরল ও দরিদ্র সাঁওতালদের প্রকৃত অবস্থা। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে বার বার তাদের মাঝে ছুটে গেছেন ঐ কিশোর বয়সেই। চেষ্টা করেছেন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় ছিলেন মানিকগঞ্জে। সাড়ে 'ন' বছর বয়সে তখন তার। কিন্তু ঐ বয়সেই দুর্ভিক্ষের অভিঘাত অধ্যাপক সেনের মনে এঁকে দেয় এক গভীরতর প্রশ্নচিহ্ন। এরই তাড়নায় পরবর্তীকালে অধ্যাপক সেন যৌবনের দুর্ভিক্ষের সাথে অর্থনীতির ঘনিষ্ঠসম্পর্কের অনুসন্ধানে। আর যার ফলেই আজ তার নোবেল পুরস্কার লাভ। ঐ কৈশোরেই দেখেছেন বাঙালীর সময়ে মনুষ্যত্বের চরম অপমান-যা আজো তাকে পীড়িত করে। তাই, ১৯৯২ সালে যখন বৌদ্ধবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বর্বর আক্রমনে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হয়—তখন অধ্যাপক সেনের মানসিক ক্ষত যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে।

শান্তিনিকেতনের পাঠভবন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওখানকার বিশ্বভারতী থেকেই সম্মানসহ আই. এস. সি পড়ার পাঠ সাঙ্গ করেন। দমদম কলেজ প্রথম স্থান অধিকারীরূপে। চোখে তখন বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন। স্বপ্ন সদ্য স্বাধীন ভারতভূমিকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন তিনি। এই স্বপ্নের তাড়নাতেই ঐ কিশোর বয়সেই মু একজন সহপাঠীদের সাথে নিয়ে প্রকাশ করেছেন পত্রিকা। লেনিন প্রবর্তিত পত্রিকা 'ইসক্রা'-র আদলে পত্রিকার নাম রেখেছেন 'স্পুলিঙ্গ'। কার্যকারণে এই 'স্পুলিঙ্গ' থেকে দাবানলের সৃষ্টি না হলেও অধ্যাপক সেনের মনভূমিতে প্রোথিত করে দেয় সমাজতান্ত্রিক চেতনার অবিনশ্বর অগ্নিশিখা। এরই প্রভাবে তাই আজো অধ্যাপক সেনের প্রতিটি অনুসন্ধানে, গবেষণায়, বক্তব্যে, লেখায় বারবার উচ্চারিত হয় তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র, নিরক্ষর, স্বাস্থ্যহীন মানুষদের কথা, যুগ যুগ ধরে নির্যাতিতা নারীদের প্রসঙ্গ। শিল্পোত্তর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আধুনিক অর্থনীতির মার্কসের মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য প্রবন্ধ প্রকাশে ইতস্তত করেন না কখনোই। বিশ্ববন্দিত অর্থনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি আজও বহন করে চলেন ভারতীয় নাগরিকত্বের নিদর্শন। ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে ইতস্তত করেন না। ইতস্তত করেন না প্রশংসার মুখর হতে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কারের কর্মসূচীকে, কৃষি ও কৃষকের প্রতি 'ইতিবাচক' পদক্ষেপগুলিকে। এখানকার বামফ্রন্ট সরকারের সাথে অধ্যাপক সেনের হার্দিক যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। তার পরামর্শগুলি গভীর গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে থাকে তাই সদাই। এ রাজ্যে শিল্পায়নের জন্যে পরিকাঠামো গড়ে তোলার বর্তমান পদক্ষেপগুলির তিনি সমর্থক।

অধ্যাপক সেনের প্রবৃত্তিমিত্র বা পদার্থবিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্নভঙ্গের পিছনে আছে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিয় দাশগুপ্তের সুপরামর্শ। তারই পরামর্শে সদ্য আই. এস. সি. উত্তীর্ণ নবীন যুবকটি সাম্মানিক স্তরের অর্থনীতি পড়ার জন্য ভর্তি হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি কখনো তাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের কৃতি ছাত্র অমর্ত্য সেন স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনার জন্য যান লণ্ডনস্থ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে। তারপর অর্থনীতির অধ্যাপনা আ গবেষণাকেই বেছে নিয়েছেন জীবনের মহৎ পেশা হিসাবে। শিক্ষকতার শু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর একে একে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ, দিল্লী স্কুল অফ্ ইকনমিক্স, লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্স, অক্সফোর্ডের নুফিল্ড কলেজ। অলংকৃত করেছেন অক্সফোর্ডের জুলফত অধ্যাপকের পদ

যদিও অধ্যাপক সেনকে অর্থনীতি শাস্ত্রে তার মৌলিক অবদানে

জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে এ বছর—কিন্তু তিনি আসলে অর্থনীতির জন্য অর্থনীতিবিদ বলতে যা বোঝায়, তা নন। নন কোন বিশেষ অর্থনৈতিক তত্ত্বের অন্ধ সমর্থক। প্রচলিত প্রথায় একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে পরিচয় দেওয়াও যথেষ্ট নয়। অধ্যাপক সেন হলেন একজন বড় মাপের দার্শনিক। বলা যেতে পারে-মানব বিজ্ঞানের একজন একনিষ্ঠ সাধক। তাই—মানব মনের গতিবিধি নিয়ে দীর্ঘপ্রবন্ধ লিখতে উদ্যোগী হন না, যা প্রকাশিত হয় 'মাইণ্ড' নামের বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানের পত্রিকায়। সুইডিশ রয়াল একাডেমী অফ্ সায়েন্সেসও অধ্যাপক সেনের অর্থনীতির সাথে দর্শনের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছেন। এই যোগাযোগের স্বীকৃতি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বহু আগেই অধ্যাপক সেনকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ অর্থনীতি ও দর্শনের প্রাফেসর অধ্যাপকের পদ গ্রহণের আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৮৭ সাল থেকে দীর্ঘ ১০ বছর ঐ পদ অলঙ্কৃত করেছেন অধ্যাপক সেন। এরপর—১৯৯৭ সালে 'মাস্টার' অফ্ ট্রিনিটি কলেজ হিসাবে কেমব্রিজে ফিরে আসেন। সাড়ে চারশো বছরের পুরানো এই কলেজের তিনিই হলেন প্রথম অর্থনীতিবিদ, এমন কি অ—ব্রিটিশীয় 'মাস্টার'। এ সবই অধ্যাপক সেনের কল্যাণকর অর্থনীতি তত্ত্বের স্বীকৃতি।

দর্শনের সাথে অর্থনীতির মেলবন্ধন ঘটালেও, অধ্যাপক সেন নোবেল পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন মূলত অর্থনীতির তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগিক ক্ষেত্রে মৌলিক অবদানের জন্য। এ সবেরই যোগফল কল্যাণকর অর্থনীতির তত্ত্ব।

অধ্যাপক সেনের একটি মৌলিক অবদানের ক্ষেত্র হল সামাজিক চয়ন-তত্ত্ব। অর্থনৈতিক সমস্যার অর্থই হল নানান বস্তুর মধ্যে কোন একটাকে চয়ন করা, যা আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারবে। কোন পথটাকে চয়ন অর্থাৎ বেছে নিতে হবে তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক আছে খুবই। নয়া-রূপদী অর্থনীতিবিদরা ব্যক্তিগত চয়ন তত্ত্বে বিশ্বাসী। কেনেথ অ্যারো নামে সত্তরের দশকের এক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ সামাজিক চয়নতত্ত্বের সূত্রপাত ঘটান পঞ্চাশের দশকে এই বলে যে মানুষকে সামাজিক জীব হিসাবে স্বীকার করে নিলে, তার চয়নের রূপও সামাজিকভাবে নির্ধারিত হতে বাধ্য। সূত্রপাত হল—সামাজিক চয়ন-তত্ত্বের। অ্যারো আরো বললেন—আমি সেনের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ১৯৬০, ১৯৭০ এবং ১৯৮২ সালে এই চয়ন-তত্ত্বের ওপর অধ্যাপক সেনের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে অজস্র নিবন্ধ। অ্যারো যে আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন—অধ্যাপক সেনই তাকে তত্ত্বের আকার দেন। অ্যারো তার সামাজিক চয়ন-তত্ত্বে এক বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন-যদি ব্যক্তিস্বার্থ বজায় থাকে, তবে সব ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে সমঝোতায় আসা অসম্ভব। অধ্যাপক সেন প্রমাণ করলেন যে গণতান্ত্রিক সমঝোতা সম্ভব। অসম্ভাব্য উপপাদ্য থেকে তিনি নিয়ে এলেন সম্ভাব্য বক্তব্যটিকে। ১৯৭০ এবং ১৯৮২ সালে চয়ন-তত্ত্ব এবং কল্যাণকর অর্থনীতি সংক্রান্ত পুস্তক দুটি ক্লাসিকধর্মী নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত। তিনি আরো দেখান যে ব্যক্তি যদি অন্যান্যদের সম্পর্কিত তথ্যসমূহের সাথে অধিকতর পরিচিত থাকে, তাহলে পারস্পরিক দেনাপাওনার ক্ষেত্রটিও সুপ্রসারিত হয়। অবশ্য গণতন্ত্রেই এটা একমাত্র সম্ভব।

৭০-এর দশক থেকেই অধ্যাপক সেনের গবেষণার বিষয়বস্তু কিছুটা দিকবদল ঘটাতে শুরু করে। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'অন ইকনমিক ইনইকোয়ালিটি'। দারিদ্র্যের পরিমাপ, দরিদ্রি এবং দরিদ্রতমের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটা অধ্যাপক সেন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। দারিদ্র্যসীমার নীচে কতজন দরিদ্র আছে—সেটা জানাই যথেষ্ট নয়। কে কেমন অবস্থায় আছে, তা জানাটাও একান্তই আবশ্যিক অর্থনীতির দিক থেকে এটা পরিমাপের জন্য তিনি একটি 'সূচক'-এর সৃষ্টি করেন। এর নাম দেওয়া হয়—'সেন সূচক'। বর্তমানে এই সূচকের সাহায্যেও প্রতিটি দেশের মানব-উন্নয়নের অবস্থা পরিমাপ করা হয় ইউ এন ডি পি-র পক্ষ থেকে। উৎপাদনের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সেন দেখান যে শ্রমিক প্রতিদিন কাজ না করলেও উৎপাদন কমে না। এভাবেই, তার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি 'উদ্বৃত্ত শ্রমের তত্ত্ব'।

আফ্রিকা এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশের দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সেন দেখান যে খাদ্যাভাবই দুর্ভিক্ষের কারণ নয়। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লিখিত হয়েছে সুইডিশ রয়াল একাডেমি অফ্ সায়েন্সেসের প্রশস্তি পত্রে।

'সামাজিক সুযোগ' সম্পর্কিত গবেষণায় বর্তমানে ব্যস্ত অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। একটা ভালভাবে চালু-থাকা বাজারও 'মানব-ক্ষমতা'-র ঘাটতিগুলির সঠিক মোকাবেলায় অক্ষম। তিনি দেখান মানব-ক্ষমতার এই অবনয়নের জন্য দায়ী নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্য পরিষেবার নিদারুন অভাব, অসম্পূর্ণ ভূমি-সংস্কার, ভারসাম্যহীন সামাজিক স্তরবিন্যাস আর নারী পুরুষের মধ্যে ঊর্ধ্বগামী বৈষম্য। সামাজিক সুযোগের ক্ষেত্রে এই বৈষম্যগুলির অনেকটাই নিরসন করা সম্ভব রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং বিরোধিতার দ্বারা। সহলেখক কেলিব্রিয়ামের অর্থনীতিবিদ জিন ড্রেজেরের সাথে একত্রে লিখিত এবং ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া : অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সুযোগ' পুস্তকটি এই বিষয়ে একটি অবশ্য পাঠ্য বই।

গত ২১শে অক্টোবর ডয়েস অফ্ আমেরিকায় এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক সেন বলেন যে ভারতের ব্যাপক দারিদ্র্য দূরীকরণে গোঁড়ামি-মুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। অল্প সময়ের মধ্যেই এটা করা সম্ভব। তিনি আরো মনে করেন—বিস্ফারন ছাড়া অর্থনীতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। কিন্তু সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নটিকে সুস্থ রেখে বিস্ফারনের পথে পা বাড়ালে, ফল মারাত্মক হতে পারে। যেমনটি হয়েছে ভারতে।

ভারতের উন্নয়ন সম্পর্কে অধ্যাপক সেনের সুপারিশ হল কতকগুলি বিষয়ের সমন্বয় ঘটানো।

১। গণতন্ত্রকে রক্ষা করা এবং রাজনৈতিক কলহ ও প্রকাশ্য বিতর্কের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, তাকে আরো ভালভাবে কাজে লাগানো।

দ্রুত সামাজিক অগ্রগতি, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি-সংস্কার ও লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটানো।

৩। অর্থনৈতিক ও লিঙ্গ ক্ষেত্রে উৎসাহ দান। এক্ষেত্রে গতিবেগ সঞ্চার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল বাধার অবসান ঘটিয়ে প্রতিযোগিতা, উৎসাহ-বর্ধক ব্যবস্থাসমূহ এবং মুক্ত আবহাওয়ার সুযোগকে সুসংহত করা।

বর্তমানে অধ্যাপক সেন গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ওপর একটি গবেষণামূলক পুস্তক রচনায় ব্যস্ত। বইটি আগামী বছর প্রকাশিত হবে। সকলেই আশা করছেন—গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ সম্পর্কে নতুন কোন দিক তিনি উপস্থাপিত করবেন জনসমাজের কাছে, যা কিনা, একদিন কল্যাণকর গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলার আরো সুপরিকল্পিত পথের সন্ধান দেবে। সন্ধান দেবে বিশ্বের কোটি কোটি নিপীড়িত, বঞ্চিত, দরিদ্র মানুষদের মুক্তির ঠিকানা। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার জয় এই সমস্ত বিষয়গুলিকে সুসংহত করতে সাহায্য করবে আগামী দিনে—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উল্কাবৃষ্টি

বিষ্ণু সামন্ত

দিগ্বিদিক অন্ধকার, মাঠময় মানুষের দল
মাঝে মাঝে কোলাহল : এই একটা উল্কা পড়ল, এই একটা।
'দেখলেন তো মশাই।' বলে পাশের জন ঠেলা দিতেই
আমি বলি, এরকম প্রতিদিনই উল্কাপাত হয়।
তৎক্ষণাৎ 'রাতের আকাশে রোজ চেয়ে থাকেন নাকি?' বলে
আমার দিকে সে এমন বাঁকা তাকাল, তার
চোখ পরিষ্কার দেখতে না পেলেও
কথাটায় কিছু একটা ইঙ্গিত টের পাই ;
সত্যিই তো, আজ পাগল কিংবা মস্ত অকর্মা ছাড়া
কারই বা রাতের আকাশ দেখার অবসর আছে!
মনটাও নেই আর, অথচ একদিন তারাভরা আকাশের
বিস্ময়ের ঘোরে ডুবে-ডুবে ছেলেবেলা পেরিয়ে এসেছি
এখন সে বিদ্যে বিশ্বে এমনিতে চলে যাই না
কোনরকম লাভক্ষতি কিছু নেই বলে ;
আকাশ দেখছি কতদিন পর, অবশ্য কিছুদিন আগে যে
ধূমকেতু বিশ্বধ্বংসী হতে পারে রটেছিল
সেদিন তাকিয়েছি সকলেই! তারপর এতদিন ঘাড় ভেঙে শুধু
তাকিয়েছি উঁচু উঁচু বাড়ির দিকে
উঁচু উঁচু মানুষের দিকে, কিন্তু ঘাড় ভেঙে
তাকিয়ে থাকিনি আরেকটু উপরে,
আজ এই মুহূর্তে ভাবতে কী-যে ভালো লাগছে এই অন্ধকারে
পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ একসঙ্গে ঊর্ধ্বমুখী স্থির!
ছবিটা অনেকক্ষণ মস্তিষ্ক কামড়ে থাকে, থাকতে থাকতে
তার উপর আরেকটা ছবি ভেসে ওঠে—
আমার ছেলের নামও আকাশ।
দু'সেট মাত্র জামা, পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে
ছেঁড়াফাটা চটি, ম্লান-মুখ বেকার বলে
কেউ ফিরে তাকায় না তার দিকে
না কোন সাক্ষাৎকর্তা, না মর্ত্য-সুন্দরী, না লোকজন!
তবে কি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মাঝে-মধ্যে
উল্কাবৃষ্টি করতে হবে তাকে!

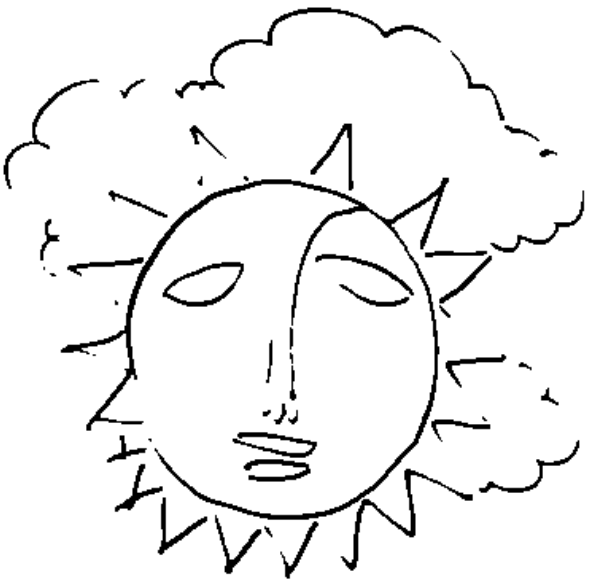

বিজ্ঞাপন

শিখা সামন্ত

চলো যাই 'সজীবতা' কিনতে
চলো, তারতাজা 'সতেজতা' কিনতে
এই যে, এখানে আসুন, সস্তায় পাবেন 'আরাম-টী'!
এখানে, মাত্র পাঁচ টাকায় জোয়ানীর ফুটফুটে' হাওয়া যায়
কেবল চার ফোঁটায় সব ময়লা ধবধবে শাদা হয়ে যায়
মুক্তোর মতো ঝকঝকে হাসি চাই? তাও পাবেন খুব কম দামে
ছেলে-মেয়ের শরীর? ও নিয়ে ভাববেন না, হাতের কাছেই টনিক
কমপ্লান বল ও গার্লি।
প্রাণ আই-চাই, বাতাস চান? প্রতিটি টিউবে ভরা বিনামূল্যে কিছু
'হাওয়া' (নির্মল?)

আজকাল সস্তায় কতকিছু যে পাওয়া যায়
এরপর মানবতা কিংবা প্রেম-প্রীতি ও কি পাওয়া যাবে টিউব-প্যাকেটে
মাত্র চার ফোঁটায় ঘুচে ফেলা যাবে ভেতরের সব মলিনতা?
বিজ্ঞাপনের যাদুতে হয়তো সব অসম্ভব রাতারাতি সম্ভব হয়ে যাবে
কেবল সামান্য কিছু বাঁধা রাখতে হবে নাম মাত্র মূল্যে—
শ্লীলতা ও সৌন্দর্যকে বন্ধক দিতে হবে লিরিলের ফেনার কাছে
মনুষ্যত্ব? ও না হয় বাঁধা থাক স্বার্থের কাছে
বিশ্বাস? উবে যাক কর্পূরের মতো বাতাসে

আর, ওদিকে দেখুন ডাস্টবিনে পড়ে থেকে কাটা হাতপিণ্ডটা কেমন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে।

বেগবান জীবনই পারে

রবীন্দ্রনাথ দাস

একটি জীবনের জন্য
দুই হাত পেতে
ব্যাকুল দাঁড়িয়ে আছি।

কত শীত গ্রীষ্ম
কত বর্ষা বসন্ত
তবু সেই নীলকণ্ঠ পাখি
আজো অধরা
পত্র পুষ্পহীন পলাশ কৃষ্ণচূড়া।

এ এক বিষণ্ণ সময়
ঝড়-ঝঞ্ঝা পাত
ভাঙে জীবনের খেলাঘর
সংসার বানভাসি
এক বেগবান জীবনই পারে
এই কালি মুছে
এ আকাশ আলো করে দিতে
ফোটাতে পারে জীবনের ছবি
রঙিন হতে।

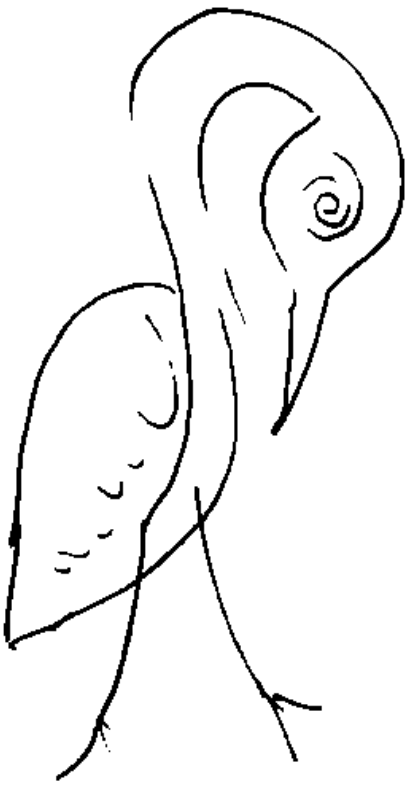

তারপর

নজর উল ইসলাম

নিঃশব্দ শরজালের গুলি জ্বালা বিঁধিয়েছে
তাই ভালবাসার আঁচ ছোঁড়ে বন-খেদেশ
বরং বাদুড়ের ডানার মতন একে দেবে
স্মৃতির সব অলগ্রা, ফুল বাগিচার রূপ নিয়ে
মন-শালী তখনই রূপসী শহরে হবিহর
অনন্য এ পৃথিবী।

সেতুর কি মিলন-বন্ধন? এদিকে নীল ওধু নীল
তার পরিশেষের দাসত্বে সততই চোখে ফোটা
ঠোঁট নাড়াবে সে চমকে ওঠা মোনলিসা
প্রথবা ফুল-কালোর সমাহার রাখে
হাসেশাই।

ভ্রমরের কায়দায় খামখেয়ালী উকি—
বিড়বিড় করছিল রূপ বাগানে সেই সময়
মনগুল স্বপ্ন ছাড়বেই না এ প্রান্তরের মাঠ
মুঠোয় প্রত্যাশিত বিশ্বাস আর অপমানের উপর
সর্বরূপ সিঁদুর উল্লাস খাটুনির বৃত্তি চেপে যাবে
তারপর..

সূক্ষ্ম

উমা পাহাড়ী

দৃষ্টি সূক্ষ্ম, প্রেম সূক্ষ্ম
সূক্ষ্ম এ পৃথিবীর
মানুষের যত অনুভূতি
গন্ধ কক্ষ, স্নেহ কক্ষ
আর রক্ষা মানবের
চলাফেরা সে গতি
স্মৃতি সূক্ষ্ম, প্রীতি সূক্ষ্ম
সূক্ষ্মতার শীর্ষদেশে
হাসি সাঁকে মানুষের মন
রক্তকণায় বশ সূক্ষ্ম, জগৎ-সৃজন-সূক্ষ্ম
সূক্ষ্মতে এ জগতে
মানবের অবস্থিতি জল।

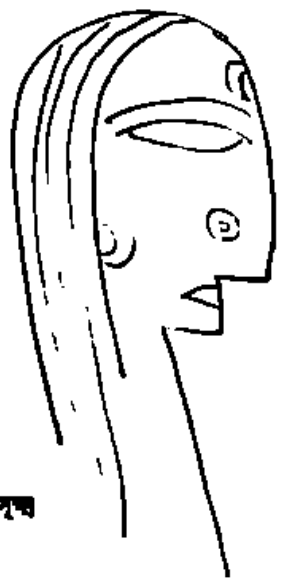

বৃহন্নলা শোনো

উত্থানপদ বিজলী

বৃহন্নলা, মন্দ এখন দিন
বৃহন্নলা, বিভীষিকার রাত
দুর্জনেরা নাচছে তাথিন থিন
চতুর্দিকে নিষ্পেষণের হাত।

ক্লীবত্ব কি থাকবে তোমায় ঘিরে?
সৈরিন্ধ্রীরা কেন নির্যাতিতা
একটুখানি দেখ পিছন ফিরে
ঘরে ঘরে জ্বলছে কতো চিতা!

বৃহন্নলা, ক্লীবত্ব এবং ছাড়ো
কীচকের হয়ে ধনীয়ান
প্রতিবাদে করো একটি বারও
বৃহন্নলা, গর্জাও বাও টান।

অন্তহীন যাত্রা

অকটাভিও পাজ (মেক্সিকো)

ভালোবাসায় অন্তহীন নারী ও পুরুষের মতন
দিন ও রাত,—একে অন্যের প্রতি গভীর আসক্ত
দুর্বোধ্য ভালোবাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ নেশা ও রক্ত,
উন্মাদ-এমন কি মৃত্যুকে ওরা অনুসৃজন!

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়
অন্তহীন প্রবাহের মতো দুর্বম, দুর্বার
জীবনের উৎসমূলে কী জাঁকে যায়?
যার কোন শেষ নেই, শুরুও নেই চলার!

উন্মাদ

জুলিয়ান সি (ফ্রান্স)

সময় হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত
কিছু না কিছু করার কথা আমার
পারছি না—কিছুই করতে পারছি না, ক্রমে আশাহত
দুখিত, শূন্যতাই ছড়াচ্ছে আমার

এক মুহূর্ত ও ক্লান্তি নেই যে চলার
কীভাবে, কীভাবে পড়ে ভুলবো নিজেকে
এই উন্মত্ত ধাবমান সময়ের মতো?
সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত!

অনুবাদ কবিতা ঃ কল্পন সরকার
সৌজন্য • Poet Vol. 39 No. 1, 1998

আদত কথা

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পোখরানেতে চোখনা রাখো খোঁজ কি রাখো খবরে
বোমার ওঁতোয় কজন মানুষ যাচ্ছে সেথায় মরে?
রোজ কত যে তৃণমূল হায়রে নতুন নতুন নেতা
বিজ্ঞানীদের এ জয় তবে লাগছে কাদের ভোগে।
মারণ বোমা ফাটিয়ে দেশের হয়েছে কিসের জয়
আমেরিকানদের বাড়াতে শক্তি স্বদেশ করছে ক্ষয়
ক্ষেপ্ত করতে মার্কিনী পদ কেন্দ্রে আসীন যারা
তারা যদি হয় সুলুকসন্ধিক দেশের শত্রু কারা?
এসব কথা ঢাকতে ওরা শোনায় অন্য গল্প
পাক-চীনারা নাশবে এদেশ এটা তো ভাই জল্প।
ভারত ফাটায় হিন্দু বোমা, মুসলিম বোমা পাক
শুনিয়ে এমন কথা-মালা করে দেয় হতবাক্।
আসল কথা বলার মতো সাহস নেই ওদের
আজগুবি সব রসালো গল্প বলছে তাই মোদের
চীন-রাশিয়া ফাটিয়ে বোমা দেখায় ওদের শক্তি
মার্কিনীদের পদ সেহরী উজাড় করছে ভক্তি।

পথ

জীয়াদ আলী

তেমন ঘৃণায় উথলে ওঠো এখন?
বলতে পারো? নিজের কথাই বলো,
ক্রোধের শরীর বলেছিল কিছুই?
শেষুর টানে নও কি টলোমলো!

এই কারণেই নিজের বুকে নিজে
দুহাত রেখে মিলিয়ে দেখাই প্রেম,
বস্তুত ঠিক পথের নিয়ম মেনে
চলছি না কি, ভাঙছি পথের দেহ!

নিজের হাতেই নিজের মতো করে
গড়ছি নিজের মহান প্রবৃত্তি
এবং আরই সাদাই গাওয়ার ছলে
বলে ফেলি সূত্র প্রোতের রীতি।

পথ হাঁটলেই পথ চেনা যায় না কি
পথের হদিস জেনেও খুঁজি কাঁকি

বজ্রের দেশ ঃ দেনজঙ

(ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী)

অজিতকুমার বসু

কৃষি শ্রমিকদের প্রতি এই অমানবিক আচরণ শুধু দাস-যুগের কথা-ই মনে ভরিয়ে দেয় না ; সে সময়কার ভূমি-বন্টন ব্যবস্থা, সামাজিক শোষন, যন্ত্রনা ও পীড়নের দিক থেকে, যে কতটা বর্বরোচিত ছিলো, তার ইঙ্গিত দেয়।

ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে যা শুনেছিলাম, তা হলো ; তখন স্থানীয় রাজন্যবর্গের হাতে ছিলো রাজস্ব আদায়ের ভার। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন কি, করছেন না, তা খতিয়ে দেখার তেমন কোন ব্যবস্থা-ই ছিলো না। এক্ষেত্রে যা ঘটার তাই ঘটতো। প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব বাবদ আদায় থেকে রাজকোষে দেয় জমা পর্যন্ত গোটা ব্যবস্থাটাই ছিলো চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায়। একদিকে গরিলাদি যেমন ও অন্যদিকে তেমন অন্যায় ও অসততার প্রশ্রয়। চাষীদের শোষনের ব্যাপারটা কিন্তু আগা গোড়াই বজায় ছিল।

১৯৫০ সালে ইজারা (পাট্টা) প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনটি স্তরে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়

এই নতুন-ব্যবস্থায় দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তি মালিকানা-র প্রকারভেদে, তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, (১) শাসক ও তাঁর পরিবারের ভূ-সম্পত্তি, (২) গুম্ফার ভূ-সম্পত্তি, এবং (৩) প্রজাদের ভূ-সম্পত্তি

মালিকানা অনুসারে ভাগ করা এই তিন ধরণের ভূ-সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে তিন তিন সরকারী- বিভাগ।

ভূমি-রাজস্ব বিভাগ সরাসরিভাবে জনসাধারণের জমি জায়গা দেখাশুনা করার দায়িত্বে আছেন।

রাজকরের হার নির্ভর করে জমির উৎপাদিকা শক্তি কেমন তার উপর। উর্বরাশক্তির তারতম্য অনুসারে, তিন তিন জমির তিন তিন পরিমান রাজকর ধার্য হয়ে থাকে।

নগদ টাকায় ঐ ধার্যকর সরকারী রাজস্ববিভাগে জমা দিতে হয়।

খাজনার নিয়ম জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই এক। তবে বৌদ্ধদের জমি বেচাকেনার ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ আছে। লেপচা-ভুটিয়া ছাড়া অন্য কোন জাতি-উপজাতির লোক বৌদ্ধদের জমি কিনতে পারেন না। তেমন আবার, উত্তর-সিকিমের কোন জায়গায় নেপালীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি নেই। পূর্ব- সিকিমের কিছু কিছু জায়গাতেও এই নিয়ম চালু আছে।

কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই ধরণের কিছু ভেদ দেখা যায়। যেমন, লেপচা-ভুটিয়ারা যে সব জায়গায় বেশি সংখ্যায় বাস করেন, সেখানে-ই এলাচ ও আপেল চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণ-সিকিমে কমলালেবুর চাষ হয়। আর সেই কমলা লেবুর বাগিচাগুলি প্রধানতঃ নেপালীদের হাতে।

রাজপরিবারের ব্যক্তিগত জমির ক্ষেত্রে এখনো গ্রামে গ্রামে 'মন্ডল' নিয়োগের পদ্ধতি চালু আছে।

ফোডং ও রুমটেক গুম্ফা দুটি সরাসরিভাবে শাসকের অধীন এবং তিনি-ই এদুটির ধর্মীয় প্রধান। বাকী গুম্ফাগুলির সবই সরকারী রাজকীয় বিভাগের নিয়ন্ত্রনে।

'লাচেন' আর 'লাচু'।

এতসব চিন্তার মধ্যে-ও উত্তর সিকিমের এই পিছিয়ে, পড়া গ্রাম দুটির নাম বারবার মনে পড়তে থাকে।

আধুনিক সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত এঁরা। জগৎ ব্যথিত হতে থাকে তাই। মনে হতে থাকে: ছুটে যাই ওঁদের কাছে। কিন্তু এখান থেকে গ্রামদুটির দূরত্ব যে অনেক।

তিস্তার উজানে রেংপো 'লাচেন' হাল্টিং হওয়া যায়। ওখানে একটি প্রাচীন গুম্ফা আছে। কিন্তু 'লাচুং'? তাহলে, আবার তো ফেরে নেমে আসতে হবে তিস্তার ধারা ধরে তারপর, একসময় হাজির হতে হবে বোতিস্তাং উপনদী 'সেবজাকু' মোহনায়। ওখান থেকে নদী-টির উজান ধরে এগিয়ে গেলে-ই 'লাচুং'

এই মুহূর্তে আমার বারবার মনে হতে থাকে: ওঁরা-ই পারে পোটাশদের উন্নয়ন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নতুন সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত দিতে

একে পঞ্চায়েত রাজ:, দ্বিতীয়ত:, সমবায় পদ্ধতি এই দুটি শক্তিশালী হাতিয়ারের মাধ্যমেই তরান্বিত হতে পারে, এলেনের উক্তি।

এখন তো জানুয়ারী মাস। ওঁদের ওখানে শীত তো বেশ জাঁকিয়ে-ই পড়েছে।

১৩

দল বেঁধে মার্কেট-স্কোয়ারে পৌঁছলাম। সূর্যদেব তখন নদী খাদ পাড়ি দিয়ে পশ্চিম-পাহাড়ের চূড়ায় চড়বার জন্য ব্যস্তসমস্ত। তাঁর অস্থিরতা দেখে মনে হয়, বুঝিবা কর্তব্যবিমূঢ়তার উদ্বেগ-উৎপরতা-ও হার মানছে। আপাত: চাঞ্চল্যের মূল লক্ষ্য কি শুধু পাহাড়ের শীর্ষদেশ? কোনমতে একবার চূড়ায় নাগাল পেলেই, প্রনতিবিলম্বে ঘুণ করে একলাফ। অমনি ওৎ পেতে থাকা শীত নামক অশরীরী তার অদৃশ্য শাণিত নখর দন্ত মেলে। "রে রে রি রি " রবে তেড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, চিত্তার হিংস্রতা ও শঠতা-কে বোকা বানিয়ে।

এদিকে ও দেখলাম একদিকে ফুটপাত, তবে গাড়ির সংখ্যা কম। স্থানীয় পন্যচারীরাও তেমন বহিরাগতদের প্রতি সৌজন্যবোধে কেশ সহজ ও সুন্দর। দোকানে দোকানে ঘুরে নানাবিধ পন্য দেখাদেখি, দরদাম্রি, যাচাই, কখনো সখনো কদাচিৎ পছন্দসই এটাওটা জিনিষপত্র কেনাকাটা চলছে। খরিদ্দার তো কত সিকিমের। চটি এ ক্রয়ক্ষমতার জন্য মূলত: এই ভিন্নতা। এঁদের সবার জন্য পন্যসম্ভারের আয়োজন-ই শুধু কি আর? ক্রেতাদের মনজয়ের প্রতিও দোকানদার-দের মনোযোগের বিন্দুমাত্র খামতি আছে বলে মনে হয় না।

একটা বিষয় আমার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষন করলো। এই সব দোকানীদের অধিকাংশই ভারতের সমতল অঞ্চলের মানুষ, এঁদের মধ্যে আবার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী-ই বেশি। পরে জেনেছি, এঁরাই হলেন এখানকার আদি ব্যাপারী। গ্যাঙটকে প্রথম মহাজনী কারবার খোলেন এঁদেরই পূর্বপুরুষেরা। হোটেল, বার ও বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবসায়ের পত্তনদার। এইসব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের বৃত্তির স্বার্থে 'সিকিম ব্যাপারী সংঘ'—নামে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। সব রকমের বানিজ্যিক সংস্থার মালিকদের কাছে এই সমিতির দরজা ছিলো খোলা। যেহেতু, ব্যবসায়-বানিজ্যের অধিকাংশে ক্ষেত্রে মাড়োয়ারী ও হরিয়ানোবাসী মালিকদের আধিপত্য, সেইহেতু ওঁরাই ছিলেন ঐ সমিতির কর্মধার। অত্যধিক মুনাফা অর্জনই ছিলো সমতলের, ব্যবসায়ীদের একমাত্র লক্ষ্য। ফলে, পাহাড়ী অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের সাথে ওঁদের মতের অমিল ও বিরোধ ছিলো প্রায় নৈমিত্তিক ঘটনা। পাহাড়ী মানুষদের সামাজিক স্বার্থবিরোধী এই অতি মুনাফা-নীতি স্বাভাবিকভাবেই দেশের প্রশাসনের কাছে চিন্তিয়তো চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। অবশেষে রাজ-দরবারের অনুকূলে পরিচালিত সিকিমীয় ব্যবসায়ীরা "সিকিম চেম্বার অফ্ কমার্স"-নামে এক পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলেন। দুটি কারণে এই নতুন সংগঠনটি প্রশাসনের আনুকূল্য লাভ করে। প্রথমত: দেশীয় এবং পরোক্ষে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভারতীয় সংস্থাগুলির স্বার্থে অনুপ্রনিত হয়ে এটির জন্ম। দ্বিতীয়ত:, ব্যবসায়-বানিজ্যের ক্ষেত্রে সংগঠিত কোন রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অভাবে, এই সংগঠনটি সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের এক বাড়তি ভাবমূর্তির অধিকারী হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য, প্রথম থেকেই এই নতুন সংগঠনটির সাথে পুরানো-টির বৈরীমূলক মনোভাব ও প্রতিযোগিতা চলে আসছে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী-ই উভয় সংগঠনের সদস্য এবং সদস্যপদের চাঁদা ও দিয়ে আসছেন। কিন্তু, ঐ সংগঠন দু'টির সভা ও কর্মসূচীতে তাঁরা কদাচিৎ অংশ নিয়ে থাকেন। বাস্তবে দেখা যায়, মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী সদস্য এই সংগঠন দুটিকে তাঁদের নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করে আসছেন।

মার্কেটে এসেছি, কিন্তু লক্ষ্য তো আর মার্কেটিং নয়, আসলে, ঘুরে ফিরে দেখা। মনের সেতারটা টানটান আনন্দের মেজাজে বাঁধা। উপভোগ্যতার ঘাটতি নেই কিন্দুমাত্র। এম. জি. মার্গ-টা ডানদিকে টার্ন নিয়ে কিছুটা এগোতেই পাপাই বলে ওঠে : দেখ দেখনা, একই দোকানে মাছ ও মুরগীর মাংসে বিক্রি হচ্ছে।

একটু থেমে ফের বললো সে, তবে যে ওঁরা বললেন, এঁরা মাংসে পচিত্রে খায়।

বৌমা তার সার্থে নিয়ে ব্যস্ত। পন্যের গুনাগুন ও দর যাচাই ইত্যাদি। হঠাৎটিরে ঢুকছে, বেরোচ্ছে এক থেকে আরেক- বিপনি-তে। বাইরে থেকে নজরে আসা পন্যশালার লো-টাই বুঝি টেনে নিয়ে চলেছে তাকে। উল্টো দিকের এক বস্ত্রালয় থেকে বেরিয়ে এসে বৌমা বললো, বরং শিলিগুড়ি-তে সস্তা। রকমারি-তেও অনেক। টেনে নিয়ে গিয়ে কী লাভ, তাহলে?

বৌমি-র প্রস্তাব কানে এলো আগামীকাল কটেজইন্ডাস্ট্রিজ-এর সেল্স্ এম্পোরিয়াম যাবে তো। কেনাকাটা-টা ওখান থেকে করা-টাই তো ভালো।

বৌমার সরল মন্তব্য করে তৎক্ষনাৎ এ প্রস্তাবে কোথায় পাবে মা? প্রজিউসার রেমন্ড, নামে ওনারেই শীত অ্যাবস্কন্ড।

কম্বলটির দাম শুনে চিন্তিত হলাম। কলকাতা গ্যাঙটকের শীতে এতোগুরি ও দামী কম্বলের প্রয়োজন আছে কি? কম্বলো-সখনো তুষারপাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চিন্তাটা এক-ধরনের সৌখিনতা, যা একমাত্র বড়লোকদেরই সাজে। তেমন ধরনের বড়লোক এখানে কজন?

বাবুসোনা বলল কেন, সোমানীজ। ওঁরাই তো সিকিমের কনকুবের, জগৎশেঠ। এঁরা এসেছিলেন দার্জিলিং থেকে।

বৌমা বললো সোমানীজরা দার্জিলিং-এর লোক হলেন কি করে?

আদি নিবাস হরিয়ানা, কিন্তু ১৮৫০ থেকেই এঁরা দার্জিলিং-এ। ১৮৮৮ সালে গ্যাঙটকে বৃটিশ রেসিডেন্সী গড়ে উঠতে-ই ওঁরা ছুটে আসেন এখানে। এখানে এসে, ওঁরা হলেন বৃটিশদের খাজাঞ্জী। মহারাজ থেকে সুরু করে কাজী, সকলেই প্রয় ঋণজালির হাত পেতেছেন ওঁদের কাছে। বৃটিশ যুগে ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যত রকমের ব্যবসা-বানিজ্য চলতো, তা এঁরাই নিয়ন্ত্রন করতেন। গ্যাঙটকে এঁদের নানাবিধ বানিজ্যিক অফিস রয়েছে। বলতে গেলে, এঁরাই হলেন এখানকার স্টেটব্যাঙ্ক, পাবলিক ট্রেকারী, সব। আসবার পথে সিকিম স্টেটব্যাঙ্ক বিল্ডিং-টা নজরে পড়েছিল। কথা-টা তুলতেই জবাব এলো,ওটার জন্ম ১৯৬৮-তে। এর একটিমাত্র শাখা আছে গ্যাঙটকের বাইরে। ব্যবসায়ীরা কতবার দাবী জানিয়েছেন, সারাদেশে ওটির শাখা ছড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু, প্রশাসন এ ব্যাপারে উদাসীন। ফলে, সোমানীজের 'জেঠমল ভোজমল ব্যাঙ্ক" বাস্তবে, এখনো সিকিমের মূল স্টেট ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে চলেছে।

কথায় কথায় সিকিমের অভিজাত দু'টি নেওয়ার পরিবারের বিষয়-আশয়ের প্রসংগ তুলতেই, বৌমা বললো, কাজীরাও যা বান বাকেন কী সে? ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, আভিজাত্য ও সম্পদ গৌরবের দিক থেকে তো ওঁরা মন্ত্ররাজা-র পরেই।

বাধ বেবার জন্য নয়। একুশ-টি কাজী পরিবার, ওঁদের হাতে চল্লিশটি এলাকা। অথচ, দুটি মাত্র নেওয়ার পরিবারের হাতে ষোলটি অঞ্চল।

নেওয়ার পরিবার-কে কেন্দ্র করে আলোচনাটা জমে ওঠার মুখে বৌমি মন্তব্য করলেন, সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

বৌদির কথার ইঙ্গিত : এখন তো আর মহারাজা নেই, নেই জমিদারী প্রথা-ই বা কোথায়? '৭৫'-এর ১৫ই এপ্রিল, এক বিশেষ গণভোটের রায়ে সিকিম এখন ভারতের ২২-তম অংগরাজ্য, সেক্ষেত্রে কার অধীনে ক'টা জমজমা ছিলো অতীতে, সে হিসাবের প্রয়োজন কি?

কিন্তু, ভারত যে আজও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। ব্যথা-টা কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে বুকে। দেশে আইন আছে, নেই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর আটিয়েও দেখছি, দেশের অধিকাংশ লোক এখনো দারিদ্রসীমার নীচে মূলত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। শহরবাসী সাধারণ-গৃহস্থ-পরিবার বলতে আমরা যা বুঝি, তেমন কোন একটি পরিবারের যেকোন একজন সদস্যের জীবনধারণের খরচ, দেশের মাথাপিছু আয়ের কতগুণ? দিন-মাস-বছর যেভাবেই হিসাব করি না কেন, পাঁচ থেকে দশ গুণ তো বটেই। এমন অবস্থা হলো কেন?

অথচ, এদিকে, 'দেশে সম্প্রতি অতিধনী নামে একটি নতুন জাতির আবির্ভাব ঘটেছে।' কে-সরকারী একচেটিয়া কায়দার দমনের জন্য ভারত-সরকার এক কমিশন নিয়োগ করেন। ঐ কমিশন মাটের দশকের শেষদিকে তাঁর রিপোর্টে ঐ বক্তব্য পেশ করেন।

তারও প্রায় একুশ বছর পরে, রাজ্যসভার প্রশ্নোত্তরে কেন্দ্রীয় নিরমন্ত্রক যে জবাব দেন, তা থেকে জানা যায়, ঐ অতি-ধনী-জাতিই নাকি আশি-র দশকের প্রথম আট বছর সময়ে ওঁদের সম্পত্তির পরিমান একশ দশগুনের-ও বেশি ছাড়িয়ে ফেলেছেন। সিকিমের কথা-ই ধরা যাক না। রাজতন্ত্রে রাজপরিবারের ধন-সম্পদের কথা না হয় বাদ-ই দিলাম। তারপরও গণতন্ত্রের অধীনস্থ হবার সময় অবধি। সেখানে-ও এই 'অতি-ধনী' পর্যায়ের পরিবারের সংখ্যা কম ছিল না। সবচেয়ে উঁচুতলায় যাঁরা ছিলেন ওঁদের চারজন 'ভুটিয়া'। তিনজন গ্রামবাসী 'লেপচা' এবং বাকি তিনজন 'নেওয়ার'। এই দশজনের মধ্যে ভূটানবাসী তিনজন ছাড়া, বাকি চারজন সপ্তাহে ধনী হয়েছেন। ভূটানিদের মধ্যে পড়েন, রাজ শ্বশুরকুল আর. বি. থেনসাপা, মন্ত্রি তাসুলু ও থেনলুপ দোর্জিকাজী ইত্যাদি। নতুন ধনী হবার মারটম টবগেন, বাইক পেট্রোল, নাস্তাকুল প্রধান ও বুজুর সেতাব।...

এই কি একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টিকর্তা? যে দেশের সরকারী নীতি ও কার্যকলাপে ধনীরা ক্রমেই আরো ধনী, গরীবেরা আরো গরীব হয়ে চলেছেন। সে দেশের সরকার কী করে, জনগনের আস্থাভাজন হয়ে উঠছেন?

আমার অসম্পূর্ণ চিন্তার মাঝে নিতান্তই আকস্মিকভাবে পাপাই এসে আমার হাতঘড়ির বেঁচকা টান মেরে বললো: এখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছ না? মা তোমাকে ডাকছে।

১৪

পাপাই আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এসে হাজির করলো হোটেল বাউলের সামনে। ফটকের পৈঠার 'পর দাঁড়ানো বৌমা ও বৌদি।

কাছে আসতেই কানে এলো: কী হবে দিয়ে, ক'টা রাতের কেনী তো নয়। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে কেটে যাবে...

মা, তুমি বুঝছো না কেন? দেখনা, ও কেমন অসহযোগ শুরু করেছে।

কই? তাকে তো দেখছি না।

লাল-মার্কেট দেখতে গেছে। মনে, ওটা না-দেখলে না কি এখানকার মার্কেট সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা-ই হবে না।

এবার কৃত্রিম রাগ-অভিমান মিশিয়ে বৌদি বলে উঠলেন, তোরা পারিস-ও বটে।

আমি কি আর তখন আমাতে আছি? ভূত চেপেছে বুঝিবা। ভূতপূর্ব নেপাল-রাজ পরিবারের পতন থেকে শুরু করে সিকিমের নবাগত নেওয়ার ট্রেডার্স-এর ক্ষণস্থায়ী কার্যকলাপ-কে ঘিরে আমার চিন্তা স্রোত ঘুরে চলেছে নানাভাবে, বিচিত্রসব ঢেউ তুলে।

অন্যমনস্কতায় হোটেলের ঘরগুলো দেখতে দেখতে কখন যে মনের বাবদীর অন্যেটভাব কেটে গিয়েছে। ঘটে গেছে সুমিতার আগমনে নীল কমল হয়ে আকাশচুম্বে সূর্যেন্দু সময়, সে কথা ঘুণাক্ষরে অবলম্বন না রেখেই, মন মেতে উঠেছে খুশি-তে।

পাশাপাশি কক্ষগুলো, তকতকে চিনামাটি জাকুজি-বেডেড্-রুম। ওয়েটার বললো, এগুলি ডী-লুক্স্ কামরা। টেলিফোন, কালার্ড টি. ভি, ডী-লীল সার্ভিস সহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে গেল এমন তড়িঘড়ি, সব-টা তার ঠিকঠাক হৃদয়ঙ্গম হলো না।

একটু থেমেই ওয়েটার প্রশ্ন করলো, সুপার ডী- লুক্স্ সুইট দেখবেন কী?

শেষ শব্দে আলোকিত হয়ে উঠেছে তখন। সে আলোর ছাপটা পাপাইকে তাঁর চারপাশের নিসর্গের পরিবেষ্টনে আরও রহস্যময়ী উঠেছে খুশি। সেই পরিবেশে বৌদি হাসিতে রহস্য ছড়িয়ে বলে উঠলেন, যথেষ্ট হয়েছে বাছা, আর নয়।

পাপাই প্রশ্ন করে, "স্যুপার ডী-লুক্স্" মানে কী? আর তখন-ই উপাদেয় খাদ্য-প্রস্তুতির ঘ্রাণে ভুরভুরিয়ে উঠে চারদিকের বাতাস।

আমি চেঁচিয়ে উঠি স্যুপার।

ওয়েটার এসে বিছানার নর্যাকরণ সাঙ্গ করে গোলাপজল ও সাবান রেখে গেল যখন, তখন মুগ্ধ চেনেনিষ্ঠ তোয়ালের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ-ই বুঝি প্রেমে পড়া মানুষের মতো ছটফটিয়ে ওঠে মনটা।

পাপাই চেঁচিয়ে ওঠে, বুকিং কনফার্মড! তার গলায় বিস্ময়ের চেয়ে আনন্দের সুর-টাই বুঝি ধ্বনিত হয় বেশি করে।

পাপাই-য়ের বিবরণ শুনে খুবলাল হোটেলের সেরা ফ্লোর এটা-ই। রুমরেট হিসাবে বর্তমানে আমরা-ই এখানে একমাত্র। আমাদের ওয়েটার-এর নাম যে গোবিন্দ, সে কথা-ও মিললো পাপাই মারফৎ।

পাপাই বললো : মা, ওঁদের জানাতে হবে না।

উত্তর এলো অর্কিড-তো? ফোনে জানিয়েছি। ট্রারিস্ট-এজেন্সী-তে অর্কিডের ঠিকানা দেওয়া ছিলো। সেখানে-ও।

বৌমা 'আসছি' বলে বেরিয়ে যেতেই, পাপাই বলে ওঠে, এবার একটা মজার জিনিস দেখাই তোমাদের দু'জনকে।

তার, ভাষণাংশী-তে মনে হতে থাকে খুশি জাদুকর বুঝি এক। জানলার দিকে হেঁটেও গেল সে সেই ভঙ্গীমায়। ভারিতে দু'পাল্লার পর্দা দিলো সরিয়ে, আর সেই মুহূর্তে-ই চোখের সামনে ধরা পড়লো এক চমৎকার রূপকথার রাজ্য।

দিনের আলোয় দেখা নদীর ওপারের সেই পাহাড় দু'টো-ই কি? তখন তো দেখেছিলাম সবুজে ছাওয়া স্নিগ্ধ নিবিড়, নীল মিনারের সন্ততার আলিঙ্গনে গভীর প্রসন্নতায় মুকিবা চোখবুজে আছে। আর এখন? এ তো কোন পাহাড় নয়, কয়া তারই পটভূমিকায় কে যেন তারার মালা পরা আলো ঝলমল আকাশ-টাকে টেনে নামিয়েছে।

এ কী কোন স্বপ্নপুরী!

কতদূরে-ই না আমরা। তবু, নদীপারের ঐ জীবনমঞ্চের ভূমীলব যাঁরা, ওঁরা সকলেই দৃষ্টির অগোচরে, থেকে বড্ড বেশি আপনজনের মতো টানতে থাকে। কিন্তু, যাই কি করে? 'জীবনে-জীবন যোগ' করা-র দুঃসাহসীক অনুভূতিদানে ওঁরা-ও তো আমাদের-ই শরিক।

(ক্রমশঃ)

আকাশ কুসুম

(তৃতীয় পর্ব)

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

বিজয় কেতন হাতের মুঠোর মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল। ধবল বুঝলো ভদ্রলোকের বিস্ময় বাড়িয়ে দিয়েছে শুধু তোর কথা। ছোট বেলার বান্ধিতা আমার খেলার সাথী। অনেকদিন এক সঙ্গে খেলেছি। তারপর বড় হয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। এই জীবনের রীতি। ছোট বেলার খেলার সাথীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েই আমাদের জীবন কাটে।

ধবল থামলো। বুঝলো ভয়ানক এলোমেলো কথা বলছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো। মানুষ হিসাবে আমি বোধহয় অন্য রকম। ছোট বেলার খেলার সাথীদের অনেকের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ আছে। যাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই তাদের কথা অনেক সময় মনে আসে।

বিজয়কেতনের মুখের উপর চোখ পড়ল। তাকে মনযোগী শ্রোতা করা মনে হল ধবলের। যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার মতো মানসিক দৃঢ়তা আছে। মানুষের সংসারে অনেক রকম ওলট পালট ঘটনা ঘটে যায়। হয়তো ঘটনা ঘটা উচিত ছিল অন্যরকম। জীবনতো পূর্বাপর বাঁধা নির্দিষ্ট পরিণতির ছক নয়। প্রতিনিয়ত ভাবা হয় নি, কল্পনা করি নি সে রকম ঘটনা ঘটে যায়। সংবাদপত্র অহরহ লক্ষ্য করে। মানুষ এ রকম ঘটনার সামনে পড়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে-অনেকে টাল সামলাতে পারে না। বিভ্রান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে যায়। বিজয় কেতন সেই বিহ্বল,বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার শ্রেণীর মানুষ নয়। যে কোন ঘটনা সে দর্শক হয়ে দেখার সামর্থ রাখে। প্রতিটি ঘটনা অনিমেষ চোখে দেখবে, প্রতিটি কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে। বিজয়কেতন অবিচল হয়ে থাকতে জানে। মায়ের হাতে শিশুসন্তান হত্যার কাহিনীও বোধহয় নির্বিকারভাবে শুনতে পারবে।

তবু ধবল নিজেকে নিশ্চিন্ত করতে পারল না। একের পর এক কৈফিয়ত দেবার কথা মনে এল। কিন্তু সে কৈফিয়তগুলি উচ্চারণ করতে পারছে না। প্রতিটি কৈফিয়তে মনে হচ্ছে ভয়ানক দুর্বল। অসহায়ভাবে বারবার নিজের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত অসহায় হয়ে একজন মানুষের সামনে বসে থাকা যায় না। নিরুপায় ধবল বললো, আজকাল আমার এইসব- এই ছোটবেলার কথা বলছি—সেই বয়সের সঙ্গীদের কথা খুব মনে আসে। আমি শুনেছি, বৃদ্ধ বয়সে মানুষ অতীতের কথা ভেবে আনন্দ পায়, অতীতকেই ফিরে চায়।

এতক্ষণে বিজয়কেতনের চোখের পলক পড়লো। এতক্ষণ সে নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল ধবলের মুখের পানে। চোখের মধ্যে ছিল জরিপ করার তীক্ষ্ণতা।

বিজয়কেতন বললো, হ্যাঁ, এ রকম ঘটে।

ধবল বললো, আমি কিন্তু ঠিক যাকে বুড়ো বলে তা নয়। পঞ্চাশ হয়েছে বলে মনে হয় না। এই বয়সেই কিন্তু সব হারিয়ে ফেলেছি। বিশ্বাস হয় ছোট বয়সের সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা করছি। অথচ কেন যেন মনে হয় আর বাঁচবো না কেন এরকম মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না। শুধু একটা কথা বার বার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ভোঁয়ায় যে হারিয়ে যাই নিজেই বুঝতে পারি না।

বিজয় কেতন ধবলের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললো, হারিয়ে যান! কোথায়?

ধবল বললো, জানিনা। বলতে ইচ্ছে করছে একটা দিগন্তহীন মাঠের মধ্যে। কিন্তু বলা যাবেনা। কোথায় যে যাই নিজেই বুঝতে পারিনে। কত সময়ের জন্য এই যাত্রা তাও জানিনা। যখন নিজের মধ্যে ফিরে আসি তখন বুঝতে পারি আমি আমার মধ্যে ছিলাম না।

বিজয় কেতন বললো, বিচিত্র তো।

ধবল হাসলো। বললো, আপাত দৃষ্টিতে এটা বিস্ময়কর। বাস্তবে কিন্তু

তা নয়। যারা বর্তমানের কাছে খুব ক্লান্ত তাদের এ রকম হতে পারে।

বিজয় কেতন বললো, কি রকম?

ধবল বললো, এই যে হারিয়ে যাওয়া। নিজের মধ্য থেকে নিজে চলে যাওয়া।

বিজয় কেতন বললো, আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

ধবল বললো, এ হল বাস্তব থেকে পালিয়ে যাবার রাস্তা। অনেকে গভীর শোকে মূর্চ্ছা যায়। এভাবে সে দুঃখকে এড়িয়ে যেতে চায়। এটা হল মুহূর্তের জন্য মস্তিষ্কের সচলতাকে বন্ধ করে দিয়ে বর্তমানকে ভুলে থাকা।

বিজয় কেতন আশ্চর্য হয়ে বললো, এতো মনোবিজ্ঞানীর বিষয়।

ধবল বললো, হয়তো তাই। আমি বললাম আমার ধারণার কথা। তাদের কথা তারাই বলতে পারেন।

বিজয় কেতন বললো, আপনার নামটা শোনা হয়নি।

ধবল ভয়ে ভয়ে নিজের নাম বললো। নাম বলেই সে নিজেকে হারিয়ে ফেললো। আস্ত বিশ্বাস হারিয়ে গেল। বার বার নিজেকে মনে হতে থাকলো সে যেন বেড়ালের মত মাছ চুরি করে খেতে বসে ধরা পড়ে গেছে। পালাতে পারছে না।

বিজয় কেতন বললো, আপনি কি লেখক?

ধবল বললো, হ্যাঁ, লিখবার চেষ্টা করি। লেখা হয় কিনা তা জানিনা।

বিজয় কেতনের ভুরু টান টান হয়ে গেল। চোখ বিস্ফারিত হল। ঠোঁটের কোনে ভাঁজ ফেল। কপালে কতগুলো রেখা জেগে উঠলো। চুলে হাত বোলাতে শুরু করলো। রক্তের চাপ সামলাতেই সিগারেটের প্যাকেট খুঁজলো। পেল না। নিজেকে সামলে নিল। বললো, আপনি বসুন। আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি।

বিজয় কেতন ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

ঘরের মধ্যে ধবল একা। তার চোখ গেল দেওয়ালে। আটা কোম্পানীর ক্যালেন্ডার। তার পাশেই আলমারী। তাতে কয়েকখানা বই আর পুতুল সাজানো। পুতুলগুলি মানুষি। দেখেই বোঝা যায় লোক নিজের মূল্য ওরা বোঝে না। হয়তো লোক শিল্প কাকে বলে তাই জানে না। কারো বাড়ি দেখে পুতুল সাজিয়েছে। আলমারীর উপর ফুলদানী। ফুল নেই। দেওয়ালে দামী পর্দা। কিন্তু পর্দার ডিজাইন সস্তা ধরণের। কয়েকটি সোফা। এক পাশে টেবিল। টেবিলে হয়তো সেই দিনের সংবাদপত্র।

ঘর শূন্য। গভীর নৈঃশব্দে ডুবে আছে। জানালার পর্দায় বিকেলের বিষণ্ণ রোদ। তার থেকেও বেশি বিষণ্ণতা তার নিজের মধ্যে। বর্ষার আসন্ন মেঘের মত স্থির হয়ে আছে। মুহূর্তে মুহূর্তে সে উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। একটা হিমার্ত কন্দরের মধ্যে বসে আছে। চারিদিকে অন্ধকার আর নির্জনতা। ধবল ভয় পেয়ে গেল।

ভয় দূর করতে উঠে দাঁড়ালো। বসলো সঙ্গে সঙ্গে। কবরের দরজা যেন খুলে গেল। নিজের মধ্যে এখন অনুভব করছে উত্তেজনা। অথচ উত্তেজনা থাকছে না। মাতাল হাওয়ার মত এসে কাপটা দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। যে কোন মুহূর্তে বাঞ্ছিতা এসে দাঁড়াতে পারে দরজার মাঝখানে। পর্দা তুলে দাঁড়াবে। দেখবে ধবলকে। ধবল চোখ তুলবে। দেখবে বাঞ্ছিতা কড়ির মতো সাদা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হুলস্থূল করে রক্ত উঠে এল বুকের মধ্যে। ধবলের হাত পা কেঁপে উঠলো। কোথায় যে ঝড় উঠেছে তা বুঝতে পারছে না। শুধু নিজের মধ্যে আলোড়ন অনুভব করছে। এতক্ষণ যে চোরা স্রোত নদীর বুকের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল তা উপরে উঠে আসছে। ধবল উত্তেজনা আর যন্ত্রণা কষ্ট নিয়ে যাওয়া ঠোঁটের ওপর সামলে নিতে চাইল। ঠোঁটের দুপাশ শক্ত করে চেপে ধরলো তবু ও দেহের.....দুলে চেপে ধরল। কিন্তু পা আর নিজের মনে হচ্ছে না। হাতও নিজের নয়। এ রকম কেন হচ্ছে বুঝতে পারছে না।

আবার দরের দেওয়ালে চোখ বোলালো। যে সব কথা আসবার সময় ভেবেছিল তা ভাববার চেষ্টা করলো। কোন কিছু মনে এলনা। সব কি রকম ঘোলা হয়ে গেছে। বাঞ্ছিতার মুখখানাও মনে পড়ছে না। গত পঁচিশ বছরে বহুবার কল্পনায় মুখখানা দেখবার চেষ্টা করেছে। দেখতে পায় নি। তার স্মৃতির জগৎ থেকে বাঞ্ছিতার নাক, মুখ, ঠোঁট সব হারিয়ে গেছে। এখন ভয় হচ্ছে বাঞ্ছিতাকে চিনতে পারবে কিনা। বাঞ্ছিতা সামনে এসে বসলেও ধবল যদি চিনতে না পারে!

সময় বাঞ্ছিতার মুখে কত পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সে সব পরিবর্তনের সঙ্গে ধবল পরিচিত নয়। অতীতের কতটুকু বা ধবল চিনে ছিল বা বুঝতে পেরেছিল? ভালবাসার গাঢ়তায় যখন জড়িয়ে ছিল তখন বাঞ্ছিতাকেই মনে হত সব থেকে বেশী অপরিচিত। ধবলের তখন অনেক সময় মনে হত যে একটা নদীতে সে সাঁতার কাটছে। জলের উপরটার সঙ্গে সে পরিচিত। নদীর বুকের তলায় কি আছে তা জানেনা। ডুব দিলেও জানা যাবে না। এমন করে ভালোবেসেও কিছু জানতে পারেনি বাঞ্ছিতার। পায়নি বাঞ্ছিতার আত্মার সন্ধান তেমনি অপরিচিত বাঞ্ছিতার দেহ।

ধবল পালিয়ে যাবার কথা ভাবলো। ঘরের বাইরে গিয়ে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দেবে। সহজ পায়ে সিঁড়ি কটা টপকে নিচে নামবে। তারপর লম্বা দৌড় দেবে। পালিয়ে যাবে বাঞ্ছিতার কাছ থেকে বাঞ্ছিতার বাড়ি থেকে অনেক অনেক দূরে। কিন্তু ধবল নড়তেও পারলো না। সবটা হবে একটা ছেলে মানুষীর কাজ।

তবুও উঠলো ধবল। পায়ে পায়ে দরজার কাছে গেল। দরজাটা বন্ধ। ধবল ঘরে ঢুকতেই বিজয় কেতন বন্ধ করে দিয়েছিল। দরজায় হাত রাখলো। কি ভাবে দরজাটা খুলবে বুঝতে পারলো না। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের দরজা কি ভাবে খোলে তা কিছুতেই মাথায় আসছে না। এরকম হচ্ছে কেন? ঘুরলো। এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে। পাখা ঘুরছে না। ভয়ানক গরম লাগছে। পাখার সুইচ্ খুঁজলো। দেখতেও পেল। কিন্তু পাখা খুললো না। বরং টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ালো আলমারীর কাছে। বইয়ের নামগুলি পড়বার চেষ্টা করলো।

তার মনে এল একটা উপন্যাসের কথা। দীর্ঘদিন পর নায়ক নায়িকার দেখা হয়েছিল এক বিয়ে বাড়িতে। ঘটনাটা ঘটেছিল একেবারেই আকস্মিকতার পথ ধরে। এত আকস্মিক যে দু জনকে দুজন চিনতে পেরেছিল কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি। সত্যি তাদের দেখা হয়েছে এটা বিশ্বাস করার মত মন যখন তৈরি হল তখন বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। ধবল সেই বইটির কথা ভাবতে চাইল। ভাবতে পারলো না। নিজের মধ্যে ডুব দিয়েও বইটির নাম খুঁজে পেল না। নামটা মনে আসছে অথচ ধরতে পারছে না। হাতে কলম নেবে সারা বাড়ি কলম খোঁজার মত করে ধবল খুঁজতে থাকলো। বইটা চোখের উপর ভাসছে অথচ নাম মনে পড়ছে না।

আওয়াজ শুনে ধবল ফিরে তাকালো। না কিছু নয়। কোথা থেকে আওয়াজ এল বুঝতে পারলো না। নিজেকে কেন কেন অপরাধী মনে হলো। বাঞ্ছিতার ঘরের মধ্যে তাদের অনুপস্থিতিতে এভাবে ঘোরাঘুরি ঠিক নয়। বাঞ্ছিতার সঙ্গে এমন কোন সম্পর্ক নেই যে বলতে পারে। অনাত্মীয় মানুষের কোথায় ঘর। বাঞ্ছিতা এসে বলতে পারে, কই আপনাকে তো চিনতে পারছি না। এক সঙ্গে খেলেছি বলছেন। তা হতে পারে। আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে তিন চার জায়গায়। পূর্ববঙ্গ থেকে ভবানীপুর। ভবানীপুর থেকে দমদম্। তারপর মৃগাপুর। তাই কোথায় কার সঙ্গে খেলাধূলা করেছি তা মনে নেই।

এ সব কথা ধবলের মনে আসতেই লজ্জা পেল। এটা একেবারেই অপরিচিত মানুষের বাড়ি তা ভুলে গিয়েছিল। কি করা যায় বুঝতে পারছে না। ধবল মন্থর পায়ে আবার ফিরলো কৌচের এক পাশে বসলো। কি করবে

ভাবলো- অথচ কিছুই মনে করতে পারছে না। অথচ আসার আগে কি ভাবে এ বাড়িতে ঢুকবে কি কি বলবে তা ভেবে রেখেছিল। তার প্রতিটি পদক্ষেপ, কিভাবে কোথায় বসবে, বাছিতাকে একা পেলে কি বলবে, তার মামী উপস্থিত থাকলে কি রকম আচরণ করবে তা একেবারে ছবির মত পেঁথে নিয়েছিল। দিনের পর দিন এসব কথা ভেবেছে। এখন কার কোনটাই মনে আসছে না। সব কি রকম ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।

ধবল ঘুরে দাঁড়াতেই ঘরটা যেন চোখের মধ্যে পাক খেয়ে গেল। অথবা কোথাও ভূমিকম্প হল। এত ভোরে পৃথিবী কাঁপতে থাকলো যে ধবল ভয় পেয়ে ছুটে এসে সোফায় বসলো। কিন্তু সোফার মাঝখানেও বসে থাকতে পারছে না। কে যেন তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ধবল দাঁতে দাঁত চেপে ধরে নিজেকে স্থির করতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই পারলো না। নগ্ন প্রাবনের বিষাণ বেজে উঠেছে। হা হা করে ঝড়ো হাওয়া আসছে। গাছের মাথা এক এক ঝটকায় অভূমি নত হচ্ছে। আবার মাথা তুলছে জ্যা মুক্ত ধনুকের মত। মেঘের দল কিসের টানে যেন বন্যাহীন ঘোড়া হয়ে ছুটছে। হাওয়া আসছে শিকল ছেড়া করেদির মত। মাটির বুক ফেটে ফেটে যাচ্ছে। গাছের শিকড় চড় চড় করে ছিঁড়ছে। বড় বড় মহীরুহ থর থর করে কাঁপছে।

ধবল সোফা আঁকড়ে ধরে বসে রইল। চোখে পলক পড়ছে না। তার চিবুক থর থর করে কাঁপছে। দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বাছিতা। ধবল যেমন কল্পনা করেছিল ঠিক তেমনি। চিনতে এক লহমাও দেরী হয়নি। পৃথিবী এত পাল্টে গেল অথচ বাছিতার দেহে তার ছাপ এত কম - বাছিতা তার কাছে প্রাচীন ভাস্কর্যের মত। কল্পনায় কতবার তাকে দেখেছে। এখন তেমনি মন্দিরের দরজার মাঝখানে কোমরে সামান্য বাঁক তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

সবে স্নান করেছে। পিঠের উপর ঘন কালো চুল এলিয়ে আছে। কানে দুটি ছোট দুল। সামান্য প্রসাধনে মুখের উপর কিরকম এক আলো। এ রকম আলো ফুলের মধ্যে থাকে। সে আলো পরাগের আলো। এত আলো কোথায় পায় বাছিতা।

বাছিতার ঠোঁট একটু ফাঁক হল। পরিচিত হাসি জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। গালের রেখা কেঁপে উঠতে না উঠতেই যেন গেল। ঠোঁটের ভাঁজে আটকে রইল চলচলে হাসির সম্ভাবনা। ধবল লক্ষ্য করলো এত সময়েও বাছিতার চোখে পলক পড়ে নি একবারো।

ধবল যাবড়ে গেল। বললে, আমি ধবল। তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো।

কথাগুলি সে বললো, সর্বশক্তি ব্যবহার করে বললো। কিন্তু গলা থেকে কোন শব্দ উচ্চারিত হল না। ভয় পেয়ে গেল ধবল। সে কি! তার গলা থেকে কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না। কথা গুলো বুক ঠেলে উঠে এসে গলার কাছে আটকে যাচ্ছে। সে কি বোবা হয়ে গেল। আবার চিৎকার করে বলতে চাইল, আমি ধবল। কিন্তু গলায় আকুলতা ধ্বনিতে রূপায়িত হল না। অসহায় ধবল শব্দহীন শূন্যতায় ধাবি খেতে থাকলো।

প্রথম কথা বললো বাছিতা। বললো, তুমি?

কথাটা উচ্চারণ করে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সহজভাবে সে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে। বললো, তুমি এসেছো আমি ভাবতেই পারিনি। আমি ভাবছি কে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

কেন, আমি আসতে পারি না? ধবল কথাটা বলতে চাইল। কিন্তু বিস্ময় তার মুখের কথাটা মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার নাম শুনেও বাছিতা চিনতে পারলো না.....ধবলের মনে এল। মনের বিস্ময় ভাষার রূপ নিতে চাইল। নিজের মধ্যে বিস্ময়সূচক শব্দ খুঁজলো কিন্তু কোন শব্দই খুঁজে পেল না। সব কি রকম যেন তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

বাছিতা দু পা হেঁটে এসে সোফায় বসলো। বসলো ধবলের ঠিক উল্টো দিকে অনেকটা দূরে। মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। হাত বাড়িয়ে ধবল ছুঁতে পারবে না। ধবল এখন যদি মূর্ছিত হয়ে পড়ে বাছিতা ধরতে ...[illegible]বে। কারণ এখন এই ঘর এবং বাছিতা ভয়ানক অপরিচিত মনে হচ্ছে ধবলের। ধবল যেন অনন্ত শূন্যতার মাঝখানে চলে এসেছে। সূর্য চোখের উপর থেকে হারিয়ে গেছে। উত্তেজনা, অবসাদ, বিস্ময়, তীব্র আকাঙ্খা তাকে পাক খাওয়াচ্ছে।

বিনয় কেতন এসে ঘরে ঢুকলো। তাতেই ভয়ানক শূন্যতা যেন হারিয়ে গেল। ধবলের চোখে আলো ফুটলো। শিকল ছেঁড়া করেদি হাওয়া দিতিয়ে দাঁড়ালো। নিজের সাথা শব্দ খুঁজে পেল ধবল। বললো, বাছিতা, আমাকে চিনতে পেরেছো?

বাছিতা চাপা শব্দে হাসলো। বললো, চিনবো না কেন?

ধবল বললো, কি জানি। আমার ভয় হচ্ছিল হয়তো চিনতে পারবে না। কতদিন দেখা হয়নি। এ সব কথা ভেবে ভয়ানক লজ্জা করছিল।

বাছিতা চোখ তুললো। বললো, চিনবো না কেন?

ধবল বললো, একসময় আমরা এক সঙ্গে খেলতুম। ঝগড়াও করেছি। সে কি আজকের কথা! কতরকম পরিবর্তন ঘটে গেল পৃথিবীর উপর থেকে। তবু আমি কলকে যেতে পারলাম না। ততখানি বলে ধবলের খেয়াল হল বিনয় কেতন বাছিতার পাশে বসে আছে। ধবল সচেতন হল। কথাটাকে লঘু করার জন্য বলতে শুরু করলো, আমাকে চিনতে না পারলে মোটেই অবাক হতাম না। ছেলেবেলার খেলার সাথীদের সবার কথা মনে থাকে না। মনে থাকার কথাও নয়। অবশ্য আমি অনেককেই ভুলে যাইনি। তাই বলে সবাইকে মনে রেখেছি তা নয়। এখন তাদের কথাও মনে পড়ছে। আমি কেন দিনে দিনে খেলা ঘরে ফিরে যাচ্ছি।

বাছিতা হাসলো। কোন শব্দ হলনা। তার রাঙা ঠোঁট শুধু একটু ফাঁক হল। আবারে এক ঠোঁটের উপর আর এক ঠোঁট স্থির হল। তাতেই বোঝা গেল তার হাসি।

ধবল নিজের বুকের মধ্যে তৃষ্ণা অনুভব করলো। মনে হল এই মুহূর্তে কিছু একটা করা উচিত। কি কথা উচিত তা বুঝতে পারলো না। বুঝতে পারলো না বলে অসহায় বোধ করতে থাকলো।

ধবলের অসহায়তা বাছিতা লক্ষ্য করলো। তাই তার ঠোঁট আবার ফাঁক হল। মেঘ ফেটে বেরিয়ে আসা রোদের মত তার দাঁতে ঝলক খেল। নিঃশব্দ এক রহস্যময় হাসি তার ঠোঁটের উপর ঝুলে রইল।

ধবল বললো, এরকম না জানিয়ে এসে তোমাকে বিরক্ত করা ঠিক হয়নি। অথচ কি আশ্চর্য আগে এ সব কথা মনে আসেনি।

এবার বাছিতার হাসি সারা গাল বেয়ে কান পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সহজ অথচ নিঃশব্দ হাসি হেসে বললো, তুমি এখনো সেই আগের মত ছেলে মানুষ আছো এসেছো তাতে কি হয়েছে।

ধবল বললো, ছেলেমানুষ! বলছো কি? তুমি কি বলছো তা তুমি নিজেই জাননা। আমার বয়স কত হল তা তুমি জান? আমার তো মনে হয় আর বাঁচবো না। প্রতিদিন মনে হয় এগিয়ে চলছি, এগিয়ে চলছি এত দ্রুত যে কখন শিশির বিন্দুর মত করে ঝরে নিজেই টের পাব না।

বাছিতা আবার হাসলো। বললো, এরকম কথা তুমি যখন ছোট ছিলে তখনো বলতে। তুমি ভুলে গেছ। আমার মনে আছে।

ধবল বাছিতাকে এসব কথা বলতো নাকি! নিজের মধ্যে ডুবুরীর মত ডুব দিতে চাইল। সেই ডুব অতীতের দিনগুলিকে নতুন করে পাবার ইচ্ছা জাগলো। হঠাৎ মনে পড়লো, বিদ্যুতের চমকের মত মনে এল। হ্যাঁ, বাছিতাকে মৃত্যু ভয় দেখাতো। ভয় দেখিয়ে তাকে নরম করতে চাইত। নরম করে কিছু আদায় করে খুশি হত। বাছিতা তা বুঝতে পারতো। এখন কি বাছিতা তাই মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কেন? বাছিতা একটুও আবড়ে যায় নি তার আকস্মিক উপস্থিতিতে। তাদের দু'জনার সম্পর্ক ভুলে গেছে। ধবল একারণেই ভয় পাচ্ছিল। বাছিতা অতীতের সেই ভালবাসার কোমল দিনগুলির কথা মনে রাখতে পারেনি অথবা গুরুত্ব দিতে চাইছে না। ছেলেমানুষী ভেবে সবটাই হাস্যকর করে তুলতে চাইছে। এ সব কথা মনে আসতে ধবল বিপন্ন হয়ে পড়ল। কি বলবে বুঝতে পারলো না।

(ক্রমশ)

অপারেশন গ্রীন

ধারাবাহিক উপন্যাস

দীনেশ চট্টোপাধ্যায়

স্লাট

মাসের প্রথম দিকেই ত্রিপোলী এসেছিল মাইকেলেরা। ত্রিপোলী মানে লিবিয়ার রাজধানী। ভূমধ্যসাগরের লাগোয়া নগরী। খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ফোয়েনিসিয়ানদের সৃষ্টি। কার্থেজ রোমান সাম্রাজ্যের অংশে প্রাপ্ত নগরী লেপটিস ম্যাগনা।

হেডকোয়ার্টার থেকে তৈরি হয়েই এসেছিল মাইকেল আর শীথ। ফিয়াকো থেকে বের হবার মুখে তারা শুনে এসেছে ম্যাকারিকার প্রেসিডেন্টের ঘোষণা। "ম্যারিকা ও তার সহযোগী সকল রাষ্ট্রের শত্রু লিবিয়া আর তার প্রেসিডেন্ট গদ্দাফি। খতম করো গদ্দাফিকে।" এই ঘোষণার দিন কয়েক পরেই আক্রান্ত হল গদ্দাফি, তাঁর নিজের প্রাসাদেই। ম্যারিকান বোমারুবিমানের অতর্কিত হামলায় খুন হয় গদ্দাফির নাবালক পুত্র। ভারতের প্রধান মন্ত্রী আর কিউবার সৌহার্দ্যনেতা কাস্ট্রো এই নগ্ন হামলার প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। গদ্দাফি নিজেই গেলেন রাষ্ট্র সঙ্ঘে। নাবালক পুত্র হত্যার জন্য দায়ী করলেন খোদ মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে। বিস্ফোরণ বিস্ময়ের সঙ্গে শুনলো রাজীব গান্ধী বা ক্যাস্ট্রোর ওরাট পলার প্রতিবাদ। কিন্তু তারা চমকিত হলো গদ্দাফির কণ্ঠস্বরে। তাঁর কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত সুরেলা ঝঙ্কারে স্তম্ভিত সবাই। গদ্দাফি রাষ্ট্রসঙ্ঘের তথাকথিত শান্তি প্রচেষ্টাকে অন্তিযুক্ত করে বললেন,—রাষ্ট্রসঙ্ঘ হলো বৃহৎ শক্তিগুলির অন্যায্য কাজকারবারের জায়গা। এটা মীতিহীনতার একটি কিম্বকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সানগ্রিকভাবে এটা ক্লিব সংগঠন। আমরা আজ যা দেখছি, তা দেখেছি ষাটের দশকে কংগোর প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বাকে হত্যার মধ্যদিয়ে। .....ম্যারিকার হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত প্রেস রিলিজ বললো,—গদ্দাফি একটা উন্মাদ, ওকে আর ওর লিবিয়াকে খতম করো। ও কিনা আমাদের বিরুদ্ধে সাবোতেজ চালানোর সাহস দেখায়।—গদ্দাফিও ফতোয়া জারী করে বলেন,—"যারাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, তারাই লিবিয়ার বন্ধু।"

ফিয়াকোর দপ্তরে বসে মাইকেল নিজে শুনেছে গদ্দাফির বক্তৃতার টেপ। নাঃ, গদ্দাফি ঠিকই বলেছেন। তবু মাইকেলকে আসতে হয় লিবিয়ায়। ফিয়াকোর কাজে লিবিয়ার আসা মানে মুক্ত দুনিয়া তৈরি করতে ম্যারিকার রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করা।

¿S Ë Á6 ± ৫ অনুসারে ডি.আই.পি. লাউঞ্জে লি-পিং এর সঙ্গে দেখা। সব ব্যবস্থা পাকা করে সে ফিরে যাবে করসোরা। লি-পেং এর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তাকে অনুসরণ করে মাইকেল আর শীথ। লি এগিয়ে যায় পার্কিং জোনের দিকে। সেখানে রয়েছে এইট-সিলিন্ডার রোলস। গাড়ির চাবী ইতিমধ্যে চলে এসেছে মাইকেলের হাতে। ব্রিফকেসও বদল হয়েছে এক ফাঁকে। পাশপাশি চলতে চলতে ইতিপূর্বে খবর বলেছে লি পেং—হোটেল সেভিয়ার ৫১০ এবং ৬১০। একটির মাথায় অন্যটি। ৬১০ নং তোমার। ৫১০ শীথের। .....এর আগে মাইকেল দু'বার এসেছে ত্রিপোলী। অবশ্যই অপারেশন-১১১-এর কাজের প্রস্তুতি সারতে। এ হোটেল কেন, লিবিয়ার অনেককিছু চিনে গিয়েছে সে।

বিমানবন্দর থেকে এইট-সিলি চালিয়েই মাইকেল আর শিথ পৌঁছায় হোটেল সেভিয়ারে। বুকিং অনুসারে উঠে যায় নিজে ৬১০ নম্বর রুমে। শীথ যায় ৫১০ নম্বরে।..... নিজের ঘরে পৌঁছে খানিক বিশ্রামের পরই কাজ শুরু করে মাইকেল। এখার সে লিডার। বসবার সময় নেই। একসময় লি-পেং-এর কাছ থেকে পাওয়া ব্রিফকেস খোলে। ব্রিফকেসের মধ্যে পায় মাইক্রো ফিল্ম। ছুরেই প্রোজেক্টার। ফিল্ম চড়ায় মেশিনে। ছোট্ট পর্দায় জেগে ওঠে ফিল্মের বিষয়। অবশ্যই কোড ভাষায়। এ ভাষা মাইকেলের জানা। ফিয়াকোর ইপলস আই মানে উআরা এ ভাষা বোঝে।....পর্দার উপর চোখ রেখে খবর পড়ে যায় মাইকেল। খবর বলছে, ত্রিপোলী থেকে ১০০ মাইলের কিছু বেশী পথের দেবে ভূমধ্যসাগরের লাগোয়া হর্নদ। সিদ্রাউপসাগরের কোল ঘেঁষে মায়াবী নগরী।

ব্রুনস-এর অভিজাত পাড়া হেন-জি। হেন-জিনা-র নাইনথ স্ট্রীটের ৭ নম্বর বাড়ি। ওখানে পৌঁছানোই সব ব্যবস্থা। পাসওয়ার্ড—লিংকেন।

ফিল্মের দুই নম্বর খবরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীথের ঘরের সব কিছুই মাইকেল নিজের ঘরে বসেই দেখতে পাবে। কোড নির্দেশ মতো নিজের ঘরের জানলার কাঁচে প্রজেকশন লেন্স ফেলতে হবে। এ্যাংগেল হবে ৪৫°। তারপর পেরিটেলী করলেই টেলির পর্দায় ভেসে উঠবে শীথের ঘরের সবকিছু।..... মাইক্রো ফিল্মের তিন নম্বর খবরটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ। এটা রে-রে, আর তার সহকারিনী মিস ম্যালিনার সম্পর্কে। ম্যালিনার মা যশোমতী ওয়েস্ট বেঙ্গলের মেয়ে। ওয়েস্টবেঙ্গল হলো ইন্ডিয়ার একটা স্টেট। ক্যালকাটার কিছুদূরে আজকের বাংলাদেশ বর্ডার। বর্ডারের এপারের কোন এক গ্রামের গরীব মেয়ে যশোমতী। অসাধারণ সুন্দরী। বিয়ে হয় গরীব ঘরে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় বাংলাদেশ ইস্ট পাকিস্তান নামেই পরিচিত। যশোমতী ইন্ডিয়া থেকে পাচার হয়ে যায় ওপারে। ম্যালিনা আর রে-রে-এর কোন ছবি নেই ফিল্মটোর কাছে। ওরা দু'জনেই ইংরেজী, ফরাসী, উর্দু, আরবী, বাংলা, হিন্দী, আর তামিল বলতে পারে, পড়তেও পারে মাতৃভাষার মতো। ম্যালিনার বর্তমান বয়স কমবেশী ২৫।...

মাইক্রোফিল্মের শেষ খবরটি ভয়ানক জরুরী। লিবিয়ার আইন বলছে, কিনা লাইসেন্সের অস্ত্র এদেশে কারো কাছে থাকবে না। যদি থাকে, তবে দেশী হলে ১৫ বছর জেল। আর বিদেশী হলে ফায়ারিং স্কোয়ার্ড। খবরের সংগ্রহ পর্বটি শেষ হতেই মাইকেলের মনে হয় শীথের কথা। কি করছে ও? পেরিটেলি করলে হয় না? যেমন ভাবা, তেমন কাজ। নির্দেশ মতো পেরিটেলি চালু হতেই টেলির পর্দায় ভেসে ওঠে শীথের ঘরের দৃশ্য। কিন্তু শীথ কোথায়? বাথ্ রুমে টেলিভায়াল করে। একটু পরেই বাথরুম থেকে বের হয়ে আসে শীথ। এবার তাকে পর্দায় দেখা যায়।

: হ্যালো শীথ। মাইকেল বলছি.....

। হলো। তুমি যে বলছো তাতো টেলিভায়ালে তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি। —শীথ হাসতে থাকে।

। তা কি করছো?

। এই মাত্র স্নান করে এলাম। এবার.....

শীথের ঘরের দরজার মাথায় সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। শীথ টেলির মোবাইল সেটটা নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। খোলা দরজা দিয়ে আসে তিনটি ব্লন্ডি সঙ্গেত ফ্লোর ম্যানেজার।

। কি ব্যাপার? কথা বলছো কেন?— মাইকেল দুশ্চিন্তা করে।

: কিছু নয়। তুমি স্নান করেছো?— শীথ ব্লন্ডি তিনটির উপর নজর বোলায়। পেরিটেলি দেখে বুঝতে পারে মাইকেল।

। হ্যাঁ, এবার স্নান করবো। বাই।— টেলির মোবাইল সেটটা বন্ধ করে পেরিটেলির পর্দায় চোখ রাখে মাইকেল। দেখে শীথ ব্লন্ডি তিনজনের মুখোমুখী। ফ্লোর ম্যানেজারকে হাত নেড়ে কি যেন বলছে সে। পেরিটেলিতে দৃশ্যটি দেখা যায়। কারো কথা শোনা যায় না। তিনটি ব্লন্ডির মধ্যে যে সবচেয়ে সেক্সী, তার দিকে আঙুল তোলে শীথ। মেয়েটিকে রেখে বাকি দু'জনকে নিয়ে ফ্লোর ম্যানেজার ঘরের বাইরে চলে যায়।..... মাইকেল কিন্তু চোখ সরায় না পর্দা থেকে। সে শীথের ঘরের ব্লন্ডির একটা নামও দিয়েছে। লুসি। শীথ হাত নেড়ে-দুলিয়ে-কি বলে। সে ড্রিংকসের ট্রলি নিয়ে আসে।

শীথ চুপচাপ কয়েক পেগ ঢালে নিজের গলায়। মাইকেল বিরক্ত হয়। বেৎ, অমন মেয়ে তোর সামনে দাঁড়িয়ে। আর তুই কিনা এখন মদ গিলছিস! বেটা তুই, ঠান্ডা মেরে গেছিস।... একটু পরেই মাইকেলের ভুল-ভাঙ্গে। শীথ হঠাৎ টেনে আনে লুসিকে। একেবারে বিছানায়। জোর করে একটা গোটা বোতল ঢেলে দেয় ওর গলায়। ছটফট করতে থাকে লুসি। এক কটকায় ওর পরনের স্কার্ট খুলে নেয়। তারপর...ক্রিং ক্রিং..... নিজের ঘরের কলিং বেল বেজে উঠতেই মাইকেল চটপট পেরিটেলি মাইক্রো ফিল্ম সব গুটিয়ে এটাচীতে ভরে রাখে। বুঝতে পারে ব্লন্ডি নিয়ে এসেছে ফ্লোর ম্যানেজার। দরজা খুলে দিতেই দেখে অনুমান তার সঠিক। ব্লন্ডিদের মধ্য থেকে বেছে নেয় একটিকে। বাকি দু'জনকে নিয়ে ম্যানেজার বিদায় নিতে দরজা লক করে মাইকেল দাঁড়ায় মেয়েটির মুখোমুখী।

। কি নাম তোমার?

: মেরী।

: দেশ কোথায়?

: ম্যাক্সিকো।—মেরীর গলা নিয়ে অহংকার করে পড়ে।

। কি করো?

: কাজ। কতুন কি করতে হবে? ড্রিংকস্ আনবো? —বিরক্তি মেরীর গলায়

। না। কতো বেতন পাও?

: নো স্যালারী। বেতন নেই। কন্ট্রাক্ট্।

। যদি কাজ না পাও? —আবার প্রশ্ন মাইকেলের।

: ফিরে যাবো নিজের ঘরে।

: ঘরে তোমার সঙ্গে আর কে থাকে?

: কেউ না।

। এদিকে এসো।

মাইকেলের ডাকে মেরী এগিয়ে আসে। খুব খাতির করে মাইকেল তাকে পাশে বসায়। কয়েক পেগ নিজে চড়িয়ে মেরীকেও অফার করে। মেরী আপত্তি করে, না, না,। এ সব অভ্যেস নেই।

: আরে খাও না। খেলেই অভ্যেস হয়ে যাবে। আর জোর করেই মেরীকে মদ গেলায় মাইকেল। ক্রমে ক্রমে মেরীর নেশা জমে ওঠে। শেষে রীতিমতো বেহেড হয়ে যায়। হঠাৎ মেরীর মনে হয়, —মদ পরিবেশন করতে মেরী করছে মাইকেল। এক সময় মাইকেলের পিঠ চাপড়ে মেরী বলে ওঠে, —'ডোন্ট মেজি নিগার। বি কুইক.....। চাবুক এসে পড়ে মাইকেলের মুখে। আগুন জ্বলে ওঠে মাথায়। তারই ভাড়া করা মেয়ে তারই পয়সায় মদ গিলে তাকেই নিগার বলে গাল দেয়। তোর দেশ ম্যারিকায়, না? তোর মতো সাদা মেয়ের ছেনালিপনা দেখ্ কি করে বন্ধ করি! সে চিৎকার করে বলে ওঠে,— গেট আপ! ইউ ইল-ফারনাল বিচ....। একটানে মেরীকে দাঁড় করিয়ে জোর করে খুলে নেয় তার বসন। তারপর আবার টেচিয়ে বলে, নাউ, গেট আপ এন্ড স্ট্যান্ড।

এরূপ অবস্থায় পড়ে মেরীর নেশা কেটে যায়। হাউমাউ করে কেঁদে উঠে দু'হাতে মাথা এক করে বসে পড়ে। লজ্জা! লজ্জা!

: ডোন্ট ক্রুয়েল। নিষ্ঠুর হয়ো না। — কাঁদতে কাঁদতে বলে মেরী। চোখের জল আর কান্না নরম করে দেয় মাইকেলকে। এগিয়ে এসে মেরীর মাথায় হাত রেখে বলে—ডোন্ট ল্যামেন্টা। কেঁদো না। আমি ল্যাবে যাচ্ছি। তুমি ড্রেস পরে নাও।

মাথা নিচু করে মাইকেল ল্যাবরেটরীতে গিয়ে ঢোকে।.....

অনেক ঘুমিয়েছিলো মাইকেল সেই রাতে। নিঃসঙ্গ অথচ গভীর ঘুম।

পরের দিন ফুর্নের কাজ মিটে যেতেই শীথকে নিয়ে মাইকেল ফিরতে চায় ত্রিপোলী। শীথ কিন্তু বেঁকে বসে।

। চলো সিড্নি ঘুরে যাই।—বলে শীথ।

: পরে গেলে হয় না?—মৃদু আপত্তি মাইকেলের।

। তা তো বলবেই। সিড্নি তো তোমার দেখা। পুরোনো হয়ে গেছে।—অভিমান শীথের গলায়।

মাইকেল হেসে ফেলে।—বাব্বা! তুমি যদি শীথ আমার বৌ হতে, তবে তোমার জ্বালায় আমি সুইসাইড করতামই।

এরপর এইট-সিলি গর্জে ওঠে মাইকেলের হুতে। গাড়ি ছোটে সিড্নির পথে।..... ভারী চমৎকার রাস্তা। ত্রিপোলীর মতো যানজট নেই। মেডিটারীয়ান হাওয়ার নাতিশীতোষ্ণ মেজাজ। রাত বারোটা সিড্নি পৌঁছতে। ঠিক হয়, আগামী ভোরে যাবে সিড্নি উপসাগরে। সিড্নিউপসাগর, মানে ভূমধ্য সাগরদুহিতা।

সিন্ধি গান্ধ। মূল সমুদ্র থেকে প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে। আহা মরি সি-বীচ নয় কিছু। তবু স্নানার্থীর সংখ্যা কিন্তু কম নয়। হোটেল থেকে ভোর ভোর বের হতে চায় মাইকেল আর শীখ। গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকতে হয় মাইকেলকে গাড়ি ছাড়ার আগে।

: একটু দাঁড়াও। কৃত্রিম ফোয়ারা দেখে আসি।—শীখ ফোয়ারা দেখতে যায়। মাইকেল মনে মনে হাসে। ও ব্যাটা গেছে মেয়ে মানুষ দেখতে। সিন্ধি গান্ধ কখোন যাবে।

শীখের ফিরতে দেরী দেখে মাইকেল বিরক্ত হয়। ও এমন মেয়েখোর কেন?...শেষে এক সময় শীখ ফেরে। ঘোৎ ঘোৎ করে মাইকেল বলে,—তুমি মেয়ে মানুষ ছাড়া বাঁচতে পারো না?

: কেন? কি করেছি? —হাসিমুখে বলে শীখ।

। কি করো নি। যে কাজ করতে এসেছো, তারই ঠিক নেই। সি. এন. জির লোকদের তো চেনো না। কোথা থেকে চোখ রাখছে কে, তুমি জানতেও পাবে না।

: ও. কে. বস, ও. কে। ঠিক আছে এবার থেকে সাবধান হবো।.....তবে?

। তবে একটা মেয়ে যা দেখলাম কৃত্রিম ফোয়ার পাশে.....

: আঃ শীখ ! — ধমক লাগায় মাইকেল।

শীখ আর কথা বাড়ায় না।

দূরত্ব তেমন কিছু নয়। ঝড়ের বেগে গান্ধে পৌঁছে যায় এইট-সিলি। সকলের আমেজ কাটে নি তখনো। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার গান্ধে এলো মাইকেল। গান্ধে! ঘুমন্তনাগর দুহিতা! সত্যি চোখ আটকে যায়। মনোরম দৃশ্য। গান্ধের জল আর সাগরের জল, নীল অথচ কালচে। এক, কিন্তু এক নয়।.....গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে সান-বাথ দেখে মাইকেল। কি যুবক- কি যুবতী, কিংবা কৃষ্ণকৃষ্ণা, সবাই পরেছে জন্মদিনের পোষাক। সবাই সূর্যস্নানে ব্যস্ত। ওদের দেখে হাসি পায় তার। ওইটুকু কাপড়ের আব্রু না রাখলে বোধ হয় ভালোই হতো। নেকেড সোসাইটির একটা দর্শন আছে। এদের আছে কি?

শীখ ইতিমধ্যে পায়ে পায়ে পৌঁছে যায় জলের কাছে। জল আর জল। কেউ কেউ স্নান করছে। কেউ বা অর্ধনগ্ন হয়ে বালির উপরে শুয়েছে। শীখ দেখে কাছে থেকে। দূর থেকে মাইকেল। জলের পরিবেশে অর্ধনগ্ন নারী দেহের দৃশ্যে একটা যৌনতা বোধ জন্মায় মাইকেলের মনে। কোথায় যেন পড়েছিলো,—জলের দৃশ্য মানুষের যৌন চেতনা বাড়ায়। কথাটা যৌন বিজ্ঞানী হ্যাভেলকের না? হঠাৎ মনে পড়ে হোটেল লেভিয়ারের মেয়ীর কথা। না, তার উচিত হয় নি মেয়ীর সঙ্গে অমন ব্যবহার করা। ওর আবার সাদা কালো কি? ও তো পয়সা নিয়ে গতর বিক্রী করে।

আ-হা-হা-হো-ও-সেভ-সেভ ফর গড সেক—একটা মিলিত চিৎকারে চমকে ওঠে মাইকেলের। তার চোখে পৌঁছে যেতে চায় আর্তনাদের কেন্দ্রবিন্দুতে।.....শীখ কই? মাইকেল শীখকে খোঁজে। কোথায় গেলো ও। জলের কিনারে এগিয়ে যায় সে। কিনার ঘেঁসে লোকে লোকারণ্য। সবাই চেচাচ্ছে,—সেভ: সেভ! সবাই কিন্তু ডাঙায়েই দাঁড়িয়ে। লোক জনের মাথা পার হয়ে মাইকেলের নজর গিয়ে পড়ে জলে। দেখে, একটি মেয়ে ভেসে যাচ্ছে গান্ধের স্রোত বেয়ে গভীরতায়। কিন্তু একটা কথা চাই। হঠাৎ দেখে শীখকে। সে জামা প্যান্ট ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো গান্ধের জলে!

: টেক কেয়ার। সাবধান !— ডাঙা থেকে কেউ একজন চেঁচায়।

: ওখানে সাবমেরিনড্ রক, মানে ডুবো পাহাড়। হুসিয়ার। সাবধান করে অন্য একজন।

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, সে কিন্তু ডোন্টকেয়ার। সেই শীখ তীব্রগতিতে এগিয়ে যায় ডুবন্ত মেয়েটির দিকে। মাইকেলের মনে হয়, মেয়েটি আভার কারেন্টে পড়েছে। প্রাণপণ লড়ছে বাঁচার জন্য। শীখ আপ্রাণ চেষ্টা চালায় মেয়েটির কাছে পৌঁছাতে। এক এক সময় মনে হয়, এই বুঝি ধরে ফেললো শীখ। না, আবার স্রোতের টানে আর ঢেউয়ের ঝাপটায় দূরত্ব বেড়ে যায়। মাইকেল বোঝে, শীখের জেদ বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা তীরমুখী ঢেউ দেখে শীখ ডুব দেয়। মেয়েটি ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে আসে একেবারে হাতের নাগালে। খপ করে শীখ ধরে ফেলে মেয়েটির সোনালী চুল। এবার ফেরার পালা। বেকুব মেয়েটির কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরে তীরে ফিরে আসে শীখ।

ধন্য ধন্য করতে থাকে সকলে। শীখের হাত থেকে মেয়েটিকে নিয়ে বালির উপর শুইয়ে দেয় মাইকেল। এই ফাঁকে জামাপ্যান্ট পরে নেয় শীখ। দু'বন্ধু তারপর মেয়েটিকে কয়েক পাক ঘোরায়। খানিক জল উগরে দেয় মেয়েটি। পরিমানে সামান্য। জ্ঞান ফেরে। নিজেকে এমন অবস্থায় আবিষ্কার করে মেয়েটি উঠে বসতে চায়। মাইকেল বাধা দেয়।—জোরা গেট আপ। শীখ, এ্যালকোহল প্লিজ। গাড়ি থেকে এ্যালকোহল নিয়ে আসে শীখ। খানিকটা খাইয়ে দেয় মেয়েটিকে।

। থ্যাংকস্। —মেয়েটি উঠে বসে।

: আমাকে নয়। ধন্যবাদ ওর খাওনা। - মাইকেল শীখকে দেখায়।—ও বাঁচিয়েছে তোমাকে।

: আপনার কে আছেন এখানে?—প্রশ্ন করে শীখ।

। কেউ না। এলোন।

সি-বিচ কাউন্টার থেকে কিনিস্ আনতে যায় মেয়েটি। মাইকেলের পরামর্শে শীখ ওর সঙ্গে যায়। ..... একটু পরেই ফেরে দু'জনে। শীখের কাছ থেকে মাইকেল জানতে পারে যে, মেয়েটির নাম লেনা।

: দেখুন তো কতো কষ্ট দিলাম আপনাকে। —লেনার কণ্ঠে বিনয়।

: কোথায় উঠেছেন। চলুন পৌঁছে দিই। — শীখ উদারতা দেখায়।

: উঠেছি তো হোটেল সিন্ধিতে।

: ওখানেই তো ছিলাম আমরা আজ সকাল পর্যন্ত। কদিন থাকবেন বুঝি? - শীখ গায়ে পড়ে আলাপ জমায়। মাইকেল চটে যায় মনে মনে।

: না, না। আজই ফিরবো ত্রিপোলী। - - লেনা বলে।

: ত্রিপোলী? আমরাও তো ত্রিপোলী ফিরে যাচ্ছি এখন। আপনার কি নিজস্ব গাড়ি আছে? — শীখ প্রশ্ন রাখে।

হাসতে হাসতে বলে লেনা, — নিজস্ব গাড়ি। কোথায় পাবো?

: তা হলে চলে আসুন আমাদের গাড়িতে। — আমন্ত্রণ জানায় শীখ।

। না, না। এমনিতেই কষ্ট দিয়েছি আপনাদের।—একটু চুপ করে লেনা আবার বলে, হয়তো বিশ্রামাদারের অসুবিধা হবে।

এরপর মাইকেলকে কথা বলতেই হয়। সে গম্ভীর স্বরে বলে, - হ্যাঁ, অসুবিধে অবশ্যই হবে। বিশ্রামাদার তো তোমাকে এতোটা পথ কাঁধে করে নিয়ে যাবে। — নিজের কথা শেষ করে মাইকেল হেসে ফেলে। লেনা ও শীখ সেই হাসিতে যোগ দেয়।

হোটেল সিন্ধি থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ে ত্রিপোলীর পথে। স্টীয়ারিং মাইকেলের হাতে। পাশে শীখ। পেছনের সিটে সামান্য লাগেজ নিয়ে বসে লেনা।

(ক্রমশ)

পিঁপড়ে

গোপীনাথ মোহান্তি

অনুবাদ সমুদ্র ঘোষ

ধীরে ধীরে দু'টো পা এগিয়ে চলেছে। দু'খানি ক্লান্ত চরণ। একটার পেছনে আরেকটা। পায়ের পেশী ছিঁড়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ির ঘা। মাথার হ্যাট থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে, যেমন ক'রে গাছের পাতার থেকে টপ্ টপ্ ক'রে শিশির পড়ে। পরনের শার্ট-প্যান্ট ঘামে ভিজে জবজবে। তবু শরীরটা এগিয়ে চলেছে, যেন বাতাসে ভরদিয়ে। সামনেই পাহাড়ের চূড়ো, রমেশ থামল।

অনেক-অনেক নীচে জমাট বাঁধা অন্ধকারের মতোই বড়ো বড়ো গাছের জঙ্গল। মনে হয় জঙ্গলটা পাহাড়ের ঢালু সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেছে। কিন্তু ওপরে ন্যাড়া মাথার মতো ঘাসের পাড় বসানো পাহাড়ের মাথাটা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। চারদিক ঘিরে আছে নির্মল নীল আকাশ।

পাহাড়ে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। বড়ই কষ্টের। রমেশ নিজেকেই মনে মনে বলল। কিন্তু একজন তরুণ অফিসার হয়ে তার বয়োজ্যেষ্ঠ সহযাত্রীদের এই কষ্টের কথাটা সে কি করে বলে। কাজেই সে তার পায়ের ব্যথা কেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে ধীরে ধীরে ঢেলে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল, যেন ইচ্ছাশক্তির জোরেই সব ব্যথা সে কেড়ে ফেলবে। সঙ্গীদের উদ্দেশে একটু জোর করেই বলল, 'কি, এরই মধ্যে সব হাঁফিয়ে পড়লে দেখছি! তারপর সে তার ক্লান্ত শরীরটা কোনমতে টেনে নিয়ে চলল এবারো-খেয়ালে ছুঁচোলো পাথর ডিঙিয়ে।

নীচের থেকে তার চালবাজী বিনু ছুটে আসতে বেল ইঞ্জিনের মতো শ্বাস ফেলতে ফেলতে। যতই সে ওপরে উঠছে ততই তার মাথার পাগড়িটা মস্ত বড়ো একটা মোটা রঙের ব্যাঙের ছাতার মতো ক্রমশঃ উঁচু হচ্ছে।

গাঢ় কালো রং, গাট্টাগোট্টা চেহারা, কানে ও নাকে সোনার নাকড়ি, কাঁধে বন্দুক, গলায় ঝোলানো ফ্লাস্ক, এই হ'ল বিনু। সে ওপরে উঠে এল, রমেশের পেছনে সাইনবোর্ডের মতো এসে দাঁড়ালো।

পাহাড়ের তলাই অঞ্চল থেকে একটা সমবেত সঙ্গীতের ধ্বনি থেকে থেকে ভেসে আসছে 'বেইলে, বেইলে,' এক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর সুরটা কানে আসছে।

লম্বা ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে সেটা আস্তেই মনুষ্য মূর্তি বেরিয়ে এল এবং হ'ল সেন্স উপজাতির মানুষ পরনে কমদামে মোটা কাপড়। তাঁদের সঙ্গে কুড়ি বেঁধে কাঁধের দুই প্রান্তে তা ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে, এইভাবে একটা ভারসাম্য বজায় করে বয়ে নিয়ে চলেছে

গান শেষ হ'ল। বিনু চেঁচিয়ে উঠল, 'যতসব অলসের ঢেঁকি, শিগগির পা চালিয়ে আয়। —যতই এদের বকি ঝকি, এরা সেই পেছুতেই পড়ে থাকবে।'

তাদের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আমরা বাপু বুড়ো মানুষ'। তারপর হো-হো করে সমবেত হাসির হুররা।

এরপর তারা একজায়গায় পা ছড়িয়ে বসে বাড়ির তৈরি বিড়ী খেতে লাগল।

বিনু ফ্লাস্ক থেকে তার সাহেবকে চা ঢেলে দিল। একটা অমলা গাছের তলায় বসে গায়ে চুমুক দিতে দিতে রমেশ জিজ্ঞাসা করল, 'এ রাস্তায় তুমি কোনদিন আগে এসেছ বিনু।

—হ্যাঁ, স্যার, অনেকবার। শেষ এসেছিলাম দু'বছর আগে, তার আগে তো অনেকবারই

একটি।

—এর আগে কি জন্য কোন অফিসার এ রাস্তায় এসেছেন?

—হ্যাঁ স্যার, অনেকেই এসেছেন স্যার। এটা তো স্যার হাটে যাওয়ার রাস্তাতেই পড়ে।

শুনে রমেশ খানিকটা থ'মে গেল। ছোটবেলা থেকেই তার মনোগত অসন্না ও আনন্দের কেন্দ্রে ছিল এই অনুভূতি যে আমি সবার চেয়ে এবং সব দিক থেকে বড়ো। আমি থাকব সবার চেয়ে এগিয়ে, কারও চেয়ে আমি কোন দিক থেকেই ছোট নই। তারপর দীর্ঘ সংগ্রাম, বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে ক্যারিয়ার সৃষ্টির এক সফল ইতিহাস। বালেশ্বর জেলার উত্তরাঞ্চলের এক অজ পাড়া গাঁয়ের গরীব ঘরের ছেলে ধীরে ধীরে কি ক'রে বর্তমানের এক উচ্চপদস্থ অফিসার পদে উন্নীত হ'ল সে এক দীর্ঘ বন্ধুর পথ পরিক্রমার ইতিহাস। স্কুল থেকে কলেজ, জীবনের নির্মম দৌড়ে বন্ধুদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া, তারা আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। তারপর ছাত্রবৃত্তি, মেডেল, পুরস্কার, একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে শুধু ওপরে ওঠার ইতিহাস। তারপর এই চাকুরী। নতুন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয়, দিনরাত লোকের ভিড়ে পরিবৃত হয়ে থাকা, চাপরাশীদের সেলাম, বীমা কোম্পানীর লোকেদের বিনয়-বিগলিত অনুরোধ, উপরোধ, একের পর এক বিবাহ-প্রস্তাব আসা—এইভাবে এই জগৎ তার প্রতি বড়ই মনোযোগ দিয়েছে, তাকে সম্মানিত করেছে।

সেই চাকুরিজীবনের গোড়ার দিকে সাফল্যের জন্য যে লড়াই এবং নিজের কাছে নিজের যে গুরুত্ববোধ বা আত্মগৌরব তা আজ রীতিমত আত্মবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। নিজেকে আজ তার একটা কেউকেটা মনে হচ্ছে। তার চারিদিকে যে মানুষেরা ভিড় ক'রে থাকে তারা আজ তার দেদীপ্যমান ব্যক্তিত্বের ধূসর পটভূমিতে পরিণত।

কিন্তু জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আজো কেন এত অস্বস্তি! তার আগেও তো কত লোক এই পথে হেঁটে গেছে তাদের পদচিহ্ন রেখে। তুলনায় তাদের কাছে নিজেকে বড় তুচ্ছ, ক্ষুদ্র মনে হয়। তবে আজ পর্বতে আরোহণ করার সময় এইটুকু ভেবে মনে মনে সে তৃপ্তি পেল যে সভ্যজগৎ থেকে সে-ই বোধ হয় প্রথম ব্যক্তি যে এইপথে এইভাবে পায়ে হেঁটে চলেছে। কিন্তু এখন তার সেই কাল্পনিক আনন্দটুকুও যেন তার হাতের মুঠোয় চলে যাচ্ছে। বিনু এর মধ্যেই তার সেই আগেকার সাহেবের পাগড়ি-চূড়ায় ঊনু কাটিয়ে পাঁচদিন বসবাস করার গল্প বলে যাচ্ছে। জীবজন্তু শিকার, হাসি-আনন্দ, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়; জায়গাটা কয়েকদিনের জন্য যেন শহরের মতো জমজমাট হয়ে উঠেছিল।

সে ছিল এক দিন। কতমানুষ এসেছে, কতমানুষ চ'লে গেছে। জায়গাটা শুধু সেই চিরকালের অন্ধকার নিয়ে আগের মতোই রয়ে গেল। বিনু বলল, 'কিন্তু আগের সে ঘর নেই স্যার, সে সব জন্তুজানোয়ারও নেই। গোপরা সব সাফ ক'রে দিয়েছে। তারাও নেই। এইখানেই ছিল গোপদের গ্রাম। নিত্যি নিত্যি গ্রামে বাঘের হামলা হ'ত। তাই গ্রাম ছেড়ে তারা পালিয়েছে'।

—এখন তাহ'লে জঙ্গল নেই বলছ? এতগুলো তাঁহলে কি?

—হ্যাঁ, কেটে নেওয়া গাছগুলো আবার গজিয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু সে জঙ্গল? সে তার হবেনি স্যার।

কল্পনার চোখে রমেশ দেখতে পাচ্ছে সীমাহীন মানুষের গোত্তাযাত্রা, অগণিত জনপ্রবাহ কত-কতকাল থেকে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কখনও গভীর বনের অভ্যন্তরে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী নদীটা তাদের দুরন্ত যৌবনের স্মৃতি বহন করে চলেছে, সে আজও শুকোয়নি। আজও সে নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে কলকল শব্দে বিরামহীন বয়েই চলেছে।

হঠাৎ তার মনের গভীরে কি এক অজানা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক-প্রতীতি ঠেলে উঠে তার এতক্ষণকার আত্মলালিত পৃথক সত্তার উগ্র অস্তিত্বটাকে যেন একেবারে ভোঁতা করে দিল এবং অন্তহীন নদীপ্রবাহের সঙ্গে যেন তাকে একাকার করে মিশিয়ে দিল।

ছড়িয়েপড়া বিন্নুটের ওঁড়োর চারদিকে এক দল পিঁপড়ে সারি দিয়েছে। রমেশ চকিত হয়ে নিজের মনেই বলে উঠল, এখানেও পিঁপড়ে? এখানে আসার যে মূলীভূত কারণ ও গূঢ় উদ্দেশ্য এবার সে-কথা তার মনে পড়ল। সে বিনুকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বলছ, আমরা তাহলে চাল পাচার কারীদের ধরতে পারব তো?'

—নির্ঘাৎ পারব স্যার, অবশ্যই পারব স্যার। যে পথেই পাচার কারীরা যাক না কেন, এই কাল্‌পাওয়ালাসার ঘাট হয়ে তাদের যেতেই হবে। এখন সবে দশটা বাজে। পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গেলে আমরা বেলা দুটোর মধ্যেই ঘাটের কাছে পৌঁছে যাব স্যার। তারপর ব্যাটারা কোনদিকে পালায় দেখি। সব ব্যাটাকেই হাতে নাতে ধরে ফেলব স্যার।

—ভাল কথা, তাহলে আর দেরী না করে চল রওনা হওয়া যাক।

এই উঁচু জায়গাটায় একটুও জিরোবার সুযোগ না পেয়ে বিনু মনে মনে বিরক্ত হ'ল। গোপদের উদ্দেশে চীৎকার করে সে তাদের তল্পিতল্পা রওনা হ'তে বলল। গোপরাও মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে ব্যাগে গজ্‌গজ করতে লাগল। একটুও জিরোবার উপায় নেই বাপু। শুধু দৌড়ও, আরও জোরে দৌড়ও। তাদের উদ্ভট ও দুর্বোধ আদিবাসী ভাষায় তারা বিনু ও তার ছোদপুরুষের উদ্দেশে গালাগাল করতে লাগল। তারা ভাবলো, এই লোকগুলো শুধু জানে হুকুম করতে—জল আনোরে—জ্বালানি আনোরে—মোট বস্তু রে—শুধু হুকুম করার কয়েকটি বুলি এরা শিখে রেখেছে। আমাদের যে শুধু গালাগাল দিয়েই যাবে, এতে এ্যানাদের কোন দোষ নেই।

গোপরা নিজেদের মধ্যে কলরবলি করতে লাগলো—এই লোকগুলো কি বোকা হাবো, এরা কিনা এসেছে বর্ষার দিনে যারা চাল পাচার করে তাদের ধরতে। আরে বাবা, খিদে হল গিয়ে সর্বাইকার ব্যাপার, কার না খিদে পায়? আর যা'র খিদের চাল দরকার সে যেখান থেকেই কিনুক, তার কেনবার হক আছে। এতে পাপটা কোথায়? পাপ কিসের? আর এই যে, ধান-চাল, এসব ফলায় কারা? না, কি, এদের জন্য আলাদা আইন আছে? যে আইনে মদ চোলাই করা পাপ, চুরি করে বনের গাছ কাটা পাপ, তেমনি কি খিদের অন্ন জোটানোও পাপ? সারা দিনমান ভারি ভারি মোট বয়ে বয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু জিরোতে চাওয়াও পাপ? নাঃ আর বলার সময় নেই, ব্যাটা চাপরাশি বকাবকি শুরু করেছে। সাহেবও তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করেছেন।

কাজেই গোপরা উঠে পড়ল। উঠেই গান ধরল। তাদের এতক্ষণকার যাবতীয় অভিযোগ গানের ঘুরার মধ্যেই আত্মগোপন ক'রে শেষপর্যন্ত হারিয়ে গেল।

সামনে গভীর বন বন। উপত্যকা ধরে নীচে নেমে গেলে সামনে শুরু হল সুড়ঙ্গের মতো সরু একটা রাস্তা। এই পরিবেশে গোপদের সমবেত গান শুনে রমেশের মনটা খুশিই হ'ল। গানটা শুনতে বেশ ভালোই, কি মোলায়েম শান্ত সুর।

কিন্তু এর মানে কি? হয়তো এটা এই আদিবাসী গোষ্ঠীর লোক-রীতি।

—বিনু, রমেশ চীৎকার করে উঠল। মনের মধ্যে তিক্ততা ও উপরে-ওঠা গালাগাল কোনমতে চেপে রেখে বিনু দৌড়ে এল। বিনুর এখন পঞ্চাশ বছর বয়েস, ছাতা দাঁত নেই, মাথায় টাক পড়তে শুরু হয়েছে, এই বয়সে শরীরটা চায় একটু আরেসী পদক্ষেপ, একটু আরাম, একটু শান্তি। কিন্তু এই ছোকরা অফিসার সবাইকে খাড়া তাড়া লাগাচ্ছে। নিজে পাগলের মতো দৌড়চ্ছে, অন্যকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি।

বিনুর বাড়িতে খাওয়া-পরার অভাব নেই। এ কাজটা তার না নিলেও চলত। কিন্তু ক্ষমতা—খ্যাম্‌তাটা চাই, খ্যামতা না থাকলে তার রইল কি। তার মতো তুচ্ছ লোকেদের সে যে এতকাল ধরে খাইয়ে পরিয়ে আসছে সে তো তাদের মতোই এক নগণ্য ব্যক্তি হয়ে রেত! তাই ক্ষমতার যাদুটা যাতে হাতছাড়া না হয় সেই ভয়েই সে কি একটা ভয়ংকর টানে এই বয়সেও ঘর ছেড়ে বনে-পাহাড়ে ঘুরতে বেরিয়েছে।

—বিনু, কি সুন্দর গান করে এই লোকগুলো, তাই না?

—হ্যাঁ, স্যার। খুব সুন্দর।

—কিন্তু এর মানে কি?

মাথার পাগড়ীটা এদিক ওদিক সরিয়ে ঠিকমতো বসিয়ে নিয়ে মুখের ভেতরকার পানটাকে আরও একটু চিবিয়ে নিয়ে বিনু প্রশ্নের মতো জানালো, 'এ হলো গিয়ে ওদের টৈতালি পরবের গান'।

—কিন্তু এর মানেটা কি?

—এ হলো সেই ড্যাংড়ো-ড্যাংড়িদের পুরোন গল্পো স্যার, তাদের ভালোবাসার গল্পগুলো।

—এরা কি সব সময় এই গান করে?

—হ্যাঁ স্যার, সারাক্ষণই এই গানই করে স্যার।

—'বেইলে বেইলে' মানে কি ফুইফুল?

—ঠিক ধরেছেন স্যার, এইভাবে আপনি, স্যার, ওদের ভাষা খুব তাড়াতাড়ি শিখে যাবেন, স্যার।

বিনুর জবাবে রমেশ খুব খুশি হ'ল। জিজ্ঞাসা করল, 'এরা বুড়ো বয়সেও কি এই গান গায়?

—আমাদের এই দেশে স্যার, কেউ বুড়ো হয়না স্যার।

রমেশ মনের মধ্যে ধ'রে রাখল, 'বেইলে' মানে ফুইফুল, আর গোপরা শুধু প্রেমের গান গায়।

রমেশকে বোকা বানিয়ে বিনু মনে মনে খুব খুশি হ'ল।

দেশল শ্রমিকেরা তখনও পাহাড়ী পথ চলতে চলতে তাদের দুঃখের গান গেয়ে যেতে লাগলো। তাদের দুর্ভাগ্যের অফুরন্ত গাথা। কিন্তু রমেশ ও বিনু জানতেই পারলোনা যে সারাক্ষণ ধরে তাদের দুর্বোধ্যভাষার সেই গানের মাধ্যমে সাহেব ও ফোরা চাপরাশির উদ্দেশে তারা রীতিমত খিস্তিখেউড় ও গালাগালি চালিয়ে গেল।

পথে একদল গোন্ড উপজাতির লোকেদের সঙ্গে তাদের দেখা হল। তারা নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি করল, তারপর তারাও সেই 'দুঃখের' গানের সঙ্গে তাদের গলা মেলাল। কারণ তারাও যে একই দুঃখ দুর্ভাগ্যের সমান অংশীদার। গানের মধ্যকার বিষণ্ণতাটুকু তারা বেশ সহজেই ধরে ফেলল।

গানে একটু ভাঁটা পড়লে বিনু চীৎকার ক'রে উঠল, বলল আবার গান ধরতে।

আমাদের দেশে কেউ বুড়ো হয় না, সাহেবকে বলা বিনুর নিজের কথাটাই এই মুহূর্তে তার নিজের কাছে নতুন অর্থ-তাৎপর্য নিয়ে যেন মূর্তি ধারণ করল। ঘরে সে তার যুবতী স্ত্রী রেখে এসেছে। মনে পড়ল এ তার তৃতীয় পক্ষ। অনেক আশা করে অনেক কন্যাপণ দিয়ে তার মা-বাপের কাছ থেকে তাকে কিনিয়ে আনতে হয়েছে। এই জঙ্গলের রাজত্বে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে জোর জুলুমের ওপর। জোর করে কোন জিনিস কিনিয়ে না নিলে তাকে আয়ত্ত করা যায় না। এক্ষেত্রে মানুষ পশুকেও কখনও কখনও হারিয়ে যায়। কিন্তু বিনুর জীবনে একটি দুঃখ ও অপূর্ণতা আছে। তার কোন সন্তান নেই। কৌশল ও চালাকি দিয়ে সে অপূর্ণতা ও হতাশাকে ঢেকে রেখেছে। তার আছে ফলের বাগান, চাষের জমি, ঘরবাড়ি, গরু-বাছুর—সব থেকেও তার জীবন শূন্য, কারণ তার কোন সন্তান নেই। বয়স যতই বাড়ছে ততই এই শূন্যতা সে বেশি বেশি করে বোধ করে। ছোট বউয়ের কথা মনে হতেই ভাবল অন্য দুই বড় বউ তার ওপর না জানি কেমন ব্যবহার করছে।

এদেশে কোন স্ত্রীলোক যদি তার স্বামীকে নিয়ে সুখী না হয় তবে অনায়াসে তাকে ছেড়ে যেতে পারে।

হঠাৎ তার দূর সম্পর্কের এক নাতি বিশির কথা মনে হল। সেও নতুন চাপরাশি হয়েছে। মাঝে মাঝে সে তার বাড়িতে এসে হাজির হত আর নতুন ঠাকুমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কি ও খুটিনাটি করতো।

—'বিনু'

—'স্যার'

—এটা কি করে সম্ভব যে এই যে চাল পাচার হচ্ছে তা আগে একবারও ধরা পড়েনি? মাদ্রাজ বর্ডার পেরিয়ে যে-চাল পাচার হচ্ছে সেগুলো নিশ্চয়ই কোথাও জমা হচ্ছে। আর সেখান থেকে ব্যবসাদাররা তা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ধরো, ফোরাপুট থেকে এই যে চারদিন ধরে পাহাড় ভেঙে বনজঙ্গল পেরিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি, কোথাও তো তেমন কিছু চোখে পড়ল না। ব্যাপারটা কি বলো তো?

—'এটা ধরা পড়তো যদি বড়া বড়া চাল চালান হ'ত।'—বিরক্তির সঙ্গে কথাটুকু বলেই বিনুর মনে পড়ল সে নিজে একবার কয়েকশ'মন চাল পাচার করেছিল এবং বেশ চড়া দামেই বেচে দিয়েছিল। তা'র বিশ্বাস যে এই সমাজে তার যার নিজেরটা নিজেকেই যোগাড় করতে হবে, একজন আর এক জনেরটা কেড়ে খাচ্ছে, একে অন্যকে ঠকাচ্ছে এবং তাদের ঠকিয়েই নিজেরা ফুলে ফেঁপে উঠছে, এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে যার যার অধিকার। যেখানে নিজের স্বার্থের জন্য আইন ভঙ্গ করা যায় এবং শাস্তির কোন ভয় থাকে না, সেখানে এই স্বার্থপর নীতির ফল যা হবার তা তো হবেই। সে ভাবল।

কথাটার মোড় ফেরাবার জন্য সে বলল—না, একটা লোক আলাদাভাবে খুব বেশি চাল পাচার করতে পারে না স্যার, হাটে গিয়ে দেখবেন, ছোট ছোট থলের আসে পাহাড়তলী থেকে, তারা বড় জোর দশ-বিশ সের চাল কেনে স্যার। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে মাদ্রাজ বর্ডারে গিয়ে দেখবেন স্যার, সেখানে সারি সারি গরুর গাড়ি, বড় বড় চটের বস্তা আর জালাভর্তি টাকা নিয়ে ব্যবসাদার-রা সব বসে আছে স্যার। তারপর গাড়ি-ভর্তি চাল যাবে বিশাখাপত্তনম্, পার্বতীপুর ও অন্য অন্য জায়গায়। ব্যবসাদাররা, স্যার, ব্যাবসার খাঁতঘোঁত খুব ভালো বোঝে স্যার।

রমেশ গম্ভীর হল।

—ব্যবসাদারদের হাতে চাল পৌঁছে যাবার আগেই আমাদের ধরে ফেলতে হবে।

তার চোখে শিকারীর মতো এক অদ্ভুত তীব্র তীক্ষ্ণ আলো জ্বলে উঠল। একটি মাত্র চিন্তা তাকে বিদ্ধ করছিল। ভাবছিল অন্যেরা কেন আমাদের চাল চুরি করে নেবে। যদি মনে ভাবে এ হল ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ। যে করেই হোক এটা বন্ধ করতেই হবে।

'আমাদের চাল' কথাটুকুর মধ্য দিয়ে সে সচেতন ভাবেই এই কথাটা বোঝাতে চাইল যে সে একজন উড়িয়া, তার পশ্চাতে রয়েছে উড়িষ্যার অতীত ইতিহাস, কত বড় বড় যুদ্ধজয়, রাজ্যজয়, কত সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস—সবই অন্যের ঐশ্বর্যের বিনিময়ে।

অতীতের ধূলিস্তূপ ও ভগ্ন ইঁটের স্তূপ থেকে তার মন ফিরে এল বর্তমানের অবক্ষয়ের রূপে এবং এর জন্য তার মতে দায়ী হ'ল প্রতিবেশী রাজ্য সমূহ। তারাই এই দেশটাকে লুটে পুটে শেষ করেছে। এখন শুধু পড়ে আছে ছিবড়ে। এ দেশের আর কি কিছু হবে? মনে মনে সে নিজেকেই এ প্রশ্ন করল।

এবার তার মনে হ'ল নীচের ওই পাহাড়ী রাস্তায় আজ তাকে শিকার ধরতেই হবে। চাল পাচারকারীদের ধরার নেশা তাকে পেয়ে বসল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে উঠল—

'একবার যদি ধরতে পারতাম। তবে—'

তবে কি করতো তা অবশ্য সে জানে না। পর্বতের ঢালু বেয়ে সে নামতে লাগলো।

তখন শীতের শেষ। হাঁটার ক্লান্তিজনিত গরম ভাবটা কমতেই আমেজ নিয়ে এল। গায়ে গায়ে নতুন পাতা ও ফুলের সমারোহ। পর্বতের ঢালু অংশের নীচে একটা ছোট্ট গ্রাম, আমগাছের সারি, ধানের ক্ষেত, ধান মাড়াইয়ের উঠোন, আর সারি সারি কয়েকটা বাড়ি। রাস্তার মাঝখানে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে। হাঁ করে আগন্তুকদের দেখছিল। দেখেই 'মা-মা' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল। তারপর দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। এই হ'ল ওর। দড়িতে বাঁধা বাছুর গুলো ঘাস খাচ্ছিল। দড়িটা খোঁটায় গোড়া ছিল। তারাও হঠাৎ হাম্বা হাম্বা করে ডেকে উঠল। মেয়েরা যারা বাইরে ছিল সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল এবং ড্যাবডেব শূণ্য দৃষ্টিতে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল।

একে একে গ্রামের লোকেরা এসে জড়ো হ'ল। রমেশের কাছে এটি ত পরিচিত দৃশ্য। তার কাছে অজানা নয়। তার পায়ে ততক্ষণে টান ধরেছে, একটা বড়ো গাছের ছায়ার মতো মেলে ধরা ছায়ার নীচে সে গিয়ে দাঁড়ালো এবং পিছন ফিরে তাকাল। তার পেছনের পাহাড়টা পঞ্চের বিরাট একটা দৈত্যাকার প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বিনু হাঁফাতে হাঁফাতে নেমে আসছে আর তার পেছনে পেছনে গোন্দরা যেন দৌড়ে আসছে।

—এখানে একটু খাবার জল পাওয়া যায় না, বিনু?

—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে স্যার। বিনু সদা প্রস্তুত। সে মোট ঘাটের বাঁধন খুলে একটা গ্লাস ও লোটা বার করল, তারপর গ্রামের দিকে ছুটল। গোন্দরা একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে মাটিতে বসে পড়ল। রমেশ জলের জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময় মুহূর্তের মধ্যে একটা চারপাই এসে গেল। একজন লোক একটা লোটাভর্তি গরম দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশেই একজন একছড়া পাকাকলা নিয়ে দাঁড়িয়ে। ওড়িয়া ও তেলেগু মেশানো এক ধরনের ভাষায় তারা বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে স্যার। সূর্যি মাথার ওপরে। আজকের মতো এখানে থেকে যান, খাওয়া দাওয়া করুন। বিশ্রাম নিন। নইলে গ্রামের লোকেরা খুব দুঃখ পাবে।'

বিশ্রাম! রমেশ হাসল। সারা পথ জুড়ে এই একই আমন্ত্রণ, আপ্যায়ন। অনেপাহাড়ে চলতে গেলে মানুষকে বোধ হয় এমনি করেই একে অপরের ওপর নির্ভর করতে হয়।—এখানে একটু থামুন, আমাদের গাঁয়ে আজকের রাতটা থেকে যান ইত্যাদি। পরিচিত গাছ-গাছালির ছায়া, আবছেলা ঢালা ঘরের চাল থেকে কুণ্ডলায়িত ধোঁয়ার রেখা, নরনারীর দিনানুদৈনিক জীবনযাত্রা—সর্বত্রই একই ছবি। বনে পাহাড়ে যেখানেই যাও সর্বত্রই সেই মানুষ, সেই পরিচিত মানুষের পৃথিবী।

কিন্তু থামলে তো চলবে না, তাকে এগিয়েই যেতে হবে। গ্রামের সেই স্নেহপূর্ণ আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করলেও সেই আহ্বান একটা মিষ্টি গন্ধের মতো কিছুক্ষণের জন্য বিরাজ করতে লাগলো, তারপর পাহাড়ী পথের উদাস-উদাসীন বাতাসে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

বিনু জল নিয়ে এল। রমেশ এক নিঃশ্বাসে সবটা জল খেয়ে ফেলল। বলে উঠল, চল, এবার যাওয়া যাক।

এমন সময় কোত্থেকে এক বুড়ী এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। তার কালজীর্ণ জরাগ্রস্ত মুখে একটুকরো হাসি। সে বলল, 'বাবা, এই অবেলায়, কিছু না খেয়ে যাবে কি করে? তোমার নিজের মা হ'লে কি তোমায় এমন করে যেতে দিত? গাঁয়ের বাড়িতে তোমার কি মা-বোন নেই?'

সবার মুখ মৃদু হাসিতে ভরে গেল। বুড়ি ছিল গোন্দ-ভোরা জাতের মেয়ে, গোন্দও তেলুগু সংকর প্রজাতি বিশেষ।

রমেশের রোদে পোড়া চোখে হঠাৎ যেন একরাশ স্নিগ্ধ শীতল ছায়া ঘনিয়ে এল। কিন্তু মুখটা ভুলে সে নিজেকে বোঝাতেই যেন বলে উঠল, 'না, না, আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে। অনেক কাজ বাকি।'

নিজেকে সে জোর করে টেনে নিয়ে চলল। কিন্তু সেই বুড়িটার মাতৃ-মুখের স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়া তার মনের মধ্যে লেগেই রইল। সকল মায়ের চোখের মতোই সেই চোখদুটো হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুরে দৃষ্টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং চিরন্তন মায়ের শ্রী-বত্সলাই তার সেই মুখে যেন শোনা গিয়েছিল। সে মায়ের জাত নেই, ধর্ম নেই, ভাষা নেই, সে শুধু মা। কিছুক্ষণের জন্য সে তার কাজের গাফিলত্ব ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু বেই দেখতে পেল একদল লোক মাথায় চালের বস্তা নিয়ে হাটের পথে সারি দিয়ে চলেছে, তখনই সে বুড়িটার কথাগুলো ভুলে গেল।

—বিনু, ছাটটা কত দূরে?

—আজ্ঞে, এই তো সামনেই। আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, স্যার। ঊদ্দিয়ার, কোন শব্দ নয়, চেঁচামেচি নয়, সব চুপ।' —এই বলে বিনু গোন্দদের সাবধান করে দিল। কাজ বন্ধ করে চুপচাপ এগিয়ে যেতে বলল।

এইবার শুরু হল সত্যকর শিকারীর মতোই বনের পথ ধরে নিঃশব্দ, সাবধানী পদক্ষেপ। বাইরে প্রকৃতির রাজ্যে গভীর নৈঃশব্দ্য ও উমার শান্তি, কিন্তু তাদের বুকের মধ্যে যেন তুমুল অশান্তি ও অস্থিরতা ঠেলে ঠেলে উঠছে। পরিকল্পিত কাজের লক্ষ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে রমেশ যেন দৌড়ে চলেছে। চালপাচার শুধু আজকের জন্য সে বন্ধ করবে না। এর চিরস্থায়ী প্রতিকার হিসাবেই সে তার রিপোর্ট গভর্নমেন্টের কাছে জমা দেবে। এতে তার সুনাম, প্রমোশন ও স্বীকৃতি যেমন জুটবে তেমনি দ্রুত উচ্চপদে ওঠার সিঁড়ির কাজও করবে। এ যেন পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য প্রাইজ এবং বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার পাওয়া। সে ভাবল এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা তার অবশ্যই আছে।

কালো আফ্রিকার আদিবাসীদের উৎস সন্ধানে লিভিংস্টোনের অভিযানের মতোই সে কি বর্ডার ডিঙিয়ে চালপাচারকারীদের মূল আস্তানা আবিষ্কারে তৎপর নয়? ব্যাপারটার সুষ্ঠু সুকৌশলী ও সুদক্ষ সমাধানের পরিকল্পনায় মনে মনে সে নিজেই নিজের কাছে অভিভূত হয়ে পড়ল।

সামনে একটু দূরে রাস্তার ধারে এক গাছের তলায় একটি পরিবার তাদের খাবার খেতে বসেছে। একটা ছোট্ট বাচ্চা মাটির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আকাশের দিকে মুখ করে তার কাঠির মতো হাত-পা নেড়ে তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। তার কর্কশ কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চীৎকারে নিঃশব্দ নীল আকাশের বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। ছেঁড়া খোঁড়া কম্বল জড়ানো মাথায় একঝোকা এলোমেলো উসকোখুসকো চুল, জীর্ণশীর্ণ চেহারার এক নারী পাতার থালায় সবে তার ভাত নিয়ে বসেছিল। ভাত ফেলে হাত না ধুয়েই সে উঠে পড়ল। ছেঁড়া খোঁড়া কম্বলে তার বুকদুটো ঢেকে দৌড়ে এসে বাচ্চাটার মুখে মাই গুঁজে দিল। ওকনো বুক দুটো ছেঁড়া কম্বলের মতোই ঝুলতে লাগলো। বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেই সে আগন্তুকদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। যেন কোন মানুষ নয়, শুধু এলোমেলো একরাশ চুল এবং দুটি বড় বড় উদাসী চোখ। আর কিছু নয়। সে দুটি চোখে বহির্জগতের কোন সংবাদের জন্য কিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই, সংসারে কে কত বড় দরের লোক তা জানবার কোন আগ্রহ নেই, সমীহ বোধও নেই। বাইরের জগৎ তার কাছে অস্তিত্বহীন।

এদের কাছে বাইরে জগতে দৃষ্টিক্ষেপ করার মানেও হল প্রকৃত পক্ষে মেহের গভীরে জীবনের ক্রিয়া শক্তির মূলে যে আদিম প্রজাপতি সেখানে দৃষ্টি ফেলা। কিন্তু সেখানে রয়েছে শুধু ক্ষুধা-ক্ষুধা-ক্ষুধা, ক্ষুধার হাহাকার এবং আদিম ভালোবাসার অস্তিত্ব, যে ভালোবাসার পশ্চীমাত্তা দুই পাখা দিয়ে তার শাবককে আগলে রাখে।

লোক তিনটি তখনও আহার করে যাচ্ছে। একটা বুড়ো, একটা বুড়ি, আর তৃতীয়জন হল অল্পবয়সী বউটির স্বামী। শুধু হাড় আর চামড়া, কোটরে বসা চোখ আর মাথাভর্তি একরাশ চুল। মাঝে মাঝে চোখ গুলো চক চক করছে। পাতার

থালায় সামান্য একটু ভাত। কিন্তু এতো খাওয়া নয়, এ হল ক্ষুধার্ত কুকুরের এক নিশ্বাসে পেটে পিলে ফেলা।

পাহাড়ের তলায় কান ভাঙা কালিমাখা মাটির হাড়ি। অস্তাচলী পোড়া উনুন আকাশের দিকে হাঁ করে পড়ে আছে। সমস্ত দৃশ্যটার নগ্ন বাস্তবতায় রমেশ আহত বোধ করল।

—কিন্তু বিনু এরা কারা?

—এরা পাহাড়তলীর তেলুগু স্যার, এরকম অনেক আছে স্যার, খিদের জ্বালায় এরা বনে জঙ্গলে এমনি করেই ঘুরে বেড়ায়।

রমেশ লোক গুলোর দিকে ফিরে বলল,

—"এই, তোদের ঘর কোথায়"?

আরও বার দুয়েক একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করার পর বুড়ো লোকটি তার খাবারের থালা থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'সীমাচলম্'।

বিনু সাহেবকে বোঝাতে লাগলো যে জায়গাটা এখান থেকে প্রায় বাট মাইল দূরে। রমেশ ভাবল এককালে ওই জায়গাটা উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। ইতিহাস তার সামনে প্রথমে একটা মস্তবড়ো অন্ধকার পাহাড়ের মতো এসে দাঁড়ালো। তারপর ছোট ছোট হতে হতে ছোট্ট একটা মাটির ঢিবিতে পরিণত হল। তারপর হঠাৎ সেটি হারিয়ে গেল ওই যুবতী মায়ের অন্ধকার চোখের কোটরে যে তখনও তার সন্তানকে আদর করে কোলে জড়িয়ে ধরে বুকের দুধ খাইয়ে যাচ্ছে।

মুহূর্তে তার মনের পটে বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো ঝলসে গেল যে, জায়গাটা এখন আর উড়িষ্যার মধ্যে হয়তো নেই, কিন্তু রয়ে গেছে এই মহাপৃথিবীর অগণিত জনপদের মধ্যেই, যে পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের জীবন শুধু আদিম ক্ষুধার জন্যই চিরকাল নির্যাতিত ও নিন্দাযোগ্য হয়ে এসেছে।

—এই রকম অনেকেই, স্যার, এদের মতো আজও বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খিদের জ্বালাটাই এদের কাছে সবচেয়ে বড়ো ভয়। সেই ভয় থেকে বাঁচার জন্যে এরা এই জঙ্গল আর জঙ্গলের বাসিন্দেকেও ভয় করে না স্যার।

—ঠিক বলেছিস্ বাবা, ঠিক বলেছিস্।—গোপরা সমস্বরে বলে উঠল। তারপর তারা আরও কাছে ঘেঁষে এল। তাদের মধ্যে থেকে বুড়োটা বলে উঠল, 'যখন খিদের জ্বালা ধরে না, বাবু, তখন সবাই সমান, সবাই এক রকম। কি খিদেই না পেয়েছে রে বাপ্। হাঁ গো, চাপরাশী বাবু আমাদের চাট্টি খেতে দেবে না?'

কোন উত্তর না দিয়ে রমেশ হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে হল, যে উদ্দেশ্যে সে এসেছে তা যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। .....সে এসেছে ন্যায় বিচার করতে। কিন্তু এখন যেন সে তার মানেটা যাচ্ছে হারিয়ে। আশুতীয় সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করতেই সে এতকাল অভ্যস্ত, লিপিবদ্ধ আইন মোতাবেক সরকারের বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনেই সে এতকাল চলেছে। কোনদিন গভীরভাবে তলিয়ে ভেবে দেখেনি যে তার বাইরেও এক বড়ো সত্য, বড়ো আইন থাকতে পারে।

কখনও তার ন্যায়বোধ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকারী আইনের বিরোধ বেঁধেছে। কিন্তু এই ভেবে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে যে মোটের ওপর কর্তব্য বড়ই কঠোর। কখনও বা নিয়মবদ্ধ মেশিনের মতোই নিষ্ঠুর। অথচ তাকে যে কর্তব্য পালন করে যেতেই হবে। ক্ষুধার তাড়নায় কেউ হয়তো কিছু একটা চুরি করেছে। কারও ক্ষুধার্ত গর্ভবতী স্ত্রী হয়তো কাছারি বাড়িতে তার এক বছরের ছেলে কোলে নিয়ে বারান্দায় গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেই চলেছে আর বলছে কেউ নেই যে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কিইবা করার আছে। চোর যে সে মোটের ওপর চোর, তাকে জেলে যেতেই হবে। এই হল আইন। একটা ঘুমন্ত চুরি করার জন্যে একজনের একবছরের জেল হয়েছিল। কারণ এর আগে পাঁচবার সে জেল খেটে এসেছে।

রমেশ ভাবল কর্তব্য বড়ই কঠোর ও কঠিন। সেখানে কোন দয়া-ধর্ম-কোমলতার স্থান নেই। তাই, নতুন করে সে ভেবে স্থির সংকল্প করল যে, যে করেই হোক চালপাচারকারীদের ধরতেই হবে।

কাছেই হাটের সোরগোল শোনা গেল। বাতাসে ভেসে আসছে কাঁচা চামড়ার পচাগন্ধ। জঙ্গলের ভেতর থেকে দলে দলে লোক বেরিয়ে আসছে। কারও মাথায় বোঝা, কারও কাঁধের দু'পাশে ঝুড়ি, ঝুড়ির ভেতর থেকে ছোট ছোট বাচ্চার মুখ উঁকি মারছে। পায়ে দড়ি বাঁধা, মাথা নীচের দিকে ঝোলানো এক ঝাঁক মোরগ, অন্যান্য জিনিসপত্র, বিশেষ করে চাল। শিকার এবার হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে, বুকের মধ্যে একটা ধুক্-ধুক্ শব্দ অনুভব করল রমেশ। পাথরের খাঁজ বেয়ে দৌড়ে নামতে নামতে রমেশ চীৎকার করে উঠল, 'বিনু, আমরা ওদের এবার হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি।

সামনেই হাট। লোকের ভিড়। লোকগুলো জড়াজড়ি গুঁতোগুতি শুরু করে দিয়েছে সারিভাঙা একদল শিপড়ের মতো। নানা রঙের বিচিত্র দৃশ্য, নানা রকম গন্ধ। আর গুণ গুণ গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কাঁচা চামড়ার বদ গন্ধে বাতাসটা দমবন্ধ করা ভারী। চারিদিকে সারিসারি ছাউনি মাছের দোকান। মাছির ভন্‌ভন্। মানুষ গুলোও যেমনি। কাছেই বন জঙ্গল থেকে বাতাসে ভেসে আসছে। একদিকে কুষ্ঠরোগী ও পচাটে ঘা-ওয়ালা রোগীর ভিড়, ক্ষুধুরের দগ্‌দগে ঘায়ের মতো ঘা, তা থেকে রস গড়াচ্ছে। কালো কালো ছোট ছোট পোকা এসে তাতে বসেছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যবান পুরুষ ও স্বাস্থ্যবতী নারী সেই ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে চলেছে। এই হল হাট বা বাজার।

হঠাৎ রমেশের চোখে পড়ল অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী মেয়ে, চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং এবং যৌবন-পুষ্ট দেহের বাঁজ গুলোও চমৎকার। কিন্তু তার এক গালে এক খাবলা সেই পচাটে ঘা। অন্য গালটা লাল টুকটুকে। কিন্তু সে গালেও ঘা শুরু হয়েছে। তবু মেয়েটি খুব সেজেছে। গায়ে মাথায় ফুল পরেছে, আর মুখের ভেতর মচ্‌মচ্ করে কি যেন চিবোচ্ছে। বেশ ছন্দোময় ভঙ্গিতে সে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। চোখের কোণে এমনভাবে তাকাচ্ছে যে একটা দুষ্টু দুষ্টু হাসির আভা ফুটে বেরোচ্ছে। মনে হচ্ছে লীলাচ্ছলে জগৎকে যেন ডাকছে।

হাটের ঠিক মাঝখানে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রমেশ তার চোখ দুটি বন্ধ করল; তার দুই কানে শব্দের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। কিন্তু মনের মধ্যে সে দেখতে পাচ্ছে সেই সুন্দরী যুবতীর গালের দগ্‌দগে ঘা।

পাহাড় চূড়োয় তখন গোল বালকদের নাচ শুরু হয়েছে।

রমেশ জানতে পারল যে এই ঘনবনের মাঝখানে পর্বতের চূড়ায় মানুষ থাকে। সে মানুষ প্রাণধারণ করে বেঁচেও আছে। শীতের নিষ্ঠুর তীব্রতায় অভিভূত জ্বালছেই। গর্জমান বাতাসেও তা নিভছেনা। কারণ মানুষ হল 'দলমুগা' ধানের মতো। যত জল বাড়ে, তত গাছ বাড়ে, মরে না। গালে পচা ঘা, মুখে কুষ্ঠের দাগ, তবু প্রাণের কি অদম্য শক্তি। বাঁচার কি দুর্মর তৃষ্ণা। জীবজগতের সকল কাঁটা ধন্য করে গোলাপ ফুটছে। যদিও তার পাপড়ি গুলো ঝুঁকড়ে যাচ্ছে। পোকায় কাটছে। তবু তো ফুল, জীবনের গোলাপ ফুল, বিরাম হীন ফুটেই চলেছে। এ শুকিয়ে যাবে, ঝরে যাবে, তবু তো হেসে উঠেছে।

—স্যার, চা। বিনু ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিল। রমেশ চোখ মেলে তাকাল। জনতার ভিড় চারদিকে বেশ ঘন হয়ে এসেছে। বিনু তার কানে কানে বলল, 'স্যার চাল বিক্রী শুরু হয়ে গেছে। এবার স্যার, সব ধরা পড়বে। তবে এখানে নয়। হাটের বাইরে একটা মোক্ষম জায়গা আছে স্যার। একটা খুব সরু, নীচু গলি, গলিটা গিয়ে পৌঁছেছে একটা চালা ঘরে। সেখানে গিয়ে আমরা সব বসে থাকবো। এটা হবে ঠিক যেন বাঘ-শিকারের মাচান। বিনু হেসে উঠল।

এরপর সবাই মিলে সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছল। রমেশ একটা চেয়ারে বসল। হঠাৎ বিনু উঠে পড়ল, চলে যাবার সময় ব'লে গেল, 'যাই শিকার ধরার ব্যবস্থাটা পাকা করে আসি'।

রমেশ বসেই রইল। একটু দূরেই পাহাড়ের ঢালুতে এক-একটা উঁচু মতন জায়গায় গোখদের বস্তিগুলো দেখা যাচ্ছে। খোলা আকাশের তলায় চারপাই পাতা হয়েছে। কুকুর বসে আছে, লেজ নাড়াচ্ছে। কয়েকটা বাচ্চা মনের সুখে একটা বিরাট ঢাক পেটাচ্ছে। দরজার মুখে একটা বুড়ো মতন লোক বসি করছে। এক বয়স্কা নারী উদ্বিগ্ন মুখে তার পিঠে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর। একটা হ্যাগল ভাল্ল পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে গলাটা বাড়িয়ে কি একটা গাছের ডগা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খাচ্ছে।

রমেশ এই দৃশ্যটার ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই আছে। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে, রুমাল দিয়ে সে গা থেকে ঘাম মুছে নিল। হাটের যে ধুলোবালি নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল তা বার করার চেষ্টা করল।

দিন শেষ হয়ে আসছে। শীতের বিষণ্ণ বিকেলের পড়ন্ত রোদে গাছের ছায়াগুলি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে আসছে। আর সেই ধূসর পটভূমিতে এই সাধারণ বস্তিটা তার অতি সাধারণ প্রাত্যহিকতা নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ কান্নার আওয়াজ। কে যেন কাঁদতে শুরু করেছে। সব বাড়ি থেকে লোকজন দৌড়ে বেরিয়ে এল। যে বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল সবাই সে দিকে ছুটল। মুহূর্তের মধ্যে সেই বাড়ির দোরগোড়ায় লোকের ভিড় জমে গেল। সবাই মিলে নিজেদের মুখে-চোখে-গালে আঁচড় কাটতে কাটতে আর বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ভীষণ কান্না জুড়ে দিল। ক্রমে সেই কান্না হুমহুতাসের স্তরভেদে বাড়তে বাড়তে একটা করুণ ক্ষোভের মৃত্যুসঙ্গীতে পরিণত হ'ল।

—'হায়। হায়। হায়। লোকটা মরে গেল গো। লোকটা যে মরেই গেল; হায়। হায়। হায়।'

—বলতে বলতে বিনু কোত্থেকে যেন দৌড়ে এসে হাজির হ'ল।

—আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি, স্যার, পাইকরা হাটে ফিরে গেছে। আমি সবকটা পচারকারীকে তাড়িয়ে আনতে বলেছি, স্যার।

—কিন্তু এখানে কি হয়েছে, বিনু?

—এমন কিছু নয়, স্যার, একটা লোক মরে গেছে। খুব সম্ভব পাহাড়ী-জ্বরে ধরেছিল। নতুন কিছু নয় স্যার। এই কথা বলে বিনু রমেশের পিছনে দাঁড়িয়ে রইল।

রমেশের কানে তখনও কান্নার রোল ভেসে আসছে। চিরনূতন, চিরপুরাতন মানুষের কান্না। কালচক্র ঘুরে চলেছে—জন্ম-মৃত্যু—আবার নতুন মানুষের জন্ম—একই লীলা চলেছে—চিরনূতন—চিরপুরাতন—অনন্তকাল ধরে একই লীলা। তার চোখের সামনে এই ছবি একবার আসছে, একবার মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন ছবি আসছে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। জন্মমৃত্যুর চিরন্তন লীলা।

তার মনশ্চক্ষে উত্তর বাংলেশ্বর জেলার কান্তিপুর গ্রামের ছবিটা ভেসে উঠল। সেখানে তার বাড়ি। তার বাবা-মা, পাড়া-প্রতিবেশী পরিচিত গ্রামের বৃদ্ধরা, চেনাজানো বাচ্চা, জানা-শোনা মেয়েরা, সেখানকার শ্মশানঘাট থেকে গ্রামের চণ্ডীতলা পর্যন্ত ছবিটা তার মনের পটে ভেসে উঠল। জীবন-মৃত্যু, আবার নতুন জীবন। সেখানকার মানুষও বাঁচে, ভালোবাসে, শান্তি চায়.....। জীবনের সঙ্গে যাদের লড়াই নেই, আবার জীবনে যারা দুঃখ পায়, যারা কারও কোন ক্ষতি করে না.....এমন যব যব লোকের কথা তার মনে পড়ল।

তখনও সেই সমবেত মৃত্যুসঙ্গীত সমানে চলেছে।

কতলোক চলে গেছে আগে, কত কত-লোক। অন্ধকার রাত্রে আগুন জ্বেলে গ্রামবাসীরা তাদের আহ্বান করে।

—তোমরা অন্ধকারে ফিরে এসো, আলো আলোয় চলে যেও।

রমেশের পিছনে দাঁড়িয়ে বিনু তার ঘরের কথা ভাবছে। ভাবছে তার যুবতী স্ত্রীর কথা। বিনি কি এখনও আসছে তার স্ত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে? হঠাৎ সে নিজের গালে এক চড় কষাল। রমেশ তার দিকে ফিরে তাকাল। দেখল বিনু হাতের তালু দিয়ে গাল ঘষছে।

—এই জায়গায় বড্ড মশা, ইয়া বড় বড় সব মশা স্যার, এদের কামড়ে যা জ্বালা করে না, স্যার।

রমেশ চমকে উঠল। কল্পনায় দেখতে পেল সে বিছানায় শুয়ে আছে, জ্বরে কাঁপছে। চোখ রক্তবর্ণ, শরীরটা রোমশ ভালুকের মতো কালো। তার যেন ১০৩° জ্বর উঠেছে। মনে হচ্ছে কামড়ে দিই, গালাগালি দিই, পাগলের মতো দৌড় লাগাই। বমি,-গায়ে প্রচণ্ড তাপ চড়-চড় করে জ্বর বাড়ছে। তারপর। তারপর জন্ম-মৃত্যু-নবজীবন জন্ম-মৃত্যু.....নবজীবন.....।

কোন প্রচলিত আইন মেনে জীবন চলে না। সে শুধু মানে জন্ম-মৃত্যু-জীবন, জন্ম-মৃত্যু-জীবন।

রমেশের মনে হ'ল সে আজ নতুন চোখ মেলে সব কিছু দেখছে।

মানুষ-মানুষ-অনেক-অনেক মানুষ—শুধুই হেঁটে চলেছে। তারপর অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জীবনের স্রোতোধারা আজও অব্যাহত।

হাট বন্ধ হয়ে আসার সময় হল। একে একে লোকজন চলে যাচ্ছে। তার মনে হল এদের সবাইকে সে চেনে—এই সব মানুষের প্রত্যেকেই তার অতি পরিচিত। ঘরে অভাবের তাড়না, বাইরে জীবনের প্রহার, তবু তারা চলেছে, সে চলার বিরাম নেই, জাত-পাত-ধর্ম বড়ো কথা নয়, তাদের পরিচয় তারা মানুষ। এরা সবাই যেন তারই গাঁয়ের লোক, সবাই খুবই পরিচিত।

অনন্ত পথযাত্রার একটা নিপড়ে আর একটা নিপড়েকে দেখছে। তাদের শুকনো চোখের কোণায় অনির্বাপিত দুর্মর হাসি যেন এই কথাটাই বলতে চাইছে।

'আমরা সবাই ভাই, আমরা পা দুটো দিয়ে হাঁটি, হাত দুটো দিয়ে কাজ করি। আমরা সবাই একই বৃক্ষতের অধিবাসী, সেই সুপ্রাচীন মাটি, সেই চিরকালীন আকাশ, আকাশের তলায় সেই সনাতন মাটি। আমাদের স্বার্থ এক, আমাদের দুঃখ এক, আমাদের ভাগ্য এক, আমাদের শত্রুও এক। যারা আমাদের যৎসামান্য মুখের গ্রাসটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেয়, তাদের পায়ের তলায় আমাদের যারা গুঁড়িয়ে মারে পড়ে থাকে শুধু ধূপাকার তপ্ত ছাই আর পোড়া কাঠ কয়লা।

নিপড়েদের স্রোত বয়ে চলেছে। রমেশের মনের গভীর অতলে অনির্বাপিত হাসির আলোক-লেখা টুকু জ্বলতেই লাগলো।

হঠাৎ বাইরে চাঞ্চল্য শুরু হল। সোরগোল শোনা যাচ্ছে। পাইকরা ফিরে আসছে। তাদের পেছনে ঝুড়ি ও বস্তা মাথায় অনেক লোক। মুহূর্তের মধ্যে রমেশ তার অফিসের সজ্ঞা ফিরে পেল। খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। পাইকরা স্যালুট করল। বিনু দৌড়ে এসে জানাল, ওদের দলে ধরে আনা হচ্ছে, স্যার। পাইকরা বলল, দেখুন স্যার, এইলোক গুলো এখানকার হাট থেকে চাল তুলে কিভাবে নীচে সমতলে পাচার করছে। এই যে ঝুড়ি ও বস্তাগুলোর ওপরে লংকা আর তামাক পাতা দেখছেন, কিন্তু নীচে রাখা আছে চাল। এই চালগুলো এরা চড়া দামে বেচবে। একমুঠো ভাতের জন্যে এরা মানুষের হাড়-মাংস খেয়ে ফেলছে স্যার।

রমেশ চোখ তুলে তাকাল। একপাল কাকাল তার সামনে দাঁড়িয়ে। খেতে নিড়ানি দেবার যন্ত্রের লোহার কাঁটার মতোই পায়ের হাড় পাঁজরা গুলো দেখা যাচ্ছে। গায়ের চামড়া ফসুড়ের মতো ঝুলে পড়েছে। শরীর গুলো যেন তোবড়ানো শুধু মাথাভর্তি একরাশ তৈলবিহীন রুক্ষ চুল, আর মিটমিটে চোখ, এরা কি মানুষ? না, মানুষের প্রেত?

তারা কখনও নিজেদের ভাষায় কাতর কাকুতি-মিনতি করছে কখনও কাঁদছে কখনও গর্তে পড়া পেটের দিকে, কখনও নিজের মুখের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। তাদের কাঠের মতো হাতগুলো ঝুলে ঝুলে পড়ছে।

এদিকে বস্তির যে লোকটি মারা গেল তার শবদেহ বাইরে আনা হয়েছে। লোকগুলো এখন ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু করেছে, তারপর তারা তাদের মুখগুলো উর্ধ্বে তুলে সমস্বরে কান্না জুড়ে দিল, 'ওগো, কে তোমাকে কেড়ে নিল গো। কে তা তোমারে খেয়ে ফেল্লে গো।' আর বস্তির ঠিক নীচেই সরু গলিটাতে ধরে আনা সেই জীবন্ত প্রেতগুলি তাদের বুক-মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে শুরু করল, হায় ভগবান, হায় সর্বশক্তিমান।

পাইকরা গর্জে উঠল, এই চুপ কর, চুপ কর তোরা। শিপগির বস্তা খোল, বস্তা খোল, চাল বার কর।

রমেশ চোখ বুজে ফেলল। তার বুকের মধ্যে যেন বিরাট ধ্বস নেমেছে। দীর্ঘ পদযাত্রার ক্লান্তি ও অবসাদ তাকে ঘিরে ধরল। চোখ বুজেও সে যেন দেখতে পাচ্ছে উন্মত্ত মানব-সমুদ্রের এলোমেলো ঢেউ মিলেমিশে সব একাকার। তাদের গালে পচাটে ঘা, অথচ মুখে হাসি, চিমড়ে যাওয়া কোঁচকানো শীর্ণ শরীর, শুধু চোখগুলো চক্‌চক্ করছে।

সবকিছু তার বন্ধ চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। মৃতের জন্যে করুণ আর্তনাদ দরিদ্র ও বাস্তুহারার বুকফাটা হাহাকার আর গর্তে বসা চোখগুলোর গহ্বরে ক্ষুধের আগুন।

রমেশ চোখ মেলে তাকালো। তখনও কান্নার রোল থামেনি, চলছেই, 'আমাদের দয়া কর বাবারা, একটু দয়া কর। হায়, হায়! হে ভগবান, হে সর্বশক্তিমান আমাদের অবস্থাটা একবার এসে দেখে যাও হে ভগবান'।

তার সামনে এক দীর্ঘদেহী নরকঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় যেন শুকনো তালপাতা দিয়ে তৈরি। কাঠির মতো দুটো শুকনো হাত শূন্যে উঠে সেলাম জানালো, তারপর ধীরে ধীরে নীচে ঝুলে পড়ল। হাত দুটো যে কোন মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ একটা ক্যাঁসকেঁসে গলার আওয়াজ শোনা গেল। এটা কি ভাষা রমেশ জানে না। কিন্তু অর্থটা যেন ঠিক মতো কানে এসে পৌঁছল। 'দয়া করো বাবা, দয়া করো।' একটা ছায়ামূর্তি এসে রমেশের ঠিক ডান পায়ের ওপর লটান লুটিয়ে পড়ল। তারপর মাথা তুলে রমেশের দিকে লোভাসুলি চোখ মেলে তাকালো। সেই দৃষ্টি রমেশের খুবই চেনা মনে হল। মনে হয় যেন চেনা লোকের চাউনি। রমেশের এবং আমাদের সকলের চেনা। সকল ক্ষুধার্তের মুখ বোধ করি চিরকালই একরকম—আরনায় প্রতিফলিত ভাঙা-বাঁকা ছবির মতোই বিদ্‌ঘুটে, কিম্ভূত।

রমেশের মনে হল তার গ্রামের লোকেদের সে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে চেনে তেমনি করেই এরা সবাই যেন তারই চেনা জানা মানুষ। এই লোকগুলির বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতি গঠন-বিশেষত্ব তার মনের সামনে আর নেই। তাদের অন্তর্গত কোন মানুষী সত্তাই যেন তাকে অধিকৃত ও অভিভূত করে রেখেছে।

তার সামনে এই যে মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে, এটা যেন তার বহুদিন আগেকার মরে যাওয়া স্বপন-কাকার মতো, তেমনি একমাথা উস্‌কো-খুসকো চুল, সেই পাগলাটে লোকটার পালে এক মুখ না কামানো বাসি দাড়ি, কঙ্কার হাড়গুলোর পাশে মাংস খসে যাওয়া গর্ত, চুপ্‌সানো শরীর। ঠিক যেন তেমনি। অবিকল। শুধু একে মনে হচ্ছে বড্ড ক্লান্ত, বড্ড ক্ষুধার্ত, আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে বড্ড ভীত।

এই যে গোঁফওয়ালা লোকটা নুয়ে বেঁকে সামনে পড়ে আছে এ হ'ল কান্ত্রিপুর গ্রামের সেই হতভাগা কর্মকার। আর ওই যে রাস্তার বাউণ্ডুলে ছেলেমেয়েরা শুধু হাড়-চামড়া সার—এরাও কি তার কান্ত্রিপুর গ্রামের সেই ছেলেমেয়েরাই নয়—যারা ক্ষুধার তাড়নায় তার বাগানে ঢুকে কাঁচা কমটি পেয়ারা গুলো সব খেয়ে উজাড় করে দিয়েছিল?

আর এই যে মেয়েরা ভাঙা চোরা ফুটো-ফাটা জীর্ণ নৌকার মতো যাদের স্বরস্বরে দেহ, এরা কি তার গ্রামের সেই মেয়েরাই নয়—যারা খুব ভোরে উঠে বনেজঙ্গলে কাঠ-কুটো শুকনো পাতা কুড়োতে যেত শুধু একটু জ্বালানি সংগ্রহের আশায়।

রমেশের মাথা নত হয়ে পড়ল। নত মাথার আড়ালে সে তার চোখদুটোকে লুকোতে চাইল। শুধু তার কণ্ঠের বিড় বিড় আওয়াজ শোনা গেল· 'যা, যা, দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা, এখান থেকে'।

বিনু বিশ্বাস করতে চাইল না তার সাহেব এসব কি বলছে। কেনই বা বলছে! এমন তো হবার কথা নয়। উনি কি সত্যি সত্যি এদের তাড়াতে চাইছেন? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে বলল, 'কিন্তু স্যার—।' রমেশ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওদের ছেড়ে দাও'।

—'সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, দেরী হয়ে যাচ্ছে, যাও তোমরা চলে যাও'।

বিনুর মনে সাহেবের কথাগুলো মূর্তিটা ভেসে উঠল। উনি তো এমন নন। এই কোমলহৃদয় তরুণ অফিসার এই দুনিয়ার কতটুকুই বা চেনেন? সবে গোঁফ উঠেছে, ঝিপঝিপে চেহারা, গলার স্বর নরম, অফিসার বলেই মনে হয় না।

সত্যিকার ক্ষমতা হল ঘাষের মতো পরাক্রমশালী। বিনু তার জীবনে বিগত কয়েক বছরে অনেক অফিসার দেখেছে। তার চাপা ঠোঁটে এক অদ্ভুত ভঙ্গি ফুটে উঠল। খানিকটা মৃদু হাসির খানিকটা বিদ্রূপের।

রমেশ দাঁড়িয়েই আছে। তার চেতনায় এখন কোন ইতিহাস বোধ নেই। সময় চেতনা নেই, সময় যেন শেষ হয়ে গেছে। যেখানে কোন কলিসেন্দ্রয়েষ নেই, পুরুষোত্তম নেই, কোনারক নেই; যারা দেশ বা জাতির মেরুদণ্ড এমন কোন মানুষও নেই। ইতিহাস অর্থহীন। সর্বত্র শুধু ক্ষুধার্ত শিপড়ের দল বাঁচবার তাগিদে মুখে এককণা খাবার নিয়ে সারিবেঁধে চলেছে। তারা বাঁচতে চায়, টিকে থাকতে চায়। এইভাবেই জীবন প্রবাহ বয়ে চলেছে। শিপড়ের স্রোত একটা ঢিবির মধ্যে জড়ো হচ্ছে। এইভাবেই তারা তাদের উইঢ়ি বাঁচার স্বাদ মেটাচ্ছে।

শিপড়েরা বাঁচতে চায়। রমেশ তার শিরদাঁড়ায় একটা হিমশীতল শিহরণ অনুভব করল। শীতের স্বল্পস্থায়ী পড়ন্ত বেলা ; আলো মিলিয়ে আসছে, চারদিক জুড়ে একটা নীলাভ অস্পষ্টতার চাদর কে যেন বিছিয়ে দিয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘোর সন্ধ্যা নেমে এল। তার বুকের মধ্যে মাঘের শীত বেশ জাঁকিয়ে বসল।

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

ভারতীয় সাহিত্যের তথা আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক গোপীনাথ মহান্তির জন্ম ১৯১৪ সনে কটক থেকে ৭ মাইল দূরে নাগাবালি গ্রামে। ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে গোপীনাথ উড়িষ্যা সরকারের প্রশাসনিক পদে দীর্ঘকাল দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় সাহিত্যিক হিসাবে। ২৪ খানা উপন্যাস, ৮ খণ্ডে প্রকাশিত ছোট গল্প, ১ খানি নাটক ও বহু সমালোচনা মূলক প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা।

তাঁর সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ ও জীবনের প্রতি ভালবাসা এবং লোকজীবন লোক-কথা ও লোক সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ।

তাঁর উপন্যাস 'অমৃতর সন্তান' (অমৃতের সন্তান) ১৮৫৩ সনে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার এবং তাঁর 'মাটি মা ভালা' উপন্যাস ১৯৯৭ সনে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করে।

সরকারী চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি ভুবনেশ্বরে বসবাস করেন।

আলো আলো

রতন চট্টোপাধ্যায়

জামার ফুটো দিয়ে চোখের পাতা মুহূর্তে মুহূর্তে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই তড়িঘড়ি গর্জে উঠলো তারক। কে, কে তোর গায়ে হাত তুলেছে রে? পচা বললো, সেকেন, (সেকেণ্ড) মাস্টার। ব'লে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

কেন? মেরেছে কেন? ওর গম্ভীর মেজাজে জিজ্ঞাসা করলো তারক। পচা বললো, টিফিন বেলায় আমরা ক'জন মিলে বিড়ি খাচ্ছিলাম, তাই—। একটানে গায়ের জামাটা খুলে দাঁচনের নীচে দাঁড়িয়ে তারকের সামনে পিঠটা মেলে ধরলো পচা।

বুকে পিঠে সরষের তেল মালিশ ক'রে, রোদপিঠ করে, দাওয়ার উপর কিম ধ'রে বসেছিল তারক। এ্যালার্জার তাড়নায় বুকের পাঁজর আর গোল্লা গোল্লা চোখের মণি দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার। বললো আমার ছেলে বিড়িই খাক্ আর বেশ্যা বাড়িই যাক্ তাতে নোকের (লোকের) বাপের কী? ভারী তো চুনোপুটি মাস্টার তার আবার গুরুগিরি। আচ্ছা, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। বললে আর নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়াতে পারে না তারক? কিন্তু তড়পানির ঠেলায় পাড়া মাৎ করে দিতে তার জুড়ি নেই। কী দিয়ে মেরেছে তোকে পোদ্দকার (পরিষ্কার) করে বল্। জাবর কাটবি তো চেঁছিয়ে বিষ ঝাড়বো তোর।

ঠোঁট ফুলিয়ে জলভরা চোখে পচা বললো, ছড়ি দে মেরেছে। এই তো, এই দেখ্। বলে, দমকা বাতাসের মত ঝুঁকিয়ে বেঁকে তারকের পায়ের কাছে ঠুস্ ক'রে পড়ে গেল পচা। ছড়ির একটা দাগ তখনও মেলায়নি তার পিঠ থেকে। চেহারা মাছের মত লাল হয়ে আছে। তা দেখে ধাঁৎকে উঠলো তারক। তারপর চীৎকার ক'রে বললো, ইস্ মেকেছ, মেকেছ, ছেলেডাকে আর আস্ত রাখেনি: মেরে ফেলে দিয়েছে একেবারে।

বগলদাবার বই স্লেট উঠোনে গড়াগড়ি খাচ্ছে পচার। সেদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে খানিকটা বাতাস বুকভরে টেনে নিল তারক। বারদুয়েক ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে আবার সোজা হয়ে বসলো সে। সমস্টা বেড়েছে তার। সেই সঙ্গে আজ ক'দিন ধরে শীতের দাপটে হাঁপানিটাও বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। একটু চীৎকার করলেই দম ফেলতে কষ্ট হয়। তবুও কথা না বলে কী উপায় আছে। খানিকটা জিরিয়ে নিল যেন নিজেরই অনিচ্ছায়। তারপর প্যাকেট থেকে একটা এ্যাজমা সিগারেট বার ক'রে মালসার আগুনে ধরিয়ে জোরে জোরে টানতে লাগলো। সূর্য তখন মাথার উপর স্থির হ'য়ে ধক্‌ধক্ জ্বলছে। দশ বছরের পচার ছায়াটা তার নিজের পায়ের পাতায় পিষ্ট হচ্ছে। এই বয়সেই লায়েক হ'য়ে গিয়েছিল তারক। পয়সার গেঁজে কোমরে পেঁচিয়ে সাত সকালে বেরিয়ে পড়তো আম বাগানের মালিকের বাড়ি। গাছগুলোতে ক'টি ধরেছে কী ধরেনি সে সব দেখাশুনা নেই। ঘাউকো ভাগ্যের উপর কোমরের গেঁজে উল্টে দিয়ে ঘরে ফিরতো তারক। সেই পয়সায় মরশুমি আনাজপাতি কিনে ব্যবসা করে দস্তুরমত নিজের ভাগ্যটাকে গড়ে তুলেছিল সে। তাই তো আজ বছর দুই বিছানায় পড়ে থেকেও বিবি ঠ্যাং এর উপর ঠ্যাং তুলে আছে। সঙ্গে ওষুধপত্তর ও চলছে পুরোদমে। অভাবটা কিসের? পয়সা গোনা শিখলে আবার পড়াশুনোর কী দরকার ভেবে পায় না তারক। সময়ের ফল, আনাজপাতি বেচাকেনা করে এ তল্লাটের অনেক ব্যবসায়ী দোমহলা, তেমহলা বাড়ি হাঁকাচ্ছে। সেখানে দু-পাতা বিদ্যের ডিগ্রিধারী মাস্টার, তার আবার গুরুগিরি ফলিয়ে লাসন। তখনও দাঁচনে তলায় দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে পচা। তার দিকে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠলো তারক, বাপের কু-পুত্তুর—কেন? যখন তোকে ধরে পেটালে তখন একটা দান ইট খেড়ে হারামজাদা মাস্টারের খুপ্‌রী উড়িয়ে দিতে পারলে না বাপ্। হারামজাদা ওরারকে বাচ্ছো—এখন ভেউ ভেউ করে বাপের কাছে নালিশ জানাতে এইরেছ? যা—সরে যা বলছি, আমার সুমুখ থেকে। নইলে, পিটিয়ে আমি তোর হাড়মাস আলাদা করে দেবো।

বাপের ভয়ে সেখান থেকে সরে গেল পচা। বাপকে তার জানা আছে। বাপ নিজেই বলে, রেগে গেলে আমি জাপের কু-পুত্তুর হয়ে যাই। পচা নিজেই দেখেছে, চেলা কাঠ দিয়ে প্রায় প্রতিদিন তার মা'কে পর পেটানো পেটাত তারক। রোজ পিটুনি খেতে খেতে একদিন গলার দড়ি দিয়ে তার মা বাপের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল, এই তো সেই দিনের কথা। সেই থেকে বাপের ছায়াকে দেখলেও ভয় পায় পচা। দাওয়ার উপর বসে একা একা গজর গজর করতে লাগলো তারক। হাতের সিগারেট পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছারপোকা মারার মত সেটাকে মাটিতে টিপে নিভিয়ে দিল সে। জানে তার সবই আসে। কী ছিল পাঁয়ের হাল, আর আজ কী হয়েছে। এক ইস্কুল ঘরে কাল হয়েছে গাঁয়ের। ছেলে-মেয়েগুলো একেবারেই বাপ মায়ের কথা শোনে না। কাক পোয়ানো সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেই তারা আগে বই নিয়ে পড়তে বসে।

তারপর কেলা বাড়ার সঙ্গে চান ক'রে, খেয়েদেয়ে বই শ্লেট বগলদাবায় ক'রে টেরি বাগিয়ে ইস্কুল মুখো হয়। এদিকে বাড়ির সব কাজ পড়ে থাকে। সকাল বেলায় গোয়াল পরিষ্কার থেকে শুরু করে মাঠের যাবতীয় কাজ বাপ মাকেই করতে হয়। অথচ ধাড়ি ধিঙ্গি মেয়েগুলো তখন ইস্কুলে বসে সুর করে করে পড়া মুখস্থ করে। বিকেল বেলায় আবার খোলা মাঠে প্যারেড করে নেচে নেচে। রাত গোয়ালে যেসব মেয়েগুলো সূতিকা ঘরে বসে যন্ত্রণায় ক্যাত্রোতে পারে তারাই নাকি ভবিষ্যতে বন্ধুক কাঁধে দেশরক্ষা করার মহড়া নিচ্ছে হারামজাদা সেকেন মাস্টারের কাছে ; গণ্ডে পিণ্ডে গিলছে আর কুঁদো শেয়ালের পারা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে পচাকেও পাঠাতে হয়েছে ইস্কুলে। কমিটি চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল তারককেও। সরকারের ক'ড়া হুকুম, ছেলে-মেয়েদের গো-মুরুখ্য (গোমূর্খ) করে রাখা চলবে না। লেখাপড়া শেখাতে হবে। গার্জেনদের পয়সা কড়ি কিছু লাগবে না পড়াতে। মাস্টারের মাইনে সরকার দেবে। কমিটির সেক্রেটারী পরান মণ্ডলের ছেলে হারান মণ্ডল। তারক ও কমিটির একজন বটে। তার হুক আছে কথা বলার। সুতরাং বিহিত একটা করতেই হবে যা হোক।

এই সব ভাবছে তারক। এমন সময় দেখতে পেল, এক হাত দিয়ে কোমর চেপে ধরে, অন্য হাতে লাঠির ওপরে ভর করে হাঁটতে হাঁটতে আসছে ভরত। তারকেরই সমবয়সী। সব ব্যাপারে না হলেও মোটামুটি মিল খায় দুজনে। ইস্কুল

ভরার ব্যাপারে তারও যে খুব একটা মত ছিল তা নয় ; তবে মাসের হাল যেদিকে যাবে, পেছনের হালও সেদিকে যাবে, এই নিয়মে ভরতও নিমরাজি হয়ে সায় দিয়েছিল। মুখুজ্যে ঠাকুরের কথার উপর আর না বলতে সাহস করেনি। গাঁয়ের সবাই তাকে মানে, গোনে। তাছাড়া তিনি নিজেই উঠোনের একটা বড় অংশ বিনামূল্যে ইস্কুলের জন্য দানপত্র করে দিয়েছেন। বলেছেন, বড় অন্ধকার রে বড় অন্ধকার—এ অন্ধকার না কাটলে তোরা মানুষ হতে পারবি নে। সারা জীবন দাসত্ব করবি পয়সাওয়ালা মানুষদের—ঠাকুর ঠাকুর করবি চিরকাল। তোদের বাপ ঠাকুর্দারা করেছে, তোরা করছিস, তোদের ছেলেরাও করবে। স্বদেশী আন্দোলনের চিহ্ন আছে তার সারা গায়ে। সেই সব দেখিয়ে পাড়ার মানুষ জড় করে ঠাকুরমশাই। গল্প করেন—ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা কীভাবে কেড়ে নিতে হয়েছে। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, বসে তারক সে সব আসরে যেতে পারে না। তবে বাড়ি বসে যেটুকু কানে আসে তাতে ঠাকুরমশাইকে ওলবাজ ধূরন্ধর লোকঠকানো আর কিছু ভাবতে পারে না তারক। বলে, শয়তান গাঁয়ের ছেলে-মেয়েগুলোর মাথা খাবার কল তৈরি করেছে—এবার দুর্ভিক্ষ লাগবে। আরে নিপড়ের কলাটাও বল। কাজের সময় ছেলেডা, মেয়েডা, যদি বিড়িটা আধাটা আগুনে ধরিয়ে টান দেরে দেয় তাহেও কাজ হয়।

ইতিমধ্যে ভরত এসে পড়েছে। সেই হাঁটুর ওপর পর্যন্ত কাপড় পরা। খালি গা, মিশমিশে কালো রং দুপুরের রোদে ঝলকাচ্ছে। উঠতি বয়সে গাছগাছ থেকে পড়ে গিয়ে এই হয়েছে দেহের হাল। তবুও ওর মেয়ে জুটেছে কপালে। ছেলে-পুলেও হয়েছে গণ্ডা কয়েক। বললো, কী ব্যাপার মিতে। বাড়ি বসে শুনতে পাচ্ছি দুখের ছেলেডার ওপর তড়পাচ্ছিস। বলি, অসুখডা আবার চাগালো নাকি?

—তোরা তো আমার অসুখটাই দেখতে পাস। এদিকে যে এক সঙ্ঘ তৈরি করে গাঁয়ের ছেলে-গুলোর চামড়ার উপর যে উড়ো খই গোবিন্দায় নমা'র দল ভূপমূপি বাজাচ্ছে তা তো তোদের চোখে পড়ে না। চেয়ে দেখ, মা মরা ছেলেডার আমার, কী সেকোন্ত করেছে ঐ হারামজাদা সেকেন মাস্টার। বলে, একটা মিথি দিয়ে পচাকে ডাকলো তারক। পচা এসে তার পিঠটা মলে ধরলো ভরতের সামনে। আর ঠোঁট ফুলিয়ে টাপ্সী খেতে লাগলো। আহা-উঁহু করে সমবেদনা জানালো ভরত। তারপর সোজা হয়ে লাঠির উপর ভর দিয়ে পেটের উপর ভেঙে পড়লো —তো মেরেছে কেন? কেন মেরেছে, সেকেন মাস্টার? প্রশ্ন করলো পচার কাছে। তারক উত্তর দিলো, বিড়ি টেনেছে। টেনেছে তা সেকেন মাস্টারের স্বপের কী? তার খায় না পরে? সে আবার কাছে এসে বললে গাজেডা—বিড়ি খেয়েছে তো মহাভারত অশুদ্ধ (অশুদ্ধ) হয়ে গেছে—এ্যা। শোন মিতে, এ শালার বিহিত যদি না হয়, তো জান তারক মালকে, রেগে গেলে শালা তারক বাপের বু-পুত্তুর। জনমের পর আমাদের বাপোরা ও ছেলেদের বিড়ি ধরিয়েছে—হ্যাঁ ধরিয়েছে—তাতে মাস্টারের বাপের কী, তা আমি দেখবো—তবে আমার নাম তারক মাল—এই শুনে রাখ। তারকের গুড়পানির হরে দেখে আপনমনে হাসলো ভরত। তারপর বললো, পরের ছেলেদের পেটানোর কী কলই না বানিয়েছে—দেশটা এবার উচ্ছন্নে যাবে। তারক বললো, খাল কেটে কী কুমীর এইয়েছে দেখ। বিটিশ আমলে ছিলাম ভালো। একটা গেঁয়ো খিস্তি কাড়লো ভরত,—নেয়েওলোর সব পাখনা গজিয়েছে। বুঝেছিস। ও বয়সে আমারগো মায়েরা আমাদের জন্মলো দিয়েছে। আর কিনা আমাদের মেয়েগুলো সেই বয়সে বিহার বিহার করে নাচে আর প্যারেড করে, প্যারেড। আবার কী সব গায় জানিস, চল কোদাল চালাই, তুলে মানের বালাই। অবাক হয়ে ভরতের কথা শোনে তারক—সে কী? তাই নাকি। এ্যা কী বিটি-বিচ্ছিরি কাণ্ড বল দেখি। আমার মেয়ে হলে বিষ কেড়ে নামিয়ে দিতাম না। দাঁতে দাঁত চাপলো তারক।

আচমকা হো হো করে হেসে উঠলো ভরত। সে ওড়ে বালি বুঝলি—তা বললে, সে জন্যে লোক রাখো, আমরা ইস্কুলে কামাই করতে পারবো না। বলে চলে গেল ইস্কুল, বুঝলি। তারক, মাস্টারেরা ওপ জানে, বিশেষ ক'রে ওই সেকেন মাস্টার, ছেলেমেয়েগুলোকে যে কী ওপ করেছে। হাসির স্বর উচ্চ তানে বেঁধে দিল ভরত।

অবাক বিস্ময়ে তারক বললো, তুই নেনে নিলি সে আবদার?

তা আর না মেনে কী উপায় আছে মিতে। এই অল্প পাড়াগাঁয়েও ইনেকটিরি আসছে। দেখিস নি, ওই দেখ, সব আল্লা পুঁতে তার মাথায় তার টানিয়ে বাতি জ্বালাবার তাল করছে। গাঁয়ের অন্ধকার এবার কাটবে গো মিতে। কথাগুলো ব'লে উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে তাকালো ভরত। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে দেশ গাঁয়ের হালচাল। যে কয়জন পয়সাওয়ালা লোক বাস করে, তাদের ছেলেরা, মায়ের দুধ খেতেই চলে যায় শহর কোলকাতায়। সেখানে বোর্ডিং কী আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করে। চাকরী করে। পরে দেবদূত হয়ে মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসে। আর বাপের বয়সী সব অশিক্ষিত চাষাভুষোদের দিকে মিটি মিটি চেয়ে হাসে। আর নাম ধরে ধরে ডাকে। সেই দুঃখেই মুখুজ্যে মশাই কী দয়ার শরীল, উঠে পড়ে লাগে গাঁয়ে ইস্কুলটা হয় তার জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করে, একরকম পয়সাওয়ালাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই ইস্কুল করেছেন নিজের উঠোনের উপর। এবার তারদের ছেলে-মেয়েরাও লেখাপড়া শিখবে, বড়হে যাবে, চাকরী করবে। বংশ পরম্পরায় আর তাদের লাঙলের মুঠি ধরে, পাচন হাতে বলদের পেছন পেছন ঘুরে দিনের শেষে বাবু মশায়দের দোরগোড়ায় হাত পেতে পড়ে থাকতে হবে না! এটা কী কম শান্তির কথা। কিন্তু তারক চিরকালের গোঁয়ার গোবিন্দ রয়ে গেল।

সহসা কাঁসর ঘন্টার মত শব্দ শুনে চোখ ফেরাল ভরত। শশী। তারকের বিধবা বোন। কোথা থেকে কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে নিজের ঘরে ঢুকেই এক লাফে উঠোনে এসে নেচে উঠেছে। তারপর তারককে উদ্দেশ্য করে বললো শশী, দাদা তুমি দেখনি—?

খেঁকিয়ে উঠলো তারক, কী দেখবো খোলামুখী? আটাশগুলো সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে কে? তা তুমি দেখনি—? ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো শশী।

দু-হাত নেড়ে তারক বললো দেখিছি-দেখেছি যাঁড়ান মালের জামনা কুকুর, দুটো চোখ, দুটো কান, চারটে পা, লম্বা মুখ আর ইয়াবড় বেঁকান লেজ। তোর ঘরের পাকাটারি (পাতকাটি) বেড়া ভেঙে ঢুকে, তোকে না পেয়ে রাগ ঝেড়ে গেছে আটার ওপর।

ভরতকে সাক্ষী মেনে শশী বললো, শোন, চোরা সাপের উক্তি শুনলে! এ্যা—বিষ নেই আর ফুলোপনা চক্কর।

বিষ আছে কী নেই তা পাড়ার লোকেরা জানেনা ধ্যেরামজাদী, কুলখাগী—তুই বলতো মিতে—তারপর পচার দিকে ফিরে বললো, কী দেখছো বাপধন, বাপের প্রকমান মেড়িয়ে মেড়িয়ে দেখছো—দেখ, দেখ। ছেনালী মাগীর পেটের বাচ্চা না হলে অমন থির হয়ে দাঁড়িয়ে বাপের অপমান সহ্য করে!

ততক্ষণে লাঠির উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ভরত। কেন জানি, এখন এ সব কথা কানে এলেই বুকের ভিতরটা চিন্ চিন্ করে পুড়তে লাগে। এমন কি নিজের মুখেও একদিন বেসব কথা সচরাচর বলেছে আজ যদি কখনও সেসব ভাষা মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায় তো ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি। কেন এমন হলো, বুঝতে পারে না ভরত। বড় দুঃখ হয় তারকের জন্য। লোকটা একই রকম রয়ে গেল চিরডাকাল। সহসা মনে পড়ল মুখুজ্যে মশাইয়ের কথা, লেখাপড়ার আর এক নাম হচ্ছে, আলো—সেই আলো এসে ঠিকরে পড়বে তোদের ছেলে-মেয়েদের মুখে। তখন দেখবি তোদের মুখেও সেই আলোর বিলিক। চকিতে ইলেকট্রিকের খাম্বার দিকে চোখ পড়তেই উজ্জীবিত হয়ে উঠল ভরত। আর ক'দিন, এবার আলো ওই খাম্বাতে জ্বলবেই...। হ্যাঁ, হ্যাঁ জ্বলবেই বলতে লাঠিতে ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে, চলতে লাগলো ভরত...।

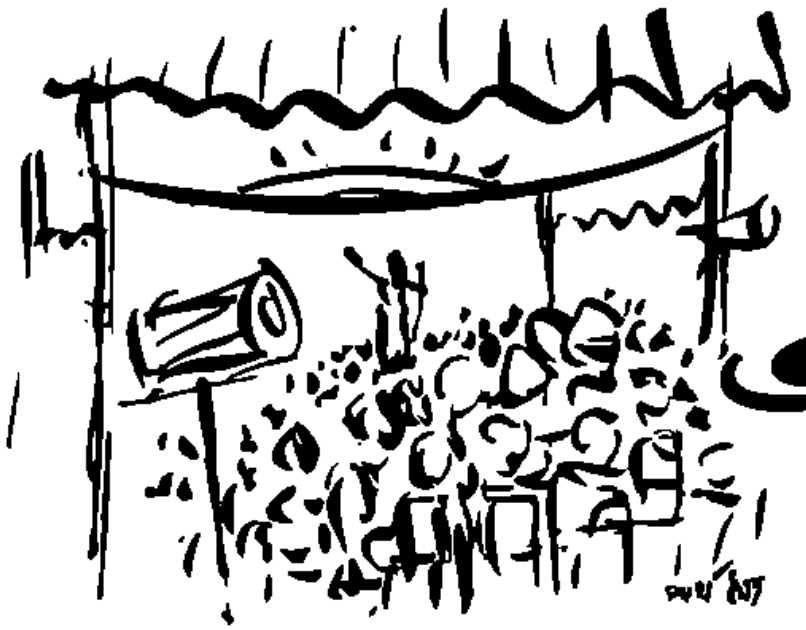

এখন

নির্মলেন্দু গৌতম

গাড়িটা মঞ্চের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই তিন-চারজন ছুটে এসে দাঁড়ালো গাড়ির কাছে।

সামনে ড্রাইভারের পাশে সমীর বসেছিল। প্রমিতাকে আনতে গিয়েছিল সমীর। পেছনে ফিরে প্রমিতার দিকে তাকিয়ে সমীর বললো, 'এখানেই নামতে হবে। ক্লাবের ভেতর আপনাদের জন্য বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে'।

প্রমিতা শুনলো কথাটা। সামনের কাঁচের ভেতর দিয়ে জায়গাটাকে দেখলো। দেখলো, গাড়ির পাশে এসে যারা দাঁড়িয়েছে, তাদের। তারপর দরজাটা খুলে গাড়ির বাইরে পা রাখলো।

এগিয়ে এসে খোলা দরজাটাকে ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে সমীর বললো, 'নিন, চলুন'।

বলেই পা বাড়ালো সমীর।

প্রমিতা হাঁটতে থাকলো সমীরের পেছন পেছন। হাঁটতে হাঁটতেই দেখলো, মঞ্চটাকে চমৎকার করে সাজানো হয়েছে সামিয়ানার শেষ পর্যন্ত চেয়ার সাজিয়ে বসবার জায়গা করা হয়েছে দর্শকদের জন্য। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু দর্শক বসে আছে সেই সব চেয়ারে।

হঠাৎ-ই তারা প্রমিতাকে দেখতে পেয়ে ঘুরে বসেছে। ক্যামেরাটা দেখতে পেয়েই সচেতনভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে হাঁটতে থাকলো প্রমিতা।

সমীর হঠাৎ ঘুরে প্রমিতার দিকে ফিরে বললো, 'জায়গাটা আপনার খারাপ লাগছে না তো'?

'না, না, খারাপ লাগবে কেন জায়গাটা। মঞ্চটা তো চমৎকার হয়েছে। বসবার ব্যবস্থাও তো বেশ ভালই করেছেন।' প্রমিতা বললো সঙ্গে সঙ্গে।

না, খারাপ লাগলেও খারাপ বলা যায় না। বলাটা ঠিকও নয়। এসব ক্লাব তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলো রীতিমতো গুছিয়েই করতে চেষ্টা করে। দু'চারজন নামী-দামী শিল্পী আনে তারা, পাড়ার কিছু শিল্পীকেও সুযোগ দেয়। প্রমিতা কিছু সময়ের জন্য এসব অনুষ্ঠান এক দুবার দেখেছে, কিন্তু এবার এই প্রথম এরকম অনুষ্ঠানে যোষিকা হিসেবে থাকছে। এসব কথা ভাবতে ভাবতেও সমীরের সঙ্গে ক্লাবঘরে এলো প্রমিতা।

একটা চেয়ার টেনে প্রমিতাকে বসতে বললো সমীর।

প্রমিতা বসতেই সমীর বললো, 'আপনি একটু বসুন। আমি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট তারাপদদা-কে ডেকে নিয়ে আসছি'।

বলেই হাত ছুটে বেরিয়ে গেল সমীর। প্রমিতা হাতে ঘড়ি দেখলো। অনুষ্ঠান শুরু হবে সাড়ে ছ'টায়। এখনও ছটা বাজেনি। একটু আগেই এসে পড়েছে ওদের জন্য। আসলে, পাঁচটা থেকেই গাড়িটা নিয়ে বাড়ির সামনে বসেছিল সমীর।

ক্লাবের দরজায় অনেক মুখের ভীড়। প্রমিতাকে দেখছে সবাই। প্রমিতা মুখ ফিরিয়ে নিরাসক্তভাবে ক্লাবের দেওয়ালে টাঙানো সুভাষচন্দ্রের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

যেসব শিল্পীদের নেমন্তন্ন করেছে ক্লাব, তাদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় আছে প্রমিতার। তারা যদি কেউ এসে পড়তো, ভাল হত। একা একা কতক্ষণ আর এভাবে বসে থাকা যায়।

না, বেশিক্ষণ প্রমিতাকে একা একা বসে থাকতে হল না। সমীর এল প্রেসিডেন্ট তারাপদ-দাকে নিয়ে।

প্রমিতার সঙ্গে সমীর পরিচয় করিয়ে দিল তারাপদদার।

না, তারাপদদা বয়স্ক মানুষ নন। কিন্তু ভঙ্গিটা খানিকটা বয়স্ক মানুষের। প্রমিতার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বললেন, টিভিতে অনেক অনুষ্ঠানে আপনাকে কিন্তু আমি দেখেছি'।

হাসলো প্রমিতা।

আসলে, এরকম কথার কোন উত্তর হয় না বলেই হাসতে হয় প্রমিতাকে।

'আমাদের ক্লাবের ছেলেরা তো আপনাকে আনবার জন্য রীতিমতো চাপাচাপি করে রাজি করিয়েছে আমায়'। তারাপদদা বললেন ফের।

এবারও হাসলো প্রমিতা।

ছেলেরা কিন্তু আপনার ওপরই নির্ভর করে আছে। ফাংশনটা শুরু হলে আপনি কিন্তু একটু দেখবেন। মানে, ভুল-টুল হলে ঠিকঠাক করে দেবেন। একটু থেমে ফের বললেন, 'আসলে

আপনাদের তো অভিজ্ঞতা অনেক। সেটা তো মানতেই হবে। ভুল-টুল হলে আপনি ঠিক শুধরে দিতে পারবেন'।

'সে আপনি ভাববেন না। কিছু অসুবিধে হবে না'।

প্রমিতা বলল।

ঠিক আছে। তাহলে আপনি বসুন। আমি একবার ওদিকটা দেখে আসি। ফাংশন শুরু হতে তো আর বেশি সময় ও নেই'।

বলে আর একবার মুগ্ধ চোখে প্রমিতার দিকে তাকিয়ে সমীরকে নিয়ে চলে গেলেন তারাপদদা।

নিশেষে আবার সুভাষচন্দ্রের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল প্রমিতা।

সত্যিই প্রমিতা একদিন মঞ্চে উঠেছিল। প্রথম দিন মঞ্চে উঠেই প্রমিতা বুঝে গিয়েছিল, মঞ্চকে সে আর ছাড়তে পারবে না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে তো শুধু নিজেকেই নিজে দেখা যায়। অন্তত আয়না চারিদিকে সাজিয়ে মঞ্চ যেন আরও অনেক বড় কিছু। সে জন্যেই কী দারুণ আকর্ষণ তার। মঞ্চের আলো যেন পরিচিত আলো নয়। সমস্ত শরীরের রহস্যকে সে যেন তীব্র করে দিয়ে যেন্ত করে। নিজের দিকে তাকালেই তখন মনে হয়, ইন্দ্রিয়গুলো আমূল যেন রক্তের ভেতর সূত্রের তরঙ্গ হয়ে আছড়ে পড়ছে।

সত্যিই, প্রমিতা এখন নিজেকেই নিজে দেখে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই একবার ব্যাগটা খুললো প্রমিতা। ছোট আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখ দেখলো।

দরজায় এখন নানান রকম মুখ। কখনও মুখের সংখ্যা বাড়ছে কখনও কমছে।

না, ঠিক এরকম পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানে কখনও আসেনি প্রমিতা। আসলে, যেভাবে সমীর নামে ছেলেটি অনুরোধ করেছিল। তাতে তাকে না করতে পারেনি প্রমিতা। তাছাড়া, প্রমিতা যে টাকা চেয়েছিল, সে টাকাতে রাজী হয়ে গিয়েছিল ওরা। 'না' বলবার কোনও পথই ছিল না প্রমিতার।

তাছাড়া সমীর এসেছিল প্রমিতার এক ঘনিষ্ঠ জনের চিঠি নিয়ে। তাকেও ঠিক অস্বীকার করার উপায় ছিলো না প্রমিতার।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই প্রমিতার সময় ফুরোতে থাকলো।

• • • • •

অনুষ্ঠান শুরু হতে প্রায় একঘন্টা দেরী হয়ে গেল। 'পাড়ার ক্লাবের ফাংশান, কি করা যাবে বলুন। আপনি শুধু একটু মানিয়ে নেবেন।' বার বার এসে বলেছেন তারাপদদা।

সমীরও বার বার এসে ক্ষমা চেয়ে গেছে।

প্রমিতা বার-বারই বলেছে, 'বুঝতেই পারছি সব। আমার জন্য কিছু ভাববেন না'।

• • • • •

অনুষ্ঠানের প্রথম বিকটাতে গান গাইলো পাড়ার শিল্পীরা। নামী-দামী শিল্পীরা গাইতে উঠলো তারপর। সাজিয়ানার নীচে সাজানো চেয়ার ছাপিয়ে ভীড় ছড়িয়ে পড়লো বাইরে।

এখন বেশ ভালোই লাগছে প্রমিতার। আসলে, ভালো দর্শক না হলে অনুষ্ঠানে এসে কখনোই ভালো লাগে না।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মঞ্চে উঠে প্রমিতা বুঝতে পেরেছিল, তার সম্পর্কে দর্শকের সত্যিই কৌতূহল আছে। সে দিক থেকেও মঞ্চে দাঁড়াতে ভাল লাগছিল প্রমিতার।

তারাপদদা কিন্তু প্রমিতার পাশে পাশেই আছেন। কে কার পর মঞ্চে উঠবে সেই নামটা ধরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আর সেই নামটা প্রমিতাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তারাপদদা।

দেখতে দেখতে এক সময় গানের শিল্পীদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলো। তারপর বসলো যন্ত্রসঙ্গীতের আসর। ঘড়ি দেখলো প্রমিতা। প্রায় এগারোটা। সত্যি, রাত অনেক হয়ে গেছে। অন্যান্য পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানে এরকমই রাত হয়। না, আর জোর করে থাকবার দরকারই নেই প্রমিতার। কাল যন্ত্র সঙ্গীতের পর আর কোনো অনুষ্ঠান নেই। কি হবে আর থেকে। তাই পরে পায়ে এসে তারাপদদার মুখোমুখি দাঁড়ালো প্রমিতা। বললো, 'আর তো আমার দরকার নেই'।

তারাপদদা ঠিক কি বলবেন বুঝি ভেবে পেলেন না। আসলে, মনে মনে প্রমিতার চলে যাওয়াটা বুঝি মানতে পারছিলেন না।

বুঝতে পারলো, প্রমিতা। মনে মনে হাসলো। বললো, 'সত্যি অনেক রাত হয়েছে। আপনি আমার গাড়ির ব্যবস্থাটা করে দিন'।

'হ্যাঁ। এখুনি দিচ্ছি...' বলেই হঠাৎ উঁচু গলায় সমীরকে ডাকলেন তারাপদদা।

সমীর এলো।

শুনি চলে যেতে চাইছেন। গাড়িটাকে ক্লাবের সামনে আনতে বলো'। তারাপদদা বললেন সমীরকে।

সমীর তাকালো প্রমিতার দিকে। বললো, 'এখুনি চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, অনেক রাত হয়েছে।' হাত ঘড়ির দিকে আর একবার চোখ রেখে বললো প্রমিতা।

কি যেন ভাবলো সমীর। বললো, 'ঠিক আছে। গাড়িটাকে আমি নিয়ে আসছি'।

বলে তাকালো তারাপদদার দিকে। বললো, 'আপনি ওই প্রোগ্রামটা....'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' তারাপদদা বললেন সঙ্গে সঙ্গে।

সমীর আর দাঁড়ালো না। বেরিয়ে গেল।

মঞ্চের ওপর যন্ত্রসঙ্গীত শুরু হয়েছে। উইংসের ফাঁক দিয়ে একবার শিল্পীদের দেখলেন তারাপদদা। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্রমিতার মুখের ওপর নিষ্পলক দুটো চোখ রেখে মুগ্ধ গলায় বললেন, 'বুঝলেন, আপনার রেটটা ঠিকই আছে। আপনার জন্য দু'হাজার টাকা কখনোই বেশি নয়'।

বলেই পকেটে ভোবানো হাত বের করে একটা খাম প্রমিতার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'এই যে আপনার টাকাটা। পত্রের বারও কিন্তু আপনাকে আসতে হবে। বলতে পারেন, আমরা আপনার এখন থেকে বাঁধা খদ্দের'।

মুহূর্তে কি যে ঘটে গেল প্রমিতার মনের মধ্যে, প্রমিতা তা বুঝতে পারলো না। এই প্রথম বুঝি আয়না ছাড়াই নিজেকে দেখতে পাচ্ছে প্রমিতা। প্রমিতা যেন এখন আর প্রমিতা নয়, রেটে বাঁধা একটি নারী। তার খদ্দের তৈরি হয়েছে। তার হাতের খামের মধ্যে যে টাকাগুলো, সেই টাকাগুলোর সঙ্গে সে যেন একাকার হয়ে গেছে।

না, প্রমিতা চেষ্টা করেও নিজের দিক থেকে নিজের চোখ ফেরাতে পারছে না। আশ্চর্য এক উত্তেজনায় ঘামতে থাকলো প্রমিতা।

সমীর ডাকতে এসেছে। গাড়ি রেডি। আচ্ছন্নের মতো সমীরের দিকে তাকালো প্রমিতা। তারপর পা বাড়ালো।

না, কারো সঙ্গে আর একটা কথাও বললো না প্রমিতা।

• • • • •

গাড়িটা বাড়ির সামনে থামতেই ব্যস্ত পায়ে গাড়ি থেকে নামলো প্রমিতা।

সমীরও নামলো।

কিছু বলতে যাচ্ছিল সমীর। তার আগেই সেই খামটা সমীরের দিকে বাড়িয়ে ধরলো প্রমিতা। বললো, 'এটা তুমি নিয়ে যাবে। আমি তোমাদের ক্লাবের অনুষ্ঠানে যা করেছি, মনের আনন্দে করেছি। মুহূর্তের জন্য একবার থামলো প্রমিতা। বড় করে একটা নিশ্বাস নিলো। তারপর সমীরের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'বিশ্বাস করো, তোমাদের অনুষ্ঠানই আমার জীবনের শেষ অনুষ্ঠান। আর আমার কোনোদিন তোমাদের অনুষ্ঠানে ডাকতে এসো না'।

সমীর বুঝি কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। প্রমিতা তার হাতে খামটা প্রায় জোর করেই ধরিয়ে দিয়ে ঘুরে পা বাড়ালো বাড়ির গেটের দিকে।

এখন অনেক অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে স্নান করবে প্রমিতা।

সুরেশ

রুহিদাস সাহা

মেদিনীপুরের একটি গণ্ডগ্রাম নয়নপুর। তারই অধিবাসী হৃদয়রঞ্জন দাসের সংসার স্ত্রী ও তিনটি মেয়েকে নিয়ে। হৃদয়রঞ্জনবাবুর রয়েছে একটি মনোহারী দোকান। অল্প জমির উপর ছোটখাটো পাকা বাড়ি। সংসারে তেমন স্বচ্ছলতা নেই, তবে খেয়ে পরে বেঁচে আছেন এবং তিন তিনটি মেয়ের কথা মনে রেখে কিছু সঞ্চয়ও করেছেন। বড় মেয়ের বয়স বাইশ, পরের দুজনের জন্ম দু বছরের ব্যবধানে।

একদিন পশ্চিম আকাশে লাল আবীর ছড়িয়ে সূর্য্য ঢলে পড়েছে। এমন সময় একজন আগন্তুক হৃদয়রঞ্জন দাসের উঠোনে এসে দাঁড়ালো।

আগন্তুক একজন যুবক, বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেহ, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, দেখতে বড় সুন্দর। স্যুট-কোট-বুট পরা এমন একজন যুবকের আগমনে স্বভাবতঃই ব্যস্ততা প্রকাশ পেল। হৃদয়রঞ্জনবাবু এগিয়ে আসতেই যুবকটি বলে উঠলো—দেখুন, আমি এসেছিলাম অফিসের কাজে পটাশপুরে। এখানেই হয়ে গেল সন্ধ্যে। তাই আমি একটু আশ্রয় চাইছি আপনাদের কাছে।

গ্রাম বাংলার মানুষ সহজ সরল, সেই সঙ্গে তারা অতিথি পরায়ণ। তার উপর এমন একটি সুন্দর যুবক চাইছে আশ্রয়। ফলে হৃদয়রঞ্জনবাবু এক বাক্যেই সম্মতি জানালেন এবং অতিথির আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

যুবকটি নিজের নাম জানালো সুরেশ বসু আর বাবার নাম সমীরণ বসু। বাড়ি ঘুঘুডাঙ্গাতে। সে কোথায় কাজ করে, কত উঁচু পদে কাজ করে ; কত টাকা তার মাইনে, বাড়িতে কে কে আছে, তারা ক ভাই, ক বোন এসবও কথায় কথায় জানিয়ে দিল সে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সুরেশ হৃদয়রঞ্জন বাবুর বাড়ির সকলের মধ্যে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠলো। হৃদয়রঞ্জনবাবুকে ডেকে বললো মেশোমোশায় এবং তাঁর স্ত্রীকে মাসিমা। মেয়েদের সঙ্গেও প্রাণখোলা হাসিখানা কথা বলতে শুরু করলো সুরেশ।

হৃদয়রঞ্জনবাবু সুরেশকে সম্বোধন করছিলেন, 'আপনি' বলে। আপত্তি জানিয়েছিল সুরেশ, বলেছিল—আমি তো আপনার ছেলের মতো। আপনি আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করবেন। তাই হলো হৃদয়রঞ্জনবাবু তাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করতে লাগলেন।

একটি অপরিচিত পরিবারের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে পরিচিত করে তোলা সুরেশের মতো খুব কম লোকেই পারে।

পরদিন সকালে উঠেই সুরেশের কথা—মেশোমশাই, নিশ্চয়ই আপনারা আমাকে পর ভাবছেন না। তাই বাজারটা আজ আমি নিজেই করব।

হৃদয়রঞ্জনবাবু স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—তা কি করে হয়, বাবা।

আমাকে যদি আপনারা পর না ভাবেন তবে তা হবে না কেন, মাসিমা—সঙ্গে সঙ্গেই জবাবও দিল সুরেশ।

তাই হলো বেশ বড় একটি ফর্দ্দ হলো, থলি থিটি নিয়ে এলো সুরেশ।

হৃদয়রঞ্জনবাবু বড় মেয়ের নাম সুধা। গায়ের রং কালো। মাথা ভরা চুল। দেখতে সুশ্রী।

এক সময়ে সুরেশ সুধার চোখে চোখ রাখলো। মনের কথাটা বলেও ফেললো এক ফাঁকে। সুধা মাকে জানালো।

এই সুধাকেই কত জায়গা থেকেই দেখে যাচ্ছে চার বছর ধরে। তিন তিনটি মেয়ে। বিয়ে তো দিতেই হবে। তাই আগে থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন হৃদয়রঞ্জনবাবু। কিন্তু কনে পছন্দ হয় তো পণে পছন্দ হয় না। সাধারণ পাত্রেরও আকাঙ্ক্ষা—পণ, গয়না—কুড়ি ভরি সোনা, কুড়ি হাজার টাকা নগদ, আরও কত কি! হৃদয়রঞ্জনবাবুর সাধ্যে কুলোয় না।

ওলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসে এ চার হাজার টাকা মাইনে পাওয়া অফিসার সুরেশের এমন ইচ্ছায় যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলেন হৃদয়রঞ্জনবাবুর স্ত্রী। সুরেশকে তাঁর মনে হলো যেন দয়ালু দেবতা। স্বামীকে বললেন সব কথা। আনন্দ হলো তাঁরও। তবে কারও কারও সঙ্গে পরামর্শ করার কথা তুললেন তিনি। স্ত্রী রাজী হলেন না। বললেন আজকাল মানুষ বড় হিংসুক, কারও ভাল দেখতে পারে না। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলে নিশ্চয়ই তারা নানা গন্ডগোল তুলবে, কাজ আর হবে না।

সুধাকে আজই নিয়ে যাবে সুরেশ। দেরি করা যাবে না। অফিসে তার জরুরী কাজ। হৃদয়রঞ্জনবাবুকে 'বাবা' এবং স্ত্রীকে 'মা' বলে সম্বোধন করলো। সে বললো, আপনারা কিছু ভাববেন না। আপনারা শুধু আমাদের মাথায় ধানদুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করুন। তাহলেই আমাদের মঙ্গল হবে। অযথা খরচ করে কি হবে। আমরা বাড়ি গিয়েই রেজিস্ট্রী করে নেবো। তারপরে বাড়িতে অতিথিদের আমন্ত্রন করে একটা উৎসব করব। তার আগেই চিঠি দিয়ে আপনাদেরকেও যেতে লিখবো।

তাই হলো। হৃদয়রঞ্জনবাবু ও তাঁর স্ত্রী ধানদুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। শঙ্খও একটু বেজে উঠলো। সুরেশ মাথা নীচু করে শ্বশুর—শাশুড়ীকে প্রণাম করলো।

বাড়ির বড় মেয়ে, গয়নাগাঁটি কিছু করা ছিল। সুরেশকে শাশুড়ী এ প্রসঙ্গে বলতেই সুরেশ বলে উঠলো মা বাবা আমার জন্যে অনেক পাত্রী দেখেছেন। আমাদের ঘর অনুযায়ী চল্লিশ ভরি সোনা, পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ, কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্রেরও অর্ডার এসেছে। কিন্তু এসব আমার ভাল লাগে না। তবে আমার মা জবা তো রয়েছেন। তাঁরা যাতে একটু খুশি হন তাই-ই আপনারা করুন। তবে নগদ টাকা আমি নেবো না। কারণ ওটা আমার নীতি বিরুদ্ধ।

ঘরও যেমন বড়, ঘরও তেমনই। তাই সাধ্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ ন'শত ভরি সোনার গয়না সুধাকে পরিয়ে দিলেন হৃদয়রঞ্জনবাবু ও তাঁর স্ত্রী। কিন্তু ছেলের মাপ মতো না হওয়ায় ছেলেকে একটি আংটিও দিতে পারলেন না। এর জন্যে অবিশ্যি সুরেশের অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেল না। বলল—ওর জন্যে ভাববেন না আপনারা। উৎসবে যখন যাবেন তখনই নিয়ে যাবেন ওটা।

এবার ওভযাত্রা। চোখে জল সকলের। চোখে জল সুরেশেরও। শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে 'দুর্গা' 'দুর্গা' ধ্বনির মধ্যে সুধাকে নিয়ে এগিয়ে চলে সুরেশ।

ট্রেন ধরলো। চলে এলো হাওড়ায়। উঠে এলো 'মনোরমা' হোটেলে। বেশ সাজানো গোছানো একটি ঘর। দেখে বেশ আনন্দ সুধার। সুরেশ সুধালো—দেখ তো, কী সুন্দর জায়গা।

সুধা বল—সত্যিই সুন্দর।

এত সুন্দর জায়গায় আমরা দুদিন থেকে যাই, কি বলো—শুধালো সুরেশ।

ঘাড় নেড়ে হাসিমুখে সম্মতি জানালো সুধা।

বেল কেটে গেল দুদিন দুরাতে।

এবার বাড়ি যাবার কথা বল সুরেশ। তার আগে সে অফিসে দেখা করে যেতে চায়, দেখিয়ে নিতে চায় নববধূ সুধাকে।

দুজনে চলল রাইটার্সে। আগেই সহকর্মীদের বউ দেখাতে, সেখান থেকে যাবে বাড়িতে।

পৌঁছেও গেল রাইটার্সে। কিন্তু সরাসরি তো আর বউ নিয়ে ঢোকা যায় না। দপ্তরে গিয়ে আগে পরিচয়ের তৈরি করতে হয়। বুঝালো সে সুধাকে।

সুধাও বুঝলো। সুরেশের নির্দেশ মতো বাইরের একটি বেঞ্চে বসে রইল সুধা। ব্রীফকেস নিয়ে সুরেশ ঢুকে গেল দপ্তরে।

সময় গড়িয়ে যায়। মিনিটের কাঁটা ঘুরে যায়, ঘন্টার কাঁটাও। অসেই জায়গায় সুধা। ঘন্টা তিনেক পেরিয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। উদ্বেগের চিহ্ন সুধার মুখে। অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেল না।

ইতিমধ্যে আরও সময় কেটে গেল। সুধার চোখে এখন জল। ভীড় জমে উঠেছে সুধাকে কেন্দ্র করে। প্রথমদিকে জর্জরিত সে। তাকে দপ্তরেও নিয়ে গেল, ঘুরিয়ে দেখানো হলো। কিন্তু তার পরিচিত সুরেশকে সে দেখতে পেল না। তোতা নিয়ে বেরিয়ে গেছে কে জানে! দপ্তরে ঢুকবার বেরোবার পথ তো তিন তিনটে।

কান্না-ভেজা গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় কাহিনী শুনালো সে। হাওড়ায় হোটেলে সুরেশ বলেছিল—এর নাম কলকাতা, ভয়ংকর জায়গা। এখানে কেউ সোনা দানা পরে না।

একথা গাঁয়ে থাকতেও শুনেছিল সুধা। তাই এক এক করে গয়নাগুলো তুলে দিয়েছিল সুরেশের হাতে, সুরেশ ওগুলো ভরে নিয়েছিল ব্রীফকেসে।

সকলেই বুঝে নিয়েছে কী ঘটেছে আসলে।

পুলিশ এলো। নিষ্পাপ মেয়েটি এখন পুলিশের হেপাজতে। এরপরে ওর স্থান হবে কোথায় কে জানে!

পণ্য

রাসবিহারী দত্ত

নপটি কাঁধে ঝোলাটি ঝুলিয়ে হাসনাৎ বেরিয়ে পড়ে। সরু চটি ঝুলে থাকে। হাটাস হাটাস শব্দ তুলে চলে এগোচ্ছে মাঠে। মাঠে মাঠে এগোবার পেছন দিকে চাকায় কাদা, আশ্বাব আঁচল ধরে নিচাপি হয়ে দাঁড়িয়ে। এবারে হাত নাড়িয়ে, এগিয়ে চলে সন্ধানের দিকে।

পথ হাঁটছে হাসনাৎ। কিন্তু মন চলছে উজানে। উজান বেয়ে চলেছে হাসনাৎ আশ্বাসের কাঁপছে উত্তেজনায়। হাতের মুঠিতে এখন আকাশ। গাছ-গাছালির ফাঁক-ফোকরে টুপ টুপ ডুব দিচ্ছে অস্তগামী সূর্য। চারদিকের কলরব ধিতোতে ধিতোতে নৈঃশব্দে নামছে। দূরন্ত বাড়ির ঘুরন্তুর শব্দগুলো তা যেন বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু এসবের কোন কিছুই হাসনাতের মনের উজানে কোন বিভ্রাট ঘটাতে পারছে না।

হাসনাৎ শেখ। তাহিরপুর মৌজায় তাকে সবাই চেনে। ছিপ ছিপে লম্বা, চেহারা। অম্বল পিত্তের রোগীর মত পেট আর পিঠ কিছুটা ঝাঁকা। পূর্ণিমা অমাবস্যার মতো তার শরীরে জৌলুস আসে আর যায়। ঠিক তার মরশুমি ব্যবসার মত।

হাসনাৎ ব্যাপারী। তার বেসাতি নানা পশরায়। যখন যেমন, তখন তেমন। চাষের মরশুমের আগে সে গরুর ব্যাপারী। কাছুর সময় কাছু, তিলের সময় তিল, সরিষার সময় সরিষা। কুমড়োর সময় কুমড়ো। আর যখন কোন ফসল থাকে না, তখন তার টুকটুক গরু-ছাগলের ব্যবসায় চলে।

ফলে তাহিরপুর কেন পাশাপাশি মৌজার অনেকেই তাকে চেনে। কারণ প্রায় বাড়িতে তার অবাধ যাতায়াত। কিন্তু টাকা পয়সার ধার বাকিতে কারো কখনো যে সে নয়-ছয় করেনি তা নয়। মৌজার সবাইই তার উপর কোন না কোন ভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু দায় দরকারে চাষের বলদটি পরিবর্তন করতে হলে কিংবা ফসলটি বেচতে হলে যেহেতু হাসনাৎকেই সবচেয়ে পড়ে তাই ভালোর মন্দোর সবার চেনা। গরীব সম্পন্ন গ্রামবাসী যে ফসল ফলায় তা নিজেরই সংসার খরচের জন্য, কিন্তু কখনো কখনো বাড়তি ফসল হয়। বাড়তি ফসল নিয়ে কে আর পশরা সাজিয়ে বসে। তা সব ক্ষেত্রে সম্ভবপরও নয়। তাই সবারই নির্ভর হাসনাৎ কুড়োয় সে।

কিন্তু আগের মত তার আর ব্যবসা চলে না কেন না ব্যাপারী হিসেবে হাসনাৎ আর একা নয়। তিন চারজন এই কাজে নেমে পড়েছে। প্রতিপত্তি যেতে বসায় সংসারে এখন টানাটানির চূড়ান্ত।

তারপর অনুবস্ত্র হিসাবে ছুটছে তিন তিনটি কেস। মহকুমা কোর্ট ছোটাছুটিতে পয়সা যাচ্ছে মেলা। কোন মতেই আয় বাড়ে সামাল দিতে পারছে না। এই সময়ই ছক্কু মিঞার বাড়তি উপসর্গ।

আজও হাসনাতের গন্তব্যস্থল হল মহকুমা কোর্ট। কিন্তু আজ আর হাসনাতের ভারাক্রান্ত অবস্থা নয়। সে আজ মৌজে আছে। হাঁটছে, মন তার উজানে। পায়ের গতি যেন রণ পা।

কেস থাকলেই সে আগের দিন বেরিয়ে যায়। জাতভাই সোহরাবের বাড়িতে কে যেন ডেকে উঠল।—সন্ধ্যা নেমে গেছে। সাতটার বাসটা না ধরতে পারলে ফের একঘন্টা পরাতে হবে। পা চালায় হাসনাৎ।

কিন্তু মনটায় ছলাৎ চলাৎ খেউ খেলছে। একটা তীব্র জ্বালা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। হাজার হাজার টাকা নয়, মাত্র পঁচিশ টাকা। আর দুটি মাস সময় চেয়েছিল সে। এমন বেহেড যে, পঞ্চায়েতে নালিশ করে দিল।

ছক্কু মিয়ার ওমর শরীরে জ্বালা ধরালেও ধৈর্য্য হারায় নি হাসনাৎ। মুহূর্তে মুলকিল আসান করে ফেলে ছুটেছিল ঝিজমৎপুর।

হাসনাৎকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল ছক্কু মিঞা যার বিরুদ্ধে সে পঞ্চায়েতে নালিশ করেছে, অপমানের চূড়ান্ত করেছে যে, সে বিনা দ্বিধায় এসে উপস্থিত। মতলব আছে নাকি কিছু। সন্দিগ্ধ চোখ তুলে তাকিয়েছিল ছক্কু মিঞা।

হাসনাৎ উপচে পড়া উৎসাহ দেখিয়ে বলল—সালাম ছক্কু মিঞা। আমতা আমতা করে ছক্কু মিঞাও সেলাম জানালো।

হাসনাৎ পিঁড়িটাকে টেনে নিয়ে জাঁকিয়ে বসল। তারপর বলল, হালুক সাজো মিঞা ভাই, বেশ বকল গেছে।

সন্দেহ নিয়েই বাঁশের দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর গেল ছক্কু মিঞা।

হাসনাৎ ফুরসত পেল ভাবনার। কি ভাবে কথাটা পাড়লে কাজ হবে। সব থেকে যাথার জায়গায় সাবধানে গুছিয়ে না বলতে পারলে ভেস্তে যাবে সবটা।

বাঁশের দরজাটায় ফের কাঁচ ভরে শব্দ হল। চমকে উঠল হাসনাৎ। নিজেকে সামলে নেয় মুহূর্তে। হাসনাৎ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। কথাটা পাড়ে। আলাপ জমায়। উপচানো খুশি চেপে রাখে।

বাসের শব্দে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাঙে হাসনাতের। কখন সে চৌদ্দমাইল বাসস্ট্যান্ডে এসে পাঁচে

পেছে। সাতটার বাস ছাড়বে ছাড়বে করছে। পরিপাটি করে জামাটা পরে নেয়। আর তড়িঘড়ি উঠে পড়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস ছাড়ে। জানলার পাশটায় বসার জায়গা পেয়ে খুশি হয়। জানলার কাচটা সরিয়ে দেয়। বাইরের দিকে তাকায়। জ্যোৎস্নায় ভরে রয়েছে চারদিক। আকাশের দিকে তাকায়, সুডৌল চাঁদ জ্বলছে। লাজরাঙা দুলহনের মত। দুলছে। ভেসে ওঠে নসীবনের মুখ। প্রায় বছর খানেক হল খোদাবক্স হাসনাতের পেছনে লেগে আছে। খোদাবক্সের কথা কোনদিনই রাখতে পারেনি। বার বারই ছলে চিররুগ্না বিবির প্রসঙ্গ তুলে নিরস্ত করেছে। বিবির ভীষণ রোগ, এই যায় সেই যায় অবস্থা। কথায় কথায় একবার হাসনাৎ খোদাবক্সের কাছে বলে ফেলেছিল। সেই থেকেই খোদাবক্স পেছু নিয়েছে।

অবশ্য মেয়ে নসীবন খুপসুরৎ। কিন্তু ঘুপচা মন্দ। পর পর দুবার বিয়ে দিল। দু দু'বারই নসীবনের নসীব পুড়ল। একজন দুরারোগ্য রোগে আর একজন অপঘাতে। তারপর থেকেই নসীবনের নামে কলঙ্ক, নসীব পোড়ানো মেয়ে এই নসীবন।

সবে বাইশে পা দিয়েছে নসীবন। খুবই কাঁচা বয়স। জলকলসির ভাঁটার মত শরীর। যেদিন প্রথম দেখেছিল হাসনাৎ, কয়েকমুহূর্ত চোখ নড়েনি। যেন বেহেস্তের হুরী। সে দিন সে তার ডাগর চোখে সুরমা পরেছিল। আর নির্ভরতার অবলম্বন খুঁজি পেয়ে যেতে পারে এমনিভাবে এনে চোখে মায়া ছড়াচ্ছিল। কোন গোপন ইচ্ছা যে সেই মুহূর্তে সুরসুড়ি দিয়েছিল তা হাসনাৎ নির্ঘাৎ বোঝে। এই সময় দিদারীর মায়ের শীর্ণমুখ ভেসে ওঠার একটু ইতস্তত বোধ করেছিল কিন্তু তার তো এই যায় সেই যায় অবস্থা। তাই সব আশার জলাঞ্জলি দিতে হাসনাৎ চায়নি। নসীবনের প্রত্যাখ্যান উৎসাহ সেই মুহূর্তে না জাগলেও নিরুৎসাহের উষ্ণ ঝলু হাসনাৎ ফিরিয়ে দেয়নি।

পরমুহূর্তেই ভীরু ভয় ছায়া ফেলেছিল সারা শরীরে। চারদিকের প্রচার নসীব পোড়ানো মেয়ে নসীবন। যার ঘরে যাবে নির্ঘাৎ তার ঘর পুড়বে। সাধ গেলেও বুক দুরু দুরু ভয় সাহসকে সাপটে ধরে। তাই এতদিন কোনভাবে এগোয়নি হাসনাৎ।

এহেন মেয়েকে নিয়ে বিপদে পড়েছে খোদাবক্স। কোনমতে পার করতে না পারলে সারা জীবনের দুশ্চিন্তা। অথচ সাহস হাসনাৎকেই সে পাকড়েছে। সে যে দেবে বোঝে না তা নয়। তবে মেয়েকে উদ্ধার করতে হবে আগে।

নসীবনের কথা খোদাবক্সকে হাসনাৎ বলে দিয়েছে। এমনকি এ কথাও শুনিয়েছে যে ওই সব প্রচারে তার কোন ভয় ডর নেই। নেহাৎ চিররুগ্না বিবি। ওটা দিন গেলেই না হয়.....। এই বলে সময় পেরিয়ে এসেছে হাসনাৎ।

এমন সময় সুযোগটি হাতের কাছে এসে যায়। হাত বদল হতে হতে বেশ কিছুটা সময়ও পাওয়া যাবে। আখেরে মোক্ষম দাওয়াইও দেওয়া হবে। আসলও মিটে হলো না অথচ সুদ মিলল চৌদ্দা।

সব ব্যবস্থাই পাকা। ভালোয় ভালোয় ব্যাপারটা মিটলে হয়। বাস থেকে নেমেই সোজা উঠবে সোহরাবের বাড়ি। আজ রাতেই সব সেরেসুরে রাখতে হবে। বাইরে চোখ মেলল। সাদা মখমলে মোড়া গাছপালা পেছনের দিকে ছুটছে। এখনো শহরের আলো দেখা যাচ্ছে না। তবে বেশী বাকি নেই।

পরদিন সকাল সকাল সব কাজ সমাধা করে হাসনাৎ ছুটল বাস স্ট্যান্ডে। ওখানেই খোদাবক্স ও নসীবন নামবে বাস থেকে। নসীবনের কথা মনে পড়তেই তার পুরো ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনটা আনমনা হল মুহূর্তে। ভেসে উঠল ছকু মিঞার মুখ। বিবিয়ে গেল সারা শরীর ও মন। বাটাকে এমন শিক্ষা দেবে যে সারা জীবনের মত তাগাদার তপতে হবে। পরক্ষণেই আবার মনটা আকুলি বিকুলি করে উঠল। বেচারা নসীবন, তার কি দোষ। এমন সুন্দর ফলফলানো লাউডগার মত তাঁটালো শরীর। মায়া করানো এমন চাউনি। কিছুটা অপরাধবোধ পেয়ে বসল হাসনাৎকে। বিষয় হল মন। কিন্তু পরমুহূর্তেই সব কোথায় উবে গেল। জুনপুট থেকে সেই একটাই বাস যায় আর আসে। একটা বাস ধরতে না পারলে বলে থাকো ঘণ্টা দেড়েক। নিশ্চয়ই খোদাবক্স বা নসীবন ঐ বাস ধরবে। সারা জীবনের মতো খোদাবক্সের নিশ্চিন্তি। নিশ্চিন্ত কি? এ নিয়ে ভাববার সময় নেই হাসনাতের। কন্যাদায় থেকে মুক্তি দিচ্ছে এতো মহৎ উপকারই। তারপর যখন অলক্ষণে নসীব পোড়ানো মেয়ে। বলতে গেলে, খোদাবক্সের মহৎ উপকার করছে হাসনাৎ। অবশ্য জিনিস পত্তরের বদলে টাকাই চেয়েছে হাসনাৎ।

-সে জিনিসপত্তর ওওরাখোওরার অক্তি অনেক। টাকাই সই। বামনগর বাজারেও কেনাকাটা করা যাবে।

-না বলছিলাম কি ওখানে এখানকার থেকে দাম পড়বে কেন।

-সে আর কতটুকু। একটু দাম কমের জন্য ঝক্তি কিনেক।

আর কথা বাড়ায়নি খোদাবক্স। সেরেসুরে যদি ব্যাপারটা মিটে যায়। মেয়েটার মতো মেয়ে বিদায় যখন দিলেছে টাকাটা নিয়ে আমেলা করা নিরর্থক। সে চুপ করে যায়।

সব আশাকে অবসান ঘটিয়ে জুনপুটের বাস এসে থামল। এদিক ওদিক চোখ ফেলতে হল না। খোদাবক্সই জানলার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাদের উপস্থিতির কথা জানাল। নিশ্চিন্ত খোদাবক্স। নিশ্চিন্ত হাসনাৎও।

বাস থেকে নামার সময় হাসনাৎ একটাকে লজ্জায় মিইয়ে থাকা নসীবনকে দেখল। চোখে চোখ পড়ল। চোখ নামিয়ে নেয়। মরমে মিইয়ে যায় নসীবন। খোদাবক্স পেছনে তাকিয়ে তখন বলছে-সাবধানে পা ফেলিস, পা পিছলে পড়ে যাসনি যেন।

এই সতর্কীকরণে কাজ হল। আরক্তিম মুখের ছবি বদলে গেল এক নিমেষে। ধীরে ধীরে পা ফেলে নেমে পড়ে নসীবন।

এবার খোদাবক্স হাসনাতের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে: সব ব্যবস্থা পাকা তো?

মাথা নেড়ে সায় দিল হাসনাৎ।

এরপর সকলেই এগিয়ে যায় রেজেস্ট্রি অফিসে। অফিসের সঙ্গে সব যোগাযোগই করেছে জাতভাই মোহরারটি। সে সেখানেই আছে। হাসনাৎ সেই অফিসের দিকেই নিয়ে চলল। ভাবতে থাকে কি জানি ছকু মিঞা পৌঁছেছে কিনা!

কয়েক পা মাত্র। সেখানে পৌঁছাতেই মোহরার ব্যস্ত সমস্ত হয়ে খাতির যত্ন করল খোদাবক্স ও নসীবনকে।

সব ব্যবস্থা পাকাই ছিল। মোহরার সকলকে ভেতরে নিয়ে গেল। খোদাবক্সের এসবের কোন অভিজ্ঞতা নেই। সে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকল প্রতিটা। রেজিস্ট্রার বার বারই তাকে দেখছে যেন। খোদাবক্স যেন সন্তুষ্ট হয়

এমন সময় রেজিস্ট্রার দুটো কাগজ বাড়িয়ে দেয়। একের পর এক সই। সব শেষে সেই হাসনাৎকে সই করতে দেবে রেজিস্ট্রার যেন এক মুহূর্ত কি ভাবেন। হাসনাৎকে কাগজটি সই করতে দেওয়ার সময় নিজের তর্জনী দিয়ে কায়দা করে টিপ ছাপের নিচে সাক্ষীর জায়গায় সই করতে ইঙ্গিত করল। কারণ খোদাবক্স বেশ খুটিয়ে খুটিয়ে রেজিস্ট্রারের সব কাজ দেখছে। ব্যাপারটা হাসনাতের জানা। সে বাম হাতটা আড়াল করে সাক্ষীর জায়গায় সই করল। সই সাবুদ সেরে রেজিস্ট্রার আইনঘটিত কাজ-কর্মের সংক্ষিপ্ত সমাধা করে ফেলে। তারপর চলে মিষ্টি মুখের পাট।

এত তাড়াহুড়ি ব্যাপারটা চুকে-বুকে যেতে খোদাবক্স আসতে আসতে রাস্তায় হাসনাতের কেন এবিধা করল। তারপর বলল, গাঁয়ে নিয়েই মসজিদে শ্রীলতীর সঙ্গে দেখা করে

বাকি কাজটা যেন মিটিয়ে নেয়। হাসনাৎ ব্রতে বলল, সে সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি।

খোদাবক্স এবার বাসস্ট্যান্ডের নিমগাছের নিচে একটু থামে। লুঙ্গির খুঁট খুলে টাকা বের করে। তারপর হাসনাতের হাতে দিয়ে গুণতে বলে। হাসনাৎ যেন ঘরের সঙ্গে গুণে নেয় নোট।

হাসনাৎ টাকা কটা টাঁকে গুঁজে যেন খুশি খুশি মুখে তাকায়। খোদাবক্স হাসি হাসি ভাব এনে বলে, খুশি তো? হাসনাৎ উত্তর করে কাঁচু মাচু হয়ে-কি যে বলেন।

এবার বিদায়ের পালা। খোদাবক্সের চোখ ছল ছল করে উঠল। মেয়ের সঙ্গে কাউকেই পাঠাচ্ছে না। অনেক ভেবেচিন্তেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে খোদাবক্স। বাড়িতে রুগ্ন বিবি। কখন কি না কি ঘটে। এই মওকা ছাড়তে হবে ভেবেই খোদাবক্সের কঠিন মনও কেঁদে ওঠে। অবশ্য হাসনাৎকে দীর্ঘদিন চেনে। তাছাড়া মসজিদের মৌলভীও তার বিশেষ পরিচিত। মুহূর্তে এইসব চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করে কিন্তু সেগুলোকে দূরে ঠেলে সচেতন হয়। এবার বিদায় দিতে হবে। বাস ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছে।

হাসনাতের হাতদুটো ধরে ছল ছল চোখে খোদাবক্স জড়ানো গলায় বলে, বড় আদরের মেয়ে আমার। তার সব ভার দিলাম তোমার উপর। যেন সুখে থাকে। আমার মেয়েকে আমি জানি। ও তোমাকে সুখে সোহাগে রাখবে। হ্যাঁ যে টাকাটা বাঁচবে তা দিয়ে স্থায়ী ব্যবসা করো। আমি গিয়ে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে আসব।

বিদায়ের পালা হঠাৎই শেষ হয় যেই বাসটি স্টার্ট নিল। নসীবন গিয়ে লেডিজ সীটে বসে। হাসনাৎ ও হুকু মিঞা বসে পাশাপাশি। বাস চলতে শুরু করে। নসীবন জানলায় মুখ বাড়িয়ে কিছুক্ষণ বাগানের দিকে চোখ রাখে। কিন্তু মুহূর্তেই আড়াল পড়ে উঠল।

দুচোখে জলের ধারা তখনো শুকোয়নি। লজ্জা ও কৌতূহল মেশানো চোখে তাকায় হাসনাতের দিকে। দেখে দুজনেই বেশ কথাবার্তায় ব্যস্ত। চোখ মেলে দেয় বাইরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।

তীব্র বেগে বাস ছুটে চলছে। দূরে সমুদ্র পাড়ের কাউ গাছগুলো মাথা উঁচু করে সারি সারি অপূর্ব মায়া ছড়াচ্ছে। সোনা হাওয়া এসে বিলি কাটছে চুলে। ব্যাগে একটা সাদা গাইডের কালো বাস্তুর চলতে চলতেই বাঁটে মুখ দেওয়ার চেষ্টা করে বিফল হচ্ছে। তার মা দাঁড়াচ্ছে না। চলছে তো চলছেই।

হঠাৎই আব্বাজানের কথা মনে আসে। বুকের ভেতরটায় দমক লাগে। বাড়ন্তুলেমানপুর-বাজান আব্বা- প্রিয় ছবিগুলো সব ভেসে ওঠে। সবই ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

মাতনাটা থেকে থেকে একেবারে বুক থেকে গলা পর্যন্ত উঠে আসে। অনেক কষ্টে চেপে থাকে, বাইরের আকাশ, গাছপালা, পাখ-পাখালি ও বিচিত্র ঘটনা দেখতে দেখতে।

এক সময় চোখ যায় হাসনাতের দিকে। ব্যাগে হাসনাৎ ও সেই বুড়োটি কি যেন চাপা কথাবার্তা বলছে। বুড়োটি কথার ফাঁকে ফাঁকে বারবারই তাকাচ্ছে নসীবনের দিকে। নসীবন কেমন যেন লজ্জা পায়। সে ঘোমটা একটু জবর টেনে দেয়। হাসনাতের কোন চাচা বা আত্মীয় হতে পারে। এই সময় হাসনাতের উপর তার খুব রাগ হয়। তার উচিত ছিল বলে দেওয়া যে কি, কীভাবে তার থাকবে করা উচিত ইত্যাদি। কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকত।

এমন সময় নসীবনের চোখে হাসনাতের চোখ পড়ে যায়। মিষ্টি হাসে নসীবন। হাসনাৎও মুচকি হাসে। নসীবনের ফের চোখ পড়ে যায় বুড়ো মিঞার উপর। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা। সেও ফোকলা দাঁতে হাসছে। লজ্জায় নসীবনের মাথা কাটা যাওয়ার জোগাড়।

বাস চলছে। তীব্র বেগে ছোটে এ লাইনের বাস। দূর দূর স্টপেজ। কাঁকুনি এমন হয় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাট বল্টু যন্ত্রাংশের মত আলগা হয়ে খসে খসে পড়ার যোগাড় হয়।

জানালার কাঁচ থেকে চোখ ফেরাতেই হাসনাতকে দেখে চমকে ওঠে। হাসনাৎ নিবিষ্ট মনে টাকা গুনছে। তবে কি বাজানের দেওয়া টাকা। না না, তা হয় কি করে। এমন সময় দেখল বুড়ো মিঞা আবার এক থোক টাকা দিল। হাসনাৎ ফের গুনতে থাকে। তারপর আবার। নসীবন ক্রমশই হতচকিত হয়ে যায়। কোন ভাবনাই তার কূল কিনারা পায় না। বেশ কৌতূহল নিয়েই ঘোমটার ফাঁক থেকে দেখতে থাকে। এক সময় দেখে হাসনাৎ গোনা টাকাগুলো ট্যাকে গুঁজছে। কিছুটা আশ্বস্ত হয়। এবার দেখল মিঞাকে কাগজ দিতে। হাসনাৎ হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে বেশ কয়েকবার দেখে। তারপর সেটিও বেশ সযত্নে রেখে দেয়।

মিঞা মাথা নেড়ে কি যেন জিজ্ঞেস করে। হাসনাৎও মাথা নেড়ে কি যেন বলে। সারা মুখে তৃপ্তির ঢেউ খেলে। আর অমনি চুক চুক চোখে তাকায় নসীবনের দিকে। নিমেষে নসীবন মুখ ফিরিয়ে নেয়। জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে ধরে। আর সাত পাঁচ ভাবনার ডুব দেয়।

হাসনাৎ-এর ডাকে চমকে তাকায়। ভাবে নামতে হবে। তড়িঘড়ি সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। হাসনাৎ নিরস্ত করে বসতে ইঙ্গিত করে। আর শরীর খারাপ লাগছে। সে নেমে পড়বে। পরের বাসে যাবে। চাচা তাকে ঘরে পৌঁছে দেবে।

কথা শেষ করতে না করতেই দাঁড়িয়ে বাস থেকে নামল। নসীবন কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাস ফের ছেড়ে দেয়। নসীবনের চোখে আঁধার নামে। সে নতুন বিবি, চাচার সঙ্গে পাঁরে ঢুকবে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

সে কৌতূহল মেশানো চোখে তাকায় চাচার দিকে। বিস্মিত হয়। চুক চুক চোখে চাচা তাকিয়ে আছে যেন। মুখে মিট মিট হাসি। নিমেষে দৃষ্টির ধরণধারণ ক্রমশই বদলে যাচ্ছে। বেশ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় নসীবন।

হুকুমিঞার চোখজোড়া ক্রমশই উজ্জ্বল হয়। বড় সুন্দর ভাগর ভাগর চোখ নসীবনের। এমন ওঁটো শরীর যে শাড়ীর বাঁধনে আটকে থাকতে চায় না। বাসের কাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কিছু কিছু অংশ বে-আব্রু হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে হুকুমিঞা তারিফ করে হাসনাতের। যতখানি খারাপ ভেবেছিল হাসনাৎকে ততখানি খারাপ সে নয়। বেশ করিৎকর্মা। ভালোই। কেমন খুপসুরৎ জুটিয়ে আনলো এক নিমেষে। প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি। তবে একেবারে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেওয়াও হুকু মিঞার স্বভাব বিরুদ্ধ।

এমন সময় কন্ডাক্টর হাঁক ডাক শুরু করে চৌদ্দ মাইল, চৌদ্দ মাইল। ব্রতে হুকু মিঞা ঝট্ করে উঠে পড়ে। তারপর নসীবনকে ইংগিত করে-নামো।

এক মুহূর্ত ভাবে নসীবন। বাস থেকে না নামলে তো কোন সুরাহা নেই। যে করেই হোক গাঁ পর্যন্ত গেলে হয়। নাকি বাস থেকে নেমে অপেক্ষা করবে হাসনাতের জন্য। শরীর খারাপ বলল। এখানে অপেক্ষা না করে ঘরে যাবে বা কি করে। নসীবন অস্বস্তিতে কাল গুনছিল। হুকু মিঞার ডাকে সে উঠে পড়ে।

বাসটা এতক্ষণে থেমে গেছে। যাত্রীরা প্রায় নেমে পড়েছে। হুকু মিঞা আগেভাগেই নেমে পড়ে হাত বাড়িয়ে আছে। অবশ্যনা নসীবন ঠিকমত নামতে পারছে না যেন। লজ্জারুণ নসীবন সাবধানে হুকু মিঞার হাত উপেক্ষা করেই নেমে পড়ে।

চোখমুখ কোঁচকায় হুকু মিঞা। অস্ফুটে কি যেন বলতে থাকে। শুনতে পায় না নসীবন। তবে মিঞার মুখভঙ্গী ভালো ঠেকে না নসীবনের। বাস ছেড়ে চলে যায়।

নসীবন একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে হুকুমিঞা কোথা থেকে একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে এসে দাঁড়ায়। নসীবনকে ইংগিত করে রিক্সায় ওঠার জন্য। নসীবন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দাঁড়িয়েই থাকে।

বিরক্ত হয় হুকু মিঞা। নসীবনের কাছে সরে গিয়ে জলে-হাজার টাকা গুনাগার দিয়ে শাদী করেছি: মুফৎ নয়।

চোরা স্রোতে

মোহন নস্কর

দিন দিন রহস্যময়ী হয়ে উঠছে রণিতা। তার ভাবনার সঙ্গে মিলছে না পরিবারের অন্যান্যদের ভাবনা। বাজারের আলু পটল যাচাই করে কেনার মত মেয়ে দেখাকে তার মনে হয়েছে অপালীন প্রক্রিয়া। অপমানকর, নারীত্বের অবমাননা। আদিম অসভ্য প্রথা। কিন্তু অভিভাবকদের খুশি করতে পাত্র পক্ষের সামনে তাকে বসতে হচ্ছে। উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তারা চলে গেলে বলছে—রিজেক্ট।

আঠারোজন পাত্র এবং পাত্রপক্ষ এলো দেখলো পছন্দের কথা জানালো। ফিরে গেল। রণিতার পছন্দের সীমানায় কারও তরী ভিড়ল না। তাদের পছন্দ হলেও রণিতার পছন্দ হলো না। ওরা কেউ গ্রেজুয়েট পেত্নি নয়। শিক্ষায় সৌন্দর্যে স্বাস্থ্যে যোগ্য। সুদর্শন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত। ওদের কেউ ইঞ্জিনীয়ার। কেউ আই. এ. এস. অফিসার। কেউ অধ্যাপক, কেউ বা প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। এদের কাউকেই যোগ্য মনে করছে না। আজকাল ছেলে মেয়েরা নিজেদের জীবন সঙ্গী নিজেরা পছন্দ করে নিচ্ছে। তেমন কিছু করলে খুশি হতেন রণিতার অভিভাবকরা। আশ্চর্য: মেয়ে কি চাইছে বোধগম্য হচ্ছে না তাদের।

আশ্চর্য চরিত্রের মেয়ে। নিজের ইচ্ছা নিজের নিয়ন্ত্রণে নাই। দর্শনে মাস্টার ডিগ্রি পেয়ে প্রথমে বললো—অধ্যাপনা করবো। কিছুদিনের মধ্যে সে ইচ্ছা ত্যাগ করে বললো—মডেলিং করবো। এক দুদিন গেল। কাজও গেল ছোট খাটো। মন ভরলো না। বললো—বাবিশ। নোংরা জায়গা। পরের ইচ্ছা সঙ্গীত শিল্পী হলো। চর্চাও করলো প্রখ্যাত শিল্পীর কাছে। কিন্তু সঙ্গীতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন, তা ছিল না রণিতার। ছেড়ে দিল। এখন রূপচর্চা। সিনেমা দেখা আর এক দঙ্গল ছেলে বন্ধু নিয়ে হৈ হল্লোড় করে বেড়ায়। রণিতার জীবন চর্চা বলতে এখন এই টুকু। আগে তবু সাহিত্যের প্রতি কিছুটা আগ্রহ ছিল এখন তাও নেই।

রণিতা সত্যিই সুন্দরী। ধৈর্য ধরে থাকলে নামি মডেল হতে পারতো, চাই কি সিনেমার নায়িকা হওয়ার সবরকম যোগ্যতা ছিল। বাবা নামি ব্যবসায়ী। দুই দাদা। বাবার সহকারী। এরা এ যুগের সংস্কার মুক্ত মানুষ। মেয়েকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। মেয়েকে স্বাধীন ভাবে সঙ্গী নির্বাচনের ব্লাঙ্ক চেক দিয়ে বলেছেন—তোমার নিজের পছন্দ থাকলে আমাদের আপত্তি নেই। রণিতা জানিয়ে দিয়েছে সে রকম পছন্দের কেউ নেই। অনেক ছেলে বন্ধু আছে ঠিকই। কিন্তু তারা শুধুই বন্ধু। তার বেশি নয়। কলেজ জীবনে দু-একজন ছেলে বন্ধুকে ভাল লেগেছিল। কিন্তু সেই ভাললাগার আয়ু বেশি পায়নি। রণিতার উপলব্ধি এরাও অন্যের থেকে আলাদা নয়। এরা বন্ধু হতে পারে কিন্তু স্বামী নয়।

তবে কি কুমারী থাকতে চায় রণিতা? সে নিজেও জানে না কি চায়। সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি অভিভাবকদের। আসলে তার ভাবনার মানদণ্ড এক নয়। অন্যান্যের ভাবনা কালকের ভাবনার সঙ্গে মেলে না। আজ যা চায় কাল তা চায় না। আজ যাকে ভাল মনে হয় কাল ধারণা পাল্টে যায়। সব ক্ষেত্রেই তার মনে হয়েছে এটাই শেষ নয়। শ্রেষ্ঠ নয়। শেষের পরেও শেষ

আছে। প্রেটর পরে আছে প্রেটতর।

বান্ধবীরা সতর্ক করেছে-আজ যাদের বাড়িতে ডাকছিস। একদিন ওদের জন্যেই পস্তাতে হবে। বান্ধবীদের সতর্কবাণী রণিতার কাছে কৌতুকের। তার বিশ্বাস অন্যরকম। হাসতে হাসতে বান্ধবীদের দিকে সরস জবাব ছুঁড়ে দিয়েছে-ঘুষটা টাকার রূপ। টাকা ছাড়লে অনেক পাঁঠা পাওয়া যাবে। চাইলে রামপাঁঠাও পাওয়া যেতে পারে।

জর্মনির অধ্যাপক পাত্র এনেছিলেন বড় মামা। ডক্টরেট। বৃষ্টি পরে পাত্রী দেখতে এসেছিলেন বলে রণিতার কাছে ছবিটি। মন্তব্য—এ যুগে অচল। সেকেলে, অরুচিকর, ভি. ভি. পি'র ইঞ্জিনীয়ার বড়দার বন্ধু। বেতন হাজার পুনের টাকা। অন্যান্য ভাতা অতিরিক্ত। সুদর্শন। বিদেশের ডিগ্রি আছে। প্রবাসী বাঙালী। বিদুষী বালিকা। সেও বাতিল হয়েছে মায়ের চুল ছোট করে ছাঁটা বলে। অদ্ভুত মন্তব্য রণিতার।

মেড়োর গলায় মালা দিতে পারবো না বাপু! ছাঁ চুল বটে সঞ্জয় দত্তের। যাকে বলে ম্যাচো হিরো। বড়দা বোনের পছন্দের কথা শুনে বন্ধুকে বললো-তুই সঞ্জয় দত্তের মত চুল রাখতে পারবি না?

বন্ধু শ্রীশীশ হেসে বললো—না।

—কেন?

—আমি হনুমান নই।

সঞ্জয় দত্তের মত কাঁধাবি চুলের আর একটা পাত্র আনলো বড়দা। রণিতার পছন্দ হলো। কিন্তু যখন শুনলো বেতন বেশি নয় সাকুল্যে দশ হাজার। বেঁকে বসলো। রণিতার বিশ্বাস ওই বেতনে এযুগে একটা ছোট পরিবার ভালভাবে চলতে পারে না। স্বাবসায়ী পাত্রও রণিতার অপছন্দ। বৃত্তি ব্যবসাকে বাদ দিয়ে স্ত্রীকে ভালবাসার সময় পাবে না। আর স্ত্রীকে ভালবাসার সময় দিলে ব্যবসা লাটে উঠবে। তাছাড়া স্বাবসায়ীরা টাকা পয়সা, লাভ লোকসান বোঝে। প্রেম ভালবাসা বোঝে না। অর্থাৎ স্বাবসায়ীরা রোমান্টিক হয় না।

রণিতার বাবা হতোদ্যম। পিতা পুত্রীর দূরত্ব বাড়ছে প্রতিদিন। এ যুগে আকছার শোনা যায় বিচিত্র মানসিক রোগের। রণিতা কি সে রকম কোন রোগের শিকার। বিয়ে করতে তার পাচ্ছে। ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন ; পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষে ডাক্তার জানালেন রণিতা সম্পূর্ণ সুস্থ। বিয়েতে অসুবিধা হবে না।

রণিতা বোকা নয়, বুদ্ধিমতী, যুক্তিবাদী। তার কাছে আবেগ নয় যুক্তিই বড়। পারিবারিক আলোচনার টেবিলে তার তীক্ষ্ণ যুক্তিজালে দাদারা অনেক সময় হার মেনেছে। রণিতার মধ্যে বস্তুমুখী অহংবোধ ক্রিয়াশীল। সময়ের দাবিকে আমল দেয় না। কালের পদধ্বনি শোনে না। শোনার চেষ্টা করে না। হুৎ বলে উড়িয়ে দেয় সব কিছু। ধনীর কন্যা বলে তার অহঙ্কার আছে। সমগ্র পৃথিবীর ধনীর হাতের মুঠোর ক্ষমী অহংকারের রঙীন চশমায় চোখ ঢেকে রণিতা দেখতে চায় না কালের গতি।

সময় দাঁড়িয়ে নেই। মহাকালের চাকা অবিরাম ঘুরে চলেছে। সময় চলেছে। চলতে চলতে এক সময় কখন তার নাগালের বাইরে চলে গেছে রণিতা টের পায়নি, একদিন আবিষ্কার করলো তার সমবয়সী বান্ধবী, আত্মীয়রা কেউ অবিবাহিতা নেই। তার থেকে বয়সে ছোটরাও অনেকে নিজের পছন্দ মত জীবন সঙ্গী বেছে নিয়েছে। অথবা বাবা মায়ের পছন্দকরা পাত্রের গলায় মালা দিয়ে তারা এখন ঘরণী। সুখি সংসারী,-সন্তানের জননী।

বেশ চলছিল দিন। চলছিল জীবনযাপন। হঠাৎ যেন বাতাস থমকে দাঁড়ালো রণিতার সামনে। বিস্ময়ে আকাশ দেখলো। আকাশ আর আগের মত নীল নেই। আয়নায় মুখ দেখলো। আগের মত লাবণ্য নেই, মাথার চুল আগের মত কালো নেই কানের পাশে দু'একটা চুলে রূপালী রঙ ধরেছে। চোখের নিচে কালির আভাস। আগে পথ চলতে যুবকদের মুগ্ধ দৃষ্টি তার আগা পাস্তালা লেহন করতো। একটা সুটো হাল্কা টিজ খারাপ লাগতো না। রণিতা লক্ষ্য করছে ইদানিং যুবকরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় না। টিজ করে না। কেউ কেউ আন্টি সম্বোধন করে। রণিতার চোখের আলোয় পাল্টে যাচ্ছে পৃথিবীর চালচিত্র। তার হাতের নাগাল থেকে খসকে গেছে সময়ের লাগাম। সময়ের অমোঘ চরণচিহ্ন রণিতার শরীরের অলিতে গলিতে।

পৃথিবী বড় নির্মম। নির্মম কালের অনুশাসন। সময় বড় পিছল। রণিতা চোখের রঙীন চশমা খুলে দেখলো পিছলে গেছে সময়। কেউ তার জন্য পথে অপেক্ষা করে নেই। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে তার অজান্তে। এখন গুমসান স্টেশন প্ল্যাটফর্মে সে একা দাঁড়িয়ে আছে শূন্য হাতে। রণিতা উপলব্ধি করলো চোরা স্রোতে সময় চলে গেছে সীমানা ছাড়িয়ে। বিয়ের বয়স অতিক্রান্ত। প্রেম থেকে প্রেমতর আজও আসেনি। অথবা এসেছিল সে চিনতে পারেনি। অহংকার, অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

বাবা, দাদারা রণিতার জেদের কাছে পরাজিত। ক্লান্ত, তারা হতাশার হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ও জীবন যেমন ভাবে চালাতে চায় চালাক। বাবা দাদাদের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে দিন দিন। রণিতা বুঝলো আর দেরি করা সমীচীন নয়। এবার বিয়ে করা উচিত। কিন্তু ইচ্ছার তীরে এসে দেখলো কোন পাঁঠা তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। বন্ধ জানালা খুলে দেখলো বাতাস হাহাকার করছে মরচে পড়া গরাদে গরাদে। আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখে রণিতার শূন্য বুকে ঝড় উঠলো।

একাল আর সেকাল। দুই কালের দুই আমিকে মেলাতে গিয়ে অঙ্ক মিলছে না রণিতার। দিন চলে যাচ্ছে। চিকন কালো চুলে রূপালী বাটিকের হিজি বিজি বাড়ছে। মুখে ক্লান্তির মরা ঢেউ চলকাচ্ছে। রণিতা ঘরে যাচ্ছে।

হঠাৎ হৃদরোগে মারা গেলেন রণিতার বাবা। রণিতা ছিটকে পড়লো তার পরিচিত কক্ষ পথ থেকে। ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েছিল যে পরিবার, ভেঙে খান খান হয়ে গেল। ছ' মাসের মধ্যে দুই ভাই পৈত্রিক ব্যবসা ভাগ বাঁটোয়ারা করে দুই জায়গায় ডেরা বাঁধলো। মা আর রণিতা পড়ে থাকতে বাধ্য হলো পুরানো বাড়িতে। উপলব্ধি দিয়ে অনুভব করলো বিশাল লবণ সাগরের মাঝে ছোট লবণ দ্বীপে বন্দিনী সে। চারিদিকে নোনা বাতাস। লবণাক্ত হাহাকার। দিশাহারা রণিতা দেখলো পাশে দাঁড়ানোর মত একজনও মানুষ নেই। অন্ধকার এই দ্বীপ ডাকিনী যোগিনী প্রেতিনীর বিষাক্ত নিশ্বাসে ভারাক্রান্ত।

অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের অভাব নেই রণিতার। অভাব নেই বিলাসের। অর্থ বিলাস বাসন নিয়েই তো জীবন নয়। জীবন একান্ত নিজের। জীবনের আর এক নাম পথ চলা। জীবনের দুর্গম পথ পরিক্রমায় একজন সঙ্গী চাই। যে অন্ধকারে আলো দেখাবে। হাত ধরে দুর্গম পথ চলতে সাহায্য করবে। ঝড়ের রাতে চওড়া বুকের আড়ালে আগলে রাখবে। দেবে নির্ভরতা। দেবে নিশ্চয়তা।

রণিতা অনুভব করছে শূন্য বুকের গভীরে অতৃপ্তির ঘুণপোকারা কিল বিলিয়ে বেড়াচ্ছে। কুরে কুরে খাচ্ছে ছোট ছোট স্বপ্ন গুলো। অর্থ সব। অর্থ থাকলে সব আছে, সময়, সুখ কিন্তু থাকবে হাতের মুঠোয়। পূর্বের ধারণা বদলে যাচ্ছে, পট পরিবর্তন হচ্ছে, অর্থই শেষ কথা বলে না, শেষের পরেও আরও কিছু আছে, যা আজও অধরা রয়ে গেছে রণিতার কাছে। অজানা থেকে গেছে, অচেনা থেকে গেছে, হয়তো এসেছিল কোন এক সময়। চিনতে পারেনি রণিতা। ধরতে পারেনি, অবজ্ঞায় অবহেলায় প্রত্যাখান করেছে।

শরীরে মনে রণিতা এখন বিধ্বস্ত। এতোকাল যেটা প্রয়োজন মনে হয়নি। আজ শরীর চাইছে, এবিলের কুহুকুহু শরীর চাইছে নিশীথ রাত্রির গহিন স্তব্ধতায় এক সবল পুরুষের আলিঙ্গন, নিপীড়ন।

সব কিছু ওলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতায় জেনেছে পুরুষ জাতটা খুব সস্তা। রূপ আছে, শিক্ষা আছে, বাপের অগাধ অর্থ আছে।

শরীর খুলে কী দেখা যায়?

ঘনশ্যাম চৌধুরী

শরীর খুলে কি দেখা যায়? দেখা যায় মনের আনাচ কানাচ। আনাচকানাচ, কোণা-খাদ্দি আরো সব বড়সড় জীবন-আপন ধরে নেবেন মুরলী মনোহর। তারপর তিনি সেগুলোকে বর্ণমালায় সাজাবেন। মুরলী মনোহর দাসকে তাই আমাদের জানা দরকার। উনি গল্প লেখেন, উনি উপন্যাস এবং কবিতাও লেখেন। উনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন। কারণ ঈশ্বরের মতো মুরলী মনোহরও সৃষ্টি কাজে ব্যস্ত। এখন রাত নিশুতি। জানালার পর্দা সরালেই নক্ষত্র ছড়ানো আকাশ। সেখানে সপ্তর্ষি, ধ্রুবতারা, স্বাতী, অরুন্ধতী, অশ্বিনী রোহিণীদের ভীড়। তিনি জানালার বাইরে মহাকাশে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে লেখার রসদ নেন। তিনি জানেন, তাঁর ইস্পাত ফলার মতো ধারালো লেখা বুদ্ধিমান মানুষের মগজ ফালাফালা করে দেবে। তাঁকে বীকৃতি দেবেই মানুষ। কারণ এছাড়া তাদের কাছে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। মুরলী মনোহরের ইচ্ছে, এই নশ্বর জীবন থাকতে থাকতে তিনি এই গ্রহের মানুষের জন্য অসামান্য কিছু দিয়ে যাবেন। যা তাঁকে অবিনশ্বর করে রাখবে। তাঁর কীর্তি দেশের গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্বে কীর্তিত হবে।

মুরলী মনোহরের জীবনী জানার অধিকার থেকে যাচ্ছে আমাদের। কারণ আগামী দিনে দেশের একজন চিত্রাশীল ব্যক্তি হিসেবে, তিনি যখন আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন, তাঁর সে জীবন তখন সাধারণ মানুষকে প্রেরণা জোগাবে। বড় সড় খবরের কাগজগুলোতে, রেডিও টিভিতে তাঁর নাম বার-বার তখন শোনা যাবেই। অতএব মুরলী মনোহরের জীবনটাও আমাদের জেনে নিতে হবে।

উদীয়মান এই সাহিত্যিকের বাবা কৈলাস দাস ছিলেন মৎসজীবী। তিনি খালে-বিলে-পুকুরে-নদীতে মাছ ধরতেন। বাজারে মাছ বেচতেন। কঠোর জীবনে বিলাসের মেন ছিলো না তাঁর। মুরলী মনোহর ভেবেছেন, যখন তিনি সভা সমিতিগুলোতে ডাক পাবেন, তখন বাবার সেই দারিদ্র্য মন্ডিত জীবন তুলে ধরবেন বক্তৃতায়। এদিকে বিশ্বস্ত সূত্রে যেটুকু খবর পাওয়া গেছে, তাতে জানা যাচ্ছে, কোন এক বরষাভর মধ্যাহ্নে বিপ্রহরে কৈলাস দাসের খাপসা জালে মাছের বদলে একটা থলি উঠে আসে। রূপকথার গল্পের মতো সেই থলিতে এক গোছা স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া যায়। লিখিত কোন তথ্য কোথাও না পাওয়া গেলেও কথিত আছে, কৈলাস দাস সেই সব সোনাদানা বেচে নিজের বাড়িতে এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি শনি-মঙ্গলবারে মা কালী তাঁর মধ্যে ভর করতেন। বহু আর্ত মানুষ কৈলাস দাসের বাড়িতে ভীড় জমাতো শোকতাপক্লান্ত-ব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে। মা কালীর অশেষ করুণায় পাঁচ বছরের মধ্যেই কৈলাস দাসের দোতলা পাকা বাড়ি ওঠে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার প্রণামীর থালায় এত পয়সা পড়তো, যে, কৈলাস দাস প্রথমে দফায় সেগুলি দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে রাখতেন। প্রতি মঙ্গল ও শনিবার তিনি রাত বারোটার পর নৃমুণ্ডমালিনীচামুণ্ডাচণ্ডিকার সাধনায় বসতেন মোক্ষলাভের জন্য। কথিত

একটু প্রশ্রয় দিলে, দু দু করে তাকালে ছুটে আসবে যে কোন যুবক। সুন্দরীর পদতলে লুটিয়ে বলবে আমাকে কৃতার্থ করো তোমার ভালবাসা দিয়ে প্রেম দিয়ে। আমাকে লেহন করো তোমার মুখ দৃষ্টির আলোয়। পুরুষ মাত্রই হ্যাঙলা। প্রশ্রয় দিলে জীবন দিতে ও প্রস্তুত।

একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছেলেরা মেয়েদের পশ্চাতে হ্যাঙলামো করে। সময়টা অতিক্রান্ত হলে যে যার পথ দেখে নেয়। ঠিক সময়কে চিনতে পারে নি রনিতা। ধরতে পারেনি সময়ের হাত।

কলেজের সহপাঠিনীর শ্রীলেখাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেনি রনিতা। শাঁখা সিঁদুরে সুখি গৃহবধূ। বিবাহিত জীবনের পূর্ণতা শ্রী আছে শ্রীলেখা তার উজ্জ্বল উপমা। আগের থেকে সুন্দরী হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে শরীরে, পোশাকে।

শ্রীলেখা কলেজে আসতো শহরতলি থেকে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পিতার কন্যা। বাপ রেলের কেরানী। অনেকগুলো ভাইবোন। টানা হাঁচড়ে চলা জীবন। বিলাসিতা ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে. রনিতার বন্ধু আর বিলাসিতার পানে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে দেখতো। নীরবে শুনতো রনিতার আকাশ ছোঁয়া কথা বার্তা। মুখচোরা লাজুক মেয়ে শ্রীলেখা। ধনীর কন্যার সহপাঠিনী ঠিক কিন্তু ওর সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা কোথায়। রনিতা উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা শোনাতো বন্ধুদের। ভবিষ্যতের কথাও শোনাতো। জানতে চাইতো অন্যদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী :

শ্রীলেখা অসহায়ভাবে বলতো—বাবা গরীব, আমার জীবনের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। বাবা কষ্ট করে লেখা পড়া শেখাচ্ছেন ভাল জামাই পাবার জন্যে।

—তোর ইচ্ছা কী?

জানতে চেয়েছিল রনিতা।

—আমার কোন ইচ্ছা নেই। বাবার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা। শব্দ করে হেসে রনিতা বলেছিল—গাঁইয়া। রাজনৈতিক নেতাদের ঢঙে আরও বলেছিল—আর সে যুগ নেই, নারী-পুরুষের দাসী বাঁদি হয়ে থাকবে না। আমরা এখন অবলা নয় সবলা। আমরা চাই স্বাধীনতা, স্বামী হবে বন্ধু। সংসার হবে যৌথ, দারিদ্র হবে ভাগাভাগি। আধা-আধি।

শ্রীলেখা কিন্তু কেনাকাটা করেছে, এক হাতে কোলাব্যাঙ। অন্যহাতে দেড় বছরের শিশুপুত্রকে সামলাতে হিমসিম। রনিতা চিন্তিত পড়লেন।

—আই শ্রীলেখা।

রনিতাকে দেখে অবাক হলো? শ্রীলেখা। ধনীর সুন্দরী কন্যা কেন এদের মত নেই। মিউটি গুলাবে পরিপাটি সংসার বছরের ছেলে শরীর ঘিরে। স্নিগ্ধ শরীরের যৌবন টিলে ঢালা। উদরের বেলাভূমিতে চর্বির সমাবেশ। চোখের চারিদিকে ক্লান্তির ছাপ। শাঁখা সিঁদুরহীন নিশ্চয় অবিবাহিতা।

—কেমন আছিস শ্রীলেখা? কোথায় বিয়ে হয়েছে তোর? দুটি প্রশ্ন এক সঙ্গে উগরে দিল রনিতা। প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই শ্রীলেখা তার ঘুমন্ত শিশুকে রনিতার কোলে দিয়ে বললো—একটু ধরতো ভাই। ঘুমে ঢলে আমাকে নাস্তানাবুদ করে দিল।

—রিন্টু। মাসিমনির কোলে একটু যাওতো বাবা। বেহাল পোশাক সামলে, ব্যাগ থেকে বিস্কিট বের করে কোলে নিতে চাইলো সে মায়ের কোলে ফিরতে চাইলোনা, মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি জানালো।

—মাসির কাপড় নোংরা করবে। এসো দুষ্টুমি করোনা। দেড় বছর রিন্টু মাসি নামের মধ্যে মজার খোরাক পেল। হাততালি দিয়ে মাতি, মাতি, মাতি। রনিতার চিবুকে হাত দিয়ে বললো—

—তুমি মাতি?

—হ্যাঁ আমি মাসি। নতুন মাসি। রাঙা মাসি। ব্যস আর যায় কোথায়। নতুন মাসিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো শ্রীলেখার ছেলে। কখনও চুল ধরে টানে। কখনও গলার হার, কখনও গলা জড়িয়ে নাকে হাগ্গি দিচ্ছে।

শ্রীলেখা জানালো সে থাকে বাটানগরে, স্বামী মহাকরণের মাঝারি মাপের কেরানী। এটাই প্রথম সন্তান। জীবন মুষ্টু।

কলেজ জীবনে শ্রীলেখা ছিল অর্ন্তমুখি। স্বল্পবাক। দামি দামি শাড়ি ব্লাউজ পরনা পরার ক্ষমতা ছিল না। আসলে সে সচেতন ভাবে সহপাঠিনী ধনী কন্যাদের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করেনি। কলেজ জীবনে শ্রী লেখাকে করুনা করতো রনিতা। পড়া লেখায় ভালছাত্রী হয়েও পড়া শেষ না করে কলেজ ছেড়েছিল। বাপের পছন্দের পাত্রের গলায় মালা দিতে পিঁড়িতে বসেছিল। শ্রীলেখার বিয়ের কথা জেনে রনিতা কলেজ ক্যানটিনে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় বলেছিল-শ্রীলেখা কি বোকা। বিয়ের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে না। মেয়েদের বিয়ের অর্থ সংসারের বাঁদি বন্দী। একজন পুরুষের দাসত্ব করা। যতদিন বিয়ে না হচ্ছে ততদিন মেয়েরা স্বাধীন। নিজেকে নিজের মত চালাও। নিজেকে চেনো। সুন্দর জীবনটাকে ইচ্ছামত উপভোগ করো।

—চলিরে রনি। চলে আয়না একদিন আমাদের বাড়িতে। ও ভীষন খুশি হবে।

ও, অর্থাৎ শ্রীলেখা স্বামীর কথা শোনালো। শ্রীলেখা পুনরায় বললো—বাটার মোড়ে গিয়ে সত্যজিৎ সরকারের বাড়ি বললে যে কেউ চিনিয়ে দেবে। আসবি কিন্তু। রনিতা হেসে বললো-সময় পেলে যাবে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ফিরলো রনিতা। চাওয়া পাওয়ার হিসাব নিকাশে কোথাও বড় ভুল হয়েছে, শ্রীলেখা জিতেছে। ওদের দেখে নিজের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করে রনিতা এক সময় ভাবতো ওরা কি বোকা। নিজেদের বলি দিচ্ছে সমাজের যুপকাষ্ঠে। ছিন্নমস্তার মত নিজের গলা কেটে নিজেই রক্তপান করছে। বেচারা। সময়ের দাস।

ছোট শিশুর নিষ্পাপ আদরে রনিতার বুকে অতৃপ্তির দাবাস হা হা: করছে। জয় পরাজয়ের হিসাব নিকাশে দেখছে শ্রীলেখারা জয়ী প্রতিটি পদক্ষেপে। স্বামীর বিশাল কায়াকে জড়িয়ে সূর্যমুখী ফুল খোলা আকাশ দেখছে। ছোট শিশুকে বুকে পেয়ে শ্রীলেখা পরিপূর্ণা। বিপদ আপদ ঝড় ঝাপটায় নিরাপত্তা দিচ্ছে স্বামী নামের বিশাল কায়াওয়ালা মহীরুহটী। সব শিশুই দেবশিশু। শিশুর মুখে মা ডাক স্বর্গীয় সুষমা ছড়ায়। ছোট শিশুর মুখে 'মাতি' ডাকে রনিতার বুকে অনির্বচনীয় সুখের শিহরণ জাগছিল। দুষ্টুমিতে নাস্তানাবুদ হয়েও মনে হচ্ছিল এতো পরম সুখের। পরম পাওয়া হৃদয়ের গহনে ঝিনি ঝিনি ঝঙ্কার তুলছিল।

নারীর পূর্ণতা জননীতে। শ্রীলেখা জননী হয়ে সুখি। শ্রীলেখার সঙ্গে তুলনা করে রনিতা দেখছে সে নিজেই পরাজিত। ভীষণভাবে পরাজিত।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে নগ্ন করে রনিতা দেখতে চাইলো সেন্সেটেড আর কতটা অবশিষ্ট আছে। অবশিষ্ট আছে যৌবনের। নেই নেই। এখন টিকে আছে শুধু যুবতীর খোলসটুকু। এখন যদি কোন যুবকের সামনে নতজানু হয়ে আবেদন করে—আমাকে গ্রহন করো। সে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অবজ্ঞায়। ঘৃণায়, করুণায় চোখে তাকিয়ে বলবে—বোকা। রনিতা রূপ লাবণ্য অর্থ বিলাস বৈভবের অহংকারে জীবনকে ইচ্ছা মত মেলে ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে ভোগ করার বাসনায় চিনতে পারেনি সময়কে। সুখের সাদা পাখি উড়ে গেছে নীল আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে।

স্বামীর অকাল মৃত্যু। পুত্র পুত্রবধূদের অবহেলা, রনিতার কিংকে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা সহ্য করতে পারলেন না মা। তিনিও স্বামীর অনুগামিনী হলেন এক বছরের মধ্যেই।

মায়ের মৃত্যু রনিতাকে আর ও নিঃসঙ্গ করে দিল। এখন তার সামনে ধূ ধূ মরুভূমি। বিশাল মরুপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে সে একা। দাসী, বৌমিরা যে যার সংসার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে? যে যার পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। বিব্রত। অর্থ, বিলাস বৈভব আগলে রক্ষ ঘুড়ির মত রনিতা এখন একা। ভীষন একা।

নিঃশ্বেস

অশোক ভট্টাচার্য্য

দুটো হাতের পরে ভর দিয়ে অতি কষ্টে জানলার পাশে উঠে বসল বিনোদ। দিনের পর দিন শুয়ে থাকতে আর ভালও লাগে না। অথচ কোন উপায়ও নেই!

সন্ধ্যে বেলায় তাই বাড়ি বাড়ি যখন শাঁখের ফুঁ বেজে ওঠে বিনোদ তখন জানলার পাশে উঠে বসে প্রতিদিন। আজকেও বসেছিল। বসে ভাবছিল, রমলা সেই দুপুর বেলায় কারখানায় গিয়েছে আর এই সন্ধ্যে হয়ে গেল এখনো ফিরলো না। আজকে বোধ হয় আর কিছুই জোগাড় করতে পারে নি, শূণ্য হাতে ফিরে আসবে!

কাউকেই আর দোষ দেয় না বিনোদ। হলোই বা সহকর্মী কে আর দেবে? ছোট্ট কারখানা। আর কি বা ওদের মাইনে, বিনোদ নিজেই তো ভাল করে জানে। তবু ভাগ্যিস্ কাজ করতে থাকা অবস্থায় এ্যাকসিডেন্টটা হয়েছিল। দুটো পা-ই শেষ পর্যন্ত কেটে বাদ দিতে হোল। মালিক কিছু টাকা দিয়েছিল, চিকিৎসার কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, আর সহকর্মীদের কাছ থেকে বাড়তি কিছু সহানুভূতিও পেয়েছিল

কিন্তু আজ দু'টা মাস হোল কাজ। একটা পয়সাও আয় নেই। কারখানার সবাই তো ওরা কাজ করে 'নো-ওয়ার্ক-নো-পে'—এর ভিত্তিতে। কত টাকাই বা তাতে জমাতে পেরেছিল? পাঁচ-পাঁচটা পেট বাই-এ। কি করে যে চলে তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন। তাছাড়া কপালের ফের কখনে বলে ; এতদিন অসুখ-বিসুখ কোনটাকেই পাত্তা দেয় নি বিনোদ। আর এই এ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই সব কিছু যেন প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে।

লো-হেলার, হাই-ব্লাড সুগার। দু-মাসেও পা-এর কাটা ঘাটা পুরোপুরি শুকায় নি। তার পরে মাঝে মাঝেই দুর্বল শরীরে ঠাণ্ডা লেগে শ্বাস কষ্ট শুরু হয়। এই দু'টা মাসেই বিনোদ নেহে তো হটেই, মনেও ভেঙ্গে পড়েছে একেবারে।

প্রথম দু-এক মাস অন্যান্যরা সহ-কর্মীরা চাঁদা তুলে কয়েক টাকা রমলার হাতে দিয়েছিল। তা আজ হয়তো কিছু আর জোগাড় করতে পারে নি। তাছাড়া বিনোদ আজ রমলাকে যাওয়ার সময় বলে দিয়েছি মালিকের সাথে দেখা করে একটু যেন বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে বড়ছেলে পটলাকে যদি একটা কিছু কাজ দেয়।

কথাটা বলেই, বিনোদ নিজেই একবার ভেবেছিল কি কাজ ওকে দেবে মালিক? পটলার বয়স তো সবে এই দশ পেরিয়ে এগারোয় পড়েছে। তারপর! লিকলিকে বা রক্ত শূণ্যের মত চেহারা।

কপাৎ করে একবার রান্না ঘরের দিকে তাকাতেই হঠাৎ বিনোদ চেয়ে দেখলো, রমলা এসেছে কিনা। কিন্তু না ; একটা বিড়াল। হঠাৎ নিজেই একবার হেসে উঠল বিনোদ, ওদের ঘরেও বিড়াল তাহলে এখনো আসে?

সন্ধ্যের অন্ধকার এক সময় গাঢ় হয়ে রাত্রি নেমে এলো। আশে পাশের বাড়ি গুলোতে আলো জ্বলে উঠল। বিনোদ নীরবে জানালার ধারে বসে সব দেখতে লাগল। দেখল, এক সময় রমলাও এসে বাড়িতে ঢুকল।

ঢোকা মাত্রই বিনোদের ইচ্ছে করল না যে রমলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে কি হোল? তাছাড়া আশা মাত্রই—বোধ হয় খিদের তাড়নায়—তিনটে ছেলে মেয়েই চেঁচামেচি শুরু করে একটা যেন তান্ডব বাঁধিয়ে তুলল। অন্ধকার ঘুপটি ঘরে তাদের কঙ্কাল সার শরীর গুলো চলাফেরা করতে দেখে বিনোদ নিজেই যেন একবার শিউরে উঠল।

শূণ্যের মধ্যে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে বিনোদ বলে উঠল, 'হেরিকেনটা এখন বরাদ্দ হয়'। বলেই আবার ভাবল, কে জানে আজ সকালে রমলা কেরোসিন জোগাড় করতে পেরেছে কিনা। কাল তো রাত ন'টার পরেই কেরোসিনের অভাবে হেরিকেনটা ধীরে ধীরে নিভে গিয়েছিল। তবু বিনোদ দেখল রমলা একটা লম্ফ ধরিয়ে উনুনটায় আঁচ দিল। ছেলে মেয়ে গুলোকে কাছে টেনে একটু শান্ত করে নিল।

আশ্চর্য মেয়ে রমলা ; বিনোদ ভাবতে লাগল। এত অভাব, এত অসুবিধে অথচ রমলা কোনদিন তো কিছু অভিযোগ করে না? তোর বেলা উঠেই বিনোদ কারখানায় বেরিয়ে যেত। দুপুরে কোন রকমে একবার নাকে-মুখে দিতে আসত, তারপর আবার সাইকেল করে ছুটে চলে যেত। সংসারের সব ঝামেলাই রমলা নীরবে নিয়েছিল নিজের ঘাড়ে। সপ্তাহ অন্তে কত টাকাই বা পেত বিনোদ। তাই-ই যখন রমলার হাতে এসে দিত, ও তাতেই খুশী হোত। আর এখন, একটা পয়সা দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে তারই জন্যে খরচের শেষ নেই।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস অজান্তে পড়ে গিয়ে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এলো বিনোদের। এক একবার ভাবে বিয়ে করাটা তার উচিত হয় নি। কিন্তু যৌবনের মাদকতায় তখন তো আর অত কেউ ভাবতে পারে না। আবার ভাবে, যদি বিয়ে না করত তবে রমলার মত বৌ সে কোথায় পেত?

ওর মতন মেয়ে হয় না।

—'চা নাও তোমার'

—চমকে উঠে বিনোদ দেখল চা নিয়ে রমলা দাঁড়িয়ে আছে।

'চা' একটু ভেবে বিনোদ বলে উঠল। সেই দুপুরে বেলা তিনটে রুটি খেয়েছিল, তার পরে এখনো তো কিছু পেটে পড়েনি। একটু ভেষ্টাও পেয়েছিল। তবু সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে চা-টা নিল না বিনোদ। কে জানে রমলার জন্যে আর এক কাপ হয়েছে কিনা? দুপুরে তো বিনোদ নিজের চোখেই দেখেছে রমলা কিছু না খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। বিনোদ একবার ভেবেছিল বলে, 'তুমি কিছু খেয়ে গেলে না। কথাটা ভাবা মাত্রই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রমলা যদি জিজ্ঞেস করে কি খাব। তখন? সেই ভেবে আর কিছু বলতে পারে নি বিনোদ।

আর একটু এগিয়ে এসে বিনোদের সামনে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল রমলা। সঙ্গে সঙ্গে চলে না গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকতে বিনোদ বুঝল রমলা কিছু বলতে চায়।

বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'ওপধরারা আজকে কোথ হয় আর, কিছু 'কালেকশন' করতে পারে নি—তাই না রমলা?

রমলা সোজাসুজি 'না' বলতে পারল না। অন্য প্রসঙ্গ তুলে বলল, 'আজ মালিকের কাছে ওরা আজকে নিয়ে গিয়েছিল'।

—গিয়েছিলে? বিনোদ একটু আগ্রহের সাথে বলে উঠল, কি বলল? দেবে পটলাকে একটা—?

রমলা বলল, 'না পটলাকে নয়, আমাকে। তোমাদের মাল বাহাইয়ের কি একটা কাজ আছে সেই কাজে। তোমার কাছে শুনে আসতে বলেছে। তুমি রাজী হলে তবে মালিক চেষ্টা করে দেখতে পারে।

বিনোদ কোন উত্তর দিল না। রমলাও চলে গেল তার কাজে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলোনা বিনোদের। মাল বাছাই-এর চাকরিটা মেয়েদেরই দিয়ে থাকে মালিক। অভাবের ঘরের শক্ত সমর্থ সব মেয়েগুলো মাল বাছাই-এর কাজে আসে। কিছু দিন কাজ করার পরে চলে যায়। আবার নতুন মেয়ে আসে। কোত্থেকে যে মালিক ওদের জোগাড় করে আনে তা কে জানে। এই নিয়ে কারখানায় চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে, চাপা হাসি সবাই হাসে। কিন্তু কোন গুঞ্জন করে না কেউ, সবাই এড়িয়ে যায় মালিকের ব্যাপার বলে। শুধু মাঝে মধ্যে কারখানার যুবক ছোঁড়াগুলো চটুল কথাবার্তা বলে বাড়তি ফায়দা লুটে নেয়। বিনোদের কোন দিনই এসব ভালো লাগে নি। কারখানায় কাজ করলেও একটা মার্জিত ভাব, একটা নীতি বোধ সব সময়ই তাকে ঘিরে রেখেছে।

বিনোদ ভাবতে পারে না—এত অভাবের মধ্যেও তার একমাত্র ভরসাস্থল রমলা, —তাকেও কি এবার হারাতে হবে? পরক্ষণেই ভাবল কি করে ও না করবে? ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে। এই বস্তির পরিবেশে কতদিন আর ওকলো পেটে বাপের শাসন মেনে চলবে। ওরা একদিন বেরিয়ে যাবে যে যার মতন। লোকে তাপে রমলাও হয়তো একদিন বিদ্রোহ করে জিজ্ঞেস করে বসবে, 'বল কেন তুমি সেদিন আমাকে চাকরীটা নিতে বারণ করেছিলে? বিনোদ কি তখন সদুত্তর দিতে পারবে? তার এই নীতির কথা বললে কি ওরা মানবে?

একটা একটা করে বিনোদের কাছ থেকে সব কিছু যেন দূরে সরে যাচ্ছে মনে হোল সে যেন ক্রমশঃ ছবে পড়ছে নিস্ব, নিঃসঙ্গ। একটা চাপা কষ্টে বিনোদ বিছানায় এপাশ থেকে ও-পাশে ফিরতে লাগল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে রমলা' বলে উঠল—সে কি তুমি এখনো ঘুমাওনি। বিনোদ কোন উত্তর দিল না। শুধু একটা চাপা গোঙানির শব্দ তার ভিতর থেকে শোনা গেল। রমলা তাড়াতাড়ি বিনোদের কাছে উঠে এলো। তার বুকের পরে হাতটা রেখে ঝুকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে?'—কি যে হয়েছে রমলা ঠিক বুঝতে পারল না। আর বিনোদও তা বোঝাতে পারে না।

আছে, দুর্জনেরা বলে, তখনই তিনি নাকি সেই পয়সা ওপরে বসতেন। প্রাচীন লোকেদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, বন্ধ দরজার বাইরে থেকে নাকি রৌপ্যমুদ্রার ঝনাৎকার শোনা যেত। অবশ্য দুর্জনদের সেইসব অপবাদ খণ্ডন করে দিলেন কৈলাস দাস। বাল্যকালে বাবার দিয়ে বলতেন, মা-মা চণ্ডিকা। তোর হাতের বাজুবন্ধের শব্দকে এরা রৌপ্যমুদ্রা বলে ভ্রম করে। এদের ক্ষমা করে দিস মা। এ-হেন পিতা তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন মুরলী।

চিন্তার ছট খোলাই সাহিত্যের কাজ অথবা চিন্তাকে জনশ্রুতি জটিল করে তোলা সাহিত্যের কাজ এ সম্পর্কে মুরলী মনোহর আজও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। লেখক-শিল্পীদের মধ্যে একটা দ্বৈতসত্তা কাজ করে। মুরলী মনোহরের এই যে সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, তাও হয়তো তাঁর দ্বৈতসত্তারই লক্ষণ। জীবনের বিচিত্রতিক্ত অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে নিয়ে আসতে হবে। জীবনের রূপ তো সরল পথের নয়। বক্র তার পথ। আত্মবিশ্লেষণে ইতি এবং নেতি দুইই তুলে ধরতে হবে তাঁকে। উপন্যাসের বড়ো প্রেক্ষাপটে নারীপুরুষের জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো কলমের আঁচড়ে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মুরলী মনোহর। কারণ কল্পনার কাঁচুলিতে তৃপ্তা মেটেনা। তাই তিনি অপেক্ষা করে আছেন সেই মহান সৃষ্টির জন্য। যা তাঁকে সৌভাগ্যের শীর্ষে নিয়ে যাবে, যশের বরমাল্য এসে পড়বে তাঁর গলায়।

এখন রাত হলেও মুরলী মনোহরের চোখে ঘুম নেই। লেখার টেবিলে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেন তিনি। তিনি তাঁর বৃহৎ উপন্যাস রচনার সময় থেকে নিয়েছেন নিশিথ রাতে। চরাচর থেমে আছে। দেওয়াল ঘড়ির একটানা টিক টিক শব্দ জানান দিচ্ছে, কালের রথের চাকা চলছে তার নিজের নিয়মে। বৌ কাঞ্চনবালা পাশেই খাটে ঘুমিয়ে আছে। ইদানিং মুরলী মনোহরের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন আসছে। বৌয়ের কৃষ্ণকলি চোখ থেকে হতাশা মানক তুলে নিতে পারছেন না তিনি। কাঞ্চনবালা স্বাস্থ্যবতী। দীর্ঘ যৌনজীবনে কাঞ্চনবালার সবরকম সহযোগিতা তিনি পেয়েছেন। মুরলী মনোহরের সমস্ত অস্তিত্বকে কাঞ্চনবালা অনায়াসে ভরে নিয়েছে শরীরে। মুরলী মনোহর কি ক্লান্ত। খানিক আগেই ওরা দু'জন এক ঝোড়ো সময় পেরিয়ে এসেছেন। সমমকালে দাম্পত্যে রুচিবোধ থাকে না। শারীরিকতার আক্রমণে সকলেই কি এভাবে উন্মত্ত হয়? এই ব্যাপারে ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রমুখের লেখা মুরলী মনোহর পড়েছেন। তিনি অপর কোন নারীতে উপগত হননি কাঞ্চনবালা ছাড়া। ফলে নারীর যৌন বা মানসিক বিশ্লেষণ করতে তাঁকে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়। কার্ল মার্কসের রচনাও তিনি মন্থন করে পড়েছেন। তাঁর গল্পে অথবা উপন্যাসে কোন প্রতিবাদী চরিত্র, শ্রমিক, কৃষক কিংবা কোন রাজনৈতিক নেতাকে জীবন্ত করে তুলতে হলে তিনি কার্ল মার্কসের শরণ নেন। আমি শিল্পী, মুরলী মনোহর স্বগতোক্তি করেন—একজন প্রতিমা শিল্পী যেমন কাঠামো, খড়, মনের খোসা, পাট, মাটি ইত্যাদির উপাদানে মূর্তি তৈরি করেন, আমাকেও চরিত্র সৃষ্টি করতে কার্ল মার্কস, শ্রীরামকৃষ্ণ, ফ্রয়েড, ইয়ুং এমনকি দরকার হলে কোন কেন্দ্রার আত্মজীবনীর সাহায্যও নিতে হবে।

কোন রকম ছুঁৎমার্গ থাকলে বড় লেখক হওয়া যাবে না—উচ্চাদর্শের সঙ্গে উচ্চস্তরের ভাবনার সম্মিলন ঘটাতে হবে। মহৎ ভাবনাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন একমাত্র মহৎ লেখকরাই—

আচ্ছা মিস্টার দাস, আপনার রচনায় যে সব চরিত্রগুলো আমরা দেখতে পাই তার উৎস কোথায়?

মুরলী মনোহর দাসের ঠোঁটকাটা অভিজ্ঞ। আধুনিক শিল্পকলা তিনি গ্রহণ করেন নি। ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য-অনুসারী শিল্পকলা দিয়ে তিনি তাঁর অফিসঘর সাজিয়েছেন। খাজুরাহো, অজন্তা, ইলোরা অথবা শ্রাবন্তী কিংবা বিম্বিসার কথা মনে প'ড়ে যায় তাঁর অফিসে ঢুকে। আজ সকালে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো বিখ্যাত চৈনিকের এক সাংবাদিকের সঙ্গে। প্রশ্নটা শুনে মুরলী মনোহর সামান্য হাসলেন। দামী সিগারেট অনেকটা টান দিয়ে নকশা করা দামী হাইদানে ছাই ঝাড়লেন।

এইসব চরিত্রগুলো উৎসে লুকিয়ে আছে চরিত্রগুলোর মধ্যেই।

ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলেন—রিপোর্টার তার টেপ রেকর্ডারটা এগিয়ে দেন।

দেখুন, গভীর অনুধ্যান এবং জগৎ-জীবনকে উপলব্ধি করার ব্যাপক দৃষ্টিই আমার রচনার চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে নিরাসক্তভাবে কাজ করে।

আচ্ছা, এই 'ব্যাপক দৃষ্টি' এবং 'নিরাসক্তভাবে কাজ' করা ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলেন।

মুরলী মনোহর মিষ্টি হাসলেন। লেখকদাও বিখ্যাত ব্যক্তির এই হাসিতে প্রভাবিত হয়ে দন্ত বিকশিত করলেন।

ব্যাপক দৃষ্টি বলতে আমি বোঝাতে চাইছি পৃথিবীর সমগ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে সৃষ্ট চরিত্রটাকে ছড়িয়ে তোলা। বুঝতে পারলেন।

প্রশ্নকর্তা বিজ্ঞের মতো সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।—আর 'নিরাসক্ত'?

আপনি সমুদ্র-মোহনায় গেছেন?

হ্যাঁ।

জাহাজকে পথ দেখিয়ে দেবার বাতিঘর নিশ্চয়ই দেখেছেন।

তা দেখেছি।

বাতিঘর থাকে সমুদ্রের মধ্যে। সে দূর থেকে ভুল ভূখণ্ডকে দেখে। তাকে সমগ্রতা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে। আমি একজন লেখক হিসাবে তেমনি নিরপেক্ষ-নিরাসক্ত থেকে মানুষকে উপলব্ধি করি। তাকে সৃষ্টি করি।

আই সী। আচ্ছা মুরলী মনোহরবাবু, সাহিত্য আপনাকে টানলো কেন? আপনার এই যে সাহিত্য সমর্পিতপ্রাণ জীবন, তার মূলে আপনার কোন চিন্তা কাজ করছে?

একটা চিরন্তন বোধ। সেই বোধকে না যায় বলা, না যায় ছোঁয়া। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যাপারটির তুলনা চলে। অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টি, না মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি—এই প্রশ্নে যে দ্বন্দ্ব, আমার বোধ আমাকে বৃহৎ সাহিত্য কর্মের দিকে ঠেলে দিল, নাকি সাহিত্যকর্মই আমাকে সেই বোধে নিয়ে গেছে তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। আমার কাছে তারী আশ্চর্যের।

আপনার জীবনে সবচেয়ে আশ্চর্যের জিনিষটা কী?

ঘটিতি গদগদকণ্ঠে উত্তর দিলেন মুরলী মনোহর—

আমার স্ত্রী। স্ত্রী জিনিসটা আশ্চর্যের।

স্ত্রী! জিনিসটা!—স্ত্রীকে জিনিসের সঙ্গে তুলনা করায় রিপোর্টারের চোখ দু'টো চকচক করে উঠলো। তিনি নড়ে বসলেন।

অবাক হবার কিছু নেই। আমার বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গীই এখানে কাজ করে।

কিন্তু স্ত্রী আশ্চর্যের জিনিস কেন?

আশ্চর্যের, কারণ, দীর্ঘদিন তার সঙ্গে থেকে তাকে সবচেয়ে ভালো করেই চিনি। কিন্তু তাকে আজো একটুও জানতে বা বুঝতে পারি নি।

রিপোর্টার তার মনের চঞ্চলতা থামাতে টেপ রেকর্ডারটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে মহান লেখকের মুখের কাছে নিয়ে যায়।

আমার স্ত্রীর কোন সাহিত্যবোধ নেই। এবং যদি তা থাকতো তা হতো আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক।

কেন?

খুবই সরল ব্যাপার। রোজকার ঘরকন্নার ক্ষেত্রে, জীবন যাপনের দৈনিক প্রয়োজনে সবারই একটা 'মেয়েছেলে' দরকার। অনেকে শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, আত্মসচেতন, 'মহিলা'কে জীবন

সঙ্গিনী হিসাবে বেছে নেন। কিন্তু আমি মনে করি, সেটা ভারী যন্ত্রণাদায়ক। সেখানে ব্যক্তিত্বের সঙ্ঘাত অশান্তি বাড়ায়।

মুরলী মনোহর টেপ রেকর্ডার থেকে মুখটা সরিয়ে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর ফের শুরু করলেন—

রাতে বিছানায় আমি স্ত্রীর কাছে সাহিত্য বা দর্শন আলোচনা চাই না। তখন চাই নিবিড় প্রেম। তখন যদি সে আমার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা শুরু করে, তা হবে আমার কাছে বিছের কামড়ের মতো।

বুঝলাম।

সাহিত্যিকের কাজ হলো জীবনের এক ব্যাপক দর্শন তুলে ধরা। বিশ্বের সমগ্রতার পরিচয় ঘটবে সাহিত্যের মাধ্যমে। রাজনীতি বাদ দিয়েই বা কি করে তা করা যাবে। তাই মুরলী মনোহর তাঁর গল্প-উপন্যাসে রাজনৈতিক চরিত্র রাখেন। সমাজতন্ত্র ব্যাপারটাও এখন বহু উচ্চারিত। কাজে কাজেই সমাজতন্ত্রের পক্ষেও মুরলী মনোহর বহু কথা বলেছেন। কিন্তু ইদানিং বিশ্বে সমাজতন্ত্রের ভাঁটা চলছে। পূর্ব ইউরোপের ভাবসাব দেখে মুরলী মনোহর কি স্ট্যাণ্ড নেবেন সেটা ভাবছেন। সোভিয়েতে নাকি দলে দলে সব চার্চে যাচ্ছে। ঈশ্বরের উত্থান আদৌ হয় কিনা সেটা ভালো করে বুঝেই তবে তিনি এ ব্যাপারে মন্তব্য করবেন। কারণ আজ সমাজবাদ আর কালকেই ঈশ্বরের কথা বললে সেটা ভালো দেখাবে না।—আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?—এই জাতীয় প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন।—এই মুহূর্তে ঈশ্বরকে নিয়ে আমি ভাবছিনা। মানুষের অনেক সমস্যা আছে। সেগুলি নিয়েই আমি চিন্তাভাবনা করছি—এ জাতীয় উত্তর দিচ্ছেন তিনি। তিনি মনে করেন, ঈশ্বরের অপার করুণায় এ জাতীয় মন্তব্যই তাঁর রক্ষাকবচের কাজ করবে।

আচ্ছা মুরলীবাবু, আপনার যে উপন্যাসটার আকাদেমি পাওয়া উচিৎ ছিলো বলে অনেকে মনে করেছেন, সেখানে আপনি জীবনের কোন দিকটার প্রতি আলো ফেলেছেন, অর্থাৎ সেই লাইট হুইচের আলো।

জনান্তিকে একটা কথা বলে নেওয়া উচিৎ যে, কাহিনীর গোড়াতেই উল্লেখ করা হয়েছিল, মুরলী মনোহরের বাবা তাঁর নাম রেখেছিলেন মুরলী। ওদুদার মুরলী দাস নামটিতে তাঁর প্রবল আপত্তি আছে। এই প্রসঙ্গটা নিয়ে তিনি স্ত্রী কাঞ্চনবালার সঙ্গে বিয়ের প্রথম দিনই আলোচনা করে নিয়েছিলেন। দাস পদবীটাও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। মুরলী দাস নেহাৎই 'পাতি' নাম। হিন্দী রামায়ণকার তুলসীদাস, বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি নামগুলি পরম্পরায় এলেও বাঙালী গল্পকার—ঔপন্যাসিক-দের পদবী ঠাকুর, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, বসু, মিত্র, নিদেনপক্ষে মজুমদার ইত্যাদি রয়েছে। সেখানে মুরলী দাস হালে পানি পাবে না। তাই মুরলীবাবু বলে তাঁকে কেউ সম্বোধন করলে তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হন। এই কারণেই তিনি মুরলী মনোহর যোগ করার গুরুত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন।

কেন এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। মুরলী মনোহরের মুখ থেকেই আমরা তা শুনতে চাই।

জীবনের এক ব্যাপক দর্শন তুলে ধরা সাহিত্যের কাজ। বিশ্ব সমগ্রতার পরিচয় ঘটানোর জন্যই আমি কলম ধরেছি। সেক্ষেত্রে নিজের নামটাও একটা বড় ফ্যাক্টর। একজন বড়ো মাপের লেখকের নাম কখনো মুরলী হতে পারে না। সাহিত্য স্রষ্টা জীবনবেদ রচনা করতে যে জটিলতম প্রয়াস চালান, তার নামও সেই অনুপাতে গুরুগম্ভীর হওয়া চাই। সেক্ষেত্রে আমি পদার্থবিদ্যার একটি সাধারণ সঙ্জ্ঞাকে গ্রহন করেছি। সঙ্জ্ঞাটি হচ্ছে, কোন বস্তুতে যে পরিমাণ পদার্থ থাকে তাকে ওই বস্তুর ভর বলে। পাঁচ কিলোগ্রাম সন্দেশ অথবা লোহা যাই হোক না কেন, ওই পদার্থের পরিমাণ বা ভর পাঁচ কিলোগ্রাম। এখানে পাঁচ হলো ভরের একক। এক্ষেত্রে 'মুরলী' এই ছোট একক সংখ্যাটির ভর ঠিক তত কুদ্রই হবে। 'মনোহর' যোগ করলে একক সংখ্যাটির সাথে সাথে পরিমান বা ভর বেড়ে যাবে, এবং সেটা একজন মহান লেখকের পক্ষে মোটামুটি পুরিয়ে যায়। মুরলী মনোহরের মনে পড়ে তাঁর বাবা কৈলাস দাসের কথা। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলতেন, মা! মা জগদম্বে! ব্যোম শঙ্কর। বাঁজখাই গলার সেই আওয়াজ অনেকেরই পিলে চমকে দিতো। মুরলী মনোহর এই শব্দ ব্রহ্মের সূত্রকে প্রয়োগ করে ভাবা ব্রহ্মের এই সঙ্জ্ঞাটি সৃষ্টি এবং প্রয়োগ করেছেন।

তাহলে মুরলী মনোহরবাবু, আপনার সেই মহৎ উপন্যাসটি সম্পর্কে কিছু বলুন। কিছু সমালোচক অভিযোগ করেছেন, ওই উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে বাস্তবোচিত কার্যকলাপ একটুও খুঁজে পাওয়া যায় না। তার উৎসমূল নাকি মরীচিকার মতো 'ঘোরাটে'. 'কুয়াশাচ্ছন্ন' ইত্যাদি মন্তব্যও অনেকে করেছেন।

মুরলী মনোহর দাস সেই মহৎ উপন্যাসটি সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে থাঁধায় পড়ে গেলেন। তিনি এটা জানেন, সেটি একটি মহৎ উপন্যাস এবং সেটি একটি জাতীয় সাম্মানিক পুরস্কার পাবে বা পেয়েছে। গীতার 'মা ফলেষু কদাচন' নীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। তিনি যা লিখবেন অবেন তার পুরস্কার প্রাপ্তিও তিনি ভেবে রাখেন। কিন্তু এই উপন্যাসটি আদৌ লেখা হয়েছে না হবে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই মনে করতে পারলেন না। যে চরিত্রগুলির কথা তার কল্পনায় এলো সেগুলি কি গ্রাম বাংলার? না শহরের? কৃষক? মহাজন? শ্রমিক? চাকুরে? কর্মি সম্পাদক? প্রেমিক না প্রেমিকা? তারা কি রোজকার পৃথিবীতে হেঁটে চলে বেড়ায়? খায়-দায়, বাথরুমে যায়? আশ্চর্য। মুরলী মনোহর কিছু মনে করতে পারছেন না। তিনি ক্রমশঃ রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে বললেন, আমি মুরলী মনোহর দাস বলছি। মহান লেখক।—এই প্রচণ্ড শব্দব্রহ্মে যে জ্যোতিপুঞ্জ সৃষ্টি হলো তাতে রিপোর্টার ভদ্রলোকটি বাক্য হারা হয়ে গেলেন।

মুরলী মনোহরের সাজানো অফিসের মহিলা রিসেপসনিস্টটে অথেষ্ট সুন্দরী, অদ্ভুত ধরনের স্মার্ট। বিবাহিতা নাকি অবিবাহিতা তা বোঝার উপায় নেই। রিসেপসনিস্টের সামনে এখন একটি বাউণ্ডুলে যুবক দাঁড়িয়ে।

আচ্ছা দিদি, মুরলীবাবু আছে?

কথা শুনে মহিলার চোখ রক্তবর্ণ। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো তার। যুবকটির দিকে আগুনের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন মহিলা।

দিদি নয়, মিস্ ভাট (দত্ত)। মুরলীবাবু নয়, মুরলী মনোহরবাবু। আছে নয়, আছেন। বুঝলেন!

ও, তা আ-আচ্ছা উনি কি- আছেন?

কেন?—স্মার্ট মহিলাটি ফনা তুললেন।

আজ্ঞে আমি 'কালের পদধ্বনি' পত্রিকার সম্পাদক। ওনার একটা লেখা চাই।

কোথাকার পত্রিকা?

আজ্ঞে গোপালপাড়া।

ক'পিস বেরোয়?

আজ্ঞে।

আপনাদের সার্কুলেশন ক' হাজার।

আজ্ঞে দু'শো পঁচাত্তর। এবার বিজ্ঞাপনই পেয়েছি সাতশো নব্বুই টাকা। আমরা ওনার একটা লেখা চাই।

উনি এখন অফিসে নেই, কখন পাবো?

ওনাকে পাওয়া যাবে না।

আজ্ঞে উনি তো প্রথমদিকে আমাদের কাগজে অনেক গল্প লিখেছেন।

উনি এখন মহৎ উপন্যাস লিখছেন। এছাড়াও তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারী সার্কুলেশনে তাঁকে নিয়মিত ধারাবাহিক লিখতে হচ্ছে।

আপনি একবার 'কালের পদধ্বনি' পত্রিকার কথা বলুন। ওনার প্রথম লেখাটি এই কাগজেই বেরিয়েছিল। পরে তো উনি পুরস্কার-টুরস্কার পেলেন। অন্ততঃ উনি যদি দশ লাইন শুভেচ্ছাবাণী লিখে দেন, আমরা ছাপাবো।

আপনি আসুন।

অ্যাঁ!

আপনি আসুন।

সুন্দরী মহিলার নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠলো। চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগলো। রক্তমুখ দিয়ে বেরোতে লাগলো গরম ভাপ। উনি দাঁত খিচোলেন। দাঁতের ফাঁকে দেখা গেল কেউটে সাপ।

'কলের পদধ্বনি'-র সম্পাদকের চোখের সামনে তখন দুলুম সর্ষেফুল। তার মনে হলো ঘরের উত্তাপ ভীষণ বেড়ে গেছে। সেই তাপে রিসেপশন টেবিলের পুরু কাচের কভারটা ফেটে গেল। দেওয়ালে বিদ্যুৎবাতির স্ট্যাণ্ডগুলো খেঁকে যাচ্ছে। পড়ে গিয়ে দুটো ভাঙলো। মহিলা কের খ্যাঁক করে উঠলেন। যুবকটির জামার হাতা ছিঁড়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে সে দৌড় দিল রাস্তার দিকে। কোন রকমে একটা ডবলডেকার বাসে সে চলতিতেই উঠে পড়ল।

অফিস ঘরের ভেতর বসে মুরলী মনোহর সবটা দৃশ্য দেখে ভীত হলেন। এই রকম প্রাইভেট সেক্রেটারিই তিনি চাইছিলেন। তার ভারী ইচ্ছে হলো সুন্দরীর পাছায় নিজের হাতটা একটু রাখবেন। অপোগণ্ডটার সাহস দেখো! বলে কিনা ছোট পত্রিকার জন্য লেখা চাই। ওদের জানা নেই, মুরলী মনোহরের লেখা প্রতিটি অক্ষরের দাম কতো।

তিনি রোমাঞ্চিত হলেন। তিনি আদর করে ডাকলেন, মিনু।

সেই মিনু ডাকটা ইথার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে সুন্দরী মহিলার কানের পর্দায় ধাক্কা দিতে লাগলো। সুন্দরীর চেহারার পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তার শরীরটা ফুলে উঠতে লাগলো। মিউ মিউ শব্দ ফুটলো মহিলার গলা দিয়ে। খানিক বাদেই সে একটা আদুরে বেড়ালে রূপান্তরিত হলো। বেড়ালটা চারপায়ে হেলেদুলে হাঁটতে হাঁটতে মুরলী মনোহরের কনফিডেন্সিয়াল রুমে ঢুকে লাফ দিয়ে মুরলী মনোহরের পিয়ে বসল। মুরলী মনোহর উম উম শব্দ করে তাকে আদর করতে লাগলেন। বিড়ালটার ফুলে ওঠা শরীরের সাদা লোমগুলোর ভেতরে আঙুল দিয়ে তিনি বিলি কাটতে লাগলেন। মুরলী মনোহর আলোর সুইচটা অফ করে দিলেন। বাইরে তখন আকাশ গলে গলে জ্যোৎস্না গড়াচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে খুবই আনন্দ পেলেন তিনি।

ঝম ঝম ঝর কের দু' এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল পর ভেজা মাটি থেকে একটা সোঁদা গন্ধ উঠে আসে। তেমন জলের ক।ক হালকা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু তার ছবিটা পাচ্ছেন না। তিনি বসে আছেন মেঘের মতো নরম একটা সোফায়। ঘরের মেঝেতে লাল মখমলের গালিচা বিছানো। তাতে গোল এবং চৌকো নকশা। পারিপার্শ্বিক পরিবেশে এক ধরনের সঙ্গীতময়তা বিরাজ করছে। উদাস উদাস বোধ করছেন তিনি। নিজের মনেই অনেক কথা বলছেন। শিল্পীর জগৎ ভাবলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মনের কথা রেকর্ড করার কোন কলকব্জা আবিষ্কার হয়েছে কিনা তার জানা নেই। নাই বা হলো, তবু তিনি নিজে নিজেরই মনোবিশ্লেষণ করে চলেছেন। তিনি দরজার বাইরের দিকে তাকালেন। দেখলেন কেয়ারী করা ফুলের বাগান। লাল পাথর বিছানো রাস্তার দু'পাশে থোকা থোকা ফুলুম চন্দ্রমল্লিকার সারি। কিন্তু জায়গাটা কোথায়। এটা কি তাঁর বাড়ি বাড়িটা খুব চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু খুব যে পরিচিত তাও নয়। তিনি আরো দূরে তাকালেন। দূরে গাছগাছালির একাকার স্পর্শে নিগূঢ় আড়াল হয়েছে। সেখানে গ্রাম-জনপদে একটা ভরা ভরা ভাব। পোয়াতী বউয়ের মতো। কাঞ্চনবালার এখনো ছেলেপুলে হয়নি। কেন! ত্রুটি কি তাঁর! না কাঞ্চনবালার! এই ব্যাখ্যাতেও মুরলী মনোহরের স্বভাবজাত দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। তিনি এই ব্যাপারটাও কোন কাহিনীতে চালিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেছেন।

নুড়ি বিছানো পথে তিনি মানুষের পদশব্দ পেলেন। সদর পেরিয়ে এক মহিলা এগিয়ে আসছেন। কাঁধে একটা বড়সড় ঝোলা ব্যাগ। তিনি কি ভুল দেখছেন? অপূর্ব সুন্দরী মহিলা। মুরলী মনোহর চোখটা রগড়ে নিলেন। সে ততক্ষণে ঘরে চলে এসেছে।

হ্যালো মিষ্টার দাস।

অ্যাঁ—হ্যালো।—মুরলী মনোহর হতচকিত। মহিলার কণ্ঠস্বর থেকে টুপটাপ করে পড়েছে মুক্তোর দানা। মহিলা হাসলেন। মহিলা বললেন,

কনগ্র্যাচুলেশনস।

থ্যাংকিউ।

সুইডিশ রেডিও জানিয়েছে, নোবেল প্রাইজ কমিটি আপনার নাম ঘোষণা করেছে। আপনার সেই বিশ্বখ্যাত উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত পুরস্কার পেল।

মুরলী মনোহরের হার্ট বিট ডবল হয়ে গেল। তবু তিনি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করলেন। বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিকের দায়ীত্ব ফুলে উঠলো। তাঁর শরীরে, চোখেমুখে। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন মহিলার দিকে।—বসুন। আপনার পরিচয়টা কিন্তু পাইনি।

আমি প্রমীলা বালসুব্রহ্মনিয়াম। ভিন্নী দূরদর্শনের সাহিত্য-সংস্কৃতি শাখার প্রতিনিধি। আমার ক্যামেরা টিম বাইরে অপেক্ষা করছে। আপনার সাক্ষাৎকার চাই।

খানিকক্ষণের মধ্যেই ক্যামেরাম্যান এবং অন্যান্য সহকারীরা তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে উপস্থিত হলো।

মিস্টার দাস। আপনি সোফার ডান দিকে একটু কাত হয়ে বসুন। ঘাড়টা একটু ঘোরান। না! অতটা না। আর একটু, আর একটু। ব্যস। ঠিক আছে। মাউথপিসটা আমি আপনার জামার বোতামে আটকে দিচ্ছি।

কল্পিত পুরস্কারটি পেয়ে আপনার কেমন লাগছে?

এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন আমি। আমার দ্বিমাত্রিক সত্তা, যার কথা আমি অনেক জায়গাতেই বলেছি, এই মুহূর্তে তারই আলোড়ন চলছে আমার মধ্যে।

মেয়েটি বসেছে মুখোমুখি সোফায়। টকটকে কর্সা গায়ের রঙ। পরনে নীল জর্জেটের শাড়ি। ব্লাউজের গলাটা সামনের দিকে এতটাই নামানো যে, সেদিকে চেয়ে মুরলী মনোহরের কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর সূর্যকিরণের উপমা মনে এলো। তার দৃষ্টি হলো বেসামাল।

আপনার লেখালেখি, আপনার চিন্তাভাবনা—এসব নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। আপনিও এ-ব্যাপারে অনেক বলেছেন। আমি আপনার ব্যক্তিগত, জীবন নিয়ে প্রশ্ন করবো।—ক্যামেরা ঘুরলো সুন্দরীর দিকে।

ব্যক্তিগত জীবনে কাদের সাহচর্য আপনাকে উদ্দীপিত করে?—ক্যামেরা ঘুরলো মহান লেখকের দিকে।

আমার শুশ্রূষাকারী, আমার একনিষ্ঠ পাঠক এবং অবশ্যই আমার স্ত্রীর সাহচর্য আমাকে উদ্দীপিত করে।

লেখা সম্পর্কে আপনার ফিলিসফি টা কি? অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাইছি, লেখা এবং আরো লেখা, নতুন নতুন আইডিয়াকে বর্ণমালায় গেঁথে তোলার যে নিরলস প্রচেষ্টা, তার সম্বন্ধীয়ভাবের কথা আপনার শ্রীমুখ থেকে শুনতে চাই।

লেখা এবং না লিখতে পারা, এই দুইয়ের টানপোড়েনে আমি ক্ষতবিক্ষত হই। যেমন আমি হতাশার ভুগি তেমনি আবার সাদা কাগজও আমাকে যন্ত্রণা দেয়। আমার স্ত্রীর কাছে আমি লেখা সম্পর্কিত কোন বক্তব্য দিলেও শুনতে ইচ্ছুক নই, তবুও আমি একটি রাতে তাঁর ভালোবাসার আশ্চর্যজনকভাবে লীন হয়ে যেতে পারি। পরেরদিন ততোধিক আশ্চর্যজনকভাবে নতুন নতুন আইডিয়া আমার মাথায় এসে যায়।—কথা বলতে বলতে মুরলী মনোহর মহিলার মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখেন। এটা কি শিল্পীর কৌতূহল আর অন্বেষণস্পৃহা। তার শাড়ি, ব্লাউজ, গলার হার, কপালের টিপের মাপিং লক্ষ্য করেন তিনি।

খাদ্য তালিকায় কি আপনার পছন্দের?

চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউয়ের ঘন্ট, মাছের মধ্যে চিতল আর সরু চালের ভাত।

আপনি দিনে লেখেন না রাতে লেখেন?

রাতেই আমার মগজ খোলে।

আপনার সাহিত্য চিন্তা অর্ন্তমুখীন, না বহির্মুখী?

বিশ্বজনীনের চিন্তায় সৃষ্টিকে গভীর এবং সার্বিক করে তোলাই আমার লক্ষ্য। এই যে আপনি বসে আছেন, একটি সুন্দরী, তন্বী যুবতী—আমি আমার সৃষ্টিশিল্পার সঙ্গে আপনাকেও একাত্ম করে নেবো।

মহিলা হাসলেন। মুরলী মনোহরের কানে নূপুর বাজলো। মহান লেখকের চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক ছুটন্ত ঘোড়া। কেশরে ঢেউ তুলে সে ছুটছে।

আপনি আপনার জীবনবীক্ষণের কথা বলুন। অন্য তার সঙ্গে আপনার প্রতিভার সম্বন্ধের কথা।

জীবন হচ্ছে রূঢ়তম বাস্তব। তার সঙ্গে মেশাতে হয় কল্পনার রঙীন মদ। প্রত্যেকটা মানুষ হাঁটে এবড়োখেবড়ো জমিতে। কিন্তু কল্পনার থাকে কবিতার ছন্দ, বেহাগ অথবা ইমনের সুর। মানুষের মন স্বপ্ন পছন্দ করে। সেই মনটাকে আমি ধরতে চাই। মনস্তত্ত্ববিদের জটিল চিন্তাপদ্ধতি প্রয়োগ করে তাকে সাহিত্যভাষার ঘরে ঘরে সাজানোই আমার কাজ।

সেখানে কি আপনার ব্যক্তিজীবনের প্রভাব পড়ে?

পড়ে বৈকি। আমার বাবা আমার নাম রেখেছিলেন মুরলী। সে তো বাঁশি। বাঁশির সুর প্রকৃতিকে মশগুল করে দেয়। ডাল-ভাত-চচ্চড়ির জগৎ থেকে নিয়ে যায় রাজকুমার, অভিসারে। সাহিত্যের মাদকতা দিয়ে আমি আকর্ষণ করি সব মানুষকে।

কিন্তু সবাই কি আকর্ষিত হয়। জনতা কি আপনাকে নিজের লোক বলে মনে করছে? তারা কি আপনার লেখা পড়ে নিজেদের সুখদুঃখের আনন্দের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারছে।

নিশ্চয়ই।

কিন্তু প্রমাণ দিতে পারেন?

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমার বইগুলির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারগুলিই তো তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এ ব্যাপারে একটা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি আপনার উচ্চ প্রশংসা করেছেন তারা নাকি আপনার 'কায়েমী লোক'। জনতা নাকি আপনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ আপনি তার জন্যতার পরিচিহ্নের পায়ে পা ফেলেন না। আরো অভিযোগ, আপনি নাকি বিভিন্ন পুরস্কার কমিটিতে নিজের লোক ঢুকিয়েছেন। আপনার বই নাকি তাঁই হয়ে প'ড়ে থাকছে বইয়ের দোকানগুলোতে। উঠতি প্রতিভাবান লেখকদের আপনার তথাকথিত 'কায়েমী লোকরা' যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছে না। গণংকাররা বলছে, একটা বিস্ফোরণ ঘটে আপনার চূড়ো থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নাকি শতকরা আটানব্বুই ভাগ।

এসব অপপ্রচার। মুরলী মনোহর চীৎকার করে উঠলেন। তিনি ভাবো কেন রাগান্বিত হবারও চেষ্টা করলেন।

কিন্তু সুন্দরী ভারী সুন্দর হাসলেন। ঝরে পড়লো শরতের কিরকিরে বৃষ্টি। আকাশে সাদা মেঘ। শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ পেলেন মুরলী মনোহর। সুন্দরী দু'হাত দিয়ে তার চুলের খোঁপা ঠিক করতে লাগলো। তার গাঁচা হলুদ বর্ণ বাহু, বাহুসন্ধি, নাভি দেখতে পেলেন মুরলী মনোহর। জিভ বেরিয়ে এলো তাঁর। মহিলা হাত নামালেন। মহান লেখক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আপনি দেশের গৌরব। আমাদের গৌরব। আপনার এতবড় সম্মানে গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠছে।

সুন্দরীর এইসব কথা টুপটাপ করে মেঝেতে ঝরে পড়তে লাগলো। তারপর কথাগুলো সারা ঘরময় লাফালাফি করতে শুরু করলো। কোন কোন কথা দরজা পেরিয়ে নুড়ি বিছানো পথে চলতে লাগলো। দেখে মুরলী মনোহর নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না। নানারঙের মেঘের স্তরে তিনি অদৃশ্য। তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। তিনি হাত দিয়ে সামনেকার মেঘগুলো সরাতে লাগলেন। তিনি মেঝেতে চোখ রাখলেন। সেখানে বিচিত্র রঙের খেলা। কার্পেটের মধ্যে সাতরঙের ভাস্কর্য চলছে। মহান লেখক বললেন,

আমি কোথায়?

তুমি যেখানে যেতে চেয়েছিলে, সেইখানে।

এ তো প্রমীলা বালসুব্রহ্মনিয়ামের গলা।

হ্যাঁ আমিই। তুমি কি আমাকে মনে মনে কামনা করছিলে না।

ন—না, হ্যাঁ। তুমি কোথায়?

এই তো। এখানে। মুরলী মনোহর দেখলেন—সাদা গোলাপের পাপড়ির মতো পোষাকে প্রমীলা দাঁড়িয়ে। সদ্য রক্তের মেঘ দুলকি চালে সেই পাপড়ির ভেতর দিয়ে, বাইরে দিয়ে, ওপর দিয়ে, নিচে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

তুমি তো আমাকে চাইছিলে। তুমি তো আজ অনেক বড়। বিশ্ব জোড়া নাম। তোমার ভালোবাসা তো সব মেয়েরই অনেক বড় পাওয়া। এসো।

প্রমীলা হাত বাড়িয়ে দিলো সেই মেঘের রন্ধ্র থেকে। মুরলী মনোহর অসাবের পা ফেলে হেঁটে চললো সুন্দরীকে ধরতে।

এসো। কাছে এসো। এই দ্যাখো। আমি কামনা।

প্রমীলা তার শরীরের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। মুরলী মনোহর তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মেঘের আড়ালে। ক্রমশঃ এবং আরো ক্রমশঃ।

আরো জোরে পা চালালো মুরলী মনোহর। আরো জোরে। প্রমীলার মুখটাই শুধু দেখা যাচ্ছে।

প্রমীলা ডাকলো—মুরলী, এসো। মুরলী মনোহর কাছে এসে তখন তার হাত ধরলো। সে জড়িয়ে ধরল তাকে। আঃ কি নরম শরীর। মুরলী মনোহর বললো—তুমি সৌন্দর্যের ধ্বনি। আমি ডুবে যাব তোমাতে। মুরলী আবেগে চোখ বুজলো। প্রমীলা বললো-এসো। প্রমীলার নগ্ন শরীরের যুবতীকে পেঁচিয়ে ধরলো। কি নরম! কিন্তু বরফ ঠাণ্ডা। শিরশির করে উঠলো মুরলী মনোহরের সারা দেহ। প্রমীলার শরীরটাকে ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি। এ কেমন শরীর, সাপের মতো। প্রমীলার হাত খেলা করতে লাগলো মুরলী মনোহরের শরীরে।

চোখ খোল মুরলী মনোহর। প্রমীলার হাত মুরলী মনোহরের মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মুরলী চোখ খুললো। মুরলী দেখলো প্রমীলার হাতটা কালো-সাদা-বেগুনি-নীল রঙের মিশ্রণে একটা সাপের ফণা হয়ে তার মুখের সামনে দুলছে। মুরলী মনোহর চীৎকার করে উঠতে চাইলো। কিন্তু কোন কথা বের হল না। তারপর হেলতে দুলতে সেই সাপের ফণা নেমে এলো মুরলী মনোহরের কপালে—আ-আ-আ-আ-আ কন-কনাৎ।

একটা কাঁচের গ্লাস ভাঙলো। কপালে যন্ত্রণা।

মুরলী মনোহর ধড়ফড় করে উঠে বসলো বিছানায়। চোখ রগড়ালো সে। কপালে গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। কপালে হাত দিয়ে দেখলো একটা কাঁচের টুকরো বিঁধে আছে। পায়ের টেবিলে সাদা কাগজ, কলম। লেখা হয়নি একটা অক্ষরও। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।

বউ কাজলবালা এক কাপ গরম চা টেবিলে ঠক করে নামিয়ে রাখলো।

চা খাও। কাচের গেলাসটা ভাঙলো কেন? বাজে সাড়ে ন'টা সে খেয়াল আছে?

মুরলী দাস আমাদের সুখ-দুঃখে ভেজা জ্যাবজেবে পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

খোলা চোখ

কালীকুমার চক্রবর্তী

বিটোফেন বাজছে স্টিরিওতে। ঘুমচ্ছে সুজনের শরীর। মনটা ঝরঝরে।

দু'চোখ বুঁজে সে সুরের নাচন ধরছে, ছেড়ে দিচ্ছে; এমন সময় বেজে ওঠে ফোন। লম্বা টানা আওয়াজ। এস. টি. ডি. মনে হচ্ছে।

দ্রুত উঠে ফোন ধরে সুজন, —হ্যালো।

—হ্যালো সুজন? খাড়েনওয়ালা স্পিকিং; হিয়ার ইজ অ্যা নিউজ ফর-য়ু।

—ইয়েস স্যার, বলুন।

—য়ু হ্যাভ্ টু স্টার্ট ফর ম্যারিকা ফর সাইনাল এনগেজমেন্ট উইথ নিকলসন।

—ওকে স্যার, বলবেন গলা সুজনের, সামান্য কাঁপে।

চেয়ারম্যান খাড়েনওয়ালা এবার বলেন ইংরিজিতে,

—তুমারে দিয়ে হোটেল সুইট হুর্ট বুক হো গিয়া। অভি এয়ার টিকেট। ওভি হো জায়েগা। মিস্টার ব্রমফুবন্ধনে সাথ জলদি ভেট কর না।

—ঠিক হ্যায় সার, বলেই সুজন ফোনের রিসিভার রেখে দেয় ক্রাডেলে।

খুশিতে ঝকমকে দেখায় তাকে। আনন্দে রিভলভিং চেয়ারে পাক খেয়ে নেয় ক'বার। বেজায় দারুন শরিফ। গায়ের ওপর পা নাচায়। গলায় তার ওপড়ল সুর, ইংরেজি গানের...আই স্যাল মিস য়ু ফরএভর, ও মাই ফরএভর।

ভেতরে ভেতরে তার কথার ফোয়ারা আসে, জোড়া লাগে, ছিঁড়ে যায়। ডিবেট্টার মিস্টার সিংহানিয়া উপদেশ দিয়েছিলেন মাস-কয়েক আগে, গো অ্যাহেড সুজন, গো ফাস্ট, কোম্পানীকে দেখ, কোম্পানীও তোমার পেছনে থাকবে।

দেখেছেই তো সুজন। কোম্পানীকে এরিমধ্যে কয়েক কোটি টাকার লাভ এনে দিয়েছে! চেয়ারম্যান, ডাইরেক্টর, রীতিমত খুশি। সেজন্যই তো কোম্পানী তার দিকে নজর। সুজনকেই বলতে হবে। কর্মক্ষম সুজন। স্মার্ট, সুদর্শন, কথাবার্তায় চৌকস। কথার ফাঁক-ফোকড় থাকে না। খুবই কৌশলে সামলায় ক্লায়েন্টদের।

তো আমেরিকার নিকলসন কোম্পানীর সঙ্গে জোড়াযোগ করার সুযোগ, কথাবার্তা চালাবার দায়িত্ব তাকে, দেওয়া হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তার পারসোনালিটি, কর্মদক্ষতার মর্যাদা থাকবে না? থাকবে। এবং থাকছেও। অবশ্য সেজন্য সে মোটা অংকের চেক পায়।

চমকে দেবার মত ভবিষ্যৎ তার। বকেয়া বাড়ির এলিভিটেটরের মত ধাপে ধাপে ভবিষ্যতের ফ্লোর। উন্নতির, সমৃদ্ধির এলিভিটর দ্রুত উঠে যাবে—ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড, থার্ড ফ্লোর। কিন্তু সিকিলতা আসলেই মুস্কিল। ভবিষ্যৎ আটকে যাবে থার্ডে।

মান্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর এটাই নিয়ম ৩২, ৩২, সাহস বুকে ওঠো, আরো উপরে, আরো...না হলে কিন্তু একই ফ্লোরে, একই পোস্টিং-এ থেকে যেতে হবে এমনও হতে পারে, একটু ভুল চালে, ফলিসের থ্রিলেমিস্টে নীচের পোস্টে চলে যেতে হবে ভাবতে পারে সুজন। এমন ডিগ্রেডেশন।

এখন সে কোম্পানীর সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। কোম্পানীর প্রফিট-লস নির্ভর করছে তার উপর। তার উপর অনেক ভরসা কোম্পানীর, অনেক নির্ভরতাও। সুজন চৌধুরী, ওপরওয়ালার ভাষায় মিঃ চৌড়বি. খুবই কাজের লোক। কত লোয়ার পোস্টিং থেকে উঠে এসেছে আপার পোস্টের হাক ধরবার। ভাবা যায়? অ্যা মিরাক্যাল। এটা সম্ভব হয়েছে তার নিষ্ঠা, সাহস আর জীবন গড়ার নেশার জন্য। কত অল্টারনেটিভ করিয়ে নিয়েছে কোম্পানীর। কোম্পানীও তার জন্য করেছে অনেক। মোটা মাইনে, লাক্সারি ফ্ল্যাটের ডিলাক্স সুট। আনলিমিটার্ড কার্নিচার। তাছাড়া চাকর-বাকর, বাঁধুনিতো আছেই। খরচ দেয় কোম্পানী।

আনন্দতো হবেই সুজনের। তৃপ্তি আসবেই। জীবনে উন্নতির গ্রোথ পাবেই। পরিপূর্ণ জীবন তাদের। অ্যা পারফেক্ট মান যব... ভাবতে দিয়ে হঠাৎ সুজনের গলার সুরে ব্রেকিড কি ব্যাপার? তার চোখ চলে যায় দেওয়ালে, তার কথার ফটোর দিকে। ধ্বক্ করে ওঠে বুক। বাবা

হাসছে কি তাকে দেখে? স্বাধীনতা আন্দোলনের জেলখাটা আসামী বিজন চৌধুরীর মুখে হাসি? ব্যঙ্গ করছে কি বাবা?

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের চোখে তার বাবা এক ঐতিহাসিকচরিত্র। ভোগ-লালসাহীন নিস্বার্থ মানুষ। ইস্টারন্যা বোর্ডের ছবিটা এখনও সুজনের চোখে ভাসে।—ট্রেজ, দ্য আর দি সন্ অব বিজন চৌধুরি। অ্যা হিস্টিরিক্যাল পারসোনালিটি? সিংহোনিয়া আবেগে গলায় নিয়া ঝুলিয়ে ফেলেছিল। শেষটা বোর্ড কেন স্তব্ধ। আর কোন প্রশ্ন করেনি কেউ। ক'দিন বাদেই এলো তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।

বলতে গেলে বাবার জন্যই সুজনের এই চাকরি। তাঁর অতীত সংগ্রামের পুরস্কার। অথবা প্রতিদানও বলা যায়। যে মানুষটা দেশের জন্য অত করলো। তার ছেলে চাকরি পাবে না?

বাবার কথা মনে আসতেই ম্রিয়মান হয়ে যায় সে। এখনও তার বাবা একগুঁয়ে, বেপরোয়া, সুজনের কোন ব্যাপারেই তাঁর কোন উৎসাহ নেই। তাদের সঙ্গে থাকেন না তিনি। আর এটাই দুঃখ সুজনের। সব ছেড়েছুড়ে তিনি এখন তিনি এখন বাঁকুড়ার কোন্ অখ্যাত গ্রামে মেতে আছেন আদিবাসীদের নিয়ে। ওদের নাকি সামাজিক পরিবর্তন ঘটাবেন তিনি।

আজই একটা চিঠি এসেছে বাবার ঃ আমি এখন এদেরই একজন হয়ে গেছি খোকা। এক সঙ্গে খাই-দাই, কাজকর্ম করি। রাতে মাদল বাজিয়ে নাচগানে ডুবে থাকি। তুমি ভাবতে পারবে না কি বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে এখানে। যৌথ খামার, যৌথ কৃষিকাজ, কুটির শিল্পের নানা শাখা, সরকারী-বেসরকারী সাহায্যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। মন ভরিয়ে দেয় উদার আকাশ। শান্ত সুন্দর প্রকৃতিক শোভা, অরণ্যের গভীর গম্ভীর হাতছানি।

চিঠিটা অনেকবারই পড়ে ফেলেছে সুজন। বার বারই ভারাক্রান্ত হয়েছে মন। দুঃখ হয়। অথবা জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন বাবা। একেবারে বাজে খেয়ালে। তবু কি করতে পারতেন তিনি। যা শুরু করেছেন অনেকদিন আগে। একক নিঃসঙ্গ মানুষ বাবা। তিনি কি নিঃসঙ্গতা কাটাতে পারতেন না? পারতেন, নিশ্চয়ই পারতেন।

এখনতো তাঁর সুজনের পাশে পাশে থাকার কথা। বিয়ে থাবেন-থাবেন। সুজনের উন্নতির ব্যাপারে আরেকটু সাহায্য করতে পারতেন। তাকে মদত দিতে পারতেন। কোম্পানীর কর্তা ব্যক্তিদের ওপর পারতেন আরেকটু প্রভাব খাটাতে। অবসর সময়ে সামাজিক কল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে নিতে পারতেন নিজেকে। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম, পুরাকীর্তি সংরক্ষণে হৈ চৈ ফ্যাপানো চমক আনতে পারতেন। কিন্তু সে সব কিছুই করলেন না। ঘরে গেলেন আদিকালের বোধ বিশ্বাসে। নিঃসঙ্গতা বোধ থাকতে পারতো তাহলে?

অথচ চিঠি লিখেছেন। বেশ দৈ চৈ-এর মধ্যে, কর্মযজ্ঞের মধ্যে মেতে আছেন তিনি। আদিবাসীদের সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাপারে নাকি মশগুল। আসলে গোয়ার্তুমি, বাবার এটা বেক জেদ। আদিবাসীদের চাল-চলন, জীবন যাপনের সঙ্গে তাদের মত মানুষদের কাজকর্ম, কৃষ্টি-সংস্কৃতির মিল হয় নাকি?

এসব ভাবতে ভাবতে চিঠিটা আবার টেবিলে রেখে দেয় সুজন। বাবার ফটোর দিকে আরেকবার তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে মুখড়ে পড়ে। কিন্তু এখন তো তাকে বিষণ্ণ হলে চলবে না। বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগ এখন। চারিদিকে দুরন্ত প্রতিযোগিতা। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, দেশি পুঁজির সঙ্গে বিদেশী পুঁজির। বিশ্বায়নের স্রোতের উপর ভেসে থাকার কসরৎ রপ্ত করতে না পারলে ডুবে যেতে হবে অতলে।

এবার দু'চোখ বুজে ফেলে সে। খাড়েলওয়ালার নির্দেশটা চারিয়ে তোলা নিজের ভেতর। এয়ার প্যাসেজের জন্য মডার্ন ট্যুর এজেন্সির রামকৃষ্ণাকে বলতে হবে। ওদের কমিশন খুব বেশি নয়।—কে?

গালে নরম স্পর্শে চমকে চোখ খোলে সে। "মি" মানে মিনা, তার বেটার হাফ গালে গাল ঠেকিয়ে বলে ওঠে,—কি ভাবছো সু? টেবিলে কার চিঠি ওটা?—বাবার, উদাস গলা সুজনের। বাসী মিত্রেরা ভাই না? আমি অবাক হয়ে যাই সু, অমন হ্যাকওয়ার্ড মানসিকতা ওয়ালা বাপের ছেলে হয়ে তুমি এত মডার্ন হলে কি করে?

—আহ—মি, প্লিজ স্টপ। বাবাকে নিয়ে কোন.....

—আমার দরকার নেই, ক্ষমাসুন্দর হাসে মিনা।

মিনা মানে সুজনের আদরের "মি" একজন ডাকসাইটে সমাজ নেত্রী। নারীবাদী আন্দোলনের দুর্ধোষ সম্পাদিকা। সুতরাং সুজনের বাবাকে নিয়ে মিনার কোন সেন্টিমেন্ট থাকার কথা নয়। ওসব কাঁপা লোক দেখানো আদর্শ-টাদর্শে তার মন গলে না। ওরকমও দেয় না সে। বিশ্বের বিভিন্ন নারী সংস্থার এলিটেরা, রাজনীতি বিশারদরা এবং শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে কর্ণধাররা মিনাকে চেনে এক ডাকে। তো সুজনের বাবার এইসব ভাবালুতা যা তাকে প্রশ্রয় দেবে কেন সে?

সুজনেরও গর্ব কম নয় মিনাকে নিয়ে। সে উঁচু ঘরের। দেশ-বিদেশের নানা সম্মেলন, সেমিনার, প্রেস কনফারেন্সে তার ঝাইফাই ব্যক্তিত্ব। বিদেশ সফর-টফর তার কাছে জলভাত ব্যাপার।

বাপ দরদী সুজনকে আদুরে হাতে পাশে টেনে নিয়ে মিনা ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগোতে থাকে। তার হাঁটার ছন্দে বাতাস নাড়া খায়। ডানলোপিলোর ছাতলহীন চেয়ারে বসে বাঁদিকে মুখ বাড়িয়ে কেষ্টার মাকে ডাকে,—কেষ্টার মা, ও কেষ্টার মা, এদিকে এসো, তাড়াতাড়ি। পাশে বসে আছে বিউটি পারলারের আরতি।

কেষ্টার মা বিধবা। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়স। নিরাভরণ। পরে পতরে ফেটে নিজের পেট চালায়। কেষ্টার মা'র কেষ্টা কিন্তু বেঁচে নেই। মারা গেছে অনেকদিন আগে। লোকে বলে ডাকাত ধরতে গিয়ে সে টেনে মারা গেছে ডাকাতদের হাতে। তবু লোকে মিনতি বিশ্বাসকে কেষ্টার মা সম্বোধনে ডাকে। ওর মিনতি নামটাই ভুলে গেছে অনেকে।

কেষ্টার মা মিনা সুজনের সংসারের হাল ধরে আছে। বুটি পটলি নামে আরো দুটো মেয়ে বাইরের কাজ করে। এই সংসারে তার কাজের প্রশংসা নেই। কিন্তু কিছু ত্রুটি হলেই সর্বনাশ। মিনিমণি বাড়ি মাথায় তুলবে। তুলোধুলো করবে কথার চোটে।

সুতরাং তাকে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসে কেষ্টার মা। সামনে এসে দাঁড়ায়। মিনার কেশচর্চা করে মিজিল পারলারের আরতি। সেই দিকেই মিনার দৃষ্টি। কেষ্টার মা'র দিকে না তাকিয়ে আদেশ হয় মিনার।—শোন কেষ্টার মা, আজকের মেনু হবে ফ্রাইডেড্ রাইস, ফিস ফ্রাই, চিকেন রেজালা আর আনারসের চাটনি। ফ্রিজে সন্দেশ আর আইসক্রিম আছে, এই দিয়েই চলে যাবে ডিনার।

—ঠিক আছে মিনিমণি, বলে কেষ্টার মা চলে যায় কিচেনে। ডিভানে আধশোয়া সুজন মিনার কেশপরিচর্চা দেখতে থাকে। সাজলে গুজলে মিনাকে সুন্দরী মনে হয়। গায়ের রঙটা আরেকটু ব্রাইট হলে তাকে দেখে কে?

—মি, মেয়ার ইজ অ্যা ছাপি নিউজ ফর য়ু।

—হোয়াট নিউজ সু? সুজনের দিকে মুখ না ফিরিয়ে জিগগেস করে মিনা। মুখে তার আলতো হাসি লাগানো।

—কোম্পানীর আরেকটা মোটা টাকার কন্ট্রাক্ট-এ এগ্রিমেন্ট করাতে ম্যারিকা যেতে হবে?

—তাইনাকি? কবে, কবে যেতে হবে সু?

—দুরেক দিনের মধ্যে। এয়ার টিকেট কনফার্ম হবার ওপর ডিপেন্ড করছে বাবার ভেট্।

—তোমার পটিনায় ছুরে যেতে পারছি তো আমি?

এ কথায় হাসে সুজন। হাসির শব্দ খুব তীব্র না হলেও তীক্ষ্ণসুরের, —না মি। ডাইরেক্টর আর্ট অ্যালাও করেনি, বলে সুজন নিজের ভেতরে হাসে। মনে মনে ভাবে, কন্টিনেন্টে স্ত্রী থাকে নাকি পার্টনার হিসাবে? শুনলে অন্য একজিকিউটিরা হাসবে। ওদেশে স্টার মার্কা হোটেলে সব রকমের সুযোগ সুবিধা থাকে।

অবশ্য সুজন জানে মিনার এটা শুধু কথার পিঠে কথা বলার জন্যই বলা। এখন সুজনকে সঙ্গ দেবার ফুরসৎ আছে নাকি তার? রোজই তো প্রোগ্রাম। নানা ধরনের। কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু সমিতিগত এনগেইজমেন্ট। আজই আছে আর্ন্তজাতিক নারী দিবসের সেমিনার। বক্তব্য রাখবে মিনা।

বিউটি পার্লারের আরতি কেশপরিচর্চার কিনিশিং টাচ্ দিয়ে চলে যায়। নিজেকে অরেকটু গোছগাছ করে নিয়ে দ্রুত চলে আসে সুজনের কাছে,—দেখ তো সুর সব ঠিক আছে কিনা?

—দারুন, দারুন, যেন পটে আঁকা, একটা ছবি হবে নাকি?

—এ্যাই-ও, নটি বয়, বলে মিনা একটা পাক খেয়ে নয়। তারপর স্থির হয়ে বলে, শোন তোমার গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি। আবার তাড়াতাড়ি ব্যাক করিয়ে দেব। আমারটা গ্যারেজে, কি সব খুটিনাটি ডিফেক্ট।

সুজনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। বিস্তৃত হয়। ইতস্তত করে বলে, কিন্তু আজ যে আমাকে ডাঃ মুখার্জির কাছে যেতে হবে। তোমার সেই হর্মোন সংক্রান্ত রিপোর্টটা আনতে হবে। আ-হা-হা, নিয়ে যাও, তবে তাড়াতাড়ি ব্যাক করিয়ে দেবে।

—ও সিওর, বলে মিনা শরীরে ঢেউ তোলে। সেই ঢেউ এসে লাগে সুজনের ভেতর মনে। তার ভেতরটা নাড়িয়ে দিয়ে মিনা চলে যায় দ্রুত লিফটিংয়ের দিকে।

সুজন ভূকুঞ্চিত বোধ করে। এক কাপ কফি দরকার। কেটার মাকে ডাকে জোর গলায়। কেটার মা ছুটে আসে, কি বলছেন দাদাবাবু?

—এক কাপ কফি খাওয়াও তো কেটার মা।

—আনতিচি দাদাবাবু, বলে দাঁড়িয়ে থাকে। যায় না তবু।

—কি হলো? সুজন অবাক চোখে তাকায়।

জড়োসড়ো গলায় কেটার মা জিগগেস করে, আর্ন্তজাতিক নারী দিবসটা কি দাদাবাবু? এদিনে কী হইচে? সুজন শুনে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, এটা জান না? নারীদের উন্নতির জন্য এই দিনটা উৎসর্গ করা হয়। শপথ নেওয়া হয়। দেশ বিদেশ থেকে মহিলা নেত্রীরা এসে নারী নির্যাতন, নারী শোষণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে। সে এক এলাহি ব্যাপার কেটার মা। তুমি বিদিমনির কাছ থেকে ভাল করে বুঝে নেবে।

বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে কেটার মা। সে ভাবে, এতসব হচ্ছে? অশিক্ষিত বলে তাদের মত মেয়েরা অত-এব খবর রাখে না। অথচ মেয়েদের জন্য কত কাণ্ড কারখানা হচ্ছে চারিদিকে। এসব জানে না তারা। বিদিমনির কাছ থেকে জেনে নিতে হবে গোটা ব্যাপারটা। এসব ভাবতে ভাবতে রান্নার কিচেনে চলে যায় কেটার মা।

সেমিনার দারুণ জম জমাট। আর্ন্তজাতিক নারীদের ক্ষোভ বিক্ষোভ, অধিকার, দাবী দাওয়ার বিস্তারিত আলোচনা চলছে। নামী দামী ব্যক্তিত্বের ভীড়। ওদেরই সামনে বক্তব্য রাখছে মিনা। পরিষ্কার ঝরঝরে গলা তার : আমেরিকার বিদের ওপর অত্যাচার চলছে। ফ্রান্সের যৌনকর্মীদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বৃটেনে ওম্যান লেবাররা নায্য মজুরী পায় না। আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও দাস প্রথার ভেতর আটকে। তাই দেশে দেশে নারীদের সপক্ষে আরো জনমত গঠন করার প্রয়াস চালিয়ে যাব। অত্যাচারী পুরুষদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হব।

বলতে বলতে মিনার চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। বাচনভঙ্গিতে অনমনীয় দৃঢ়তা। কঠিন কঠিন বক্তব্য। গায়ে চোরা বিদ্যুৎ খেলে যায় সুজনের। গায়ের রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথায় যেন খটকা লাগে তার। ওধুমাত্র পুরুষ তন্ত্রের বিরুদ্ধে বলছে কেন মিনা?

হঠাৎ তার বাবা বিজন চৌধুরীর মুখটা নারী শোষণকে দেখা ঠিক নয়। গোটা সমাজ ব্যবস্থায় যে শোষণ চলছে নারী নির্যাতন তারই অঙ্গ। সমাজের সমস্ত শোষণ অত্যাচারকে জিইয়ে রেখে অবিচ্ছেদ্য শোষণ। এসব পুঁজিবাদের কৌশলমাত্র।

ঠোঁটে ঠোঁট চাপে সুজন। বাবার কথাগুলো এই মুহূর্তে তাকে যেন খামচাতে থাকে। ওপর ওপর চিন্তা করলেও তো দেখা যায়—মেয়েরা মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে। দায়ী কে তাহলে? বাবার কথাই কি সত্যি? এর জন্য দায়ী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা?

হঠাৎ চারদিক থেকে হাত তালি পড়ে। মিনা অভিনন্দিত হচ্ছে। অনেকে ছুটে আসে ওর দিকে। নানা দিক থেকে অনেকগুলো হাত এগিয়ে আসে হ্যাণ্ডশেকের জন্য। অনেকের চোখে প্রশংসার দ্যুতি। রাজনৈতিক নেত্রীর মত ভীড় ঠেলেঠুলে মিনা এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

গাড়িতে ওঠে ওরা। মিনার নাকে টোনা মোর সুজন বলে, দারুণ বলেছ মি, একসাইটিং অ্যাণ্ড আগ্রেসিভ্। তবে নারী নির্যাতনের জন্য পুরুষরা দায়ী এটা কিন্তু মানতে পারলাম না। মিনা বাঁ হাতটা পদির ওপর দিয়ে এগিয়ে দেয় সুজনের কাঁধে। দু' আঙুলে সুজনের দু'টি কুচি চুলে টান মেরে কথা চিবাতে থাকে, —ওসব বুঝবার চেষ্টা করা না যু, জনফিউশনে পড়বে। সুজন কিছু না বুঝে অনেক কিছু বোঝার ভান করে।

ফ্ল্যাটে এসে ওরা থ। কেটার মা, বুচি, পটলিরা ফ্ল্যাটের কোথাও নেই। শুধু দরোয়ান রামলখন সিং নীচে বসে। তৃষ্ণায় মিনার গলা শুকিয়ে গেছে। ঠাণ্ডা পানীয় বা সরবৎ না হলে তৃষ্ণা মিটবে না। রামলখনের কাছ থেকে সব শুনে মিনার সারা শরীরের রক্ত চিড়িক করে মাথায় উঠে যায়।

এত সাহস কেটার মা, বুচিদের। রামলখন সিং ওদের ঠাণ্ডা পানীয় এনে দেয়। মিনা আকণ্ঠ পান করে কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। গা এলিয়ে দেয় ডিভানে। সুজন ধীর পায়ে চলে যায় ফোনের কাছে।

আধঘন্টা পরে ওরা আসে। কেটার মা নরম পায়ে এগিয়ে এসে জিগগেস করে,—আপনারা কখন ফিরি এ্যালেন বিদিমনি? ওকে দেখে চলাৎ করে রক্ত উঠে যায় মিনার ব্রহ্ম রন্ধ্রে। রুদ্ধকণ্ঠে গলায় হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে,—কোথায় গিয়েছিলেন?

নতমস্তক কেটার মা, মিন মিন করে বলে,—খেটে খাওয়া মাইন্ষের নিয়ি মিটিং হতেছেল মাঠে। আর্ন্তজাতিক মাইয়ের দিন চলতিছে যে।

কথা শেষ করার আগেই চেঁচিয়ে ওঠে মিনা, —বেরিয়ে যাও বুচি পটলিদের নিয়ে চলে যাও। আমি কোম্পানী থেকে অন্য লোক চেয়ে নেবে।

—কি বলতিচেন বিদিমনি?

—আর কোন কথা শুনবো না আমি, বলেই পটপটিয়ে বেডরুমের দিকে চলে যায় মিনা।

কেটার মা হতভম্ব। তার চোখ দু'টো ক্রমশঃ ঘোলা হয়ে যেতে থাকে। ঘোলা চোখ তুলে সামনের দেয়ালে তাকায় সে। দেয়ালে হরিণের মাথা, বাঘের মুখ আর রঙবেরঙের নানা ধরনের মুখোশ। মুখোশ গুলো যেন বাতাসে উড়ছে, দুলছে। অন্ধ ঠিক তার উল্টোদিকে সুজনের বাবার ফটোটা স্থির গম্ভীর মুখে লেপ্টে আছে দেওয়ালে।

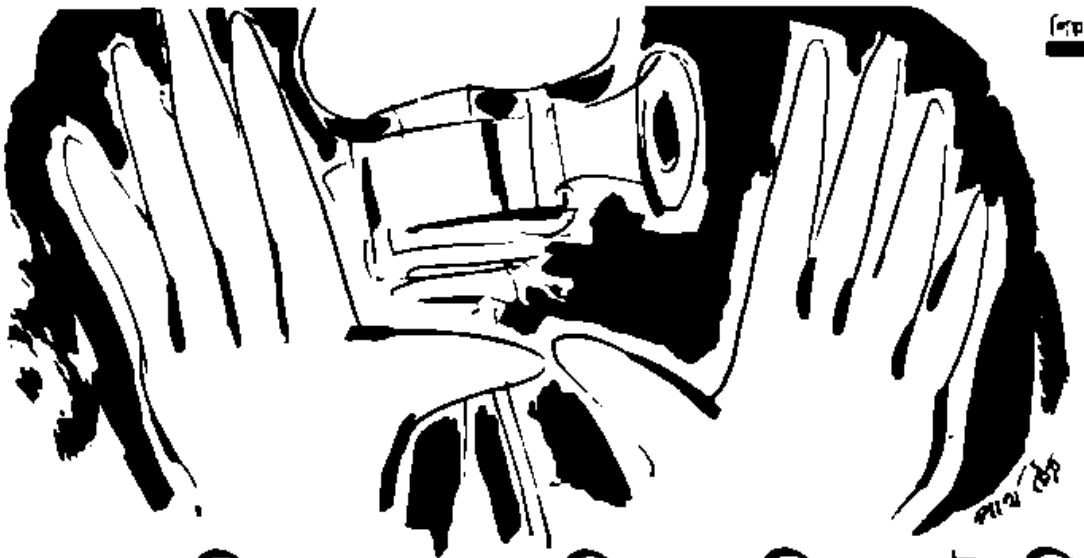

বিশ্বায়নে সিনেমা ঃ অভিনব বিষয় বৈচিত্র্য শতাধিক ছবিতে কিন্তু মিলের খিল খুলেছে

সমীরণ দত্তগুপ্ত

গত এক সপ্তাহ ধরে কলকাতা সহ রাজ্যের মানুষ দেখেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শতাধিক ছবি। যার একটা বড় অংশ নির্মিত হয়েছে এই ৯-এর দশকেই। বিশ্বায়ন, বাজার অর্থনীতি এখন সারা পৃথিবীতে বেশ দাপিয়ে বিরাজ করছে। ছবিগুলিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে। কেমন করে বিশ্বায়নের রথচক্র মানুষের মূল্যবোধকে ভাসে করছে। কেমন করেই বা মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। ছবি সে সবকিছুকেই ঘুঁয়েছে, নারীর পণ্য হয়ে ওঠা। পণ্যের গুণমানে নারীকে বিবেচ্য করার প্রয়াস। পরিচালকের ক্যামেরায় ধরা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছবিগুলির মধ্য দিয়ে এ আমরা দেখলাম বিশ্বায়নের প্রভাবে মানুষের জীবনে কি নিদারুন দুর্ভোগ যন্ত্রণা নেমে এসেছে। আছে কয়েকটি কালজয়ী ছবি। কুরোসোয়া থেকে ব্রেখট। আইজেনষ্টাইন। বিকল্প সিনেমার পথচলা ঋত্বিক সিনেমার কথোকথা। এরই সঙ্গে হলিউড মোঘলদের সর্বগ্রাসী ধারা। ১০ থেকে ১৭ই নভেম্বর। কলকাতা ছিল উৎসবমুখর। পৃথিবীটা যেন আমাদের দোরগোড়ায় বিরাজ করেছে। এসেছেন বহু বিশিষ্ট পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। পারস্পরিক মত বিনিময় করেছেন। জানিয়েছেন নিজ নিজ দেশের সিনেমার সংকট ও সম্ভাবনার কথা। রাজ্য সরকার পরিচালিত এই উৎসব এবারই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পেলো। চতুর্থ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম একটি পর্ব ছিল। ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর ইয়ং সিনেমা। ফিল্ম সিনেমার গত ১১ই নভেম্বর থেকে প্রদর্শিত এক ঝাঁক ছবির একটি স্টর্ম ইন দি আফটার নুন। আমেরিকার এই ছবিটির পরিচালক একজন অনাবাসী বাঙালী। গত ১৩ই নভেম্বর প্রদর্শিত রবীন পোদ্দার পরিচালিত এই ছবিটির বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। ৪এর দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে শামিল হয়ে বিকল্প সংস্কৃতির পথে যারা হাঁটতে শুরু করেছিলেন অনাবাসী এই ভারতীয়টি তাঁদেরই একজন। পরবর্তীকালে কল্লোল নাটকের সঙ্গে যুক্ত হন। নাটামন নামে একটি সংস্থা নিয়মিত পরিচালনা করতে করতে সাতের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ জীবিকার সন্ধানে পাড়ি দেন ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে।

স্টর্ম ইন দি আফটারনুন ছবিটির বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির ঘেরাটোপে মার্কিন মুলুকে এক ভারতীয় পরিবারে মূল্যবোধ আর অস্তিত্বের সংকট। ভোগবাদ কেমন করে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করছে। ছবি প্রদর্শনের পর পরিচালকের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, ছবির গল্পের উৎসটা কোথায়? তিনি জানান তখন বৈভব আর প্রাচুর্যে মানবিক চাহিদার সংকট অনুভব করছিলাম। একদিন নিজের স্ত্রীকে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই ভোগসর্বস্ব জীবন ও অহেতুক খরচ কবে কমাবে? সে উত্তর দিয়েছিল তুমি যবে যথেষ্ট রোজগার কমাবে। এইখান থেকেই ছবির গল্প তৈরির পটভূমি তৈরি হয়।

এবার থাকা যাক মার্কিন মুলুকে ভোগবাদী সমাজের অভ্যন্তরে থাকা একটা পরিবারের সংকট কেমন করে তৈরি হলো। স্বামী, স্ত্রী, শাশুড়ির সংসারে যথেষ্ট বৈভব। ভোগসর্বস্বতার চোরা স্রোতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে মধ্যে ফাটল ধরলো। এলো একজন ভোগ্যপণ্যকে ব্যবহার করার মতোই স্ত্রীর মানবিক চাহিদা পণ্য হয়ে উঠল। ডাক্তার অজয় বসুর

পরিবারে আসন করলো। অস্তিত্বের সংকট শুরু হলো। যেমন করে পণ্যসর্বস্ব অর্থনীতির সংকট তৈরি হচ্ছে। আমেরিকান সমাজে থেকে যতটা সম্ভব সফলভাবেই পরিচালক রবিন পোদ্দার ফেলুলয়েডে কোলাজ তৈরির চেষ্টা করেছেন। [illegible] কাজ। কয়েকটি মার্কিন যুবতী [illegible] এলো ভোগসর্বস্ব সমাজের দাঁতাকলে [illegible]। নিজেদের মানবিক চাহিদার সংকটের [illegible] অন্যের বন্ধুর সংকটের প্রতি সহানুভূতিশীল। ছবিতে খানিকটা নাটকীয়তার মাত্রা আছে। সিনেমাটিক আবেদন তাতে খানিকটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। ছবির শেষ কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমেই। পরিচালক ফেলুলয়েড ভোগসর্বস্ব সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

ইস্টার ন্যাশনাল কোয়াম ফর ইয়ং সিনেমা বিভাগের অধিকাংশে ছবিই ৯০-এর দশকে তৈরি। অধিকাংশেই ইউরোপের কেন্দ্রগুলির পুঁজিতম বিষয়বস্তু। প্রায় প্রতিটি ছবিতেই নারীর শরীর, তাকে ঘিরে মনুষ্যত্ব, পৌরুষের টানাপোড়েন মূল বক্তব্য। ছবিগুলি দেখলে বোঝা যাবে ইউরোপীয় সমাজে বর্তমান সময়ে চলছেটা কি। সুইজারল্যান্ডের বেশ কয়েকটা ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে এই বিভাগে। এরকম দুটি ছবি 'দি ওয়াশার ম্যান ফ্রোক' ও 'নাইস টাই ডিন লুই পারসিভিউ'। ছবি দুটির পরিচালক ক্লাউডি গোয়িট্যা। সুইস সিনেমার ক্যামেরার কাজ অত্যন্ত ঝকঝকে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের সুকলতা ছবিতে আছে। প্রকৃতি দুটি ছবিতেই বড় একটা জায়গা জুড়ে আছে। প্রাচুর্য, বৈভবের অত্যন্তরে থাকা মানুষের শুন্য হওয়া অস্তিত্বের সংকট ছবির অন্যতম বিষয় বস্তু। ছবিতে নারীর শরীর ব্যবহারের একটা প্রবনতা বিদ্যমান।

সমস্যাটা হচ্ছে মানবিক অস্তিত্বের সংকট বোঝাতে ফেলুলয়েডে ভোগসর্বস্ব জীবন, তার যন্ত্রণাকে যতটা বিস্তৃতভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা, ঠিক ততটাই স্পর্শ করতে বিশ্বাসীয় মুভির অধিকতা অনুপস্থিতি। অর্থাৎ গোটা সমস্যাটার প্রকরণে চেতনাটা বোঝাতে নারীর শরীর নিয়ে ভোগসর্বস্বতার ইদুর দৌড় চিত্রায়িত হয়েছে। কিন্তু ভাবনার সমান ভাষার তথ্য অনুপস্থিত। অথচ ফেলুয়ড ফেলায়। যদিও নারীর শরীর সর্বস্ব কাহিনীর উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ভোগসর্বস্ব সমাজ, সেখানে নারীকে ভোগ পণ্যের মূল্যমানে বিচার বোলআনা। সিনেমাটিক আবেদন নিয়েই ছবিতে বিরাজ করেছে। সমস্যাটা হচ্ছে ধারনিক সিনেমার অনুপস্থিতি। ফেলার উত্তরণের উপেক্ষুখ। প্রায় প্রতিটি ছবিতেই এই সীমাবদ্ধতা দেখেছি। এ এক ধরনের ফাঁকি। বাস্তবতা প্রকর্ষনে কার্যপ্রণালীন পরিচালক যেসব থাকা সমাজ বাস্তবতার প্রতি তেমনভাবে দৃষ্টি দেননি। যদিও দর্শকদের আসল অবস্থাটা বুঝতে অসুবিধা হবে না।

এরকমই পোল্যান্ডের পরিচালক আন্দ্রেজ ফাজদার 'দিস নো বডি' মেলার ল্যাতের পরিচালক ইজিউটারমলের বাউন্ডস হ্যাণ্ড ব্রাইজসমেইড। ভোগসর্বস্ব সমাজের প্রতিফলন হচ্ছে ছবি দুটিতে। কেমন করে নারীর শরীর ভোগ্যপন্য হয়ে ওঠে। নারীও নিজেকে সঁপে দেয়। শারীরিক কিংবে বিকৃত হয়ে ওঠে। তখন এরা পৈশাচিক খেলায় মেতে ওঠে। একদিন কিন্তু খেলা থামে। নারীর মানবিক চাহিদা ফল্গুধারায় প্রবাহিত হয়। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। নারী পুরুষের শরীরের অযেচ্ছ ব্যবহার। ন্যাপটার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের সংকট গভীর হয়। একাকীত্ব নেমে আসছে। মানবিক চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে শরীর সর্বস্ব চাহিদার ফারাক তৈরি হয়। ফেলুলয়েড এই ভাষনকে ধরেছে বেশ নিপুনভাবেই। পোল্যান্ডের ছবিটি ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতিকে স্পর্শ করেছে। উত্তর আধুনিকতার সর্বনাশা ছড়কে বোঝাতে পরিচালক সে দেশের লোকসংস্কৃতিকে ছবিতে ব্যবহার করেছেন। ফোকের ভাষাতেই উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেকড়ের সন্ধানে সে যাঁতার অযেচ্ছ সম্ভাবনা সত্ত্বেও ছবির বক্তব্য সীমাবদ্ধতা দ্বনির্ভরতায় আক্রান্ত হয়েছে। পোল্যান্ডের ছবিটিতে ঘুষোস ব্যবহার করা হয়েছে। এসেছে রূপকথা ছবিতে শরীরে উল্কি আঁকা। এসব নিয়েই ফেলুলয়েড বাস্তবতাকে ছুঁয়েছে। পণ্যের জন্য মানুষের ইদুর দৌড় বোঝাতে বা উল্কিকে গাড়ির পরিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ইদুর দৌড়ের নিষ্টকল যে শূন্য তা বোঝানো হয়েছে চোখের জলে। বাউন্ডস হ্যাণ্ড ব্রাইডমেইড ছবিতে প্রচ্ছন্নভাবে ধরা পোলা হয়েছে বিবাহ ধরে উত্তরণকে। কে এই ন্যাপটার কর্তব্যরিনী। কেন মানুষ এই মরীচিকার পিছনে ছুটছে।

এরকমই আরেকটা ছবি গ্রীসের পরিচালক ভিসিলিস ভ্যাসেলিউসের দো নিকনামি কল দি ডেভিল। ছবির ভরুবরণ ১৯৯৭ সাল।

একটি মেয়ের চোখের জল দিয়ে ছবিটির শুরু। ক্যামেরা নিখুঁতভাবে চোখের জল ধরেছে। আসলে চোর মেয়েটি। ভোগসর্বস্ব সমাজের প্রতীক। বৈভবের হাতছানি আর সাফল্যের অযেচ্ছ ধারনাটা মেয়েটি পূরণ করতে চেয়েছে ওর শরীর দিয়ে। সে ভদ্রলোকে ভোগনে চু যাচ্ছে। শুরু সাফল্য করে। ওর শরীরের দিয়ে আর পয়সার জন্য দিয়ে একাকার হয়ে যায়। একসময়ে ধরা পড়ে। পয়সার গুপ্তধান বোঝাতে মেয়েটি অবলীলাক্রমে খুলে ফেলে ওর শরীরের যাবতীয় আক্র। পণ্যনির্ভর বেচাকেনার সঙ্গে নারীর বেচাকেনা একাকার হয়ে যায়। ফেলুলয়েড ঘুঁরে যায়। শরীরকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের জন্য দিয়ে মেয়েটি পন্যের গুপ্তধানকে প্রতিফলিত করে। শরীরে অত্যাধিক কাম তৈরির জন্য কৃত্রিম ওষুধ সেবন করে। যেমন করে পণ্য নির্ভর অর্থনীতি [illegible] একদিন শরীরে সংকট নামে। এরই মধ্যে মানবিক চাহিদাগুলো সজাগ হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অসম্ভব ভাল অভিনয়। বিশেষ করে নায়িকার।

পোল্যান্ডের আরেকটি ছবি 'আগাথাস ফিজন্যাপিং', পরিচালক নারিক পিস্তওয়াস্কি। ষোল বছরের কিশোরী আগাথাস। জামরেল এক রাজনৈতিক নেতার কন্যা। হঠাৎই ভালবেসে ফেললো এক ভবঘুরে জিপসি ছেলেকে। পরিবারের পরই সিদ্ধান্ত নিলো ওরা বিয়ে করবে। আগাথাস জিপসিকে বাড়ি নিয়ে এলো। বাড়ির লোকেরা আপত্তি তুললো। আগাথাস নাবালিকা, তাছাড়া স্ট্যাটাস আলাদা। প্রেমিক প্রেমিকা সে বাধা মানলোনা। ওরা পালিয়ে গেলো। ছেলেটির পিতৃ পরিচয় অজানা। ভবঘুরে জীবন, জীবন ভাল করেকটা গান আছে ছবিতে। পোল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত। চললো টানাপোড়েন। পরিচালক ছবিতে পোল্যান্ডের রাজনীতির একটা ছবি এঁকেছেন ব্যাঙ্গভরে। রাষ্ট্রীয় অনুশাসন নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এসব টানাপোড়েনের মধ্যে যুজনে বিয়ে করলো। ছেলেটি নিজের শুদ্ধতার রক্ত দিয়ে বন্ধন দৃঢ় করতে উদ্যত হলো। তখনই আগাথাসের স্বপ্নের গণ্ডিতে সে গ্রহণ লাগলো। শুরু থেকে কয়েকটি চালে গল্প বলতে বলতে পরিচালক শেষ দৃশ্যে ট্রাজিডি এনেছেন।

সিনে সেন্ট্রালের পরিচালনায় ঔবেলকরে এই পর্বের আরেকটি ছবি ক্রোয়েশিয়ার 'হাউ টি ওয়ার স্টার্টেড ইন মাইল্যান্ড'। পরিচালক জেলেকো ব্রিচেন। সাবেক যুগোস্লাভিয়ার সংকট এই ছবির মূল বিষয়বস্তু। কেমন করে জাতি সমস্যার জর্জরিত মানুষ অস্তিত্বের সংকটে আক্রান্ত হলো ইতিহাস কথনের ধরা দিয়ে তা বলা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই ইতিহাস কথন কতটা বিশ্বাসযোগ্য, ছবিতে একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সেনাবাহিনী তার্কবলাপ। কেন কাল ব্যক্তি ছবিটিতে একাকার হয়েছে। সেনাবাহিনীর যান্ত্রিকতা, নেতিবাচকতাকে ফেলুলয়েড ধরা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, চাওয়া পাওয়া, প্রেম বিষয় তেমনভাবে সিনেমাটিক আবেদন নিয়ে ছবিতে আসেনি। কাকতালে ফটোগ্রাফিক সম্পাদনা আরেকটু খাঁটোসাটো কাম্য ছিল।

প ত্র প ত্রি কা

- বর্হির্বাঙ্গলার বাঙালীদের মুখপত্র 'সঙ্কিতা' (নভেম্বর) সংখ্যার প্রাপ্তি স্বীকার করছে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বর্হির্বাঙ্গলার বাঙালী সমাজ যে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধরে রাখতে ও প্রসার ঘটাতে তৎপর তা এই পত্রিকার মধ্যে দিয়ে জানা যায়। মূলতঃ পাটনা ও বিহারের বিভিন্ন শাখার কার্য বিবরণী ছাড়াও ভারতের অন্যান্য দু' একটি প্রদেশের কথাও জানা গেল। আমরা এই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

- অখিল ভারত বঙ্গ সংস্কৃতির একুশ বছর পূর্তি স্মারক সংখ্যা 'ক্রান্তিক' দপ্তরে এসেছে। সংখ্যাটি সংস্থার কার্য বিবরণী হলেও কিছু কিছু লেখা আছে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সিতেশ রায়ের 'পথের কাহিনী' ভিন্ন ধারার লেখা। পড়তে বাধা লাগে তবে সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলে পথের নামকরণ বিষয়ে পুরানো তত্ত্ব বেশ জানা যায়। অন্য একটি লেখা লালন ফকিরকে নিয়ে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিদ্বেষের যুগে লালন ফকিরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের গান সত্যিই মনমুগ্ধ জোয়ার আনে।

- দহন চেতনা। স—ঝুলীপদ ঘোষ, ৩৪/১/১, কালী ধাপাজী লেন, হাওড়া-৭১১১০১। ২য় বর্ষ। দাম-১০। মোট ৭টি প্রবন্ধের মধ্যে "আমেরিকান নিগ্রো অথবা কৃষ্ণ কবিতা" প্রবন্ধটি উল্লেখ করার মতো, অন্যগুলি আরও বিস্তৃত করলে ভাল হতো। "মহাযষ্ঠীর লুচী" রম্যরচনাটি যেমন উপেক্ষা করাই ভাল অপরদিকে ছড়া "হেমিত মঙ্গল" পড়তেই হবে। একমাত্র গল্প "যাত্রী" এবং কবিতাগুচ্ছের কবিতাগুলি সুনির্বাচিত সন্দেহ নাই।
- ছড়াকা। স—সতীন বিশ্বাস। ১৭/১৭, কালীরাম দাস রোড, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪। ত্রৈমাসিক। ২য় বর্ষ। দাম-২। ২১টি ছড়াকা নিয়ে ছোট্ট ফোল্ডার পত্র। ছড়াগুলি উপভোগ্য।
- চিত্রাঙ্গ। স—শেখ নসরুৎ আলি। কল্লি মহলা, পাণ্ডুয়া, হুগলী, ত্রৈমাসিক। ৩য় বর্ষ। দাম-১০, ৫টি প্রবন্ধ, ১টি রম্যরচনা, ৭টি গল্প, ১৮টি কবিতা, ১টি নকশা, ২টি ভ্রমণ ও ১টি খেলা নিয়ে রচনা। প্রতিটি বিভাগের রচনাই সুনির্বাচিত। কলকাকে ছাপা ও আঙ্গসৌষ্ঠব দৃষ্টি কাড়ে। বিশেষ করে প্রবন্ধের অংশটি উল্লেখযোগ্য।
- নীল সুষমা। স—প্রশান্ত ঘোষ। ১৮বি/৫, রাজা রামমোহন রায় সরণি, শ্রীরামপুর-৭১২২০৩। ত্রৈমাসিক। রচনাগুলির মধ্যে বাসনা নির্মাণ ও অঘটন যথাক্রমে রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুতে ভাবর। সবগুলি না হলেও বেশ কিছু কবিতা মনকে নাড়া দেয়।
- শাশ্বিক। স—ডাঃ শ্রাবন্তী বিশ্বাস। ৫১/২৯, নেতাজী সুভাষ রোড, বিষড়া, হুগলী-৭১২২৫৮। ত্রৈমাসিক। দাম-১২। ঝকঝকে, তকতকে ছাপা—প্রচ্ছদ ও যথাযথ। অল্প পরিসরে পত্রিকাটিকে আকর্ষনীয় ও উন্নত করার জন্য সম্পাদকদ্বয়ের প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষনীয়। রচনার মধ্যে নতুন খেলা—গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
- অভিনয়। স—অমল রায়। ১বি, প্রতাপ রুদ্র লেন, কলি-৫৭। ত্রৈমাসিক। ১৫বর্ষ। দাম-১৫, নানান রীতির ১১টি নাটক ছাড়াও আধুনিক বাংলা নাটকে চরিত্রচিত্রণ শীর্ষক প্রবন্ধটি নাট্যমোদীদের তৃপ্ত করবে।
- সপ্রতিভ। স—শিবশক্তি চক্রবর্তী। ১৬, উত্তরপল্লী স্ট্রিট, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩, বর্দ্ধমান। ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা। ১০ম বর্ষ। দাম-৫। বিভিন্ন স্বাদের ৪৪টি কবিতা নিয়ে "একাত্তাই কবিতাও কবিদের পত্রিকা" হয়ে উঠেছে। ছাপা ও প্রচ্ছদ যথাযথ।
- প্রেক্ষণ। স-সুদীপা বসু। স্কুল রোড, কান্দি, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৩৭। ত্রৈমাসিক। ৫ম বর্ষ। দাম-১৫। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছড়া—নানান স্বাদের লেখা। প্রচ্ছদ থেকে পত্রিকাটির সর্বাঙ্গে সমাজ সচেতনার ছাপ স্পষ্ট।
- ভোরের তারা। স—বিশ্বনাথ হালদার। ছোট দেউড়ীপাড়া, কালনা, বর্দ্ধমান-৭১৩৪০৯। ত্রৈমাসিক ছিন্নোর পত্রিকা। ১৬শ বর্ষ। দাম-৩। স্বল্প পরিসরে ছোটদের জন্য নানান সম্ভার।
- কালের যাত্রার ধ্বনি। স—সতী চট্টোপাধ্যায়। বলরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯। ২২শ বর্ষ। হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা। বিষয় ও আঙ্গিকে অভিনব ও বৈচিত্রপূর্ণ।'
- রতন। স—মানিকলাল দাস। টেপনপাড়া, বাসবুদ্রা-৭৪১১২১, নদীয়া। ত্রৈমাসিক। ১৩শ বর্ষ। দাম-৫। ১বর্ষার পত্রিকার ১টি প্রবন্ধ, ২টি গল্প ও ৩টিকর কবিতা, প্রচ্ছদে নজরুলের উক্তি সব মিলিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ার মত।
- শ্রীরামপুর সমাচার। স—সমন কুমার গাঙ্গুলী। ৯ দে বাগান, শ্রীরামপুর, হুগলী। 'সংবাদ পাক্ষিক'। ৩১ বর্ষ। দাম-২৫। গল্পে গদ্যে বেশ মোটাসোটা। প্রবন্ধ, নিবন্ধ, রম্যরচনা, কবিতা, গল্প অনেকগুলিই আছে। বিষয় বস্তুতে রচনা চয়নে সম্পাদকের মুন্সিয়ানা আছে। দুটি উপন্যাসও আছে তবে ওগুলিকে উপন্যাস বলতে অসুবিধা-মাত্র পৃষ্ঠা চারেক করে।
- অন্বেষা সাহিত্য। স—অশোক মজুমদার। সি ১১, ডি এম সি ট্রাক কোয়ার্টার্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, বর্দ্ধমান। ৪র্থ বর্ষ। দাম-১০। বেশ গুছিয়ে করা সংখ্যাটিতে কবিতা। এখানে একগুচ্ছ কবিতা এখানেও এই সময়ের গল্পে একগুচ্ছ গল্প ছাড়াও একটিমাত্র প্রবন্ধ আছে। সম্পাদকের রুচিবোধের মুন্সিয়ানার প্রশংসা প্রাপ্য।
- আন্তারবী। স—ড. শিশির কুমার মাইতি। ২৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, হাওড়া-৭১১১০৪। ত্রৈমাসিক। ৩২বর্ষ। দাম-৩০। গল্পে গদ্যের সাথে নানান স্বাদের রচনায় সমৃদ্ধ। প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়। ছাপাও যথাযথ।
- রূপসী ধরিত্রী। স—অজিত মিত্র। পাঁটপুর, হুগলী। ত্রৈমাসিক। ৩৬ বর্ষ। দাম- ১০। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতাগুচ্ছের প্রতিটি রচনাই সামাজিক চেতনাসমৃদ্ধ। ছাপা যথাযথ।
- বিচার। স—শিশির কর। ৪৬ কালী ব্যানার্জী লেন, হাওড়া-৭১১১০১। সংবেদ সাপ্তাহিক। দাম-১৮। স্মৃতিকথা, নিবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণ, কিচার, স্বাস্থ, খেলা, কবিতা ও ছড়া এবং ছোটদের ইত্যাদি শিরোনামায় প্রায় শতখানেক লেখার সমাবেশ। মলাট বিভ্রান্তিকর।
- শ্রীঘৃরিকা। স—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। ২০৫, শরৎ চাটার্জী রোড, হাওড়া-৭১১১০২। দাম-৫। ১৪ বর্ষ। ছোট্ট পরিসরে অনেক রচনা। সম্পাদকের রুচি ও আন্তরিক প্রয়াস লক্ষনীয়।
- মণিমুক্তা। স—নীলমণি মুখোপাধ্যায়। ২০, দেবেন্দ্র গাঙ্গুলী রোড, হাওড়া-৭১১১০৩। ১১ বর্ষ। দাম-৩। বাহুল্য বর্জিত আয়োজন—কিন্তু ছোটদের জন্য আন্তরিক প্রয়াস রচনা চয়নে। গল্প, ছড়া, নিবন্ধের দু'চারটি তো সত্যিই অনন্য।
- কাঁচামিঠা। স—মানসী কুরি। উমরপাড়া, কাঞ্চননগর। বর্দ্ধমান-৭১৩১০২। ৫ম বর্ষ। দাম- ৩। ছোটদের মাসিক পত্র। দাম তত্ত্ব

আয়োজন অসামান্য। খুদে পাঠকদের ভালো লাগার উপাদান পত্রিকা জুড়ে। প্রচ্ছদটির প্রতি আরও একটু মনোযোগ দাবী করে।

- ছোটদের সাহিত্য। স—সনৎ কুমার দাস। ৫০/১/১, বেলিলিয়াস লেন, হাওড়া-৭১১১০১। ৬ষ্ঠ বর্ষ। ত্রৈমাসিক। দাম-৫। স্বল্প পরিসরে বেশ কিছু নজরকাড়া লেখা মন কাড়বেই। বিশেষ করে ছড়া/কবিতার অংশটি।
- নবকল্লোল। স—গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত। ৫১/১, শিবপুর রোড, হাওড়া-৭১১১০২। ৩য় বর্ষ। দাম-১২। সাহিত্যপত্র। কবিতাগুলোর মধ্যে "বাঁকাজল" ও প্রবন্ধ "গজল কবিতার ইতিহাস" উল্লেখযোগ্য, তবে "উল্লাসদির ঘাট" গল্পটি কৃত্তিবাস পত্রিকার পাতায় বড়ই বেমানান। প্রচ্ছদটির দিকে একটু নজর দিলে ভাল হতো।
- স্পন্দন। স—নারায়ণ দত্ত। বিদ্যাসাগর, পোঃ-ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি-৭৩৫২১১। ২য় বর্ষ। চতুর্মাসিক। দাম-১০। 'সতর্কতার দৃষ্টিচোখ রেখে' যদি সব কবিতা ছাপা হোত তবে 'সমরের উত্তাল ঢেরস, কবিতায়" আরো অর্থবহ হোত। এছাড়া নাটিচর্চা সম্পর্কিত রচনাগুলি পত্রিকার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।
- স্টিমেন্ট। স—শ্রীচরণ সরকার মণ্ডল। ৩৪ জাতীয় সড়ক, কালিদাচক, মালদহ-৭৩২২০১। ৮ম বর্ষ। দাম-১০। ত্রৈমাসিক। সম্পাদিকীয় মনকে ছুঁয়ে যায়। কবিতার রকমফেরের গল্পের রকমফেরের-এর পাশাপাশি করেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে।
- মন্ত্রার। স—কেশবলাল ভট্টাচার্য। ডোমজুড়, হাওড়া। ১৭ বর্ষ। দাম-৩। স্বল্প পরিসরে যে লেখা সম্পাদক উপহার দিয়েছেন-তা যথেষ্ট। তবে রচনা চয়নে আরো একটু যত্নবান হলে ভাল হতো।
- হুগলী সংবাদ। স—সন্ধ্যা ঘোষ। ষ্টেশনপল্লী, ডানকুনি, হুগলী। সংবাদ পাক্ষিক। ৩য় বর্ষ। দাম-২। সংবাদের পাশাপাশি কিছু কবিতা ও নিবন্ধ নিয়ে সাজানো সংখ্যাটি।
- সাহিত্য বাণী। স—আভাস মজুমদার। ২৬/১, কৈপুকুর লেন, শিবপুর, হাওড়া-২। ২৫ বর্ষ। দাম-৩০। শারদ সংখ্যাটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে নিবেদিত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও কবিতার সম্ভার। অন্যান্য রচনাও আছে।
- সমন্বয়। স—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দময়ী, ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সরণী, কেয়াতল, হুগলী-৭১২৩০৫। দাম-২০। ছিমছাম ছাপা, বাহুল্য বর্জিত অঙ্গসজ্জা সর্বত্রই মনকে নাড়া দেয়। একগুচ্ছ সুনির্বাচিত কবিতার পাশাপাশি করেকটি গল্প ও প্রবন্ধও ভাল লাগে।
- ছোটদের দাবি। স—অরুণরঞ্জন চক্রবর্তী। হাটপুকুর, ডি আই পি রাজারামতলা, হাওড়া-৭১১১০২১। ৪র্থ বর্ষ। ছোটদের বান্মাসিক পত্রিকা। পত্রিকার প্রথমাংশে ঝকঝকে ছাপার সাথে পরবর্তী অংশের অসঙ্গতি চোখকে পীড়া দেয়। তবে রচনা বৈচিত্র্যে মনটা ভরে ওঠে।
- প্রেরেনটা। স—গৌতম কুমার দে। ২১, ধর্মদাস কুণ্ডু লেন, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২। ৬ষ্ঠ বর্ষ। ত্রৈমাসিক। দাম-১৫। এসংখ্যার বিশেষ সংযোজন ১০ টি সুনির্বাচিত ও অলঙ্কৃত ছোট গল্পের ডালি।
- রুদ্রাক্ষ। স—শিবাজী পণ্ডিত। ১৯, রামলাল ব্যানার্জী রোড, বরানগর, কলি-৩৬। দাম-১০। বিভিন্ন ধরনের রচনা, অল্প সৌষ্ঠব। সম্পাদকের সবল পরিচর্যা বিশেষ উল্লেখ্য।
- আসর সংকেত। স—সোমেশ ভুঁইয়া। ১১/২/১বি, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলি-৩। সব সেরেন্ডির আসরের ত্রৈমাসিক খবরাখবর। ১ম বর্ষ।
- প্রতিভা প্রজন্ম। স—ইঞ্জিনিং অধিকারী। বারাতলা বাহিরকুঞ্জ, বিরলাপুর, পঃ ২৪ পরগণা-৭৪৩৩১৮। ত্রৈমাসিক। দাম-৫। ৭ম বর্ষ। ৫টি গল্প, ১৮টি কবিতা ও ১টি প্রবন্ধে সমসাময়িক প্রজন্মের প্রতিভাকে স্থান দিয়েছেন সম্পাদক।
- মুকুল। স—দীপালি চৌধুরী। মালগ্রাম, শিববাড়ি রোড, শিলচর-২ কাছাড়, আসাম। ছোটদের ভাল লাগার মতো ছড়া-কবিতা-গল্প দিয়ে সাজিয়েছেন সম্পাদিকা—কিন্তু বড্ড ভুলো মন—ভাই ঠিকানা, বর্ষ, দাম ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ গেছে।
- নতুন আলো। স—সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। কিশোরদের সংকলনে অনেক গল্প, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা লিখেছেন নবীনদের সাথে মেলবিদ্ধ প্রবীণ সুধিজন। ছাপা ঝকঝকে, তকতকে, তবে বর্ষ, দাম, ঠিকানা, ইত্যাদি বাদ কেন, বুঝলাম না।
- আহরণ সমাচার। স—দেবকিশোর চক্রবর্তী। ভদ্রেশ্বর, এ্যামাস, হুগলী-৭১২২২১। সংবাদ পাক্ষিক। দাম-১৫। প্রবন্ধ, রচনা চয়নে, বাহুল্য সৌষ্ঠব, অফসেটে ছাপা ইত্যাদিতে সম্পাদকের সবল নজরদারি উল্লেখযোগ্য। ১০টি গল্প, ১টি প্রবন্ধ, ১টি রম্যরচনা, ২টি দীর্ঘ কবিতা আর একগুচ্ছ কবিতার মধ্যে ভালমন্দ বাছা অত্যাসঙ্গিক।
- সময়। স—অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়। ২৩৮এ, ক্ষুদিরাম বসু সরণি, রেল পার্ক, শিবড়া, হুগলী-৭১২২০৫। চতুর্মাসিক। ১ম বর্ষ। ১০ টাকা। গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বিজ্ঞানের কল্পনা, কবিতা, ছড়া, ম্যাজিক, কার্টুন অনেক কিছু আছে সাম্প্রতিক সময়কে মনে রেখে ছাপা, অঙ্গসজ্জা যথাযথ।
- খেয়া। স—সুরজিৎ মালাকার, স্বপন নগর। এন টি ৩/২৪২ আর্যাপুর এস্টেট, কানপুর, উত্তরপ্রদেশ-২০৮০০৯। ২৪ বর্ষ। সাহিত্য ত্রৈমাসিক। দ্বিনছাম ছোট্ট পত্রিকা। প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে প্রতিটি রচনা নির্বাচনে রুচি ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ধরা পড়ে।
- মুনিয়া। স—সুকেশ মজুমদার। সোনারপুর, রাধাগোবিন্দপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ২৪ বর্ষ। দাম-৫। ছোটরাও একদিন বড় হবে নিরোনামের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পত্রিকার প্রচ্ছদ ও রাজার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়। ভেতরের ছাপাও ঝকঝকে।
- মাটি। স—কিংশীল সাঁতরা। আনন্দবিহার, পশ্চিমপাড়া, সবং মেদিনীপুর-৭২১১৪৪। দাম-২০। প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা, নাটক, প্রবীণদের পৃষ্ঠা থেকে ছাড়াও আছে একগুচ্ছ কবিতা/ছড়া। প্রচ্ছদ/ছাপা সাধারণ, কিন্তু রচনা চয়ন অসাধারণ।
- সীমায়ন। স—গোবিন্দ চন্দ্র রায়। ফটকবাঘ, অমলনা, বর্ধমান-৭১৩৪০১। ২৫ বর্ষ। দাম-৫। কালনার সংস্কৃতির ওপর লেখালেখি নিয়ে সংখ্যাটি সাজানো। এ ব্যাপারে উৎসাহীদের ভাল লাগবে।
- অভিযান। স—স্বপন আইচ। বসিরহাট, কোতবিহার-৭৩৪১৩১। ৬ষ্ঠ বর্ষ। দাম- ৫। একটি সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে গল্প-কবিতা ইত্যাদি নির্বাচনে।
- মাধ্যম। স—কাজল সেন। ৬৯, মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া-৭১১১০১। ১৭ বর্ষ। দাম-৫। সাহিত্য পাক্ষিক। বিভিন্ন ধরনের রচনার সন্নিবেশ। অফসেটে ছাপা, তবে কোথাও যেন অধ্যবসায়ের চাপ—মতিই বেমানান।
- মালঞ্চ। স—জিষ্ণু গুপ্ত। ২৮/৬, পূর্বপাড়া রোড, ঠাকুরপুকুর, কলি-৬৩। ৪১ বর্ষ। দাম-৫। সাহিত্য পত্র। স্বল্প পরিসরে মানান রচনা। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের ছায়া ছোট "ছোট প্রতীতের [illegible]" পত্রিকার পরিশিষ্ট মনকে নাড়া দেয়।
- ছোটদের কথা। স—[illegible]। ৫, সাহেবতলা রোড, মহাদেবনগর। বর্ধমান-৭১৩১০২। সচিত্র পাক্ষিক পত্র। ২৬ বর্ষ। ৪ টাকা। নতুন আঙ্গিক, স্বল্প পরিসর, নতুন প্রযুক্তিতে ছাপা, সামগ্রিক কিছু লেখা—এসব নিয়েই অসামান্য।
- অভিনব অগ্রণী। স—দিলীপ কুমার রামকিশোর ও চরণদের নিজস্ব মাসিক সংবাদ পত্রিকা। ৪৬ আই, বড় বাগান লেন, শ্রীরামপুর। হুগলী-৭১২২০৩। দরভাষ-৬২২-২০৪৭।

With

Best

Complements from

BANERJEE LABOUR CONTRACTOR

Rifle and metel & Steel Factory
Ichapore Nawabganj 24 Parganas (N)

বর্হিবাঙলার বাঙালীদের মুখপত্র

সংহিতা

বিহার বাঙালী সমিতি

☎ 245 4573

DUTTA & Co.

FISHING TOOLS ORDER SUPPLIER

39 B, Dr. Suresh Sarkar Road
Calcutta-14

ক্রান্তিক

ক্রান্তিক

মাসিক সাহিত্য সঙ্কলন

শারদীয়া ২৬ বর্ষ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৮

সূচীপত্র

কবিতা

ভূদেবদেব □ রক্তবিহঙ্গী সখা □ ৯

প্রবন্ধ

অরুণাভ সিংহ □ সৈয়দ মুস্তাফা □ ১৩

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় □ শঙ্খ ঘোষ □ ১২

অন্নদাশঙ্কর রায় □ ড. শঙ্খকুমার নাথ □ ১৭

একাত্মতার তত্ত্ব ও তথ্য □ অনন্যা চক্রবর্তী □ ২১

বিশ্বের ঐশ্বর্যে ও দারিদ্র্য □ অমলেন্দু বসু □ ২৪

নব্যবস্তুবাদ বিষয়ক □ ড. ঈ. এম □ ২৬

বাংলা গীতের ভূমিকা □ নীরেন্দ্র চক্রবর্তী □ ৩৩

সুধীন্দ্র দত্ত □ বিমল মাজি □ ২০৪

কবিতা : ২১-২৯

সম্পূর্ণ উপন্যাস

গুরুদিন □ অশোক ভট্টাচার্য □ ৪৭

অন্ধকারে বসে □ অমর মিত্র □ ৮৩

পরীর ডানায় □ অমল চট্টোপাধ্যায় □ ১০৪

নীলাচলের অন্তিমলগ্ন □ বরেন গঙ্গোপাধ্যায় □ ১২৫

নতুন মানুষ □ গৌতম রায় □ ১৭২

গল্প

উর্বশী □ অমল বসুচৌধুরী □ ৩১

একদা এক দেশে □ অনুবাদ : সমুদ্র সেন □ ১০২

নওসর ও এক বৃত্তান্ত □ বরীন্দ্রনাথ দাস □ ১২৭

প্রতিবিম্ব □ অতীন্দ্রকুমার বসু □ ১৪৯

প্রতীক্ষাতুরের পটভূমিকে □ লালু ঘোষ □ ১৭৬

কালচাঁদ নন্দর □ তারাপদ সাহা □ ১৭৯

শেষ কথা □ অনুবাদ : সমরেশ বসু □ ১৮২

অন্তরঙ্গ □ অনুবাদ : তারাপদ বসু □ ১৮৩

রোদ্দুর □ অনুবাদ : মিত্রা গুপ্তা □ ১৮৭

মনের ভেতর মনের মানুষ □ শুভেন্দু ভট্টাচার্য □ ১৯৭

পাপের মানুষ □ শৈবাল চক্রবর্তী □ ১৯১

ওষুধ □ মোহাম্মদ বরকত □ ১৯৩

পাঁচালি □ বিমলেন্দু চক্রবর্তী □ ১৯৬

মনোবাঞ্ছা □ মোহন সরকার □ ১৯৯

তুমি আসবে না □ নির্মলেন্দু গৌতম □ ২০২

প্রচ্ছদ : অর্ঘ সরকার ● অলঙ্করণ : শুভ্র মাজাতপু, সলীল দাস ও পার্থ মৈত্র ● মূল্য : ৩০ টাকা

ক্রান্তিক চলে আসে পরিবেশনা-র-এর পক্ষে বাসন্তিকুমার দত্ত সম্পাদিত ও মুদ্রিত ও উদ্যোগ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ফ্ল্যাট ৩১, ব্লক-৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত।

Krantik is published from Krantik group of publications for an annual subscription Rs. 150 in registered post and by hand delivery Rs. 100 Krantik Prakashani Flat-31, Block-5, Bankim Chatterjee St., Calcutta-700 073 RN-32755/78 Ph. 551-4007

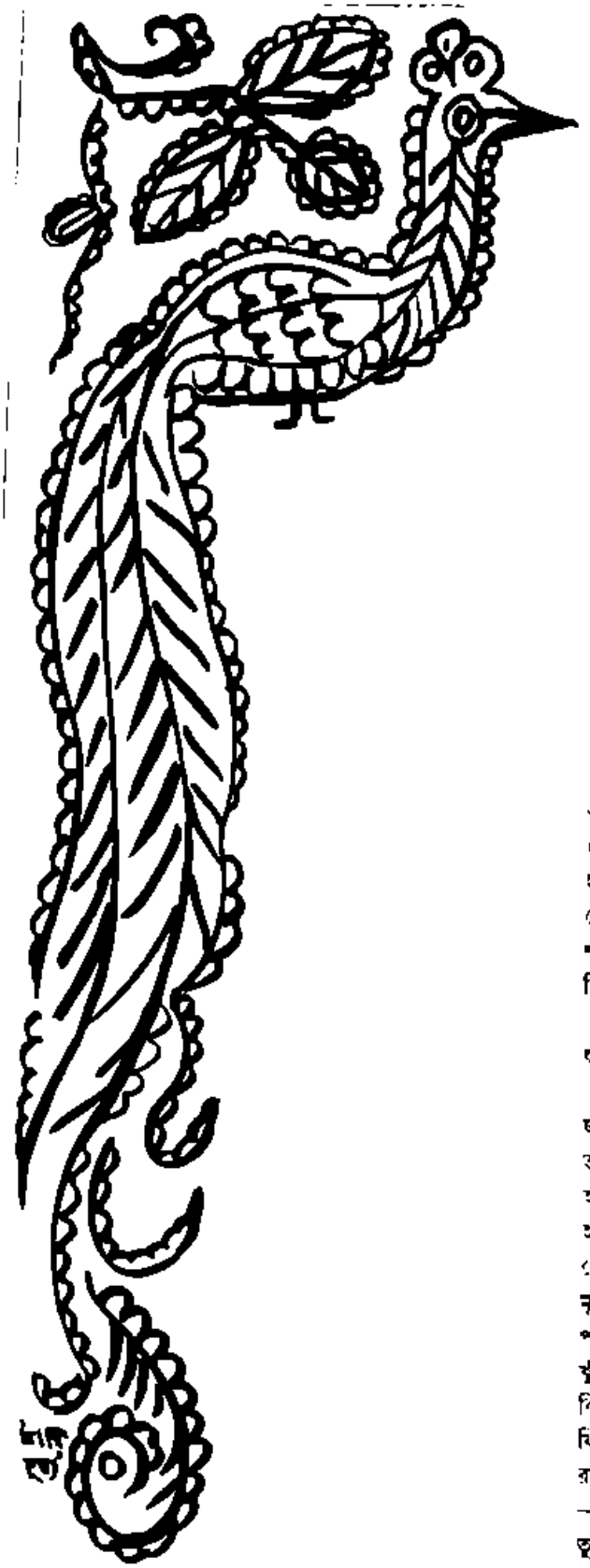

ভূমিকা

এখনো চাইছে কবিতা পুরোনো বন্ধুরা।
কে জানে ঘড়ির কাঁটাতে
হা হা করে ওঠে কিনা ব্যঙ্গের হাসি, অথবা সে
কোন এক আঁধারেরই তিমিল মন্ত্রণা
শতাব্দীর শেষে এসে তবে
জিতে নেবে যৌবরাজ্য, অকাতরে, সময়ের জুয়া!

ক্লান্ত মালা হাতে নিয়ে ফিরে যাব পথিক পৃথিবী

জানিনা--জানিনা·· জানিনা
তবু আর পর বলি, তুমি আনো উজানের মায়া
মনা নামে সেই এক লাবণ্যের নিবিড় জোছনা।
অলেখা সেতারে তুমি অলৌকিক জ্বালা—
পেয়েছে মৃত্যুর হেমগৃহবিভা, তাই বলে
মৃত্যু কি এতই সারধি?
পথে তার চূর্ণ করে ফেলে যাবে
খুঁজে খুঁজে খুঁজে ফেরা সেই এক
বিবস শুশ্রূষা।
ফিরে আসে আবার কবিতা :
রাতের বিবরে স্বপ্ন, তবু, বুঝে নেয় স্বার্থের ভূমিকা
—তুমি যে আমার তৃষ্ণা, হে মালিনী,
তুমি আমার বাঁচা।

শতরূপ চাকী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

পর্ষদের সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক

● ভারতবর্ষের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	—ইন্দ্রেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	—৬০.০০
● উদ্ভিদবিদ্যার পরিভাষা	—উদ্ভিদবিদ্যা পরিভাষা উপসমিতি	—১৪০.০০
● উচ্চতর গতিবিদ্যা	—অমল কুমার রায়চৌধুরী	—১১০.০০
● তড়ীয় পদার্থবিদ্যার ভূমিকা (১ম খণ্ড)	—শ্যামল সেনগুপ্ত	—১০০০০
	অশোক ঘোষ	
	দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	
● ভারতের অস্ত্রশস্ত্র : প্রাচীন থেকে আধুনিক	—প্রিয়দর্শন সেনশর্মা	
● মৌলিক পদার্থ	—কানাইলাল মুখোপাধ্যায়	
● প্রকৃতিতে প্রবৃত্তি	—দ্বারিকানাথ ঘোষ	
● পেট্রোলিয়াম	—দেবব্রত চন্দ্র	
● ভূগোল পরিভাষা	—ভূগোল পরিভাষা উপসমিতি	
● ভূবৈজ্ঞানিক পরিভাষা	—দীপঙ্কর লাহিড়ী	
● ইঞ্জিনিয়ারিং ভূবিদ্যা	—প্রসাদ চন্দ্র গোস্বামী	
● খনিজ দেহের আকৃতি	—অনিল কুমার দত্ত	
	নারায়ণ দাস মিত্র	
● রোগী পরীক্ষা পদ্ধতি	—পূর্ণেন্দু কুমার চট্টোপাধ্যায়	
● ভৌত রসায়ন (১ম খণ্ড)	—নিত্যানন্দ কুণ্ডু	
ঐ (২য় খণ্ড)	— ঐ	
● জৈব রসায়নে কর্মালী	—ঊষা সরকার	
● জৈব রসায়ন (১ম খণ্ড)	—কানাইলাল মুখোপাধ্যায়	
● ফলমূলক বস্তুবাদ (অখণ্ড)	—মরিস কর্নফোর্থ	
	(অনুবাদ : ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)	
● মেডিক্যাল অভিধান	—অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
	(রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত—১৯৮৪)	
● গণজ্ঞাপন	—পার্থ চট্টোপাধ্যায়	

কার্যালয় : আর্য ম্যানসন (নবম তল), ৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০১৩

বিপণন কেন্দ্র : ১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
(সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের একতলায়)

সগর্বে ফিরে দেখা—
পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট
সরকারের কুড়ি বছর

কৃষি উৎপাদন—
প্রগতির এক নতুন দিশা

কৃষি উৎপাদন-ই রাজ্যকে নিয়ে যায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে। আজ যা পশ্চিমবঙ্গে প্রমাণিত। বামফ্রন্ট সরকারের বিশেষ প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। খাদ্য উৎপাদনে বামফ্রন্ট সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ রাজ্যকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অর্জন করেছে।

বিশেষ সাফল্য ঃ

- ☑ খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সাফল্য
- ☑ ধান উৎপাদনে অগ্রগণ্য
- ☑ সবজীর যে অগ্রগতি
- ☑ শুধু জমি বিতরণ-ই নয়, ভূমি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, উন্নতমানের বীজ এবং সার প্রয়োগে উৎপাদনে সাফল্য
- ☑ একই জমিতে একাধিক শস্য উৎপাদনে বিশেষ সাফল্য
- ☑ সুষমা সার ব্যবহারে অগ্রণী
- ☑ সক্ষম কৃষিজীবীদের সহজসাধ্য বা ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা।

নতুন শতাব্দীর প্রাক্কালে কৃষি উৎপাদনে সফলতার মাধ্যমে রাজ্যকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

D.O. No.-3184 ICA/Advt
dt. 3.9.98

সংগ্রহ করার মত সাম্প্রতিক কালের কিছু উল্লেখযোগ্য বই

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ভূতের বেশে হঠাৎ এসে (গল্প) বোকারাম চোখারাম (গল্প) ডুডুম ডুম (ছড়া)	**আনসার উল হক-এর** ঝু কিক কিক বেলে গাড়ি (ছড়া) আইকন বাইকন (ছড়া) চিরন্তন (কবিতা)
মনোরঞ্জন পুরকাইত-এর আয় ছুটে আয় (ছড়া) ঝাঁড় ছপ ছপ নৌকো (ছড়া) এ নদী শঙ্খচিলের (কবিতা)	**হাসান আহসান-এর** ছড়ার গাড়ি (ছড়া) ঝিকিব ঝিকির (ছড়া) রহস্যময় বন্দি (গল্প)
সুকুমার মজুমদার-এর ইচ্ছে নদীর গান (ছড়া) স্বপ্নের কুলি (গল্প) টাপুর এবং টুপুর (গল্প)	**অরুনা ভট্টাচার্য-র** এসো লিখু ছড়া শিখি (ছড়া) ছোট মামার ট্রাজেডি (গল্প) ছদ্মবেশ রক্তের বাঁশি (গল্প)
প্রণবকুমার পাল-এর পঞ্চ পুরুষ ও পাঞ্চালী (বাক্যগ্রন্থ) গোপাল দরজা ছুঁয়ে (কবিতা) ডাম্পি (ছড়া)	**বিশ্বনাথ রাহা-র** নিনু খুড়োর চাক (ছড়া) টুনটুনির পাঠশালা (ছবি ও ছড়া)
চন্দ্রচূড় ঘোষ-এর জিরাফ বুড়ো (গল্প) যোকারাম চোখারাম (গল্প)	**মানসী বালা-র** উড়লো টিয়ে জানলা দিয়ে (ছড়া)

● প্রাপ্তিস্থান ●

ক্রান্তিক, স্টল নং ৩১, ব্লক-৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২

With

Best

Compliments of

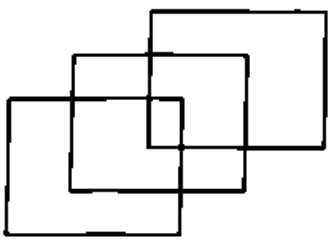

Modi Xerox

With

Best

Compliments of

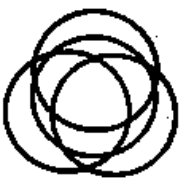

Ful Chand

With

Best

Compliments of

M. L. Roy

ভারতবর্ষ

রাসবিহারী দত্ত

এই কি আমার দেশ, ভারতবর্ষ,
আজন্ম পরিচিত বাংলা, আশৈশব সাথী?
কূপ কোথা কোথা তবে, কোথা আজ তোরের মোরগ
ধানফুল গন্ধ কোথা, ফসলী মাঠের মাঝে
সোনালি সূর্যকে ঘিরে কিষানি আবেগ?
নিকোনো উঠোনে কোথা, রাশি রাশি আঁটি আঁটি ধান
নবান্নের গন্ধ কোথা, ঘুঘু ডাকা দুপুর,
অজস্র টেকির শব্দে পড়ন্ত বিকেলই বা কোথা
সন্ধ্যা শাঁখ, পরিচিত কিঙ্কিণি নূপুর?

ওরা সব কোথা গেল
অভিমানে ঝরেছে কি চুপে
নাকি কেউ লুঠ করে নিল মগ ঘুমে ছিলাম যখন।

মগ ঘুমে থেকে থেকে কতদিন দেখিনি তোমায়
চারিদিকে একি অন্ধকার!
ঝুলেটে বিবেকেরা আজ উদ্ভাস মুখর
ছড়ানো সন্ত্রাস চারিদিকে
বিধ্বস্ত ধূসরাশ খোঁজে গৃহকোণ
ভারি বুট ভালোবাসা কেড়ে নেয়
পথে পথে পড়ে থাকে লাশ
ধর্ষণদাব বাহিনীর ধাপট স্পর্শভরে
পিষ্ট করে শ্যামল সবুজ দ্বীপভূমির ইজ্জত বিকোয়।

তাইতো গিয়েছে থেমে মোরগের গান
দোলয় না মন আর কখনো খঞ্জন
ধান কাটা শেষ হলে চড়ুইরা মাঠে মাঠে খেড়ায় না নেচে।
নিকোনো উঠোনে আজ নেইকো টেকির শব্দ
সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে বাজে নাকো শাঁখ
প্রেমীরা খুঁজে ফেরে প্রিয়তম মুখ
সবাই ভয়ার্ত ভিড় মেঠোপথে মানুষের ভাকে।
২

আশ্রয় আমার সাতাশ, তবু
ঘুমের মধ্যে জাগরণে চতুর্থপাঠ, চতুর্থপাঠ, চতুর্থপাঠ...
সারা শৈশব হাঁটু মুড়ে চিবুকে হাত
উবু হয়ে ভাবছে বসে ভাবছে কবে
আগামীকালই রোদ দেখাবে গোধূলি মেঘ
মবুরপুটি জাহাজগুলো পাল তুলবে
বাগান ভরে ফুল ফুটবে ঘ্রাণুঘ্রনা, ঘ্রাণুঘ্রনা, ঘ্রাণুঘ্রনা...

চোখের কোলে জমছে কালি সকাল বিকেল
ছন্নে হয়ে বাগান দেখে কাপড় মেপে বিজাপনে
-দোর থেকে দোর ছুটোছুটি ঘ্রান্ত ফড়লে

শুকনো মুখে হাসি এনে, কান্না চেপে
কিবাছি ভবে ঘাত দুপুরে ভাত হবে না, কাজ হবে না, কাজ হবে না.

চাউনি তরুণ মা জননীর বাত বিয়েছে
তাই বোনেদের বায়নাগুলো পুরুষ স্বামীর
হাবনা হয়ে বাপকে তাড়ায়
জায়গা নেই মুখ লুকোবার
ঘরি গলি পথের ফাঁকে সর্চলাইটে পুলিশ হাঁকে
এং লড়ো ছিন পার পাবে না, পার পাবে না, পার পাবে না...

সাতাশ বছর বয়েস আমার
ঘুমের মধ্যে জাগরণে চতুর্থপাঠ, চতুর্থপাঠ, চতুর্থপাঠ...
সারা শৈশব হাঁটু মুড়ে চিবুকে হাত
উবু হয়ে ভাবছে এখন ভাবছে বসে
নিশানে কেন স্বপ্নগুলো জপবে নাকি
কেড়ে ফেলবে, দেখানো সব পুথিবা৩লোব
খুঁজবে নাকি কবরখানা, কবরখানা, কবরখানা...

ধর্ষণজাবী, এ বড়ো কম সময় নয়
আপনস্তব্ধ টাস নাটাস
জীবনের হাল, কি আর বলবো
পেটে পিঠে তফাৎ খোঁজা ভার
মেনায় বিকিয়ে গেছে ঘটি বাটি
তাস তবু নারিকেল পাতার জীর্ণবাড়ি
—পাহক দিচ্ছে পুলিশ আনাড়ি।

অথচ এমন নয়, মনুষেরা চিরদিন নিঃশেষ্ট থেকেছে
অক্তাপ্রস্তুত উদ্দীপনা দেখায়নি কোনদিন
হেলেসানা হিতুমীর তবে কিসের ইঙ্গিত
শোনায়নি জীবনের গান, আবহ সংগীত?
তবুও তিরিশ বছর পর হেলেসানা,
কেন প্রতিক্রিয়া কবলিত হয়
কি নক্সির দেখাবে এর, জবাব কখনো হয়?

ধর্ষণজাবী এ বড়ো কম কথা নয়
কেনা জনে রক্ত কবরীতেও থাকে কাঁটা
তা বলে কি করবী হাসে না
সোনালি বোদ্দুরে সুমিষ্ট ভাষে না?
খোঁজ নিও এই বিশে শতাব্দীর কাছে
যথারীতি সে খবর মুখে মুখে প্রচারিত আছে।

ধর্ষণজাবী, এ বড়ো কম সময় নয়
এ কথাও ভাবে যদি ধরিত্রির চিন্ময়
এবা শিকার হয় প্রতিপক্ষ শিহিরে
কতটুকু দোষারোপ করা যায় তাদের বিবেক বিচারে।

অর্ধশতাব্দী, এ বড়ো কম সময় নয়
কীর্ণ কাঠামো হলেও
বাড়ির দখলি সত্ত্ব কে আর হাতাতে চায়;
অসহিষ্ণু মানুষ এভাবে নিষ্ক্রিয়ে এলে
এবং থেকে থেকে হুহু উঠলে ঘায়নুখী
পিছটানে সুড়সুড়ি দিবে, যথারীতি
কেউ যদি নিষ্ক্রিয়ের গতিমুখ ভাঙে
স্বতঃই সন্দেহ জাগে—
এখনও লুকিয়ে আছে ডাকে।

তারপর,
তারপর কি হলো বলবে তো—
তারপর সেই যে সেই হাঁটু-কাপড়ে বুড়ো
স্বাধীনতার জন্মি হাঁকু পাঁকু, বাত গরীবে
নিজের মাঝে দু'ভাগ করতি সই দিলে
একঝাটা সবার মুখে ছাই ছড়ালে,
ফেলে দিলে নুড়ো।

তারপর তো দেখতিছ এই লোকের হাল
জমি নাই, ভিবেট নাই, গোয়ালে বিলোনা গাই নাই
শিছনের কাপড় নাই, কুটার অভাবে খাঁ খাঁ আটচাল।

তাও যা যা ছেল
সাতপুরুষের দোহাই পেড়ে
সেই ফুলপরী যে এলো
দেশের মধ্যি চোখা চোখা বাণী দিল
গণতন্ত্রের নাম্নি নিয়ে কথা হাঁটলে,
আশা ছাঁটলে
আসমান জমিন এক করল
কথা রটল বটে
এ নাকি সাক্ষাৎ মা, জগদম্বা,
কলকেতার কোন মাঠে।

তারপরই তো ক্ষেপল মানুষ
জবাব দিল একঝাটা, আড়ি
সভার মধ্যি হই বই রই, ফাটলো বিষের হাঁড়ি
খবর রটল ফুলপরী নয়, মেমীও নয়
গরীব মানুষের রক্ত-চোষা রাক্ষুসী সে বুড়ি।

কলকব্জির নাড়ি ধরল
এবার কি মা'র মুক্তি হল।
ধান্ কলল কেশে
তা, হয় কি কোন দেশে
অবশ্যর যে সেই ছাজির হলো
আর এক ঘুড় ঘুড়ো।

বুঝলে ধানু ভাই—
বদলে নুখোস সাবেক আদল
মানুষ বদল নয়,
ঘুলা দিলেই মুক্তি আসে
শান্তিতে কয়।

ভারতবর্ষ এগুচ্ছে হে এগুচ্ছে।
সিংহাসনে দৃষ্টি রেখে বুঝছই তো
সময়মতো হয়ই এবা হচ্ছে
কোন রোগের কোন চিকিচ্ছে;
যখন যেরূপ হয় প্রয়োজন
যোগিনী কি ভৈরবী
মা ভৈ মাঝল যা ইচ্ছে.....

এর পর তো নিস্নুকে কয়
ভারতবর্ষে হচ্ছেটা কি, কি হচ্ছে?

কৃষি বিপ্লব, সাম্যবাদ পাশাপাশিই
ধরাধরি হাত এগেছে
দেখছো নাকি গেবাই কলের লড়াকু নেতা
মাইঃ মন্ত্রে মজুর—মালিক মেলাচ্ছে।
এরপর ও প্রশ্ন সাজে, ভারতবর্ষ এগোচ্ছে।

তবাই এব জঙ্গলে যারা
লড়েছিল হে এককালে
তাদের কেউ কেউ এখন কেউ যন্ত্রক
জোতদারদের বন্দুকগুলো আগলাচ্ছে...

একটু রোসো, ভারতবর্ষ এগুচ্ছে হে এগুচ্ছে।

হাড় কাঁপানো শীতের রাতে
বিশু রুগ্নির বাড়িতে বৈঠক,
বিষয় : ভরা ফসলী ভাতারমারিব বিল।
উপর থেকে নেতা এসেছে
চলছে চুলচেরা আলোচনা;
পাশে ক্রিকাস বুড়ো বিশু বাগদি
হাত সেঁকছে মালসায়,
মাঝে মাঝে ফুকফুকিয়ে কাশে
আর কথার পিঠে কথা চড়িয়ে
অভিজ্ঞতায়, জ্ঞান দেয়।

জোর আলোচনা। নৌকোর ছাল যখন হাতে

হিসেব কষেই পা ফেলতে হবে।
থানা হো তবুও পাঁচ কষছে
ঘুঁসে উঠলো কেউ
ছিঁকে মোড়লও তাক করেছে বন্দুক
খিস্তি দেগেছে কেউ
নেতা বললেন যুক্তি
জমির লড়াই নয়কো সোজাসুজি
হলেই একটা এদিক ওদিক
গেল গেল রব উঠবে
পড়বে ঘাড়ে দায়—

তবে কি আর
দাওয়ায় বসে
দারুণ কষে হুঁই তোল
ফসল উঠুক ছিঁকে মোড়লের গোলায়।
কথার পিঠে কথা চড়িয়ে
আবার বুড়ো ফুকফুকিয়ে কাশে
বড় বউকে ডেকে বলে, "কই গ বউ,
তামাকওলের ছাই ফুরলো বোধ হয়"।
বিরক্ত মুখ কেউ ঘললে
আঃ কথার পিঠে কথা চড়িয়ে
বড্ড বুড়ো জ্বালায়।

আবার শুরু আলোচনা। নীরবতা ভঙ্গ করে নেতা
কালের ফেরে ভাবতে হবে সকল কিছু
জমির লড়াই নয়কো ছেলেখেলা।
মুখ ঘষে বীতি ভেঙে কেউ বললে
বুঝলি এবার ব্যাপ্পা
এমনি করেই সময় যাবে দোনামোনায়
দাঁও লুটবে ছিঁচকে মোড়ল
ধান তুলবে গোলায়
কাঁধিয়ে উঠলো ভাগচাষীরা
—তাহলে কিটা হবে
হেই বাবুসো উপায় বলে যাও,
কথার পিঠে কথা চড়িয়ে
আবার বুড়ো ফুকফুকিয়ে কাশে
ডেকে বলে, উপায় কি আর
জড় জমছে হাড়ে
—ঘুরঘুনটুস্থ উসকে দাও।

৭
বুক বাড়, বুক বাড়
ভেসে পড়ছে মজবুত বিমান
ঘরবাড়ি কি অন্নবাড়ি
দেশ জুড়ে শুরু হল ঘুরন্ত উদ্যান।

তিরিশ সালের তন্ত্র
নড় বড়, জড় নড়
কেরামতি ভেজালটি কারবার
কি জাপার ঘুরু হলো কেবা কোন জন।

ছিসেবে মেলে না যেই
সাদাসেশ ঘুঁই ঘুঁই
চালচিত্র পাল্টে যায়
কাঁপে দুঃশাসন।

বুক বাড়, বুক বাড়
ভেসে যায় ঘরবাড়ি
তিরিশ সালের তন্ত্র
মজবুত বিমান

জীবনের আবাবান গুহাবাস
এইবার মানিব মানুষ চক্ষুষ্মান।

৮
আজ আর ছিঁচে নেই তেমন কাজো কাছে, যেমন ছিলাম
তার হেতু, শুধু সেতু
নিজস্ব প্রতিভার কাছে,
তারল দুঃখেরে অন্তে।

কোনো কাগ কাঁধে নেই আর
উসকো খুসকো চুল
সন্তা চটি ছুতো, কোটরগত চোখ
অথচ নিশ্চিন্ত নির্ভুল।
এখন যেতেসেতে দাওয়ার বসে
মিষ্টি কথা বিনিময় নেই,
মুড়ি-নারিকেল, পানন্যা-তোল,
প্রথম মধ্যাহ্নে কলবি পাকে
এক থালা গরম ভাত, যেমন ফিস্ট.....

ঘোমটা টানা নববধূর বিস্ময় ভরা চোখ
ইনি কনিউনিস্ট.....

কি শুরু গম্ভীর আলোচনা
সহজিয়া কথায় অমৃত
আজ নিছুই নয় জ্ঞানচর্চা নৃত
ম্যানিফেস্টো কি রেড বুক, চে'র ডায়েরি
পকেটের নোট বুক এখন খেরো খাতা

আদর্শের জন্য যারা ধার তন্ত্রে ও তালুকে
কাউকে কাউকে তাদের উল্টোনো ইতিহাসের পাতায়
মোবাইল ফোন বাঁকে লিমুজিন গুলু করে থাকে।
সাধারণ মানুষ দেখলে পরে তাদের
নিরালম্ব মুখমণ্ডে চোখ উল্টে নিজেদের ঢাকে;

ভুলেই বিছুটি বিষ
গাছে, কাঁধে হাত রাখে—

আদর্শের পথে যারা যায়
সে কেন জড়ায় পাঁকে।

কেনই বা জড়াবে না, বলো
সংগঠক কোথায় এত
প্রবল সরকার চালানো চাই
মৌতাতের লোভে তারা ছিল আই চাই
সুযোগের সদ্ব্যবহারে আদর্শের চুমে দিয়ে যাই
আজ তারা দক্ষ কুশীলব।
তাছাড়া যুধিষ্ঠীর সকলেই হয় না
জীববৃত্তি, হিংসে হিংসে সরীসৃপ
জীবনের প্রতিটি বাঁকে চুপিসারে লুকিয়ে থাকে।

আদর্শের পথে যাত্রা যার
কেউ কেউ তাদের মতিভ্রমে
মধ্যপথে পড়ে যুধিপাকে।

পাশাপাশি দুটি যুবক-যুবতী ব্রিগেডের সবুজে বসে।
মাথার উপর নীল আকাশ
পাখির ঝলকা ডাকে
গান বাঁধা বন্ধ রেখে তাকায়

জোড়সপ্তার টগবগ টগবগ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে
হম হম হম হম সবুজের ব্রজধাম।

বিষয় গড়ালো বাদানুবাদে, জনটি তর্ক
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দ্বীপভূমি, মধুপর্ক ভারতের চালচিত্র
ছিড়ির বিড়ির তলানিতে গিয়ে ঠেকল,
বলে চলল অর্কপ্রভ।

–মেঘো, সবে তো পঞ্চাশ....
সুচেতনাকে মাঝপথে থামিয়ে
বাঁকিয়ে উঠল অর্কপ্রভ
–পঞ্চাশ বছর মোটেই কম সময় নয়।
–তুমি কি বলতে চাও উত্তরোত্তর মেটেই এগোয় নি ভারত?
–ভাঙচুর হাজার গুণ বেশি। তিলোত্তমা দ্বীপভূমি এখন মুক্তকেশী

বেড়ে সন্তানের পিতামহ প্রপিতামাতাদের চুতুর্থী, কুলাঠিকুলি
কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে ন্যাপ না রেপ
উদান ব্যাদানে ভুবন ঐতিহ্যদানের
জ্যাকসনি ধাঁচের চন্দ্রিমা খাবে
নাকছাবি, টাঁকছাবি তুলে দিতে ব্যস্ত
হায় দু'শো বছরের পদানত ভারতবর্ষ....

–তোমার কমিউনিস্টরা কি এমন সোনার সেঁউতি
তোড়াতোড় গাঁইতি এখন গোঁজ খায়
নীরেট বুদ্ধির গোলবাজারে।

–বিস্তর বিপর্যয় কাটিয়ে কি উঠছে না ভেবেছো।
–কে অস্বীকার করছে তা, কিন্তু আসল সংগঠন কই?
–তা কি তোমায় জানিয়ে করবে?

–কস্তুরি জন্ম নিলে কাউকে খবর দিতে হয়।

কে বললে শেষ চালার পালা
নতুন করে শুরু
বাঁক বিপাকে পথ করাই
কিংবা তুফান মরু
বুকে নিয়ে করলে শুরু
ফুরায়রে লড়াই অহরহ :
পেরোব ঠিক, পেরিয়ে যাব
ভীমি কালিদহ।

এমন তো নয় তৈরি সড়ক
পায়ে পায়ে পেরিয়ে যাওয়া শুধু
কাঁটা ঝোপের বালাই নেই
শুধু মরু ধূ ধূ :
এমনকি নেই নষ্ট হওয়া
স্বর্ণহরের যৌবনেরই দিন
মায়ের বুকে সান্ত্বনা নেই
স্বামীর পত্নীশোক, পৌর্য অন্তরীপ।

রূপান্তরের পথ কি তবে
সবুজ মরীচি!
শীতাতপে তত্ত্ব তাজা
রম্য ফলগীতি?
রূপান্তরের পথ পিছিল
মৌল রূপান্তর ঃ
রক্তদানের উৎসব সে
লড়াই মরণপর।

মহামণীষীর বিভ্রান্তি!

রবি মাইতি

জীব প্রজাতির সংখ্যা প্রায় অগণ্য। তাদের মধ্যে একমাত্র মানব জাতিকে অর্থযুক্ত ও সার্থক ভাষাভাষী প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এভাবে 'ভাষাভাষী' শব্দটি তার প্রতিনতম দ্যোতক হওয়ার যোগ্য। জীব হিসাবে তাই একমাত্র মানুষই তার সেই অর্থবোধক ভাষা-শক্তির যথোপযুক্ত প্রয়োগের দ্বারা পার্থিব প্রকৃতিপ্রবাহে বা বিশেষত তার একমাত্র জন্মভূমি হিসাবে নিজ প্রজাতি-প্রকৃতির অপূর্ণসরণ যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তার জন্য অবশ্যই সবিকৃত ভাষা প্রয়োজন প্রয়োজন অনিবার্য। কারণ, বিড়াল জল যেমন জীবন জীবন, বিড়াল ভাষাও তেমনি প্রজাতি তথা সমাজ অর্থাৎ মানব বহুসমাজ-বিকাশের প্রাণ স্বরূপ। অনিবার্যভাবে লক্ষণীয় যে, এ-বিশ্ব ও তার বিকাশ একক (Unit) ভিত্তিক। যেমন, একটি প্রজাতির ভিত্তি হল এক-একটি স্বয়ংক্রিয় বা স্বয়ংসম্পূর্ণ একক জীব। কবুতর প্রজাতির একক-ভিত্তি হল এক-একটি স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংসম্পন্ন কবুতর জীব বা প্রাণী। ব্যাপক অর্থে, পার্থিব বিকাশের ক্রমবিকাশমান সাধারণ একত্ববেদীর নাম হল : পরমাণু-অণু-মহাণু (যৌগীন) প্রকৃতকোষদেহ (যৌগোদ্ভিদ বা) যৌনজীব-জীবমিথুন-গণপতি। কিন্তু এগুলির এক-একটি নিজ উৎপত্তি বা সৃষ্টির জন্য কখনো অসম্পূর্ণ, কৃত্রিম বিশ্বের পক্ষের ওপর নির্ভরশীল সত্তা নয়। অন্তত একটিমাত্র অসম্পন্ন বা সুসম্পন্ন একক বিকশিত হয়ে পরবর্তী কোনো সুসম্পন্ন বিকশিত একত্বে উত্তীর্ণ হতে পারে না। 'মানব'-অভিহিত শব্দটির প্রকৃতবিজ্ঞান সম্মত উত্তীর্ণ অর্থ হল তাই মানবপ্রজাতি, কোন ব্যক্তি মানুষ নয়।

বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব-ও জিন-বিজ্ঞানী বি. জি. সিম্পসন জানিয়েছেন, "It is populations, not individuals, that evolve." এখানে Population- অভিধাটি মূলত Gene Population. হিসাবে সূচিত হলেও এর প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্মত সমাজবিজ্ঞানগত অর্থ-তাৎপর্য হল, Human-Population. তাছাড়া মানুষের ক্ষেত্রে উপলব্ধির প্রকৃতিবিজ্ঞানিক অর্থ হয়ে দাঁড়ায়, ব্যক্তির নয়, সমষ্টিরই বিবর্তন [ও বিকাশ-ক্ষমতা] ঘটে থাকে।

কিন্তু ঈশ্বর বা অনিবার্য্য, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, কিংবা ব্যক্তিগত মানুষ তার প্রজাতি প্রকৃতিকে সার্বজনীনভাবে অনুসরণ করতে নাও পারে। যদি তাই হয় তাহলে সে তখন তার জৈবনিক বা প্রজাতি শক্তি হিসাবে ক্ষমা, প্রেম, সাম্যের এবং কাম, সাহিত্য, সংগীত শিল্প-কলাদি আত্মীকরণ-ওসের মত প্রজাতি-প্রাপ্ত বা অর্জিত ঐসব শ্রেষ্ঠ ওপরাজিরও বিচ্যুতি। বিজাতি এবং জাতেনুসের পরিণতি ঘটিয়ে বসতে পারে। নিউটনের মহাকর্ষ-সূত্রের নিয়মে যেন তখন ঐসব ওপাজীও ক্রমবর্ধিত যেন ওপগুলস, বা বহুতপাত, যথা পতিত হতে থাকে। অর্থাৎ, প্রজাতি-প্রকৃতির অনুসরণ যোগ্যতা যথাযোগ্যভাবে সম্ভব হলে উপযুক্ত ভাষাভাষী মানুষের দ্বারা তখন কেবল বৃত্তিবিকাশ-বিজ্ঞানের নয় বিশ্ববিধানের পরিপ্রকৃতি ও তার নির্দেশক পক্ষকেও সপক্ষ এবং স্বাধিত করা সম্ভব হতে পারে। সেই কাজ সার্থক হলে স্বয়ংক্রিয়-মানবপ্রজাতি তখন তার সহজ পূর্ণবিকশিত একক-প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বস্তুসত্তাগত ঈশ্বর-ঘটনার বিকশিত হতে আরম্ভ করবে। ক্রমক্রমে সমগ্র প্রজাতিগত ভাষার একত্বাৎ মিলিত সেই পূর্ণবিকশিত সংঘটিত হলে সেই অবস্থার নাম তখনকার ঈশ্বরসত্তা হিসাবে প্রতীত হতে পারে। সম্ভবত সেটি একদা প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের দ্বারা অভিহিত 'big crunch' এবং তার (আদিত্য-) বৈপরীত্যমূলক ঘটনাটি তাঁদের দ্বারা 'big bang' হিসাবে সেরূপ বিশ্বস্বরূপের সূচনা বা হোমেগা-মুক্ত হতে চলেছে। সে-কারণে এখন তার কোনো মানুষ বা আদিমা-ঈশ্বরের তেমন প্রয়োজন থাকছে না। কিন্তু কেনেরকমের বস্তুসাধিত সম্ভাবে বা সার্থকতামূলক চূড়ান্ত উক্তির আধার গ্রহণ করলেও মনীষী বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন "আদার্কি দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। স্বরূপীর যে তাঁর আর একটি চূড়ান্ত সত্যপ্রকাশ উক্তি হল, "জীবে প্রেম যেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" এই সত্য উক্তির মধ্যে কিন্তু মনীষীর ব্যক্তিমানবতা মূলত 'চালকির' কোনো সন্ধান নাই এবং সে মানবত্বকেও ছেড়িতে যথা হল। কেবল আদিমা-ঈশ্বর-প্রতিমার কৌশল হিসাবে 'জীবে-প্রেম' নয় ; পরন্তু, সেটি হল প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরমার্থ মূলক বস্তুসত্তাগত 'জীবে-প্রেম' দ্বারাই 'অবতারের' ঈশ্বরের 'প্রতিক্রমন' বা Substitution. কারণ, ক্রমাধিক ও অধিনস্থবেলী প্রকৃতির সর্বজনস্তুত নিয়ম লঙ্ঘন করেই সেই ঈশ্বর মানবপ্রজাতির বস্তুসার মূলিবাতা অর্থাৎ ক্রমশ-প্রসিত ও সচেতনা-চেতনাহিত পার্থিবপ্রকৃতির মূলত ঈশ্বর না হয়ে হয়েছে কেবল ব্যক্তি-ভক্তের-ঈশ্বর অর্থাৎ যে-ঈশ্ব পক্ষপাতদুষ্ট। এবং এই মহামনীষীর অন্য একটি অন্যত শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিবিজ্ঞান মূলক উক্তি হল : "Uniformi is the rigorous law of nature." প্রকৃতি এই 'সমকপতা বা নিয়মশক্ততা' কিংবা অনঙ (আমা এটি হল প্রকৃতির ওপর অপূর্ণ-মানব-আরোপি তথাকথিত ঈশ্বরের ওপ) -সরলরিখার সৃষ্টির মা সর্বপ্রকার তথাকথিত ঈশ্বর বা অদিমা-ঈশ্বর সম্পর্ক ভাবনা জনিত সকল সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব ও জ্ঞান হয়ে নি যায়। সাংবাদিক থেকে তাঁর উক্তিও ছিল, 'God unnecessary, nature explains all.'

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে, বড় বড় বৈপ্লবা প্রকৃতিবৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কিন্তু শত শত বছর ধ একটু একটু করে ঘটতে থাকে. কারণ, কোন মনী কোন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কারের ভাবনাচিন্তাভাবে, সর্বদিকতে সর্বদিকে অগ্রসর কো ব্যক্তি বা মনীষীর. এমন-কি, প্রজাতি প্রতিভূ-মহামনীষ সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব হয়। বস্তুত, প্রজাতিপ্রতিভূ ব্য একেই বলা যেতে পারে, যিনি দেশ-কাল নির্বিশে পূর্ববর্তীদের সঞ্চেতন প্রকৃতিবিজ্ঞানীই নন। অন্ত কোনো পূর্ণমন্তের ক্ষেত্রে তেমন হওয়া উচিত,—বি প্রজাতিগতভাবে অগ্রিমের প্রজাতি কর্তৃক পূর্বনির্দিষ্ট কি একটি বা একাধিক সমাজ প্রকৃতির নির্দেশক। অর্থাৎ সাধনা বলেও তিনি কোনো না কোনোভ প্রজাতিবিজ্ঞানের জন্য যার কম সচেতন প্রয়োগ ক্ষেত্রের পালনের মধ্য দিয়েও বিজ্ঞানসম্মতভাবে জাগ্রত এবং নিরলস নিষ্ঠাবান হয়ে কোনো বি প্রজাতি কর্তৃক পালনে সক্ষম হন। সেই কিংবা প্রত্য প্রতিভূ-মনীষীকে হজতো মহামনীষীর সাক্ষাৎ লা করা যায়। বুদ্ধ, সক্রেটিস, প্যাগলিও, চৈতন্য, গ্যালিল ডারউইন, মার্ক্স, এঙ্গেলস, রামকৃষ্ণ পরমহংস রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রকৃতি যাঁরা আজন্ম প্রজা পূর্ববর্তিত ওদের অধিকারী হিসাবে প্রতিভাজন ও উদ্ভূত এবং প্রজাতি ও সমাজবিকাশের কর্তব্যে নিষ্ঠা ও অনেকাংশে নিয়োজিত বা আত্মসমর্পিত,—তাঁ একইভাবে আখ্যাত হতে পারেন। কিন্তু উপরোক্ত বা কালগত কারণে কোনো বিশেষ আবিষ্কার ঘটায় পূ

হয়তো কোনো প্রজাতি প্রতিভূ বা অন্যমনীষী সেই ভবিষ্যৎ অধিকারের সম্বন্ধে তাৎক্ষণিকভাবেই স্বল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। সেরূপ সিদ্ধান্তকে হয়তো আমরা দমন করলে তাকানুগভাবে অভিহিত করতে পারি। আর যার অন্যমনীষার মত বিশ্লেষানন্দের ক্ষেত্রে ও সে-ঘটনা তাত্ত্বিক মনে করা যায়। বিষয়টি বস্তুত গুরুত্ব সহ আলোচনার যোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দের শেষ শেষবাস পর্যন্ত পরমাণু বা atom প (গ্রীক ভাষায় atom=indivisible, non-breakable) বস্তুটিকে চিরন্তন পদার্থ বা বস্তু হিসাবে গণ্য করা হত। সুতরাং, প্রকৃতি বৈজ্ঞানিকতাকেও তখন সম্ভবত কোনো বস্তুর চিরন্তনত্ব স্বীকার্য হতে পারত। কিন্তু ১৮১৭ খ্রী-এ পরমাণুর অন্তর্গত ক্ষয়া বিজ্ঞেয় বস্তু হিসাবে ইলেকট্রন-কণিকার আবিষ্কার, ১৮১৮ খ্রী-এ পরমাণুর অন্তর্গত বর্ষাত্মিক তেজস্ক্রিয় রশ্মির এবং ১৯০০ খ্রী-এ ফটোক্রিয় থেকে সাম্প্রতিক পারমাণবিক বলবিদ্যা আবিষ্কারের পর চিরন্তন ও এমন কি, হাজার হাজার বছরের স্থলিত সেখর চিরন্তন পদার্থ যাবতে দূরীর্ঘ ঘোষিত দাম্ভোরের মূলেও কুঠারাঘাত চলতে থাকে। কিন্তু অন্তজল পরেই, বর্তমান শতাব্দের গোড়ার ১৯০৫ সালে আপেক্ষিক তত্ত্বের আবিষ্কারের পর প্রকৃতি-বৈজ্ঞানিকদের নিছক অনুমিত ঐশ্বরিক সাম্রাজ্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটনের সম্ভাবনা অত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার পূর্বমুহূর্তে ১৯০২ খ্রী-এ বিজ্ঞেয়ানন্দের "অকস্মাৎ" মৃত্যু ঘটে। "অকস্মাৎ" কথাটি বলা হয়তো ঠিক হবে না। কারণ, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে (সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব হয়নি) তিনি কেন তাঁর সৃষ্টিসত্ত্ব জ্ঞেয়-সিদ্ধান্তের ফলেই সমষ্টিগত বা সমগ্রভাবে মানবসমাজের ও মানববন্ধনমাত্র-বিকাশের অনিবার্য প্রয়োজন অনুভব করে সেজন্য তাঁর নিজ ব্যক্তিসত্তারও বিসর্জন দিতে সংকল্প করে লিখেছিলেন, "It may be that I shall find it good to get outside of my body to cast it off like a disused garment. But I shall not cease to work until the world shall know that it is one with god." লেখক প্রজাতি তথা মানববন্ধনসমাজে তথা সমগ্র জড়প্রকৃতির কারণেই ব্যক্তি-সত্ত বস্তুবস্তুর্থ এবং হয়তো সেজন্য যসনর্থ বা অনুপযুক্ত দেহটি ত্যাগ করার বিষয়েও সংগত ও উচিতবোধ করেছিলেন। কিন্তু তার জ্ঞেয়-জড়প্রকৃতি, মৃত্যুত্ত্ব-সর্বাহে, পূর্ণ যৌবনবিকশিত, কৃতিসমৃদ্ধ অন্যমনীষার এই অকাল-মৃত্যুর জ্ঞেয়া-সিদ্ধান্ত কেন।। কারণ মনে হয় একটিই। কয়েক শ'বছর আগে আপেরার আর এক অন্যমনীষা চৈতন্যের শরীর-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে তাঁর একজন ভ্রেষ্ঠ ভক্তবন্ধু অনুপমী হরিদাস জানিয়েছেন, "শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন।" বর্তমান প্রসঙ্গেও আমাদের সেই একই উত্তর মনে আসে। অর্থাৎ, আপেক্ষমান মনীষীর নিজস্ব তাঁর 'বুদ্ধি-মনের' বিশ্লেষি। সৌভাগ্যে তখন ছিল একদিকে বহু বছরের পরিপুষ্ট-ভাবাবর্জিত বা 'ভাবের অতীত' এক অসম্ভব ও উদ্ভট তত্ত্বপ্রবর্তিত অধ্যাত্মিকবিজ্ঞানের সম্ভোষ। অন্যদিকে আছিল অসম্ভ ভবিষ্যতের নিশ্চিন্তস্তর তার সুনিশ্চিত ও প্রত্যক্ষীভূত বিজ্ঞানচেতনা। এই উভয়ের সুতীব্র দ্বন্দ্ব আপেক্ষমান মনীষীর চিত্তলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর সেই অন্তর্দ্বন্দ্বির অন্তরতীতির জন্যে 'ভালাভি'র কোনোরূপ ছিল না। ফলত, সেই জ্ঞেয়াসিদ্ধান্তজনিত জ্ঞেয়াগ বিষয়টি কোনোরূপ আত্মহত্যা বা অতিসন্ধিমূলক অপমৃত্যু হয়ে পারে না। তার কারণও তাঁর অবশ্যই উক্ত ভাবাই নিহিত আছে। জনাত্মকবিশ্বাসী বিশ্লেষানন্দ যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র জগৎসংসারী বা প্রজাতিমানব কর্তৃক সত্যাত্মবিজ্ঞানে সাধনা আত্মনে ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের পথ ধরে জীব-জড় নির্বিশেষে বিশ্বসোদরের মুক্তি। ইতিপূর্বে বহুজন আমাদের পূর্বনির্ধারিত প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক আলোকে আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, সে-উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতি-বৈজ্ঞানের তাৎপর্য নির্ভর চিরপদার্থের উচ্চতম বিকাশ সংগঠন। এ তাঁর অনুমিত তত্ত্ব হলেও কাজটি অনুমিতভাবেও সমজসাত্ত করেছে ছিল না। তাঁর কিয়ে সেজন্য হয়তো চাই ঘনেষ্টিত সুস্থ-সমর্থ দেহে চিরদিন বাস্তব অর্থাৎ অসংখ্যজন জীবনধারণ পূর্বক বহু মানুষকে একপ্রভাবে প্রাণিত করে অন্তত তা অভাবিত প্রসমাধান মাধ্যমে যথাযোগ্য প্রেষ্ঠজীব হিসাবে সমষ্টি বা প্রজাতিগতভাবে উন্নীত ও প্রজ্ঞানন প্রজাতিতে উত্তীর্ণ রূপে দেওয়া এবং তার জন্য সার্থকভাবে সুদীর্ঘ ও নিষ্ঠাময় যবিরাম শ্রুত চালিয়ে যাওয়া । কিন্তু কোনো অপ্রমেয় বা অহিংসা ঈশ্বরের সান্নিধ্য যে প্রজাতিগত বা সামাজিক চিরমুক্তির শেষ অবলম্বনীয় পথ হয়ে উঠতে পারে না, সে-সম্বন্ধে নির্দেশমানের জন্য তখনো আপেক্ষিক-তত্ত্ব, জিন-তত্ত্ব ও প্রতিবর্তী-ক্রিয়াতত্ত্ব প্রকৃতির মত কোনো প্রকৃতিবিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্বের সুনিশ্চিত আবিষ্কার ঘটে ওঠেনি। সে কারণে তাঁর জ্ঞেয়ার দেহ-মন পরিত্যাগের বা সংকেতে ইচ্ছামৃত্যুর সংকেতটিকে কালানুগ বিরাতি বলেই সিদ্ধান্ত করতে হয়। তাছাড়া, প্রজাতি বা সমাজ-মানস থেকে উদ্ভূত মনের সমাধান প্রজাতিগত হওয়াই ফলশ্রুত বা সার্থক হতে পারে। সুতরাং কেমনোরূপ বিজ্ঞান আত্মহত্যাকারী বা অপমৃত্যু যে সমাজ-মানসে কী রূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সে সম্বন্ধে প্রজাতিপ্রতিভূ মন্যমনীষীর কোনো অভ্রান্ত বিষয়ক অনুমান, সত্তার অপলাপ মাত্র।

অপরপক্ষে, তাৎক্ষণিকী প্রজাতিগত অর্জিত সারফলের প্রতিমূর্তি বা প্রজাতিপ্রতিভূ নিশ্বাস হয়ে ওঠা গ্রামকৃষ্ণের বিশ্বাস ও ভাবাবেগের সজনিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রভাবও তখন তাঁর সমক্ষ থেকে বিজ্ঞান প্রভাবিত অন্যায় কারণে কিছুটা অপসৃয়মান হয়ে থাকতে পারে। সেরূপে প্রজাতি বা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নক্ষত্রলোকির মৃতিনির্ভরের প্রত্যক্ষ প্রভাব হয়তো তাঁর চেতন অবচেতনে তখন কিছুটা নবতর হিন্দোলও সৃষ্টি করে থাকবে। এছাড়া অন্য পথে, একথা সত্য যে, তখনো পর্যন্ত জড়-তত্ত্ব এবং তেজোময় শক্তির মহাত্রিক্রিয় অন্তঃপরিবর্তন-তত্ত্বের অন্বেষণাতীত আবিষ্কার ঘটেনি। কিন্তু পূর্বেক্ত তৎপূর্ববর্তী আবিষ্কারগুলি যে সেই তখন পোষিত সকল মত সম্বন্ধীয় চিরন্তনত্বের ধারণাকে অপসারিত হয়তো আর কোনো চিকানো-খটানোর মত সচেতনভাবে পুনরুদ্দীপিত করে তুলতে নাও পারত, উক্ত ফলানুগ মাত্রির প্রভাবকল তখন সেই মৃত্তিও তাঁর কাছে অনতিক্রমণীয় হয়ে তাঁর মানসলোককে আরও আচ্ছিন্ন করে তুলতে পারে। ফলত, (জ্ঞেয়াসৃত্যু) বরণকে সিদ্ধান্ত অপরিত্যাজ্য হয়ে হয়ে থেকেও তাকে সফল করার জন্য তাঁর সচেতন জ্ঞেয়াগের পথ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু অসম্ভাবিত ও অজ্ঞাত। থাকার অতীতের সর্বোচ্চ অপরিত্যক্ত ত্রুটি ও মনের অন্তর্যামনকে অহেতুকভাবে সর্বসমক্ষে তুলে ধরাও তাঁর কাছে সম্ভবত 'অসুস্থ' বা অসংস্থে মনের পরিচায়ক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এক সময় তিনি কোথাও লিখেছিলেন, "Dirty linen must not be exposed to the street." এক্ষেত্রে তাই তাঁর পূর্বচর্চিত মনসাযোগসমন্বয় জ্ঞানতন্ত্রস্তরের ধারণা তিনি তাঁর নিজের এবং হয়তো বা সুস্থ সেবস্থ অসুস্থ ও অপরিচ্ছন্ন বুদ্ধিমনের বিসর্জনকে 'মনন-ত্রাণ-প্রয়াসের' অন্যায় নির্দেশ বিবেচনা করে তার দ্বারা শ্রীস্তরের সামাজিক বা প্রজাতিগত মানসলক্ষ্যের সমাধান সমাহিত হওয়ার বাঞ্ছিত পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। অর্থাৎ, বহু সাধন ও মানস-মেহনত অর্জিত সমাধি-অবস্থার মধ্যে এভাবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মূল দেহ-ত্যাগসহ সূক্ষ্ম 'মন'শক্তি অর্থাৎ সর্বস্ব পরিত্যাগ করে তথাকথিত বা অহিংসা-ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে নয়, চতুঃ শব্দ ('মন'-'বুদ্ধি'-'বিজ্ঞান' ও 'আনন্দময় ও ময়া বিজ্ঞানঘন চিরপদার্থ-প্রকৃতিসত্ত্বে' কিংবা বা প্রত্যাবির্ভূত হওয়ার কলাকৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর উপযোক্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই আলানুগ-ভাত্তিজনিত ছিল। কিন্তু তার প্রয়োগপদ্ধতি বা কলা-কৌশল ছিল বিপুল বা অবর্ণ। কিন্তু "Uniformity is the rigorous law of nature." সার্বিকভাবে প্রজাতিমুক্তি অর্জন বা তৎসম্বন্ধীয় নৈপুণ্যও তাঁকে আর অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রজাতি সাম্রিধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। তিনি ব্যক্তিদেহ থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন এবং তার পদ্ধতিও নিন্দনীয় বা হতে পারে। কিন্তু অবাধভাবে প্রকৃতিবিজ্ঞানের পক্ষাবলম্বনে তাঁর সেই বিজ্ঞানাশ্রিত-'জীবে-প্রেমে স্থিতি ফলশ্রুতিও আর সম্ভব হয়নি। সে-অর্থ একমাত্র বিজ্ঞানমান সমাজ-একতীয় সর্বময় ও সর্বশক্তিমান বিদ্যমানব-প্রকৃতিরই কাজ। অন্য কোনওভাবে তা অসম্ভ বা অপম্য।

অবশ্য, আলোচ্যমান কালপর্যায়ে বিশ্লেষানন্দ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণাটি হয়ে উঠেছিল সর্বাত্মবর্জিত প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্মত বা অভাবিত, এবং তার অনুরূপ সাধনাপথও তিনি অনুসরণীয় প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে ও অন্তর্ধ মানসসৃষ্টি বা বিশ্বসৃষ্টি (World-outlook)-রূপে বর্ণনা করতে পেরেছিলেন। সেটি হল অবশ্যই এই ঈশ্বরতত্ত্ব-সর্বাত্মিকস্থাপী ও সর্বাংশ সার্থক 'জীবে প্রেম'। কিন্তু তখন তিনি আর তার ভিত্তিকে প্রকৃতিবিজ্ঞানসম্মত ও অনুসরণীয় ভিত্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথোপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারেন নি। তবে তিনি যে কেন কয়েক মাস পূর্বে সেই শক্তির সাধন লাভ করতে পেরেছিলেন, তাঁর রচিত গ্রন্থ বা ইতিহাস সে-সম্বন্ধে সন্ধান দান করে থাকে। সেই ইতিহাস ও বিজ্ঞান ও দর্শনের পরস্পর-সম্পর্কিত হয়তো বিস্তৃ আলোচনা বা অ-পর্যাপ্ত বিবরণ আমরা একটি সংকলিত পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থ মধ্যে নিবেদন করার প্রবল প্রয়োজন করেছি। সে-সম্বন্ধে যথোপযুক্ত আলোচনার স্থান এটি নয়। সুতরাং অপরাপর এখানেই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করতে হয়।

মনোচিকিৎসায় সঙ্গীত

শাশ্বত রায়

কবি যাজ্ঞবল্ক্য যাকে 'সঙ্গীতবিজ্ঞানন্' বলেছিলেন। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের অনেকেই তাকে আর নিছক 'শিল্পমাত্র' বলতে পারছেন না। ঘোড়া যেমন করে একদা শিকটের তাঁর 'রিপাবলিকে' স্থান নিতে চাননি, তেমনটি আজ আর কেউ কল্পনাও করতে পারেন না —কারো, বিশেষ করে সঙ্গীত, আজ আর মানুষের ধারণায় মোটেই কোন আলঙ্কারিক অবতরণ সঙ্গী নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গীত আজ মানুষের দেহ ও মনের কাছে ওষুধের চেয়েও বেশি শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে।

Music Therapy বিষয়টি ভারতবর্ষে এখনও নতুন হলেও সারা পৃথিবীজুড়ে এটি এক ব্যাপক আলোড়নের চেহারা নিয়েছে। বহু মানুষের নিরলস চেষ্টা ও একনিষ্ঠ গবেষণার ফলে ধীরে ধীরে বিষয়টির বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগবিদ্যায় প্রসার ঘটছে। একথা বলাই বাহুল্য যে নিছক ঘটনাচক্রেই বিষয়টির আবর্তনের মূল কারণ হলে বিজ্ঞানীরা এটিকে এত গুরুত্ব দিতেন না। এর ব্যাপকতা এবং কার্যকারিক উপযোগিতাকে উপলব্ধি করেই একদা 'United States National Association for Music Therapy' স্থাপিত হয়। এই সংস্থা আজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মিউজিক থেরাপির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা ছাড়াও ত্রৈমাসিক পত্রিকার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন সেমিনার ও গবেষণা লব্ধ তথ্যাদি সরবরাহ করে। এরপরেই ১৯২৮ সাল থেকে, 'The British Society for Music Therapy' সংস্থাটি লন্ডনের 'Guildhall School of Music and Drama'-র সহযোগিতায় কাজ করে আসছে। সুইডেন আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলেশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, জাপান প্রভৃতি অন্য দেশে ইদানীং কেন কিছু এই ধরনের সংস্থার জন্ম হয়েছে, যারা তাদের নিজস্ব সামর্থ অনুযায়ী বিষয়টিকে আজও আধুনিক করে তুলতে সচেষ্ট।

যেহিনেরীর নাম অনেকেই আজ আর মনে করতে পারেন না। তিনি বেগলমের এক বিখ্যাত ক্যাস্ট্রাটো গায়ক ছিলেন। ১৭৩৭ সালের ১১ই জুন, তিনি লন্ডন থেকে স্পেনে যাত্রা করেন। তিনি যখন মাদ্রিদ-এ পৌঁছলেন। তখন রাজ্যজুড়ে হতাশা আর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পঞ্চম ফিলিপ তখন একেবারে শয্যাশায়ী। এক অদ্ভুত মানসিক অবসাদে (Melancholia) তাঁর দিন-রাত্রি একাকার। সব চিকিৎসা ব্যর্থ। এমতাবস্থায় রাণী ফেরিনেল্লিকে ডেকে পাঠালেন। গভীর রাত্রে রাজার ঘরে মৃদু করুণ সুরের গান ভেসে এল। সুরের যাদুতে গলন ফিলিপের মনের সমস্ত বন্ধ জানলা খুলে গেল। ধীরে ধীরে বেদনার শত ঢেউয়ও যা হয়নি, যেহিনেরীর গান এক নিমেষে তাই ঘটিয়ে দিল। এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। রাজা হেসে উঠলেন। যেহিনেরীর আর ফেরা হল না। ৫০,০০০ ডলার মাসোহারার বিনিময়ে তিনি রাজ বাড়িতেই বন্দী হয়ে গেলেন। প্রতিদিন রাত্রে কিছুক্ষণ তাঁকে গান শোনাতে হত। শোনা যায়, এইভাবে ৬৬০০ বার তিনি একই (মোট চারটি) গান গেয়েছিলেন। এটাই মিউজিক থেরাপির যাদু।

ইতিহাসে কিন্তু যেহিনেরী একা নন। অনেকেই, নানা সময়ে নানা ভেবে, বিভিন্নধর্মী সঙ্গীতের সাহায্যে পীড়িত মানুষের গ্লানি দূর করার চেষ্টা করেছেন। 'Shabut-e-raja' ছিলেন এদেরই একজন। মিশরে তিনি সঙ্গীতের ব্যবহার করতেন অসুস্থ মানুষের উপর।[১] গ্রীক বীণা বাদক 'থিমোথিয়াস' প্রথম বাইবেল বর্ণিত তার-বাদক 'ডেভিড'—এরা সকলেই একই-ভাবে মানুষের মনে নতুন করে বাঁচার আশা জাগাতেন।[২] তাঁদের শক্তি ছিল তাঁদের সঙ্গীত।

মানব সভ্যতার উন্মেষের প্রথমদিকে এমন একটা বিশ্বাস মানুষের মনে প্রবল ছিল যে—অশুভ আত্মা এবং শক্তির প্রভাবেই মানুষ অসুস্থ হয়। অথবা কোন দেবতা রুষ্ট হলে তাঁরা মানুষের শরীরে রোগের প্রকাশ ঘটে। অপরাধ বোধ এবং অসুস্থতা—এটা যেহেতু সর্বকালের একটা বড় সমস্যা। বৈদিক যুগে এই ধরনের সঙ্গীত প্রসঙ্গে যাগ-যজ্ঞের কথা বলা আছে, যার দ্বারা দেবতা তুষ্ট হন। গ্রীক দেবতা এসক্লেপিয়াস কথা তো না বলাই; যাঁকে একাধারে সঙ্গীত ও ওষুধের দেবতা বলা হত। খ্রিষ্টিয় যুগের প্রথম দিকে St. Vitas, এইভাবে মৃগী রোগ সারাতেন। St. Lazarus, St. Sebastian এবং St. Blassey যথাক্রমে কুষ্ঠ, প্লেগ এবং গলার রোগ নিরাময় করার চেষ্টা করতেন।[৩]

ইউরোপে গ্রেগরিক-দেবতার বাজনা করে এনেছিলেন প্রভু যীশু এবং তাঁর সঙ্গীতায়। ঘণ্টা এবং ঘন্টাধ্বনি রোগের ভয় দূর করতেন। বাঁশের বাঁশি মনোযোগ করা হত, তাঁরা সকলেই এই মূলতত্ত্বের এবং সেবার বিশ্বাস করতেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, গভীর মূলতত্ত্বের এবং সেবার আদর্শ নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ালেও কেন তাঁরা অসুস্থ মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বস্তুতঃ বেনেসাঁ সমাজ পরবর্তের পর যে অন্ধকারময় যুগের সূচনা হয়েছিল তাতে অনেক কিছুই যুগে যুগে সাধু হয়ে গিয়েছিল চিকিৎসা বিদ্যা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি করার সব বিদ্যা (এমন কৈল) তখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অথচ ধর্মযুদ্ধের প্রকৃত চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রয়োজন যে চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। যেমন, প্রয়োজন আবিষ্কারের জননী, ঠিক তেমনি-ভাবেই কার্যকর বিকল্প খোঁজাই ছিল এই ধরনের বিপরীতধর্মী অনুভূতি বিশেষতঃ মনোচিকিৎসার ক্ষেত্রে।

একথা নিশ্চিত যে, গ্রীক দার্শনিকরা যে পূর্ণ সঙ্গীতের এই বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপারটি লক্ষ্য করে ছিলেন। এরিস্টোটল মনে করতেন মেলডি হ আত্মিক উন্নতির পথে একটা বড় সহায়।[৪] গ্রেগ হলস্বরোঁকস্ত (Korbantism) বাঁশির সুর প্রয়ে করার উপদেশ দিয়েছিলেন।[৫] যৌন উত্তেজনা দূ করে—এটি একটি প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাস।[৬] চিকিৎ ক্ষেত্রে বাঁশির সুর প্রয়োগের এই সমস্ত ত পরবর্তীকালে আরবদের মাধ্যে সঞ্চারিত হয়, যা তা তাদের হাসপাতাল গুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহ করতো, বিশেষতঃ শারীরিক কাটা-ছেঁড়ার ক্ষেত্রে ঘুম এবং উত্তেজনা লাঘব করতে। ফোস্টে সাহেব উ করেছেন তিনি কিছু নির্দিষ্ট হাসপাতালের সুর বাজিয়ে সু বন্ধুটি সাইটিকার মত দুরারোগ্য স্নায়ু রোগ থেকে আর পেয়েছেন।[৭] প্রাচীন গ্রীসে সঙ্গীতের যে ব্যা প্রয়োগ হত, তা মূলতঃ মানসিক উত্তেজনা এ নিয়ন্ত্রণীনভাব প্রতিরোধে। এমন কি, আত্মহত্যে সা পাঁচার ব্যাপারেও হলদের পক্ষে উপকারী,—এ বিশ্বা প্রচলিত ছিল।[৮] এই বিশ্বাস থেকেই হয়তো রোগ এবং পাগলাগারদ মানসিকের আত্মহত্যের সঙ্গে বাঁ অস্ত্রগুলির ব্যবস্থা করে আসছে আজও।

প্রাচীন ভারতবর্ষে সঙ্গীতের চতুর্বর্গ প্রয়োগ উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহলে অবাক হতে হয় বৈদিক যুগে যখনই ব্যাপারে সঙ্গীতই ছিল একম নিরাময়ক, তা সে আধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক—এ হোক্ না কেন! অথর্ব সঙ্গীতের ক্ষমতা ছিল আ ব্যাপক। কিন্তু এই সমস্ত সঙ্গীত ধারাই আজ লুপ্ত। আ আর সঙ্গতী তাঁর বৈদিক ঐতিহ্যমাত্র গানে মুখ হয় না। তবু আশার কথা, রাগ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রটি আ লুপ্ত হয়নি যা অনায়াসেই মনোচিকিৎসার জগতে ন নিজস্ব উন্মোচন করতে পারে। এই মুহূর্তে, ইউরো

এবং আমেরিকায় যারা সঙ্গীতকে ব্যবহারিক কাজে লাগাতে চান, তাঁরা অবশ্যই ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-তালতত্ত্বটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করবেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, আজও আমরা এর সঠিক মূল্য বুঝতে চেষ্টাই করি না। অবশ্য তা বাদলাটী টাঁদে এবং প্রবাস তা মানস ভ্রাতাটীবৃদ্ধির মত সৃষ্টিমের ক'বেকজন এ বিষয়ে গবেষণার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তা টাঁদে পুনে জেলার কারলার 'আর্যবর্ধে এণ্ড মেডার কিলব'-এ সঙ্গীত নিয়ে কাজ করে জানিয়েছেন, পাশ্চাত্যের ক্ষুব্ধ মিউজিক অবলাম্বস্ত রোগীকে সাময়িকভাবে সুস্থ করে। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী, উন্মাদ রোগ দারে তৈরক্টীতে : শিবরক্ষণী স্মৃতিশক্তি কড়ানোর সাথে সাথে মানসিক ব্যাধি প্রতিরোধ করে : উত্তেজনা ও রক্তচাপ কমায় টেরিড ও তৃপাদী রাগ্, এবং আনন্দবর্ধী ও মালাকোষ দুশী রোগ সারায়।[১১] প্রথাত ডা ভ্রাবটীবৃদ্ধি (কলকাতায়) নিয়ন্ত্রিতভাবে সঙ্গীতের প্রয়োগের নানা দিক নিয়ে কাজ করেছিলেন। বস্তুতঃ এই ধরনের দাবীর ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি তাঁর নিজেরাও উপলব্ধি করেছিলেন তা হল—সুরের যা রাগের কাঠামোর কোন বিশেষ ওজন জন্য এবং ছন্দ বা লয়ের তারতম্যের জন্য ঠিক কি ধরনের মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয়, তার সঠিক ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন নি। এছাড়া, সুরের উচ্চতা, জাতি, প্রকৃতি এবং মূর্ছনার ক্রমের চড়িয়ে এবং রোগীর অজ্ঞাতসারে কোন পরিবর্তন আনে কি না।—এ ক্রমের ক্ষেত্রেও তাঁরা বিস্তৃত থেকেছেন। আশার কথা, বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক এই বিষয়েই গবেষণা চলছে।

আমাদের দেশে মনোরোগের চিকিৎসার কোন ক'টেকটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনোরোগীদের কোন সাইকোথেরাপিই অথবা কিছু মিউজিক-মেডিসিনের সাহায্য নিতে হয়। এর ও উদ্ভবের মাধ্যমে রোগীদের চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার করাই হল সাইকো-থেরাপি। রোগীদের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে আবেগ-বৃত্তির সংশোধনকেই এক্ষেত্রে বেশি জরুরী মনে করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার নিজস্ব সমস্যা সমাধানের শক্তি আছে—এই বিশ্বাসই সাইকো-থেরাপির মূল ভিত্তি। চিকিৎসার পরিভাষায় একে বলা হয় নন-ডাইরেক্টিভ-কাউন্সেলিং। এ ক্ষেত্রে মনোচিকিৎসক শুশ্রূষার একজন সহানুভূতিশীল শ্রোতার ভূমিকা পালন করেন।[১২] অপরদিকে, ডাইরেক্টিভ-সাইকো-থেরাপিতে মনো-চিকিৎসক কিছু নির্দেশের সাহায্যে সমাধান সূত্রের পথ দেখিয়ে দেন। সাইকোথেরাপির প্রথম সমস্যা হল কণ্ঠস্বরের, যা অনেক ক্ষেত্রেই রোগী এবং মনোচিকিৎসকের অবচেতনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। রোগী প্রায়ই মানসিক অবসাদের কারণে মনোচিকিৎসকের সাথে আদৌই সহযোগিতা করে না ; -এটি হল দ্বিতীয় এবং প্রধান সমস্যা। এসব ক্ষেত্রে সাইকোথেরাপি ব্যর্থ হলেও সঙ্গীত কিন্তু সাহায্যে সফল হয়। অনেক ক্ষেত্রেই রোগীদের কিছু প্রত্যাশিত গুণুর নিয়ে চিকিৎসা করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের জানেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গুণুরের কাজ সাময়িক এবং তার মাত্রাও ক্রমশঃ বাড়াতে হয়। এক্ষেত্রে সঠিক গুণুর নির্বাচন ও তার মাত্রা নির্ধারণ নিয়ে চিকিৎসকের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হল এই সমস্ত গুণুরের অভিপ্রায়ক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়টি। এই সমস্ত ওষুধ বন্ধ হলে কখনও কখনও উন্মাদনা দেখা দেয়। ইলেকট্রিক শক্ থেরাপি অথবা মস্তিষ্ক কর্তনের মাধ্যমে রোগীকে একেবারে জীবন্মৃত করে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ, এই কারণেই পাশ্চাত্যে মনোচিকিৎসার বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন R. D-Laing, Thomas Szasz, Robert Boyers প্রমুখেরা এবং নাম রাখে Anti-Psychiatric—আন্দোলন। ফলেই, মিউজিক থেরাপির প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নাতীত।

মানুষের সত্তিত্বের উন্নতি শরীর মনের নিবিড় তারসাম্য ছাড়াই সম্ভব নয়—এই প্রচীন হেলেনিক্ ঐতিহ্যে মিউজিক থেরাপির দর্শন আজও খাঁটিয়ে বুঝেছে। যে শারীরিক রোগের মূল কারণ যে আসলে মনের উপর জমে থাকা চাপ—এ কথা আজ আর মনোবিদদের অজানা নয়। এই অবস্থাকে বলা হয় সাইকো-সোমাটিক-কন্ট্রোলন। এইভাবে রোগ শরীরে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় ; এই তা দীর্ঘস্থায়ী হ'লে শরীরে উচ্চরক্তচাপের স্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবার মানসিক উদ্বেগ পাকস্থলীতে এসিড ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, ফলতঃ প্যাপটিক আলসারের মত মারাত্মক শারীরিক সমস্যার সূত্রপাত হয়।[১৩] বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ সূত্রে জানা যায় এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রতিমুহূর্তে একজনের সমান্তরাল পারস্পরিকতা বজায় থাকে। এতে বলা হয় Psycho-physical-parallelism. এটিই হল মিউজিক থেরাপির কার্যকারিতার মূল ভিত্তি।

সাম্প্রতিককালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মানসিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাব-সঙ্গীতের (mood-music) সাড়া দেয়। মিউজিক থেরাপিতে একে বলা হয় ISO-Principlism.[১৪] পাশ্চাত্যে এই ধরনের ভাব সঙ্গীতের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

(১) বিষণ্ণতা—Brahms-এর—'Clarinet Quintet in B-minor.'
(২) ক্রোধ—Bartok-এর—'String Quartet No. 5.'
(৩) অপরাধবোধ—Ernest Bloch-এর—'Schelomo for Cello and Orachstra.'
(৪) প্রেম—Wagnner-এর—'Liebestod.' ইত্যাদি।

ভারতীয় রেকর্ডপটে দীর্ঘস্থায়ী করুণ রসাত্মক ভাব-সঙ্গীত যে বেশি কার্যকর তা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ক্ষণস্থায়ী সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়ার এইদিক থেকে বিচার করলে মোটেই সন্তোষজনক নয়। প্রশিক্ষিত চিকিৎসার ক্ষেত্রে পর্যাবৃত্ত ঔষধসেবনের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। আমাদের মস্তিষ্কের রন্ধ্রের কার্যকারিতাকে সঠিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে এই ধরনের পর্যাবৃত্ত-বিরাম দেওয়াও অত্যন্ত জরুরী। বস্তুতঃ, আমাদের প্রতিটি চেতন এবং অবচেতন—এই দুই স্তরেই সঙ্গীতে সাড়া দেয়, এটা প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে দেখা যায় আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সঙ্গীত শ্রবণে মস্তিষ্কের ব্রাডমান এবং হাইপোথ্যালামাস অঞ্চলে অবচেতন অনুভূতির অবস্থার একটা পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন সঙ্গীতের চরিত্র দ্বারা নির্ধারিত করা যায়। এই পরিবর্তিত অবস্থা মস্তিষ্কে নিউরো-হরমোন গুলির ক্ষরণে একটা সাম্যতা আনে, যা পরবর্তী স্তরে যন্ত্রণাদায়ক গ্রন্থির হরমোন গুলির স্বাভাবিক ক্ষরণে সাহায্য করে। ফলতঃ শরীর ও মনের ভারসাম্য পুনরায় ফিরে আসে এবং আমরা সুস্থ হয়ে উঠি।

ভবিষ্য মিউজিক থেরাপি বিষয়টি ভারতবর্ষে এখনও নতুন, তবুও বিষয়টির সম্ভাবনাময় নির্ভরযোগ্যতা ইতিমধ্যেই সারা পৃথিবীর চিন্তাবিদদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বস্তুতঃ, শব্দের সংস্কৃতি এবং সঙ্গীতের মনোস্তাত্ত্বিক চরিত্র যেমন আজও জানা যায়নি, তেমনি মানুষের শারীরিক এবং মানসিক চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিও ঠিক থেকেই অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সেই কারণেই ওষুধের ব্যাপক ব্যবহারও মিউজিক থেরাপির মূল্য কমিয়ে দিতে পারেনি। সুতরাং, একবিংশ শতকের আসন্ন জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভয়ঙ্কর অস্থিরতার কথা মনে মনে রেখে মিউজিক থেরাপির ওষুধ প্রভাব দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের জীবনের সংকট মোচন সচেষ্ট হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।

॥-॥

—উৎস নির্দেশ—

(১) Juliette Alvin, Music Therapy. London-1975, P-157.
(২) G. Mancini, quoted in Grove's Dictionary of Music Musicians, (Macmillan, 1954), vol-II, P-200
(৩) Papyrus Hent Tani, British Museum, quoteb by—J. Alvin, op. etc, p-22.
(৪) D. H. Charnet, The Influence of Music on Health and Life, (New York, 1876), p-195.
(৫) Cf. J. C. Weldon, ed. The Politics of Aristotle, (Macmillan, 1888), Book-V, ch-7, p-256
(৬) Plato, Conviv, 245E, quoted by-J. Alvin, op.cit, p-41.
(৭) Marius Schneider, 'Primitive Music', ed.-Egon Wellesz, (Oxford University Press, 1957-60), Vol-I, p-57.
(৮) D. H. Charnet, The Influence of Music on Health and Life, quoted by-J. Alvin, op.cit, p-41
(৯) J. Combarieu, 'La Musique et la magie,' (Paris A. Picared & fils, 1909), p-292
(১০) আজকাল পত্রিকা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১২।
(১১) H. W. Bernard, Mental Hygine For Classroom Teacher, 2nd ed.-1968, p-392.
(১২) Lynn Gillis, Human Behaviour In Illness, London-1982, p-141.
(১৩) Roy Saswata, An Outline of the Dynamics of Music Therapy, Sanskriti,-2nd-issue, July-1995, p-36.

মানবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব

ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

(ঘ) সূচনা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুটি অত্যন্ত বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে গোটা বিজ্ঞানের জগতে, বিশেষভাবে পদার্থবিজ্ঞানে। ১৮৯৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেল্ম কনরাড রন্টজেন (১৮৪৫-১৯২৩) আবিষ্কার করলেন এক বিস্ময়কর রশ্মি-যা কিনা শরীরে ঢোকড়া, মাংসপেশী ভেদ করে ছলে যেতে পারে। ফলে এই রশ্মি দিয়ে শরীরের হাড়ের ছবি অনায়াসেই তোলা সম্ভব হল। এই রশ্মির নাম রাখা হল এক্স-রশ্মি।

পরের বছর ১৮৯৬ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক হেনরী বেকারেল (১৮৫২-১৯০৮) ইউরেনিয়ামের লবণ নিয়ে ভাল করতে করতে দৈবাৎক্রমে আবিষ্কার করলেন অদৃশ্যরশ্মির কিছু বিকিরণ যা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নামে অভিহিত। পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে এলো যুগান্তর। পূর্বে-প্রতিষ্ঠিত বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ধূলে কুটারাঘাত হেনে সগর্বে এগিয়ে চলতে লাগলেন এই প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানে।

ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হল যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণে রয়েছে আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মি। এই বিকিরণগুলি ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি বেশ কিছু ধর্মের থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে-তেজস্ক্রিয়তার জাগতিক ব্যবস্থাই এদের উপর সভয়ে বিচার করতে পারে না। ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে এইসব বিকিরণ বেরিয়েই চলেছে—থামানোই যায় না।

বেশির ভাগ পদার্থবিদ গভীর নিষ্ঠায় বিজ্ঞানীর মতনভাবে গবেষণা শুরু করলেন। ফলে গেল—লবণাম্বুর তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে আলফা রশ্মি বলা হোলো এবং বিটা রশ্মি বিটা রশ্মি। আর ঐ রশ্মিগুলিকে ভেঙ্গে করে দেবার পথে ঘুরে চলেছে, তাদেরকে আলফাকণা ইলেকট্রন। একটি আলফাকণা ২ টি নিউট্রন এবং ২ টি প্রোটন দ্বারা গঠিত। আর নিউট্রন বলা থেকে একটি বিটা বলা নির্গত হলে সেই নিউট্রন বলা থেকে একটি প্রোটন কণায় পরিণত হয়। যেমন যায়—ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, ইলেকট্রন, নিউট্রন—এদের প্রত্যেকটি পরমাণু, পরমাণুর পরমাণু-রশ্মি এবং পুরুষের এক রশ্মি হল পরিবেশ-দূষণের বিকিরণ। আমাদের এই সমস্ত বিকিরণের পরিমাণ খুব বেশি হলে তাদের এক্স-রশ্মি বেশি হলে তেজস্ক্রিয়তার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখা গেছে যে, মানবদেহের ক্ষতিকারক, তেজের মাত্রা অনেক বেশি হলে মৃত্যু হতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই ধরনের মৃত্যুকে বলা হয় মৃত্যু।

(ঙ) ক্ষতিকারক বিকিরণ এবং তার জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়া :—

যে সমস্ত বিকিরণ মানুষের বা জীবজন্তুর দেহে প্রবেশ করলে পরমাণুগুলির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয়ে থাকে, সে সব বিকিরণকে আমরা ক্ষতিকারক বলে উল্লেখ করব বলা যায়, এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি, আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি, নিউট্রন কণা সবই আমাদের ক্ষতিকর বিকিরণ। সমস্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মধ্যে আলফা

বিকিরণ।

জীবকোষের উপর আয়নকারী বিকিরণের ক্রিয়া দুভাবে ঘটতে পারে। এক। প্রত্যক্ষ ক্রিয়া : এক্ষেত্রে বিকিরণ শোষিত হয়ে অণুগুলি ভেঙে যায় ; ফলত জীবকোষের প্রত্যক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়। দুই। পরোক্ষ ক্রিয়া : আয়নকারী বিকিরণের পরোক্ষ ক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ, কোষস্থ নিউক্লিওলাসের মধ্যে অবস্থিত ক্রোমোজোমের DNA-কে (Deoxyribonucleic Acid) ক্ষতিগ্রস্ত করাই হল আয়নকারী বিকিরণের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং আয়নকারী বিকিরণের মাত্রা যতই থাকে, ততই কমে ক্রোমোজোমের বিকৃতির মাত্রা। জীবকোষস্থ জল (H_2O) আয়ন হয়ে যায় এবং তৈরি করে H_2O^+ আয়ন এবং ইলেকট্রন (e)। এইরকম কি স্যাডিক্যাল আয়নগুলি খুবই অস্থায়ী হয় এবং ভেঙে গিয়ে তৈরি করে H^+ আয়ন এবং OH^- আয়ন [এখানে OH-এর উপরে ফুটকির অর্থ হল জোড়া না এমন (unpaired) ইলেকট্রন]। এই দি স্যাডিক্যালগুলি আণবিক গঠনকে বিপর্যস্ত করে তোলে—ফলে দেখা দেয় বিকৃত ক্রোমোজোমের। এইভাবেই জীবন্ত কোষগুলির উপর আয়নকারী বিকিরণ ক্রিয়া করে। এমন ক্ষেত্রে সন্তান যা যা ঘটতে পারে তা নিম্নরূপ। বিপর্যস্ত কোষটি আবার তার স্বাভাবিক মেরামতি পদ্ধতির দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। অথবা ক্ষতিগ্রস্ত কোষটি মেরামত করেও আংশিক সুস্থ ও আংশিক বিকৃত থাকতে পারে। কিংবা কোষটির সম্পূর্ণভাবে মৃত্যু ঘটতে পারে। উপরোক্ত ক্ষতির মাত্রা নির্ভর করে আয়নকারী বিকিরণের মাত্রার উপর। অতিরিক্ত মাত্রার বিকিরণ হলে শেষোক্ত পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ জীবকোষের মৃত্যু ঘটে—ফলে সমগ্রটি মানুষটিরও মৃত্যু ঘটে যায়, যেমনটি ঘটেছিল হিরোশিমা, নাগাসাকিতে (১৯৪৫)।

তাই সহজেই অনুমেয় কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের ভিতর থেকে সৃষ্ট আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি আয়নকারী বিকিরণ যখন খাদ্য হয়ে মনুষ্য দেহে প্রবেশ করে, তখন তা থেকে উৎপন্ন শক্তি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে দেহকোষ দ্বারা শোষিত হয় এবং ফলত কোনও ক্রোমোজোম এবং তার (DNA)-এর অবশ্য ক্ষতি সাধিত হয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, ক্ষতি কিন্তু হবেই, বিকিরণের মাত্রা যত কমই হোক না কেন। উল্লেখযোগ্য যে, জীবতন্ত্রটিতে (Tissue) বিভিন্ন ধরনের আয়নকারী বিকিরণের ভেদন ক্ষমতা বিভিন্ন হয়ে থাকে। এটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট বিকিরণের ধরন এবং শক্তির উপর। ফলত, ভেদনক্ষম বিকিরণ খুব অল্প স্থানের মধ্যেই প্রচুর আয়ন সৃষ্টি করে অর্থাৎ শক্তি ত্যাগ করে ; আবার কোন কোন বিকিরণ জীবতন্ত্রটিতে প্রবেশ করে এবং অল্প অল্প শক্তি ত্যাগ করতে করতে বহু গভীরতা পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। উপরোক্ত বিকিরণ হল আলফা কণা এবং দ্বিতীয়োক্তটি হল গামারশ্মি। রশ্মির এই ধরনের ওপরে বলা হল লিনিয়ার এনার্জি ট্রান্সফার (LET)। LET হল শক্তির পরিমাণ যা কিনা জীবকোষের প্রতি মাইক্রন (এক মিলিমিটারের এক হাজারের একভাগ) অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট বিকিরণ ত্যাগ করে।

(ঘ) তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা আয়নকারী বিকিরণের পরিমাপের বিভিন্ন প্রকার একক ঃ

আয়নকারী বিকিরণের পরিমাপের মাত্রা ক্ষেত্রভেদে একাধিক একক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো একক হল রন্টজেন (Roentgen)। এই একক্কের মাত্রাটি এসেছে এক্স-রশ্মি আবিষ্কর্তা রন্টজেনের নাম থেকে। নীচে এককগুলির সঙ্গে দেওয়া হল।

রন্টজেন ঃ এর প্রতীক R। রন্টজেন হল বিকিরণ (Roentgen) পরিমাপ বা exposure-এর একটি বিশেষ একক এবং এটি প্রতি 0.001293 গ্রাম শুষ্ক বায়ুর 1 e. s. u. বা ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ইউনিট আধানের সমান কিংবা প্রতি কিলোগ্রাম শুষ্ক বায়ুর 2.58×10^{-4} কুলম্ব পরিমাণ তড়িতের সঙ্গে সমান। প্রসঙ্গত, Exposure হল প্রতি একক ভরের বায়ুতে ফোটন (photon) দ্বারা সৃষ্ট একই Sign-এর সমস্ত আয়নগুলির মোট তড়িৎ-আধান। অন্যভাবে বললে—প্রতিগ্রাম বায়ুতে শোষিত ৪৩.৩ আর্গ শক্তির পরিমাণই হল 1 রন্টজেন।

র‍্যাড (Rad) ঃ এটা হল Radiation Absorbed Dose। এটি প্রকাশ করে জীবদেহে কতটা পরিমাণ বিকিরণ শোষিত হল। প্রতি গ্রাম জীবদেহে যখন তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে 100 আর্গ শক্তি শোষিত হয়, তখন বলা হয় 1 Rad বিকিরণ শোষিত হল।

গ্রে (Gray) ঃ এই Rad-এর একটি বড় একক। প্রতীক GY। 1 GY = 100 Rad = প্রতি কিলোগ্রামে 1 জুল (Joule)।

রেম (Rem) ঃ এই এককটির পুরো নাম Roentgen Equivalent Man। রেম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্যে বলা যায় যে, সব ধরনের বিকিরণই কিন্তু জীবদেহে সমানভাবে ক্রিয়া করে না সমানমাত্রায় প্রয়োগ করা সত্ত্বেও। এই কারণেই রেম এককের আগমন এবং এই একক বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় Radiation Protection বা বিকিরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে। রেম হল যে-কোন আয়নকারী বিকিরণের এমন পরিমাণ যা কিনা প্রতিগ্রাম জীবদেহে যে-পরিমাণ শক্তি প্রদান করে তা 1 Rad এক্স-রশ্মি দ্বারা সৃষ্ট জৈবিক কার্যকারিতা বা Biological effectiveness-এর সঙ্গে সমান হয়।

এক্স-রশ্মি, গামা রশ্মি, বিটা বিকিরণের ক্ষেত্রে মূল আয়নকারী কণা হল দ্রুতগামী ইলেকট্রন ; তাই এদের জৈবিক কার্যকারিতা পরস্পরের সমান। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে—

1 Rad = 1 Rem.

কিন্তু যেখানে আলফিক আয়নকারী কণা হল ভারী কণা—যেমন নিউট্রন, আলফা কণা, সেখানে জৈবিক কার্যকারিতাও বেশি হয়। তাই এদের ক্ষেত্রে—

1 Rad = 1 × 10 Rem.

অনুরূপভাবে, উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণার ক্ষেত্রে—

1 Rad = 1 × 20 Rem.

সিভার্ট (Sievert) ঃ প্রতীক হিসে Sv। এটি Radiation Protection-এর SI একক এবং 100 Rem = 1 Sv.

কুরি (Curie) ঃ এর প্রতীক Ci। এই এককটি তেজস্ক্রিয়তার একক। 1 কুরি-এর অর্থ হল তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে প্রতি সেকেন্ডে 3.7×10^{10} সংখ্যক disintegrations বা ঐ সংখ্যক পরমাণুর ভাঙনে।

বেকারেল (Becquerel) ঃ এর প্রতীক Bq। এই এককটি তেজস্ক্রিয়তার SI একক এবং সংজ্ঞানুযায়ী একটি disintegration হল এক Bqm-এর সমান। SI একক এবং প্রতিসেকেন্ডে একটি Disintegration হল এক Bqm-এর সমান।

(ঙ) আয়নকারী বিকিরণের উৎস ঃ

আয়নকারী বিকিরণের উৎস হিসাবে আমরা পৃথিবীর বাইরে থেকে এবং পৃথিবীর মধ্যের কোন কিছু প্রাকৃতিক ঘটনাকে দায়ী করতে পারি এবং বলা যায়, এইসব উৎস থেকে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মাত্রাগতভাবেই পৃথিবীর মানুষের উপর সর্বদাই আঘাত হানছে। এগুলির মিলিত বিকিরণকে আমরা বলি পরিবেশ-বিকিরণ (Background Radiation)। সৃষ্টি প্রধান উৎস থেকে এই ধরনের বিকিরণ সৃষ্টি হয়। (ক) প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট বিকিরণ এবং (খ) মনুষ্য-সৃষ্ট বিভিন্ন কারণ থেকে উৎপন্ন বিকিরণ।

(ক) প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট বিকিরণ ঃ একে দুভাগে ভাগ করতে পারি।

(1) মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Radiation)।

এই রশ্মি আসে সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্র থেকে। মহাকাশে এইভাবে পাই প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, মেসন বা কর্কশ, হিলিয়ামের আয়ন। এগুলি অবশ্য বেশির ভাগটাই আমাদের মাধ্যাকর্ষণজনিত আকর্ষণজনিত ভরবেগ হারিয়ে যায়—পৃথিবীতে প্রতি সামান্য পরিমাণে আসে। ফলে বলতে পারি, পৃথিবী থেকে যত উপরে ওঠা যায় ততই মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ বাড়ে।

(2) পৃথিবীর মধ্যে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব।

মাটি যার পরিমাণেও সামান্য পরিমাণে পৃথিবীতেই বিভিন্ন পাথর (বিশেষ করে গ্রানাইট) বা মাটির ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে। এগুলি থেকেই অতি অল্প পরিমাণে সৃষ্টি হয় আয়নকারী গামা রশ্মি। এই কারণে বিশেষ বিশেষ জায়গার মাটি তৈরির ইট বা পাথর থেকে এমন বিকিরণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া খুব সামান্যক তেজস্ক্রিয় গ্যাস রাডন গ্যাস (Radon), যা কিনা ইউরেনিয়াম-এর তেজস্ক্রিয়তার ফলেই পাই, তা-ও ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বাতাসে। মজার কথা, তেজস্ক্রিয় মৌল পটাশিয়াম-40 (অর্ধায়ু সময় 1.3×10^9 বছর) পাওয়া যায় মানব দেহে এবং কেন কিনা সার-এর মধ্যে। এটিও পরিবেশ-বিকিরণের আওতায় চলে আসে।

প্রাকৃতিক কারণে এইভাবে উৎপন্ন আয়নকারী বিকিরণের মাত্রা বছরে প্রায় 125 মিলিরেম। এর অর্ধেকটাই আসে অবশ্য Random gas (অর্ধায়ু সময় 3.8 দিন) থেকে।

(খ) মনুষ্য-সৃষ্ট বিভিন্ন কারণ থেকে উৎপন্ন আয়নকারী

বিকিরণ ।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণ বেড়ে চলেছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন শিল্পে এখন এর-রশ্মির ব্যবহার অনিবার্য। বিভিন্ন ধরনের মনুষ্য-সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আজ চিকিৎসা এবং শিল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে।

মনুষ্য-সৃষ্ট বিকিরণের ক্ষেত্রে অবশ্য তিনভাগ আয়নকারী বিকিরণ সৃষ্টি হচ্ছে পরীক্ষের সব পরমাণু-বিস্ফোরণ পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে আর তা কিন্তু সাধারণ মানুষের পরীক্ষেই আসতে পড়ছে—শুধু মানুষ কেন, সমগ্র জীবজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ আর আবহমণ্ডলই তার শিকার। যে-সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ এইসব পরীক্ষার ফলে তৈরি হয়, তা হল ষ্ট্রনশিয়াম-90 (Strontium-90, অর্ধায়ু সময় 28 বছর) এবং সিজিয়াম-137 (Cesium-137, অর্ধায়ু সময় 30 বছর)। এরা বহু বছর আমাদের পরিবেশে থেকে যায়। এছাড়া নিউক্লিয়ার জ্বালানি প্রসেসিং করার সময় তৈরি হয় ট্রাইটোজেনের আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় ট্রিসিয়াম (Tritium, অর্ধায়ু সময় 12·26 বছর) এবং ক্রিপ্টন-85 (Krypton-85, অর্ধায়ু সময় 10·76 বছর)। এরাও পরিবেশ দূষণে অংশগ্রহণ করে।

নাবভাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলি Nuclear Hazard-কে আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করে তুলেছে। যখন এই ধরনের কেন্দ্রগুলিতে দুর্ঘটনা ঘটে, তখন পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, সন্দেহ নেই এবং তা আশপাশের বহু মেলেই ছড়িয়ে পড়ে। এমন দুর্ঘটনা গত পঞ্চাশ বছরে অনেকবার ঘটেছে। 1979, 28 মার্চ, মধ্য পেনসিলভানিয়া থ্রি-মাইল আইল্যাণ্ডের পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রটিতে আংশিক গণ্ডগোলের ফলে ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছেয়ে ফেলে বহু বিস্তৃত অঞ্চল। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর, তা বলাই বাহুল্য। এই শতাব্দীর আর এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে রাশিয়ার চেরনোবিল-এর পারমাণবিক চুল্লীতে। ঘটনার সময় 1986, 26 এপ্রিল। ফলে প্রচুর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পরিবেশে মিশেছে অত্যন্তে।

আর একরকমভাবে পরিবেশে বিকিরণের পরিমাণ বাড়ে—তা হল নিউক্লিয়ার বর্জ্য পদার্থকে ঠিকমতো নিরাপদ তফাতে রক্ষা না করলে—কারণ এই বর্জ্য পদার্থগুলিও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উৎস।

এবার পরিবেশে বিকিরণের একটা হিসাব দেওয়া যাক। আমাদের দেশের হিসাব নয়—এটি হিসাব যুক্তরাজ্যের (U. K.)। যুক্তরাজ্যের পরিবেশে বিকিরণ (Background Radiation)-এর মাত্রা প্রতিবছর প্রায় 2·5 মিলিসিভার্ট। কোন উৎস থেকে কতটা উৎপন্ন হয়, তার শতকরা হিসাব নীচে দেওয়া হল।

(ক) প্রাকৃতিক ঃ 87%
রাডন 47%, থোরা 14% আন্তর্জাতীয় 12%, মহাজাগতিক 10%, এবং পোটাশ 4%

(খ) মনুষ্য-সৃষ্ট ঃ 13%
চিকিৎসাক্ষেত্রে 12%, নিউক্লিয়ার বর্জ্য আউট 0·4%, পেশাগত 0·2%, বিবিধ রকম Discharge থেকে খুব সামান্য, অন্যান্য 0·4%

(গ) মানবদেহে অন্তর্নিহিত আয়নকারী বিকিরণের চিত্র ।

মানবদেহে অনেক ধরনের জৈব আছে এবং আছে নানান জৈব-রস সমূহ। দেখা গেছে কোন কোন জৈব খুব সহজে এই বিকিরণেই কাবু হয়ে যায়, আবার কোন কোন জৈবকে ঘেরে ফেলতে বিকিরণের মাত্রাকে অনেকগুণ বৃদ্ধি করতে হয়। এই কারণেই এখানে বিকিরণের প্রভাবে জীবকোষের সংবেদনশীলতার (Sensitiveness) কথা।

আয়নকারী বিকিরণে সংবেদনশীলতা অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন জৈব এবং অঙ্গকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

(ক) উচ্চ-সংবেদনশীল ঃ অণ্ডাশয় (Testis), ডিম্বাশয় (Ovary), অস্থিমজ্জা (Bone-marrow), অন্ত্রের বিভিন্ন অংশসমূহ ইত্যাদি।

(খ) মাঝারী সংবেদনশীল ঃ থাইরয়েড গ্রন্থী, যকৃত, কিডনী ইত্যাদি।

(গ) কম সংবেদনশীল ঃ মাংসপেশী, মাথার হাড় ইত্যাদি।

কেমোথেরাপি সাধারণ মাত্রার থেকে 500-700 Rad-এর মতো অল্প মাত্রার আয়নকারী বিকিরণ প্রয়োগ করা হলে ঘেরে পারে, ধ্বংস হতে পারে, পরীক্ষে আলাদা রাগ হয়ে যেতে পারে, এমনকি বিকিরণজাত ঘা (ulcer) হয়ে যেতে পারে। আবার, যেমন স্ত্রী বা পুরুষের সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতা কমে আসে বা সম্পূর্ণ বন্ধ্যা হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, তেমনি চোখের লেন্সে ছানি পড়ার সম্ভাবনাও থাকে।

এর থেকে সামান্য একটু বেশি মাত্রার বিকিরণে চামড়ার পর্যন্ত ঝলসে ফেলা যায়। আবার আরো একটু বেশি বিকিরণ প্রয়োগে কিডনী, হাড় বা মার্ভকলার স্বাভাবিক ক্রিয়াকে বিশ্লেষকভাবে নষ্ট করা যায়।

এইভাবে সমস্যার পরে হাতের ক্যান্সার বা রক্তের ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে।

প্রসঙ্গত: বলা যায়, এমন কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, যেগুলি শরীরের বিশেষ কিছুর অংশে জমীভূত হয়ে ক্ষতি সাধন করেই চলে। যেমন, আয়োডিন-131 (Iodine-131, অর্ধায়ু সময় 8 দিন) থাইরয়েড গ্রন্থিতে এবং ষ্ট্রনশিয়াম-90 হাড়ের উপর-ক্রিয়া করে অস্থিমজ্জাকে ক'রে থাকে।

(ঘ) রিন (Gene)—এর উপর আয়নকারী বিকিরণের প্রভাব ।

অনেকসময় অতি অল্প মাত্রার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কোষের বিভাজনের উপর আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কোন প্রভাবই ফেলছে না—আসলে এ-ক্ষেত্রে সম্পর্কে ভয়ঙ্কের সম্ভাবনা হল যে, এই রকম অল্প মাত্রার বিকিরণ জীবকোষের ক্রোমোজোমের জিন গুলিকে অতিরঞ্জন করতে পারে, এমন কি জিনের বিকৃতি বা Gene mutation ঘটাতে পারে, অথবা ক্রোমোজোমের DNA বা রিবোনিউক্লিয়েকে নিউক্লিয়ীক অ্যাসিডের গঠনটাই পালটে দিতে পারে। এইভাবে একবার জিন-বিকৃতি ঘটে গেলে, তা কিন্তু পরবর্তী বংশধরের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়ে যায়।

উল্লেখযোগ্য যে, বিবর্তনের অঙ্ক হিসাবে জিন-মিউটেশন খুব ধীরে ধীরে ঘটে চলেছে। জিন-মিউটেশনের কারণ সঠিক জানা না গেলেও এর জন্য প্রকৃতিতে স্বাভাবিক যে আয়নকারী বিকিরণ (Background Radiation) আছে, তা কিন্তুটা দায়ী বলে মনে করা হয়। কিন্তু এর সঙ্গে যদি মনুষ্য-সৃষ্ট বিকিরণযুক্ত হয়, তা হলে দ্রুত জিন-বিকৃতির কারণে শারীরিক বিকলাঙ্গতা থেকে শুরু করে নানা দুরারোগ্য রোগে মানুষ আক্রান্ত হবে এবং তা বংশানুক্রমিক ধরে চলবে।

(ঙ) মানবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ।

মানবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তখনই, যখন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে হয় (যেমন হিরোশিমা, নাগাসাকিতে ফেলা হয়েছিল) অথবা পারমাণবিক চুল্লীতে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এই সব ক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংস্পর্শে এসে পড়ে মানুষ। এর ফলে মৃত্যু ঘটে যায় বহু মানুষের। অন্য যারা বেঁচে যায়, তারা কিন্তু থেকে যায় মৃত্যুযন্ত্রণার আশঙ্কায়, কিংবদন্তীতে যার ভবিষ্যতে যে রোগ হতে পারে ক্যান্সার (লিউকিমিয়া)।

পারমাণবিক বোমা হিরোশিমাতে যত মৃত্যু ঘটেছিল তার অধিকাংশের মারা গেছিল প্রথম বাতাস, কারণ এ বিপুল অংশের থেকে যার স্বল্পী কৃষি পরমাণুর দু হাজারটি বিস্ফোরণ আর পাশা বিকিরণ থেকে।

হিরোশিমা, নাগাসাকি (1945)-এর ঘটনা থেকে প্রথম মহাসাগরের উপর মার্শাল দ্বীপের (1954) যে পরীক্ষার দুর্ঘটনা থেকে, চেরনোবিলের (1986) পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনা ইত্যাদি থেকে এবং নানান গবেষণের পরীক্ষার মাধ্যমে যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে নিম্নোক্ত আলোচনা করা যেতে পারে :—

সমগ্র শরীরে বিকিরণ প্রয়োগের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ও ক্ষতির আরুলে উদ্ভূত উপসর্গসমূহ আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) রক্ত সংক্রান্ত উপসর্গ সমূহ
(খ) পাকস্থলী-অন্ত্র সংক্রান্ত উপসর্গ সমূহ
(গ) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র উপসর্গসমূহ

(ক) রক্ত সংক্রান্ত উপসর্গসমূহ ঃ

সমগ্র শরীরে 100 Rad পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণেই শুরু হয়ে যায় রক্ত সংক্রান্ত উপসর্গগুলি প্রকাশের মধ্যে। মানুষের মৃত্যু ঘটে 200 Rad বিকিরণ 3 থেকে 8 সপ্তাহের মধ্যে।

এইক্ষেত্রে বিকিরণের লক্ষ্যবস্তু হল অস্থি-মজ্জা যেখান থেকে রক্তের কণাগুলি উৎপন্ন হয়ে পরিণত হবার পর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এইসব কোষগুলি কমে হতে থাকে। অনুচক্রিকাগত (Platelet) কমে হবার কারণে শরীরে রক্তপাত বা রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না ফলে।

শরীরের উপসর্গগুলি সমস্যের সাথে সা

এইভাবে ভাগে ভাগে 1—

- ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে । বমি, কিছু নয়, পাতলা-পায়খানা।
- 24-36 ঘণ্টার মধ্যে । উপরোক্ত উপসর্গগুলি ফিরে আসে।
- 3 সপ্তাহের মধ্যে । ওজন হ্রাস, দুর্বলতা, হাঁপানো, শরীরে ব্যথা, চুল উঠে যাওয়া, টনসিল ফুলে যাওয়া, টনসিল ফুলে যাওয়া ও ঘা হয়ে যাওয়া, মাড়ি থেকে রক্তপাত, সারা শরীরে ছোট ছোট লাল দাগ হওয়া, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি।
- 6 সপ্তাহের মধ্যে । রক্তাল্পতা, নানান জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি।
- 8 সপ্তাহের মধ্যে । মৃত্যু ঘটে।

(খ) পাকস্থলী-অন্ত্র সম্পর্কিত উপসর্গসমূহ ঃ

সমস্ত শরীরে 500 Rad পরিমাণ বিকিরণে দেখা যায় এই সংক্রান্ত উপসর্গগুলি 3 থেকে 5 দিনের মধ্যেই। মানুষের মৃত্যু ঘটে 1000 Rad বিকিরণে 3 থেকে 14 দিনের মধ্যে।

এই ক্ষেত্রে বিকিরণের লক্ষ্য বস্তু হল ক্ষুদ্রান্ত্র। প্রথম ঘণ্টা কয়েকের পরই শুরু হয়ে যায় বমি আর তারপর পাতলা পায়খানা। 3 থেকে 5 দিনের মধ্যে অন্ত্রের ভিতরের কোষের আবরণ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে শুরু হয় রক্ত পায়খানা। এর ফলে শরীরে তরল এবং ইলেকট্রোলাইটের সাংঘাতিক ঘাটতি দেখা যায়। অবশেষে সংবহনতন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে।

(গ) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কিত উপসর্গাবলি সমূহ ঃ

সমস্ত শরীরে 2000 Rad প্রয়োগ করলেই স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কিত উপসর্গগুলির প্রকাশ ঘটে কিছুক্ষণের মধ্যেই। মানুষের মৃত্যু ঘটে 5000 Rad প্রয়োগ মাত্র কুড়িতেই।

এইক্ষেত্রে বিকিরণের লক্ষ্যবস্তু হল মস্তিষ্ক বা Brain। 15 মিনিট থেকে 3 ঘণ্টার মধ্যেই উপসর্গগুলি সাংঘাতিকভাবে প্রকাশ পায়। এগুলি হল রক্তনালীর প্রদাহ, এনকেফেলাইটিস ইত্যাদি, যার ফলে হল মস্তিষ্কের নানা তরলপদার্থ জমে যাওয়া, দুর্বলতা, শরীর কাঁপা, খিঁচুনি শুরু হওয়া ইত্যাদি। ফলত খুব শীঘ্রই আসে মৃত্যু। গর্ভস্থ সন্তানের উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তাৎক্ষণিক ক্রিয়া ঃ

প্রসূতি মায়ের উপর সমস্ত শরীরে বিকিরণ এসে পড়লে—হয় শিশু -সন্তান তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায় অথবা মৃত শিশু জন্মগ্রহণ করে। আর শিশু যদি শেষে বেঁচে যায়, তাহলে সে শিশু-জন্মায় বিকলাঙ্গ নিয়ে, মাথাটি হয় ছোট—কখনও মস্তিষ্ক-ও হয় ছোট। এরা হয় মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী সন্তান।

(ঘ) পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে বিলম্বে-ক্ষতি প্রতিক্রিয়া সমূহ ঃ

এইক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ-ক্ষত বেশ দেরিতেও নানা রূপে ফুটে ওঠে। যার মধ্যেই পড়ে ক্ষত হয়ে যাওয়া, ফুসফুসের ক্যানসার, রক্তের ক্যানসার ইত্যাদি রোগগুলি দেরিতে প্রকাশ পায়। এই বিলম্বগুলি আসে তেজস্ক্রিয় ফল-আউট থেকে। এই ফল-আউট হল বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয় ধুলো। এই ধুলো বিস্ফোরণের কারণে উপরে উঠে মিশে যায় বাতাসে। এরপর বাতাসের গতির জন্য তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উপর। আগেকার কথা এই তেজস্ক্রিয় ধুলো সমস্ত পৃথিবীকে বছরের একেবারে বেশি করে থাকতে পারে। এমন ফল-আউটের কারণে পাই-তেজস্ক্রিয় ট্রিনিয়াম বেশি কিনা ও উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শরীর দ্বারা শোষিত হয় এবং খাদ্য ও জলের মাধ্যমে ঢুকে পড়ে মানুষের শরীরে।

(ঙ) তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে নিরাপত্তা ঃ

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার, পাশ্চাত্যদেশে বোমা পরীক্ষা ইত্যাদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যার ফলে আজ চালু হয়েছে নতুন শব্দ 'বিকিরণ-দূষণ' বা Radiation Pollution। এটা ঠিক, মানুষ আজ পারমাণবিক শক্তিকে আপনিয়ন্ত্রণে করে তুলেছে, যদিও সারা পৃথিবীতে সব রকম পরমাণু-শক্তি সৃষ্টির কিরকে মানুষ প্রতিবাদও জানাচ্ছে। মানুষের সৃষ্টি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ আর প্রকৃতি থেকে নানান ধরনকারী বিকিরণে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া মারণ মূর্তি ধরে চলেছে, সে ধরণোন্মত্ত হলেও, তখন মানুষই বেরিয়ে সর্বোচ্চ কত মাত্রা পর্যন্ত বিকিরণ একটা মানুষের পক্ষে বিকিরণ স্পৃষ্ট (Exposed) হওয়া যায়, যেখানে জীবনেরহানি ঘটবে না। এই কারণে গঠিত হল ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অন রেডিয়েশন প্রোটেকশন অ্যান্ড মেজারমেন্ট (NCRP) এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন রেডিওলজিক্যাল প্রোটেকশন (ICRP)। বলে রাখা ভাল আয়নকারী বিকিরণের কোনোমাত্রাই কিন্তু নিরাপদ নয়, নির্দোষ নয়। তবুও এই দুই সংগঠন বিভিন্ন সময়ে বিকিরণের নিরাপদ মাত্রা বেঁধে দেবার চেষ্টা করেছে। ইংরাজীতে তাকে বলে—Maximum Permissible Dose (MPD), তাকে আমরা বলোয় স্বচ্ছন্দে বলতে পারি 'সর্বোচ্চ মঞ্জুরীকৃত মাত্রা'।

আয়নকারী বিকিরণ আবিষ্কারের প্রায় 35/36 বছর পর তিরিশের দশকের প্রথমদিকে বিকিরণ সম্পর্কিত একটা প্রথম স্বচ্ছতার শুরু হল। এই একটা প্রকাশ করা হোক। 1934-এর আগে MPD ছিল বছরে 100 Rem, 1934 তে NCRP এই MPD কে বেঁধে দিল বছরে 50 Rem এবং তা চলল 1950 পর্যন্ত ; কিন্তু প্রায় একই সময়ে 1935 সালে NCRP এই MPD-এর মান ঠিক করল বছরে 30 Rem আর সেটা চলল 1948 সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ একই সময়ে দুটি পৃথক সংগঠনের সুপারিশে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এরপর ICRP ঐ 1950 সালে MPD-এর মান নিয়ে এল বছরে 15 Rem-এ এবং তা অনুসৃত হল 1956 সাল পর্যন্ত। 1956 সালে MPD দাঁড়াল 5 Rem বছরে। কিন্তু 1991 সালে ICRP-এর সুপারিশে MPD হল বছরে 2 Rem বা 20 mSv (20 মিলিসিভার্ট)।

বিকিরণ থেকে নিরাপত্তা ব্যাপারে আমরা জনসাধারণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

(ক) যারা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ে কাজ করেন (পেশাগত) ঃ

এদের ক্ষেত্রে MPD-এর কার্যকরী মাত্রা হল বছরে 20 mSv, চোখের লেন্সের ক্ষেত্রে 150 mSv, হকের ক্ষেত্রে 500 mSv এবং হাত ও পায়ের ক্ষেত্রে 500 mSv।

(খ) সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ঃ

এদের ক্ষেত্রে MPD-এর কার্যকরী মাত্রা হল বছরে 1 mSv এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে MPD হল পেশাগত মানুষের মাত্রার দশভাগের একভাগ।

মনে রাখতে হবে, পেশাগত মানুষের ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে কিন্তু পরিবেশবিকিরণকে ধরা হয়নি।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতেই হয় যে, যারা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ে কাজ করেন, তাদেরকে বিকিরণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে নানানভাবে তৎপর হতে হয়। এদের ক্ষেত্রে সদাজাগ্রত নজর রাখার (Monitoring) ব্যবস্থাও আছে এবং কার কত পরিমাণের বিকিরণ স্পৃষ্ট পরীক্ষার ব্যবস্থাও আছে—প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে নির্দিষ্ট কাজ থেকে দূরে সরিয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বড়ই নিরক্ষর, বাচ্চাদের মত। কারণ প্রকৃতি থেকেই হোক আর মনুষ্য-সৃষ্ট বিকিরণ থেকেই হোক, সাধারণ মানুষ কিন্তু কতটা বিকিরণ-স্পৃষ্ট হচ্ছে, তা নিয়মিত মাপার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে।

(ঙ) শেষ কথা ঃ

মানুষ তার গবেষণায়, অভিজ্ঞতায় আজ স্থির নিশ্চিত যে, যত কমই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা হোক না কেন, তা কিন্তু জীবদেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবেই এবং তা চলতে থাকবে পরবর্তী বংশধারাতে। অথচ মানুষ পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে চলেছে, পারমাণবিক চুল্লির সংখ্যা বাড়িয়ে তুলবে, সেশীয় শক্তি প্রদর্শন হেতু পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা চালিয়ে যাবে—এমনটা চলতে কিন্তু ভারসাম্য নষ্ট হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেমে থাকবে না ঠিকই। বিজ্ঞানীদের এগিয়ে তে হবে, তার একশ শতাংশে নিরাপত্তার ভিত্তিটা, সুদৃঢ় পত্তির ভিত্তিটা, সুদৃঢ় হয়ে ওঠার ভিত্তিটা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে বিকলাঙ্গতা থেকে মুক্তি দেবার ভিত্তিটা। জীবনের সাথে বিজ্ঞানীদের হতে হবে কঠোর, মুকলনা, উদার, কোন একজন মানুষের কথা-ভাবে তাবলে চলবে না—ভাবতে হবে সমগ্র মানবজাতির কথা, উপেক্ষা করতে হবে আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতাদের অন্যায় নির্দেশ।

মনে রাখতে হবে, পারমাণবিক বোমার মধ্যে কিছু মাত্র নেই মানবিকতার সৌন্দর্য, বরং ধ্বংস ভাল, নেই-তথাগত পরিবেশও জীবনের কোন লক্ষণ ; জীবন তো আছে আমার আপনার চেতনায়, অনুভূতিতে, পৃথিবীর প্রকৃতির শোভায়।

ঋণ

সূত্র ঃ-

Atomic Radiation and Life-by Peter Alexander, 1965

Science Today—June, 1980

Walter and Miller's Textbook of Radiotherapy-by C. K. Bamford et al, 1993

Time—29 July, 1985

Radiobiology of Humans and Animals—by S. P. Yarmonenko, 1988

Science Reporter—Sept 1980 ; Feb 1987

Ideas and Opinions—by Albert Einstein, 1994.

ইচ্ছাপূরণের কত কথা

অনসূয়া রায়চৌধুরী

একটা দৃশ্য কল্পনা করা যাক—নায়ক এক অতি নগণ্য পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে—ঘাড়টা একটু বাঁকানো, ঠোঁট টেপা হাসি, হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করা। নায়িকা হেঁটে চলে যাচ্ছে—নায়কের দিকে পিছন ফেরা—ট্রেন ধরবে বুঝলেই—নায়ক স্থির দাঁড়িয়ে আছে তবুও। তারপর অস্ফুটে পরিচিত ভঙ্গিতে নায়কের ভাষাহীন স্বগতোক্তি—নায়িকার উদ্দেশে—"তুমি যদি আমাকে ভালবাস তাহলে তোমাকে পিছন ফিরে তাকাতেই হবে।" নায়কের ঠোঁটের কোণে পরিচিত দুষ্টু হাসি। নায়িকা কদাপত চলে যেতে থাকে। দর্শক রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায়—নায়িকা চলে যেতেই থাকে—নায়ক বলে ওঠে—"পজ—pause —পজ—pause—পজ" (অর্থাৎ বিনা পিছনে ফের—pause—পিছনে ফের—pause—পিছনে ফের) । দর্শক নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম—নায়িকা ট্রেনের দরজার একেবারে সামনে, নায়কের close-up—প-জ-প—দর্শকের হৃদয় ডুবে ডুবে আসে প্রায়—নায়িকা দরজায় হাতলে হাত রাখেই—ট্রেনে উঠবে বলে, নায়কের ঠোঁট চেপা হাসি—close-up—"প-জ-প"—দর্শকের হৃদপিণ্ড ডুবে ডুবে আসে—

কি হয় বলুন তো এরপরে? কি হতে পারে নিরানব্বই পারসেন্ট ভারতীয় চলচ্চিত্রে? কি আর হবে, তাই হবে যা হয়েছিল উপরোক্ত দৃশ্যটিতে। না, দৃশ্যটি আদৌ কাল্পনিক কোনো দৃশ্য নয়। ১৯৯২-৯৩ সালের দুপারহিট হিন্দী ছবি—দশ ফেলড়ার প্রযোজনা এবং আদিত্য ফেলড়ার পরিচালনায় "দিল ওহাঁনে দুনিয়া সে যায়েগে" ছবির একটি অত্যন্ত সুপরিচিত দৃশ্য এটি। নায়ক বহু কষ্টকৃত ভঙ্গিমাওসিসহ চিরযুবক শাহরুখ খান আর নায়িকা ফ্রেঞ্চকাট, ফ্রেঞ্চ ন্যাচারাল কাজল—সিংগাপুরের ঘ রাজ সিনরান—পটভূমি—ইওরোপের বিস্তৃত আদিগন্ত সবুজ মাঠ, বরফ-পাহাড়, ট্রেন, অভিজাত রাজপথ, বোহেমী ইত্যাদি। তো কি হল সেই শাহরোখকাজলি উচ্ছেদনাদ দৃশ্যটির শেষের?—কাজল অর্থাৎ সিমরান ওরফে বাচ্চের সেনিওরিটা ট্রেনের হাতলটি ধরল তারপর অপূর্ব স্মিত হাসি ঠোঁটের কোণায় ঝুলিয়ে মুখ ঘোরাল শাহরুখ অর্থাৎ রাজের দিকে—তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল রাজের ধরাছোয়ার—শাহরুখের close-up—আর ঘন ঘন সিটি মারা কান ঝালাপালা করাতলিতে ফেটেপড়তে লাগল প্রেক্ষাগৃহ।

পীড়াদায়ক শেষ—ভারোত্তোলন—বিস্ফোরণ—পরিবেশের সঙ্গে বড়লোকের দ্বন্দ্ব, সব নায়ক (এমনকি অন্যায় যদি কিছু করেও সে, তার জন্য যথেষ্ট justification মজুত থাকে হিন্দী ছবিতে) গ্রামী নায়ক—পরিশ্রমী নায়ক—গরিব নৃত্যপটু নায়ক—বৈভব—সুন্দরী স্বল্পবাস নায়িকা—সরল কুবেরাণী, ধনপতি, মন্ত্রী, আলসা.—মিলন—রোমান্স—রোমান্সোত্তর—দ্রুত আত্মোপলব্ধি—সর্বসেরা পুরস্কারে নিপুণা মা—ধর্ম-ভক্তি ইত্যাদির মিশ্রণে তৈরি হয় ইচ্ছাপূরণের বকটেল। দর্শক তাই পান করে—গেলে—রীজ করে আর ঢেকুর তোলে।

আমরা জানি সাত পৃথিবীর মধ্যে ভারতে বছরে সব চাইতে বেশি সংখ্যক সিনেমা তৈরি হয়। লক্ষ এবং কোটি টাকা ঘরে তৈরি হয় এই চলচ্চিত্র। মৌলানুষ্ঠিকভাবে পত্রাঘাতের দশক থেকে এইসব চলচ্চিত্রের মধ্যে মুটো বড় ধরনের চরিত্রগত বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ দর্শকের ভাষায় তা হল Art ফিল্ম আর Commercial ফিল্ম অথবা ফিল্ম। অনেক বা সমর দর্শক নাগাদ এই ভাগাভাগিটা আরও একটু সরলীকরণ হল, তৈরি হল এক অদ্ভুত শব্দ—middle of the road cinema আর একেবারে বাজারি বাণিজ্যিক ছবিগুলিকে Commercial ফিল্ম নামের বদলে একটু Elite গন্ধ উপহার দেওয়া হল—নতুন নামকরণ হল—Main Stream Cinema আর Art film-কে কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করলেন parallel cinema. এই নামকরণের হেরফের নিয়ে বাজারবাহিকতা আছে, ইতিহাস আছে—কিন্তু যাঁরা প্রতিদিন চায়ের টেবিলে এই সব শব্দ উচ্চারণ করে তুফান তোলেন তাঁরা জানেন না সেই পারম্পর্যের কথা, শব্দগুলো যখন এসেনি, যখনসবগুলি তাদের সম্বন্ধে বলা করতে হয়েছে। তবে এই যে তিন রকম ভাগাভাগি এসব ফিল্ম তাবতবর্ষে সাধারণভাবে সিনেমা হলের দর্শকদের আগ্রহী জানা নেই, জানার প্রয়োজনও নেই। তাঁরা বোঝেন কেবল অর্ট ফিল্ম আর কমার্শিয়াল ফিল্মের তফাতটাই। আর বোঝেন অর্ট হল তাই যা বোঝা যায় না, কমার্শিয়াল হল তাই যা অবশ্য আনন্দ দেয়, তৃপ্তি দেয়, বেশিরভাগের বোঝার এক কথায় বিনোদন দেয়—মনোরঞ্জন দেয়। এই সব প্যারালাল, মিডল অব দ্য রোড, মেইন স্ট্রীম—এসব হাজার ভেজেন না, জানেনও না, জানার এইগুলি intellectualদের বিষয়।

যাই হোক, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়ে আসা যাক—যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে তথাকথিত বাণিজ্যিক ছবির এই বিপুল জনপ্রিয়তার পিছনের ফোর্মুলা কথাটি একলাইনে জানাও—তবে নির্দ্বিধায় তার উত্তর হবে ইচ্ছাপূরণ অথবা wishful filment. যদিও জানি বিষয়টিকে এই মুহূর্তে অথবা অত্যন্ত ক্লিশে মনে হচ্ছে, তবু দু-চার কথা বলার লোভ সামলাতে পারলি না। অথবা সমাজের উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বর্তমান শুধুমাত্র তাই নয় বহু মানুষের রুটি-রুজির সুযোগে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সেলুলয়েডের ফিতে ঘোরে সমগ্র জনজীবনের পরিবেশে চলচ্চিত্র যাচ্ছে এইসব

ইচ্ছাপূরণ প্রসঙ্গে নৃপাল নেহরুর একটি জনা কথা একটু উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না "...তবে একটু পেরিয়ে যাই সেই 'ফরিদ'-এর কথা সময়ের। মূল কাহিনী রমাকান্ত চৌধুরী। ছবির শে শাহরুখ ফোলোকে পুড়িয়ে এসে ট্রেন থেকে না আসা বুড়ো কাশ পাতার একজন ফেরে নিয়ে যি আসে গুরুদ্বারায় বসিয়ে। সবার মতন্তর চৌকাঠ ডিঙি এক রহস্যময় অনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড সেরে (যা নি শাহরুখবাহিনীর কল্পনায়) বাপ বিদি ফেরে ফোলো ঁ যায় গুরুদ্বারার ঘাসে, মুখোমুখি উপায়, দর্শকও হয় সেই মুহূর্তে এক অজানা আশঙ্কায় ফোলো কিছুর প্রতীক্ষা করে থাকেন। গুরুবাণী, গুরুবাণী ও ঁ শিখসন্তানের কাছে কিসের নিয়ে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে ফোলো ফেলের বাপ। নিশ্চয়ই, বিনা দ্বিধায় এবং একলাফে ছবির শেষ।

অথবা কয়েকদিন ছবিঘরের লাইন দেখ অসংখ্য পাঁচ-সাতবার দর্শক এবং উঁচুর শোয়ের শে আছে কিছু মানুষ আসার আগে অনুরোধ করেন, কেউ পাগার, কেউ বা রিকিং কিনিত হয়ে প্রশ্ন করতে আমাদের এইভাবে হতাশ করবেন কেন। বাপার কিসের গুরুদ্বারায় কয়ে মুটো চড় মারতে পারলেন নৃপালে। একটি প্রশ্ন বেশ কয়েকজন শুনতে আমাকে। একটি জবাব দিয়েও আমি, কারণ : চড় ফোলো আমি, ফেলেন আপনারা, শরীরে ব্যথা হ করতে পারছেন না।

এইখানেই আমাদের, শহরের মধ্যবিত্ত উচ্চ মানুষের, ইচ্ছাপূরণের চেহারাটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। অ বাপের চড় মারাটাকে দর্শক সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করে খুশি হচ্ছেন, পরিচালককে অভিনন্দন জানাচ্ছে শোক বাপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বৈপ্লবিক সত্তাকে তুলে ধ জন্য। আর এই কাজটা করাটাকি করে যে কোনও হ অতি সহজেই পেতাম তা পেলাম না। পেলে আমা আমার সুবিধে হতো ঠিকই, জনপ্রিয়তা বাড়ত, ি ফোলাতে হত বাস্তবতাকে। এবং তারই সঙ্গে দর্শকে একটা বড় সুযোগের ক্ষতি হতো যা আমি মোটেই চা এবং চাই না। অর্থাৎ দর্শক সেক্ষেত্রে অবাস্তবিক পো তীব্র এক যন্ত্রণা থেকে, সমাজের মধ্যে থেকেও পাপবোধ থেকে মোটই পেতেন। মোটই পাননি 'অরি এর লেখক, পেতে চাইনি, এবং আমিও লেখ অনুপস্থিতি হতে পেরেছিলাম হয়তো।"

এতো গেল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-প্রসূতজনিত চাহিদার কথা। কিন্তু অনেক সূক্ষ্মস্তরে ইন্দ্রিয়পূরণের পর্যে পা ফেলার জন্য অনেক গভীরতর ইন্দ্রিয়পূরণের দিকে ফিরিয়ে দর্শককে টেনে নেওয়া হয়, তার একটা উদাহরণ মনে পড়ছে—যে কোন ভারতীয়কে জিজ্ঞেস করুন—গত কয়েক দশকের মধ্যে সব চাইতে জনপ্রিয় হিন্দী ছবি কোনটি —উত্তরটা অসংকোচে কোনরকমে একবাক্যে এবং তাহলে—"শোলে"—সিনি জোড়াকলমের এই ছবিটি নানা কারণেই আজ ইতিহাস। কিন্তু আমরা আজ কথা বলছি ইন্দ্রিয়পূরণ নিয়ে। ছবিটির শেষে খুব অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে। আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়পূরণের যেন Co-relation ঘটনাটির সঙ্গে নেই, তাই বেশিরভাগ দর্শকের চোখ এবং মন দুই-ই এড়ায় স্বাভাবিক অনায়াসে। ছবিও একেবারে শেষ দৃশ্যে ট্রেনের ভায়লেন্স বর্ধেন্দ্র-হেমমালিনীর মিলন দৃশ্যের মত বুদ্ধিহীন-ছিন্নে-গতানুগতিক হিন্দী-ফিল্মীর ইন্দ্রিয়পূরণের ঘটনার চাইতে নিচে অবলোকিত ঘটনাটির সামাজিক অভিঘাত অনেক সুদূরপ্রসারী। ছবিতে খুব সূক্ষ্ম একটি স্তরের সম্পর্ক দেখতে পাই আমরা অমিতাভ বচ্চন আর জয়া ভাদুড়ির মধ্যে। জয়া ঠাকুর সাহেবের ছোট পুত্রবধূ—স্বামী দুর্ঘটনার মৃত—এরপর কাউকেই মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। সারা ছবি জুড়েই জয়া-অমিতাভের মধ্যে খুব নিচুস্তরে একটা ফ্লিরটেটিভনেস চলে যা দর্শক মনে সুন্দর প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে সমর্থ হয়। ছবি এগিয়ে চলে অন্য নায়িকার সংযোগের পাশাপাশি বর্ধেন্দ্র-হেমার সেন্সরের পরিধি ছেড়ে দেখতে দেখতে। ছবির শেষে ধর্মেন্দ্র-এর মৃত্যুর সময়ে সংঘর্ষে অমিতাভ জখম মারা যায়। হয়তো ছবির সামাজিক পটভূমির সূত্রে অমিতাভের মৃত্যু ব্যাপারটা যথেষ্টই logical, তবু এখানেই কিন্তু শুরু থেকে আসছে। আপাতদৃষ্টিতে জয়া-অমিতাভ মিলন হয় না যার বিশ্লেষণ মানেই দর্শকের ইন্দ্রিয়পূরণের সম্প্রতি। কিন্তু শেষের দর্শকমন কি একটিবারও ভেবে দেখেছেন যে জয়া ভাদুড়ি ছবিতে ছিলেন বিধবা। ভারতীয় দর্শকমন, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো—অমিতাভকে যদি সিনিয়া যদি মিলিয়ে দিতেন, তাতে অবশ্য ছবির শেষটা অত ট্রাজেডির হত না এবং অমিতাভও পুরো ছবিটা জুড়েই দর্শকের মনে অতখানি glorified হয়ে থাকতে পারতেন না, তবু তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়াই যাক যে শেষে অমিতাভ বেঁচে উঠলেন, তাহলে তো জয়ার সঙ্গে তাঁর মিলন অবশ্যম্ভাবী—মেনে নিতেন আপনারা নিশ্চয়ই।? মাথার আকুল বিশ্বাসাসার মতন আর আলোর বিতর্কিত উনিশ শতকীয় মনস্তাপরণ। তাই অবশ্যম্ভাবি ছিল অমিতাভের মৃত্যু—দর্শকের বুক নেচড়ানো কান্নার সঙ্গে ছবিটির সুপার-হিটের টিকে থাকা। এর সঙ্গে কিন্তু Intellectual দর্শকদের জন্যে পাওয়ার মতো উপকরণটিও তৈরি করা হয়েছে—মৃত অমিতাভের সামনে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন জয়া—সদ্যবিধবাদের মুখে ভাষা জোগে, তিনি কিনা সম্পর্কে জয়ার শ্বশুর। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কি দুর্লভ নমুনা।

এ বিশ্লেষণে ইন্দ্রিয়পূরণ ছেড়ে দেওয়ার একটি উদাহরণ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে—সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিক ছবির শেষে শাবানা আজমীর কৃতকর্ম অনুভব করার পর সুকন্যা (শর্মিলা ঠাকুর)-র অভিমান অপনোদনের পরম মুহূর্তে সত্যজিৎ-মেটাফিজিকটেস, কিন্তু ছবির সমগ্র মানসগঠনে, সমস্ত দর্শক যখন একটা উত্তেজনার পরিণামে, তখন পরিণতির নির্লিপ্ত (অথচ অবাধনকরণেই লিপ্ত), তন তন সুর তাঁকে এবং নিশ্চয়ই ঘড়িটি ছুঁড়ে ফেলে ফুলে টেবিলে রাখা—দর্শককে অমূল নাড়িয়ে দেয়।

ছবিও অপরাজিত, নায়ক, অবতারের বিবরণি, অভিনয়কলা তত্ত্বানক Restrained সত্যজিৎই যখন অপুর সংসারের শেষ দৃশ্যে বাচ্চাদের কাঁদিয়ে কয়ে অপু কেনী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে হাজির করেন তখনই দুনিয়ার মুখ ঘটে যায়।

সত্যজিতের পরিশীলিত শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্য একই সময়ে ছবি করেছেন ও কি ঘটে। অপরিমিত, ঘাবেদনময় কিন্তু সামাজিক মানা তত্ত্বাতীত প্রতি ঘৃণায় তরপুর মানবিক সম্পর্কের অবগাহনে মুখর—বিভিন্ন, ঘনের জীর্ণ অন্ধ সততার উজ্জ্বল ঘ বিকের দর্শকরা ছুঁড়ে ফেলেছিল, হজম হয়নি। অথচ এখনও অযোজন এ ঘরিচের মতই চিরন্তনকাল জন্যগ্রহণের, সাধ্যাপরিষ্ঠ সেলুলয়েডের আবর্জনাতে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য।

দর্শকের ইন্দ্রিয়পূরণের আকাঙ্ক্ষার সব চাইতে বড় উদাহরণ হল ভারতীয় সিনেমায় অমিতাভ বচ্চনের উত্থান, বৃদ্ধি, বর্তমানে জীবন কিংবদন্তী হয়ে শীর্ষে অবস্থান এবং মূলে যাওয়া চামড়া, কপালের উপর পড়ে থাকা হাসকের পক্কতা সহযোগে এখনও কৃতিহীন, দুনা সব cinema-র প্রধান চরিত্র হিসেবে প্রত্যাবর্তনের দুঃসাহসে না স্পর্ধা। স্বাধীনতা-সেনাগ্রাম-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তড়িনক হতে-পড়াজুক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আজে আজে মানুষকে এক অদ্ভুত সংঘেদের অবস্থার মধ্যে টাঁচ করিয়ে নিয়েছিল যা মানুষের ব্যক্তিগত-সামাজিক সবরকম অস্তিত্বকেই আমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল বিরাট বন্ধনের এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়—এ সমস্তই বর্তমানে প্রত্যক্ষেন, বলা বাহুল্য যার যে ক্রমশঃ এই সমস্ত সংকট তার সঙ্গে রূপ বদলে আর তাদের আরও জটিল হয়ে উঠেছে। '৪০, '৫০-এর দশকের যে অস্থিরতা তা চরম রূপ ধারণ করেছিল '৬০-এর দর্শকে সারা পৃথিবী জুড়েই প্রকটভাবে। এই সময়ই অমিতাভ বচ্চনের উত্থান চলচ্চিত্রাকাশে। মানুষের রূপ-ভেঙে-চুরমার, সংকট অমিতাভ বচ্চনের 'larger than life' চরিত্রায়ণকে যাঁকড়ে ধরে মুক্তি পেতে চাইল। আসলে এখানেই একটা মস্ত বড় ফাঁকি হয়ে গেল, যে ফাঁকিটা অনেকে ধরতে পারেন না, অনেকে ধরতে পারেন—কিন্তু প্রায় সবাই-ই ফাঁকির বেড়াজালে বন্দী হল প্রতি মুহূর্তে। মানুষ একই সাথে তার অক্ষম-কিংকর্তব্য-বিদ্রোহ-প্রতিবাদের অবাস্তব প্রতিফলন পর্যায়ে দেখতে পেয়ে খুশি হল, আবার এই সব সংকট হতাশ থেকে পালিয়ে তিন ঘন্টার জন্যে যাঁধারীর ছায়ে মুখ লুকোতেও চান। আর আশ্চর্যজনকভাবে ভারতীয় সংস্কারগ্রস্থিত সিনেমা-দর্শককে প্রতি মুহূর্তে এই দুই উপাদানের সমন্বয়েই নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হয়। আসল কথা হল একটা উত্তেজনা-নেশা। তা কখনো আসে পরীর ছবিতে হয়ে, কখনো খুন অথবা অন্যান্য chemical ছবিতে হয়ে, কখনো মিশ্র-সংস্কৃতি ছবিতে হয়ে। পরিমাণটা একটা।

বর্তমান বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মানুষের জীবন সংকটের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে যৌন মূল্যবোধ আশ্চর্যজনকভাবে এবং এটা সমস্ত পৃথিবীতেই একেবারে সমূলে বিনাশ পাওয়ায় তাই এ এক অবস্থার সময় তাই অতিমাত্র বচ্চনের স্রষ্টা প্রতিবাদী এক জীবন বিমুখ সব সমস্যা সমাধানকারী চরিত্রের পাশাপাশি মার্কেটীয় mass stream সিনেমায় অযোজন হচ্ছে নানা সূক্ষ্ম-জটিল ইন্দ্রিয়পূরণের উপাদানের সুকৌশলী অযোগ (অবশ্য middle of the road অথবা তথাকথিত Art film-এর বেশিরভাগ আলাই এর থাইরে নয়, শুধুই অযোগের প্রকরণের মাত্র) যা অমিতাভ বচ্চনের প্রয়োগ ক্ষমতাকে বাহ্যিকভাবে না হলেও আরও গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে হারিয়ে দেবেই। আসলে সবই হচ্ছে, হয়ে চলে—মানুষ এক অদ্ভুত বিজিজ্ঞাসার শিকার আজ সব ক্ষেত্রে—"যেন কেউ রক্ত মাংসের মানুষ নয়, প্রত্যেকে ছবার ও প্লাস্টিকের পুতুলের মত একটা জ্যোতিক শক্তির কিরায় চলে ফিরে বেড়াচ্ছে—বিলিত হচ্ছে—বিনিময় হচ্ছে—ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরছে তো ঘুরছেই। দেহের সঙ্গে দেহের ঘাত প্রতিঘাতে অটোমেটিক যন্ত্রের মত ঘুরছে। লক্ষ মানুষ চলছে নির্বিকার, উদাসীন, যৈবিক আন্তরকার চিন্তায় নিমজ্জিত। হয় অমিনের দিকে না হয় ঘরের দিকে চলছে। এমন সময় হঠাৎ হাহাকার চলন বাসে উঠতে গিয়ে একজন মারী পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বিশ হাজার লোকের ভিড় জমে গেল। পলার শিরা ও চুলের আসল ফুলে উঠল। একজন, দুজন, তিনজন ক্রমে গুড়ে গেল। ট্রাফিকার, কন্ডাক্টর আবার অবস্থার ভালোয়ালে গেল। আশপাশের দোকানপাট লুঠ হল, পুলিশ এসে টিয়ার গ্যাস ছাড়ল, গুলি চালাল। অনেকে আহত ও চারজন নিহত। রাজনৈতিক নেতারা প্রচুর শব্দ করে বক্তৃতা দিলেন, ঘনতার কাঠে বক্তৃতার মত নিনাদিত হল 'তদন্ত চাই', কমিশন বসল। তদন্ত হল। কাগজে রিপোর্ট বেরোল। কত দিন কাগজ লাগল কেউ তার খোঁজ লাগল না, রিপোর্ট কেউ দেখল না। কারণ সেকথা তখন আর কারও মনে নেই।" (শ্রীবিনয় ঘোষ) অনিকের উত্তেজনা সব। প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার জন্য উত্তেজনা চাই মানুষের খাদ্য, তাই কাজটা গৌণ হয়ে গেল—উত্তেজনাটাই আসল। আর এ সবই অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের মত চলচ্চিত্রের অবক্ষয়ের ও চলচ্চিত্র। এই সময়টাতে বুঝতে পারলে তাই মানুষের ইন্দ্রিয়পূরণের আকাঙ্ক্ষার এই যে ক্রমিক পুনরাবৃত্তি তার জনপ্রিয়তার কারণকেই খোঁজা যাবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের কবি শ্রীশঙ্খ ঘোষের কিছু লাইন মনে পড়ছে—"হলফিল দত্তা তা আমাদের দেখাচ্ছে এমন একটা আদেরেমিক রোগগ্রস্ত আর অস্বাভাবিক সুস্থিরভাব যে জীবনযাপনের একেবারে মাইরের মৃত্যুকেই দেখতে পাই আমরা, ভিতরের দিকে তাকালে আমাদের অপার আনন্দ বা অনিদ্রা। যে কোনভাবে দৈনন্দিনকে কাটিয়ে যাওয়াই আমাদের পরম লক্ষ্য, নিজেদের সমূহ অপকর্মের মুখোমুখি না দাঁড়াবার আমরণ চেষ্টায় আমরা কতগুলি উত্তেজক নেশা ধরনো আকড়ধরে খুঁজে বেড়াই, যার তখন সেই গান, সেই লেখাই আমাদের আপনারের মনে মনে হয় যেখানে এই সব মুহূর্তের উত্তেজনা আছে..."

আমার এতক্ষণ ধরে এই পালিয়ে বেড়ানোর কথাই বলছিলাম, তারই মাঝে এই মুহূর্তের উত্তেজনা। আর জীবনের এই মাইরের মুখটা দেখে দেখেই আমরা নিজেরা আরও কখনো গানে, কখনো লেখায়, কখনো

নাটকে, কখনো সিনেমায়। যার ভয়ঙ্কর ছাপার চেষ্টা তা হল এই সমস্ত কিছু নিয়েই পরে ক্লাইম্যাক্স ছুটে চলেছে গ্রামের দিকে—তাকে গ্রাস করে নেবে বলে। অন্ধকার গ্রামের জন্য আলাদা আলাদা কিছু চলচ্চিত্রের প্রস্তুত হয়—সেগুলির বহিরঙ্গের ভূগোল, perversion-এ আকাঙ্ক্ষিতরূপেই আরও অনেক বেশি।

দর্শকের ইচ্ছাপূরণের খাতিরেই অন্য নানা আয়োজনে ভরে থাকে আমাদের চলচ্চিত্রের জগৎ। অকল্পিত কিছো, অকল্পিত যৌনকাঙ্ক্ষা, অকল্পিত বৈভব বাসনা, অকল্পিত সমস্ত কিছুরই সৃষ্টি ঘটে এই সব সিনেমা দর্শনে। তাই নায়কের অতি সাধারণ ক্ষমতা-মারামারি-এমনকি সততা, নায়ক-নায়িকার মৃদু ঝঞ্ঝাবিহীন বৈভব-প্রেম, নায়িকার অর্ধনগ্ন শরীর সবই নিয়ত দর্শককে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার এক স্বপ্নময় জগতের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। আবার এক একটা সময় আসে যখন এক ধরনের ছবির রমরমা বাজার থাকে। যেন বেশিরভাগ সময়ই ফেলাগৃহ ভাগিয়ে চলে এককেন্দ্রিক-ভায়োলেন্স-সেক্স ভিত্তিক প্রণয়ন্ত ছবির বাজার। কখনো এগুলি একঘেয়ে হয়ে গেলে দর্শক ছাড় হবে, তখন আসে রোমান্টিক প্রেমের সিনেমার হিড়িক—পরীক্ষ নায়ক, ধড়ফড়াক নায়িকা অথবা উল্টোটা—পারিবারিক দুই দলে-পেয়ে মিলন (কখনো কখনো আবার একটু ছকের চারপাশ কাটিয়ে চমক আনা হয় কাপিলিক সাফল্যের স্বার্থে যেন কখনো সে কখনো তবু—OSOT অথবা আরও কিছু বছর আগে এক যুগকে নিয়ে এক অন্ধকারিতভাবে ছবি মুলাবহিত।) এই সব মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মবিশ্লেষী প্রয়োগ এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন - পরিচালকদের মুক্তির প্রশংসা করতেই হয়। তবে main stream হিন্দী ছবি তার যেন কিছোন কিছুন অজানার কারণে যে পরিমাণ সূক্ষ্মভাবে এই উপাদানগুলিকে দর্শকের মনে ঢুকিয়ে দিতে পারেন (যদিও সব ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে নয়), সাদৃশ্যের আর অজানার কৃত্রিমতনের কলে আঞ্চলিক ছবিগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অত সূক্ষ্মতা প্রয়োগের সুযোগ থাকে না, অর্থেই ঐগুলিতে perversion-টা থাকে অনেক প্রকট এবং স্থূলভাবে।

একসময় আঞ্চলিক বা main stream হিন্দী ছবিতে (যেমন, বাংলার ক্ষেত্রে উত্তম-সুচিত্রা জুটি এবং সমসাময়িক বা তার আগের বেশির ভাগ হিন্দী main stream ছবির কথা বলছি) ইচ্ছাপূরণের প্রয়োগ বা প্রকাশ যেমনটাই এটা অতিকর ছিল না। মূলতঃ পুরুষ-নায়ীর প্রেম এবং সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব এসবের মধ্যেই ছড়িয়ে থাকা রোমান্টিক পরিবেশিত তলিয়ে দর্শককে ইচ্ছাপূরণের সর্পিল আবার তবে রাখা হত তখন। এর কোন ব্যতিক্রম কিছ ছিল না তা নয়, তবু তা অনেক কম এটা বলাই হবে। কিন্তু '৬০-'৭০ দশক থেকে শুরু করে '৮০-'৯০-এর দশকে ব্যাপকভাবেই ইচ্ছাপূরণের ছবির গতি -প্রকৃতি যা দেখেছি তা রীতিমতন ভয়ঙ্কর এবং আশঙ্কাজনক। যেমন, নায়ক—এক সফল্য সমাধানের খোঁজ অন্ধ থেকে হিন্দী main stream সিনেমা থেকিয়ে আসে মূলতঃ Raj Kapoor-এর Bobby-র হাত ধরে অন্যান্য সোজাসাপ্টাভাবে। তারপর '৮০-র দশকে এসে তেরী পাতা মৈলী-ফ্রেন্ডশিপিনির ঢাল তলে মৃদু মেশাতে মেশাতে দর্শকের মৃদু উত্তালিত যেন বাঁচুনি আর কাউকে কাউকে গ্রাস করে নেয় অপরিচিত প্রতিটি।

আমরা এই ক্রমের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। '৯৪-'৯৫ সালের সুপারহিট হিন্দী ছবি (বাকি আলাপনায়) HAHK যখন প্রথম আপনার হাতে কোন ফেকে কিছু উপাদান দেন একটা ছবিটি আপাতদৃষ্টে মধ্যবিত্তের ইচ্ছাপূরণের ছবি। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে হয় যখন ওটি ছবিটির লন্ডনে শেষদৃশ্যে ভূমিকি হয়েছে। (যার জানেন নিশ্চয়ই, ছবিটির কাহিনীবর্ণন অবশ্যিকতার মাধ্যমে হয়েছে। প্রযোজক-পরিচালক ছবিটিতে পরে একধিক গল্প যুক্ত করে দিয়েছিলেন—এর পিছনে আমাদের ধারণা যে ব্যবসা-বৃদ্ধি অন্য করেছিল তা হল দর্শক বিচ্ছিন্ন, তৃতীয়বার ছবিটি দেখতে হলে আসবেন। বৃদ্ধিটিকে অপারবৃদ্ধিতে ভুল মনে হলেও আমরা বিশ্বাসের সীমাপার করে যাই যখন ওটি তাদের prediction সত্যিই হয়েছিল—হল উপচে পড়েছিল যাদের মেজ দর্শকের ভিড়ে। তারপরের অন্যান্যদের এমন অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কোন সমাজতাত্ত্বিকও করতে পারতেন কি না সন্দেহ।) কিন্তুতেই বুদ্ধিকভাবে মেলানো যায় না লন্ডনে ছবিটির এত জনপ্রিয় হবার কারণ—কিন্তু অচিরেই উত্তর মেলে। পরিচালক সুরজ বরজাত্যিয়া বলেন,—"We may wear jeans and sport Nike shoes, but we as Indians also end up making the yearly tips to our holy sites too. So despite the cosmetic changes, we Indians, at heart, have remained the same." আশ্চর্য নয়। অথবা তিনি আরও বলেন—"It is a very Indian film and nice have gone back to our culture, our traditions and it is an expression of our love to our indian traditions for reference point in the film."

আমরা এই ছবি ঘুরে একদিকভাবে জিন্স, স্পোর্টস শু সুলভ আধুনিক জীবনের সঙ্গে সমানতালে, ট্রাডিশনের পরিচয় মত মিশ্রণের সহযোগে একটি 'ভারতীয়' ছবি বানাতে সমর্থ হয়েছেন। এখন আমরা ছবিতে ব্যবহৃত ভারতীয়ত্বের উপাদানগুলিকে একটু বিস্তারিতভাবে আলার চেষ্টা করতে পারি। মূর্তি পরিবারও—একটি একান্নবর্তী, অথবাটি ছোট—কিন্তু আকারে কাছাকাছি। বড় পরিবারটির বড় ছেলের সঙ্গে ছোট পরিবারটির বড় ছেলের বিয়ে হয় সমান্তর করে। সেই মেয়েটি অর্থাৎ পূজা যেন বিয়ের জন্যই তার ভারতীয় অনায়াস দক্ষতা-কুশলতাগুলি মূল্য হেবে প্রতীক্ষা করে বসেছিল। অনায়াসে সার্থক গৃহিণী এই পূজা ছেলের জন্য বিয়েই মুক্তিনামিত কারণে মারা যায়। পূজার ছোট ছেলে আধুনিক, স্মার্ট, সুদর্শন, আকর বরজাত্যার পারদর্শী নিশার ছেলে ছিল এই বড় পরিবারেরই ছোট ছেলের সঙ্গে সেও আধুনিক, স্মার্ট অর্থাৎ দুজনে একেবারে দিগন্তরের বিজ্ঞাপনের মত made for each other. অনুকরিত সেই ছেলের কথা না জানার কারণে পূজার মৃত্যুর পর সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় পূজার স্বামী রাজেশের সঙ্গেই নিশার বিয়ে হবে—আসল রাজেশ-পূজার একমাত্র পুরস্কারের মা ওল্লেখন। এমনকি নিশ্চ এবং নিশার প্রেমিকও তাদের সম্পর্কটে sacrifice করবে বলে ঠিক করে যেন পূজার সন্তানের স্বার্থে, কারণ পরিস্থিতির সংকেত। এইরকম সমস্ত অবশ্যিকভাবে রাজেশের কাছে কোনভাবে উপস্থাপিত হয়ে যায় এই সম্পর্কের কথা। তখন ধরতেই বাজেশ গাঁড়িয়ে থেকে ভাই-এর সঙ্গে নার্সের বিয়ে দেয়—মহৎ আত্মত্যাগ! এবং আধুনিক অথচ গৃহকর্মে নিপুণা মার্সি cum কার্সিয়ার হাতে তুলে দেয় তার একমাত্র পুত্রসন্তান। যারা পুরুষের পক্ষে গৃহস্থালী এবং সন্তান পালন কি না নিয়েই অসম্ভব কাজ। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই শাশ্বিকে বিয়ে করতে রাজি হওয়াটাই নয়—তা মৃতা স্ত্রীর কথা মনে রেখে মুখটা একটু দুঃখী-দুঃখী করে রাখলেই সমস্ত সহানুভূতি পাওয়া যায়! এরপরে সমস্ত এই ছবিতে যুক্ত হয় বিবিধ আচার-পরীক্ষা অনুষ্ঠান যাতে আকাশ-সৃষ্ট-ঘটিত মায় আধুনিক যুবক-যুবতী সবাই অংশগ্রহণ করে সানন্দে। কারণ তারা নিজস্ব ট্রাডিশনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল! কিন্তু স্ত্রী আচারগুলিও বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে দীর্ঘ নাচ-গানের দৃশ্যের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করা হয় সমস্ত ছবির মধ্য দিয়েই সন্তানে ভারতীয় চিত্র পরিবারত্ব তথা পুরুষতন্ত্র—সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ নারী-পুরুষের অবস্থান সমস্ত কিছু সম্পর্কে ট্রাডিশনাল ধ্যান-ধারণাকে পক্ষ করা হয়েছে। তার পাশাপাশি নি আর তার ফ্রেন্ডদের প্রেম জীবনযাপন সব কিছু সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত উপস্থিত হয় আধুনি জীবনযাত্রার নানান অনুষঙ্গ। যা প্রতিফলিত হয় নিরবচ্ছি ভোগবাদের মাধ্যমে। এইসব কিছু ছবিতে সহজ স্বাভাবিক-সাধারণভাবেই উপস্থিত হয়—যেন এসে একটি পরিবার দেখতে দেখতে দর্শক মনে একরকম প্রীতি তবে এ ছবি সমালোচনাই আধুনিকতার আড়ম্বর এ সঙ্গে সঙ্গে সনাতন পরিবারতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসমন্বয়ে শ্রদ্ধাশীল। তাই নিশ্চ jeans পরে কিন্তু ধর্মিতর হ গান বা কখনোই ধর্মিত সে ইউরোপিয়ান এসবের পাশাপা যুক্ত হয় নিশ্চ ওকে আধুনি দীক্ষিতের সৌন্দর্যের সাধা এক অদ্ভুত মেলবন্ধনের তৈরির চেষ্টা। এর মেতেই (বন্ধুকন্যা কিনা হলেন 'কিনা' হয়ে যাওয়া)। এইভাবে সূরজ বরজাত্যিয়া ভারতীয় সাধারণ দর্শকদের জন্য মুসাহেবদের ফাঁদে আটকে যেন আর নিশ্চর সৌন্দ খোলা পিঠ, আধুনিক জীবনযাত্রার সম্ভার, শোপ্ প্রশাস্ত, রঙিন প্রেম সর্বোপরি পারিবারিকতার ম্যা লন্ডন আর ভারতের উজবর্ধির দর্শককে বে গেলেছে। মানসিক নাম্য ইচ্ছাপূরণের ভবন সীঁ পৌঁছে যাই আমরা।

একেবারে শেষ হল আমাদের ইচ্ছাপূরণের কত ব অথবা কতকথা। এরপর আর কিই বা বলার থাক পারে—কেবল সমস্ত কথাগুলির মধ্যে মাত্র সোজাসাপ্টা ধার—পিছনের দিকে এগিয়ে যান, সামনে পিছনের দি এগিয়ে যান—এগিয়ে যান—এগিয়ে যান—পিছ পিছে...

সাহায্য পেয়েছি।

১) মেট্রোপলিটন মন-মকবিত্ত-বিদ্রোহ ঃ বি ঘোষ

২) ঐ পঞ্চ ঘোষের একাধিক রচনা

৩) পুরনো কথা, নতুন ভাবনা। দুপাশ সেন-। ১৮ই এপ্রিল ১৯৮৭

৪) জনপ্রিয় ছবি, ছবি জনপ্রিয়তা ঃ হায় আল্ লায় কোন—একটি পাঠ। নিলাদ্রিয় সেন—এপ্রি ১৯৯ কলকাতা—জানুয়ারী ১৯৯৬

৫) ঐ তাপস পত্রিকা।

শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ভারতে আজ পরীক্ষা-নিরীক্ষার খেলা চলছে। যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসছে তারা তাদের চাপিয়ে দেওয়া মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদান হিসাবে হাজির করছে। ফলে বিষময় ফল পড়ছে ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বলতে গেলে সমাজের সব মানুষের উপর। এখান থেকে মুক্তির উপায় এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না। কারণ ভারত জুড়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙচুর চলছে। বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে ভারত। এই মুহূর্তের শিক্ষাকে নিয়ে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার অভিজ্ঞতা এই নিবন্ধে লেখক তুলে ধরেছেন।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সমাজ

পরেশ বসু

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষা প্রক্রিয়াকে তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করেছেন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সমাজ। এই তিনটি ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিক্ষা কাজটি সম্পূর্ণ হয়। উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশে, সমাজের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিক্ষার্থী সকলে পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমরা জানি শিক্ষাই সামাজিক প্রগতি ও পরিবর্তনের ধারাকে অব্যাহত রেখে পুরাতন সামাজিক সংস্কারগুলিকে সংশোধন করে এবং আমাদের সামাজিক চেতনা ও সমাজসচেতনতাকে জাগ্রত করে অগ্রগতির যবনিকা ঘটে, যথার্থ সমাজ জীবনের বিকাশ।

জীবনের অন্যতম চাহিদা হল সক্রিয়তা। প্রত্যেক শিশু বা শিক্ষার্থী চায় স্বাধীনতা এবং সক্রিয়তা। তারা দেওয়ালের গণ্ডীবদ্ধ সংকীর্ণ জীবনে তারা আবদ্ধ থাকতে চায় না। হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে এবং বাস্তব জগৎ থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে সব বিষয় শেখতে চায়, চিনতে চায়। প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশ শিক্ষার্থীর বিচিত্রভাব চাহিদাও প্রয়োজন অনুযায়ী তার সম্ভাবনাময় ব্যক্তি সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটাবে সমাজের সুযোগ্য ও স্বনির্ভরশীল নাগরিক রূপে গড়ে

তোলার উদ্যোগ নিয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পশ্চিমবঙ্গে আজ পর্যন্ত যে অগ্রগমন ঘটেছে তার বিস্তারিত তথ্যে না গিয়ে শুধু এইটুকু বলা যে, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত শিক্ষার মান একেবারেই তলানিতে ঠেকেছিল এবং শিক্ষা ব্যবস্থাও প্রতিস্তরেই বিকলাঙ্গ হয়েছিল। পঠন-পাঠন, পরীক্ষা গ্রহণ এবং তার ফল প্রকাশে অনিশ্চয়তা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ণের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অগ্রগণ্য, আর্থিক নিয়ামক ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে। ১৯৭৬ সালে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার থেকে যুগ্ম তালিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে একটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষাই ব্যক্তির মধ্যে ভাল-মন্দ বোধ ও নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারে এবং ব্যক্তির সঙ্গে নৈতিক ও চেতনা সৃষ্টি করতে পারে এবং ব্যক্তির সঙ্গে নৈতিক ও চেতনাযুক্ত হয়ে আদর্শ চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্তির মনুষ্যত্ববোধ গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার শাসন ভারতার এসে প্রথম কয় বছরে কয় হাজার প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন এবং পুরাতন স্কুলগুলির সংস্কার করে পড়াশোনার উপযোগী করে তোলেন। পরবর্তী ১০ বছরে এক শ্রেণী স্বার্থান্বেষীদের মামলার হাইকোর্টের নির্দেশে আর কোন স্কুল গড়া সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি সরকারের সামনে সুযোগ এসে যাওয়ায় নতুন করে প্রাথমিক স্কুল এক হাজারের মতো হয়েছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষা কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আন্তরিকতার পরিচয়টি কারুর অজানা নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষক সমাজকে অমর্যাদাকর অবস্থায় রেখে শিক্ষার মানোন্নয়ন বা প্রসার করা সম্ভব নয়। সেই জন্যে শিক্ষকদের মাসিক বেতনসহ অন্যান্য আরও সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে উপযুক্ত সম্মানের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে এত আয়োজন, এত পরিকল্পনা, এত অর্থব্যয় এবং সুন্দর পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর শিক্ষকদের উদাসীনতায় শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষক শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। শিক্ষার্থীর কাছে তিনি বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক। যাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব আদর্শ চরিত্র ও সহজ সরল মনের মানুষের স্পর্শে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাময় শক্তি সহজ ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত শিক্ষক তাদের মধ্যে উদাসীনতা ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকতার প্রতি যথাযথ মন না হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ, চাহিদা, রুচি ও আবেগ হারিয়ে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন কিছু শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই পড়াশুনা ছেড়ে দিচ্ছে এবং ফলে ফলে নিরক্ষর হয়ে পড়ছে অন্যদিকে তেমন তেমন শিক্ষার্থী অন্যের পর বছর ফেল করে ঐরে ঐরে পড়াশুনার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে স্কুল ছেড়ে পালাচ্ছে। অন্যদিকে এরই অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে পড়ার পাড়ার পরিবর্তে উঠেছে ঘর উঠেছে শিক্ষার নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের চালিত করছেন সেই দিকেই। যাঁ-এর পাঠ্যবই, সিলেবাসের বহর, পড়া আর পড়া, টাস্ক আর টাস্ক। চলছে প্রথম ও দ্বিতীয় হওয়ার লড়াই, বিপর্যস্ত হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানলাভ ও বিদ্যার্জন, ব্যাহত হচ্ছে চেতনার বিকাশ, তৈরি হচ্ছে যন্ত্রমানুষ। ফলে শিক্ষার্থীর সুকুমার বৃত্তিগুলি আগে আগে উধাও হয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে শুরু হয়েছে শিক্ষার দারিদ্র্যিকরণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা চলে যাচ্ছে শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের কব্জায়। শিক্ষাদানের বদলে চলছে শিক্ষা বিক্রি, শিক্ষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাজারের পণ্য। শিক্ষা আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

স্কুল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেখে পঠনের একটি সুন্দর পরিকাঠামো। জীবন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে এর ছাপ্তি, মানুষ না পড়লে দেশ গড়া যায় না এসব ভাবনা চিন্তা আমাদের মাথার ওপরেও শিক্ষা নামক সেই ভয়ংকর কারখানার অভিভাবকরা নিয়ে যাচ্ছেন অল্প তার বুঝতে পারছেন না শিক্ষার নামে সেখানে চলছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। ঐ সব স্কুলের কোন কোন শিক্ষক সহানুভূতিহীন। সেখানে নিরানন্দময় পরিবেশে বাঁধনের গাদাগাদির মধ্যে ফেড়ে উঠছে। এক শ্রেণীর শিক্ষকদের কঠোর শাসন ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ অসহায় শিশু শিক্ষার্থী ঠিক যেন খাঁচায় বন্ধ তোতাপাখি। এই সব স্কুলে প্রকৃত সমাজ পরিবেশ না থাকায় ইতিনীতি, আচার-আচরণ অনুশীলন না করায় ব্যক্তি জীবনের বিকাশ ঘটলেও সামাজিক কল্যাণে এদের শিক্ষা ব্যর্থতায়ই থেকে যাচ্ছে। মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটছে না, মনের সংকীর্ণতা দূর হচ্ছে না, মনকে উদার ও সাবলীল করা যাচ্ছে না। শিক্ষায় এরা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি উদাসীন থাকছে। এদের যন্ত্রমানুষ দিয়ে জনদরদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাচ্ছে না। এরা পুথিগত বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা পাচ্ছে না। যদিও আমরা দুঃখের সাথেই বর্তমান দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও দারিদ্র্য মানুষকে বাধ্য করছে জীবন ধারণের উপযোগী শিক্ষা গ্রহণে। যে শিক্ষার জীবিকার নিশ্চয়তা আছে সেই শিক্ষার শিক্ষার্থীর আগ্রহী। জীবিকার নিশ্চয়তাহীন কোন কোন মানুষের কাছে খাঁচা-মরার প্রশ্নের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ। শিক্ষকরা যদি আন্তরিক হতেন অন্তত সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শিক্ষার সামাজিকিকরণের দায় নিয়ে সাধারণ মানুষের উপকৃত হতেন। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জের প্রতিটি জায়গায় গড়ে উঠেছে প্রাথমিক স্কুল, গড়ে উঠেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে গড়ে উঠেছে কেন কিছু ব্যতিক্রম। এদের অনেকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এদের অনুপস্থিতি, সময়ে না আসা এবং পরিচালনায় শিক্ষা এবং শিক্ষার পরিবেশটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলোর এক শ্রেণী শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ববোধের অভাব দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রেই আজকের দিনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মধ্যে সম্পর্ক সহানুভূতি, সহযোগিতাপূর্ণ এবং বন্ধুত্বের এবং মধুর ও মানসিক মিলন—এর প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর যার সমস্ত দেওয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা অবক্ষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এসে পড়েছে। স্কুলের বাইরে অর্থনৈতিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে শিখে নেওয়া বা জেনে নেওয়া বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠেছে। শিক্ষাকরা পেশাকে আ হামরা শিক্ষায় এর মধ্যে অর্থের লেনা-দেনা খুব ক্ষমাদায়ক। এতে ছাত্র-শিক্ষকদের আন্তরিক সম্পর্ক বজায় থাকছে না। দেশের আর্থ-সামাজিক হেজেপেজা শিক্ষকরা এখন উচ্চ বেতনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেন কিছু শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে টুইশন করছেন, ফলে ক্লাসে আসেন ক্লান্তি আর অবসাদ নিয়ে পড়াশোনা অনেকটা দায়সারা গোছের। এসব শিক্ষকদের সেবার আদর্শ অবলুপ্ত, শিক্ষাদানে অনীহা, সময়মতো শিক্ষাদানে না আসা, ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আন্তরিক এবং মনযোগী না হওয়ার ফলে একদল শিক্ষক সরকারি সুযোগ-সুবিধা আদায় করায় তৎপরতায় লিপ্ত। এর ফলে কেন কিছু স্কুল ছাত্র ঘোষের গোরস্থানে পরিণত হয়েছে।

প্রায়ের শতকরা অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। এই মানুষের ঘরে আগের ছেলে বা মেয়েরা অর্থনীন আয়ের নিত্যসাথী, সেই সব পরিবারে ছেলেমেয়েরা যাতে শিক্ষার গোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারে তার জন্য চলছে সরকারের অক্লান্ত চেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর শিক্ষক রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। ফলে সাধারণ মানুষ এই সব স্কুলগুলোর উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। এই সব অনেতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এসব অসাধু শিক্ষকদের চিহ্নিত করতে হবে। সমাজে যাতে কোনভাবে এই সব শিক্ষক প্রতিষ্ঠা না পায় তা দেখতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষা বাণিজ্যিকিকরণ বন্ধ করতে হবে, এবং সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে শিক্ষাকে করতে হবে সামাজিকিকরণ, করতে হবে পাঠক্রমের পরিবর্তন সাথে শিক্ষক ক্ষেত্রেতে হবে মাতৃভাষার বন্ধুত্বের ভূমিকা

‘নখ-দর্পণে বিশ্বদর্শন’

ডি. জি. এস

মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা'র প্রশ্নই আমার আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে।

'সমসাময়িক বিশ্বে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা'র প্রশ্ন আলোচনার প্রবেশ করার পূর্বে তিনটি বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা চাই।

১) সমসাময়িক বিশ্ব বলতে কোন ছবি আঁকা হবে ; কী কী বৈশিষ্ট্য তাতে বর্ণিত হবে,

২) যেহেতু মার্কসবাদে আজ আর কোন সর্বজন-স্বীকৃত কোন অভিন্ন সত্তা নেই, প্রশ্ন, তাহলে কোন সত্তা-নির্দেশিত মার্কসবাদ আলোচনার ভিত্তি হবে,

৩) তৃতীয়ত, না, প্রয়োগগত, কোন দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন আলোচিত হবে।

উপরে উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের আলোয় ভিত্তিতে বর্তমান লেখক এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে নিজ অবস্থান উপস্থাপন করেছেন। মূল প্রশ্নে, অর্থাৎ, প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে লেখকের সুস্পষ্ট বক্তব্য :

১) সমাজ-ইতিহাসের ধারা অভিব্যক্তির, পুঁজিবাদী সমাজের গঠির অর্থনৈতিক নিয়ম উদ্ঘাটনে, তার সংঘাতে অধিক্ষেপ-উদ্ভূত সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণে, সমাজ বিশ্লেষণের আয়ুধ ও করণ নির্ণয়ে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের সত্তা, স্বরূপ ও লক্ষ্য, ইত্যাদির নির্ধারণে, এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় সমাজের রূপরেখা অঙ্কনে মার্কসবাদের তত্ত্বগত গুরুত্ব অপরিসীম। আবার, সমাজের রূপান্তর ঘটাতে বিশেষ দেশের আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের ভূমিকা অনুযায়ী রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণে তার নির্দেশের ভূমিকা অপরিসীম।

২) সমকালীন বিশ্বের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসেবে মার্কসবাদ আজও প্রাসঙ্গিক,

৩) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পতন বা বিপর্যয়ের জন্য মার্কসবাদের তত্ত্বগতিত 'সীমাবদ্ধতা' বা 'অক্ষমতা'-কে দায়ী করা যেতে পারে, কিন্তু তা-তে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হবে না,

৪) মার্কসবাদের বিকৃতি, অপপ্রয়োগ, অসম্ভব, ভ্রান্ত ও অপপ্রয়োগ, যাই ঘটে থাকুক, তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল সমাজতন্ত্রের সার্বিক বিপর্যয়। এবং সেটাই আমাদের কোনোমতেই অভিপ্রেত।

বর্তমান প্রবন্ধে লেখকের মূল আলোচ্য সমসাময়িক বিশ্বের কমিউনিস্ট ইশতেহার, তথা সার্বিক মার্কসবাদ-এর প্রাসঙ্গিকতা নয়, ইশতেহারের মার্কসের চিন্তা-ভাবনার ইতিহাস থেকে দেখে তার, তাঁর প্রথম পর্বের (১৮৩৭-৪৩) রচনা রোমান্টিক ও হেগেলীয় ভাববাদের স্তর- পরম্পরা অতিক্রম করে মার্কসের উন্নত মুক্তিবাদ, ও শ্রেণ্য-দর্শনের সমালোচনায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এই 'সমালোচনা'র মার্কসের পরিণত চিন্তার সর্বপ্রথম অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সন্ধান মেলে।

অনেকেই মার্কসের বিকাশের-পর্যায়ের ক্রমের মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপাদান অভিব্যক্ত করেছেন। এগুলি বিশ্লেষণে ধরা পড়ে এই রচনাগুলি মার্কসের তাত্ত্বিক-মূলগত আবেগের অভিব্যক্তি মাত্র।

লক্ষণীয়, ১৮৪১ সালেও মার্কস হেগেলের ভাবকল্প অবস্থানকে আঁকড়ে থেকেছেন, তখনও মানুষের 'আত্মচেতনা'র বিকাশের মাধ্যেই সমাজের ইতিহাসের গতি ও স্বরূপ খুঁজেছেন। এরপর থেকে মার্কসের বস্তুবাদী অবস্থান ধীরে ধীরে স্পষ্টতর রূপ পেতে শুরু করে। ১৮৪৩-এর মে'র পরে মার্কস জার্মানির বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সাময়ে যে অনিবার্য তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন।

১৮৪৪ সালের 'প্যারি পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়। এর প্রথম অধ্যায়ে মার্কস শ্রমের বিশ্লিকতার ভিত্তিতে শ্রমের বর্জন দেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সমস্যার সমাধান রূপে তিনি কমিউনিজমকে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, কমিউনিজম হচ্ছে সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকানা, এবং মানুষের আত্মবাহ্যত অবস্থার নিশ্চিত অবসান। কমিউনিজম-ই হচ্ছে মানুষের স্বরূপের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তৃতীয় অধ্যায় মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভাববাদী দৃষ্টি কোণের সমালোচনা করেন।

তখনও কিন্তু মার্কস নিজেকে একজন কমিউনিস্ট বস্তুবাদী হিসেবে উপস্থিত করতে পারেননি।

'হোলি ফ্যামিলি'-তে (১৮৪৪-৪৫) মার্কস ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নের উপর আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী সমাজে সম্পত্তিবান শ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণী, উভয়েই বিচ্ছিন্নতার শিকার। কিন্তু যেখানে পূর্বোক্ত শ্রেণী এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও সুপ্রতিষ্ঠিত বোধ করে, সেখানে শেষোক্ত শ্রেণী তার মধ্যে নিজেকে নিঃস্ব ও নিষ্পেষিত ভেবে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণীর কিছু কিছু উপাদান এই গ্রন্থেই প্রথম দেখা গেল। ১৮৪৫-এর গোড়ার দিকে মার্কস তাঁর কয়েকখণ্ড-ব্যক্তি মুক্তির কটিপাথরে যাচাই করে নিলেন। এরই ফলশ্রুতি, তাঁর, 'Eleven Theses on Feuerbach' রচনাটি।

প্রথম 'থিসিসে' ফয়েরবাখের বস্তুবাদ সম্পর্কে মার্কসের সমালোচনার সারবত্ত। দ্বিতীয় 'থিসিস' হচ্ছে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য সম্পর্কে মার্কসের অবস্থান। তৃতীয় 'থিসিস' হচ্ছে কারণী বস্তুবাদীদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত।

'জার্মান ইডিওলজি'-তে (১৮৪৬) মার্কসের ভাবনে 'এতকালের সমস্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে সব হিসেব মিটিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট। বাস্তবিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল নীতিসমূহের সংজ্ঞায়নের এক নতুন স্তর বলে একে চিহ্নিত করা যায়।

'পভার্টি অব ফিলসফি' (১৮৪৭) হচ্ছে অর্থনীতি বিষয়ে মার্কস প্রথম বিস্তৃত উপস্থাপনা। অর্থনৈতিক প্রত্যয়সমূহ সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কের ভাবগত প্রকাশ মাত্র, এই উপলব্ধির অবতরণ জন্য মার্কস প্রধোঁর সমালোচনা করেছেন।

'পভার্টি অব ফিলসফি'-কে মার্কস তাঁর পরিণত চিন্তার ফসল রূপে দেখেছেন।

'কমিউনিস্ট ইশতেহার' (১৮৪৮)-এর সঙ্গে একে যেন 'ক্যাপিটাল'-এর ভূমিকা হিসেবে সুপারিশ করেছেন। লেনিনের মতে, 'পভার্টি অব ফিলসফি' হচ্ছে পরিণত মার্কসবাদের প্রথম রচনা।

মার্কস-এঙ্গেলস রচিত, ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 'কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো' হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রথম কর্মসূচী সংক্রান্ত দলিল। এই দলিল মার্কসবাদের চিন্তার এক অনবদ্য স্বাক্ষর রূপে সারা বিশ্বে সমাদৃত।

তার অধ্যায় বিশিষ্ট এই রচনার প্রথম অধ্যায় রয়েছে ; এক উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা অপর উৎপাদন ব্যবস্থার অনিবার্য, নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত প্রতিস্থাপন, এর আলোচনা। 'আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা' দ্বারা আজ পর্যন্ত সকল বিদ্যমান সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, এই ঘোষণা থেকে মার্কস-এঙ্গেলসের সিদ্ধান্ত পুঁজিতন্ত্রের পতন এবং এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থা সাম্যবাদের আবির্ভাব, দুই-ই অনিবার্য।

এই অধ্যায়েই পুরনো সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের, এবং নতুন সমাজের রূপকার, সর্বহারা শ্রমজীবীদের ঘর্মের প্রবক্তা, শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রলিতশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী রূপে কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য রূপে বর্ণিত হয়েছে : সর্বহারাদের একটি শ্রেণীতে সংগঠিত করা, বুর্জোয়া শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। 'শ্রমিকশ্রেণী একসাথে' বাক্যটি উল্লেখ করা ; পরিবার, সম্পদ ও মাতৃভূমির সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা; এবং ক্ষমতায় আসার পরে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের তালিকা তৈরি, ইত্যাদি প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মার্কস-এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রে পরাজয়ের আক্রমণে ক্ষয়ে যাওয়া বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া প্রকল্পসমূহের গভীর তীব্র সমালোচনা করেন ; এর ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম, এই দুটি সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ও অবস্থান স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে মার্কস-এঙ্গেলস বিভিন্ন বিরোধী পার্টি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অবস্থানের রূপরেখা তুলে ধরেন। 'শ্রমজীবী মানুষ এক হও', এই আহ্বান বাণী উচ্চারণসহ ইশতেহারের সমাপ্তি ঘটে।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ-এর প্রথম কর্মসূচী সংক্রান্ত দলিল, এই ইশতেহারের মার্কসবাদের দার্শনিক মতবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—ঐতিহাসিক বাস্তবের বস্তুবাদী বর্ণনা

ইশতেহারের অসামান্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে লেনিনের উক্তি :

'This little booklet is worth whole volumes ; to this day its spirit inspires and guides the entire organised and fighting proletariat of the civilised world.'

শিরোনাম প্রসঙ্গ ঃ

প্রথিবেত্রহীন তখন আন্তর্জাতিক সংগঠন, কমিউনিস্ট লীগ-এর কর্মসূচী হিসেবে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে লন্ডন থেকে মার্কস-এঙ্গেলস রচিত, 'Manifesto of the Communist Party' প্রকাশিত হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অসামান্য রচনা কেন নিছক 'ম্যানিফেস্টো' বলে চিহ্নিত হল। অভিধানিক অর্থে 'ম্যানিফেস্টো' হচ্ছে 'মতামত', উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্বন্ধে একাল্ত লিখিত ঘোষণা। এ অর্থে রচনাটি অবশ্যই 'ইশতেহার' রূপে উত্তীর্ণ হতে পারে। সতেরোটি পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পরিসরে এই পুস্তিকায় কমিউনিস্ট পার্টির মতামত, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই পুস্তিকাটি কি নিছক এক ইশতেহার, না, আরও কিছু। উদ্দেশ্য, মতামত, কর্মসূচী, ইত্যাদির যেমন স্থায়ীন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়, তেমনিই উদ্দেশ্য ও সিদ্ধিই এদের আশ্রয় দেয়, সার্থক করে। বর্ণনাই যাবতীয় বর্ণিত ও পর্যবেক্ষণিকার ভূমিকা পালন করে উদ্দেশ্যকে। কর্মসূচীকে ফলপ্রসূ করে থাকে।

পূর্বত্র, পরিণত মার্কসবাদের ঘনীভূত অভিব্যক্তি (Concentrated expression) এই পুস্তিকার ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য।

এ কারণেই পুস্তিকার প্রথম থেকে চতুর্থ, প্রতিটি অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও প্রসঙ্গের সবিস্তারে বাস্তবিক তত্ত্ব ও তথ্যের উদ্ধারিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

The history of all hethirto existing society is the history of class struggles [P32]

What the bourgeoisie produces, above all, are its own gravediggers. [P49]

Capital is....not a personal, it is a social power. [P61]

In bourgeois society....., the past dominates the present in Communist society, the present dominates the past. [P62]

The ruling ideas of each age have ever been the ideas of a ruling class [P67]

Political power, properly so called, is merely the organised power of one power for oppressing another. [P61]

The Communists fight for the attainment of the immediate aims, for the enforcement of the momentary interests of the working class, but in the movement of the present, they also represent and take care of the furture. [P78]

সামান্য বিশ্লেষণেই বোঝা যাবে, এই পুস্তিকায় কমিউনিস্ট পার্টির যে মতামত, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার বিধি হচ্ছে ঐতিহাসিক বাস্তিক বস্তুবাদী দর্শন। 'ম্যানিফেস্টো', রচনাটির সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দর্শনকে যেন ফুল ফোটানো যায়নি। ফলে, মার্কস-এঙ্গেলসের এই অসামান্য রচনার বিশ্লেষণের বস্তুনিষ্ঠতা সম্পূর্ণতা সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে।

মার্কসবাদ যদি 'বিশ্ব-দর্শন' রূপে আখ্যায়িত হয়ে তাহলে এই বিশ্ব দর্শনের 'নব-দর্শন' রূপে আত্মপ্রকাশ পত্র হবে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি। মার্কসবাদের মৌল প্রত্যয়গুলি সহ, তার সারাংশে এই নব-দর্শনে প্রতিষ্ঠিবিত, তবু ইশতেহার হিসেবে পারা বিশ্বে এই পুস্তিকা যা, 'Bible of the working-class', 'Song of songs', 'A stream of molten gold', ইত্যাদি নানা অভিধায় অভিহিত, সমৃদ্ধ হয়ে তি। তাই বলতে দ্বিধা নেই, মার্কস-এঙ্গেলসের এই অসামান্য রচনার আত্মপরিচয় বিশ্লেষণের আড়ালে অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

আই, গ্রোসত সম্পাদিত, Dictionary of Philosophy-এর কথায়, 'The Programmatic Document Scientific Communism' কি যেন গ্রন্থবোধ নয়।

বিন্যাস প্রসঙ্গ ঃ

কমিউনিস্ট ইশতেহারে বুর্জোয়া-সর্বহারা দ্বন্দ্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

● উৎপাদন-যন্ত্র, এবং ফলতঃ, উৎপাদন-সম্পর্ক, এবং তৎসহ সমাজের সমগ্র সম্পর্ক, ইত্যাদির অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়ারা টিকে থাকতে পারে না। [P36]

● নিত্য পণ্যের জন্য অবিরাম সম্প্রসারণ বাজারের প্রয়োজন বুর্জোয়াদের সারা বিশ্বে ছোঁক ধরিয়ে বেড়ায়। ইশতেহারের ভাষায়, 'it must nestle everywhere, settle everywhere, establish connections everywhere.'

● বিশ্ববাজার শোষণের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়ারা প্রতিটি দেশে উৎপাদন ও ভোগ-কে এক বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে।....নিজের পা-এর তলা থেকে এরা জাতীয় জমি (national ground) সরিয়ে নিয়েছে.....। সকল পুরনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, অথবা, প্রতিদিন ধ্বংস করা হচ্ছে। তারা বিতাড়িত হয় সমস্ত নতুন শিল্প দ্বারা, যার প্রবর্তন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই জীবন-মরণ প্রশ্ন; যা আর দেশজ কাঁচামাল ব্যবহার করে না, সুদূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামাল ব্যবহার করে ; যার উৎপাদিত সামগ্রী কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বের সব এলাকায় ভোগ করা হয়। স্বদেশের উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা চাহিদা পূরণে অভ্যস্ত লোক দেখা দেয় নতুন সব চাহিদা যার পূরণের জন্য চাই দূর স্থান ও দেশের উৎপাদিত সামগ্রী।

পুরনো স্থানীয় ও জাতীয় বিলগ্নতা ও স্বনির্ভরতার জায়গায় দেখা যায়, 'intercourse in every direction, universal inter-dependence of nations'। যেমন বৈষয়িক, তেমনি বৌদ্ধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে একথা সত্য।

ফলতঃ জাতির বুদ্ধিগত সৃষ্টি সাধারণের সম্পত্তি (Common property) হয়ে দাঁড়ায়। অসংখ্য জাতীয় একপেশেমিয়া এবং সঙ্কীর্ণ ভিন্নতা [P37] ক্রমশ অধিকতর অসম্ভব হয়ে ওঠে। অসংখ্য জাতীয় ও স্থানীয় সাহিত্য থেকে এক বিশ্বসাহিত্যের উদ্ভব হয়।

● বুর্জোয়ারা উৎপাদন-যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি দ্বারা, যোগাযোগ উপায়ের প্রভূত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির দ্বারা সকল, এমনকি সবচেয়ে বর্বর, জাতিকে সভ্যতার মধ্যে টানে।

লোপ পেতে বাধ্য, এই তত্ত্ব থেকেই বুর্জোয়ারা সকল জাতিকে বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করে, অর্থাৎ বুর্জোয়া হতে বাধ্য করে। ইশতেহারের অবলুপ্তকরীয় ভাষায়,

'it compels all nations, on pain of extinction, to adopt the bourgeois mode of production it compels them to introduce what it calls civilisation into their midst, i.e., to become bourgeois themselves. In other words, it creates a world after its own image.' [P38]

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসের এক সংক্ষিপ্ত, আশ্চর্যজনক, অনবদ্য বর্ণনা পাওয়া গেল ১৮৪৮-এর ইশতেহার থেকে।

প্রসঙ্গত, দেড়শত বছরের ব্যবধানে, আজকের আধুনিক জগতে বিন্যাসের অন্তর কতটি তুলে ধরা যেতে পারে। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী, অর্থনীতিবিদ, পল সুইজির ভাষায়,

'.....We have the unprecedented situation of a globally interconnected society under the direct or indirect dominance of capital with its head quarters in the economic and financial centres of a handful of imperialist powers, among which the United States occupies the position of first among equals.'

সুইজির এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বিন্যাসের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিকের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও সাংস্কৃতিক দিক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এদিক থেকে ইশতেহার কিছু অধিকতর বিন্যাস ও অন্য কিছু তুলে ধরতে পেরেছে।

কালের অপেক্ষা রাখে না, ইশতেহারে এই বর্ণনা সমসাময়িক বিশ্বের কঠোর বাস্তবতার এক পূর্ণাঙ্গ মাত্র নয়, তার বিশ্বয় জাগানো এক স্থায়ী বিন্যাসও বটে। এর ইঙ্গিত নিহীন সৃষ্টিতেই একাল্ত সম্ভব।

পণ্যের রহস্যময়তা (Commodity fetishism) প্রসঙ্গ ঃ

পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে যে মূল্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তা আসলে পণ্য-উৎপাদকদের সামাজিক সম্পর্কের অভিব্যক্তিমাত্র। অথচ, আপাতদৃষ্টে কথা, পুঁজিবাদী সমাজে এই ধারণের

ব্যবস্থাটা (অর্থাৎ, মূল্য-সম্পর্ক) সত্য হিসেবে টেকে থাকার, এবং সত্য আড়ালেই থেকে যায়।

পণ্য-অর্থব্যবস্থার এই বিকৃত বিষয়কে মার্কস পণ্যের অতৌকিক বা রহস্যজনকতা রূপে চিহ্নিত করেছেন।

পণ্য-উৎপাদনী রূপ সমাজের শ্রেণী চরিত্রকে প্রকাশ না করে আড়াল করে রাখে। এ আমাদের মধ্যে একটা মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করে যে ধনতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজ, যেখানে সকল উৎপাদক সমান ও স্বাধীন। কিন্তু, একটু বিশ্লেষণেই ধরা পড়ে যে ধনতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত—পুঁজি-মালিক এবং শ্রমিক। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কই এই সমাজের মূল ঘটনা, এবং অন্যান্য ঘটনা এই মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হয়। [Capital Vol. I]

'পণ্যের অতৌকিকতা'র পণ্যের প্রতি যে অন্ধ ভক্তি, তার সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিকৃত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, 'ম্যানিফেস্টো'-এবং 'ইশতেহার', উভয় রচনাতেই মেশিন ও যন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিক্ষোভের মধ্যে প্রকাশ পায় এই অন্ধ ক্রোধ।

পুঁজির জন্ম থেকেই পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু।

কিন্তু যন্ত্র প্রবর্তনের পর থেকেই পুঁজির মূর্তরূপ, 'শ্রমের যন্ত্র' (Instrument of labour)-এর বিরুদ্ধেই শ্রমিক লড়াই করছে। মার্কসের কথায়, 'He revolts against this particular form of the means of production, as being the material basis of the capitalist mode of production'. [Ibid]

অনুরূপ বক্তব্যই রয়েছে ইশতেহারে। They (the Proletarian) direct their attacks not against the bourgeois conditions of production, but against the instruments of production themselves ; they destory imported wares that competes with their labour, the smash to pieces machinery, they set factories abbaze....[P45]

সমাজ বিপ্লব প্রসঙ্গে :

সমাজ-বিপ্লবের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন :

At a certain stage of the development, the material forces of production in society come in conflict with the existing relations of production.....From forms of development of the forces of production these relations turn into their fetters. Then comes the period of social revolution.

[Preface to the Critique of Political Economy]

এর অনুরূপ উপস্থাপনাই আমরা পাই কমিউনিস্ট ইশতেহারে।

At a certain stage in the development of these means of production and of exchang, the conditions under which fudal society produced and exchanged, the fudal organisation of agriculture and manufacturing industry, in one word, the fudal relations of property became no longer compatible with the already developed productive forces they became fetters. They had to be burst asunder ; they were burst asunder. [P39]

আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কেও কাছাকাছি একই সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে।

For many a decade past the history of industry and commerce is but the history of the revolt of modern productive forces against modern conditions of production, against the property relations that are the conditions for the existance of the bourgeoise and of its rule [pp39-40]

'পোটা মানুষ' প্রসঙ্গে :

মার্কস তিন তাঁর সারা জীবনে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু যা নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল—সম্পূর্ণ, খোটা মানুষ গড়ার স্বপ্ন।

শ্রম-বিভাগ, যান্ত্রীকরণ, শোষণ, এবং অধিকারের মাধ্যমে মানুষের খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ (fragmentation) হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের বাস্তবতা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা, সর্বাঙ্গিক বিকাশের থেকে মুক্তি লাভ—এর পথ সন্ধান ছিল মার্কসের কর্মময় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিরলস প্রচেষ্টায় পথ-সন্ধানে দ্বিতীয় পর্যায়ে অবশ্যের প্রকৃত পথ আবিষ্কার করলেন, কমিউনিজম-এর পথ।

যেহেতু এই সাম্যবাদী সমাজ হবে 'বিমূর্ততা' মুক্ত, তাই এখানে মানুষে-মানুষে, মানুষে-প্রকৃতি, ব্যক্তি-সমাজে, (শ্রমের) বস্তুরূপগুলি এবং স্ব-প্রকাশ, স্বাধীনতা এবং প্রয়োজন, অস্তিত্ব এবং সারসত্তা, ইত্যাদি বিভিন্ন দ্বান্দ্বিক বিরোধের অবসান ঘটবে মার্কসের অনবদ্য ভাষায়,

"It is the genuine solution of the antagonism between man and nature and between man and man. It is the true solution of the struggle between existence and essence, between objectification and self-affirmation, between freedom and necessity, between individual and species." [1844 Manuscripts]

কমিউনিস্ট সমাজের যে চিত্রায়ন ইশতেহারে রয়েছে তার প্রতি সঙ্গত অবলোকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

When, in the course of development class distinctions have disappeared, and all production has been concentrated in the hands of a vast association of the whole nation, the public power will lose its political character. political power, [p50] properly so called, is merely the organised power of one class for oppressing another.

In place of the old bourgeois society, with its classes and class antagonisms, we shall have an association, in which the free development of each is the condition of the free development of all. [p50-1]

মার্কসের সুদীর্ঘ গবেষণা-জীবনকে তিনটি সুস্পষ্ট পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। ১৮৩৭ থেকে ১৮৪৬ প্রথম পর্ব ; ১৮৪৭-৪৮ দ্বিতীয় পর্ব ; এবং ১৮৪৯ থেকে ১৮৮২ হল তৃতীয় বা শেষ পর্ব।

প্রথম পর্বের অর্ধমার্গে মার্কসের রচনায় রোমান্টিক ও হেগেলীয় ভাববাদের প্রভাব স্পষ্ট। দ্বিতীয়ার্ধের রচনায় মার্কসের বস্তুবাদী অবস্থান ক্রমশ স্পষ্টতর রূপ লাভ করে। হেগেলের ভাববাদী দৃষ্টিকোণ কঠোরভাবে সমালোচিত হয়।

'হোলি ফ্যামিলি'-তেই প্রথম ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু কিছু উপাদান পাওয়া গেল।

জার্মান ইডিওলজি (১৮৪৬)-তে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল নীতিসমূহের সন্নিবেশ দেখা যায়।

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম রচনা, 'পভার্টি অফ ফিলসফি' (১৮৪৭) হচ্ছে 'পরিণত মার্কসবাদের প্রথম রচনা'। দ্বিতীয় রচনা, 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (১৮৪৮) হচ্ছে সম্পূর্ণ, পরিণত, সমৃদ্ধ মতবাদের এক অসামান্য দৃষ্টান্ত, এক আদর্শ রূপ।

প্রথম পর্বের অসম্পূর্ণ, অপরিণত অবস্থা থেকে মার্কসবাদের তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্বের সুসম্পূর্ণ, সুসমন্বিত, পরিণত অবস্থায় উত্তরণের পর্ব হল দ্বিতীয়, ইশতেহার পর্ব। এই দিক থেকে ইশতেহার হচ্ছে দুই পর্বের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধ রচনা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিকত্ব, তত্ত্বগত বা প্রয়োগগত, যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ইশতেহারের সুদীর্ঘ পরিসরে উত্থাপিত-আলোচিত হয়েছে তার-ই বিকশিত, সংস্কারিত, রূপ হল সমৃদ্ধ, পরিণত সময় মার্কসবাদ। অন্য কথায়, মার্কসবাদকে যদি বিশ্বদর্শন রূপে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে কমিউনিস্ট ইশতেহারের অবস্থানই তার 'মধ্য-দর্শন' রূপে অনুভূত হবে। এখানেই ইশতেহারের অনন্যতা।

বাংলা বইয়ের ভূমিকা

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা বলতে আমরা বুঝি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সূচনা। বিশেষ করে নিবন্ধ সাহিত্য অথবা গবেষণামূলক গ্রন্থে প্রকৃত বিষয় বস্তুর পূর্বাভাস বা পূর্ব সূচনা পাঠকের কাছে উল্লেখ করা হয়। অনেকে যে বিষয়ে গ্রন্থ লেখেন, সেই বিষয়ের একজন গবেষকের লেখা ভূমিকা বাদে প্রথমে প্রকাশ করেন। এই লেখা মুখবন্ধ নামেও পরিচিত। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা নিয়ে কাজ হয়েছে। কিন্তু ভূমিকা সাহিত্য নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ভূমিকা সাহিত্য নিয়ে কাজ শুরু করার আগে প্রয়োজন তালিকা প্রণয়ন করা।

নির্বাচিত ভূমিকা সাহিত্যের পঞ্জী

বাংলা গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জীর অভাব আজও বিদ্যমান। কোন বিষয়ে জানার জন্য যার সময়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গ্রন্থপঞ্জীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু সর্বত্র এক একটি নির্বাচিত বিষয়ের বইয়ের খোঁজ পাওয়া যায় না। অধিকাংশে গ্রন্থাগারে এক একটি বিষয়ের বাংলা বইয়ের তালিকা সহজলভ্য নয়। তথ্যপঞ্জীর সাহায্যে জ্ঞান ভাণ্ডারের তথ্য-তত্ত্বের খনিজের পাওয়া যায়। নির্বাচিত বিষয়ের তথ্য পঞ্জীর জন্য অনুসন্ধানী ও নিষ্ঠাবান গবেষক শুরুর দিয়ে থাকেন। কিন্তু যাঁরা শুধু গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় পাঠ করেন, কিংবা গ্রন্থাগারে ওই সব বইয়ের খোঁজ করেন, তাঁদের অনেকে হয়তো নির্বাচিত ভূমিকা সাহিত্যের পঞ্জীর গুরুত্ব দেখেন না। কিন্তু তথ্যপঞ্জী প্রতিটি গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখার মতো বিষয়।

নির্বাচিত ভূমিকা সাহিত্যের পঞ্জী তৈরি করার কাজের জন্য আমার মনে হয়েছিল, গ্রন্থাগার কর্মীদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। কেন না, গ্রন্থাগারে কর্মীদের হাতের কাছে বই থাকায় তাঁরা সহজে কাজটি করতে পারেন। কিন্তু যে কোন গবেষকের পক্ষে এই কাজ হবে দীর্ঘদিনের। তা ছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রধান কাজ পাঠকের হাতে দ্রুত গ্রন্থ পৌঁছিয়ে দেওয়া। প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বইয়ের সন্ধান জানানো গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজ। বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি গ্রন্থাগারে কর্মসূত্রে অতিবাহিত করেছিলাম। এই কথা মনে করে শুরু করেছিলাম নির্বাচিত ভূমিকা সাহিত্যের পঞ্জীর কাজ।

আমরা দেখেছি, কয়েকজন স্বনামধন্য গবেষক জীবনীগ্রন্থে লেখকের বিভিন্ন লেখা তালিকাভুক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁদের অনেকে অন্যের গ্রন্থেও ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। সেই সব ভূমিকার তথ্য অনেক জীবনী লেখক বাদ দিয়ে গেছেন। গ্রন্থের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা। এই কারণে অনেকে অন্যজনের লেখা মুখবন্ধ দিয়ে গ্রন্থের সূচনা করেন। কিন্তু জীবনী লেখকরা সেই লেখাগুলিকে মনে হয় তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি।

বর্তমান চলচ্চিত্র প্রচারের এবং জনসাধারণের মধ্যে আনন্দদানের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প। তাই গোড়া থেকে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত নট-নটী নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ আজও তেমন হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে যে শিল্পের সঙ্গে অগণিত নট-নটী জড়িত। তাঁদের সকলের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করা একক ভাবে সম্ভব নয়। তবু ব্যক্তিগতভাবে একজন অনেকদিন আগে শুরু করেছিলেন। তাঁর নাম। সুবীর বসু। গ্রন্থের নাম। 'আলোর নট-নটী', ১৩৪০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ভূমিকা লিখেছিলেন : প্রভাবতী দেবী। ভূমিকায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতী লিখেছিলেন : '.....সংসারের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত মানুষ অন্তত খানিকক্ষণের জন্যও বিশ্রাম চায়, আনন্দ পাইতে চায়, এক ঘেয়ে জীবন-প্রণালীর জন্য এতটুকু বৈচিত্র্য আনিতে চায়। তাহাদের কর্মক্লান্ত জীবনে যাঁহারা এতটুকু আনন্দ উৎসাহ আনিয়া দিতে পারিয়াছেন তাঁহারা সত্যই অভিনন্দনের বা অবজ্ঞার পাত্র-পাত্রী নহেন। তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার বাসনা লোকের থাকে এবং আজও,—সেই জন্যই পৃথিবীর সকল সুসভ্য দেশ তাঁহাদের উপরে স্থান দেয়—তাঁহাদের পক্ষিচয় সযত্নে সংগৃহীত করে।...'

ঋত্বিকচন্দ্র মজুমদারের লেখা। 'দেবী চৌধুরাণী' ১৮৮৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৫৬ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনায় উক্ত গ্রন্থ আবার প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে ভূমিকা লেখেন আচার্য যদুনাথ সরকার। তিনি ঐতিহাসিকের চোখে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিচার করেন।

আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন : 'দেবী চৌধুরাণী প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই আমাদের জানাইয়াছেন। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি

নাই।—'

'—দেবী চৌধুরানী গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরানীর সম্বন্ধ অল্প আছে। দেবী চৌধুরানী, তাহাকে পাঠক, তাহাদের সহিত, সেণ্ট্রেলাস ব্রেনান্, এই সমস্তগুলি ঐতিহাসিক।—'

আচার্য যদুনাথ সরকারে আরও লিখেছেন : 'এ কথা সত্য। নাম ও তারিখ বদলিয়া দেখিলে দেখা এই উপন্যাসে ঐতিহাসিকতা মানিয়া চলা হয় নাই। প্রকৃত ঘটনাটি পাঠক একজন ভোজপুরী অর্থাৎ আরা জেলার বিহারী মুসলমান। তাহার সহযোগে এবং তাহারই বন্ধু ডাকাতের সর্দার মজনু সাহ, শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ বর্তমান আরেরাজ জেলার লোক ; আদালতে তাহার জন্ম হয় না, এবং মৃত্যুর পর তাহার দেহ আদালত হইতে সেই সুদূর দেওঘরে কবর দিবার জন্য পাঠান হয়, আদালতে হেয় জমিতে নহে। তাহাদের অনুচরগণ রাজপুত, কেহই বাঙালী নহে—"Not a Bengali rabble, but a number of well-armed Rajputs" (১৭৭৬ এবং ১৭৮৭ সনের সরকারী রিপোর্ট)। তাহাতে পাঠক ১৭৮৭ সনের জুলাই মাসে ইংরেজ সিপাইদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যায়, ঘ ইহাদের ধরা দিয়া দ্বীপান্তরে যাইবার পর নহে, (আর, তখন ফাঁসীমানে কয়েদী পাঠান প্রথা আরম্ভ হয় না)। ফলতঃ ওয়ারেন হেস্টিংসে পলত্যাগ করিবার কয়েক বৎসর পরে এই সব ডাকাতদের দমন হয় এবং 'দেবী'ও অদৃশ্য হন। দেবী চৌধুরানী নিজ দল ভাঙ্গিবার কয়েক বৎসর আগে গুরুপ্রাপ্ত ব্রহ্মপুর ছাড়েন।

কিন্তু যে রিপোর্টের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য। খাঁটি রঙ্গপুরীরাও ডাকাতি করিত। চলনবিলের ধারে একটি গ্রামের এক বিস্তৃত বংশের ব্রাহ্মণ-বাবুদের পুরুষেরা নৌকোযোগে ডাকাতি করিতে করিতে যে নিজের নতুন জামাইকে হত্যা করেন এবং তাহার অনুতাপে ঐ পাপ-ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন, তাহার কথা, রাজশাহী-পাবনা জেলার লোক প্রসিদ্ধ।

আর হেস্টিংসে দাঁড়ি হইবার পর (১৭৭৫)-এ দেশের দশা যে রূপ ছিল বঙ্কিম তাহার অনেক অনেক দশা বর্ণনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ'-এর (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) ভূমিকা আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছিলেন। উক্ত ভূমিকায় তিনি বলেন : '.....সন্ন্যাসী বলিলেই বাঙ্গালীরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরি পুরীর দল, একেবারে লুঠেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবার জমিদারিও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, মুসলমান দমন ও নিষ্টের পালন, উহাদের অনেকেরই অতীত ছিল। এই মন্ত্রগুরু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনার সৃষ্টি বুঝিলাম ভ্রম। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে "আনন্দমঠে" বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য ও কথা (ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধটা অতিরিক্ত ছাড়া) অধিকাংশে অসত্য এবং এ কথাগুলি কোন অংশেই ঐতিহাসিক এই বিশ্বাসে পাঠিত পারে না।—'

আচার্য যদুনাথ সরকারের ওই ভূমিকা আধুনিককালের গবেষকদের কাছে নতুন করে চিন্তার খিদে হতে পারে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনেকের লেখা গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। তাঁর প্রতিটি ভূমিকা গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ। তাঁর মনমোহন গোস্বামী লিখিত 'রায়তপাকর আরতচন্দ্র' গ্রন্থের ভূমিকা আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন।

কিন্তু আগে হলে এই। '...প্রথম যুগের কবিকল বৌদ্ধ সহজিয়া মতের আধ্যাত্মিক সাধনা লইয়া যে গ্রন্থগুলির পূর্ণ কবিতা বা গান রচনা করিতেন এবং তখনকার দিনের সামাজিক জীবন লইয়া ও লোক-প্রচলিত দেব-দেবীর স্তুতি লইয়া যে-সমস্ত গান বা পদ রচনা করিতেন, তাহার নিদর্শন আমরা নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত 'চর্যাপদ' হইতে ও 'তাঞ্জুর' সৈমসন' প্রভৃতি তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি। এই যুগের কবিদের, কিংবা যাহারা চর্যাপদের কবিতা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের নাম পাইয়াছি। তাঁহাদের অনেকের কথার আভাসও পাইয়াছি ; এতদ্ভিন্ন অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীর পর্যায়ের কথাবস্তু হইলেও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে অবস্থিত বলিয়াই মনে হয়।

এই চর্যাপদের সিদ্ধাচার্য যথা—লুই, কাহ্নু, ভুসুকু, কুক্কুরী, শবরি, ডিম্বিকা, তাড়ে, সরহ, ঢেণ্ঢণ, চাটিল প্রভৃতি ২২ জনের কথা পাইয়াছি, তাঁহাদের অলৌকিক জীবন কথাও কিছু জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার পথ আমাদের নাই।'

আচার্য চট্টোপাধ্যায় উক্ত ভূমিকায় বেহুলা-লখিন্দর উপাখ্যান, চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালের বৈষ্ণব চরিতকারগণের কথা, কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবীরদাস, দাদাওদ ও অন্যান্য কবিদের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত ভূমিকা বঙ্গসাহিত্যে একটি মূল্যবান লেখা। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা অনেক গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

খাটনামা সাপ্তাহিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন নিবন্ধ একত্র করে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদনা করেন । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস। ভূমিকায় তাঁরা লিখেছেন : '...বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি সাময়িক প্রয়োজনে তিনি সাহিত্যের যে বিপুল সম্ভার সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথা সম্ভব একত্র দেখিবার সৌভাগ্য বাঁহার এতকাল পরে হইবে, তিনিই পরিশ্রম ও বিস্ময়ের সঙ্গে ইহার অধিকাংশ লিখিবার শিল্পীর কি বিচিত্র শক্তি দৈনন্দিন সাময়িক ঘটনাবলী-জাল তোলার কাজে ব্যয়িত হইয়াছে, মূল্যবান কত খোয়াই, শিল্পমূর্তি হেলেনের চুলায় কিভাবে ধ্বংস হইয়াছে। অর্থাৎ সেই সম্পদ কিছু পরিমাণে এখনও খুঁজে খুঁজিয়া চিরন্তনের ধরাঘরে রক্ষিত হইতে পারে, সেই চিন্তার ফলই এই গ্রন্থাবলী।—'

উক্ত ভূমিকা সেকালের ঘাটিয়ে যাওয়া অমূল্য লেখাগুলি সংগ্রহ করার কাজের উৎসাহ দেয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের স্বাধীনতার বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের আলোচনা তিনি যেমন করেছিলেন, ঠিক তেমনি, সাধারণ মানুষের মুখে-জোগানর কথা পত্রিকাদ্বারে চিন্তা করতেন। এমন কি সেকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন সভায় তাঁকে দেখা যেত। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত (মুক্তি সন্ধানে ভারত) গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

"আমাদের দেশে ''বাঙ্গি-বিজ্ঞান'' এখনও পুরাপুরি বিজ্ঞান হিসাবে আলোচিত হয় না—এমনও ইহার প্রয়োগ ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ। কিন্তু বাপকভাবে দেখিতে গেলে সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব বিষয়ে সমন্বয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান গঠিত। কোন একটি বিশেষ সমস্যার রাষ্ট্রীয় তথ্য আলোচনা করিতে হইলে এতগুলি বাদ দিয়া যদি শুধু রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধেই অবতারণা করা হয় তবে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হইল বলা চলে না। কারণ জীবনের সকল প্রচেষ্টার উপরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে একটি পত্র লেখেন সেই লেখা প্রমথ চৌধুরী 'ভারতের কথা' গ্রন্থের ভূমিকা রূপে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিনের জাতীয় আন্দোলন এবং সাধারণ মানুষের কথা বলেছিলেন।

ভূমিকা অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের সূচনা। গ্রন্থের পূর্বাভাস বলা বলা হয়। ভূমিকা সাহিত্য বুঝবার মানের পরিচিতি তা ছাড়া অনুচ্ছেদিকা, অবতরণিকা, প্রোতন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে অনেকের লেখা ভূমিকা আলে সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। ভূমিকা সাহিত্যের একটি পল্লী হাতের কাছে থাকলে হয়তো অনেকের পথেরদাস কম করতে সুবিধা হতে পারে। এই কথা মনে করে করেক বছর আগে নির্বাচিত ভূমিকা সাহিত্যের পল্লীর কাজ আ করেছিলাম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, ভূমিকা পল্লী সম্পূর্ণ নয়। ইহা নির্বাচিত ভূমিকা সাহিত্যের পল্লী যার একটি কথা উল্লেখ করতে চাই, নির্বাচিত ভূমি সাহিত্যের পল্লী এইভাবে সাজানো হলো :

ভূমিকা লেখকের নাম / গ্রন্থের নাম / গ্রন্থ লেখক / গ্রন্থ প্রকাশের স্থান / প্রকাশ কাল।

অক্ষিতকুমার ঘোষ / ছড়াবাটা / জীবনতারা হালদার / কলিকাতা/১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

অক্ষিতকুমার ঘোষ / বাংলা বঙ্গালয়ের ইতিহাসে উপাদান / শচর ভট্টাচার্য / কলিকাতা / ১৯৮২।

অক্ষিতকুমার ঘোষ / বঙ্গর পত্র : বঙ্গভূর বিভূতি / বিভূ বসু (বঙ্গানুবাদ)/কলিকাতা/১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

অনিলকুমার সেনগুপ্ত /চন্দ্রিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ে জীবনী / রায়গোপাল সান্যাল (প্রথম সংস্করণ ১৮৮ সালে প্রকাশিত হয়) / কলিকাতা/১৯৮৪।

আবদীন্দ্রনাথ ঠাকুর / নষ্টনীড়ের মাঝ / জাতী উদ্দীন / কলিকাতা।

আদিম

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

তোমার শরীর সমুদ্র পাহাড় তোমার ভাষাই নদী,
তোমার হলকা হাসির ঢেউয়ে দমকা ঝাঁকের পাখি
যা-চরাচর উচ্চারণের মুক্তি রুমাবদি।

মুগ্ধ কুমুদ উজান ঠেলে তোমারই নাম রাখি।

তোমার নামেই আদিম প্রণয়....তোমার নামেই নাম,
তোমার পিদিম ঘুটিয়ে যেমন আকাশ জেগে থাকে—

তোমার চোখেই চোখ রেখে এই আমাদের সংগ্রাম।

তুমিই সবার নামের নিবাণ এমন মূর্তিপাকে।

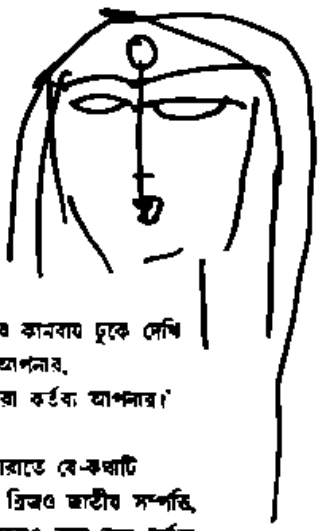

দিগভ্রান্ত

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কখনো মেঘের ছায়া শরীরে জড়িয়ে আমি ট্রেনের কামরায় ঢুকে দেখি
লেখা আছে দেয়ালময় 'এইসব লাইন, এই ট্রেন আপনার,
এই ট্রেন জাতীয় সম্পত্তি, একে রক্ষা করা কর্তব্য আপনার।'

অন্ধকারে আলো জ্বেলে হাওড়া ব্রিজের বুকে মধ্যরাতে যে-কলাটি
লেখা আছে চুপি চুপি দেখি, তারও অর্থ হাওড়া ব্রিজও জাতীয় সম্পত্তি,
পরোক্ষে আমিই সেই ব্রিজের মালিক, তাকেও রক্ষা করা কর্তব্য
আমার।

গোধূলি সন্ধ্যায় আমি সাবিধান ঘেটেঘুটে যতর্কিতে স্পষ্ট বুঝতে পারি,
জাতীয় সড়ক আর জাতীয় পারকসহ অনেক কিছুর সঙ্গে আমিও অজ্ঞাত এক
জাতীয় সম্পদ। অথচ বিপন্ন আমি। আমাকে রক্ষার জন্যে বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি
বা সতর্কতা জারি হয়নি আমার চারদিকে। বলা বলা ঐতিহ্য ও আভিজাত্য
চাপিয়ে দিয়েছে কেউ আমার যজ্ঞাতসারে আমার ওপর।

অনেকের খেয়ালই থাকে না, অর্থহীন মানুষেরা আভিজাত্যে ভর দিয়ে
কোনদিন আকাশে ওড়ে না। কেননা, তাদের সেই কল্পনার ব্যক্তিগত ডানা।
এইসব ক্রেনেভনে দু-মুঠো অন্নের জন্যে রোজ ভাবি বলে ফেলি, 'আজই
যাবতীয় ট্রেন, ব্রিজ ও আভিজাত্য আমি তবে বেচে দিতে রাজি।'

ভাবি, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারি না।
কেননা, আমারই ছায়া রোজ রোজ মেপে যায় আমার সীমানা।
মাথা নিচু করে আমি চুপচাপ
ছায়াটার দিকে চেয়ে থাকি।

জ্বর ছেড়ে গেছে

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

আমার দু'লো কপাল
আল-গেছে ছুঁয়ে আছে
কারও ফেরে ওঠা হাত....

আজ বেশ মন ভাল আছে।

অতি বৃদ্ধ মেহগনি টেবিলে
পথা আর ওষুধের
নামের নাম ছাপিয়ে
শুয়ে আছে মেয়েলি রুমালে....

রুমালেরও ডানা থাকি নাকি
পাখিদের মতো?
কখন তারা ঢুকে গেছে
অসুখের ঘরে
কেউই দেখেনি তা।
অতি বৃদ্ধ মেহগনি কখন যুবক বৃদ্ধ হয়ে সেই সব
নতুন পাখিদের দিয়েছে আশ্রয়
তাও কেউ দেখেনি সংসারে।
বিদুল জ্বর আজ ছেড়েছে আমাকে....

আজ বড় মন ভালো আছে।

সেই সব পাখিরাও এখন
গেরস্তের কাজে মেতে আছে।।

তাই হবে, তাই হবে!

মধু গোস্বামী

তোমার কথা
শ্রাবন মেঘের মায়া,
আমার কথা
চৈত্রদিনের খরা,
তোমার কথা
শান্ত বটের ছায়া,
আমার কথা
তপ্ত বালির চরা।
বলছো তুমি
আমায় বেঁধো হাতে,
আসতে কেবল
তোমার কথার সাথে।

বলছো যখন

তাই হবে, তাই হবে!
তোমার কথায়
ছন্দে সুরের ছোঁয়া,
তোমার কথায়
গন্ধে গোলাপ ফোটে,
আমার কথায়
ঘর পোড়ানো ধোঁয়া,
আমার কথায়
বীভৎসতা যান ছোটে।
বলছো তুমি
আমার বোবা হোতে,
ভাসতে কেবল
তোমার কথার স্রোতে!

বলছো যখন
তাই হবে, তাই হবে!

তোমার কথায়
দখিন বাতাস বয়,
আমার কথায়
কাল বোশেখীর ঝড়,
তোমার কথায়
কোকিল কথা কয়,
আমার কথায়
বাজের কণ্ঠস্বর।
বলছো তুমি
আমায় বোবা হোতে,
ভাসছে কেবল
তোমার কথার স্রোতে।

বলছো যখন
তাই হবে, তাই হবে!

তোমার কথা
অতল ঘুমের রাত,
আমার কথা
পাখার ভাঙা দিন,
তোমার কথায়
স্বপ্ন বাড়ায় হাত,
আমার কথায়
গ্র-মেলে দুর্দিন।
বলছো তুমি
আমায় বোবা হোতে,
ভাসতে কেবল
তোমার কথার স্রোতে।

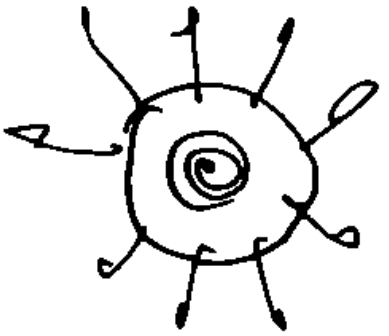

বলছো যখন
তাই হবে, তাই হবে।
আমার সময়, তোমার স্বপ্নে
স্বপ্ন মিটুক তবে

ত্রিমাত্রা

মধুসূদন দাশগুপ্ত

মনের ভিতরে ঘন অবগুণ্ঠন
ঘরে বেঁধেছি তোমার জন্য
সেই অন্ধকারে আদিম বন্য
প্রাণ সম্ভবা আলো অগণ্য

আছে রূপহীন কিছু হিংস্রতা
প্রতীক প্রতিমা কিছু বুনোলতা
বিষ শব্দাবের নীলশূন্যতা
উদাসীনতা ও বর্ণময়তা
ঘরে বেঁধেছি তোমার জন্য

তবুও গভীরে পেতে রাখো কান
অস্তিত্বের সবুজ জোগান
শব্দবিহীন আছে টান টান
ঘন আড়ালেও আলোর বিহান
জোগাবে তোমাকে শুভ্র অন্ন
মনের ভিতরে আছে সব।

কবির আড়ালে

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

হলুদ জোৎস্নার তীরকল
নাচতে নাচতে উড়ে যায়
ঠাণ্ডা নরম তার ডা
একটি পাটাতনের নীচে বাসা বেঁধেছি
ঝোপ ঝোপ সাদামোম ঘ
কতটা তা বেড়ে উঠবে কে জানে
মৌমাছিদের বসন হবে না
এ তো আমি জা
কল্পিত ভয় ও ভাবনার
আমার অস্বাচ্ছন্দ্যে
আমি ক্রুদ্ধ হত্যাকাণ্ড ঘটা
ভাঙলাম গোপন বাসাটা
যা আমি বানাতে পারি ন
কবি তো এসব মোটে সহ্যই করতেন
লিখছেন মৈত্রেয়ী
ভাগ্য ভাল, কবি আজ নেই
যে যা পাবে সে তেমন করে নেয়
কবির আড়ালে—

সারা দুপুর শব্দ হয়

মানস চক্রবর্তী

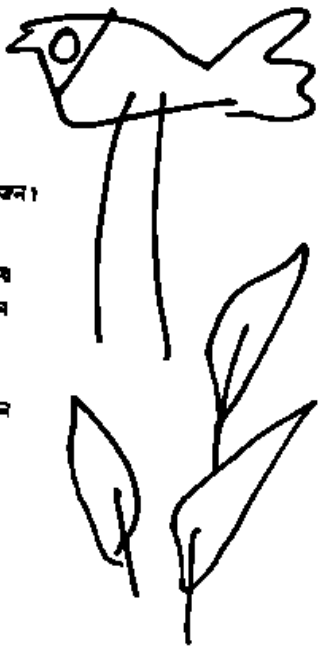

সারা দুপুর শব্দ হয়
কাকে খোঁজে শব্দভেদী বান!
খুকলি উড়িয়ে, তার
খুটো করে কাঠ-ঠোকরা-
বৃক্ষ, তুমি ঠিক জানো ওর কী প্রয়োজন।

আশ্রয়-বৃক্ষরা আছে শব্দেরও
তাই সমাধীতে মানুষ শব্দ ফিরিয়ে দেয়
জীবনের নিঃশব্দ-অবকাশ বড় প্রয়োজন
বৃক্ষ কোটরে কাঠ-ঠোকরা যেমন
শতাব্দীতে মৃত্যু কিছু খোঁজে।
কতদিন তোমাকে খুঁজেছি আমি তেমন
শব্দ শুধু বাড়ে
অতিক্রম ক'রে অবকাশ আসে না।

সাম্প্রতিকগুলি

তারানাথ আচার্য

প্রতিদিন খুলে নেয়া হাতের পায়ের সব ছল
খুলে নেয়া অবিকল
রেখায় রেখায় টান, ঢেউ ভেঙে একা চলা নদী—
নদীস্নান, সুবাতাস কাঁপে,

তরঙ্গিত গন্ধবহ সেইসব কুলি ভ'রে নিয়ে
একদিন ঠিক ফিরে যাবো

অবিরল বাতাস দিয়েছো ব'লে ব'লে আজি আসে
অনন্ত বিছিয়ে দাও যদি!

গাতার লিখন যতো সমুদ্রের জলরাশি আঁকে
বৃথাস্তব্ধ শব্দীত করে ছন্দহীন সাম্প্রতিকগুলি।

পাথর ভাঙছে জল

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

পাথরে জলের স্রোত ধাক্কা মারে ভীষণ গর্জায়.....

সহজ সরল জল গতি তার ছিলো সাবলীল
সে জল এখন কেন ফুঁসে উঠে! এতো তার ক্রোধ
কোথা ছিল কোন খানে ছিল! ঢেউ নীল নীল
বর্শা ফলকের মতো ক্রুদ্ধ বুক—তার প্রতিশোধ।

পাথর জলকে বেঁধে রাখতে চায় কঠিন শাসনে
জল নয় ক্রীতদাস। বাঁধন ছেঁড়ার গানে কল্লোলিত স্বর
যতবার ভাঙতে জানে ছুঁতে চায় শিখর
বর্ষিত হিমের স্তরে মুখ ঢাকে গোপনে গোপনে
জলের শক্তির কাছে পর্যুদস্ত ক্রমশ: পাথর।

ফুঁসে জল ঢেউয়ের ঘুড়িতে তার সন্ত্রাস বিস্তর।

সে জেনেছে পাথর ঘাটায় নম্র সমুদ্র শাসন
স্বাধীন সুখতে তাই ছল্ ছল্ খল্ খল্ হাসির তুফান
ঝড়ের প্রহরে দেখে প্রলয় আহবে নাচছে কালার জননী
চোখে নীল স্বপ্ন ঘুকে চাঁদ মাল—স্পর্ধিত যৌবন
নিঃশব্দে কাঁপিয়ে দিচ্ছে হিমরাত সত্তার ধমনী।

পাথুরে স্তব্ধতা ভাঙে জলের ধাক্কায় যেন মানুষের উদগ্রীব চেতনা।

নিসর্গ জার্নাল

অজয় নাগ

ঘরের চারটে দেয়াল সরে যাচ্ছে
জানলার পাখা পক্ষাঘাত....

আকাশের এত রঙ
আমি কি নিতে পারবো

পদ ডাকছে

হাঁটতে হাঁটতে রেখা বসতে যায়
যা ছিল দণ্ডিত
এখন উত্তর মেরু

মাথার ওপর থেকে ঝুলন্তার
চন্দ্রাতপ খসে পড়ে
নদীতীরে লেখা হয় জলের অন্য নাম।
ছিন্ন সাগীত
যশোধরা রায় চৌধুরী

যেখানে যেখানে যাও, বুঝতে পারি। একা থাকি জলে
জানি যে তুমি যে শূন্যে বিচরণশীল
সে শূন্যে সম্পদ আছে, শীতল মাথার
বৃষ্টি অযুক্তির সেই সীমা আছে, সোজা রাস্তাঘাট

আমার মাথার মধ্যে গিজগিজ করছে বিষণ্ণতা
না, কল্পটা ভুল হল, বিষণ্ণতা নয়
সময় যে নেই তাই উপদ্রব, সংখ্যা, পরিসীমা
হাতবাড়ানোর কষ্ট, ভুল বোঝা, রাগ, নিরস্ত্রণ....
যুক্তি অযুক্তির বাধা লঙ্ঘন, লঙ্ঘন

সবকিছু ঘেঁসে শুধু অতৃপ্তি ও ভয় খেলা করে
দৃষ্টিতারা বেঁকেচুরে যায়

তবুও তো সেবব্রাশ বুঝতে পারে, স্পষ্ট দৃশ্য, মাথা-পারঙ্গম,

তবুও তো সেবব্রাশি বুঝতে পারি, তুমি
কোথায় কোথায় গেছ, কি কি ভাবে ভেবেছো আমাকে।

বড়দের থেকে ওরা বেশি জানে

রথীন সেনগুপ্ত

একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুদ্দাড় নেমে আসে পথে।
অসংখ্য যন্ত্রের ঢেউ তুলে দিয়ে কিচির মিচির
যেন একঝাঁক পাখি শূন্যে চকিতে উড়ে যায়।
দু'পাশে বাড়ির সারি-পথ মেপে ঘুরে ওই উজ্জ্বল আকাশে
কোথায় চলেছে ওরা? খোলা মাঠে, নাকি কোন ফুলের বাগানে!
এখন শাসন নেই, বাঁধন ভ্রুকুটি নেই, নেই কোন বড়দের ভিড়,
কর্ণার মত তাই দুরন্ত পায়ে পায়ে ওরা নেমে আসে।
মন কেন তরতাজা খুশি হয়ে ওঠে এই রৌদ্রে হাওয়ায়
বড়দের থেকে ওরা বেশি ভাল জানে।
পথের কুকুরটিও সঙ্গ দিতে পেয়ে খুশি—ছোটে সাথে সাথে।

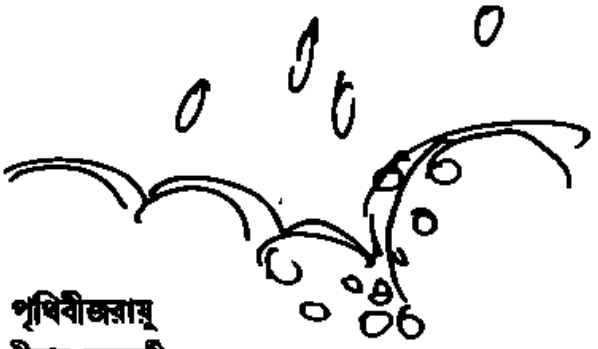

পৃথিবীজরায়ু

ধীমান চক্রবর্তী

কিছু কিছু মানুষের জীবনে পৃথিবী
অনুপস্থিত থাকে পরস্পর কয়েকদিন
শত শত বছর ধরে এরকম
ঘটে চলেছে জানি। আকাশ-রাস্তায়
জমে থাকা কাদা নেমে এল
পৃথিবীতে, জ্যান্ত মাওর ঐ রাস্তা।
ফিরে চলে যায় ঘরে। সাদা স্মৃতির
ধূসরাবলী ঋতুর গন্ধে বুঝতে পারে
ল্যাজ ঘুরিয়ে নক্ষত্রও
উল্কোজাহাজ ঘেরে চলেছে পরস্পর
ভেদ ক'রে। যারা পাশে দাঁড়িয়ে
লক্ষ্য রাখছিল, ঐ অজানা
চালক,-সব মৃত। শুধু বিমানক্ষেত্র
নিজের বিভিন্ন মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে
দিলে বুঝতে পারি উড়তে ওর করবে
অনুপস্থিত জীবন ও পৃথিবীজরায়ু।

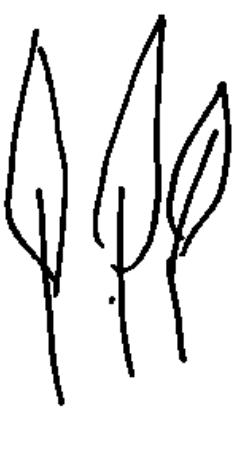

প্রোহকাল ঃ ৫

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয় উদ্যানে আজ নৌরসী পাটার সুখ পুড়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়,
দুবারপাতের নীচে চাপা পড়ে যায় পরীর মানুষের জলছবি। সমবেত কা
নবুর শেষম দিয়ে পুনর্বার নিজেকে সাজিয়ে নেয় চলিত জীবনে।
বীত-বুদ্ধ-আত্মা-রান আধার তুলেছে কলরব। ধর্ম নয়, ভক্তি নয়
সেবসেব পালাগান লেখা হচ্ছে নতুন আবেগে। ওধুই ভোটের জন্য
ঘৃণা ছলাকলা। ওধুই ভোটের ভনো ধর্মের নামাবলী গায় ধর্মান্ধ সাজা
প্রোহকাল, এ-সময়ে উদাস থেকোনা।

তোমার ছায়ার মমতা দাও জলকালো মেঘ আর বাতাসের ভিড়ে।
কৃষকে তোমার দিন শেষ। উত্তরাধিকারের কাল্পাভেজা মাটি
খিল খিল হেসে উঠে ঘিরে। চুপচাপ মেঘে—গলানো লোহার মত লোভাত্
চোখে
কতখানি বিবাদ্রা ক্রন্দন: গেরস্থ হতে পাশে বসে প্রতিবেশী বোবে।

আমাদের বাসতলো এখনও নরম। এখনও রাতের আড়ালে ঘুম
কোটে।
উন্মুক্ত হাওয়ায় থাকে মনস্তাপ অজ্ঞানের চাবলের গান। নিস্তব্ধতায়
বিস্ফোরণে প্রতিবাদী তলতলি ও মুদ্রা ফুটে ওঠে। বিস্ফোরণের
সিসুমোগ্রাফ হৃদয়ে বিদ্ধ হ'য়ে ফিরে যায় রুটি ও ভাতের দাবী নিয়ে।
পারঙ্গম ভূস্বীলবদের হুনুতে ঝুলতে থাকে ভয়ের বাদুড়।

প্রোহকাল, এসময়ে উদাস থেকোনা।
মানুষের পাশাপাশি থেকো, এর থেকে বড় ধর্ম পৃথিবীতে আছে।

নিরাবরণ

গৌর খাঁড়া

কোন আবরণে ঢাকবো তোমায় সত্য এবং সুর্য
যে রঙে সাজাই সে ও তো তোমার আবরণহীন অঙ্গ
কোন আবরণে ঢাকবো তোমায় হিমালয়
দূর থেকে বিনয় তোমায় ঘিরে পড়ে অবিরত
কোন আবরণে ঢাকবো তোমায় সমুদ্র
নীল পাখনায় জ্বলে ওঠে ধ্রুবতারা
কোন আবরণে রাঙাবো তোমায় নীহারিকা
যতদিন যায় আলোকবর্ষ সুবর্ণলতায় ঘেরা
কোন আবরণে সাজাবো তোমায় আকাশ
অন্ধকার যদি ঢেকে রাখে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ

কোন আবরণে সাজাবো তোমায় সুখ
নিরাবরণ নিরাভরণ সত্য যে সব রাগ
কোন আবরণে সাজাবো তোমায় প্রিয়
তুমি আছো, আমি আছি আর আছে অনুরাগ।

ভারতীয় ট্রিওলেটগুচ্ছ

অরুণাভ ভট্টাচার্য

ওরো পাপবোধ লুকিয়ে রাখার নয়
একপাশে জল ; শেষরাত হতবাক
ওলো লিরিক জলে ভেজা, তীর পাখে—
মনে হয়েছিল জড়োসড়ো, পরাজয়।
সেই বনপথ, পথেই পড়া গ্রামদেশ
তামসিকভাষ নীলাদ্রিত (হাসি) যেন
তবু কেন পাপ লুকিয়ে রাখার নয়
হে লিরিক, যেন শেষরাত,—হতবাক।

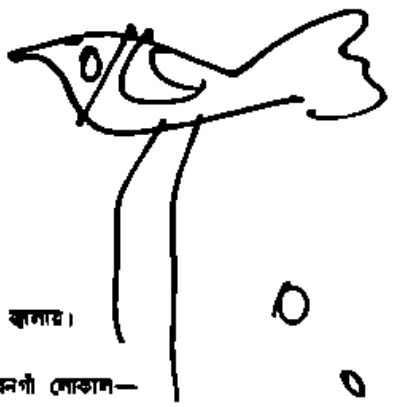

সোমেশ

কুমারেশ চক্রবর্তী

কোলকাতার রাজপথে আলো জ্বলায়।
রিপোর্ট নেয়। রিপোর্ট লেখে।
তারপর, অগত্য ভিড়ে ঠাসা বনগাঁ লোকাল—
লেট রান—মাকরুত—
বাড়ির দিকে সোমেশ

প্রায় ফাঁকা স্টেশন চত্বর—
সারিবদ্ধ বন্ধ দোকানপাট, হকারের ডালা
কৃতজ্ঞী পাকিয়ে সাট্টা জুয়ো পুলিশ বাঙ্গালনদ
দিনের অত্যন্ত কর্কশ তার স্বাভাবিক রাস্তাটা
এ সময়ে যেন অস্বাভাবিক রকমের মসৃণ, ফিনফিনে
চাঁদের গোপন অঙ্গের মত আকর্ষণীয়....।
অন্ধকার ফুঁড়ে উঠে আসা জোনাকের দল
তাকে ঘিরে বৃত্ত আঁকে, আর—
সে একবার কেন্দ্র থেকে পরিধি, আবার
কেন্দ্রের পথে হাঁটতে হাঁটতে
হারিয়ে যায় রাতের মধ্যে—

আমাদের যতটুকু উত্তেজনা, ততটুকুই নিয়মমাফিক
যে ডাক্তারবাবু তার নার্সিং হোমের ঠিকানা দিয়েছেন
মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যু পরিবারবর্গকে
তাকে একটু মানবিক হতে বলি
যে উকিলবাবুর রক্তচক্ষে সর্বশান্ত এক
বাপ মা নয় ভাইপো
তার কাছে দাবী করি ন্যায়বিচার
আর মালিক শ্রমিক প্রতিনিধি যোগাযোগে লক-আউট কারখানার
গেটের সামনে বিক্ষিপ্ত করি—বিপ্লব দীর্ঘজীবি হবে।

কুহেলিকা পথ

চিত্তরঞ্জন হীরা

হয়তো কুহেলিকাই একদিন ইতিহাস হবে।
দুধির কর্ণার পাশে সলজ্জ পাথর এসে দাঁড়াবে
নিবেদন হিতার্থে। সত্যের পরমায়ু লিখবে—
পাথর না কর্ণা কে বেশি মানবিক।
কে বেশি প্রস্তাব বুকে নিতে পারে উপভাষা শরীরের।

এক একটা বিকেল কেমন পাথর মসৃণ
হেঁটে যায়। একেকটা কর্ণা যেন অনন্ত রাত্রির।
তখন নর্মদা খোবাই লালা হাত গড়ানো কিম্বকে
অনড় স্বপ্নের পাশে কর্ণার মত
একে প্রলাপ অথবা কুহেলিকা যাই বলো—

কোনও কোনও দিন অন্ধুর বালিকারা আসে।
জোৎস্না হাসির কোলে পুতুল কান্নাকে রেখে
চলে পড়ো-জল, জল মানে মাটি।
পড়ো-আকাশ, আকাশ বলতে ৪-৫ পারদের
ওঠানামা কাঁচ কর্ণার ঘড়ি বেয়ে।

এখন যে কণ্ঠনালী প্রবাহের কাছে খুলে দিতে পারে
পাথর বাসনাকে একদিন সে—ই ইতিহাস হবে নাকি।

গুহাচিত্র

আনসার উল হক

গুহার ভেতরে তুমি
যেখানে দাঁড়িয়ে আছ
সেটা জেনো শেষ নয়, তারো শেষ আছে
সুড়ঙ্গবাহিত হয়ে দেওয়ালের খাঁজে
তুমি আছ রেখা চিত্রে
পাথুরে হাওয়ায়
ইতিহাস রাখে নাই কোন সীমারেখা
অরণ্যভ্রষ্ট হয়ে
ঘুরে ফেরো বিদেশী বন্দরে
দিপাশায় খুঁজে ফেরো শিশিরের জল
অচেনা বিন্যাস তবু চেনা চেহারায়
শীতার্ত হাতড়ে চলো আবার আদিমে
গুহাচিত্রে আলুথালু মনের গহনে

হাসো হয়ে কি যে খোঁজো মেয়ো পথে পথে
দায়া মেহে সোনা জল
পাতে পাঁক-কাদা
দু-কোঁটা দুধের রং দু'রকম স্বাদ।

বিভ্রম

বোধিসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদীপের বুকে নীল শিখা জ্বলছে
—জ্বলছে
কেঁপে কেঁপে ওঠা শিখায় আলো
যেন একটু বেশি এলোমেলো
তবুও আমার চোখ দু'টি যা দেখেছে
আর কারোর তা দেখার কথা নয়
প্রমথ—
তুমিও আমার মত করে বল্লে
ঐ সিঁড়ির ধাপের পাশে ছায়াগুলো
বড় বেশি আবছায়া কালো
তবে কি
সব আলোর কিছুরণ
পথ হারিয়েছে
কোন এক কৃষ্ণ গহ্বরের আবর্তে
ছেলেটা বাঁশী হাতে বটবৃক্ষতলে অপেক্ষায়
কোমল মেয়েটা জানালার ধারে বসে
এক-দৃষ্টিতে পূর্ণচাঁদ দেখছে
রূপালী আলোয় ভেসে গেছে ওর কিশোরী শরীর
বাঁশীর বুকে মুখে ডুবিয়ে
অকল আবেশে ভাটিয়ালী সুর সেধে সেধে
ঐ বাঁশুরিয়া ছেলেটির ঠোঁট হয়েছে সাদা—
—কি বিপজ্জনক সাদা
কিশোরীর চোখ বেয়ে
দু'ফোঁটা জল নিঃশব্দে ঝরে পড়ে,
কেন আজ এত অচেনা সব—
—সবই
আলো, আবছায়া অন্ধকার
ঐ বটবৃক্ষ
বাঁশী হাতে ছেলেটি
রূপালী আলোয় ভেসে যাওয়া কিশোরী
তুমি, আমি.....
তবে কি
আমার দু'চোখে যা কিছু দেখা
সব, সবই বিভ্রম
সবই মরীচিকা!

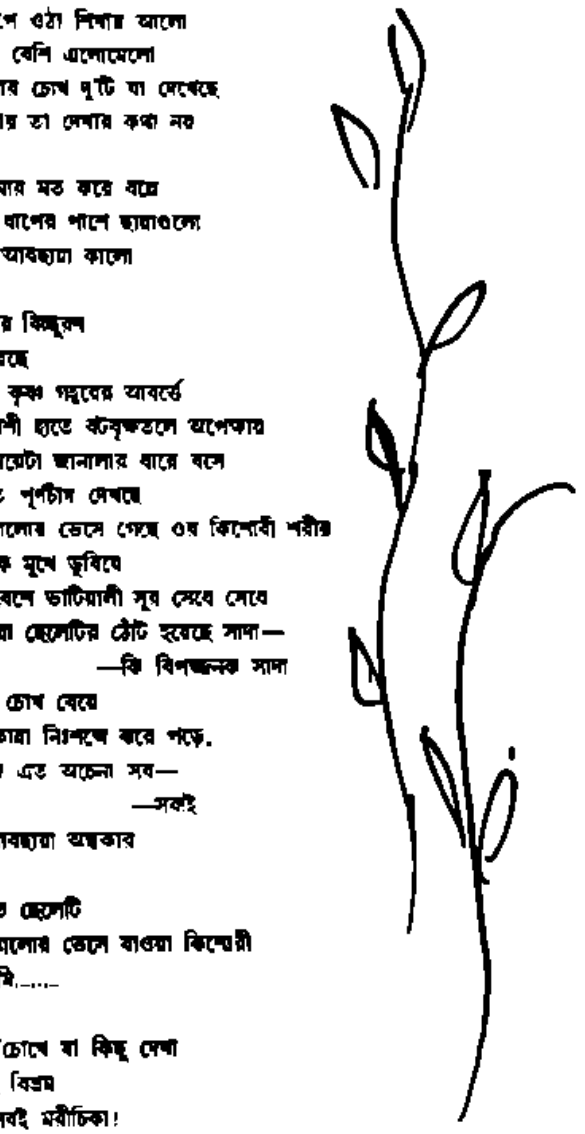

ব্যাক হচ্ছেওভাল

সুবিমল চক্রবর্তী

কোন ইচ্ছেই পূরণ হয় না
তবু এখনও জেগে আছে
বাকি ইচ্ছে গুলি

দুঃস্বপ্নে দুঃস্বপ্নে
দুচোখের মণি ঢুকে আসছে
তবু বেঁচে আছে বাকি ইচ্ছেগুলি

অন্ধের মত হেঁটে যাচ্ছি
শুধু আলো খুঁজে বেড়াচ্ছি
কপালে জমা হচ্ছে লাশ

আমাদের চোখ নেই বলে
কিছুই দেখতে পাই না।

দিনগুলি গড়িয়ে যায়
কোন ইচ্ছেই পূরণ হয় না
আকাশে তারার মত
শুধু ঝুল ঝুল করে
বাকি ইচ্ছেগুলি।

যে কথা তোমাকে বলতে পারিনি

অচিন্ত্য নন্দী

ঘন সবুজের ওপরে সরষে ফুলের আস্তরণ দেখে
সেজানের ছবির কথাই মনে হবে। ঘাসের ওপরে
রূপোলী শিশির বিন্দু তোমার কান্না ভেজা চোখ দুটি।
রোদ ও দমন হাত ধরাধরি করে এলো যেন দুই ভাইবোন।

যে কথা তোমাকে বলতে পারিনি কোন দিন, আজ যদি
নিজস্ব ভাবার অধিকারী, সে কথাই কি বলা যাবে ঠিক সেই
পৃথিবী বদলে গেছে অবলুপ্তির দিকে, আমিও তো ধীরে
ধীরে জীবাশ্ম হয়ে উঠছি সংগ্রহশালার প্রয়োজনে।

বেডসুইচ

পরেশ সরকার

হাত বাড়ালেই বেডসুইচ অথচ আমার
আলো জ্বালতে ভালাগেনা
তাকালেই ড্রেসিং টেবিল আয়না, আয়নায়
বিষণ্ণ ছায়া মেঘ থেকে প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে
সেই মুখ অপমান ঘৃণা সাংঘাত বিয়োগান্ত নাটক
তাই অন্ধকারে ঢেকে রাখি কালো চাদরে-শরীর.....

হাত বাড়ালেই জলপ্রপাত,
এতো তৃষ্ণা চোখে ঠোঁটে
অস্থিরতা ঢেলে রাখি নীল জলরাশি
অবশ হয়ে আছে মন এশবীর হৃদয়
অহল্যা পাষাণী, আমাকেও করবে পাষাণ।

হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যেত সেই হাত স্পর্শসুখ
শরীরের নীল ঢেউ চলকে আসতো বাতে ঠোঁটে ঠোঁটে
আমাকে ভিজিয়ে দিতো আবেগী বর্ষামুখরা যে নারী
তাকে ছুঁতে এতো যে সঙ্কোচ পৌরুষত্ব সেই বলে নয়
অপমান বোধ, বিশি কাঠে আজও বুকের ভেতরে
দ্বারপোকা, আয়নোলা মায়ার প্রভুত্ব স্নেহকরাও তাদ্রাগেনা.....

ফিরে যাওয়ারে সেই প্রস্তাব এনেছিল প্রেম
চেতনার এই পাবলামেন্টের নৈতিক অধিকার আছে কিনা
প্রশ্ন তুলেছিল, তোমারও কি মনে হয় ইম্পিচ
করা যায় এ আমাকে এ দেউলে আমাকে, কাঁটার মুকুট
ওই সোনার টুপিটার জন্যে, তুমি হয়তো এখনও কাঁদো ভাবো।

বিশ্বাস করো হাত কড়া করা বিচারাধীন কয়েদীর মতো
এখনও হাজত বাসে বসে আছি জীর্ণ বাসে ভাঙাশরীরে
কাঠগোড়ায় তুলে এনে, আর ওভাবে যেন বন্ধুরা তোমরা
মুহূর্তেকো দিয়ে তোমো শাস্তি মুহূর্ত প্রার্থনা করবে না জেনো
বেডসুইচ কি হবে আর সেই নারী মুখ ভাসবে ঘরা কাচের আয়নায়.....

দেশ বধ্যভূমি নয়

বিশ্বনাথ রাহা

খোলো চোখ এইবার
ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে কালো ধোঁয়া
কার্বন মনোক্সাইড—
শরীরে তাঁজে তাঁজে ঢুকে যায়—
বিষাক্ত নিঃশ্বাস, পরিবেশ দূষণ।

শ্বেত কলোনের তানায় ক্ষতচিহ্ন-
এ তোমার এ আমার দেশ।

একদিন অযুত স্বর
ছুঁয়ে পড়া রক্ত পড়া—
দুঃখের টুকরো টুকরো—
এ কোন বধ্যভূমি।
পঞ্চকন্যার বিশাল সঙ্কটে।

এরপর.....
ধলিত প্রহরে উদ্যত মুহূর্ত,
এ দেশ তোমার
আমার এ দেশ।।

ঈশ্বর দর্শন

মানসী বাগচী

চার দেওয়ালের বাইরে নেমে দাঁড়ালাম
খোলা আকাশের নীচে,
দিনের আলোটাও অন্ধকারে ঢেকে গেছে—
অনুভূত হ'লো ঠিক—১৯৯৮-র ২রা জুন মঙ্গলবার।
দুটি চোখ খুঁজেছিল চিরশান্তিতে
ঐ অসীম উন্মুক্ত আকাশেই নিথর দেহটা পড়ে আছে।
নিদ্রাহীনের নিশ্চিন্ত চিরনিদ্রায় নিথর
ক্ষোভে অভিমানে আর আপশোসে
নিজের সৌকুমার্যে একটুকুও টোল পড়েনি।

ঘরের ভিতরটা জমাট বাতাস—শ্বাসরুদ্ধ প্রায়
বুকভাঙা অভিমান তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে
আছড়ে পড়েছে সেদিন সূর্যাস্তের বিকেলে।
বুকের গোপন উর্বরতায় সত্যি সত্যি
আজ লোনা ধরে গেছে।
শুধু একটু একটু করে যাওয়ার পালা।

বুকের ওপাতায় সোমত্বালো মোচড়ানো ছবিখানা
কী হবে। কেন এ পরিহাস্য ও বিড়ম্বিত জীবন।
আবার আছড়ে পড়ে ভূমিতলে
সত্য এত নিষ্ঠুর, জীবন এত সত্য। প্রিয় এত প্রিয়তম।
পারবো না—পারবোনা মানতে, ছেড়ে দিতে, ছেড়ে যেতে।
কোথায় ঈশ্বর.....দেখতে চাই তাকে।
অযুত বিশ্বের বুকে কে সাজালো
এমন ক্যাকাসে বেশে
জীবনের এমন সাজ—এটাই কি ঈশ্বরের রূপ, ঈশ্বর দর্শন।

রক্ত

শম্পা বাগচী

সুবিশাল পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনেছো।
চব্বিশ ঘণ্টাকে বড় কম বলে
মনে করো তুমি।
ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার
করছো পৃথিবীর তিনটি কোনে।
তাবছো। আরো কত সাম্রাজ্য
করা যায় পৃথিবীর তিনটি কোন্।
বিভিন্ন মিটিং, কনফারেন্স, কনভেনশনের
সবই তোমার প্রয়োজনে
রঙিন হয়ে যাচ্ছে।
রঙ। না—রক্ত আশ্চ কোরনা তুমি।
তুমি সবই ভুলেছো
পৃথিবীটা এক বেদীর নীচে

শত পঁচনি দিয়ে গেঁথেছো।
এখন চাইলেও তার বন্ধের
ছোঁওয়া তুমি পাবে না।

দিনান্তবেলায়

অমলিতা খাঁড়া

এই যে উদাসী বিকেল
স্বপ্ন খোঁজে
দিনান্তের দিনান্তের কাছে—
আমি ওর হৃদয়ে
ফুটিয়ে দিলাম
বাঁশির সুরের মতো জোৎস্না—
একটি কাকলি তবে
আরেকবার বেজে উঠুক।

চিত্র

তাপস মুখোপাধ্যায়

সকালের তবু কিছু বক্তব্য ছিল
দুপুরটা ছিল নিশ্চুপ
সন্ধেটা চঞ্চল-মাতোয়ারা ছিল
রাত্রিটা তপ্তরূপ।

সূর্য তবু আড়ালে ছিল
বাতাসটা ছিল স্থির
মেঘ ছিল ক্রুদ্ধ-পাগল
প্রকৃতি গম্ভীর।

অতীতের তবু লক্ষ্য ছিল
দ্বন্দ্বে বর্তমান
ভবিষ্যতের দোদুল্যমানতা
অনুচ্চার শর্তমান।

বিলম্ব তাই

মুরারী মান্না

মাথার ওপর নীল আকাশ ছিল
পৃথিবীতে ছিল বসন্তের গান
রাতের প্রহরে প্রহরে শিয়ালেরা ডাকতো প্রতিদিন
জোনাকীরা দীপ নিয়ে দাঁড়াতো
আঁধারের খেয়া বেয়ে।
আমার পৌঁছোতে দেরী দেখে
তুমি ভুল বুঝলে—
তাইলে আমি ঠগ! প্রতারক ।

সত্যি কি তাই?..

যে মহান পথিক নিয়ে
এ পৃথিবীতে আমার পথ চলা শুরু
সে তাও শেষ হয় নি এখনো
আসতে বিলম্ব হলো তাই—
এসে দেখি তুমি নেই
চলে গেছো বন্ধুর!

ভুল লেখা

প্রভাত মিশ্র

ভুল লিখি
ভুল লেখাগুলি সব বছর বছর কলঙ্কিত করে শাদা পাতা
যে-সব শব্দ টেবিলের চারপাশে উঁকি-ঝুঁকি মারে
চিনতে পারি না
কে শত্রু বন্ধু কে
যে-সব রাত্রি জাগি কিংবা জাগব ভাবি
সেইসব রাত্রিরে ধুলো ওড়ে খুব
এই ধুলো আকাশটা ঢেকে যায় না আকাশের রঙে
লক্ষ্য না
যে-সব বেদনা স্বপ্ন করাঘাত করে
দরজা খুললে দেখি নেড়ি কুকুরের পাল ঘিরেছে তাদের

ভুল লিখি
কিন্তু এই ভুল লেখাগুলি, কলঙ্কিত শাদা পাতাগুলি
যখন আমার দিকে চেয়ে থাকে লজ্জানমিন
আমি সুখ পেয়ে যাই
আর চিৎকার করি
পালাবার কোথায়
সাদা পাতাগুলি সব ঘাতো থেকে ছিন্ন হয়
ঘিরে ফেলে আমার শরীর
উল্লাস নাচে
হাতে হাতে উদ্যত ত্রিশূল

পালাবার পথ নেই
কেবল জানালা দিয়ে যতটুকু চোখ যায় দেখি
শত্রুর শার্ট গায়ে বন্ধুরা ছোটে
বন্ধুর পাঞ্জাবী শত্রুদের গায়ে
তাদের ছাপিয়ে উড়ে আসছে রাশি রাশি ধুলো
দরজার দিকে চোখ, এগিয়ে আসছে দুঃস্বপ্নের কুকুর

কথা হাঁস

কালিদাস ভদ্র

রাত্রিকাল শেষ হয়
পদ্ম পাপড়ি পড়ে মাটিতে ঝরে
ঘরের ভেতরে ঘর, মশারির ভেতরে মশারি স্পর্শময়
দাঁড়ায় দরজার ভগ্নাংশে

নিভেনো আঁধার হেসে ওঠে
দুবুরি বাতাস ছোটে মাথায় তেরাস্কির বৃষ্টি
ঘরের ভেতরে ঘরে বিকলাঙ্গ ছায়া ফোটে
নিবিড় লবিশব, ঘুঁসে ওঠে বেহুলা নর্তকী

মাটি ডাকছে...
মাটি মুখে উড়ে যায় সারস্বত-জোতদার
জনপদ চুরমার, জল ডাকছে...
হিরোশিমা-নাগাসাকি শীতঘরে দাঁড়ায় কথাহাঁস

এসো সারস্বত-সন্তান,
চুলোয় যাক বমকাই বিজ্ঞান, কম্পুটার টিপে বুদ্ধ নয়
গাঁজা হোক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গান
পাঁজরে পাঁজরে ওড়ে কবিতার নিশ্চুপ আখর
ধুলি ঘরে ভালবাসা
মনুষ্যের মাতাটান।

কুয়াশায় ঢাকা নয়

গৌরাঙ্গ দাস

শরৎ এ আকাশটা'
যত্নমুকুল, ওভা শিওলি গন্ধে ওভ্র
তৃষ্ণার্ত হৃদয় আমার কতকাল দেখিনি তোমায়
হিম কুয়াশা শিশির ভেজা নেবতলি,
মাথায় ঘুমটা খুল,
আষাঢ়ের নিস্তব্ধতা গরমের উত্তাপে
বিন্দু বিন্দু শিশির ওলো
গলে গলে জল হল তোমার অহংকার।

রিটায়ার্ড

অংশুমান চক্রবর্তী

লাঠিওলো বসেছেন টেপানে সন্ধ্যা আড্ডায়—
—'কাল বুকে যন্ত্রনা, মনে হচ্ছিল প্রান যায়...!'
—'ডাক্তার?'
—'ছেলে বলে, কিছুনা বয়সের দোষ—
পেমসন্ পেয়েছিস। নসিত যে, বস্, পাশে বস্।
দুই বল—'
—'শেষ দাঁত এতদিনে সঙ্গীতে ছেড়ে—'
—'পালসলো? আমরাও দেখ হাঁপানিটা গেছে খুব বেড়ে।
কোন দিকে বাবি বল? কি বার আজ?
শনি? রবি? সোম?...?
—'আমাদের রোজ রবিবার। পথ?
সে তো খুটো-ওল্ডেজ হোম আর ফুরবন।

তিনটি অভিন্ন প্রতিক্ষন

অক্রুরপ্রসন্ন চক্রবর্তী

ইজিয়ান সাগরের তীরে আপেল শহরে
রোদের বারান্দায় স্মৃতির উপলে
বালুকী চুম্বন আঁকি লাজুক খেয়ালে।
ঠোঁট জল খেলা করে ঢেউ তোলে,
ছড়িয়ে মেঘ চিবুক গড়ানো হাসি।
ঘুর্ণেদা শঙ্খের ভেতর বসে
রোদিত ঘুমঘু চোখ
নৈসর্গিক ভাবনায় অনাবাধি
নীল ভূমি দ্যাখে।
আবেগের বালিয়াড়ি ঘিরে
আমার সম্ভব উত্তোন পেরিয়ে
জলের শরীর ছুঁয়ে
বোবা রোদ হেঁটে যায়।
ঘুরে আসুনি নদ হয়ে বহতা নদী এক
চন্দ্র বিন্দু রূপে উপস্থিত অহল্যার মত
চুবুল অপমান সয়ে
পরিব্রাজী নর্তকীর মত
সার্থকতা খুঁজে ফেরে।
আর ঘরের রাজপ্রসাদ গড়তে চেয়ে
কবুতর ক্রীড়াবত হয়—
মুঠোভর্তি মুকুল বাতাস
চরম উপেক্ষার ভাগমান ধুলো ছুঁড়ে দেয়—
বোবা প্রহর শুনে যায় তামাম পৃথিবী।

পোখরান। আর না

বাসুদেব চ্যাটার্জী

রাজনীতি করবার বয়সের সুত্র
স্বাভাবিক ঘোরার ক্লান্ত পোখরান
বালি ও ধোঁয়ার কালিমা লেখার
আকাশের নীল অবলুপ্ত।

হায় ভারতবর্ষ।
বাঁকা হাসি বুদ্ধ পূর্ণিমার রাতে
পরমা গজ্জাত্মির মুখে।

সেই রাতে—
রাজধানী কাঁপলো উত্তাল উল্লাসে।
নত শাখীরে নিজেদের শির চাপড়ালেন
জয়জানিতে নেতৃবৃন্দ।
হলো না কি ভগত সভায় দ্বারতের যোগ্য আবাহন!

হায় মুমূর্ষু বৃদ্ধ জনপদ:
ভটির বদলে খোলা
বাজের বদলে বেকারী।
প্রতিবাদে তাই গর্জে তুফান
মহানিদ্রিল ওঠে কলতান
সমর্প যোবণা
পোষরান আর না।

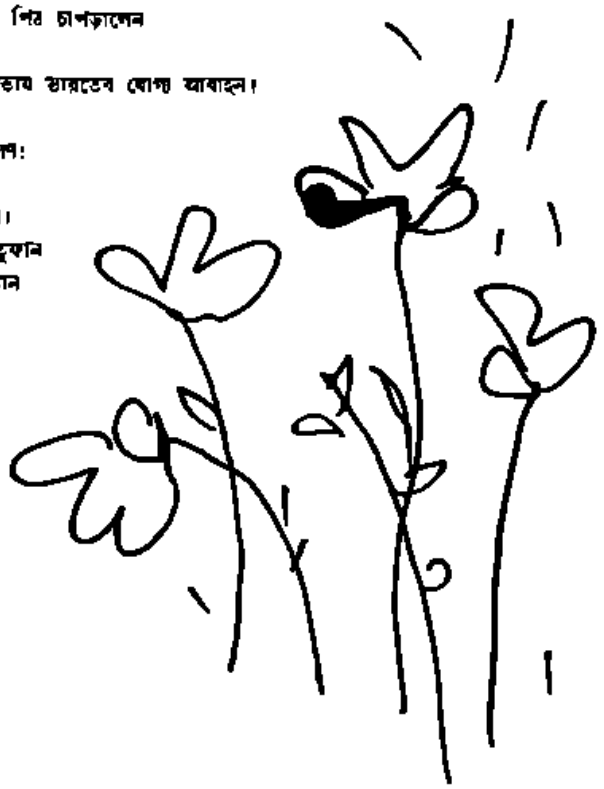

সেই চেয়ারটা
অমিতেশ মাইতি

একরকম অন্ধকার থেকে আরেকরকম অন্ধকারের দিকে
যখন আমি হেঁটে যাচ্ছি
তখন সেই নক্ষত্র, যাকে আমরা একদিন একসঙ্গে চিনেছিলাম
সেও এখন চিনতে পারছে না আমাকে
তুমিও নিশ্চয়ই তখন আমার প্রিয় চেয়ারটা বাড়িয়ে দিচ্ছ
অন্যজনের দিকে, বলছো আসুন-বসুন-চা খান
দোতলায় সেই রহস্যময় মানুষটি ঠিক ন'টা বলে বাড়ি চলে গেলে
তুমি বারান্দায় মেলে দিতে আসো
আজীবনের ভিজে জামাকাপড়
সেই সিল্যুয়েটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি তখন শুকিয়ে কাঠ।

'আমার রাতের পছন্দ হবে,
ছাত্র আমার বাড়িতে আসবে—' তুমি বলেছিলে।
আসুক না, ক্ষতি কী? দশদিক খোলা পৃথিবীর
অদৃশ্য উইসে দিয়ে যে কেউ যে-কোনখানেই ঢুকে পড়তে পারে
যখন তখন, শুধু
কেউ যেন না বসে ঐ দগ্ধ স্মৃতির চেয়ারে
আপাতত এইটুকু বিনীত নিবেদন।

একরকম অন্ধকার থেকে আরেকরকম অন্ধকারের দিকে
আমার পৃথিবী ডুবে গেলে
নিজেকে জিগ্যেস করি তুমি হাত কোথায় রেখেছিলে—
হাতে না হাতলে।

ভাঙনের কবিতা
পার্থ রাহা

জানিনা কেমন করে
আমাদের ভালবাসাবাসি
তোমার শরীরে আছাড় খাচ্ছিল
ঢেউ তোলে
আমাদের জীবন যৌবন ধনমান
সমুদ্রের সাঁতারে ভেসে
নিশ্চিন্ত সাক্ষী বিহীন

আধাবোচলা বাড়ির ছাদে কালসালো রোদ্দুর
হাওয়াদের শব্দহীন আনাগোনা
পায়ের তলায় ঘ-ব শহর
শব্দের অরণ্যে আমি অন্ধ বধির

সমস্ত অরণ্য সমুদ্র ভূমণ্ডল নগর
ঘরের ভিতর খেলা করে
তোমার আমার স্বপ্ন
হঠাৎ কখন
নীল প্রদীপের আলো
তোমার ঠোঁট, চোখ, ভ্রূ
আমার বুক কালো করে নেয়
আমাদের স্বপ্নরা খানখান
ক্লান্তি ঘন রক্তে টের কোন দুঃখ
কোন সুখ
আসা বেঁধে নেই

এখন ছাদের বাগানে
শুধু এক হলুদ শালিখের মৃতদেহ
ছায়া তার
দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘতর হয়
আলো মাটিতে তার পালকের রং
কালো
ঠোঁটের সীমান্ত রেখায় লাল নীল
রক্ত
আকাশে কী সঙ্গিনীরা অকূল কান্নার গানে?

তোমায় নতুন করে পাবো বলে
এই শহরের ঠিকানায় আমি
তোমার পাইন নীল নিস্তরঙ্গ সমুদ্র আকাশ ছায়া
দেশান্তরী পাখি
খুঁজে বেড়িয়েছি

ঘাসের শরীরে শুধু শিশিরের ক্রমাক্রম
নীল গোলাপের দীর্ঘতর ছায়া
তমসায় তিমিরের নির্জনতা

ফাইক্যাপারের ছায়ে
আমরা দুজন
আমাদের স্বপ্ন প্রেম মুক্তি আশা
ভেঙে পড়ে

বকুলতলা বাড়ির নির্মান
ভেঙে পড়ে
জীবন যৌবন অবসান
ভেঙে পড়ে
আমাদের অতীর্ণ উজ্জ্বল ভালবাসা।।

অনিকেত

অনির্বাণ দত্ত

সিঁড়ির নীচে, বাতিল আসবাবের গন্ধে
এক-একদিন
হঠাৎ শুনতে পাই তোমার পুরনো গলার স্বর,
যেন
ঘুমের মধ্যে কোনো চেনা স্বপ্নের ডাক..
অন্ধকারের আড়ালে, হারানো ঠোটের মুছে-যাওয়া অক্ষর!

মা, তুমি ডাকছ আমাকে?

সেই ডাকে....
কোন অজানা স্টেশনে
কাকভোরে নেমে পড়ি আমি।

আমার পিছুটানে, সেদিন
মোবাইলের অনর্গল কলস্রোত নেই,
যন্ত্র-নষ্ট নীলামের দর-দাম নেই...
শুধু, আমার চুলের উপর-তোমার শীতল স্পর্শ।

অপমানের সিঁড়ি বেয়ে, না
একদিন
কতো কষ্টে বড়ো করেছিলে আমাদের...
বড়ো হয়ে, এখন
তোমার দিকে তাকালেই, শিউরে উঠি আমি!

খোলা পিঠে—ছড়ানো, একরাশ সাদা চুল....
ভয়ঙ্কর।
যেন, দুলে-দুলে, এক কঙ্কাল-নদী
হেঁটে চলেছে
শেষ দিকে, অপমানের।

সেই মুক্তকেশী, কৃষ্ণাম্বরী বীথি..
ঘন বনানীর গভীর থেকে গভীরে..
উড়তে-থাকা পাতার মতো, ভেসে আসা—
তোমার ডাক শুনে-শুনে, আমি হাঁটছি..
হাঁটছি
নিশিথোরে, যেন এক চুম্বন-ভিখারী।

কথা

হান্নান আহসান

ইদানীং কথা বলতে গেলে রাগ হয়
ক্রোধান্বিত কথারা বড্ড এলোমেলো ঝরঝরে
তবু কথা বলতেই হয়। কথা না বললেও রাগ হয়।
রাগ রাগ কথারা স্খলিত হয়ে ছড়ায়।

ভূমিহীন কথার মাবপ্যাচেও রাগ হয়
কথার সরল সমীকরণে ইদানিং বড় ঢেউ
কথায় কথা বাড়ে। ম্লান আকাশে কথা।
কী কথার অর্থ বোঝে ঝড়ের পূর্বাভাস।

বেশি কথা বলা বারণ বলেই হয় না
কথার সেতুন কাঠে উইপোকা আপন
কথার খই ফুটলে হলে। কথা আলো হয়।
যন্ত্রের কথারা এবার নিজস্ব ভঙ্গিতে উদার।

কথারা দু'কানে হলেই যত আয়োজন ব্যর্থ
কথার পরপুষ্প গন্ধ ছোটে বিজনে মরুতে
কথার কথা যদি হয়। মৃত্যুহীন কথারা।
কথা রাখার সিঁড়ি পেতে হাপিত্যেশ বাসর।

কথারা বুকের গভীরে ঘোল তোলে হৃদয়ের
শুমরানো সংবেদনগুলো ইতিউতি মরা নদী
কথা হয় ডেসিবেলে। কথা হয় ঘাসে।
সংবৎসর খেয়েদেয়ে সমেমিরা কেউ।

তুমি কথা ঝোলো না। ফিসফিস করে বোলো।
মৃত কথার ফুলঝুরি এখন বেমালুম নির্ভুল
একথা সেকথা হয়ে কুকথা স্ট্যাচু হলে
গাঢ় হোমিও-কথা দিও ছেড়ে আপন মনে।

বন্ধু, কথা বোলো নেপেন্থকে অবসীলায়
বেখাস কথারা নীল হয়ে ফেরে মুখহীন
বিচ্ছুরিত কথারা তবু কক্ষপথে ঘুরে ফিরে ঘর্ষিত
কথা স্থির হয়। কথা বাড়ে। কথা রাখে কথাতেই।

মায়াময়

সত্যসাধন দাস

সম্পর্কহীন হয়ে বাঁচি
এ ইচ্ছা নয়কো আমার
সাধের ভুবনে কত কিছু পাওয়া
সাদাপাতায় কত বেদনালাল
মলাটের ভাঁজে জেগে থাকে স্মৃতি,

ইচ্ছা অনিচ্ছায় ভালবাসা কথাবাসা
শরিকে শরিকে দ্বন্দ্ব-প্রেম!
এ পৃথিবীর যা কিছু লিখে রাখে
মেয়েদের মায়া
জল হয়ে কান্না হয়ে ঝরে পরে ঝরে ওঠে
মানুষের কত প্রিয় মানুষতা জানে।
বুক ভরে শূন্য ঘরে চিঠি লিখি
এ পৃথিবী এখন আমার
প্রতিটি প্রাণী জীবকুল সত্য মনে
শুধু আপনার, প্রিয়জন প্রিয় সব এখন সবার।

হাইকু

সেবাংশু ঘোষ

নৈঃশব্দের পর ভাঙা ঘুমে
জানালার দিকে তাকালে আকাশ যতদূর
তুমি কি ঠিক তেমনি দূরে।

ভীষণ রাতের অতলে এখন পৃথিবী
নীল ঘুমে
ধবধবে শুনেদের মত শুয়ে আছে

চোখ খুলতেই ভোর
খড়ের চালে কমলা রোদ খেলছে
নীলচে কালো পাখী।

এখানে

শঙ্খ বিশ্বাস

এখানে হারিয়ে যায় সজীবতা,
এখানে হারিয়ে যায় ভোরের পাখির গান।
হারিয়ে যায় মোটর গাড়ির শিকশিক আওয়াজে।
এখানে কালো রঙের নির্বোধ মেয়ের বালিকা
জল আনতে যায় না পদ্মপুকুর ঘাটে।
এখানে ফর্মের দাপটে কালো রং—
হয়ে আরো কালো-দেহ হয় কঠিন।
এখানে রাখালে গরুর ঘন্টা বাজে না।
বন্ধ থাকে কয়েকদিন বেড়ার মাঠে—
ওর মা-হারা-হারা ডাকে।
এখানে গোলাপ প্রকৃত প্রেমের গন্ধ ছড়ায় না
ছড়ায় ঘিরে বেদনা প্রেমের দাপট।

আমি সে প্রেমিক নই

বিপ্লব চক্রবর্তী

তুমিও প্রেমিকা বুঝি আমার শব্দ পেলে কাছে এসে বস
সুচতুর শব্দ দিয়ে আমার প্রতিটি পাপ চোখ থেকে নখ্
প্রতিদিন যত আসে স্খলন বমন আর নৃশংস পতন
সবকিছু তোমার চোখে অবিশ্বাস্য চীনকুচম সুন্দর আর পূর্ব গোপন
আমি তো প্রেমিক নই তোমার পাওনা দিতে কড়ই কৃপণ।

অনেক প্রেমিকা আজ তৃষ্ণার্তচোখে এধারি ও বাড়ি ব'সে
রাজপথ নভশ্চারী নগরীর অসংখ্য প্রেমিক পুরুষে
রাস্তাঘাটে বেইুরেন্টে শহরের রাজপথ ধরে অজানা অচেনা গ্রামে
সবুজ ঘাসের মত ফুটিগুলি দানাবাঁধে প্রকৃতির নিজস্ব দানে।
শুধু ভালবাসা স্মৃতি পাব আনাচে কানাচে এক কিংবা দুই ব্যতিক্রমে।

আমি তো সে ভাগ্যবান নই, নির্লজ্জ পুরুষ আমি ভালোলাগে নারী
প্রেমিক হবার মত সম্ভাবনা দেখি নাযে, আমার স্বভাবে নারী
আমাকে ঘিরেছে লোভ পাপ স্বার্থপরতায় রক্তে নেই বিন্দুমাত্র ত্যাগ
আমার প্রেমিকা হলে দিতে দিতে নিঃস্ব হবে তোমার সুখের সিংহভাগ

আমি তো সে ভাগ্যবান নই, নির্লজ্জ পুরুষে আমি ভালোলাগে নারী
প্রেমিক হবার মত সম্ভাবনা দেখি নাযে, আমার স্বভাবে নারী
আমাকে ঘিরেছে লোভ পাপ স্বার্থপরতায় রক্তে নেই বিন্দুমাত্র ত্যাগ
আমার প্রেমিকা হলে দিতে দিতে নিঃস্ব হবে তোমার সুখের সিংহভাগ
এস ভালোলাগা নিয়ে পাশাপাশি কিছুক্ষণ হাঁটি
ছোট ছোট তর্ক করি নিজেকে প্রকাশ করি নিজেদের কাছে
সবুজ নিরালা কোণে সূর্যডোবা বিকেলের সুখে
নিস্তব্ধ নুখর হয়ে দুইজনে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসি।

ব্যাতিক্রম

গৌরীশংকর দে

ঘড়ি ধ'রে বৃষ্টি নামে
আজকাল প্রত্যহ বিকেল,
সময়ের প্রতি এত অনুগত
সম্প্রতি প্রকৃতি!
বকুলের নিয়মিত
ঝিজে মেরে কৃষ্ণচূড়া
ঝিজে বনবীথি।
আবার জগতে শুধু
চুরমার যাবতীয় ঘড়ি।
অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা,
বিদ্রোহ, বিপ্লব,
নেই কোন অনুষ্ঠান,
নেই কোন নির্দিষ্ট উৎসব,
এই ব্যতিক্রম নিয়ে
নিয়মের রাজ্যে কী যে করি।

ভাইরাস

শৌভিক দত্ত

কম্পিউটার আকাশ থেকে
নেমে আসছে ডিজিটাল ছবি—
ইন্টারনেট পর্দাজোড়া
সম্পর্কের জুলে ওঠা প্রোগ্রামিং
হারিয়ে যেতে 'টাইপ্‌ফোন'
সাইবার স্পেসে ব্যবহৃত
মনকে বাঁধতে চেয়ে চোখের পাতায়
এঁকে দিচ্ছে নক্সা.....
এইভাবে বারবার মনকে মনকে ফিরে গিয়ে
কী-বোর্ড বুঝে নিতে পারে
তাঁতাবে 'ভাইরাসেরা' বন্ধুকে
নষ্ট করে দ্যায়..

হলুদ ডুমো পাখি

প্রণব দেবনাথ

অর্ধেক জেগে আছি বর্ষণ পুপুরবেলায়
পৃথ্বীতা থেকে নামিয়ে এনেছি
ঘরের হলুদ ডুমো পাখি।
শুধু একটা নিরেট স্বপ্ন দেখবো.....

তোমার পিপাসাকাতর ঠোঁট জানে না
ঈশ্বরের কোনো গুঢ় আশকোর কথা.....

পোখরান-এক

পীযূষ ধর

ছায়া স্পর্শ ঘর পাপ এখন মরুর মতো কান্না—
তোমার সময় ভালোবাসা ইচ্ছা চিরে ইচ্ছেরা বাড়ায়
চারদিকে। পোখরান ভাসে জলে, চোখের পাতায়
জাগলা নক্সা খোঁজে স্নেহ...মানুষের মন আজ
দ্রুত লয়ে হারায় পশু ও ঘাট। প্রেম
একটি ঘরের জন্য হরিণ হয়ে ঘোরে।

দূরত্ব

দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাস

কতদূর থেকে ডাকা যায়
যদি হয় চেনা লোকজন,
হতে পারে কণ্ঠস্বরে ছিল না
পরিচয়ের গাঢ়তা মেশানো
তবুও কি বাতাসের লঘুঘাতে

ছুঁই না মালতী বুকা ভাব।
অনুনাদী কম্পনের ধ্বনি
শুকো রেখে কোন দেশ
তোমার স্বর-তরঙ্গে সে
চিনে নেবে উতলা আবেশ।
দূরত্বের তাই, নেই কোন
পার্থিবিক সীমা
বাদুঘরে ধরা থাকে
দূর দিনান্তের সজীব ঠিকানা।

কত কাছে থেকে হবে
ধরি মেখো অচেনা পথিক,
হতে পারে কণ্ঠস্বরে মেখেছিলে
হেমন্তের বেলা
তবুও কি পথিকের লেখ-চিত্রে
দেখাবারে বিস্তৃত কম্পন!
কতদূর থেকে ডাকা যায়,
কতকাছে থেকে হবে
ধরি হয় অচেনা পথিক।
দূর থেকে, কাছ থেকে
ডেকে নেওয়ার যাদুকাঠি নেই,
তবুও পেতে পারো
শরতের উড়োমেঘের
নিশ্চল ঠিকানা
ভুলে কি যেতে পারে
মিশে যাওয়ার বিভ্রান্তির ক্ষণ
এক নিমিষেই।

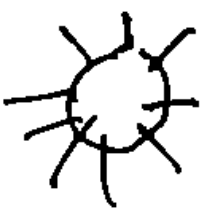

প্রত্নপোখরান, আমরা প্রেমবলি

তাপস রায়

আকাশ কুসুম, টুপটুপ নেমে আসে, সূর্যাস্ত পেরিয়ে যাই
আর ঘর-বাড়ি, শূন্যতার নাম মাপজোকে ফুটে ওঠে
তুমিও বর্ণমালায় কোনো চেনা অক্ষর

ঘুম পাড়ি, গর্ভগৃহে বাস্তবায় দুফেনেন স্বপ্নও
অন্ধকারে সন্তত বৃক্ষরেখা কীরকম মোহময় লাগে
বাঁশি বাজে, সকল সন্তান যায় ঘুমঘাতে

স্রোতের অভিমান ধরে আমাদের গ্রামেও নগরে ফেরিওলা
ঘুরে যায়, হর্ষোল্লাসে ঘুম ভাঙে, দেখি আমাদের বিকেলাজ ভোর
পোখরান ভাস্য দেখে আকাশকুসুমে।

প্রিয় শৈশব, সাদা ঘোড়া

শীতল চৌধুরী

নিশুতিরাতের গল্প থাক
থাক সংলাপ উচ্চারণে
নাটকের মহড়া ;
এসো উজ্জ্বল ভোরের
শুভক্ষণে
সকল শরীর ভিজিয়ে
আর একবার ফিরি

ফিরে আসি
জলের সরল দর্পণে ;
যেখানে রয়েছে
সঙ্গীতের নতুন চাঁদ
শস্যের ঘ্রাণ
পথের ধুলোয় ঢাকা
আমাদের প্রিয় শৈশব, সাদা ঘোড়া
মানবীলতার নিচে
আমাদের কিছু বেহিসেবি সময়ের
জালবাঁধে খুঁটে খুঁটে রাখা
হৃদয় উপুড় করা
হেমন্তপাখির কণ্ঠস্বর।

এখন নৈশব্দ নয়

নিরঞ্জন মণ্ডল

একটু নৈশব্দ দাও পারিপার্শ্বচুড়ে
ভাবের সৈকত টুড়ে খুঁটে আনি দু'চার ঝিনুক
টাটকা, রঙিন ;
ভেঙে ভেঙে খুঁজে নয় মুক্তোর প্রতিমা
শব্দের তরঙ্গে ভেসে ভেসে।
নিরুচ্চারী থাকো, প্রিয় কিছু মুহূর্তপল
হোমাগের স্বপ্নের মোহাই।

দু ঠোঁটের মাঝখানে উদ্ধত তর্জনী
আমার কিশোরী কন্যা এই অবয়বে
সন্ধানী চাহনি মেলে মুহূর্তেই খুঁজে নিতে চায়
অভিধের আসল শেকড়।
তারপর কলহংসো ভাষিয়ে জগৎ
অভিযোগে নাড়ায় চেতনা—
এতকথা কেন বল তুমি?
ইসারায় বোঝাতে তো পার।

আর্ষার্থ প্রশ্নের জালে ডুবে যেতে যেতে
কানে বাজে সংগীতের মত।
এত কথা কেন এই পরিপূর্ণ শব্দের জগতে
ছন্দহীন, গন্ধহীন, রসকষহীন :
নৈশব্দকে ভালবাসি যদি।

জীবনের শব্দ মত, শব্দের জীবন
তাকে ছেড়ে যেতে চাই কোন প্রিয় শব্দহীনতায়।
সেখানে শীতল শান্ত আঁধারের মাঝে
মৃত্যুর নরম আলিঙ্গন।

নৈশব্দ এখন নয়
শব্দের লাগাম ছেড়ে ক্লান্ত হলে এই দেহমন
জনারণ্যের মধ্যের পনে নিরুচ্চারে ঢেকে
রঙিন মুক্তোর স্বপ্নে ডুবে যেতে যেতে
পরম নৈশব্দ দেখে যায়
ভেড়ায় কয়ের ছিন্ন সন্ধেত শব্দের নিনাদ।

হাল ছাড়িনি

বিবস্বান ভট্টাচার্য্য

হাল ছাড়িনি।
ছাড়িনি এমন একটা বোধ ভূলভূলে সকাল—
স্বপ্নের মত
আলোয় তার, প্রলয়বস্তু হই কি করে
—সেই সন্ধান.
টুকরো মেঘেরা সবসে ভেসে গেলে
তত নিঃস্বতা,
খাঁপা এ গোপনে, বুকে তার এমন পলাশ
পলকদীপে নুপুরের আশা ছিল.
বাচ্ছন্দ্য কোথায় স্থিরতা যদি ফসফাসমান,
—কোথায় যাব.
সুস্থ অবস্থা প্রকাশ প্রায় ক্রমে.
অসাধুত নই,
বোধের বিন্দে বুক বুকে হাল ছাড়িনি এখনও।

তৃষিত ময়ূরের আত্মনিবেদন

জহর সেনমজুমদার

দিন শুরু হলো। মাদুরাওয়ার মতো ঢেউ নেবে
দিন শুরু হলো। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দেখি
ভিসেনের ধর্ষণ, সূর্যাস্ত, ইস্কুলফেরত চড়ুই আর
একটি অদ্ভুত বেদনা লোক : কিমোনো রোগা নদী
সামান্য, অতি সামান্য হাড়ুড়ে ফটোগ্রাফার আমি
কি ছবি তুলবো তাবি দেখি তালবনের ভিতর
আগুন জ্বেলে একটি মোমশিখা জ্বালিয়ে বসে আছে
সেই ময়ূরী.... আমাকে দেখতে পেয়ে
চোখ দুটি কোরে তোলে নয়নবলয়ন....
রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি আর কোনো ছবিই
তুলতে পারি না... শুধু ভীষণ একা.... মাদুরাওয়ার
অন্ধকারে আমি ভাঙা ক্যামেরার চোখ রেখে দেখি
একটি অদ্ভুত বেদনালোক
কিমোনো নদী

মোনালিসা
মধুমতী
কাশবনের ভিতর দিয়ে আমাকে ডাকছে ঐ মধুমতীনদীর।

জবাব

মুসাফির সমাদ্দার

তোমাকে ভালবাসতে...বাসতে...বাসতে
যদি আমি নিঃশেষ হয়ে যাই
তা' হলেও কী
তোমার আকাশ ভেঙে
জলোচ্ছ্বাস বৃষ্টি নামবে না।

সেই ছোট্ট জবাব টুকুও জানাই তো
আমি মোম হয়ে জ্বলে যাচ্ছি
দিনের পর দিন...
দিনের পর দিন...
দিনের পর দিন...

ধ্বংসে নামা রাত ও শিল্প শহরের কবিতা

সমরেন্দ্র বিশ্বাস

তারহীন সাঁকো দোলে এপার ওপার
ঐ বীজ ধরে আমি কতখানি যেতে পারি আজো?

শিল্প শহরের মোহন প্রসূতি, তার ভাব ভালোবাসা
মধ্যরাতে আমাকেও ডাকে—'এসো, এসো
দুঃখমোচন মানুষের দিকে যাই।'

মেশিনে, রোবটের প্রখর প্রহরে
আবাল্য শ্রমের মর্মে ঢেকে রাখা ক্ষরিত শরীর নিয়ে
দুঃখমোচনে আমি কত খানি জানি।

চাই ওভার ব্রীজপথ ছুঁয়ে, ক্যাপস-বাজেই ওড়ে, লোড শেডিং রাত
শিল্প শহরের ন্যাপথার পোড়া চাঁদ আলো দিলে দেখি
অবয়ব দাঁড়িয়ে থাকে নিরালম্ব সাঁকো।

সাঁকোর এপারে আমি শহরের ট্র্যাফো।
অন্যপারে বন্ধুত্বে আমাদের প্রাণ
মধ্যরাতে নিস্তব্ধতা ভাই বলো তাকে ;
অন্ধুর শিরায় জাগে অহিংসুকো নেবে, যাকে আমি 'দেশ' বলে জানি।

পারাপারহীন এক নিরালম্ব সাঁকো
আমাকেই হাতছানি দিয়ে ডাকে, 'এসো, এসো।'
দুঃখ মোচনের তারা কতখানি জানে?

মাঝখানে নিরালম্ব সাঁকো
বড়ো একা আমি, কোন দিকে যাই?

অবশেষে

নারায়ণ আচার্য্য

আমি জীবন দেখিনি
যা দেখেছি—
নরম কাঠের ভেসে ভেসে যাওয়া
স্বাধীনতাহীন পরাধীন তরঙ্গমালায়,
কিংবা
শকুনের পাশা খেলায় কুসুমপুত্তলিকা দাহ।

যেমন দেখেছি
তেমনটা ভাবিনি কখনো
স্বপ্নেও।
কেউ কারো নয়, কেউ যেন চেনে না,
হৃৎপিণ্ডের ঘর,
তৃষ্ণা বর্বরতা পাতা মেলে
বক্ষে পড়ে রক্ত বিকালের নামে,
রক্তটা খেলনার হেসে হেসে খুন।
কর্ণ পৃথিকাট, কাতরে বর্ষণ
তাবড় তাবড় নেতার উপড়ানো উদ্ভাষণ
মাছি ওড়ার
চেয়ারে চেয়ারে চোরকাঁ, নীরবে দেখেছি চাতার
শুধু অসুক বাতাসের লড়াই,
ঊর্বশীর স্তনে আঁকা
সভ্যতার বিপন্ন হলুদ ঘাস, জীবন নয়। হিসাব মেলানোর গানে গানে
গুজন—
নয় ছয়, ছয় নয় জীবন যাপন....

অবশেষে
দেবতার অগ্নিস্নান খুঁজি পথির সূর্যমুখী।

শীত ভাঙানো ফাগুন

মিলনেন্দু জানা

কে বলবে কে দিয়েছে কার আবাসে আগুন—
কে বা নিলো উল্টোপথে হাল-হাওলা ফাগুন।
জানুক কিংবা নাই বা জানুক মক্ষ সন্ধায় হেঁটে—
দিন দুপুরেই হচ্ছে দিতে মস্ত-মোটা ভেট।
কে বলবে কার জগনে.....।

কে বলবে কার গগনে পুঁতছে কারা শূল—
কার খোঁপাতে কে রাখছে পালিশ করা ফল।
ধুলা হয়েছে কলহে সবাই—ওবজ্রলে পাক ঘুরে—
দেশটা জুড়ে চলছে 'তা' তুলের অন্ধ জুড়ে।
কে-ই বা করে....

কে-ই বা করে বিচার কার—বিচার করে চাবি—
মেহগিনির মক্ষ ঘিরে মায়া-শালার খাবি।

যাবলতার সাথে কোনো বন্দোবস্তের সুখ—
লজ্জাবতী—পড়ছে ঝুলে দন্তবিহীন 'মুখ'!
কেই বা নিলো.....

কে-ই বা নিলো সপাং করে কার আকাশের আগুন—
হয়তো পারে বলতে কেবল শীত তাড়ানো আগুন!।

চোখের জল

পরিমল ঘোষ

গরীবের চোখে দেখি করুণ আকৃতি,
চোখে তার ফুরায় না জল,
স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তা ঝরে চলে শুধু।
কাপসা চোখে সে দেখে
চারিদিকে ঘিরে আছে গভীর অন্ধকার।

চোখের জলেতে হয় না কিছু,
এ দুঃখের নেই কোনো কানাকড়ি দাম।
চোখের জল মুছে তোমরা আগুন জ্বালো,
সমস্ত শক্তিকে সংহত করে
চোখের আগুন ছড়াতে ছড়াতে
তোমরা এগিয়ে চলো।

অন্ধকার সরে যাবে দূরে—আরো দূরে।।

মাটিকে জানতে ইচ্ছে করে

বিনয় সরদার

সন্ধ্যার গহনে অরণ্যে জমে থাকা ভীড়
কার সাথে বোঝাপড়া হবে।
অস্থি-মজ্জা বিবেকের দংশন, এই দেহে
সর্বাঙ্গে আমার ক্ষত
ওঠে অমাবস্যা ছোঁয়াবো : শিরিস গন্ধে দিন
ডোবানো শব্দে আমি জেগে উঠবো
ঝিনুকের হাত ধরো শুনো মুক্তি তোলে
নীলাভ আকাশের দিকে খুঁজে নাও তোমার প্রিয়জনকে।

একটি গাছের জন্ম দেবো
সন্তান জন্মাবার আগে
সে গাছের নুন্যা হবে
পাতাগুলিকে কোলে নিয়ে
শ্মশানে বসে রাত জাগবো।

দীক্ষ রোপন করেছ তুমি
তুমি দিয়েছ চিরনীল আকাশের বিস্তার
চিরন্তনা পৃথিবীর স্তনরেখা।

কলমটাকে আস্ত রেখে
আমাকে ভস্ম করে দিয়ো।

ও মন তুমি থেকো—

আশীষ শর্মা

ও মন তুমি থেকো—
তোমার বুকে যদি না পেলে
আকাশ পাবো সূর্য-চাঁদ
বুড়িয়ে নিয়ে পেরিয়ে যাবো
রাতের ঘুম
তোমার প্রয়োজন এখন।

ও মন, আমি পৌষের ধীরে
চলন ফেলে ছুঁয়ে, তুমি
ছড়িয়ে দাও শরীর, অঙ্গ
আমার বুকে যে জাগছে
পাখির ডাক শুনে। তুমিই
জল-ছায়া তোমারই প্রয়োজন এখন।

তোমার কাছে বাড়াই পাখা
ওড়িয়ে যাবে শূন্য শুধু
তোমার মনের প্রয়োজন
এখন, সব শূন্য মুছে
ও মন তুমি থেকো, ও মন
তোমার বুকে আকাশ পাবো।

আবার কি কথা

দীনেশ চট্টোপাধ্যায়

আবার কি কথা বলবে কোন সখ মনে
ভুল হলে কতোবার ক্ষমাপাত্র বলে
অথচ অন্যায়ি
অন্ধকার পার করে আসেনা বিদ্যুতের ঝলক!
তোমারই নানা নামে বারবার এলে—
পথে ঘাটে ডাক দিলে
প্রত্যেকেই সব কাজ ফেলে
চলার মুখেই ছুটে গৃহস্থালী যতো
নিখন হৃদয়ের ঘরে তোমারই থাকো অধিবাস।
আবার কি কথা বলতে এসেছো এখানে,
ভুলে কি গেলেই শেষে লজ্জার মানে—
দু'কান কেটেই শেষে বাজানের ঠিক অধিবাস।

আবার কি কথা বলবি ভুলেছিস সব
মনে নেই কি প্রতিজ্ঞা ছিলো—

সাম্রাজ্যবাদী প্রহারণে শহীদের স্মৃতি
অগ্রগামী সৈনিকের ঐতিহ্যবাহী
কোনদিন পোড়ায় নি কি তাহাদের দাহ।
কোনদিন শুনলি নাকি মায়ের অন্তর
মা বলতেন—
শুধু কি মরণে, মৃত্যু একবারই হয়।

কি কথা বলবি আজ মনে কি পড়ে না—
তেবে দেখ পদ্মদিঘীর বুকে আকাশের ঘনা
চৈত্রের দুপুরের কুহুকুহু ডাক
হে-তাগায় আন্দোলনের লড়াকু কিষানের তেজোদীপ্ত হাঁক
মনে কি পড়ে না।
সেদিন কি দেখিস নি কুমারী যৌবন
ঘুমেল ধানের ঘ্রাণে দুলেল পবন
সোনার লক্ষ্মীর পা প্রসারিত তোমাদের ঘরে
দেখিস নি সোনার লিপিতে শ্রাঙ্কা তোরাই অক্ষরে।

কোন স্মৃতি কোন সঙ্গ কিম্বা ভবিষ্যত
তোমাদের ডাকে না আর—
পথের সামনে আজ বিভ্রান্তি পাহাড়,
রুটী নেই, রুজী নেই হাভাতের দীর্ঘ হাহাকার
বন্ধমন মানুষেরা ভুলে গেছে স্বপ্ন সাম্রাৎসার।
পথের দিশার আলো নিভে গেছে, পথ যে কোথায়—
শান্তিপূর্ণ উত্তোরণে বিপ্লব ঠিকানা হারায়।
সূর্যসন্তান হারিয়ে গেছে, আর তার মা
অশ্রুসিক্ত ভঙ্গিমায় নিলাম আসরে—
বিশ্ববাণিজ্যের বাজনা ঘাটা ঢোলে অথবা কাঁসরে।

অন্যদিকে পতিত জমিতে ওই মেগাসিটি শোভন বাহার
হাইজেনে হাইটেক এটিকেট এসিটী ব্যাপার।
সেই দেশে সংখ্যাহীন ক্রসাদের তোরণ দুয়ারে
মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়ার নামাবলী শোভন বাহারে।
এরা সব রাষ্ট্রপিতার মানসপুত্রো ভাই—
ভাড়াটিয়া কলমচী লিখে দেয় এদের সাফাই,
ঘরে ঘরে আত্মীয়রা কেউ কোলে ব্রাটিনাম চেন—
মিডিয়ার সওয়ারীরা নবরত্নে হোলিখেলে
মুখে বলে, আসেন। আসেন।
কোন কথা বলে যেতে বারবার আসলি এখানে—
কালো ঘোড়ায় জেমিসন ছিলো কোনখানে
মনে কি পড়ে না ;—
বিভ্রান্তিতে তোর মাকে ঘিরেছিলো নরক যন্ত্রণা।
কি করে ভুললি তোরা পিতাদের রক্ত—
রক্তাক্ষরে লিখে গেছে যারা কি না মুক্তির বারতা
যাহারাই একদিন সমগ্র স্বদেশ তুচ্ছ স্বার্থ ভুলেছিলো মার মানে অথবা আত্মের।

কি কথা বলতে এলি প্রবার এখানে—
ভুলে কি গেছিস শেষে স্বদেশের কোন কোনখানে
পড়েছিলো পিতাদের রক্ত ধারা—জননীর নরক যন্ত্রণা—
আত্মমুখ ভুলে ফেল ছক মনমনা।
মনে কর সেই সব কৃষাণ শ্রমিক—
যার জন্য বেওনেটে বুক পেতে বলেছিলো —ফিরু, তোরা ফিক।
কি করে ভুলিস তোরা শহীদ স্বজন—
অবলোয় চোখে বুঝি দেখিস নি সোনার স্বপন।
ভুলে গেলি কবিতা-সঙ্গীতা আর বন্ধনার দাস
স্বাধীনতার এ পঞ্চাশে শুনে নে যে
তাহাদের তীক্ষ্ণ উপহাস।

খাদ্য আন্দোলনের রাতে এ্যাসপ্লানেড চত্বরে
হিংশ্রাণী লাসের ঘৃণা কে পাঠালো বিস্মৃতি কবরে।
ভুলেছিস মকে তোরা—অথচ একদিন
মা ছিলেন মাতঙ্গিনী সমরে তাহিন।

কোন কথা বলে যেতে কতোবার একত্র হয়েছো—
কোন কিছু না করেই বারবার ভেঙে ভেঙে গেছো।
মা বুঝি বলেনি ডেকে কোনদিন—
বাস বাহ্যের জোটেনি ভাত জোট বাঁধো
মা বুঝি বলেনি ডেকে ভিন্ন ভিন্ন দিন—
দেশের দ্যুর কি দুর্দিন আকাশ কেরোসিন
দীর্ঘ-যাত্রার সুর সাধো, জোট বাঁধো।

কতো শত স্বজন শহীদ
কেন যে কাঁপে না আজো শান্তিপূর্ণ-উত্তোরণ ভিত্ত।
প্রমিক কৃষাণ মরে হাজার হাজার
বিগত পঞ্চাশে কতো লাস চুলি পার।
সমগ্র স্বদেশ জুড়ে মুণ্ডহীন বড়
সংসদীয় পথ ছাড়তে দিয়েছে স্বাক্ষর।

কি কথা বলবি তোরা সব ভুলেছিস
পিতৃঋণ তর্পনের দাবী তোরা বিস্মৃতি করিস,
পায়ের তলায় মাটি তৃণমূলে, নেই—
প্রতিদিন মরেছিস বিনষ্ট জলেই,
ভুলেছিস জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বাঁশি
ফাঁসীকাঠ তুচ্ছ করা শহীদের হাসি
সব কিছু করেছিস বিবর্ণ দেওয়াল—
এখনো সময় আছে ফিরে দাঁড়া বন্ধনা
ভুলে যা স্রোতের বিরুদ্ধবাদী পাল।।

প্রতীক্ষা কাঁদার

প্রদীপ পাল

মাটিতে বিছানো দামি মাদুর
অদূরে সাজানো আধুনিক খাট
ফ্রেসিংটেবিলে ছড়ানো কসমেটিক
রূপ-লাবণ্যের বিয়ের-বয়স খাট

লাম্পট্য-সৌরভে তবাট সবখান
মুখ থেঁতলে, সম্মান না থাকায়
ধরমর ছড়ানো হরেক পুতুল
প্রতীকায় শুধু, পদ্মা ছেড়ে কাঁদায়

অভিনব স্বপ্ন নিয়ে

অনাথ মুখোপাধ্যায়

এখন যে স্বপ্নও সত্যের দেশে পৌঁছানোর সময় দরকার
উদযাস্ত নীল হাওয়া আকাশের বুক ভরে আছে

মনে হয় হাওয়া হয়ে বয়ে যায় আকাশ নীলিমা
নীলের জমানা ঘরে শঙ্খালো মেঘের দরবার।

অথবা মেঘেরা যেন নীল জলে অমেয় ঈথার
টানাপোড়েনের ধ্যানে টেক্কা টেনে সূর্যকে ডোবায়

তপস্যার ধনরাত তাকাত তাড়ানো মন-গোনে
নির্জনতা চাঁদের কেনায় ঢিলে দিতে জানে ধ্রুবতারা।

কবিতা কোথায়

দিগন্ত চট্টোপাধ্যায়

কবিতা আমার হেঁটে গেছে
মধ্য এশিয়ার রুক্ষ ধূলোয়
চাবুকের উৎফুল্ল শব্দ জুড়ে
কারাভানের দিগন্ত বিস্তৃতি
উত্তাপ-অনুভব-অন্বেষণ
নিশ্চিন্দিপুরের আম্রকুঞ্জ
অথবা তাকলা মাকানের অবোধ মরীচিকায়..

যেদিন দেখেছে প্রতিরোধ
বৃটিশ গারদনা থেকে একুশে সুকান্তে—
মুষ্টিবদ্ধ চেতনা—আগ্নেয়ী চিতা
বিপন্ন সভ্যতা বলসেভৈশনে—
পরম পাথেয়র নিরন্তর অনুসন্ধান
রুদ্ধ জিনান শঙ্খচিল আস্বাদনে—
বিপ্লবী দলিল নাচে অজয় কূলে
জয়দেব কি মোহনে মাতাল
কৃষ্ণতনি হরিণ চোখে কৃষ্ণসাগর উপকূলে
রবির ছন্দে ছন্দেও উথাল পাথাল..

এখনো ও ঘোরায়
কলমতার আঁচলে পৌষালী হাওয়ায়
ফাউল নদী—অন্তিম বেলায়
জানো সে কোথায়—
শ্রান্তি ক্লান্তিদের সংঘাত
সরলীকরণ—রক্তস্রোতের মেরুপ্রবণতা—
না।—চাই না তাকে ফুঁড়ে
দুর্বৃত্তবন ফ্রেম ছেড়ে দূরে
যোলো থাকবো বসে
ভরা বৌদ্ধ বিহারে
ওঙ্কারি পদ্মে যোগাসনে
ভবাকুসুম সকালে...

অগোছালো পঙ্‌ক্তিমালা

শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতির ক্যানভাসে শুভ্রমুখ, জীর্ণশরীর, ছিন্ন বসু
যারে কত কি যে এলোমেলো ভাবে ভেসে ওঠে।
কোনটা থেকে যায় চিরস্থায়ী ভাবে,
কোনটা ক্ষণস্থায়ী হয়ে মিলিয়ে যায়.....
কথাগুলো লিখতে গিয়ে কিরকম অগোছালো, এলোমেলো, কিন্তু-বিহিন হয়ে যায়।
সাজানোর ভঙ্গিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।
তবুও লিখি, লিখি আশা-নিরাশায় ছবিগুলিকে সাজিয়ে তোলার জন্য।
কখনও ছন্দ দিয়ে, আবার কখনও ছন্দ পতনের মাধ্যমে সৃষ্টি করার প্রয়াস
কবির কল্পনাতে সেই ক্ষণে অনুভূতি
ধানক্ষেত, শঙ্খচিল, শালুকেওড়ার লতা, বেহুলার স্রোত হয়ে ভেসে যায়।

মিটিং-এ, মিছিলে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে
দাঁড়িয়ে থাকে এক-একটা জীবন্ত কোটেশান হয়ে।
পতাকার রঙে নিবেদিত মাথায়, অর্জিত ছেড়া গেঞ্জিগুলোর পাশঁড়িতে
সযত্নে মুখর হয়ে ওঠে সেই লাইনগুলি।
চেতনার প্রত্যুষকাল থেকে দেখেছি বৃদ্ধ, মধ্যনারী, শিশুকে
রক্তোৎপলো রাস্তা ভেসে গেছে লাল আবির গোলা জলের স্রোতে
(রক্তনাম তার)...
কাটাশাল, চোরা পুকুরে ডুবে থাকা
সতীশ, নিখিল, অরুণ, কিরণ ইত্যাদি অনেক তরুণের
অবুঝ ক্ষোভ, অসহনীয় বেদনা, পুঞ্জীভূত অসন্তোষ...
আর, লাল কালী ঘরের নৃশংস ভোতা ছুরি
আমার কবিতার লাইনে এসে আড়াইটে তিনটায় ঘড়ির ঘন্টা বাজার শব্দে,
পাড়ার নেড়ী কুত্তাদের দুর্বোধ্য ঘেউ ঘেউ ডাকে—
"ব্রতী'র মার কানে পৌঁছেছে বটে—কিন্তু অনেক, অনেক পরে

এখন নতুন রঙে বড়ো বড়ো রাস্তাগুলো সুশোভিত হচ্ছে।
হয়তো কার্পেটের ওপর দিয়েও বয়ে যাবে মানবের মতো গাড়িটা,
ভিতরে এ. সি. ; জনশেষক মধ্যে আদর্শবাজির লোভী শরীরটা
কুর্তার নীচে নিজেরে আড়াল রাখবে।
কিন্তু ঐ গাড়ির চাকাও চাকার সন্ধানে পাতা দামী কার্পেটের নীচে
একদল কান্না, দর্শীদের হাহাকার, কিরণের অসহ্য যন্ত্রণা,

নিখিলের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ-
অগ্নিগর্ভিত ভাবে যুগে যুগে নিরোজ্জিত হবে যাবে,
'স্তব্ধী'-কে আবারও '১০৮৪' নম্বরে লাশকাটা ঘরের কোণে পচতে—হবে
দিনের পর দিন
আমার কবিতার লাইনে ভেসে আসে
শতাব্দীর পূর্বেকার সমাধির ভিতর থেকে ঘুসেদ্ কন্টের আওয়াজ
:
"আ.....হ্ব.....আ.....
যতই অত্যাচার করো
তবু ও মানবো না তোমার
অন্যায় শা.....সে.....নে.....।"

ভাসান খেলা

পুণ্ডরীক চক্রবর্তী

মতিচ্ছন্ন সময়ের হাতে
হাত মিলিয়ে ন্যাখো
মানুষ ক্রমশ একা হয়ে পড়বে।

শূন্য আকাশের নীচে
সংক্ষিপ্ত হাসি, কথা
নিঃসঙ্গতাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ভুল পথ, ভুল নারী
ভুল পুরুষের হাত ধরে
রক্তের ভেতরে হাবুডুবু খায় ঈর্ষা....
বোধবুদ্ধি দুই হারিয়ে
দুর্যোধনের মতন ভাসান খেলায়
মেতে ওঠে জীবন।
উজ্জ্বল প্রকল্প নিয়ে ন্যাখো
কারো কোন মাথা ব্যাথা নেই।

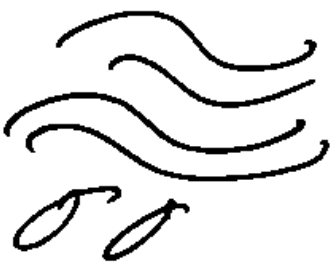

সামাল সামাল

স্বপনকুমার রায়

মনটা যখন বলল আমায় যত পারিস কাঁদ
দমকা হাওয়ায় পাল ছিঁড়ল,
ভাঙল নদীর বাঁধ।
এখন সবই জল থৈ থৈ নেইতো কোথাও ডাঙা
সামাল দেওয়া কষ্ট ভীষণ,
ঝড়ের খুটি আঙা।।

মনটা আবার বলল যখন যত পারিস হাস
আসবে ছুটে ফাগুন হাওয়া,
কাটবে আমার মাস।
এখন আমি সব হারিয়ে খুশি ভীষণ খুশি
মনের গভীর কারাগারেই
দুঃখটাকে পুষি।।

সেই রমণী নিরদয়া

শৈবাল চাকী

ঘোঁড়া ঘোঁড়া স্বপ্নের ঘন জলরঙী ওড়নায় যাদো অনাবৃত কে ছিল
সে ঠিক চিনতে পারিনি তাকে—কিন্তু সে এসেছিল—
জানিনা মোমমোম মার্বেল পায়ে সে ঘুঙুরের শব্দের ঝড়
নিষ্ঠুর কেন তুলেছিল। সোনালী জরির বুটিদার উড়ছে লাল
কাঁচুলী তার, মখমল শ্রীবার হেলদোল, কীজানি কে ছিল
সেই এলোকেশী যুবতী রমণী। কারা যেন, কারা কারা যেন,
দুঃসাহসের কাণ্ডা উঁচিয়ে তাকে ঘিরে ভিড় করেছিল যেন
কালো সেই, কালো কালো মানুষের সেই দেশে হীরের খনির
খোঁজে বা সোনার টানে উন্মত্ত আগন্তুক ছুটে আসা, দিশাহারা
পথাচিক বা অন্বেষীগণ। তার সেই পাণিত হাসির শব্দে
বা চকিত চাউনিতে শরবিদ্ধ অনেক হৃদয় আহত হ'তে হ'তে
হাহাকারে হারিয়ে গিয়েছিল। স্বপ্নে সেই স্তনবতী আজও
মাদলের নাকি ঠিক কী সেই রাগ শোনাতেই থাকে
আকাশে, পাতালে, নদীতে, মরুতে, কর্ণা, পাহাড়, অরণ্যের
বাষাবর আলো অন্ধকারে বিস্তৃত যা।

আমি কি ঘোরের মধ্যে আছি?
আমি কি ধোঁয়ার মধ্যে আছি? ধোঁয়া-কুয়াশায় আছি?
সময়ের সার্কাসে খেলতে খেলতে, খেলতে খেলতে, খেলতে
খেলতে এই চিরঞ্জেবী নটজনু আমি এখন কান
পাতলেই শুনি অজস্র শুকনো পাতার মত জমে থাকা
স্মৃতিতালির বুকে পা ফেলে ফেলে সে আসছে, সে
আসছেই আমাকে নিতে। কে যেন বেহালায় ঝড় তুলছেই।
অথচ এখনও স্বপ্নেও সেই ঘরে বসে অনন্যা সুন্দরী আনাগোনারী।

ভ্রমণ

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

পশ্চিমদিকে বনের উপর থেকে ঢলে পড়ছে দিন শেষের সূর্যের রক্তিম আলোর রেখা। তার আলোর বলয় একদিকে ঘিরেছে আকাশকে, আর একদিকে নদী মাঠ বন আর বেড়াতে আসা নারী পুরুষদের। সেই সাথেতন আমাদের দুঃখসুখ স্মৃতি অভিজ্ঞতা জড়ানো। একটানা চিন্তা ও ভিন্ন ধরনের উত্তেজনার হাতুড়ির পিটিনির বাইরে এসে পড়েছে আজ।
নানা ধরনের ভাবনার মাধ্যাকর্ষণের বাইরে এসে ভারহীন হয়ে যাব আসা ও অস্তিত্ব, মানুষজনের তুচ্ছ অতিতুচ্ছ ঘটনাক্রম মুছে যায়। শুধু একটা অনুভূতি অনুচ্ছ আনন্দ ধূপের ধোঁয়ার মতো ঘুরে বেড়ায় পাতার শব্দে হাওয়ায় হাওয়ায় প্রজাপতির রঙিন পাখার ছবি হয়ে কাঁপতে থাকে, আমনা ভ্রমণ শরীর মন।

দানো

তপন চক্রবর্তী

দেখছি না এমনতো নয়
দেখতেই পাচ্ছি তুমি ধীরে ধীরে উলঙ্গ হচ্ছো
অপেক্ষায় আছি কবে বের করবে মুলোপনা দাঁত

কবে আসবে ঘন্ত ওরে নিতে।

যদিও এখন তুমি প্রাণপনে মুখোস আগলিয়ে
জলছিয় তক্তি নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়েছো
তাই দেখে কেউ কেউ আশ্বস্ত আপাত
বুক থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে ভয়ের কুণ্ডলী।

তুমি চাইছো আরো আরো অসতর্ক হোক
লক্ষণরেখার গণ্ডি পার হয়ে গেলে
টেনে নেবে প্রবল আক্রোশে
তারপর মৃত্যুদাঁত বসাবে গলায়।

দেখছি না এমন তো নয়
দেখতেই পাচ্ছি তুমি ধীরে ধীরে এগোচ্ছো সেদিকে।

আত্মহনন

বিরূপাক্ষ পাণ্ডা

তারা ভরা রাতের ঘরে
আমি গড়েছি আর্দ্রতার জতুগৃহ
জোছনা ভরা বসন্ত মাসে
খুন করেছি হাসির শরীর
পিছু পথে হেঁটে যাচ্ছে।
আমার বেঁচে ওঠার স্পর্ধা
আমি আজ ভালবেসী কবিতা সমগ্র।

বিশ্বাসের আলো

শিশির মিত্র

মনীষা তোমার আলো দেখে
বিপন্ন হয়েছি প্রতি দিক নই
তবু আসি সনবেকা অসময়ে
তোমাকেই খুঁজি—
ভুল ভাঙে অন্ধকার কমে
নূতন নূতন করে পৃথিবীকে চিনি।
মনীষা তোমার আলো যদি
নরম কোমল হতো, স্থির হতো
'উত্তরা'র আলোর মতন।
উত্তরার কাছে আমি নিজে
হতে পারি
সে শুধু হৃদয় জ্বালে সহজ বিশ্বাসে
তুমি তো দাড়াও খুঁজি
করে তোল তীব্র অহঙ্কারী।

যক্ষিণী

চিত্ত মণ্ডল

তোমার আত্মানা থেকে একচুলও নড়বে না জানি,
যক্ষের সাধের বাস গিনিসোনা আসলে তুমি
শরীরের চর্বি বাড়াও।
জনকে ঘিরেছ পর্দায় কৃত্রিমতার নকসাকোটা ফুলে,
দরজায় খিড়কিপথে বসিয়েছ তাঁটা আকটাস।

তুমি তো গিয়েছ বনে, পাহাড়ে, কখনো বা
সমুদ্রে ভিজেছে তোমার নগ্ন পা, গভীর আয়ত চোখ
তবু তুমি যক্ষিণী মননে, মগজে।

যে অরণ্যে ঘুলো হাওয়া, শব্দ নেই পরিযায়ী পাখির,
যে জলে ভাসে না জোৎস্না, উষ্ণতা ছড়ায় না সৌততা
যে পাহাড় ডাকে না জীবন, নেচে না ঝরা মোহ গ্লানি
যে সাগর বালুচর, বানভাসি তোলে না ঢেউ শরীরী কামনার,
সে জমিতে কেন তুমি গৃহচারী কিন্নরীর মত পরজীবী
বুকের কষ্ট ঢেলে দিনদিন বাড়াও নিয়তি।

যে মনে লেগেছে ফাগুন, যে মনে লেগেছে
অগুন সর্বনাশা পরকীয়া রাধার শরীরের,
যে মনে পড়েছে ছায়া কালীদহের কৃষ্ণনীলজলের,
সেই দেহে, সেই মনে নিরন্ন মৃত্তিকার চাষবাস কর
যক্ষের যক্ষিণী হয়ে বাস্তুঘুটার আড়ালে
শস্যহীন দখনী সম্ভব!

নিয়তিকে ভালবেসে পদ্মের মত সাজিয়ে পসরা
যক্ষিণী নারী তুমি বাজিকরের হাতের ইশারায় শুধুই নাচো,
হাসো কিংবা পকেবনে এখনও শরশয্যায় ফিরে যাও উজ্জয়ীনীতে
হৃদের পৌরাণ
লেগেছে ঘুণ,
যক্ষিণী এবারে
ঘুমার খোলো।
উঠেছে ঝড়
করেছে বৃষ্টি
এবার মোক্ষম খোল।

নদীরার যক্ষের শব ভেসে যায়।

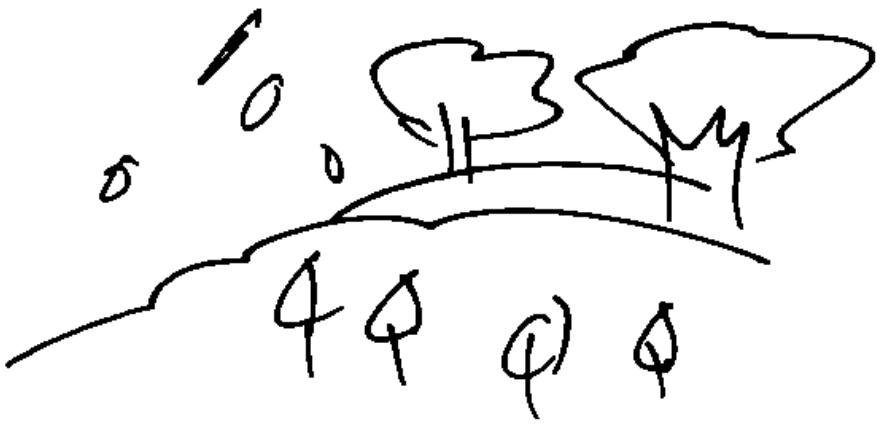

সাগর

চন্দন সেনগুপ্ত

জীবন ভেঙে যায়
একের পর এক
সরে যায় স্নেহ
সমুদ্রে কাছে চায়
আশ্রয়।
আশ্রয়হীন / ভাসাকুল
আবর্তাহত
নীরব দু ফোঁটা নোনা জল
নালিশ জানায় না
কেবল অপরাধীর মতো
চেয়ে থাকো।
জানেনা অপরাধের নিয়ম
শুধু সাগরের নিয়ম
চেয়েছিল তার বিশাল জলরাশি
জলরাশি।
নিজের করে।
সমুদ্র ছিল তাকে দুফোঁটা
নোনাজল
লাগ না লাগা এক মন
দু ফোঁটা নোনা জল
নীরব নোনা লাগ
রেখে যায়।

২

তোমার উন্মুক্ত বুকে
আমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট
খুঁজে সবে শুভ্র রাশি রাশি
তোমার সকল প্রস্তুতি দিয়ে
আমায় ঢেকে ফেল
তোমার বিছানো নির্ভর
বালুকাসনে
একাকী আমি নতজানুহয়ে
উপাসনা করি।

সেখানে রাতনাই, দিননাই
রূপ নাই, অস্তি চর্ম নাই
এক বৈচিত্র্য
কেবলই অনুভূতি।
নীল আর নীলাচল
আমি ভালোবাসি।
শুধু ভালোবাসি।
ঈশ্বরের চেয়েও দেখি ভালোবাসা
তার একটি নাম সাগর।

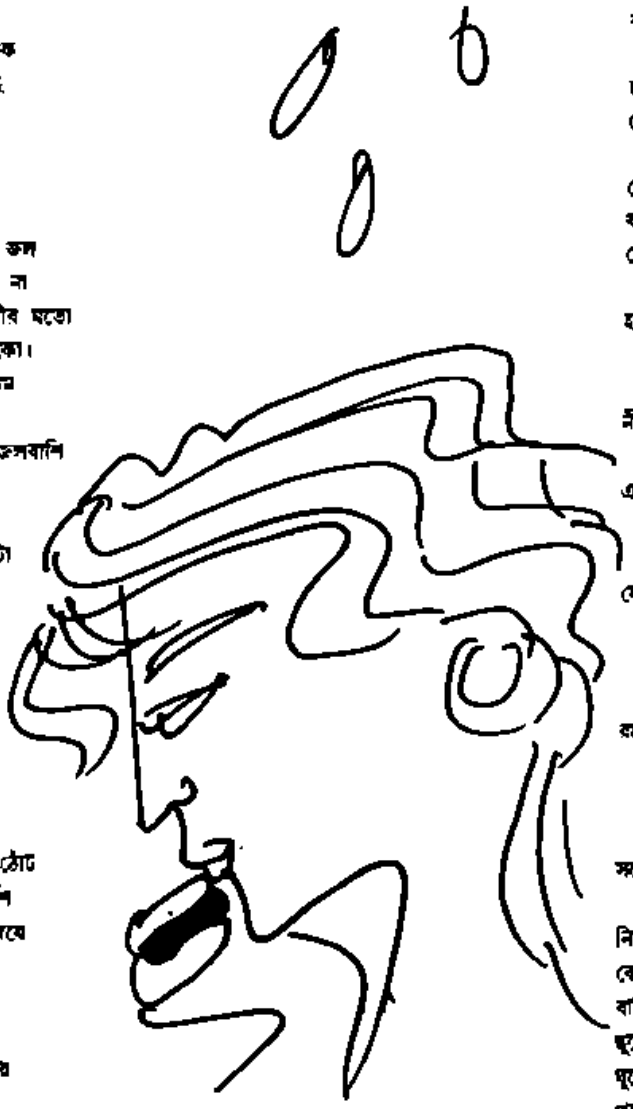

৩

সেদিন প্রথম দেখা তোমায়
তাজমহলের থেকেও ছিলে
বিস্ময়। ছিলে আবেগতরা
বহুদিন থেকে তোমায় জানি
তবু দেখিনি কখনো
হয়তো ইচ্ছাই ছিলো না
সেদিন যখন একাকী দাঁড়িয়ে
তোমার দুয়ারে
তোমার আহ্বান উচ্ছ্বাসিত
আমি নিষ্কলঙ্ক চোখ দেখেছি
ভোরের ত্রিলিটানে
স্নিগ্ধতার লতার গভীরে
হারিয়ে যাওয়া বহুদূর দেশের
অজানা পথের নির্জনতায়
হাতে হাত রেখে
নীল হৃদয়ের ভয়ঙ্কর স্নিগ্ধতায়
তোমার গান গেয়ে যেবে
এক পথীর কবি।
সাগর তাকে মনে রেখো।

৪

যেদিন তুমি জন্মাওনি
যেদিন আমার পদচিহ্ন পড়ে নি
এ মাটিতে, তোমার সৃষ্টি
আমার পথ চলা।
রাজপ্রসাদ হতে যাত্র পথ ধরে
ধূলোমাখা গায়ের বুনোঘ্রাণ বেয়ে
সোনালী খেতের ভাঙা সিঁড়ি ভেঙে
কতদূর, কতপথ, কত ছবি গেছে ডুব দিয়ে
সবে যাওয়া নিস্তব্ধ রাত্রি
গান গেয়ে ওঠা ভোরে বাগানবাটি
নির্জন দুপুরে, একসুরে ডাকা
কোন ফেরিওয়ালা।
বাকি সময়। জীবন কষ্ট,
ছুটেছি বেপরোয়া বন্য ঘোড়ার মতো
ঘুরেছি বেদুইনের মতো
পূর্বের লাল সূর্যটা আমার চাই
কিছু চোরা গোপ্তা অন্ধকার, বন্ধুকের নল
পিচ্ছিল রাস্তা
শিকের ভেতর অন্ধকার ঘর
চিৎকার করে বলেছিলাম সূর্যটা আমার চাই

তারপর কখন যে সময় গেছে কেটে
অনাচাই, বস্ত্রচাই, বিদ্যাচাই
পুরোনো হয়ে গেছি আমি

আজ কোন এক অপরাহ্নে
আমি শুনেছি আমার নাম

আমার নাম ছুয়ে কে গায়
চোখ মেলে দেখিনীল সাগরের
ভেঙে পড়া ঢেউ
অনেক পথ চলা পথ ধরে
আমি এসেছি সাগর পাড়ে
লাল সূর্যের ঠিকানা পেয়েছি
আমার নীল সাগরের পাড়ে।

চারিত্রিক

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাদের অপোচরে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুরই একটা-
আখিং দেশা।
বিশ্বজোড়া কাপে কাবা যেন পাকা বৈদ্যের মতো
অবলেহটি সেবন করিয়েছেন তোমাদের
শৈশব থেকে বার্ধক্য নারীপুরুষ নির্বিশেষে চাপা পড়েছেন এই অবলেহে
মুমূর্ষু রুগী ও সম্বিত ফিরে পেয়ে জানতে চায়
সোনার বুটটা এবার কার।
আদালতে বিচারক লাল কার্ড দেখিয়ে
মুলতুবি করে ওকালী।
তেতাল্লিশের বংশধরেরাও যেখানে হার মেনেছে
তোমরাতো কোন ছার।
সারা বছরের রসদ ওদের জোগাড় থাকে
কখনো দাড়িওয়ালা লোকটার তুলিতে
কালিমাখিয়ে সর্বাঙ্গীনকে সাজায়
'বৈজ্ঞানিক'-ব্যাখ্যার হাতিয়ারে
'বিশ্বসুন্দরী' নামে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দিতে
ওরা কুণ্ঠা বোধ করেনা কখনো
মুক ও বধির কিছু জড়ের বুকে ভাষা দিয়ে
এগিয়ে চলে অভিষ্ট লক্ষে।
এগুলো সবই ওদের পাঁচন তৈরির উপকরণ
সবাই ধর্মান্ধতার জালে ঘিরে
ভাঙতে চায় তোমাদের মেরুদণ্ডগুলো
ভাত-পাতের মোক্ষম অস্ত্র দিয়ে
দু'হাতে দুর নেয়-প্রণ জুড়োনো ঠাণ্ডা বাতাস
আর, চোবা-চোবা-লেহ্য করে উপভোগ করে
কাঙ্খিত মসনদের আরাম।

কথা

সৌরভ চট্টোপাধ্যায়

আলোদণ্ডে জমে আছে ঘুম জেনেও
আকাশ প্রহরীরা চোখ মেলছে না এ কার্ফুনির্জনে
অন্ধকার নিভে যাবে শতচ্ছিন্ন সজলের আগেই
নইলে মনখারাপের রক্ত ও সরিসৃপ হ'য়ে
ভুলে দেবে আলোদণ্ডের ঘুম
ছেয়ে যাবে সমস্ত মানবের মুখ।

মৃণাল সেন-৭৫

উদয় দাশগুপ্ত

ইস্।
হোমাব জেনে গেছো আমার বয়স
রাতভোর আকাশ কুসুম ভাবনায় প্রতিনিধি
হয়ে ছিলের ধাইপে শ্রাবণে
চেতনার কোরাস সংগীতে
নীল আকাশের নিচে।

হুম, কলকাতা একাকার।
ভুবনায়ন স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের দিন।
এখন আকাশের সন্ধানে একদিন প্রতিদিন
অন্তরীণ পর্দা বেঁচে আছি স্বগতভাবে।

তবু একদিন হঠাৎ স্বর্গ দুয়ার
স্বপ্ন এসে দাঁড়াবে পঁচাত্তরের যৌবনে—
ঘুম ভাঙে
নতুন মধুপৃথিবী।

আমার বন্ধু

রীতা মিত্র

আমার দোষ দিও না বন্ধু
তোমার ভালবাসি বলেই
বাঁচার জন্য করি সংগ্রাম
লড়াই করছি অন্যায় করার বিরুদ্ধে
লড়াই করছি নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে,
প্রতিজ্ঞা করবই সত্যকে,
মহাশূন্যতার মাঝে তোমা তারার মতো।
বাঁচতে চাই না আর
জীবনকে বাঁচিয়ে তুলতে সবুজ নদীর মতো,
ফুলে, ফলে, রসের গন্ধ পেতে
সে অধিকার ছিনিয়ে নেবে এবার।

দোষ দিও না। ক্ষমা করবেও না,
জন্মেছি একবার যখন
সৃষ্টির একাংশ হয়ে বাঁচতেই হবে,
বন্ধু, আমার হাত নাও তোমার হাতে।

পোখরান : এক রাজকীয় ছলাব

অমিতাভ দাস

ইতিহাস। নিশ্চিত পুড়ে গ্যাছে ধূলোবালি
এখন ক্রোবিন সকাল পেরিয়ে চিতাকাঠ
গুলপিণ্ড জ্বলে আছে দাউ-দাউ, অকারণ
শত্রুতা। রক্তমাখা হাত। ছয়কোটি বর্ষিণ
রাজকীয় মেধাবী ছলাকলা জানে খুব

তাবণর বিষ জাগবণ। নিজেদের আত্মহনন
কিভাবে মেনে নেবো পবমাণু নিউট্রন
শ্রীবরতা। পাণ্ডুলিপি তবে ওঠে, ঘুলঘুলি
চোরানো দুহাতকাব। মাটি ও শব

মহাভারতের আকাশে বাতাসে

প্রতিম সরকার

সহজ জীবন সহজেই নীলামে উঠে গেছে
গোপন কুরুক্ষেত্রে জন্ম নিচ্ছে ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষ।
চিৎঅবে ওই কাঁপায় মেদিনী দ্রৌপদীর রুদ্ধ কাতরব
ওই আকাশে তোলে দৃষ্টি দ্যূত
কাকস্য পরিবেদনা
স্মিত হাস্য কৌরবের
যৌন গুজব মোনালিসা সভাগৃহজুল
আশ্চর্য পক্ষপাতে পঙ্গু ধৃতরাষ্ট্র
লজ্জিত পাণ্ডবের বজ্রমুষ্টি হয়ে যায় অসহ্য বৃহকম্পন।
মহাভারতের আকাশে বাতাসে
ঘুনের বেলুনে কে মোহাবে অনাগত
পবমাণুব বিষ প্রসাধন।

দ্বৈত সংগীত

যশোধরা রায় চৌধুরী

যেখানে যেখানে যাও, বুঝতে পারি। একা থাকি বলে
জানি যে তুমি যে শূন্যে বিচরণশীল
সে শূন্যে সম্পর্ক আছে, শীতল রাখার
দৃষ্টি অনুভূতির সেই সীমা আছে, সোজা রাস্তাঘাট

আমার মাথার ঘরে শিরাশিরা করছে বিবাহতা
না, কথাটা ভুল হল, বিবাহতা নয়
সময় যে নেই তাই উপদ্রব, সংক্ষা, পরিসীমা
দ্যূতখেলানোর কষ্ট, ভুল বোঝা, রাগ, নিরুত্তাপ...
দৃষ্টি অনুভূতির বাধা লঙ্ঘন, লঙ্ঘন

সবকিছু থেঁসে তবু অন্তর্দৃষ্টি ও ভয় দেখা করে
দুশ্চিন্তারা বেঁকেচুরে যায়

তবুও তো শেষপর্যন্ত বুঝতে পারি, স্পষ্ট হয়, মাধা-পরিশ্রম,

তবুও তো শেষপর্যন্ত বুঝতে পারি, তুমি
কোথায় কোথায় গেছ, কি কি ভাবে ভেবেছো আমাকে।

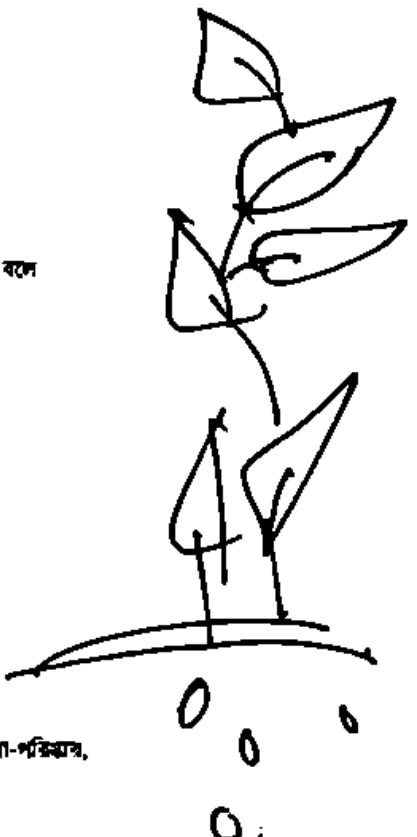

ফটো

শংকরনাথ সেন

এই যে, দাদা, কোথায় চলেছেন?
গলায় ঝুলছে ক্যামেরা দুলিয়ে
বুকের মাঝে ক্যামেরা দুলিয়ে—
একটা ফটো তুলে দেবেন?
না, না, পাসপোর্ট নয়।
সে অনেক আছে—
লেগেছে নানান কাজে—
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, পাস পোর্ট
এখন দরকার ফটো—
ভালো একটা পোট্রেইট, সেটা
হাপবে কাগজ, বিশেষ পরিচয়ে
না, এখনি নয়,
পরে কোন একসময়।
ঠিক, কি রকম?
বোঝাতে পারব কিনা!
সেটা ঠিক জানি না।
ধরুন, ছবিটা হাতি আসল,
অন্তত মাপটা আসার
আটত্রিশের মত যেমোদাগে
উচ্চতা বাড়িয়ে
ধরে নিন, পথের ওপর দাঁড়িয়ে
মোদ্দা কথা, দেখে যেন ভাল লাগে।
তিনা.....
হয়ত বসতেই কম চলে যাবে
আপনার কাছে রঙীনের ফিল্ম তবু আছে।
রঙীন তো ভাল—
সাদা-কালো
সেটা যেন কেমন,
চলে ও না তেমন
কিন্তু পুরানো এ্যালবাম
ঘাটতে গিয়ে,
শৈশবের কালো-সাদা ছবিগুলো
মনে করিয়ে দেয় সেই দিনগুলো।
সেই, সেতারে বিয়ের পরে পরে
সেতারে ছবিমুনে গিয়েছিলাম দেওঘরে—
সবার তোলা ছবি : এখনো আছে কি
ঝাপসা হয়েছে একটু ফিকে।
তখনও কালো-সাদা তোলা
সে সব দিনও তবে যায় না তোলা
কিন্তু সে তবো কেমন যেন রঙীন
জীবন ছিল এমন দিন
অন্য সব তুচ্ছ, হীন—
আমার জীবনে সবকিছুই রঙীন।

পরমানু বোম ফাটিয়ে করছে কারা গর্ব

সমর পাল

একশো দিনের ধর করে তাই
গোখরানে হয় গর্ব।
গর্ব থেকে করতে সিজার—
অটল থ্রেন কাঁচি
বিস্ফোরণের ফলে এখন
জামরা সবে বাঁচি।

স্বপ্নের পাখীরা

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের পাখিরা শুধু আকাশে ওড়ে না
তারা সব জানা মেলে
মানুষের চেতনার গভীরে ;
মস্তিষ্কের কোষ হ'তে কোষে কোষে
অপূর্ব দ্যোতনা।

স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়
নোতুনের গর্ভ দানে
নোতুনের জীবন কল্পনা।

এখন সবর
শুধুমাত্র ব্যস্ততায় নিমগ্নে নিবিড়,
যন্ত্রের সভ্যতা দেয় যান্ত্রিক বিন্যাস
লাভ-ক্ষতি টানাটানি
হিসাবের কাথিতে গোধূলি
বুকে নিয়ে দিতে চায়
জীবনের নোতুন মহিমা,

তবু জানি
স্বপনরা দিয়েছে জন্ম আগের সভ্যতা
স্বপ্নের পাখিরা জানি,
মানুষকে নিয়ে যাবে
সমন্বয় নোতুন প্রভাতে
মানুষের নবজন্ম হবে
লোভ হিংসা দ্বেষ মুক্ত নোতুন পৃথিবী
হাসিমুখে দেখা দেবে
নব সূর্য রাগ।

পরশমণি

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

হে সময় কথা কও,
ফেলানো বারুদ নও।
নেই আগুনের হাত,
হাত ধরি, হাতে হাত,
কণ্ঠে কোথায় ভাষা
দাও না উল্টে পাল্টা।
যান্ত্রিকিকের প্রাচ্য,
ওর মুখে দাও কাঁটা।

হে সময় ওরো ফাঁসে,
কী হবে নিকেতে মুখে?
পালায় মুড়ুং পাখি,
কে কোথায় এসো, ডাকি!
বারুদ না ঘটাই ফুর্তি,
দেওয়াল তুলি, রুখি।
পশ্চাতে ওর ঠেকো,
নও তুমি নও একা।

হে সময় কথা কও,
ফেলানো বারুদ নও।
এসোনেলো ফেলে ঢেউ,
পৃথিবে তো নেই কেউ!
আগুনের হাতে সেঁকে,
কও বলে যাবে কে কে।
হাত ধরি, হাতে হাত,
কেউই দেখেনি তা।
যতি বৃদ্ধ মেহগনি কখন যুবক বৃদ্ধ হয়ে সেই স
নতুন পাখিদের দিয়েছে আশ্রয়
তাও কেউ দেখেনি সমোবে।
বিদুল জ্বর আজ ছেড়েছে আমাকে..

আজ বড় মন ভালো আছে।

সেই সব পাখিরাও এখন
গোধূলের কাজে নেমে আছে।।

মানুষের বিশ্বাসেই

বিশ্বনাথ মাঝি

সময়ের হাতে বাঁধী বেঁধে
এই তো পথচলা
সময়ের প্রতি বিশ্বাস রেখে
মানুষের সাথে কথা বলা।

ও নদী, এই আঙুলে ছুঁয়েছি তোকে
তুই পুণ্যতোয়া
মানুষের বিশ্বাসে আছে গভীরতা
জ্যোৎস্নায় চাঁদোয়া।

বুদ্ধমূর্তির নিচে

গোষ্ঠবিহারী খাঁড়া

ফিরে যেতে হবে
একা একা ফিরে যেতে হবে
শুধু মাঝখানে ঐক্যের সূত্র ধরে নীল গ্রহগুলি
দাঁড়িয়ে থাকে।

অনল-বিলাসী সময়ে
সময়ের পিঠে কাটা-ছেঁড়ার দাগ
মসৃণ চর্বির ঔজ্জ্বল্যে গন্ধে কখনো
এলোমেলো আঙুলগুলি মাতাল নৃত্য করে।
বন্দুকে শূন্যতায় পাহাড় ভিড়িয়ে
বিবর্ণ একা ঠিক ঠিকরে ঠিকরে উড়ছে

মধুর গতির গোধূলি আর
পিপাসার ঘোর অন্ধকার
ভাঙা-ভাঙা বুটজুতোর শ্রেণী—
হাড়-ভাঙা মানুষের কপালে
যে চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে প্রতিদিন

তার বুদ্ধ মূর্তির নিচে
আমার শবদেহের প্রতিমা
সটান খাড়া তালগাছের মত দাঁড়িয়ে আছে
পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে
শত হাহাকার, শত নিদ্রা মগ্ন প্রাচীন এক
ভাঙার ধ্বনি....

তোমাকে অনেক কাল দেখিনি

দিলীপ চক্রবর্তী

অনেক বসন্ত চলে যায়
কালো পৌষ সাদা হয়
তোমাকে দেখিনি কতকাল
ভোর হ'লে রক্ত এলে যায়
অথচ—
তোমার দু'চোখ দেখে দিনের শুরু
শুরু শুরু মেঘ ডেকে যেত
কতকাল হারিয়ে গেছে যে ডাক
জীবনের অজস্র শ্রাবণে
আজ—

ঠিকানা

শিবব্রত দেওয়ানজী

ভালবাসার মানুষ কেমন দেখতে জানি না
ভালবাসার কথা কিভাবে বলতে হয় জানি না
একজন ভাললাগা মানুষের মনে
কণে থেকে--
তালি-তালি সবে খুঁজছি
না-পেলাম না
'কোথায় তারে খুঁজে পাবো'
তার কি অলৌকিক শরীর
সে কি দেখতে পাবালো নেকড়ার মত—
হয়তো বা তাই
কিংবা অবিকল তার মুখের মতন মুখ
যে মুখে আনন্দের গান শুনি
সে কি ভালবাসার মানুষ ;
প্রতিদিন জন্ম নেয় পৃথিবীতে
না গণিত মানুষের মধ্যে
তার অস্তিত্ব সতন্ত্র!

হে শ্রম, হে সম্পদ

বসন্ত সরকার

হে তোমায় বলেছে সুন্দর
সম্বোধিত হও!
কার তরে সদাই চঞ্চল তুমি উন্মন হয়ে রও।

তোমাকে স্পর্শ করে আমি অনুভব করি
সদ্য সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ!
তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আমি শুনি
অগ্নিপাতের শব্দ ; দারুণ বৃষ্টিপাত।

যে তোমাকে বলেছে প্রখর দীপ্তি,
জ্বলন্ত হও ;
কার তরে সদাই চঞ্চল তুমি
শ্বরণের দিকে চেয়ে রও?

আমি তো আকাশে দেখি
গ্রহ, নক্ষত্রের ধ্রুবপাত—
আমি তো অন্ধকারে শূন্য হাতে ফিরে যেতে যেতে
তোমাকে স্পর্শ করে অনুভব করি প্রচণ্ড উত্তাপ।

তুমি কি আমার নও?
কেন তবে উন্মন হয়ে রও প্রগাঢ় আলিঙ্গনে!

শুভাসিনী

অশোক ভট্টাচার্য্য

১

[illegible]
[illegible]
[illegible]

থার্মোমিটারে দিতে ঘাম দেখা। ও সবের আর বালাই নেই। কপালে হাত দিয়ে ছেঁচকু ছোঁয়া আর সে টুকুই যথেষ্ট। কপালে এখন আর হাত ছোঁয়ান যাচ্ছিল না, এত গরম। নিমাই, মার মাথার কাছেই বসেছিল। বিধির ছেলেমেয়ে ও-ও একটা নেকড়া ভিজিয়ে মার কপালের উপরে বিছিয়ে দিয়েছিল। আর একটা ভাঙা পাখা নিয়ে হাওয়া দিচ্ছিল মাথার। অনভ্যাসে আর বাসী ঠোঁকা লাগছিল মার মাথার দিকে তাকিয়ে। মানদা নীর্ব হাতটা উঁচু করে বলার চেষ্টা করছিল—'থাক বাবা, আর হাওয়া করতে হবে না। আমি একটু ভাল বোধ করছি।'

ভাল যে সে বোধ করছিল না তা নিমাই ওর অস্ফুট মুক্তিতেও বুঝতে পারছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখছিল মার চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। টলমল-টলমল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল চারদিক। নিমাই একটু ভয় পেয়ে গেল। মা মুখের কাছে একেবারে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মা বিধিকে খবর দেব? বিধির কথা শুনে মানদা স্থির হয়ে গেল। কি উত্তর দেবে তাড়াতে তাকেই দৃষ্টিটা ঘোরে পড়িয়ে পড়ল জল। শেষে নিজে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'না বাবুখে। তাকে ডেকে আর লাভ নেই। শুধু-শুধু তার ঘরটা আবার ছড়িয়ে তুলব।'

নিমাই মায়ের চোখের জল মুছিয়ে একটা হাত আকুল মানবার মাথায়। আঙুলগুলো দিয়ে চুল নাড়তে নাড়তে বলল। 'তোমাকে কি ওষুধ জানব না। ডাক্তার ডেকে তো তুমি কোনদিন জানতে দাও না।' মানদা এত কষ্টের মধ্যেও না হেসে পারল না। নিমাই ওর হাতটা কপালের কাছে থেকে টেনে নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে এনে বলল, 'ডাক্তার। ও কি আর আমাদের জন্যে রে। ও সবের আর দরকার নেই। ওষুধ পত্র খেতে আমার আর ভাল লাগে না।'

—'ওষুধ-টা খেলে অসুখ সারবে কি করে? এবার যে তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে মা।'

—'বাড়াবাড়ি যার কি? এ আপনা আপনিই সেরে যাবে। এর জন্যে আর ওষুধ খেতে হয় না।'

—'না হয় না আমার, এমনি এমনি সারবে কিনা?'

—'আহা না, তুই অত ভাবিস না। তার থেকে তুই বরঞ্চ একটু জল দে আমাকে। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

—'জল।'

—'হাঁ, একটু জল।'

—'দিচ্ছি' বলে তাড়াতাড়ি উঠে গেল নিমাই।

বেশিক্ষণ আর ঘেরে হোল না। মাথার কাছেই জলের কলসীটা ছিল ঢাকা দেওয়া। ঘুমের মাথাটা বার বার গলা ওদিয়ে আসছিল, -মানদা নিজেই গড়িয়ে খাচ্ছিল জল। কখন যে জল ফুরিয়ে গেছে তার আর খেয়াল নেই। নিমাই উঠে কলসীর ঢাকা খুলতেই শূন্য কলসী টুন করে আওয়াজ করে উঠল। তবু ছেঁচকু তলানি জল ছিল তাই আস্তে আস্তে ঢালতে গিয়ে খানিকটা পড়ল মাটিতে আর খানিকটা পড়ল গেলাসে।

মানদা একবার তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ঐ টুকুতেই হবে, ঐ টুকুই তুই আমার মুখে দে নিমু।'

নিমাই গেলাসটা এগিয়ে দিতেই মানদা নিমাই ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে জলটা ঢেলে দিল নিজের গলায় মধ্যে। অস্ফুট স্বরে একটা স্বস্তির শব্দ বেরিয়ে এলো, 'আঃ।' নিমাই নিস্তব্ধ হয়ে ছলছল চোখে তাকিয়ে ছিল মায়ের দিকে। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় কাঁপছিল তারকের কোমল হৃদয়। মানদা ধীরে ধীরে পাশ দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'আজ তোর কিনু খাওয়া হয় নি। নয়রে নিমু?'

নিমাই কোন উত্তর দিল না।

খাওয়া যে হয় নি মানদা তা জানে। গতকাল বিকেল বেলা অন্ধকারের কাছে মল পৌঁছে, নিয়ে এসে সেই যে শুয়ে পড়েছিল, আরপর কি করে যে রাত কেটে সকাল হোল, আর দিন গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এলো তার হুস নেই। কে যে কোথায় খেল আর কে যে খেলো না, তার আর খেয়াল রাখতে পারে নি। নিজের পেটেও পড়তে কিনু পড়ে নি। শুধু ছুয়ের ঘোরেই আর ঘরে জল গড়িয়ে গেছে।

পাড়া প্রতিবেশীরা যে কায় খোঁজ নিতে পারে। তাদের নিজের নিজের সংসার নিয়েই তারা ব্যস্ত। শুধু গোপালের মা একটু কড়া হাত-পা মানুষ বলে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু খোঁজ খবর নিয়ে যায়। মানদা তাকেই একবার ডেকে আনবার জন্যে নিমাইকে বলল, 'গোপালের মাকে একবার একটু ডেকে আনতে পারিস নিমু?' নিমাই চুপ করে ছিল এতক্ষণ। মার কথা শুনে বলল, 'ডাকব। মাসীকে।'

—'হাঁরে, তোর মাসীকেই বরঞ্চ একবার ডেকে আন।'

—'আচ্ছা, যাচ্ছি, বলে উঠে দাঁড়াল নিমাই।

২

যেদিন বাড়ি ছেড়ে ভবে যে ওরা চলে এসেছিল, আর ভবে যে এ দেশে এসে আবার ঘরকন্না পেতেছিল নিমাই এর মনে পড়ে না। আজ হওয়া অবধিই সে দেখেছে তাদের ছোট্ট ভাঙাচোরা একটা ঘর। আর দেখেছে মাঝে সে, বিধি আর মা। মার কাছে মাঝে মাঝে গল্প শোনে, যে দেশ ওরা ফেলে এসেছে সে দেশে নাকি ওদের অনেক কিনু ছিল। খেয়াল ভরা গরু, পোষা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ। আরো নাকি কত কি। নিমাই-এর এক এক সময় ইচ্ছে করে চলে গেলে হয় আবার সেই দেশে। কিন্তু মার কাছে কথাটা পাড়লেই মার চোখ যেন কেমন ছল ছল করে ওঠে। ঐ দেশ থেকে আসার সময়ই নাকি ওরা ওদের ছেলেবেলার মাকে অকালে হারিয়েছে। তাই ও দেশের নাম আর মা সহ্য করতে পারে না। মায়ের কষ্টের কথা ভেবে নিমাই আর বায়না করে না। ওরও বেশ মনটে বেশ তো আছে এখানে। কত পাখি ঘোরা, কত ইলেকট্রিক বাতি, কত বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু নিমাই তবু বুঝে উঠতে পারে না। এসবের মধ্যে কেউও মা কেন দিনকে দিন ফিকিয়ে পড়ছে। একটা না একটা অসুখ তার লেগেই থাকে। আগে তবু বিধি ছিল, মার অসুখ হলে বিধিই সব ভার করে নিত। আজকাল আর তা হবে কি করে। বিধির যে বিয়ে হয়ে গেছে। এক মার বাড়াবাড়ি হলে গোপালের মাই ভরসা। গোপালের মাকে ওরা মাসী বলেই জানে আপন হাত পা মানুষ তিনি। আপদে-বিপদে পাশে এসে দাঁড়ান। তাছাড়া আরও দু একজন প্রতিবেশী আছে যিদের করে মানদা মাঝের সঙ্গে ডোর থাকতে উঠে কাজ ছেড়েছে। তারাও মধ্যে মধ্যে এসে খোঁজ নিয়ে যায়। কিন্তু মুসকিল হল তাদের ছেলেরা ছোট্ট ছোকরার আর। কাজ তাদেই দিলে চলবে কি করে? গোপালের মাও আর ছেড়েছে ওদের সাথে কাজে। গোপাল একটা কাজ পাওয়ার পর আজকাল আর মা না। মানদাও তাই মনে মনে ভাবে নিমাই বড় হয়ে গেলে ও-ও আর এ কাজ করা না। কিন্তু ততদিন কি তার বেঁচে থাকতে পারবে। শরীরের যা অবস্থা হচ্ছে দি দিন তাতে আর ভরসা পাচ্ছে না কিনু। এর মধ্যে যদি মারা যায়। নিমাই যে ও ছেলেমানুষ সেই চিন্তা করলেই বুকটোর ছোট্ট জল আসে। গোপালের মা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'বাঁচবি না কেন রে, কি বয়স তোর বলুন হয়েছে।'

মানদা বলে, 'বয়স দিয়ে আর কি হবে দিদি। আমি যে দিনকে দিন পঙ্গু হয়ে পড়ছি।'

গোপালের মা বলে, 'শরীর অসুখেই রোগ ভাবি হয়, আসার সেরেও যায়

মানদা আর কোন কথা বলে না। মনে মনে একবার কপালে হাত দুটো ঠেকিয়ে বলে, 'তাই যেন হয় ঠাকুর।'

গোপালের মা কাছে এসে বসলে মানদা যেন একটু ভরসা পায়। নিমাই তা বুঝতে পারে। তাই জন্যেই সে একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। মাসীকে দিয়ে মার অসুখ খবর দিয়ে একবার ডেকে আনতে পারলেই হয়। তারপর সব ব্যবস্থা মাসীই নি করে নেবে।

বাইরে তখন সূর্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দূর থেকে শাঁখের ভেসে আসছিল। এরই মধ্যে কেউ কেউ আবার উনোন ধরিয়ে রান্না শুরু করে দিয়ে রান্নার ঘ্রাণ-ভুর ভাওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল মানদা শুয়ে শুয়ে। কিন্তু তার শোঁয়ার ক্ষ নেই। সন্ধের সময়ও শুয়ে থাকবে। তাই একবার মাথাটা উঁচু কেমন যেন এ অবস্থায় বোধ করতে লাগল। না ঘুম, না জাগা অবস্থায় কেমন যেন একটা ঘো বোধ করতে লাগল। দুর্বোধ ঝুড়ে পুকনো জিভাওলো তীক্ষ্ণ করতে লাগলো মাথ কতবার ভেবেছে সে তারকের দোহাই দিয়ে সমস্ত কিনুই তুলে আনবে, কিন্তু জিভাও কেন যে যায় তার এসে কাঁটা দেয় তা সে বুঝে উঠতে পারে না। একটা মায় তার, তারেই নিজের হাতে তুলে দিল কিনা—। না কাউকেই সে দোষ দিতে না কিশোরকে ঠানদিকে হাত দোষ হয় না। বৃদ্ধা মানুষ। নিজের হাতে ওদের সে থেকে কুড়িয়ে এনে ঘর বেঁধে দিয়েছিল। সরল বিশ্বাসেই ছেড়েছিল, ও মানদা তো বুঝেনি। এখন মান চলবে কি করে।

মানদার তখন আর চিন্তা করার শক্তি ছিল না। ঝাঁঝ কাঁঝ হয়ে আসছিল, 'চা আর ইচ্ছে করে না ঠানদি।'

—'খুব করে আর কথা কবি কি। যা গেছে তা তো আর ফিরবে না। ভগবানের আর নিমাইকে তো আর ভগে তাসিয়ে দিতে পারিস না।'

—'এটা-ই তো ভাবন ঠানদি। নইলে জীবনের প্রতি আর আমার মোহ

—'তা তুই এক কাজ কর মানদা, বড়ি বড়ি দিয়ে কি-এর কারবার করে

ক-টাকা পাবি? তার থেকে ধরচে মীনার জন্য সব চাল ক্রয় করে। ওদের সাথে মিশে জমীন কায়েম না হয়ে লেগে যা।'

—'ছলে বলে তাহলে চাল ছেড়ে হবে?'

—'তা না হয় একটু ছেড়েদি। তবে তা না করলেও চলবে। তার জন্যে সব আলাদা লোক ঠিক করা থাকে। তুই না হয়ে শুধু চাল পৌঁছে দিয়ে চলে আসবি।'

—'যা ভাল তুমি বোঝনি। আমি কিছু আর ভাবতে পারছি না।'

মীনার জন্ম সময়ে আজে লেগে গিয়েছিল মানদা। শুধু কি মীনার মা? সে যেন একটা বল। শ্যামলার-মা, কলার মা, চম্পা, মীনাদি আরও কত জন। ভোর না হতেই ওরা বেরিয়ে পড়ত। প্রাগৈতিহাসিক থেকে চাল এনে ফেলেনি। এলাকা কোলকাতার পৌঁছে দিত অন্যজন যারা প্রশাসনে আছে। পথের ঝুটি-ঝামেলা সব মীনার মাই পোহাত। সেই ছিল ওদের ঘরের লক্ষ্মী। কোন পথ দিয়ে কখন যেতে হবে, আর কোন ফ্লেক পোস্টে কত দিতে হবে সব যে মীনার মার কণ্ঠস্থ। বস্তা প্রতি পৌঁছে দিতে কত পাওয়া যাবে তাও যারভী প্রশাসনের সাথে ঠিক করত মীনার-মা। তার সঙ্গে মীনার মার আরেক সম্পর্ক ছিল একটু আলাদা ধরনের। আদিখ্যেতা দেখে মানদার গা জ্বলে যেত। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার যো ছিল না।

মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে মানদা আর স্থির করে উঠতে পারছিল না। তাছাড়াও পরীক্ষাটাও তার দিনকে দিন ভেঙে পড়ছিল। শেষের দিকে ছেলের ছালায় প্রায়ই বেরুতে পারত না কাজে—।

মীনার মা একদিন এসে বলল, 'ও মানদা তোর শরীরে আর সইবে না ওসব। ওতাসিনী তো এখন বড় হয়েছে। ওকেই বলত যে, পড়িয়ে লিখিয়ে নিই।'

—'তা কি করে হয় দিদি। ওরে অড়ির ঝাইরে কি কাজ লাগানে যায়? ওর এখন উঠতি বয়স।'

—'উঠতি বয়স তো হয়েছেটা কি? অন্য মেয়েরা যেন আর অড়ির যায় হয় না!'

—'না তার জন্যে নয়, তবে—।'

—'তবে আবার কি? না খেয়ে মরার চেয়ে কাজ করে খাওয়া অনেক ভাল। কি বল ওতো? পারবি নে তুই কাজ করতে?'

ওতাসিনী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। মীনার মার কথা শুনে মানদার দিকে একবার তাকালো।

মানদার আপত্তি শেষ পর্যন্ত আর টেকে নি। ওতাসিনী আরও কয়েকদিন যাতায়াত করেছিল। —যারভী প্রশাসন নতুন নিয়মে পেয়ে মীনার-মার মজুরী দিয়েছিল গণ্ডা চারেক বাড়িয়ে।

মীনার মা তবুও সন্তুষ্ট নয়। পরিহাস করে বলেছিল, 'এত অল্পেই সারতে চাও যে তারা।'

—'আরে যাও, যাও, এতো সবে জল পাবার। কারটা আগে ইলিশ করে যাও।'

—'অনেক কাজই তো ইলিশ করে দিচ্ছি। অন্তমানের না তো একটাও। এটাও ফলবেনে না।

—'আরে কি যে বলো মীনার-মা। তোমাদের পরে আমার অগাধ বিশ্বাস।'

অগাধ বিশ্বাস তখন করে নি মীনার-মা। একদিন এসে মানদাকে বলল, 'ও মানদা তোর যে দেখি কপাল ফিরতে আসছে রে—।'

মানদা বলল, 'কেন কি হোল আবার? চালের দর বুঝি চড়তে আরম্ভ করেছে।'

—'আরে না, না। তোর মেয়ের কথা জানতে চাইলাম আর কি।'

—'ওতাসিনী?'

—'ওরে হ্যাঁ। ওতো দেখি তোর বড় পাকে লাভি রেখেছে।'

—'সে কি। ওতো তো আমার সে রকম মেয়ে নয়।'

—'সে রকম মেয়ে নয়তো কি? অমন সুন্দর চেহারা আর যখন সুন্দর পাত্র অন্যদের মেয়ে দেখলে আর না আর মন উলে। ঘরা যারভী প্রশাসনেই মন উলে গেছে রে।'

—'যারভী প্রশাসন!' মানদা যেন চমকে উঠল।

—'ওরে হ্যাঁ সেই। আগারটা অবশ্যি বুঝতে পারছিলাম অনেকদিন থেকেই। কিন্তু আমি কি আর অত খেলা যে বুঝবোই মুখ খুলি। ওদের পরি যাঁরে বলুক। —দেখে কলকে দেখি ঘরা যারভী প্রশাসনই ছেলে কাল, 'ও মীনার মা—।'

—'আমি বললাম, 'মুখেই, আর কাজে হাত না। আমাদেরও তো চোখ আছে। দেখি একবার মেয়ের হাতে ধরে। —যারভী প্রশাস তাই শুনে যেন লজ্জায় ঘরে যার আর কি। হাজার হলেও তো কুড়ো ঘরানে বিয়ের প্রস্তাব। —তা তোর কি মত বল একবার।'

মানদা এতক্ষণ চুপ করেছিল। সব কিছু শুনে যেন আর মাথা তুলিয়ে বাসিছিল। বলল, 'তুমি কি সব বলছ দিদি আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।'

—'আ-হা। কিছুই যেন বুঝতে পারছিস না। মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তা আবার অত বড় ঘরানোকের কাছ থেকে। আমরা হলে তো এখনই গিন্নে হাঁ দিতুম।'

—'যারভী প্রশাসের সঙ্গে ওতোর বিয়ে দেবো। ও যে ওর চিন ভন ছাড়ে দিদি।'

—'আ-হা-হা। কথা শুনলে যেন গা জ্বলে যায়। এমন বিয়ে যেন 'সপের বিনে আর ছেড়ে না। ভাল ঘর দেখলে আগে লোকে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে গলায় ঘটে বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। তা যারভী প্রশাস তো এখন গিন্নি বুঝ। ভাল করে ভেবে দেখ্। ওতাসিনী তোর রাজরানী হয়ে থাকবে। ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।'

—'কিন্তু দিদি, ওতাসিনী আমার একটা মস্ত মেয়ে তাকে দেখে-।'

—'সতীনের ঘরে। এই বুঝি তোর চিন্তা এখন? সে ভয় তোর আর করতে হবে না। যারভী প্রশাসের বউ মরে গেছে অনেক দিন আগে। ছেলেরাও সব বড় হয়ে গেছে। ঘাইরে থাকে। যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। ওর সঙ্গে ওতোর বিয়ে দিলে, তোর মেয়ে হয়ে থাকবে পাটরানী। —মার তোর মুখ পর্যন্ত যাবে ঘুরে। দিন দিন যা তোর শরীরের হাল হচ্ছে, চোখ বুজলে ঐ মেয়েকেই তো তখন পাঁচ জন দিয়ে থাবে ;—ভেবে দেখেছিস্?'

—'তাদের শক্তি আমার আর নেই দিদি।'

—'তা যদি না থাকে তবে লোকে ভাল বুদ্ধি দিলে তা একটু শুনতে হয়। কথাটা আমি বলে গেলুম। একবার ভেবে দেখিস সময় করে।'

মীনার মা চলে গেলেও মানদা ঠায় বসে রইল। মনে মনে আকাশ পাতাল কত ভাবনাই না ভাবতে লাগল। কিন্তু যেন কিনারাতেই পৌঁছতে পারল না। ঐখানে বসেই ওতাসিনীকে ধীরে ধীরে ডাকলো, 'ও ওতো, ওতো রে।'

ওতাসিনী ঘরামার বসে ঝরি ছাল বিনছিল। মার ডাক শুনে বলল, 'আছি। পরিছাটা হয়ে এলো, এটা নিয়েই যাই।'

একটু পরেই ঝরির আটিতে টিনিটা ঘুটতে ঘুটতে এসে ওতাসিনী বলল, 'এটা খেয়ে নাও মা—।'

মানদা বলল, 'এখনই খেতে হবে? এই তো সবে খেয়ে উঠলাম।'

—'সে কি? সেই ভোর সকালে মু-ভাত ছাই খেয়েছ। আর এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। এটুকু না খেলে চলবে কেন?'

—'মানদা হেসে বলল, 'যে যা হলে। না খেলে তুই মারবি নে তা আমি জানি।'

ঝরিটা চুলুক দিয়ে আটো ওতাসিনীর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে মানদা বলল, 'সবই তো শুনলি ওতো। তোর মতটা তো বললি না।'

—'আমার আবার কি মত।'

—'অমত তুই করিস নে মা। এত দিন তোর হয় শুশুরঘর মুখ তুলে চেয়েছিল। তা না হলে অত বড় লোকের ঘর থেকে সম্বন্ধ আসে। আমি তাহলে মীনার মাকে ডেকে ভাল বলে দিই, কি বলিস।'

ডেকে আর বলতে হয় নি মীনার মাকে। নিজে এসেই কথা নিয়ে গেছে সে। তার পরে ; বিয়ে হয়ে গিয়েছিল যারভী প্রশাসের সাথে ওতাসিনীর। কথা কথায় এ বিয়েতে যারভী প্রশাস আর চৌপর মাথার দিয়ে এসে ওঠে নি মানদার কুঁড়ে ঘরে। বিয়ে যা হয়েছিল তা সমস্তই যারভী প্রশাসের বাড়ীতে। সেখানে ঘরপক্ষে শুধু ছিল যারভী প্রশাস। আর কন্যাপক্ষে যিনি ছিলেন সর্বেসর্বা তিনি হলেন মীনার মা। সমস্ত কিছু দেখে শুনে মানদার যেন ভাল লাগছিল না। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না।

ঝরি নিয়ে আসতেই গোপালের মা জিজ্ঞেস করল, 'ও মানদা তুই নাকি তোর মেয়ের বিয়ে দিয়ে এলি?'

—'হ্যাঁ দিদি। মীনার মা ঠিক করে দিল।'

—'কে? মীনার মা? আ-হা-হা। মেয়েটাকে তুই পরে বসিয়ে এলি মানদা!'

—'কি বলছ তুমি দিদি? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

—'বুঝতে পেরে আর করবি কি? মীনার-মা যে যারভী প্রশাসেরই চর।

ওকে কি আর সে ঘরে রাখবে রে। ওকে নিয়ে ব্যবসা করবে। মানদা যেন আঁতকে উঠলো।—'ব্যবসা! ওকে কেন আমি নিজের ঘরেই—।'

কথাটা আর শেষ করতে পারে নি। ভূপে ভূপে শরীরটা আগে থেকেই দুর্বল হয়েছিল। অকারণ এই হঠাৎ আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল মানদা। খানিক পরে অবশ্য ফিরে এসেছিল জ্ঞান। কিন্তু সেই মানসিক অনুভূতি হঠাৎ ধরে শরীরটা তার ভূল ভেঙে পড়তে লাগল। তা আর কেউ দেখল না।

নিমাই-এর সঙ্গে গোপালের মা এসে দেখল, মানদা ঘুমে একেবারে বেহুঁস। কখনও বা একটু জ্ঞান হচ্ছে, আবার কখনও বা যাচ্ছে মিলিয়ে। তাড়াতাড়ি একটা লম্বা ঘুমিয়ে দিল গোপালের মা। মানদার মাথার কাছে এসে ডাকল, 'মানদা, ও মানদা। মানদা অতিকষ্টে একবার মুখ তুলে তাকাল। জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'কে? দিদি!—আমি কোথায় যেতে বসেছি, দিদি।

—'তোর সঙ্গে কোনো এসব অলুক্ষুনে কথা বলতে নেইরে মানদা'—বলল গোপালের মা। মানদার কানে গেল কিনা কে জানে, বলল—'নিমাই আমার ছাইল দিদি। ওর বোধহয় আজ সারাদিনেও কিছু পেটে পড়ে নি।'

—'তুই ওসব চিন্তা করিস না। আমি তো এসে পড়েছি।'

—'হাঁ'। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানদা।

আর কোন কথা বলল না। গোপালের মা ততক্ষণে উনোনটা ধরিয়ে একবাটি বার্লি তৈরি করে নিল। নিমাই এর জন্যে ডাল তাতে ভাত চড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ও নিমাই তুই মাকে এই বার্লিটুকু খাইয়ে দে দেখি। আমি একবার ডাক্তার খানা থেকে ঘুরে আসি।

ডাক্তারের নাম শুনে নিমাই ওর মুখটা কেন হঠাৎ ফ্যাল ফ্যাল করে উঠল, 'ডাক্তার ডেকে আনবে মাসী?'

—'ডেকে আনব সে সাধ্য কি আর আছে। ঐ ছেলে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। যদি বলে কয়ে একটু হোমিওপ্যাথি ওষুধ আনতে পারি।

গোপালের মার কথা শুনে নিমাই কেমন যেন মিইয়ে পড়ল। তবু বলল, 'তাই যাও মাসী। আমি মাকে ঘাঁইরে দিই বার্লিটা।'

ওষুধে কাজ দিয়েছিল কিনা জানি না। মাঝ রাতের দিকে মানদা একটু ঘুমিয়েছিল নাকি। গোপালের মা ছেলে বসেছিল মায়ের কাছে। নিমাই একবার ঘুমোচ্ছিল ; আর এক একবার ছেলে উঠে জিজ্ঞেস করছিল, 'মা কেমন আছে মাসী।'

ভোরের দিকে মানদা অনেকটা ভাল হয়ে উঠল। চোখ মেলে একবার গোপালের মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সারারাত্রি জেগে কষ্টালে দিদি!'

গোপালের মা সে কথার কোন উত্তর দিল না। শুধু জিজ্ঞেস করলো, "ওভাগিনীকে একবার খবর দেবো রে মানদা।—মুখ করে যাব করবি কি! যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরতে পারবি না।'

—'মানদার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কেন মুখে আমি তাকে আসতে বলব দিদি। আমি যে তাকে নিজ হাতে পথে বসিয়ে এসেছি।'

—'তবু তো তুই তার মা। তোর অসুখের খবর দিয়ে নিমাই একবার তার সামনে দাঁড়ালে, সে আর না এসে পারবে না রে।'

—'তা আমি জানি দিদি। কিন্তু—।'

—'কিন্তু আর করিস নে। শেষ সময়েও যদি না দেখতে পায়, তবে জীবন ভরে যে ওর দুঃখ থেকে যাবে।'

—'তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর দিদি। আমার আর চিন্তা করার শক্তি নেই।'

৩

ধারাবী অঞ্চলের পরিচয়ের মাঝিক সেরুক বেহুলো বিয়ের পরীটা দিনের বেলাতেই মিটে গিয়েছিল। বিরাট বড় বাড়ির ছাইলের মহলে কি ঘটল ভেতর মহলে কিছু টের পেল না। সবাই চলে গেলে ধারকী চলার তার ধারওয়ানকে ডেকে হুকুম দিল, 'সিউলক্ষন ছাইলীকে এবার ভেতর বাড়িতে নিয়ে যা।'

সিউলক্ষন কাছে এসে একটা সেলাম ঠুকে বলল, 'জী।' তারপর ওভাগিনির দিকে চেয়ে বলল, 'আইয়ে মাইজী।'

ওভাগিনি চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কখনও বিয়ের পর বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কতবার বেতে বেতেছে সতীন বাড়ী। সেই সংসারের মধ্যে আজ ধারওয়ানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কেন যেন ওভাগিনীর মন সায় দিচ্ছিল না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই ধারকীচলার হেসে উঠল, 'কি গো তার পাচ্ছ? ভয়ের কি আছে। চিন্তামনিকে আমি সব বলে রেখেছি। ও হয়তো এতক্ষণে সব গুছিয়ে বসে আছে।'

ওভাগিনী কোন কথা বলল না। ধীরে ধীরে সিউলক্ষনের সাথে হাঁটতে সুরু করল। খানিক দূর হেঁটে যেতেই এক চত্বরে এসে সিউলক্ষন চিন্তামনিকে না দেখতে পেয়ে চাঁক ছাড়ল, 'ও চিন্তে চিন্তে—।'

চিন্তামনী এ বাড়ির দাসী। বিরাট বড় বাড়িতে ধারকী চলারের আপনজন বলতে কেউ নেই। যা আছে সব ধারওয়ান, চাকর, চাকর আর চাকরানী। চিন্তামনি হচ্ছে এই সকলের প্রধান। তাই সকল সময়েই সে ব্যস্ত। তার স্পষ্ট কথার ধারকী চলার ও সময় সময় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

ওভাগিনীকে যে আজ আসার কথা চিন্তামনি তা ভুলেছিল। কিন্তু ওকে যে কি। আর ওকে নেওয়াই বা কি আছে। এরকম তো মাঝে মাঝে এসে থাকে। ও একটা ঘর দেখিয়ে দেওয়া করেকদিনের জন্যে ; তারপরে তো সবার একই গন্তব্যস্থল তার জন্যে চিন্তামনি আজ কামাই না করে অন্য কাজে চলে গিয়েছিল।

চিন্তার রেখা না পেয়ে সিউলক্ষন নিজেই বুদ্ধি খরচ করে ওভাগিনীকে এক ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি এ কামরেমে বইঠিয়ে মাইজী। হামি চিন্তেকে খুঁজে আনে।'

সমস্ত শরীরটা কেমন যেন ঘুমিয়ে আসছে। সিউলক্ষন চলে যেতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ওভাগিনী। কোন তখন পড়িয়ে পড়েছে। সারাদিনের অবসন্ন শরীরটা যেন বেচে কিন কিন করতে লাগল। সেই জোন ঝক তোরে সে, তার ওস্তাদ মীনার মা চিনেছানে চলে এসেছিল এ বাড়িতে। নিমাই তখন ঘুমোচ্ছিল।

ওভাগিনী বলল, 'ও মাসী, নিমাই যাবে না আমার বিয়েতে।'

—'মীনার মা উত্তর দিয়েছিল, 'বলিস কিরে ফোলকাতার রাস্তায় ওকে এ নিয়ে ছেড়ে আসতে নাকি। তা ছাড়া আজের ঘটিতে—কোথায় হারিয়ে যাবে ঠি যাবে? তার থেকে ও বরং এখানেই থাক।'

মানদা একটু আপত্তি করেছিল, 'ও একা থাকবে কি করে দিদি!'

—'একা থাকবে কেন? এই তো আশে পাশে কত লোক রয়েছে। তার মাসীরে আমি ওর দেখাশোনা করতে বলে দিয়েছি। মীনা এসে। ও এ আনার ব্যবস্থা দেব।

মার কথাটা ওভোর মনে হচ্ছে লাগল অন্তরকম। মা তো আবার অসুখ মন উপোষ করেছিল। যে জ্বালে একদম কিছু তার পেটে পড়েছে কিনা। চিন্তা ক করতে ওভাগিনীর মাথাটা বিমঝিম করে উঠল। বসে পড়ল। হাঁটু দুটোর উপরে মা রেখে কতক্ষণ যে চোখ বুজেছিল তার ঠিক নেই। হঠাৎ কাঁধের উপরে কার হা ঠেলা লাগতেই চমকে উঠল।

—'চিন্তামনি বলে উঠল, 'ও বব্বা তুই তো তারী সীঁদু দেখি।'

—'ওভাগিনী হেসে বলল, 'না হঠাৎ মাথাটা আমার কেমন ঝিম ঝিম করছি

—'সে-ও ভাল। আমি তো ভাবলাম একটা মতে বুঝি কর্তার পরে টান প গেল. তাই সীঁদুরে বসে চোখের জল ফেলছিস।'

—'ধুঁ। আমার ঘরে গেছে। আমি তো অন্য চিন্তা করছিলাম দিদি।'

—'ও ঝব্বা, তোর আবার অন্য চিন্তা করার লোক জুটে গেছে এরই মধ্যে

—'না, না, আমি, আমার মার কথা চিন্তা করছিলাম। মার যে খুব অ কেউ দেখার নেই।' প্রায় কেঁদে ফেললো ওভাগিনী।

—'এই রকম কিছু একটা না হলে আর এই নরকে কেউ মরতে আসে তা ওঠ দেখি এখন। পেটে দানা-পানি হয়তো এখনও কিছু পড়েনি।'

—'না সে হবে খন। তুমি একটু বল দেখি এখনে। বুড়ো কত্তা কদি-

—'আরে কত্তা করার সময় অনেক পাবি। বেশি কথা অরি বলি বড়ো কেউ দেখতে পাবে না আমাকে। তা ছেড়ে নামটা কি?- আমি আবার সবাইকে ছাড়া কাজে পারি না। রাগ করিস না কিন্তু—।'

—'ওভাগিনী মৃদু হেসে বলল, 'ওমা সে কি রাগ করব কেন? আমার ওভাগিনী।'

—'আ, কেন নাম তো। তা হবে না কেন অমন সুন্দর দেখতে যাকে নামটা সুন্দর না হয়ে পারে।'

—'সুন্দর না ছাই।—তা তোমার নাম তো বললে না দিদি।'

—'দিদির আবার নাম থাকতে হয় নাকি? দিদির নাম দিদি।'

ওভাগিনী একটু যে অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল।

চিন্তামনি আবার জলে উঠল, 'ও আজ, মুখ দেখি ফেকাসা হয়ে গেল। মেয়ের তো মান অপমান জ্ঞান নাই। শোন, আমার নাম চিন্তামনি। সবাই আমাকে চিন্তে জানে। আমি এ বাড়ির মালী।'

—'সে তাই হোক, আজ থেকে তুমি হলে আমার দিদি।'

—'দিদি, বেশ তো তুই না হয় আমার দিদি বলেই ডাকিস। এখন ওঠ, বেলা যে পড়িয়ে গেল।

—'ওতাসিনী আস্ত মেয়ের মত উঠে দাঁড়ালো।'

● ● ● ● ●

মস্ত বাড়িটার প্রতি তলাতে সব আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। নতুন মানুষ আসে তাদের জন্যে তিন তালাতেই ব্যবস্থা হয়। চিন্তামনি তাই ওতাসিনীকে নিয়ে তিন তলাতে উঠতে লাগল। খানিক দূরে উঠে আবার চিন্তামনি তো দাঁড়ায় ওতাসিনী তো জানে কেউ আজকে জল তুলেছে তিন তলাতে। তার থেকে ঘড়া নীচে ফেলে হয়। ওতাসিনীকে বলল, 'চলরে ওতো আমরা নীচে নেমে যাই। কে জানে কেউ একনও জল তুলেছে কিনা।'

বলতে বলতে কেউ হাসির রোল। কাঁধে তার জলের কাঁখ। কেউকে দেখে চিন্তামনি বলে উঠল, 'কি কেউনা এত বেলাতে বুঝি জল তোলা হচ্ছে?'

—'কেউ বলল, 'হাঁ, একন সব নিকিন বুঝি, কৈফিয়ৎ দিতি দিতি যে পেরানডা যেরেম ছেলো।'

—'কৈফিয়ৎ দেবে না তো কি? আজ যে নতুন মা আসবে তা তোমার খেয়াল ছিল না?'

—'কত নিকি আর খেয়াল রাখুক! দু-দিন অন্তে বাদেই তো নতুন মা আস্‌তিছে। জোনজা-বোনুন আর জোনজা-পুজোনো তা অত আর খেয়াল থাকে নি যে।'

—'বুঝতে পেরেছি মন পড়ে রয়েছে তোর জবার কাছে। তা এই বুড়ো বয়সে এ কষ্ট আর নাকরে তার কাছে থাকলেই তো পারো।'

—'তা সারাটা জেকনই তো টুঁটো মন্তর করেই কাটালে। এখন এঁটুন পথ দাও নিকি উপরে উঠি জলডা নে—।'

—'পথ তোমাকে দেওয়াচ্ছি। আকুকে বলে সোজা তোমাকে দেশের বাড়ির পথটা দেখাব।'

—'হ্যা, মরণী আছে কেবল ঐ ডা, পথ ছাড়ো নি নি।'

—'আজকে দিনের মত—তোমার ছেড়ে দিলাম চল ওতো আমরা নীচ তলাতে যাই।'

পাশ কাটিয়ে উঠে গেল কেউ। নীচের তলার আকড়াটা দেখিয়ে চিন্তামনি বলল, 'ও তলো তুই ওখানে স্নান করে নে। আমি ঠাকুরকে তাগদা দিয়ে আমি গে—'

ওতাসিনী স্তম্ভিত হয়ে যেতে তাকেই নিয়ে তিনতলায় চলে এলো চিন্তামনি। বড় একটা ঘরে ঢুকে বলল, 'এই ঘরটা এখন তোর হোল রে ওতো।'

ওতাসিনী একবার তাকিয়ে দেখল চারদিক। দামী দামী সব আসবাবপত্র। বড় একটা পালঙ্ক, সুটকে ড্রেসিং টেবিল, আলমারী আর কতকগুলো সোফার ধরণের চেয়ার সাজানো। মনস্থ করে ওতাসিনী সঙ্কোচ ত্যাগ করলো। চিন্তামনির হাত ধরে বলল, 'তুমি একটু বসবে না দিদি?'

—'বসব না কেন? আর এই জানলার ধারটায় বসি।' কতকাল যে বসেছিল ভুলনে তার খেয়াল নেই। পেরে চিন্তামনি বলল, 'উঠি তাহলে এবার। ওতাসিনী তার আঁচল টেনে বলল, 'কেন তো তুমি। এতক্ষণ তো আমার কথাই শুনে গেলে। এখার তোমার কথা না শুনলে আমি ছাড়ছি না।

—'চিন্তামনি বলল, 'এই তো ;—বাবী মুসকীলে ফেললি। আমার আবার কথা আছে নাকি। ও তো কাউকে বলি না।'

—'কেউ শুনতে চায় না বলে বলো না। আমি শুনতে চাইছি। তোমাকে বলতেই হবে।

—'কি আর শুনবি বোন। ও এক মস্ত দুঃখের ইতিহাস।'

—'তবে থাক দিদি। তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাই না।'

—'কষ্ট এই কষ্টটাকেই তো বুকে নিয়ে আমি এখনও বেঁচে আছি রে।

ভুল পথে পা দিয়েছিলাম। তাই খেসারত দিতে হচ্ছে সারা জীবন ধরে। তুই তো কিছুই দেখিস নি শুনিস। আমি শুধু পেয়েছিলাম স্বামী, পেয়েছিলাম সন্তান, সংসার। কিন্তু বুদ্ধির দোষে কিছুই ধরে রাখতে পারলাম না।'

—'ও কি তুমি কাঁদছ দিদি?'

—'না রে! আমি তো কাঁদি না। আমি হাসি। ওটা হচ্ছে চোখের জল।

জীব মানে না, তাই পড়িয়ে পড়ে।' চিন্তামনি বলতে লাগল, অজয়ের লালসার যা হয়। প্রতিদিনই স্বামী স্ত্রীর কলহ লেগেই থাকত। ছোটখিনি আমার তার-ই মধ্যে তোর জামাইবাবু আসত মন খেয়ে। সেদিন আমার কপালেও দু-চার ঘা পড়তে বাকী থাকত না। বাবীর মানুষগুলোর মজা লুটতো তবুই দেখে। অভিচরনকে তো তুই একনও দেখিসনি। কি আমারির স্বামীর ওর। কিন্তু তখন কি জানতাম, ওই হচ্ছে ভাবীর চরম। একদিন স্বামীসোহাগের সুযোগ নিয়ে এসে বলল আমাকে, 'কেন পড়ে আছিস দিদি, মাহুবোর ছেড়ে, আকাশেও ছেড়ে, চল আর আমার সঙ্গে। আমাদের মধ্যজনকে বিয়ে করে সুখে থাকবি। তোর রূপ আছে, যৌবন আছে।'—চন্দ্রমনি ওনে তো ওকে মারতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন বাদে কি করে যে একদিন তার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলাম, তা আজ আর আমার মনে নেই। তার পরেই তো আমার এই পরিণতি।

—'ওতাসিনী জিজ্ঞেস করল, 'উনি তা হলে তোমায় বিয়ে করেন নি।'

—'উনি বলছিল কাকে? ও নতুন সম্বন্ধ তো তোর। তা একটু ও সবুর হয়। —বিয়ে ও কাউকে করে না যে কেন। বিয়ের ভাওতা দিয়ে ফাঁদে ফেলে। তার পরে লাগিয়ে দেয় ওর পাশ ব্যবসার। বড় বড় সব অফিসার। বড় বড় দর কেঁ। নারী দেহ কেঁচে করে ঘুনাক্ষর।

কিন্তারিত নেত্রে তাকালো ওতাসিনী। গলা দিয়ে যেন তার স্বর বেরুতে চাইল না। আস্তে উঠে বলল, 'কি বলছ তুমি দিদি?'

—'ঠিকই বলছি যে বোন। বিয়ে চলে যেতে চেয়েছিলাম আজও। কিন্তু সে বড় কঠিন পথ। একবার বেরিয়ে এলে আর ফেরা যায় না। না শ্বশুর বাড়িতে না বাপের বাড়িতে। শ্বশুর বাড়িতে আর কেউ ছিল না। স্বামীই ওনেছিলাম আমি চলে আসার পর আত্মহত্যা করেছিল। আমাকে কি জীবন ভালোবাসত আমৃত্যু কোনদিন বুঝিনি। ছেলেটা পথে পথে ঘুরে ঘুরে খিয়েছিল না ফিরিয়ে নিয়েছিল তার খোঁজ আর পাই নি। তারপর, তারপর! এখন আমি খুব সুখী রে! আমি হাসি, কিন্তু কাঁদি না—কাঁদতে পারিনা। ভাবনী ওসব এখন আমাকে ভয় করে। আমার মুখের ওঁর ওপরে ভয় করে।

—'দিদি। ওতাসিনী ধীরে ধীরে বলল, 'তাহলে আর ফেরবার কোন পথ নেই দিদি?' তিলে তিলে পাপে ডুবে মরতে হবে আমাকে? প্রশ্ন রোধ করতে পারল না ওতাসিনী।

—'মরবি কেন রে। মারবি, মারবি। মরতে পারবি না তুই ওদের!'

—'কাকে? ভাবনী চন্দ্রমনিকে? ওতাসিনী হতচকিতে তাকালো চিন্তার কথা শুনে।

—'চিন্তা এবার হতাশার সুরে উঠলো, 'না পারবি না। ওরাই বেঁচে থাকবে। তার থেকে এই ভেল তো আছি। বিরাট বড় বাড়ি, গিজগিজ বড় ঘর, আর অসংখ্য মানুষের ভীড়। —এই দেখ ; কি আরোজন তাদের সব কিছু তখন থেকে। তুই কিন্তু মনে করিস না যেন। পুজোনো কথাগুলো তুলসে নিজেকে আর সামাল দিতে পারি না। সঙ্কে হয়ে গেল দেখছি। উঃ এখনও কত কাজ যে বাকী। তুই তা হলে বস এখানে, আমি যাই।

ওতাসিনী আর বাধা দিল না চিন্তামনিকে। সে চলে যেতেও মন্ত্র মত বসে রইল জানালার ধারে। কাইরে তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাস্তার আলোগুলো কখন যে জ্বলে উঠেছিল খেয়াল নেই। আসে পাশের বাড়ির ইলেকট্রিক বাতির আলো জানালা দিয়ে ঠিকরে পড়েছিল ওতাসিনীর ঘরে। সেই আলোতেই মুখ ঘুরিয়ে ওতাসিনী একবার দেখল, সামনের ড্রেসিং টেবিলের বিরাট আয়নাতে তার প্রতিচ্ছবি পড়েছে স্পষ্ট। সিঁথির সিন্দুরটা কখন মুছে গেছে। ওতের গলা শাখাটা লাল শাড়ির সাথে মিশে গেছে একাকার। হঠাৎ একটার মনটা পাগল হয়ে উঠল ওতাসিনীর। মুছে ফেলে দেবে ঐ সিঁথির সিন্দুর, ভেঙে ফেলে দেবে শাখা, পুড়িয়ে দেবে লাল শাড়ি। চলে যাবে, চলে যাবে সে সেই খুঁড়ে ঘরে ওর মার কাছে।—কিন্তু না। থাক, এতদিনের উপর যে তার বন্ধ মারা জন্মে গেছে—এরই জন্যে।

৪

বিয়ের নাটক শেষ হয়ে গেলে যাবনী যখন তার কাজের আস্তানায় এসে বসল। কাজের মানুষ, কাজ না করে কি পারে? বড় রাস্তাটা পেরিয়ে পাশের গলির মুখে তার দোকান। কি বিক্রি হয় দোকানে তা কে জানে। তবে লোক জনে এটা নাকি যাবনী রমণীদের মেন মেন করার আস্তানা। মদ আছে তার দোকানে, বিক্রিও অনেক। বড় বড়

সব পাটি আসে। কেউ বা আসে মটোরে, কেউ বা আসে হেঁটেছে। অনেক অনেক টাকার দেন দেব, সওয়াল জোকে তাই একটু সময়ে চলে।

ম্যান খুলে দিয়ে চেয়ারে বারণী প্রসাদ ডাক দিল, 'রামলাল ও রামলাল, ওনছিস।'

রামলাল কয়লাখার ভাঙ্গা পাখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বাবুর ডাক শুনেই ছুটে দিয়ে বলল, 'কি চাই বাবু।'

—'এক গ্লাস জল যে তো দেখি।'

কুঁজোয় জলই ছিল। এক্সগ্লাস জল ভরে রামলাল টেবিলের উপর রাখলো। এক নিশ্বাসে জলটা শেষ করে দিল বারণী প্রসাদ। পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখে নিল কটা বাজে। মনে মনেই বলে উঠল, 'না। এখনও কি তার আসার সময় হোল না? রামলাল দাঁড়িয়েছিল পাশেই। তাকে লক্ষ্য করেই বারণী প্রসাদ বলে উঠল, 'কান্তিচরণকে তুই আজকে আসতে বলেছিলি তো।'

—'হ্যাঁ বাবু আমি নিজে গিয়ে বলে এসেছি। এমন কি মোক্ষদা মাসীকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছি।'

—'বেশ করেছিস্। তবে এখনও তাদের আসার নামটি নেই কেন।'

—'তা কি করে বলব বাবু। এগিয়ে কি একবার দেখবো।'

—'তাও কি আমায় বলে দিতে হবে। ছুটে গিয়ে একবার দেখ কি হোল।'

—'বেশিদূর আর যেতে হলো না। রাস্তার নামতেই দেখতে পেল কান্তিচরণ আর মোক্ষদা ঠাকরুন আসছেন। ফিরে এসে বারণী প্রসাদকে বলল, 'ঐ যে বাবু ওরা আসছেন।'

—'হোক্কার। বলে বারণীপ্রসাদ সড়চড়ে বসাতেই ওরা দুজনেই ঘরে ঢুকলেন। —কি ব্যাপার কান্তি, এত দেরী করলে যে?'

—'দেরী কি আর আমার কাকা। মাসীর যে এখন নড়তে চড়তে ছ-মাস।'

—'হ্যাঁ, নড়তে চড়তে ছ-মাস। মুখ বিকৃত করে বলে উঠল মোক্ষদা, 'দেখ কান্তি বোর কাকায় মাসী বলে কি তোরও মাসী।'

কান্তিচরণ বলল, 'তা নয়তো কি। সুখিমামা তো আমারও মামা। ঝগড়া ও ক্ষমা।

বারণী প্রসাদ হেসে বলল, 'এই তো মাসী, ঠাকে গেলে আর আস্তির কাছে।'

—'এই ঠকা-ঠকি করেই কি সমস্তটা কাটাবি, না কাজের কথা বলবি। — রেগে উঠল মোক্ষদা।

—'বারণী প্রসাদ বলল, 'এই কাজের কথা বলার জন্যেই তো ডাকা তোমাদের। কাজ তো এখন করবে তোমরা।'

—'মোক্ষদা বলল, 'তা ও মেয়ের খবর দিল কে।'

—'কে আবার দেবে। প্রথমে দেখেই আসিই। পরে তো মীনার মা আসেই।'

কথাতে বলতেই মীনার মা এসে ঢুকল ঘরের ভিতর। বারণী প্রসাদ আহ্বান করে বসালো, 'আরে এসো, এসো মীনার মা। তোমার কথাই বলছিলাম মাসীকে।'

মীনার মা বলল, 'আমার কথা আবার কেন। আমি তো এক নগণ্য লোক। তুমি নগণ্য হোক। ও বাবু, তুমিই হলে আসল। ও হ্যাঁ তোমার বাকী টাকার কথা আমি বলে দিয়েছি জনদাদাকে।'

—'আরে টাকার কথা তোমার কে বলছে। তোমার কাছ থেকে যে আমার টাকা মার যাবে না তা আমি জানি। তবে হাল-চাল সামাই দিয়ে বিশ্লেষণ করা উচিত তো কেমন হোল।'

—'ঠিক বলেছ মীনার মা। তবে এখন পরিষ্কার পিটিয়ে পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব তোমার। —কি মাসী, এটাই তো কেন ঘর যায় তোমার ট্রেনিং থেকে।'

—'মোক্ষদা বলল, 'ঘর যাবে কেন, মানুষ তো হোল এতগুলো।

—'তা আমার জানতে। তবে সাত দিনের বেশি কিন্তু সময় দিতে পারব না তোমাকে;—কি বল কান্তি, আজ রোববার, আসছে রোববার প্রথম পার্টিকে আসতে হবে। তবে এর মধ্যে কান্তিচরণ, তুমি আসর মোক্ষদ্ব করতে পারবে তো।'

কান্তিচরণ বলল, 'কি যে বলেন কাকা। সপ্তাহদিনে তো একটা বিশ্ব ব্যাপ হয়ে। তা এত তাড়া একটা ব্যাপার। কাজের তো কালকে ছাড়েই করা যায় না।'

বারণী প্রসাদ বলল, 'কি মাসী। পারা যাবে কি তা। —না অতটা বুঝি নিয়ে আর দরকার নেই। ঝি-নিকারী তুমি এখনও দেখলেই না।'

—'দেখব আবার তো এসেছি।'

—'তা যাও দেখে এসো। তোমাকে আজকে দেখিয়ে দিতে হবে নাকি।

—'কেন কালে কেন দিয়েছে? কথা ফুরুল যে জল পড়ে যায়।'

—'না, না মাসী রাগ করলে তুমি আমি। তোমার উপরে আমার কত ভরসা বিশ্বাস। —তা একটা কথা মনে পড়ে গেল।

—'কি।'

—'তের নম্বর ঘরের মেরেটার কি ব্যাপার বল দিকি।'

—'কেন, কি হোল আবার।'

—'টাকা-কড়ি আদায়পত্র আপদ আপদ দিয়ে দিচ্ছে যে। প্রেম-ট্রেম করে আবার পালিয়ে যাবে না তো।'

—'হুঁ : পালিয়ে যাবে। ওলি বুঝে হয়েছি বলে কি সমস্ত কিছু লোপ পাবে ; যে আমার চোখে ধুলো দেবে।'

—'না, না তা বলছি না তবে—'

—'তবে আবার কি। ছিল তো কোন ব্যাঙ্কার পড়ে। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মানুষ করলাম। প্রেম-ফ্রেমের পথ করে দিলাম। এখন উড়ো পাখি উড়ে গেলেই হোল'

—'তা একটাকে একবার দেখে এস তুমি।'

—'হ্যাঁ যাব এখনে। —তা চল মীনার মা দেখে আসি।'

—'মীনার-মা বলল, 'আমি আবার দেখব কি। ওকে তো দেখছি অনেকবার তুমি বরঞ্চ যাও। আমি এখানে বসি।

মৃদুহাসে হেসে যেতে বারণী প্রসাদ বলল কি কান্তিচরণ, আজ একটু জলের ভোর হবে নাকি। কান্তিচরণ একগাল হেসে, একটু এগিয়ে এসে বলল, 'আমিও তা ভাবছিলাম কাকা, আজ তাই বলে কলসীই হলে চলবে না।'

—'পাখি ছাড়া করে বারণী তোমাকে খাইয়েছি।'

৫

চিন্তামনি চলে যেতেও শুভাঙ্গিনী ঠায় বসে রইল। জানলায় নিজের উপ প্রতিষ্ঠা হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে চোখ দুটো তার বুজে এলো। কেন কী যে কি এসে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেল শুভাঙ্গিনী তা আর খেয়াল করে। অন্ধকারের মধ্যে চোখ বুজেছিল, সেই অন্ধকারই রয়ে গেছে সেই রইল। এর পর এক চিন্তা করে, মন, সেই সঙ্গে দেহটাও কেন তার ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড় ছরের কথাটা আবার একবার মনে হতে লাগল। গলা ছেড়ে একবার ডাকতে ই করল, 'মা, মা গো।' হঠাৎ যে তার মনে হোল মার কণ্ঠস্বর, 'ওলো, ও ওলো ভাত আনাতে।'

শুভাঙ্গিনী যে চমকে উঠল। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'মা।' তাকিয়েই যে সামনে অপরিচিতা এক মহিলা। ধড়মড় খেয়ে বসে পড়েই, মোক্ষদা ঠাকরুন যে উঠল, 'কি রে বৌ, ভয় পেয়ে গেলি নাকি। তা আমি তোর মায়ের মতনই ; আর আমি সম্পর্কে মাসী।'

শুভাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে পড় । একবার প্রণাম করে বলল, 'না মাসী ভয় পাব কেন।'

—'তবে যার কথা বুঝি চিন্তা করছিলি, তাই না।'

শুভাঙ্গিনী আর উত্তর দিল না। ম্লান হেসে একবার মাথাটা নীচু করে ন মোক্ষদা বলল, 'তা একটু আধটু নতুন নতুন করে যাই কি। কিন্তু তাই । এমন সুন্দর মুখখানাকে কালি করে যে বসে থাকবে চলবে না।'

শুভাঙ্গিনী আর না হেসে পারল। হাসি মুখ ঝলা মোক্ষদা চুলে ধরে বা 'বা, যাদুতে তোকে দেখি কেন সুন্দর লাগে।—তা এই মুখখানা তুই কালি করে বসে এতক্ষণ। ছি! ছি! ছিঃ ;'

এই বলে শুভাঙ্গিনীর হাতটা ধরে খাটের উপরে বসিয়ে দিয়ে নিজেও ব কলল।

—'কেন গেয়ে আমার বিয়েটা হোৎ ঠিক হয়ে গেল কিনা, তাই বিয়ের ব আর উপস্থিত থাকতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম, এই ফাঁকে একবার এর সঙ্গে আলাপ করে যাই।

শুভাঙ্গিনী কোন কথা বলল না। মাথাটা নীচু করে বসে রইল চুপ ক

মোক্ষদা আবার বলতে লাগল, 'কেন-পো সোজাসুজি লজ্জার আর কিছু নেই। কিনা, 'মাসী বিয়েটা সত্যি হোৎ ঠিক হয়ে গেল। কাউকেই কিছু খবর দিয়ে উ পারি নি। এবার একটা পার্টি দেবো মনে করেছি ; তাতে কিন্তু তোমায় থাক হবে।'

আমি বললাম, 'তা আর থাকব না কেন। তুই যখনে কলিদিন। শেষে ও সময় হাল কিনা—তোমার বৌমাটিকে কিন্তু মাসী করিয়ে নিতে হবে এই পা

যোগ দেওয়ার জন্যে। তুই নাকি আবার সেকেলে পার্টি ; এই পার্টি-ফার্টি বিশেষ বুঝিস নে। —তা আমি বললাম—হাঁ ; আজকালকার মেয়ে আবার পার্টি জানে না। শুনে ও-সব সে হাসলে। তা তুই কি ঘরিস,—এই যা, এতক্ষণে তোর নামটাই শোনা হোল না।'

শুভাঙ্গিনী ঈষৎ হেসে বলল, 'শুভাঙ্গিনী।'

—'বাঃ বেশ নাম তো। তা তুই-ই বল ওতো, আজকালকার মেয়েরা পার্টিতে যেতে কখনও ভয় পায়?'

—'কেনদিন তো যাই নি মাসী। তাই—।'

—'ও লজ্জা করছে বলতে আমার কাছে। তা আরশী যখন এসে বলবে তখন তো আর না বলতে পারবি না। তা আজ যে, —তোর বাড়ির কথা কিছু শোনা হোল না।'

বাড়ির কথা উঠতেই মুখটা আবার ভার হয়ে গেল। মোক্ষদা জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে তোর কে কে আছে গো মৌ।' আবা নেই বুঝি?'

আবার কথা উঠতেই শুভাঙ্গিনীর চোখ দুটো যেন জল জল করে উঠল। তখন তার কষ্টই বা কতো তবু, বাবার কথা বলতেই সেই ছবিগুলো যেন মনের কোনে বেজে উঠে, বুক-টা একেবারে কাঁপিয়ে দেয়। মা তো এখনও ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠে দেখে ওতো আর নিমাই ঠিক আছে কিনা। সন্ধেতে একবার তাদের পাশে হাত বুলিয়ে আবার ওরে পড়ে।

শুভাঙ্গিনী একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঈষৎ ঢোক গিলে বলল, 'না, আবা আর আমাদের কেউ নেই মাসী। ও-দেশ থেকে কষ্ট পালিয়ে আসছিলাম। তখন আবা আমাদের জন্যে দেরী। আর কোন বিপদ আসতে পারবে না। হিন্দু-মুসলমানের ঝামেলায় দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল তখন দেশটা।

মোক্ষদা যেন আৎকিয়ে উঠে বলল, 'অ-মা-মা। তা দুখ করে আর করবি কি বল্,। কত জনের যে এইভাবে সর্বনাশ হয়ে গেছে। -তা তুই আর ভাবিস না। যা গেছে তাতো আর কেনদিন ফিরে আসবে না। এখন তা হলে তোর শুধু মাই বেঁচে আছে, নয়রে।'

—'মা, মা আর এক ছোট ভাই। মা আবার যে বড় রুগ্ন। দিন দিনই তার শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়ছে।'

—'কি হয়েছে তোর মার?'

—'কি হয়েছে তার বুঝতে পারিনি। ডাক্তার তো আর দেখানো সম্ভব হয় নি। রোজই জ্বর আসে। এক একদিন জ্বরে একেবারে বেহুঁশ হয়ে যায়।

—'তা তোদের তাহলে চলে কি করে?'

—'চলতে তো আর চাইত না মাসী। তবু যদি মা একটু সুস্থ থাকত। তা হলে না হয়—।'

মোক্ষদা মাথা নিচু করল, 'এখন আর এসব কথা ভাবার ধরকার নেই রে মৌ। তুই যখন একেবারে আরশীর কাছে এসে পড়েছিস তখন আর কোন চিন্তা নেই। তা তুই মার বড় মেয়ে, একে সামলাতে পারতে মাকে দেখবি না তো কে দেখবে।'

শুভাঙ্গিনী কোন উত্তর দিল না। আঁচল দিয়ে একবার চোখের কোন মুছে নিয়ে মাথার উপরে কাপড়টা টেনে দিল।

মোক্ষদা আবার বলতে লাগল, 'আরশীর মত মেয়ে হয় না ওতো। ও নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়াতে ভালবাসে। তার সব এখন নিজের এক একটা সন্তান হয়েছে। মিষ্টি মুখে আছে। তা তুই ও ভাবিস না মৌ, তোকেও ও এমন না কাছে বুকিয়ে রেখে।

—'আমাকে আর কি কাজ দেবে মাসী। আমি তো লেখা পড়া কিছু শিখিনি।'

—'লেখাপড়া দিয়ে কি হবে। মেয়ে মানুষের রূপ-যৌবন যতদিন থাকে ততদিন তার ভয় কাকে রে। লেখাপড়া শুধু পুরুষের চোখে সব ধুলো দেয়ার জন্যে।'

কথাটা বলেই মোক্ষদা একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি বলিস ওতো।'

শুভাঙ্গিনীর মাথার নিচটা যেন ধপ করে ঘুরে উঠল। এতক্ষণ মাথা অবনত করে আসছিল।

হঠাৎ কেন্দ্রের কথার যেন কাঁটা বিঁধে উঠল গায়ে গা। চিন্তাশক্তির কথাটা আবার মনে পড়ে গেল, 'ওরা আইবে বিয়ে অরে না রে কেন। ওরা ওদের কাকরার খাটায়।' শুভাঙ্গিনী যেন উত্তর দিতে পারল না। ধীরে ধীরে একবার মুটো চোখ তুলে আবার নত করে নিল মোক্ষদাকে।

মোক্ষদা তা আর লক্ষ্যও করল না। আপন মনেই বলে চলল, 'এই জন্যেই তো বলছি বৌ, আরশী যখন যে পার্টি দিতে চায় তাতে তুই আর আপত্তি করিস নে। কতটাকা পাবি, কত উপহার। তার পর যদি একবার তোকে ওদের মনে ধরে, তবে লাল জলের মেয়ে তোকে একেবারে ধনী করে দেবে। —দেখিস তখন আর, ছেলে পেলে পিতে সবই যেন আবার হাবভাব হাতে তুলে দিস না। নিজের জন্যে কিছু রাখিস ; আর, আর এই বুড়ো মাসীটাকে যেন কাল বিস না।

এক শুভাঙ্গিনীর বৈধোর বাঁধ ছেড়ে গেছো। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কি বলছ তুমি মাসী।' আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

শুভাঙ্গিনীর চেঁচিয়ে ওঠা শুনে, মোক্ষদাও তার আসল কথাটা সহসা ধরে ফেলল। মাথাটা নেড়ে মুখ বিকৃতি করে বলে উঠল। 'আ-মা-মা, কতি বুদ্ধী যেন, বুঝতে পারছিস! বলি সোজা আঙুলে কি ঘি ওঠে।' আবলায় বাপদাদা, মা হয়ে এক অনাথ মেয়ে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেই রাজী হয়ে যাবে। এখন দেখছি তা নয়। বলি মেনে শুনেই তো এসেছিলি।

—'না বুঝবনো নয়। সবরে বলে উঠল শুভাঙ্গিনী।

মোক্ষদাও মুখে রাগী ভাব এনে বলল, 'না বুঝবনো না।' বলি আরশী ছোকরাকে চেনে না কে এ তল্লাটে? তার কাছে মেয়ে দেয় যে খেতে না পেয়ে মরবে। টাকার সব করে। টাকা নেওয়ার সময় মনে ছিল না।

—'টাকা? শুভাঙ্গিনী যেন আশ্চর্য হয়ে গেল, 'কে নিয়েছে টাকা।'

—'কে আবার? তোর মা পোড়ার মুখী।'

—'হতেই পারে না। মা আমার কখনো সেরকম নয়। মা টাকা নিয়ে কখনো আমায় বেঁচতে পারে না।'

—'কেন মীনার-মা কে তোর মাসী বলে জানিস না? মাসী টাকা নেওয়া আর মা টাকা নেওয়া দুকি আলাদা হোল।'

—'মীনার মা।' তারপরে চিৎকার করে বলে উঠল শুভাঙ্গিনী। নিজেকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। দুহাতে নিজে মাঁচলটা মুখে চাপা দিয়ে এদিয়ে পড়ল মোক্ষদার। ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হয়ে গেল, নিমাইকে কেন আনতে চেয়ে মি মীনার মা। কেনই বা নিজের ছাপাকটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাইছিল। কিবে মাওয়ার আগে [redacted] হয় নিজেরা আলাপ করতে পেরেছিল। কিন্তু তখন আর কোন উপায় ছিল না। তাই বোধ হয় যাওয়ার সময়টোতে মুখে-লজ্জায় আর দেখা করতে এলো না।

মোক্ষদা বলে উঠল, 'ও রকম চোখের জল আমি অনেক দেখেছি মেয়ে। মোক্ষদা কারার তোলবার লোক মোক্ষদা ঠাকরুন নয়। এটা জেনে রাখিস। জল চাস তো এখনও রাজী হয়ে যা, না হলে কপালে দুখ আছে।'

এবার ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠল শুভাঙ্গিনী, 'দুখকে আমার ভয় পাই না কখনো। তাই বলে ভাল কথা বলে ঘরানীর ক্ষতি না করবে।

—'কি বললি ঘরানীর? এতদিন আমার মুখের পরে কেউ কথা বলতে পারল না, আজ তুই কিনা আমার কালি কলমাইস! থাকবে না ও তেজ। দেখিয়ে দেবো আমি, কত ধানে কত চাল। একদিন আমার পায়ের পরে এসে কাঁদতে হবে তোকে। বলতে হবে, 'মাসী বাঁচাও।'—একথা যদি না বলে তবে আমার নামই নয় মোক্ষদা ঠাকরুন। এই আমি বলে গেলাম, হাঁ।'

৬

মোক্ষদা চলে যেতেই আবার মেঝেতে এলিয়ে পড়ল শুভাঙ্গিনী। সমস্ত চেতনা যেন আবার ছুটে গিয়ে শুধু মাথার শিরাগুলো সব সক্রিয় হয়ে উঠল। চিন্তাশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে চোখ বুজে পড়ে রইল। কখন যে তন্দ্রা এসে তাকে নিশ্চল করে দিয়েছিল তার আর খেয়াল নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন অনেক বেলা। জানলা দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঘরে দিয়েছিল সমস্ত ঘরটা। বাড়ির সামনের চেরকের ঝাঁকা ঝাঁকি-ও কানে আসছিল মাঝে মধ্যে। ধীরে ধীরে উঠে বসতেই কি, কুসুমিনী এসে ঘরে ঢুকল, দেওয়ালের দিকে মুখ দিয়ে মুড়ির টোকাটা তুলেই বলল, 'এ কি দিদি, তুমি কাল রাতে খাওনি দেখছি। অসময়ে অমনভাবে শুয়ে থাকতে দেখে প্রথমে আমি ভাবিনি। ভাবলাম ওখানে ঢেকে রেখে গিয়েছিলাম। তা তুমি খেলে তো নি। কি শরীর খারাপ করেছে!

শুভাঙ্গিনীর কোন উত্তর দিতে ইচ্ছে করল না। শুধু আস্তে আস্তে একবার বলল, 'নিয়ে দিদিকে একবার ডেকে দিবি বোন।

—'কারে। নিয়ে দিদিরে।'

—'হাঁ, হাঁ।'

—'ও আজ, ওকে আজকাল পাওয়া যাবে নাকি? ও এখন কতদিন আইবন। জানতে কি ওরে হাঁদারাম যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল তার জন্যে আজ সেখানে ছেলে আমি মাথায় করেছে।'

—'কেন। ছিঃ ছিঃ কি দোষ করল।'

—'ও দোষ করবে কেন। দোষ করেছে তার মুক্তারন। কেমন আসে সাহেব সব তখন বলে গেছে। আমুকে পর্যন্ত মানে না। তাই নতুন কেউ এলে ক-দিন ও খাকে আটকে।'

—'তত্তানিনী একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ও।'

—'তা ছিদি এ রকম না ছেড়ে আর কতদিন চলবে। এখন যদি শরীর খারাপ লাগে তবে নাই বা খেলে। তাই বলে ঘুপুরেও কিছু না খেয়ে থেকো না।'

ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোল। তত্তানিনীর ঘরে তখনো কেউ পর্যন্ত কেউ এলো না। তত্তানিনীর আর বেরিয়ে আইকে ডাকার প্রয়োজন মনে করল না। সন্ধের একটু আগে কুমুদিনি যেন একটু ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে পায়েই দরজা বন্ধ করে দিল। আস্তে আস্তে তত্তানিনীকে বলল, 'চেঁচিও না ছিদি, আমি তোমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসেছি। আমুর আজার যে আজ তোমার খাওয়া বন্ধ। জানতে পাও নি। আজকেও যদি কিছু পেটে না পড়ে তবে বাঁচবে কি করে।'

এই বলে আঁচলের আড়াল থেকে ছোট একটা টিফিনকারী বের করে তত্তানিনীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এই নাও ছিদি, আজ মুরি আমি ভাল দিয়ে ছাত মেখে এনেছি। খেয়ে নাও ছিদি।'

অতি দুঃখেও তত্তানিনীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'কিন্তুই আমার খেতে ভাল লাগছে না বোন। এ তুমি নিয়ে যাও।'

—'নিয়ে যাব বললেই আমি তনছে কি না? এ তোমাকে খেতেই হবে।'

এই বলে কুমুদিনী তত্তানিকে আইয়ে দিয়ে এসে গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল, 'এ কি ছিদি তোমার গা'যে দেখি আগুন একেবারে। তাহলে আজ তাবটা খেয়ে কাজ নেই।'

—'তুমি বরঞ্চ আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার বোন।'

—'ছিছি' বলে উঠে গেল কুমুদিনী।

একটু পরেই এক গ্লাস জল নিয়ে এলো। সাবধে আইয়ে দিল তত্তানিনীকে। কপালের উপরে একবার হাত দিয়ে বলল, 'আজ জল খেকো না ছিদি, শুয়ে পড়।'

মেঝের উপরেই আবার মাথাটা এলিয়ে দিল তত্তানিনী। ছিঃ ছিঃ সন্ধ্যা নেমে এসে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। তত্তানিনীর যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। মাঝে মাঝে কী কেউ পাশে নিয়ে দিন ঘরে দিত। কাল মাঝেই তো এসেছিল মোক্ষদা। আজ আবার কে নতুন ঘরে আসবে তাকে জানে। উঃ এ যে যন্ত্রণা। তত্তানিনী একবার এ-পাশ, একবার ও-পাশ করতে লাগল।

হঠাৎ ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতেই তাকিয়ে দেখল, কুমুদিনী। ব্যাকুল ভাবে ডেকে উঠল তত্তানিনী, 'এই এই ছোন, একটু এদিকে।' কুমুদিনী একটু এগিয়ে এসে বলল, 'ডাকছ আমাকে ছিদি?'

—'হাঁ, হাঁ তোমাকে, তোমাকে।'

—'কি হয়েছে তোমার, ভয় লাগছে?'

—'না। না। আমাকে একটু তোমাদের আবুর কাছে নিয়ে যাবে।'

—'নিয়ে কি হবে। তাকেই আসতে দাও না।'

—'কৈ, কৈ সে তো এলো না। তার ফয়সলা কি একটা পড়ে দিল।'

—'ফয়সলা হওয়ার কি আছে। তার ফয়সলা পড়লে সে নিজেই আসবে।'

—'নিজেই আসবে। হাঁ, হাঁ সে নিজে, নিজেই আসবে।'

কুমুদিনী আর দাঁড়ালো না। তত্তানিনী আবার শুয়ে পড়ল। কেমন যেন একটা বিকারের মত বলে চলল আপে আপে, 'হাঁ হাঁ সে নিজে, নিজেই আসবে।'

হঠাৎ সশব্দে দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে তত্তানিনী তাকিয়ে দেখল আরশী আলম দাঁড়িয়ে। মুহূর্তের মধ্যে উঠে পড়ে ঝাপিয়ে পড়ল তার পায়ে। চুল তার আলু-থালু, বসন তার খসে পড়েছিল গা থেকে। —'তুমি, তুমি এসেছ। তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার সব।'

ফাঁকা মেঝে পা ছাড়িয়ে নিজে মুখে সরে গেল আরশী আলম, 'ছাড়ো। কে তোমার স্বামী। ব্যাকমেলার আর আমার পাস নি। আজুর এত বিপদের দেখে, আমিকে তুই কিনা ফয়সালেন করিস।'

—'না, না আমি আজুকে কিছু বলতে চাই না। আমি, আমি শুধু তোমাকে বলতে চাই। তুমি, আমাকে ও আজে দিও না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। ওগো,ও আজে তুমি আমাকে দিও না। তোমার যে ভয়ে আজ আছে। আজকে, আমাকে তোমার নিয়ের মত একটু যাও।'

—'নিয়ের আজ একটা যাও। নিয়ের আজ কতদিনের জন্য যেন এতটাকা খরচ করে এনেছি তোমার। টাকা নেওয়ার সময় মনে ছিল না?'

—'না, না, টাকা না নেব নি। টাকা না নিতে পারে না।'

—'নিতে পারে না। টাকার সব হচ্ছে : আর এ কারবারী হতে পারে না। ও সব মেকো কথা আরশী আলম অনেক শুনেছে। ও আজার আর ভোলাবে পারবি না আমাকে।'

—'ভোলাতে আমি চাই নি। আমি সত্যি বলছি।'

—'সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে আমি নি এখানে। পার্টিতে তোকে ফেলেই হবে। কথাটা তোকে জানিয়ে দিতে এসেছি।'

তত্তানিনী আর উত্তর দিতে পারল না। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। তবু কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াতেই তার মাথার যেন খুন চেপে গেল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'না, যাব না আমি।'

—'না আমার মুখের উপরে কথা।'

—'যে মুখের কোন কথার ঠিক নেই সে মুখের উপরে আমি কথা বলতে ভয় পাই না।'

—'ভয় তোকে আজ পাইয়ে দেব। পাজন মজের চাবুক দিয়ে মেরিয়ে দেখে ভয় কি করে পাওয়াতে হবে।

—'ও কি তুমি বের আর করেছে। এ যে পশু, পশু, পশু—।'

—'পশু, হাঁ পশু।'

—'উঃ। উঃ, মা: ....।'

'আ-হা-হা। আরশী করিস কি করিস কি? মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবে নাকি। জল্লাদ কাপতে ছুটে এলো মোক্ষদা। তত্তক্ষণে সজ্ঞান অতিরিক্ত চৈতন্যহীন তত্তানিনী মোক্ষদা আর চলল, 'ও আরশী করিস কি? মেরে ফেলবি নাকি।'

—'বজ্জাত মাগীর ভণ্ড গুনেছে।'

—'ও মজা আর চলন চলন। তুই রাগ করিস না। আর ছেলে আর আসছে।

—'তা না হয় যাচ্ছি আজকে। কিন্তু তোমাকে আমি বলি রাখি, কপালে কিন্তু ওর অনেক দুখ আছে।'

—'না, না দুখ থাকবে কেন। ও ঠিক রাজী হয়ে যাবে, ঠিক রাজী হয়ে যাবে। তুই এখন যা তো দেখি।'

যেমন সশব্দে ঘরে ঢুকেছিল আরশী আলম, তেমনি সশব্দে বেরিয়ে গেল। যেন এক বিরাট হিংস্র পশু তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়ে গেল।

একটা গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এলো ঘরের মধ্যে। শুধু বেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটা এক নাগাড়ে শব্দ করে চলল টিক্ টিক্। শুধু সেই তার বিরামহীন কর্ম করার ফাঁকে ফাঁকে জানান দিতে লাগল সময় কিছু।

● ● ● ● ●

কুমুদিনী ঘরে আর একবার আসবে বলেছিল। এসেছিল কিনা তা কে জানে আসলেও সে তত্তানিনীকে আর বিরক্ত করে নি। ভগ্না বিমান মুঁড়ে ঘরের মত পড়ে রইল তত্তানিনী মেঝের উপরে। মাঝে মাঝে চুল —এসে পড়েছে মুখের উপরে। কখন পড়েছে জলে, ঘেমে ঢ্রাবে, অবসন্ন।

সারাটা ঘরে একটা ঘোরের মতো ছিল ছেয়ে তত্তানিনীর। ঘোরের ভিতরে একটু তন্দ্রা আসার সাথে সাথে একটা স্বপ্ন দেখল। চোখের সামনে ভেসে উঠল রাজরাজ মূর্তিমূর্তি। কি গভীর প্রশান্ত মূর্তি! স্নিগ্ধতরু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তত্তানিনীর দিকে

তত্তানিনী জীবন ফিরে পেয়ে গেল। মুখের ঘোরেই বলে উঠল, 'মা, মাগো আমি ওরো, তত্তানিনী। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না। তুমি কথা বলছনা কেন। তুমি কথা বল। মা, মাগো।'

স্বপ্নমূর্তি কোন কথাই বলল না। চোখ বুজে একবার যেন ঘুমিয়ে অন্য দিকে তাকাল। তত্তানিনীও সেই দিকে তাকিয়ে দেখল নিখাদে দাঁড়িয়ে। পরনে তার কোরা কাপড়। পরণে মুখ, কপালে একটা বড়া।

তত্তানিনী চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে তার তন্দ্রা ছুটে গেল। ধড়ফড় করে উঠে বসতেই দেখে চিত্রাদনি ঘরে ছুটে এসেছে ঘরের মধ্যে।

—'তবেরে, ও তবো তুই কেমন বাহিনী যেন। আমি এ দুদিন আসতে পারি নি তো। আমাদের ওরা আটকে রেখেছিল। তোকে ডেকে খুব কষ্ট দিয়েছে ওরা, তাই না?'

তরঙ্গিনী যেন উত্তর দিল না।

নিরানন্দি নিজেই বলতে লাগল, 'আসবে আসবে তোকে মার কাছে যেতে দেবে ওরা। তাই কোনরকমে পালিয়ে চলে এসেছি তোকে খবরটা দিতে। তোর তাই, তাই এসেছে নেহাত নিতে।'

—'তাই? কৈ, কৈ, কৈ সে।'

—'এই যে, এই এখানে।'

নিমাই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতেই তরঙ্গিনী ছুটে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল নিমাইকে।

—'নিমু, নিমু তুই এসেছিস নিমু! আমি জানতাম তুই আসবি ; আসবি আমাকে নিতে। —কিরে তুই কথা বলছিস না কেন! কথা বল!'

নিমাই সমস্ত কিছু দেখে কেমন যেন আবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'আর কথা বলবার যে নিদি। তোকে দেখতে এসেছি।'

৭

খোপাদের মা আর বেশী ভাবল না। মানদার অবস্থা দেখে ও নিজেও একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। আগেও অনেকবার নিমাই তাকে ডেকে নিয়ে এসেছে, 'মার অসুখ, তুমি এসো মাসী' এই বলে। তখন টানাটানির সেলা পড়া, না হয় নিদেন পক্ষে হেম-ডাক্তারের ফিনে পয়সার ওষুধে কমে গেছে। কিন্তু এবার যে তেমনে কমবে না তা খোপাদের মাও বুঝতে পারল। তাই শেষ সময়ে, আপনজন বলতে যে ঐ মেয়ে, তাকে একবার অন্তত খবর দেওয়ার কথা ভেবেছিল। নিমাইকে তাই ডেকে বলল, 'ও নিমাই তুই একটু তোর মার কাছে বস দেখি, আমি একবার ঈশানের মার কাছে যাই।'

ঈশান মার কথা শুনে নিমাই একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি যে নিদিকে খবর দেবে বলেন-?' —'হাঁরে, সেই জন্যেই তো যাব। তোর জামাইবাবু যে খুব রাগী মানুষ। ঈশান মরে সে ভালভাবে জেনে। সে যদি নিজে না নিতে আসে, তাকে আর কাউকে দিয়ে পাঠাবে না।'

—'তাই নাকি? তা হলে তুমি তাড়াতাড়ি যাও মাসী। আমি ততক্ষণ বসি।'

—'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে গেল খোপাদের মা

● ● ● ● ●

ঈশান মা মানুষের মানুষ। বাড়ি পাওয়াই তাকে মুশকিল। তবে এই তোর বেলা শুনল সে নাকি ভোর বাড়ি আছে। সকলকেই ভোর বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। মানদা জানবার থেকে মাল জোগাড় করে ভোরের আগেই মজুত করে ঘরের মধ্যে। তার একটু সুর উঠলে পাড়ার করে সেরা খারাপী প্রসাদের আকৃতে। এই সময়টাই নাকি মাল পাচারের ভাল সময়। লাইন সব ফাঁকা থাকে।

খোপাদের মা তা জানে। তাই একটু ভোর পাড়েই হাঁটতে লাগল। বেরিয়ে পড়ার আগে ঈশানের মাকে বলতে পারলে ভাল। তা যদি না পায় তার তবে গেল আসবার দিনটা। কাল পর্যন্ত আবার মানদা বাঁচে কিনা কে জানে।

বাড়ির কাছে আসতেই ওর গলার আওয়াজ পেয়ে একটু আশ্বস্ত হোল খোপাদের মা। ঘরে ঢুকে ঈশানের মাকে দেখে বলল, 'এই যে তুই যেন নি তা হলে এখনও।'

ঈশানের মা একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এমি তুমি এলবার!'

—'তোর জন্যেই এসেছি। মানদা যে তোকে ডাকছে।'

—'সে কি! কি হোল ওর আবার?'

—'হবে আবার কি? এরমিতেই তো টিকবার। তার উপর আবার তোরের মাথাটা যেন খারিয়ে নিয়েছে।'

—'কেন? মেয়ে আবার পাগল কি!'

—'এতদিন তুই-ও কি কম পাগলি ঈশান মা।'

—'বলতে পারছিস মানে! মাসী এতদিন নিয়ে কাউকে কয়ে না—এই কথাই তো বলতে চাইছ?'

—'কেন! তা কি তুই অস্বীকার করতে পারিস নাকি?'

—'না, তা আমি অস্বীকার করতে চাই না। তবে যে মেয়েকে সে নেয় সে আর পরীর থাকে না। বিশ্বাস না হয় একবার গেয়ে এসে না নিজে, তারা সব এখন এক এক ঘরে কত টাকার মালিক। আসলী খেলোয়ার যে মায় যে আছে ঘুমিয়ে দেয়। আড়ালে আবডালে এক একজন যা আয় করে, তাতে মত একটা সংসার চালিয়ে দুটি কম্ম যায়।'

—'তা হয়তো যায় কিন্তু—।'

—'কিন্তু আবার কি? ছানের কথা এই তো! মান খুয়ে তুমি ভাল খেও। কত ভদ্র ঘরের মেয়ে-বৌ-আজ অভাবের তাড়নায় ছলনার জন্যে ঐ আজ পেশে অর্থে হয়, তার খোঁজ রাখ! তা এখন তো আমার দেখে পড়তেই। ঘরি আপকে তো খুইয়েছে অনেক আগেই। আর মায়ের যা শরীর, ডাক্তারে তখন দেখত কে ঐ বড়দা মেয়েকে?

—' তা তুই যা ভাল মনে করেছিস, করেছিস। তার জন্যে নয়।'

—'তবে আবার কি?'

—'আমা, রাগছিস কেন? আমি এসেছিলাম অন্য কথা বলতে।

তরঙ্গকে তুই আমাকে একবার নিয়ে যায় তাই। তোকে ছাড়া আসলী ঘরনার আর আরও ছয়তে ওকে দেখে না।'

কথা শুনে যেন চমকে উঠল ঈশান মা, 'বল কি তুমি নিদি। সেদিন সবে ওর বিয়ে হোল, এর মধ্যেই তুমি মেয়ে দেখতে চাও? আগে আগে সবাই মেয়ে বিয়ে দিত, না, ঘরের বাড়ি দিত। আর জানদা এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল?'

—'ও হাঁপাবে কেন? আমিই নিজে থেকে বলেছি। মানদা বেশ হয় আর বাঁচবে নাকে। শেষ সময় যদি মেয়েটাকে একবার দেখে যেত, তবে মনের আক্ষী, হয়তো করে মোক্ষদার মতো পারত। —তা ওরা তো কোন দোষ করে নি তোর? মানদাকে না হয় একবার দেখেই এলি। যাবি আমার সাথে।'

ঈশান-মার মনটা কেন একটু নরম হয়ে গেল। তবু গলাটা চড়িয়েই বলল, 'তলা যায় কি মরেও তো যেতে পারে। শেষমেশে আজার একটা কথা থেকে যাবে। তার থেকে ভাল দেখেই আসি। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলে রাখি নিদি, উলটো-পালটা কথা বলবে কিন্তু আমি শেষ সময়েও সহ্য করব না।'

—'তা তোকে বলতে হবে না। মানদা ঐ বিষয়ে কোন কথাই বলবে না।'

● ● ● ● ●

নিমাই তার মায়ের মাথার কাছেই বসেছিল। কপালের উপরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল ; আর একবার জিজ্ঞেস করছিল, 'মা কেমন লাগছে তোমার?'

প্রতিবারই একটু ক্ষীণ হেসে উত্তর দিচ্ছিল মানদা, 'একটু ভালো মাবা।' একবার যার উত্তর দিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অনেকে খুব কষ্ট পেয়ে গিয়েছিস, তাই নয়ে নিমু।'

নিমাই বলল, 'তা পাব না! তুমি যা কাণ্ডটা করেছ ঘোষ উল্টাচিতে মাববাব, — মাসী শুদ্ধু ভয় পেয়ে গিয়েছিল।'

আবার চুপ করে গেল মানদা। ঈশ্বরে তার অল্প যন্ত্রণা লাগল। নিমাই-এর হাতটা তার হাতে নিয়ে বলল, 'আমি যদি মরে যাই, তোর যে কি হবে রে নিমু!'

নিমাই-এর চোখে জল এসে গিয়েছিল। কাঁপা কাঁপা স্বরেই বলল, 'চুপ কর মা চুপ কর। আমার মা মরবে না কোনদিন।'

—'মরতে তো চাইনা রে! কিন্তু বাঁচতেও আর ভাল লাগে না।'

বলতে বলতেই ঈশান মার ঢুকল এসে ঘরে। ঈশান মাকে দেখে নিমাই তাকল নিদি এসেছে বুঝি। তাড়াতাড়ি তাই মাকে টেনে বলল, 'মা, দেখ নিদি এসেছে।'

তাই শুনে মানদা মুহূর্তের মধ্যে পাশ ফিরে দেখল, ঈশান-মা, মনটা হঠাৎ মিইয়ে গেল। অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে চোখ দুটো তার ভিজে এলো।

তাই দেখে ঈশান মার মেজাজটা একেবারে সপ্তমে চড়ে গেল। চেঁচিয়েই বলে উঠল, 'কি রে মানদা, দেখে যে একেবারে মুখ ঘুরিয়েই নিলি!'

—'না, না নিদি ও কি কথা বলছ। আমি ভেবেছিলাম ওতো এসেছে বুঝি। ওতোকে কতদিন দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি ওকে একটু এনে দাও না নিদি। —আমি বোধ হয় আর বাঁচব না।'

—'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ওতোকে এখন পরকার লাগল নিজে। মরার আগে তুমি মেয়েটাকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিবি!'

—'এ্যা কি বললে। মানদার গলার স্বরটা যেন কেঁপে উঠল। একটু থেমে বলিষ্ঠ করেই বলল, 'নিমু, নিমাইরে, ঠা ঠা, তাই-তাই। ঠিক বলেছ নিদি।'

—'ঠিক আমি সব সময়ই বলি। কেন এখন কেন ; তখন তো একেবারে ঘিব ধরে পড়েছিলি, '৩-ঘরে আমি মেয়ে দেব না।' তারপর বিয়ে দিতে এসেই বিয়ের

নিয়ে পড়লি, আর এখন তাদেরই মেরে আনছিস্। দরকারের সময় আসলে কুটি মেয়ের হয় না। অন্য সময় লোকের মত অসুবিধে।'

রানদা আর কোন কথা বলল না। ঠোঁট তার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

তাই দেখে গোপালের মা বলল, 'কি বলছিস্ তুই মীনার-মা। মরামরা কি তোর একটুকুও নেই শরীরে।'

—'ও সব লোক দেখানো ভক্তি শ্রদ্ধা আমার দেখাই না আমি। আমি যা করি আমের কাজ। আমারে নিমাই আমার সাথে, ওতেমেরে নিয়ে আসি।'

এই বলে আর উত্তরের কোন অপেক্ষা করল না। নিমাই-এর হাতটা ধরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওরা চলে যেতেই একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো ঘরের মধ্যে। গোপালের মাও যেন কথা বলল না, রানদাও যেন মুখ খুলল না। অনেকক্ষণ চলে গেল এইভাবে। শেষে গোপালের মা বলল, 'ও রানদা তুই এখন একটু একা একা থাকতে পারবি।'

—রানদা বলল, 'কেন তুমি একলার কুথি যবি যাবে।'

—'যাঁ রে সেই কখন সন্ধের সময় এসেছি, ওর মধ্যে আর বাড়ি যাওয়া হয় নি। কে জানে ওরা আবার কি করছে।'

—'তা ঠিকই তো তুমি এখনে যাও। আমি একটু সুয়ে থেকে করবি।'

—'না, একলাই যাচ্ছি না ; তোর জন্যে সাবুটা জাল দিয়ে রেখে যাই। দুপুর নাগাদ খেয়ে নিস।'

—'না, না, থাক। ও আমি নিজেই না হয় ফুটিয়ে নেব। তা ছাড়া এখন আমার খেতে একেবারে ইচ্ছে নেই।'

—'পারবি তুই। —আচ্ছা। তা হলে না হয় এক কলসী জল এনে রেখে যাই ঘরে।'

রানদা কোন প্রতিবাদ করল না। গোপালের মা জল এনে ঢেকে রেখে দিল, রানদার মাথার কাছে।

—'এবার তা হলে আমি আসি রানদা।'

—'আচ্ছা এস।'

—'দুপুর নাগাদ আবার আমি আসব।'

সুয়ে থেকে রানদা মোটেও কল্পছিল না। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠে শীত করা দেখেই বুঝতে পারছিল জ্বর আসছে। কিন্তু কীভাবে তার বিরুদ্ধে করা যায় তার জন্য কে। নিজের উপরে একটা বিতৃষ্ণা এসে গেল রানদার। ক্রমে ক্রমে যখন বেলা বাড়ছিল, গলাটা তত শুকিয়ে আসছিল। বিছানে যে না পারছিল তা নয়। কাল রাতে গোপালের মা একটু আর্লি ফেলে দিয়েছিল মুখে। তাও উঠে এসেছিল বমি হয়ে। এখনও পাকস্থলি খালি পেটে কিছু পড়ল না। সাবু যে নিজেও কখনও ফুটিয়ে খেয়ে না, তা সে তখনই ভেবেছিল মনে মনে। স্বামী নেই, মেয়ে নেই, ছেলেতেও চলে গেল। তবে কি নিজের জন্যে নিজে ফুটিয়ে খাবে? তারচে শেষ্কা শেষ্ট। এক গ্লাস জল ভরে নিয়ে তাই খেয়ে নিল ঢক্ ঢক্ করে। কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। অস্ফুটে একবার বলে উঠল। 'মা গো, আর যেন উঠতে না হয়।'

৮

মীনার মা যখন বারবী হসপিটালের কাছে পৌঁছাল তখন সে রীতিমত ক্লান্ত। সন্ধ্যাল বেলাটা এই সময় সে মোটেই ব্যস্ত থাকে। এক এক পার্টি আসছে, সব জল নিয়ে। তাদের সামনে ওজন করে নিয়ে টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে। আবার তার সঙ্গে সঙ্গে খালাসী এসে জল নিয়ে যায় কেটে। কাত্তিকদা যেন হিমু-নিমু খেয়ে বসেছিল। তাই মাঝে মীনার মা বসিয়ে রাখল তার মালের মালটা। সময়মত একবার ওজন করিয়ে পয়সা বুঝে নিল। অন্যদিন হলে ঐ সময়ই সে চলে যেত-বাকী সাইটটা কাত্তিকদা থাকতে থাকতে আর একটা ট্রিপ দেওয়া যায়।

কিন্তু এই দিন আর গেল না। পরের কর্মটি মাথায় নিয়ে নিজের ক্লান্তি একটু কমাতে হয়। তাই বসে রইল একপাশে।

কাজ-কর্ম একটু মিটে গেলে বারবীদাদার বলল, 'আরে মীনার-মা যে, এখনও তুমি যাওনি!'

মীনার মা এবার একটু এগিয়ে এসে বলল। বলল, 'আজ তারা একটু অন্য কথা আছে।'

—'আরে বল, বল, তুমি বলবে নাতো বলবে কে!'

—'আজ অনেক হয়েছে। বাকী ওজনের একটা কথা কি!'

—'খবর তো এখনও ভাল না। বড় শক্ত মেয়ে বিয়েছ। তারচে তবু ভাবনার না।'

—'তা বলছ এখন একটু হয়।'

—'সে কথা অবশ্য ঠিক। তবে অসিন তো হল।'

—'আর কতদিন না হয় দেরী কর। ওর মা-ও একঘরে হয়ে বসেছে। এবার তিন কূলে কেউ আর থাকবে না। তখন তাইকে নিয়ে উঠতে হবে—।'

—'এই বারবী হসপিটালে আছে।'

—'ঠিক তাই। কিন্তু আজকে তাই আগে ওষুধপত্র একবার দিতে হবে। মা মরাটা একবার দেখে আসুক।'

—'এ কি কথা আর মীনার-মা। ও যে এখনও মনের পাখী। পোষ না মানিয়ে ছেড়ে দেবো!'

—'তবু খাঁচার প্রয়োজন হয় না আরা, পায়ে দড়ি বেঁধেও দেখতে হয়। —এত দিনেও তুমি বিশ্বাস করতে পারলে না আমাকে। এই দুঃখ রয়ে গেল।'

—'আরে কি কথা, কি কথা। তোমার উপরে অবিশ্বাস! —তা, তুমি একা আমার বুড়ীর দোকা। যেতে দেওয়া না হয় বিকেলের দিকে যেও।'

'সে কথা আর বলতে হবে না। এখনে আসার আগেই টিয়ের ঘরে আমি দেখা করে এসেছি। তাই-টাকে এনে রেখে এসেছি তার কাছে।'

—'ও আচ্ছা, শলা-পরামর্শও এসে গেছেন দেখি। এবার তাহলে তুমি একলা রোগ দে যাও। ফরুর যেন তার ত্রুটি না হয়।

—'যাঁ আমি এবারে একলার ভিতরে যাই।

মীনার মা উঠে যেতেই বারবী হসপিটালের তাক দিল, 'আরিচরণ।'

আরিচরণ পাশেই বসেছিল। এ ডাকের অর্থ তার বুঝতে আর বাকী রইল না। হেসে বলল, 'তার নেই আজ, পালিয়ে আর যাবে কোথায়। সাটাই হয়েছে তেমন হাতে।—বারবী হসপিটাল হেসে উত্তর দিল, 'সে কথা ঠিক। তবে সূত্রে কিন্তু তাই তুমি

● ● ● ● ●

গোপালের মা যখন রানদার ঘরে আবার এলো তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। যন্ত্রণা তারই। আঁচলটার ঝেড়া দিয়ে তার পাশটা ঢেকে কোন রকমে আঁচলটাকেই ব্যবহার করেনি। রোদ কুটি কুটোরী সেখানে আরাম পতি।

জৈষ্ঠ মাসের আর কটা রোদ্দুরে ঘরটা হয়ে ওঠে একটা অগ্নিকুণ্ড। এ যা সুয়ে মানুষেরই জ্বর হয়ে যায়। তার ওপরে মানুষ রানদার জ্বর যে দুপুরে উঠেছে তা জানে।

গোপালের মা যখন ঢুকল তখন রানদা ওপরের বিমানে মাথা নাড়ছিল ঘ ঘন। তারই মধ্যে এক একবার হেসে উঠছিল ; আবার কোন সময় বা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। ধীরে ধীরে রানদার কাছে গিয়ে বসল গোপালের মা। গায়ে হাত দিয়ে যে চমকে উঠল, 'ও আল্লা, ওরে একেবারে আগুন।' কোমরের উপরে রাখাটা তুলে দিয় মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডেকে উঠল, 'রানদা, ও রানদা।'

রানদা যেন ধড় পড় করে কেঁদে উঠল। চোখ দুটো একবার অতিকষ্টে খু তাকিয়ে বোধে বলল, 'কো -দি-দি।' তুমি এসেছ দিদি? —ঐ, ঐ দেখ ওরা আব আসছে। আবার আসছে। আমি, আমি আর বাঁচব না।'

গোপালের মা একটু ধমকের সুরে বলে, উঠল, 'কে কে আসছে! কে, কে আসছে না। তুই একটু চাঙা হয়ে শো দেখি।'

—'শোবে? শোব কি গো। টোনাও। টোনাও। কিন্তু কেউ আসবে না। ঐ দেখে দেখো সব জল বেঁধে আসছে। হাতে ওদের তরোয়াল। এই এইভাবে কোপ বসাবে আর একেবারে না। খুন, খুনের জন্যে কাঁপছিল নিমাই। খুনের জন্যে। আমাকে দেখে, আর কিছুতে না। তাতেই বিস্ময়ের ঘোরে কেঁদেই উঠল রানদা।

গোপালের মার একবার আর বুঝতে বাকী রইল না। বিকারের ঘোরে আবে তাবোল বানদা বলতে থাকলেও পুরোন স্মৃতি ওলো তার এখনও যায় নি মন মধ্যে থেকে। একথা রানদা নিজেই তাকে বলেছে অনেকদিন, চোখের জলে ৭ ভাসিয়ে।

● ● ● ● ●

একদল ওরা পালিয়ে আসছিল সেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়। নিজেদে বলতে বাবা মার অনিচ্ছায় সব পড়ে রইল। অনুমতির বাবাটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি পথে। বনের মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত। রাত্রি নিশীথে আবার শুরু করা পথচলা। একদিন, দুদিনের ক্লেশে পেটে কিছু পড়ে নি। তবু কি ওদের,—মনে

সকলেরই। ছোট মেয়ে ওতো সেও ছিল না ঘরে। ঘরেতে সকলেরই মুখ দেখিল ওতিয়ে। তবু তার খেল না নিমাইর। তখন সে মেয়েদের ঘরটা। তারঘরে কাঁদতে শুরু করে দিল ঝিয়ের ছানায়। মরার লোক সব জেগে উঠল যেন। বলল, 'মানদা তুই পারবি রে। আমাদের সে। চেখটা একটু ঐ দিকে ঘুরিয়ে রাখ। আমরা, গলায় একটু জল দিয়ে শেষ করে দিই।'

কথাটা শুনে মানদা একেবারে ঘর ফাঁ করে কেঁপে উঠেছিল। শক্ত করে নিমাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাতর ভাবে তাকিয়েছিল মায়ির দিকে। নিবারণও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, 'না, না, তোমরা ওকে নেয়ো না। মেয়ো এরকমভাবে। আমি যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি একটু দুধ পাই নাকি দেখতে।'

সেই যে গিয়েছিল। আর ফেরে নি। গভীর রাতে যখন সবাই আবার চলা শুরু করেছিল। তখন মানদা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলেছিল, 'নিমাই-এর মরকে তোমরা ফেলে রেখে যেওনা মাসী? ও যে এখনও আসে নি।'

—'কে একজন উত্তর দিয়েছিল, 'ও আর আসবে না। তোর বাবি তো চল। নইলে থাক।'

তবে, ভাবনার ডিসকর্টেড্যিড্ হয়ে ফেরিয়ে পড়েছিল ওদের সাথে। কিন্তু মন থেকে বেরিয়েই যা গেছেছিল তাতে আর জ্ঞান হারতে পারে নি মানদা। নিস্তব্ধতার মি-খচিত ফেরা পড়েছিল রাস্তার ধারে। পরে কে যে মানদাকে তুলে এনে স্টেশনে বসিয়েছিল আর কে যে ওতো-নিমাইকে দেখেছিল তা আর মানদার মনে নেই। পরে নিরাপদ স্থানে এসে যখন পৌছল, তখন সে স্থির, সর্বহারা। হাউ হাউ করে কাঁদছিল ওতোকে আর নিমাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তখনই দেখা হয়েছিল ঠানদির সাথে।

পুরোন কথা মনে পড়ে কেউই গোপালের মার চোখ থেকে জল এসে গেল। মানদার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'নিমাই, তোর নিমাই আছে রে মানদা।'

—'নিমাই? চিৎকার করে উঠল মানদা, 'না, না নিমাইকে তোমরা নেয়েন।' বলতে বলতে ঘুরে গোপালের মার হাত দুটো একেবারে শক্ত করে চেপে ধরল। তার তখন সে কি মূর্তি।

গোপালের মা তীব্রণ ভয় পেয়ে গেল। অস্ফুটে কেঁদে উঠল, 'ওরে কে কোথায় আছিস, মানদা আর কাঁদল নয়রে।'

প্রতিবেশী কৃষ্ণকামিনী হেঁটে আসছিল পাশ দিয়ে। চিৎকার শুনে ছুটে এলো ভেতর থেকে।

—'কি। কি হোল দিদি, মানদার কি হোল?'

—'মানদা আর বাঁচবে নয়রে। মেয়েটাকেও খেয়ের আর দেখতে পেল না।'

কৃষ্ণকামিনী তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, 'দেখি, দেখি কি হয়েছে।' পরে হাত দিয়ে বলল, 'ও মরা, এযে জীবন আছে। তুমি তার মাথাটা নীচে নামিয়ে দাও, আমি জলপটি আর হাওয়া করে দিই।

গোপালের মা মানদার মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে মাদুর থাকে আস্তে আস্তে। একটু পরে মাথা ঘামাই বলতে লাগল, 'জীবনে যার অনেকগুলো একসঙ্গে দেখতে দিলে। সেই জোর বেলাতেই গেল, এখনও পর্যন্ত আসতে পারল না ওতোকে।'

'ওতো' কথাটা কানে যেতেই মানদা একটু যেন জ্ঞান ফিরে পেল। বলল, 'ওতো? কে ওতো। না। না ওতো নয় আসবে, আসবে। তবু ঘুমু, ঘুমু।

কৃষ্ণকামিনী তেজা নেকড়াটা আবার পালটিয়ে দিল কপালে। ধীরে ধীরে মাথায় হাওয়া দিতে বলল, 'জীবনে যা তো ঐ রকমই দিদি। তা যদি না হবে, তবে ভেবে কি আর এই হুকুম দেয়।'

গোপালের মা কোন উত্তর দিল না। কৃষ্ণকামিনী নিজেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, 'সবই কপাল দিদি। এ জীবনে মানদার আর সুখ হোল না।'

ক্রমে ক্রমে সন্ধে হয়ে আসবার পরও এসে পৌছল না। গোপালের মা এক একবার একটু ঝুঁকে করে পাশ ফিরছিল আর মান খোলা করে ঘুমে দেখছিল মেঝে এসে নাকি। ভিবে ভিবে একবার উঠে গিয়েও দেখছিল দূর থেকেও কাউকে দেখা যায় নাকি। কিন্তু যার মাঝে ঘুমে এসে জানছিল মানদার কাছে। ধীরে ধীরে মানদা নিজের হয়ে আসছিল। একটা হতাশা, একটা ক্লান্তি নেমে এসে তার মেয়ে, মনে। ঘুমটি আসবারের মতো ওরে ওরেই এক একবার চোখ মেলে দেখছিল, আবার বন্ধ করে ফেলছিল। কাকে যেন খুঁজছিল, দেখতে চাইছিল। কিন্তু দেখতে পাচ্ছিল না। তাই অভিমানের মতো হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

গোপালের মা পাশেই বসেছিল। কতদিন ধরে দেখছে সে মানদাকে। একটা ব্যথা পড়ে নিয়েছিল তার। আপদ-বিপদে তার কাছেই সে ছুটে যেত। আজ বৃদ্ধ বয়সে মেঝের সে মায়ে ; না কে বেরে কাদছে। কন্ধ কান্না অনেকক্ষণ চেপে রাখতে রাখতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল গোপালের মা। 'মানদা, ও মানদা। তুই আর একটু মেয়ী কর মা। তোর মেয়ের সাথে তুই একবার দেখা করে যা মানদা।'

ঠিক সেই সময়ই ঘরে ঢুকল ওতাসিনী। ঘুপ্ থেকে তাদের নিয়ে নিজেও সে ঠানার মাকে সন্ধের আগে বের করতে পারে নি। আসার পথেও, আর যাই জিজ্ঞেস করছিল, 'তুমি মাকে, কোন দেশে এসেছিলে মাসী? তুমি তো কিছু বলছ না।'

—'যাচ্ছিল মো, উত্তর দিয়েছিল ঠানার মা, ' গেলেই তো দেখতে পাবি।'

সেই দেখতেই যখন ঢুকল ঘরে, মানদার তখন শেষ অবস্থা। গোপালের মাকে কাঁদতে দেখেই বুঝতে পারল আসল্লটা। বাঁধ ভাঙা জলের মোতের মত কেঁদে উঠল ওতাসিনী। —'তোমরা কাঁদছ কেন মাসী? মা কি তাহলে নেই? মা, মাগো, তুমি একবার তাকাও মা। আমি ওতো, ওতো এসেছি।'

মানদা একবার তাকাল। হয় তো বা তাক শুনেই, কিংবা এরই। কিন্তু সে তাকানোতে তার দৃষ্টি ছিল না। ওতাসিনী একেবারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আমি ওতো, ওতো, মা, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না।'

মানদার কোন পরিবর্তনই হোল না। যেমন ধীরে ধীরে তাকিয়েছিল তেমনি ধীরে ধীরে চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে নিল। শুধু মুক্তোর দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

নিমাই এককোণে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল, কি হতে চলেছে। কৃষ্ণকামীর ঐ দিকে চোখ পড়তেই উঠে গেল তাড়াতাড়ি নিমাই-এর কাছে। মানদার কাছে ঝুলিয়ে হাতে এক চামচ জল তুলে দিয়ে বলল, 'দে বাবা তোর মাকে এটুকু খাইয়ে। দে, দে আর দেরী করিস না।' বলতে বলতে নিজেই নিমাই-এর হাত দুটো ধরে ঢেলে দিল মানদার মুখে। কতটুকু তার ভেতরে গেল তা কে জানে,—অধিকাংশই গড়িয়ে পড়ল কাপড়ের পাশ দিয়ে।

৯

মানদার মারা যাওয়ার পর ওতাসিনীকে হাতের মুঠোয় নিতে স্বাভাবী প্রশাসনের বেগ পেতে হোল না। সিউনিলল যখন গাড়ি নিয়ে আসতে গেল ওতোকে, গোপালের মা তখন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলল, 'আপত্তি তুই করিস নে ওতো যেতে। স্বামীর ঘর থেকে লোক এসেছে নিতে, মেয়েদের কাছে এর চাইতে আর বড় সম্পদ হয় না রে।'

—ওতাসিনীও চোখের জল আর ঠেকাতে পারে নি। আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, 'কিন্তু এ সম্পদ তো আর ওখানে গিয়ে থাকবে না মাসী।'

—'থাকবে না কেন? অসম্ভব জেনে, ছেলে কোন দিন জন্মতে পারবে না রে, স্বামী প্রথম জেনে যত অপরাধই করুক, সব অপরাধই ক্ষমা দিয়ে তার পায়েতেই জড়িয়ে থাকবে। জোকে যে ও বিয়ে করেছে। তা সে যত লোক দেখনেই হোক না কেন। মেয়েদের স্বামী ছাড়া আর গতি নেই রে।'

ওতাসিনী কোন উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে একবার মাথাটা নুইয়ে প্রণাম করল মাসীকে। গোপালের মা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। ওতাসিনীকে জড়িয়ে ধরে একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, বলল, 'তোকে আমি আশীর্বাদ করছি ওতো, তোর ব্যাত সম্মান তুই একদিন না একদিন নিশ্চয়ই পাবি।'

ওতাসিনী আর দেরি করল না। দিহান দিয়ে একবার ওদের ঝুঁড়ে ঘরটা দেখে নিল। তারপর নিমাই এর হাতটা ধরে বলল দিয়ে স্বাভাবী প্রশাসনের গাড়িতে।

নিমাই-এর ভয় ভয় করতে লাগল। দিদির গায়ের কাছে ঘেঁসে বলল, 'ভয় করছে দিদি।'

ওতাসিনী কোন উত্তর দিল না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নিমাই-এর দিকে। মনটা তার একটু একটু করে কঠোর হয়ে উঠল। একটা অগ্নির জিঘাংসে ধীরে ধীরে জেগে উঠল তার মনের মধ্যে। —শেষ করে দেবে সে। যে কারণটা, সেদিন সবাই মিলে চেষ্টা করে পারে নি করতে, আজ একা একাই যদি করে ফেলে? প্রথমে নিমাইকে, তারপর, তারপর নিজেকেও সরিয়ে দেবে চিরদিনের জন্যে এই পৃথিবী থেকে।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল নিমাই-এর কান্নায়।—হি, হি, কি যন্ত্রণা জানে সে চিন্তা করছে। তাড়াতাড়ি নিমাই-এর মাথাটা নিজের বুকের পরে টেনে এনে বলল, 'তুই কাঁদছিস্ নিমু।'

● ● ● ● ●

চিন্তামনি কিন্তু খুশী হতে পারে নি ওতাসিনী ফিরে আসায়। দূর থেকে

ওতাসিনীকে তার কাছে আসতে দেখেই ঝলে উঠল, 'তুই আবার ফিরে এলি ওতো? এবার যে তোকে কেউ ই বাঁচাতে পারবে না রে। এর থেকে যদি তোর মরার খবরটাও জানে আসতো।'

ওতাসিনী কোন উত্তর দিল না। চোখের জল তার শুকিয়ে গিয়েছিল। তাই ম্লান হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'সেই সকালেই এখানে এসেছি বিবি। মা মারা যাবার পর, আর স্থান দেখার না কোথাও। তাই—তোমার কাছেই ফিরে এলাম আবার।'

মা মরার সংবাদ শুনে চিন্তামনির মনটা নরম হয়ে এলো। বলল, 'এক যা ছিল, তাও তোর চলে গেল ওতো? হা ঈশ্বর। তিন কূলে তো আর কেউ রইল না রে।'

—'যা যদি গেছে তা হলে নিজের জীবনটাও আর রাখতাম না। কিন্তু, কিন্তু ভাই-এর জন্যে আর পারলাম না বিবি।'

—'নিমাই?'

—'হাঁ নিমাই।—ওকে ফেলে আর যেতে পারলাম না বিবি।'

—চিন্তামনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ওকে তুই কোথায় রেখে এলি? ওকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

—'কোথায় আর রাখব বিবি, আমার সাথেই নিয়ে এসেছি। ঐ তিন তলার সেই ঘরটাতে ওকে বসিয়ে রেখে, তোমার জন্যেই প্রথমে ছুটে এসেছি। তুমি ওকে দেখবে একবার?'

দেখব বৈ কি? চল উপরে চল ওকে আগে রেখে আসি। আহা, জ্ঞান না হতেই ও মাকে হারিয়েছে। আর এই অবস্থায় মাকেও হারাল রে।'

ওতাসিনীর ঘরে অনেকক্ষণ কথা বলে চিন্তামনি। নিমাইকে সান্ত্বনা দিয়ে ওঠার সময় বলল, 'এবার তা হলে আমি উঠি ওতো। আমার তো আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

ওতাসিনী আর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'যত্ন তার ওর করছে বিবি। নিমাইকে উনি তাড়িয়ে দেবেন না তো?'

—'তাড়িয়ে দিলেই হল? তোরও একটা অধিকার আছে। সেই অধিকার তুই ছিনিয়ে নিবি। স্বয়ংবি ওকে তুই নিজের করে।'

কথাগুলো চিন্তামনি জোরের সাথে বললেও ধারবী প্রসাদের কাছে যে কোন দামই নেই তা চিন্তামনি যেমন জানে, ওতাসিনীও সেই রকম জানে। কিন্তু তবু ওতাসিনী মনে করতে পারল না যে, অধিকার তার কিছু নেই। চুপ করে রইল চিন্তামনির কথা শুনে।

ধীরে ধীরে রাত্রি হয়ে এলো। নিমাইকে সে খাইয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। ছোট ছেলে, ঘুম এসে যাওয়ায় ঢুলুঢুলু চোখে ঢুলছিল। বিবি শুইয়ে দিতেই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওতাসিনীর কিন্তু ঘুম এলো না। একটা অজানা আশঙ্কায় মন তার পরিপূর্ণ হয়ে রইল। আজ রাত্রে কি ধারবী প্রসাদ আর না এসে আসবে? এবার তো ওর কোন দরদ নেই। কি নিয়ে সে টেকিয়ে রাখবে? ভাবতে ভাবতে শুধু একের পর এক দীর্ঘশ্বাসই ফেলে চলল। -কোন কিছুই আর ঠিক করতে পারল না।

হঠাৎ সশব্দে দরজা খোলার আওয়াজে ওতাসিনী যে চমকে উঠল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে ধারবী প্রসাদ। তার তখন ভয়ঙ্কর মূর্তি। নেশার ঘোরে পা দুটো কেঁপে চলেছে। চোখ দুটো লাল জবা ফুলের মতো। হাতের পাত্র মাত্রাধিক চড়ুক।

ওতাসিনী ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। পাশ ফিরে তার আর শুল না। মুহূর্তের মধ্যে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়িয়ে, ধীরে ধীরে পিছনে সরে যেতে লাগল। তাই দেখে ধারবী প্রসাদ যেন ঘরটা কাঁপিয়ে হেসে উঠল, 'পালিয়ে যাচ্ছিস? পালিয়ে একার তুই যাবি কোথায়? আজ, তোকে আমি ভালো করিয়ে তবে ফিরব নিজের ঘরে।'

ওতাসিনী কোন উত্তর দিল না। পিছনে পিছনে দেওয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চুপ হয়ে।

ক্রমশঃ পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল ধারবী প্রসাদ। বলল, 'তাইকে নিয়ে এসেছিস্ শুনলাম? কোথায় রাখলি ওকে? নিজের জায়গাই ঠিক না হতে অন্যজনকে আবার স্থান দিয়েছিস। আজ, আজ সেই তাই-এর সামনেই তোকে রাজী করাব।'

ওতাসিনী আর পারল না। খাটের মধ্যে এসে পড়তেই লুটিয়ে পড়ল ধারবী প্রসাদের পায়ের উপর। ব্যাকুলভাবে বলে উঠল, 'আমি আজকের রাতটা আমাকে সময় দাও তুমি। ওকে তুমি কিছু বলো না। আজকে, আমাকে আর একটি বার চিন্তা করবার সময় দাও।'

ধারবী প্রসাদ হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল, 'একদিন তোর চিন্তা তাহলে শেষ হয়ে নি!'

—'শুধু আজকের রাতটা, আজকের রাতটা আমাকে সময় দাও।'

ধারবী প্রসাদ যেন কি ভাবল। একটু ঝুকে টলে পড়তে পড়তে বলল, 'আজ আজ রাতটা না হয় ছেড়েই দিলাম।' কিন্তু মনে থাকে যেন কালকে কিন্তু নয়, আমার আর সময় নয়। বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চিৎকার চেঁচামেচিতে জেগে উঠেছিল নিমাই। কিন্তু ধারবী প্রসাদের রূপ মূর্তি দেখে ভয়ে তার কথা সরছিল না। এখন সে দুই হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। নিমাই-এর সঙ্গে সঙ্গে ওতাসিনী নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ওতাসিনী যে খেলা এইভাবে হার যে জানে। রাত গভীর হতে ঘুমিয়ে পড়ল নিমাই। ওতাসিনী কিন্তু ঘুমাতে পারল না। একের পর এক চিন্তা তার মাথার মধ্যে খেলে যেতে লাগল। মনে মুটো তার পাগল হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল। চোখের পেলা যখন সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে তখন একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।

ধারবী প্রসাদ একেবারে ভূতে উঠে বলল, 'এ কি, তুমি?

—'হাঁ, আমি। আমি মনস্থির করে তোমার কাছে এসেছি।'

—'ও তাই বল। তা কি ঠিক করলে?'

—'ঠিক করেছি। ঠিক করেছি তোমার কথাই আমি মেনে নেবো। তবে, যা আমার কিছু টাকা দিতে হবে।'

—'টাকা! এ তখন তুমি আগে বলো নি কেন? কত চাই? এক হাজার, দুহাজার?'

—'থাক। যত চাই না। আর একটা আমার কথা দিতে হবে।'

—'কি কথা?'

—'যে টাকা যেন দেবে, সেই টাকা দিয়ে আমি নিমাইকে আমার স্কুলে ভর্তি করে রেখেছি এ যেন থেকে যায়।'

—'কেন তো এতে আবার আমার কিসের কি আছে? এত ভাল খবর

—'হাঁ ভাল খবরই বটে। কিন্তু, ওকে তুমি ঘুণাক্ষরে তখনো জানতে পা না, ওর বিবি কি কারণে বিয়ে এগিয়ে চলেছে।'

—'পাগল! কারোর কথা, কেউ কোন দিন বলে নাকি? ও-কথাটা গোপন রয়ে যাবে। মুচকি হাসল ধারবী প্রসাদ।

● ● ● ● ●

ওতাসিনী দ্রুত পায়ে চলে এলো তার নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকতেই ধ কাঁদো স্বরে জিজ্ঞেস করল নিমাই, 'তুই কোথায় গিয়েছিলি দিবি? আমি যে তো দেখতে পাচ্ছিলাম না।'

ওতাসিনী একটা ম্লান হাসির ভাব ফুটিয়ে বলল, 'তুই ঘুম পেয়ে গিয়ে তাই নারে নিমু।'

—'হাঁ।'

—'তাহলে তুই ইস্কুলে পড়বি কি করে? সেখানে যে একলা থাকতে হ

স্কুলে পড়ার কথা শুনে নিমাই-এর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। মার সে কয়দিন ওই আবদারটা করেছিল। সমবয়সী ছেলেমেয়েরা সব স্কুলে যেত, নিমাই-এরও খুব ইচ্ছে করত ওদের সাথে স্কুলে যায়। —'ওমাসে নয় পরের মাস থেকে ভর্তি করে দেবো।' শেষ পর্যন্ত 'এ মাসে আর হোল না রে। তাই তো ও মাসের গোড়ায় ভর্তি করে দেব। —'মানদা এই কথাই তাকে জানাতো।'

তাই স্কুলের কথা শুনে নিমাই জানা, 'সত্যি সত্যিই আমাকে স্কুলে ভর্তি দিবি দিবি?'

—'হাঁ রে। সেখানে তুই একলা থাকতে পারবি তো নিমু?'

—'থাকতে হবে কেন? বন্ধুরাতো স্কুলে পড়তে যেত। ছুটি হলে আবার চলে আসত।'

—'সে যে ঢের স্কুল। তুই যে স্কুলে পড়বি সে স্কুলে তো কত বড়। ঘর বড় বাড়ি। কত বড় খেলার মাঠ। কত বড় হবে।'

—নিমাই এর মুখটা শুধু যেন গম্ভীর হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বলল, সেখানে আমাকে না দিবি?'

—'আমাকে ওখানে থাকতে দেবে কেন? যায় ওখানে পড়ে আসাই তবু পাবে। তারপর একটু হেসে নিমাইকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'মন খারাপ হচ্ছে বুঝি? ওখানে গিয়ে নতুন বন্ধু-বান্ধব পেয়ে যাবি। আমাদের ভুলবি। আমাকে তখন মনেই পড়বে না।'

—'ইস্ কিযে বলিস মিনি। তোকে ভুলে কখনও আমি থাকতে পারি?'

—'আচ্ছা, পরে না হয় দেখা যাবে।'

কোলের কাছ থেকে সরে এসে বলল নিমাই, 'সে তুমি দেখে নিস মিনি।'

● ● ● ● ●

ছুটির পর মিনিট খানেকের পর আর একবার এসে হেডমাস্টার মশাই -এর ঘরে ঢুকল তরঙ্গিনী। নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আপনার কাছে আর একবার আপনাকে বলবার একটা কথা ছিল মশাই। আমার আমার মা-বাবা কেউ নেই। আপনি একটু।'

—'ঠিক আছে। ঠিক আছে।' কথা শেষ হতে না হতে উঠলেন মাস্টার মশাই। নিমাইকে কাছে টেনে এনে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কি কথা বলছ তোমরা।'

—'বলছি বেড়ে নিমাই বলল, 'না।'

—'এই তো ভাই। ভয় করবে কেন? কত বন্ধু বান্ধব পাবে। কত খেলাধূলো করতে পারবে। তবে পড়াশুনোও কিন্তু করতে হবে ঠিক মত। —তা তোমার নামটা কি আবার বলত?'

—'নিমাই কুমার বসু।'

—'আচ্ছা নাম?

—'ঐ——, এই। ঈশ্বর নিবারণ চন্দ্র বসু।'

—'আ আ, তুমি দেখি তো সাঙ্ঘাত বিদ্যু জান। বেশ বিদ্যা নেই। তরঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাই আপনার বুদ্ধিমান ছেলে।'

তরঙ্গিনীর মুখ হাসি ফুটে উঠল, 'এবার তাহলে উঠি মাস্টার-মশাই।'

—'আচ্ছা আসুন।'

ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো তরঙ্গিনী। পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখল নিমাই তখনো দাঁড়িয়ে। দূর থেকেই সে দুজনের পায়ের তার চোখ দুটো তখনো জলে ছল ছল। তরঙ্গিনী আর পারল না। ছুটে বেরিয়ে এলো গেটের বাইরে। পাঁচিলের আড়ালে চলে এসেই বসে পড়ল। দু'চোখ ছেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা।

বেশ কিছুক্ষণ সময় এভাবে চলে গেল। হঠাৎ কারিতরণ এসে বলল, 'তাহলে-বৌ কেঁদে আর কি হবে?'

তরঙ্গিনী যেন চমকে উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি?'

—'চিনতে পারছ না তো? কিন্তু, আমি অনেকবার ওনেছি। আমার নাম কারিতরণ।'

তরঙ্গিনী মনে মনে যেন শঙ্কিত হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, ও আপনার নামই তাহলে কারিতরণ।

কারি আমার আবু মনে হেসে বলল তাল-বৌ? কারি সত্যসত্যই কারিতরণ।

—'তা আপনি এখানে কি করেন?'

—'এই দেখ বুড়ো মানুষ কি আর এখন এখন তোমাকে পাঠাতে পারে? হাজার হলেও তো বুড়ো মানুষের বৌ কিনা।'

—'তাই বুঝি আমাকে এখন ছেড়ে দিয়েও পিছনে পিছনে ওস্তাদ লাগিয়েছেন?'

—'আরে অমন কথা কেন তাল বৌ। পথে ঘাটে তো বিপদ-আপদও হতে পারে।'

—'হুঁ, বুঝেছি। তা তাল-বৌ হলাম কেমনকে?'

—'ও-হ, এই জন্যেই। ওরা আমি নিমাই নিজেই বলিয়ে। সম্পর্ক দেখতে গেলে, খুড়তুতো পরিচয়, তা হলে খুড়ী। কিন্তু মা-কারিকে কিছু কি আর ঐ সব—। তাই মনে মনে ভাবলাম একবার চেষ্টা করে যাব। সে কি আর ভাল বৌ-না হয়ে যায়। তাই আমি তোমাকে তাল-বৌ বলেই ডাকব। কি আপত্তি নেই তো।'

—'না, না আপত্তি থাকবে কেন? আর আপত্তি থাকলেই এখন ওনছে কে?'

—'ওই দেখ তুমি রেগে আবু তাল-বৌ।'

—'না, না রাগব কেন। তবে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ?'

—'সেই কথাটাই তো বলব ভাবছি। চল আমি পাঁড়িয়ে আছে। তা এখন তুমি কোথায় যাবে ঠিক করলে, খুড়তুতো ভাসুরের, না একেবারে সেই মোক্ষদা ঠাকরুন-।'

—'হাঁ, হাঁ সেইখানেই। একেবারে সেই মোক্ষদা ঠাকরুন ভাসুরের।' উত্তর দিল তরঙ্গিনী।

১০

মোক্ষদা ঠাকরুন খুঁজতে খেরেছিল তরঙ্গিনী আজ আর না করবে না তার এখানে আসবে। অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় তা কি আর বুঝে হয়। বিদেশ বাসুদের যখন এক একটা করে যৌবন ঝরে যায় তখন, সেই মৃত অবস্থায় একটা নিরাপদ ভাব জেগে ওঠে মনের মধ্যে। তখন নিজেকে আর ফেট্টা করে কারুর মধ্যে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। নৌকা যত তখন ছেড়ে দিয়ে হাওয়ার টানে যেখানে নিয়ে যেতে চায় নিক, এমনি হয় মনের অবস্থা। তরঙ্গিনীর তাই হোল। স্বামী, মা, ঘুরুনৌ চলে গেল। তাইও আর রইল না কাছে। নিজের জন্যে কিছু করার সকল শক্তিই যেন তার চলে গেল। তাই স্কুল ছুটি থেকে ফেরিয়ে এসে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজিচরণকে বলল, 'যাঁ, সেইখানেই আমাকে নিয়ে চলুন। একেবারে সেই মোক্ষদা ঠাকরুন কাছে।'

যত্নজন্তা থেকে সরে এসে গলির মুখে সেই 'অস্তানা। সোতলা একটা বাড়ি। চৌতলে ঘরে চারি পাশ দিয়ে ঘেরা। এক তলাতে সারি-সারি সব ঘর। ঘরে ঘরে ভাড়াটে। সোতলায় একটু ফাঁকা। সবগুলো সব বড় বড়। মাঝী মাঝী সব আলাদা আলাদা পরিবার। নারি-নারী সব লোকেরা থাকে ঐখানে, তাই জন্যে তাদের আলাদা ব্যবস্থা।

মোক্ষদা ঠাকরুন তাই দারওয়ান মেওকীলালকে নিয়ে ঘর সাফাতে লেগে গিয়েছিল। দারুণী প্রলোভন কড়া হুকুম তরঙ্গিনীর যেন কোন ওখানে না হয় কোন মতে। সোতলার একটা ঘর থেকে নিয়ে মোক্ষদা তাই আসবাবপত্রগুলোকে একবার রাখছিল এদিকে আর একবার রাখছিল ওদিকে। ঘোছগোছ করা দেখে মরালী আর থাকতে পারল না। পাশের ঘরের কমলাকে একবার ডিকোল করল, 'ও কমলা ব্যাপার কি? ওপরে এত আওয়াজ কিসের?'

—'কমলা বলল, 'ও সব ঘর ঘোছগোছের আওয়াজ। আজ একজন নতুন মাল আসছেন, এ সব তারই জন্যে।'

মরালী বলল, 'তাই নাকি? তা তো আমি শুনিনি একদো।'

—'সে কি! তুমি শোন নি।

—'না,—আ, তার জন্যে এত ঘোছগোছের কি আছে।

—'তা ঘোছবারে বৈকি। ও যে আমাদের কর্ত্রীমাঈর ঘিয়ে করা পরিবার। তার আবার নাকি পরম সুন্দরী। যৌবন বতী।

—'ও তাই, দেখবার মুখি আপনার। তা চল একবার ওনে আসি উপরে জানীর কাছে।'

—'না ঃ তুমি একাই যাও মরালীদি, আমার একটু কাজ আছে।'

—'সে ফিরে এসে উনাকিন আবার খুলি করে দেবে?—তা চল চম্পা ও না যায় তবে তুই আর আমি দেখে আসি।'

চম্পা বলল, 'তাই চল মরালী দি। ও থাকলে ওর কাম নিয়ে।'

মরালীকে দেখতে পেয়ে মোক্ষদা বলে উঠল, 'কি রে তোরা আবার এখানে যে।'

মরালী উত্তর করল, 'এই দেখতে এলাম তোমার ঘর ঘোছগোছ। তা কিনি আসছেন, কেমন দেখের রানী গো? যে এত তোমার ঘর ঘোছগোছের ব্যস্ততা?

—'আরে রানী না হলে কি এত ঘোছগোছ করি? আসলে দেখতে পাবি। চোখ টেরিয়ে যাবে।

—'যাঁ, যাঁ সে, কত টেরিয়ে যাওয়া তো দেখলাম। তা আমার বয়স কালে অনিক ও রকম অনেক ওনেছি তোমাদের মুখে। এখনও যদি একবার সেজে ওজে দাঁড়াই তাহলে কম যাব না।'

—'এ জন্মে আর নয়।' উত্তর দিল মোক্ষদা।

কথাটা ওনে মরালী যেন হেসে কেওনে হুলে উঠল। ঠেটিয়ে বলে উঠল, 'কি বললে?'

—'না, না,—কিছু না।'

—'কিছু না। আমি ওনতে পাই নি মনে করেছ? কেন এখনও আমি তোমার চৌদ্দ পুরুষের কেন গোকে মালে মালে অনেকের চেয়ে টাকা দিয়ে থাকি।

—'আরে রাগছিস কেন, আমি কি কিছু বলেছি নাকি?'

—'বলবে কেমন করে, বলার সুযোগ দিলে তো।' 'এই বলে চম্পার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'চল রে চম্পা আর এখানে দাঁড়াতে হবে না।'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নেমে যেতে না যেতেই ঘরদার গোছার মতিয়ের দুর্ব-

এর আওয়াজ পেলো গেল।

রাগে মরালীর কান-মাথা যেন গরম হয়ে উঠেছিল। অন্য দিন এর উপরে ওর রাগ যাও ঘুরে উঠতে পারছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি মুহূর্তে সাত দিন-রাতটা ধরে একবার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে চোখের সামনে ছড়িয়ে দিতে পারত, তবু যেন তার মন শান্ত হতে না। এক সময়ে সেই ছিল আরতী প্রকাশের সব থেকে প্রিয় পাত্রী, এ বাড়ির মধ্যমণি। তারপরে এলো কমলা, এলো চন্দ্রা, কেতকী, বনানী, বিদ্যা আরও কত কে। কিন্তু সবাইকেই সে জানিয়ে দিয়েছে সে হচ্ছে মরালী ; এ বাড়ির মধ্যমণি। এখানে থেকে যদি স্বাধীন ভাবে চাও, তবে এ সত্যটিকে মেনে নিতেই হবে। আজকে সেই অধিকারে এসে হাত বাড়াতে চায়? কেন? স্নান খেয়েছে বলে কি তার রূপ একেবারে ধুয়ে গেছে? কখনই নয়। এখনও যদি একবার সে ইচ্ছে করে, তবে দেখিয়ে দিতে পারে—সে মরালী এখনও মরে নি।

দ্রুত বেগে আসছিল মরালী সিঁড়ি বেয়ে। নিজের ঘরে ঢুকতেই শুনতে পেল। দরজার কাছে মটোর গাড়ির আওয়াজ। ঘরকে দাঁড়ালো মরালী।

শুভাশিনীকে নিয়ে ভাস্কিচরণ নেমে আসতেই মরালী বলে উঠল, 'ও এই বুঝি সেই জয় জয়ী! মরালীর কথা শুনে উৎসুক আরশিটোরা পেছন থেকে হেসে উঠল। শুভাশিনী একটু যে হকচকিয়ে গেল। মরালীর দিকে একবার তাকিয়েই চোখটা নামিয়ে নিল নীচের দিকে। লজ্জা শরীরটাকে যেন তার ঘৃণায় ভরে উঠল।

বুদ্ধিমতী মরালীর সেটা বুঝতে বাকী রইল না। রাগে শরীর যেন তার জ্বলে উঠলো। আরও খানিকটা এগিয়ে এসে শুভাশিনীর চিবুকে হাত দিয়ে একটু তুলে ধরে বলল, 'ঘি, এত অহঙ্কার থাকবে না সুন্দরী ; তা তুমি যত মেয়ের পায়েই ধর না কেন আরতী প্রকাশের। টাকা দিতে যখন কাঁচা পড়বে তখন দেখবে পাবে তার আসল রূপটা।'

—'সে কথা কাউকে আর বলে দিতে হয় না মরালি দি' বলে উঠল কমলা. 'এ সংসারে যারা আসে সেটা ভাল করেই জানে।'

—'কমলাকে তথা দিয়ে চন্দ্রা বলে উঠল, 'তুই এত দেখি কমলা। সবকাতেই তোর দেখি। -এই জন্য আমাদের দিকে একেবারে পিছন ঘুরিয়ে চলে যাবে? এই গোমর আমরা অনেক দেখেছি।

বিদ্যা দাঁড়িয়ে ছিল পাশের দিকে। বয়সে সে ওদের তুলনায় অনেক ছোট। বড়দের কথায় সে নাক গলাতে যায় না। তাই সে একবার শুভাশিনীর দিকে তাকিয়ে চলে গেল তার নিজের ঘরে।

শুভাশিনী এক একজন এক এক জনের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। আর মাথাটা ঘুরিয়ে নীচু করছিল। কোন কথারই উত্তর সে দিতে পারল না। তার পা-হাত-পা যেন কাঁপতে শুরু করে দিল। চোখ ফেটে জল আসতে লাগল। অন্যত আজ তোর বেলায় যখন নিমাইকে ভুলে ভর্তি করে দেওয়ার জন্যে আরতী প্রকাশের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তখন, মনকে সে কত শক্ত করেই না বেঁধেছিল। চোখের জলের অপমান সে আর করতে দেবে না। লজ্জা, মান তয় সমস্ত কিছু ত্যাগ করে সে ভাসিয়ে দেবে নিজেকে খরস্রোতা নদীর স্রোতের মুখে। দেখবে সে দেব পর্যন্ত এই স্রোতের টানে ভেসে গিয়েও তোনদিন সে কূল পায় কিনা। যদি পায় তবে সে খুজে সন্ধান নিয়ে বাঁচবে না হয় তুবিয়ে দেবে সে নিজেকে অতল জলে। এই শক্ত মন নিয়েই সে নিমাই-এর স্কুলের সীমানা থেকে বেরিয়ে এসে ভাস্কিচরণকে বলেছিল, 'আরতী প্রকাশের বাড়ি আর আমি যাব না। আজকে আপনি সেই মোক্ষদা মাসীর আস্তানাতেই নিয়ে চলুন।'

তখন এ বাড়িতে পা দেওয়া পর্যন্ত এক্কের পর এক জনের মন্তব্য শুনে শুভাশিনী আর সামলাতে পারল না নিজেকে। সারা শরীরের মধ্যে কেমন যেন তয়ে উঠে মাথাটা ঘুরতে লাগল। অস্ফুটে কি যেন একবার বলতে চাইল, কিন্তু ঠোঁট দুটোই কেবল কেঁপে উঠল, কথা কিছুই আর বেরুল না। পরিবর্তে কেবল দুচোখের কোণে জমা হতে লাগল উদ্বেলিত জলের স্রোত।

শুভাশিনীকে এই রকম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে দেখে ভাস্কিচরণ বলে উঠল, 'কি আরম্ভ করেছিস তোরা সবাই মিলে। ওদের কথায় কান দিস না তুলু-বৌ। চল আগে তোমাকে মাসীর কাছে নিয়ে যাই।'

মোক্ষদাও ততক্ষণে সেইখানে এসে হাজির হয়েছে। মোটা মানুষ তার আবার ব্যস্ত হাড়ার সাথে সাথে অতের কাপড়টা একটু বেড়ে নিয়েছে। দরজার গোড়ার গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বুঝতে পেরেছে—এ নির্ঘাত ওতো ছাড়া আর কেউ নয়। তাড়াতাড়ি তাই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতেও একটু দেরী হয়ে গেল। দূর থেকে মরালী আর অন্য সবাইকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল মোক্ষদা, 'এই মরালী তোর এখানে কি করছিস শুনি?'

মোক্ষদার গলার আওয়াজ পেয়েই শুভাশিনী নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। বাঁধের উপর মাথাটা নুইয়ে দিতেই মুক্তো ছেড়া জলের ধারা যেন বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তে শুভাশিনী আর মত করতে পারল না-মোক্ষদাই তাকে এ পথে আসার জন্যে প্রথম দিয়েছিল তখনে।

প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতেই শুভাশিনীর আগের কথাগুলো মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি নিজেকে শক্ত করে তাঁচলে দিয়ে দু'চোখ মুছে নিল। মোক্ষদার দিকে একবার তাকাতেই অবাক হয়ে গেল শুভাশিনী। ঠোঁট দুটো ওতোর কাঁধের উপর রেখে অনেক চাপতেই মোক্ষদা। বলল, 'বড় রাগ হচ্ছে আমার উপরে তাই নাকে না আমিও এ চাই না। কিন্তু আমার যে আর উপায় নেই আজব আর ওর থেকে মুক্তি নেই রে।'

শুভাশিনী কোন উত্তর দিল না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মোক্ষদার মুখের দিকে।

বুক ভরে শ্বাস টেনে নিয়ে মোক্ষদা আবার বলতে শুরু করল, 'এক এ ছেলে সবাই যখন আমার চলে গেল ওতো, তখন কেমন করে যেন একদিন এখানে এসে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সে আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। সেই থেকে আর ছাড়তে পারি নি এ বাড়ি। অন্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে এ জীবন।

ভাস্কিচরণ বলে উঠল, 'নাও আবার হল এখন মাসীর পুরোনো খরা। অত ভাল-বৌ-এর যে এদিকে ঘিনের চুলের বাল ওঁড়াণত তার বেয়াল নেই। সেই তে সকালে ছড়ি ফেকে বেরিয়েছে।'

—'ও মা, তাই নাকি।' আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে কপট মোক্ষ 'সত্যি তো, মোক্ষদার হেকে যাবে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাবে তা নয়, দরজার গোড় দাঁড়িয়ে জাঁদারেদি আরম্ভ করেছি। চল যে ওতো, উপরে চল।'

● ● ● ● ●

দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে উঠতেই ওতোর চোখদুটো কেন ঘুমে ভেঙে এসে হয়তো বা ক্লান্তিতে, হয়তো বা বিস্ময়ে। চোখের পাতা দুটো সে আর টেনে রাখ পারছিল না। অন্ত বিছানার ওপর পড়তেই কিন্তু ঘুম এলো না। অনেকক্ষণ তাই এপা ওপাশ পড়াপড়ি দিয়ে শেষে উঠে দিয়ে বসল জানলার ধারে। ততক্ষণ বসেছিল কে জানে, হঠাৎ 'ওতোদি-' বলে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল বিদ্যা।

শুভাশিনী যে চমকিয়ে উঠল। বিদ্যার কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করার যার অব ছিল না। আপন মনেই সে কিতার হয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বলল, 'ওতো আন্দা ওতোদি আমি কেমন করে তোমার নাম জানলাম বলো তো!—ওমা, তু দেখি মুখ ফোলয়া করে বসে আছো। তুমি আমার উপরে রাগ করেছো? আমি তোমাকে কিছু বলি নি।'

শুভাশিনী সজল মিষ্টি মুখ তুলার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, 'ন তবন কেন? -এই, তুমি আসবে বলে আমি বসে আছি।'

—'তাই নাকি? আচ্ছা বলতো আমার নাম কি?'

—'কি করে বলব, তুমি যদি না বলে দাও।'

—'এই তো পারলে না।—বিদ্যা, আমার নাম বিদ্যা।'

—'আ কেন সুন্দর নাম তো।

—'তোমার নাম তো আরও সুন্দর। তোমাকে দেখতে যেমন সুন্দর তো না মাও হোমনি সুন্দর।

—'কিন্তু তোমার মতন তো আর নয়।'

—'এ মা। কি বলছ, তুমি! এ বাড়িতে তোমার মত সুন্দর দেখতে আসে নি এ পর্যন্ত। তাই বেকলে না মরালী দিদির কি চোখ টাটানি। তুমি চলে আসব ওরা যেন হিংসেয় একেবারে ফুলে পুড়ে গেল।'

—'মরালীদি আবার কি।'

—'যা যে, এই যে, যে মেয়েটা তোমাকে এমন করে কথা শোনাচ্ছিল। গাড়ী ও। সব সময়ই যেন খিঁচি খিঁচি করছে। তার ঐ পাশে, আর দিদুনের কি যে, যে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের নাম কমলাদি, চন্দ্রাদি—আরও অনেকে আছে ; স করল, আস্তে আস্তে সবার সঙ্গেই পরিচয় হয়ে যাবে।

—'তোমার সঙ্গে বুঝি সবার পরিচয় হয়ে গেছে?'

—'তা হবে না আমি প্রথম দিন এসেই সন্ধ্যার সময়ে পরিচয় করে নিয়েছি।'

—'সে কি! তুমি তাহলে এখানে থাক নাকি?'

—'না, না, আমি এখানে থাকি না। রোজ কাজ করি এখানে এসে আবার চলে যাই।'

—'তার মানে? তুমিও—!'

বিভা লজ্জায় অবনত মুখে বলল, 'হ্যাঁ ওরোদি, আমিও তাই। পয়সার জন্যে দেহ বেচি। বাড়িতে যে বড় অভাব ওরোদি, তাই দুপুর বেলা নাগর জুটিয়ে আমাকে নিয়ে যায় এ বাড়িতে। আবার অনেক রাতে এসে দিয়ে যায়।'

ওতাসিনীর সারা শরীর দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল। বিস্ময়ে চোখ দুটো সে বড় বড় করে বলল, 'বাবা তোমাকে দিয়ে যায়!—তোমার মা বেঁচে নেই?'

প্রশ্ন শুনে উঠতেই বিভার মুখখানা যেন গম্ভীর হয়ে এলো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লান হাসি মেখে বলল, 'না ওরোদি নেই কেন? তবে নিজের মা আর নেই ওরোদি। এ আমার সৎ মা। ছোট ছোট অনেকগুলো ভাই বোন, -বড্ড অভাব আমাদের ওরোদি। বাবার যখন চাকরীটা ছিল তখন তবু যেন কোনরকমে দিন চলে যাচ্ছিল। কিন্তু চাকরী চলে যাওয়ার পর থেকে সংসার অচল। মার গয়নাগুলো প্রথমে বন্ধ রাখি হয় দি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখা হয়ে—।'

কথা মাঝে ওতাসিনী বলে উঠল, 'থাক ; আমি আর শুনতে চাই না বিভা।'

বিভা কিন্তু থামল না। চোখের জল গাল দুটো ভাসিয়ে বলল, ' আমার কিন্তু তোমার মত এক সিসি ছিল ওরোদি। ঠিক যেন তোমার মত দেখতে। মা মরে যাওয়ার পর তার কাছেই আমি বড় হয়েছিলাম ওরোদি। কিন্তু সেও আর টিকল না। মাবপথেই ও চলে গেল একদিন। তুমি আমাকে তো ছেড়ে যাবে না কোন দিন? বল, বল ওরোদি, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?

ওতাসিনী কোন উত্তর দিতে পারল না। কেবল মুগ্ধচোখে চেয়ে পড়েছিল অপলকে। ধীরে ধীরে বিভার হাত দুটো কোলের কাছে টেনে এনে নিশ্চলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। বাইরে তখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। রাস্তা দিয়ে শুরু হয়েছে লোকজনের যাতায়াত : কেউ বা ব্যস্ত পায়ে, কেউ বা মন্থর।

১১

ওতাসিনীকে পৌঁছে দিয়ে কান্তিচরণ-যখন ফিরে এলো, তখন তার বৈঠকখানা ঘরে বসে। কান্তিচরণকে ঘরে ঢুকতে দেখেই তারাপতি প্রসাদ বলে উঠল, 'এস কান্তিচরণ এস। এই যে এই ছোকরাটা আমি তোমার জন্যে রেখেছি-কি? সস্তা ধরের?—কেমন শানাল বলো'—এই বলে বিকট এক হাসি হেসে উঠল তারাপতি প্রসাদ। সেই হাসির মধ্যে একটু দ্বিধান্বিত ভাব ফুটে উঠল কান্তিচরণের। কিন্তু তার আর বলবার মতো কিছু ছিল না। তাই সে কোনরকমে ঢোক গিলে বলল, 'কি খুশি তো?'

কান্তিচরণ একেবারে কৃতজ্ঞতায় যেন গলে পড়ল। ছোকরাটা হাতের মুঠোর মধ্যে একটা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল মুখে। চোখের ইসারায় বলতে বলতে বলল, 'তা খুশি না হয়ে উপায় আছে। কুড়োর জায়গা এসে কে কবে না খুশি হয়ে গেছে শুনি?'

—'এই তো তুমি আবার তোষামদ আরম্ভ করলে। আগে এসব কাজের কথা বলতো। মেয়েটা আর আপত্তি টাপত্তি করে নি তো?'

—'পাগল। উল্লো পাখী এবারে পোষ মেনেছে। তাকে যে বোল তুমি শিখাবে সেই বোলই বোকে তোমাকে খুশিয়ে।'

—'তাহলে বোল শিখানোর পালাটা তুমি আরম্ভ করে দাও। দেরি করে কাজ নেই। তবে হ্যাঁ, এমন সুন্দর খাসকোরা মেয়েটাকে তো আর বাকে তাক দিয়ে প্রথম রাতের ছোপটা ফেলাতে পারি না। প্রথম দিন যে আসবে, তাকে হতে হবে এক ডানাকাটা রঙ্গিনী আসমী। আমি মুঠো মুঠো টাকা আর সোনা দানা তুলবে চাই।'

—'সে কথা আর বলতে? তুমি যেমে নিও খুড়ো এবার আমি কেমন জহুরে খবি না নিজে আমি তবে আমার নামই নয় কান্তিচরণ। সেমি একবার ও ভাল করে যে, আমাদের ওসোমে যা আছে সব খুমিয়াল। -খানের জন্য আনব কুমকুম কুমারীকে, সাথে আনবে জোয়ার ধরা মিঞা। কত সাঁতারের আগের আর তার সাথে রসমেরজ এর ফোকলের মতো মহার গ্লাস হাতে নিয়ে ভাল-বৌ যখন চুমবে না, তখন কোন শুকার আর চোখের পলক ফেলতে হবে না।

—'সাবাস। এই রকমই একটা কিছু চাইছিলাম আমি। তুমি তা হলে আমাকে কথা দিচ্ছ'

—'কথা দিচ্ছি মানে?—যেমন কথা তেমনি কাজ।

—'সাবাস।'

—'তাহলে উঠি আমি। দুদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলব।'

● ● ● ● ●

ধীরে ধীরে ওতাসিনী অনেকটা শক্ত করে নিল নিজেকে। মল্লিকা, চন্দ্রা, কমলা, কেতকী সবার সঙ্গেই সে পরিচয় করে নিল। কিন্তু বিভার সঙ্গেই গড়ে উঠল তার আন্তরিক সম্পর্ক। প্রথম দিনেই বিভা তাকে করে নিয়েছিল আপনজন। আর ওতাসিনীও দেখেছিল তাকে ছোটবোনের মত। মোক্ষদা মাসীকে তেমন খারাপ মনে হলো না। আলাপ ব্যবহারে সেও অনেকটা হয়ে উঠেছিল কাজের মানুষ। তাই দুদিন পরে ওতাসিনীর যখন আসরে যাওয়ার ডাক পড়ল, তখন মোক্ষদা এসে বলল, 'আয় ওতো, প্রথম দিন তোকে আমি সাজিয়ে দিই আবার মনের মতো করে।'

ওতাসিনী কোন আপত্তি করল না। ধীরে ধীরে এসে বসল মোক্ষদার কাছে।

মোক্ষদা বলল, 'কি রে কোন কথা বলছিস্ না যে, মনে মনে খুব ভয় করছে তাই না রে?'

—'না খারাপ লাগছে মাসী। দেখতে ভূত হয়েছে কি না!'

—'কৈ দেখি।' গালে-মাথায় হাত দিয়ে মোক্ষদা বলল, 'না, ভূত ভূতও লাগছে না। ও জোবনে তোর ওদের জন্যে ঐ রকম মনে হচ্ছে। একটু থেমে মোক্ষদা আবার বলল, 'তুই বেশীদি মা একটা কাজ না করে ঘসিস প্রথম দিন। সময় আর বেশি নেই। এখনই লোকজন সব এসে পড়বে। তোরা ওসে তৈরি হয়ে না থাকলে আসরী এসে আমাকেই তো দুষবে।

সাজতে সাজতে সন্ধে ঘনিয়ে এলো। প্রকাণ্ড বাড়িটার ঘরে ঘরে আলোয় ঝলমল করে উঠল। কলরবে মুখর হয়ে উঠল সেই জনের আস্তানাটা। কান্তিচরণ পার্টি দেওয়ার সব কাজ কর্ম শুছিয়ে এসে একেবারে ফরসা হয়ে বসল। বলল, 'কি মাসী এখনো সাজানো শেষ না?'

মোক্ষদা উত্তর দিল, 'এই তো হয়ে এলো, তোমার লোকজন সব এসে পৌঁছেছে?'

—'পৌঁছেছে মানে? সব বসে আছে। কেদার কত বসে আছে। ঝুনঝুন কুমারীর গান শুনছে। জোয়ারদার মিঞা মাজারে আরম্ভ করেছে। -কেন গান কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ না?'

—'হ্যাঁ, তা পাচ্ছি।'

—'তবে? খুড়ো তো একেবারে রেগে আগুন। আমাকে আর কথাই দিল না স্থির হয়ে। -নাও, ওঠো, ওঠো এঘরে ভাল-বৌ।'

কান্তিচরণ ব্যতব্যস্ত বাড়িয়ে দিয়ে ওতাসিনীর হাত ধরতে গেল। কিন্তু তার আর দরকার হোল না। ওতাসিনী তার আগেই উঠে পড়ল বলল, 'চলুন কান্তিবাবু যেতে হবে।'

—'কিন্তু একি ভাল-বৌ তোমার মুখ দেখি একেবারে গম্ভীর। অমন গম্ভীর থাকলে তো হবে না। হাসি খুশি ভাবটা ফুটিয়ে তোল মুখে।'

—'ওতাসিনী হঠাৎ খিল খিল শব্দ করে হেসে বলল, 'আপনিও যেমন ; প্রোমর মুখে থাকব কেন? এই তো আমি হাসছি।-তা এইখানেই আপনি সময় নষ্ট করবেন নাকি। চলুন।'

—'হ্যাঁ, চল।'

ঘর থেকে তখন কুমকুম কুমারীর সুরেলা কণ্ঠে ভেসে আসছিল। -'কথা কও সজনী—ওরোনো জল মো.....। ওতাসিনী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। মাসী আজকে তাকে সাজিয়ে দিয়েছে মনের মত করে। নীল একটা শিফের শাড়ি দিয়েছে পরিয়ে তার সাথে চটকদার ব্লাউজ, —বুকের খিকটা ফেল খোলা রেখা। চোখে কাজল, মুখে 'আই-বু' ঠোঁটে লাল লিপষ্টিক। পায়ে 'ফেল পাউডার'। নখে নেল পালিস। তালুতে মেহেদী আর আলতায় ছড়িয়ে দিয়েছে আরো। কপালে জ্বল জ্বল করছে বড় টিপ। শাড়ির আঁচলটা এতো ছোট করে রাখা যে বারবারই সেটা খসে পড়ছিল বুক থেকে।

ওতাসিনী মনে মনে একবার ভাবল নিজের দিকে একবার দেখে আসবার মতো দিয়ে। কিন্তু তা আর দেখে ইচ্ছে করল না। মনের খেয়াল ভর্তি ট্রে-টা যা হাতে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল ঘরের দিকে। সেই মুহূর্তে কারও কথাই তার মনে করতে ইচ্ছে করল না—নবতুত, না শুশুরজন। তবু একবার আর কথাটা মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তার চোখের পাতাগুলোর ঝিল ভোর করে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল দুগাল বেয়ে।

ওতাসিনী তাড়াতাড়ি আঁচলের খুঁটো দিয়ে আলতো করে জলের রেখাটা মুছে

ফেলে ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর। স্তব্ধ হয়ে গেল সব, বন্ধ হয়ে গেল জোকনার ঝিঁঝির ঝঙ্কার। দারুণী প্রসাদ তার আসন ছেড়ে উঠে এসে ওতাসিনীর হাত ধরে নিয়ে এলো আসরে। আর কেদার রায় নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওতাসিনীর যৌবন উদ্ভাসিত মহিমময়ের সৌন্দর্যের দিকে।

● ● ● ● ●

ভোর বেলা ওতাসিনীর যখন ঘোর ভেঙে এলো, ঘর শূন্য দেখে, একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আঃ, বাঁচা গেল।' জানালা খুলে দেখল, 'যাক কোন ভয় নেই কেদার রায়ের। আমি এখন চলি।'

কারো মুখে কোন কথা সরলো না। শুধু ওতাসিনী তার অর্ধ উন্মিলিত চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল সবিশেষ। বুঝতে পারল না কেন সবাই তাকে এমনভাবে ঘিরে রয়েছে। মাথার কাছে একজন চেয়ে দেখল মোক্ষদা মাসী আর রয়েছে সেখানে নীরবে। একটু আগেও বসেছিল জানকীর বাবু, তাকেই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দারুণী প্রসাদ, কেদার রায়।

ওতাসিনী একটু নড়ে চড়ে উঠতে যেতেই 'মা, মা ; বলে এগিয়ে এলো কেদার রায়। বলল, 'না, না এখন তুমি আর উঠতে যেয়ো না। শরীরটা তোমার বড় দুর্বল, বিশ্রাম কর।'

দারুণী প্রসাদ এগিয়ে এসে বলল, 'হাঁ, একেলা তুমি শুয়েই থাক, উঠ না।'

ওতাসিনী কিন্তু নিজের ভিতরে তত আর অবসাদ বোধ করছিল না। তিন তবু তখনকার মত আর উঠতে চেষ্টা করল না।

কেদার রায় আবার বলল, 'এবার তাহলে আমি আসি দারুণী বাবু—ও বেলা এসে দেখে যাব, —কেমন থাকে। এর মাঝে যদি আবার জানকীর দেখাতে হয়, তার কিন্তু কসুর জরুরেন না দারুণী বাবু।'

দারুণীপ্রসাদ বলল, 'না না তার জন্যে চিন্তা করবেন না।'

কেদার রায় চলে যেতে দারুণী প্রসাদও তার সাথে এগিয়ে গেল বাইরে।

এতক্ষণ পরে মাসীকে একলা পেয়ে ওতাসিনী তাড়াতাড়ি উঠে বসে মোক্ষদার হাতটা চেপে ধরে বলল, 'কি হয়েছে বলত মাসী? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

মোক্ষদা বলল, 'বুঝতে আর পারবি কি করে। ঐ বলেছিলাম না, তুই একটা কাণ্ড করে বসবি। তাই-ই করেছিস।'

ওতাসিনী আর পারছিল না। অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, 'হেঁয়ালী তোমার রাখ মাসী। কি হয়েছিল বলতো দেখি।'

—'হবে আবার কি? এই টুকুনেই তুই অজ্ঞান হয়ে পড়লি। দেবে একেবারে ভেলোমাসী কাণ্ড। কেদার রায় তো একেবারে ঘেন্নপ্প মনে গেছে।'

—'হাঁ, সে তো—, তার পরে কি আর জ্ঞান হয় নি?'

—'আয় আমার। তা হলে আর এত জ্বালার ভোক্তেরে দৌড়াদৌড়ি করবে কেন? তুই যা দেখলি না।'

এই বলে মোক্ষদা উঠে গেল অন্য ঘরে। ওতাসিনী বিছানাতে বসে রইল আর বিছানায়। একটু পরে ফিরে এলো মোক্ষদা। একটা পুটলি ওতাসিনীর সামনে রেখে বলল, 'এই নাও এটা তুলে রাখ। যত সব তো আমার। ও রকম নিত্য নিত্য পটাং করে পড়ে গেও আর কলা খেয়ে বসে থেকে।'

পুটলিটা ওতাসিনীর কোলের কাছে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে খুলতে লাগল। খানিকটা খুলেই অবাক হয়ে বলে উঠল, 'ও কি মাসী, এসব কি।'

—'কি তুমি চিনতে পারছ না? নিয়েছিল আরও অনেক। সব পাছন্দ করে নিয়ে গেছেলিল ঐ দারুণী হারামজাদা। বলি, আছি থাকতে তা হবে না। নিজের সব কিছু খুইয়ে যে ভোজপাত করবে সে কিছু পাবে না, আর সব পাবে তুমি।

এ তো হতে পারে না। তাই যেঁদুর ভেতর দিনিতে দিনিতে নিয়ে গেছেলি, নিয়ে এসেছি তোর জন্যে। এই রকম যদি অজ্ঞান হয়ে পড়িস ঘরে ঘরে। তবে কিছুই আর পাবি না, -জেনে রাখিস। -নে এখন ওগুলো তোর কাছে তুলে রাখ। অনেকক্ষণ তো বিশ্রাম হয়েছে। ওঠ এবারে। মেয়ে মানুষের অত বিশ্রাম করলে চলে না।'

ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল ওতাসিনীর কাছে। কাল সন্ধের সময় গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে উঠেছিল পুরুষকে, তখন কেদার রায় দেবার ঘোরে অনেক কিছুই তাকে উপহার দিয়েছিল। সমস্ত কিছুই সে একে একে তুলে দিয়েছিল দারুণী প্রসাদের হাতের কাছে। তারপরে একসময় হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল কেদার রায়। বিছানার ফেলে দিয়ে জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার অর্ধনগ্ন শরীরটার উপরে। লজ্জা করতে পারে নি ওতাসিনী। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর : কখন যে তার হাত বিভোর মেহেতে সবটুই মিশে নিয়ে এই ওইখানে নিয়েছিল তার বিছানার তা সে টের পায় নি। মাসী যে এই পুটলিতে কি টাকা আর সোনা-দানা রেখে গেল এ সেই উপন্যাসেরই একটা ছোট অংশ।

মোক্ষদা চলে যেতেও ওতাসিনী তার মনে ভাবল তার বিছানায়। টাকাগুলোকে একবার হাত বুলিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বুকের ভেতরে চাপা কান্না ওমরিয়ে ওমরিয়ে উঠতে লাগল। অনেক কষ্টেও তা আর ধরতে পারলো না। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোটা।

ঠিক সেই সময়েই বিভা ঘরে ঢুকে গেল, 'তুমি কাঁদছ ওতোমি?' ওতাসিনী তাড়াতাড়ি আঁচলের খুঁটো দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'কৈ না তো, কাঁদব কেন? কি জন্যে বুকি বাড়ি আসি নি।'

—'কি করে যাব বল। কাল রাতে তো তোমাকে নিয়ে ঐ ঐ পরে বিছেছিল আজ সকালেও যে এসে তোমার খোঁজ নিয়ে যাব তার উপায় আছে? কর্তাবাবু সব তোমার ঘর ভর্তি করে রেখে গেছে—আমি আসি কি করে বলতো?'

—'তুই বুঝি ওদের খুব ভয় করিস, তাই নয়ে?'

—'না, ভয় করিনা। তবে ঐ দারুণী মি, জ্ঞানি ওরা কিছুতেই আসতে দি না। বলব দিয়ে বলল, 'তুই খাঁড়া পুকুরি ছুটি তোকে যেতে হবে না। সেখি কর্তাবাবু সামনে বিবি কত আকারো করতে পারে।'

—'ওরা বুঝি সব ঘুরে ঘাঁড়িয়ে গেছেলিল এতক্ষণ।'

—'তা আর বলতে। সবাই ছিল দাঁড়িয়ে। ডাক্তার বাবু- উঠে আসতেই দূ দূর করে পাঠিয়ে গেল। -জান ওতোমি কেদার বাবু তোমার কাছে আসতে ওর না দিতে হয়েছে, না তা আর কি বেশ্যার জানব!'

—'কেন দিতে যাবে কি আছে? ওদের ও তো অনেক বড় বড় খোপ আছে।'

—'তা আছে। তবে কেদার বাবুর সাথে অন্যের তুলনা। কি বল তুমি

—'বলার আবার কি আছে।'

—'বলার নেই? কেদারবাবু হচ্ছেন মস্ত বড় ধনী লোক। ওকে যদি একন হাত করা যায় না, তা হলে আর কখন নেই। কারুর মুরোদ তো হোল না। আর আর হলেনই কি কম চেষ্টা করেছে। একমাত্র তুমিই ওকে আনে আনলে। ছিপে হবে ওদের। ছলে খুড়ো মন্ত্রর সব।

—'তোর আর অত পাকা পাকা কথা বলতে হবে না। তুই একরে বাড়ি যি একবার দেখা করে আয়। সকাই হয়তো চিন্তা করছে।'

—'চিন্তা করবে আমার জন্যে। বুঝি হাসলে'—বিভা চলে যাচ্ছিল।

ওতাসিনী তার হাতটা ধরে বলল। দাঁড়া একটুখানি। দেখি তোর পলায় হারটা কেমন মানায়। এটা যদি তোকে পরতে দিলাম।'

—'বিভা একেবারে অবাক হয়ে গেল। 'কি বলছ তুমি ওতোমি, ওর যে অনেক।'

—'দাম দিয়েই তো মূল্যবান জিনিস কিনতে হয় রে। তুই কি আমার মাসী। এটা নিতে তুই অস্বীকার করিস না যেন।'

বিভা অপলক দৃষ্টিতে ওতাসিনীর দিকে চেয়ে রইল। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো জলের ধারা।

১২

তিন দুই তিন মাস একদিন সকালে বেলা ওতাসিনীর ঘুমটা কেমন যেন ভেঙে উঠলো নিজেই এর জন্যে। সেই কবে নিমাইকে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিল। তারপর এ কয়দিনের মাঝে আর একবারও খোঁজ নিতে পারে নি। কে জানে সে কেমন আছে এ কয় দিন যে ভাবে কেটে গেল তাতে আর তার খোঁজ নেওয়ার অবস্থাও ছিল না। একটা প্রচণ্ড দুর্দিনের ঝড় গেল তার জীবনে। সে এখন যেন মনে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

দুপুরবেলা ঘেরে মেয়ে ওয়ে পড়ল ওতাসিনী। কিন্তু ঘুম এলো না। খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে বিছানার উপরে উঠে বসল। মনে মনে ভাবল নিমাইকে একবার দেখে আসলে হয় না। দুপুর বেলা তো ফুরিয়ে একবার বিকেল হয়। কে জানে এ ক'টা বছর।

তাড়াতাড়ি খাটের থেকে নেমে পড়ল ওত্তাসিনী। পায়ের দেওয়াল আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা বেঁধে নিল, কাপড়টা পরে নিল। এমন সময় বিভা এসে ঘরে ঢুকল। সর্বদাই হাসি খুশি চঞ্চল মেয়ে। আজ যেন একেবারে চুপসে গেছে। ঘরে ঢুকেই ওত্তাসিনীকে সাজা-গোজা অবস্থায় দেখতে পেয়ে বিভা যেন আরও নীরব হয়ে গেল। ঢোঁক গিলে বলল, 'কোথাও যাচ্ছ ওত্তোদি?'

ওত্তাসিনী তার কোন উত্তর দিল না। বিভার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল আজ তার কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। সস্নেহে তার হাতটা ধরে কাছে বসিয়ে বলল, 'আজ তোর কি হয়েছে বলতো?'

বিভার চোখের জল যেন এতক্ষণ একটা বাঁধের কাছে এসে আটকে পড়েছিল। হঠাৎ একটা বাঁধের দরজা খুলে গেলেই যেন প্রবল বেগে বেরিয়ে এলো। মুখের ওপর আঁচলটা চাপা দিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বিভা বলল, 'না কিছু হয় নি ওত্তোদি।'

ওত্তাসিনী সস্নেহে তার হাতটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'আজ তোর হয় খাওয়া হয়নি তাই মনে।'

বিভা উঠে উঠে মাথাটা নেড়ে বলল, 'না, আজ আমি আর আই নি ভাত খাব।'

'রাগ করে।' হেসে উঠল ওত্তাসিনী। 'তাই বল—আজ বুঝি খুব দুষ্টুমি করেছিস্নি, তাই না মাস্টার?'

—'আমি আর পারছি না ওত্তোদি। কোথা থেকে আর টাকা এনে দেব বলতো? পরীক্ষার বেঁচে যা রেজাল্টের করি তাতো নিজের জন্যে তুলে রাখি না। বাবা যে মাসের শেষে কাউকেই আমি ফিরিয়ে দিই না। মুখ বুজে সহ্য করি নির্বাচনে। তবু, তবু এইভাবে যদি আর আরও টাকা চায় তাহলে আমি আর কি করতে পারি ওত্তোদি। আজ বাবা পর্যন্ত বাড়তি টাকা না পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। —তাই না খেয়েই চলে এসেছি। যা তোর ঘরে পাস্নি খেয়ে নে।'

ওত্তাসিনীর হাসি ঠোঁটে ঠোঁটে মিলিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিশ্চলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিভার দিকে।

তারপর নিজেই উঠে গিয়ে কিছু খাবার এনে বলল, 'নে এটা তুই খেয়ে নে।'

বিভা কোন আপত্তি করল না। খেতে খেতে বলল, 'তুমি কোথায় যেন যাচ্ছিলে ওত্তোদি।'

—'যাবো, তাতে তুই আমার সাথে।'

—'কোথায় ওত্তোদি? খুশির রেখা ফুটে উঠল বিভার মুখে। বলল তুমি নিয়ে গেলে যাব। নিশ্চয়ই যাব।'

—'নিমাইকে দেখতে যাব। অনেক দিন দেখি নি রে।'

—'তাই তো।'

—'হ্যাঁ যাবি।'

—'সে তো বাড়ির বাইরে যেতে হবে। কর্তাবাবু যদি রাগ করে।

—'রাগ করবে কেন? তার গাড়িতে, তার ড্রাইভারই তো নিয়ে যাবে।'

—'তবে চল। তাইকে দেখে আসি সে।'

● ● ● ● ●

গাড়িতে চেপে বিভা তার স্বভাব সুলভ চঞ্চলতায় কখনও বা জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য আবার কখনও বা ওত্তাসিনীর হাতটা টেনে ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগল নানান প্রশ্ন। ওত্তাসিনীর কিন্তু ভাল লাগছিল না। যেমন যে তার ওর করছিল আর। তবু কখনও বা হ্যাঁ, কখনো বা হুঁ করে বিভার ঐ অফুরন্ত আবেগ ভালোর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল।

—'আচ্ছা ওত্তোদি তাই তো আমাকেও দিদি বলে ডাকবে। তাই না।'

—'ওত্তাসিনী হেসে ফেলল, 'কেন ডাকবে না? তুইও তার দিদি বই কি।'

—'আচ্ছা ওত্তোদি, তাইকে তুমি কেন্ ক্লাসে ভর্তি করে নিয়েছিলে।—এর মধ্যে আরো একটা ওপর ক্লাসে উঠে গেছে তাই না।'

—'দূর পাগলি, এই তো সে দিন ভর্তি করে নিয়ে এলাম। এর মধ্যেই কি নতুন ক্লাসে ওঠা যায়। পরীক্ষা হবে তবে তো উঠবে।'

—'পরীক্ষা, ও হ্যাঁ তাই তো। আচ্ছা তাই পরীক্ষায় পাশ করলে তুমি আমাদের খাওয়াবে তো।'

—'নিশ্চয়ই খাওয়াব। নিমাই আমার কত পরীক্ষা দেবে, কত পাশ করবে।'

—'ঠিক বলেছ ওত্তোদি। ও কত বড় বিদ্বান হবে। কত বড় চাকরী করবে তাই না।'

—'ওত্তাসিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি কি আর দেখে যেতে পারব রে।'

বিভা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা ওত্তোদি, তাইকে যেখানে ভর্তি করেছ, সেটা খুব ভাল স্কুল তাই না? -অনেক মেমেদের পড়ে।'

—'দেখতেই পাবি কত বড় স্কুল। ঐ তো এসে পড়েছি। এই যে দেখা যাচ্ছে।'

বলতে বলতে গাড়ী এসে থামল স্কুলের গেটের কাছে। দেওজী প্রসাদ গাড়ী থেকে নেমে দরজাটা টেনে ধরল। ওত্তাসিনী আর বিভা নেমে আসতেই একটা সেলাম ঠুকে বলল, 'কতক্ষণ কাজ আসব মাই জী।'

—'আসবেন' উত্তর দিল ওত্তাসিনী।'

● ● ● ● ●

বিরাট বড় স্কুল। সাহেবী কায়দায় তার গড়াওনা। সামনের 'লন'টার ভিতর দিয়ে তাড়াতাড়ি দু'জনে এগিয়ে চলল। ইস আসতে বড় দেরী হয়ে গেল। ওত্তাসিনী বলে উঠল, 'আর একটু আগে আসতে পারলে ভাল হতো। ছুটি হওয়ার আগে যদি অফিস ঘরে পৌঁছতে পারি তবে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না নিমাইকে।'

কিন্তু অফিস ঘর পৌঁছতে না পৌঁছতেই ছুটির ঘন্টা পড়ে গেল। কিল্ কিল্ করে বেরিয়ে এলো ছেলে মেয়ের দল ; ছোট থেকে বড়। সকলেরই এক রঙ্ এর জামা, এক ঢঙ-এর প্যান্ট। ওত্তাসিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। বিভা বলল, 'ছুটি হয়ে গেল ওত্তোদি। কি করে এখন খুঁজে পাবে তাইকে?'

—'তাই তো ভাবছি।'

বেশিক্ষণ আর খুঁজতে হোল না। নিমাইও বেরিয়ে আসছিল তার 'ক্লাস রুম' থেকে। দোতলার বারান্দায় নিমাইকে দেখতে পেয়েই ওত্তাসিনী চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'নিমাই, এই নিমাই।'

চেনা গলার ডাক শুনতে পেয়েই, ছুটে চলে এলো সিঁড়ি বেয়ে। পিঠে তার বই ভর্তি ব্যাগ। ওত্তাসিনীকে একেবারে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'ওঃ দিদি তুমি এতদিন বাদে তবে দেখতে এলে! সেই কবে আমাকে ভর্তি করে দিয়ে গিয়েছিলে আর আস নি।'

ওত্তাসিনীর চোখ বিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। দু'হাত দিয়ে নিমাই-এর মুখটা তুলে ধরে বলল, 'কেন রে, তোর বুঝি খুব মন খারাপ করছিল।'

—'তা আর বলতে। কিন্তু আমার ভাল লাগছিল না।

—'দূর বোকা, আমি তো ভাবলাম, তুই নতুন বন্ধু-বান্ধব পেয়ে আমাকে ভুলেই গেছিস।'

—'ইস ভুলবো কেন? তুমি তো আমার প্রথমের দিদি। তোমাকে কখনো ভুলতে পারি? চল আমার সহপাঠিদের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই—।'

—'তাই চল—।'

—'আচ্ছা আগে তাহলে আমি যেখানে থাকি, সেখানে চল।

আমার পাশে যে থাকে, তার একজনের নাম বাবলু, আর একজনের নাম শুভঙ্কর। আর ঐ দেওয়ালের পাশে যে থাকে তার নাম চিত্রগুপ্ত। তুমি কিন্তু ভুলিয়ে ফেল না। আচ্ছা বলতো কি, কি নাম বললাম।'

—'এই তো বাবলু। শুভঙ্কর আর, আর চিত্রগুপ্ত।'

—'যা দিদি ; তুমি ওদের নাম ধরে ডেকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেবে। ওরা ঘুনাক্ষরেও পারবে না তুমি ওদের নাম কি করে জানলে।'

—'কেন তাই হবে। বলল ওত্তাসিনী।'

—'আর একজনের সাথে কিন্তু তোমার আলাপ করে যেতে হবে, তার নাম বাসবী। কালকে ওর সাথে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। ও বলে কিনা, আমার নাকি কেউ নেই। আমি যত বলি, আমার দিদি আছে, ও বলে 'ধুৎ, তা হলে কি আসত না দেখতে।'—আজ আমি ওকে দেখিয়ে দেবো ; আমার কথা সত্যি না মিথ্যে।'

ওত্তাসিনী বলল, 'আদরীয় আজ বুঝি প্রথমই দেখতে আসবে।'

—'ধুৎ, প্রথমই না ঘন্টা। যা আসে ওকে দেখতে আর আসে কি, বাজখাঁই-কক্ষ কে। আমার কেউ আসে না বলে, ও বলে আমার নাকি কেউ নেই। ভারী পাজী। ঐ, ঐ যে বাসবী যাচ্ছে। —'বাসবী, -বাসবী।' চেঁচিয়ে দিয়ে নিমাই তাকে ধরে আনল ওত্তাসিনীর কাছে। বলল, 'এই দেখ আমার দিদিকে। তুই বলেছিলি না আমার কেউ নেই।'

বাসবী একটু যেন লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, 'তাই সত্যি সত্যি তাই বলেছি

নাকি? জানে মিসি ও আমাকে আজ মেরেছিল। বলে আমি ফেলে দিয়ে এসেছিলাম এসব কথা।'

নিমাই তাড়াতাড়ি বলল, 'না মিসি ; মিথ্যে কথা। কাল ও বলেছিল, আমি আর ও এক ক্লাসে পড়ি। কিন্তু আমি তো একটা ক্লাস উঁচুতে পড়ি।'

—'উঁচুতে না হাতি! জান মিসি ও পড়ে 'এ' সেক্সনে, আর আমি পড়ি 'বি' সেক্সনে, এক ক্লাস হোল না? ও কিছু জানে না।'

—'আই বলে ভেংচে দেখাল নিমাই।'

ওতাসিনী ওকে শান্ত করে বলল, 'তোমরা যদি ঝগড়া-আড়ি কর, তাহলে আমি কিন্তু এক্ষুনি চলে যাব।'

—'না, না, আমরা আর ঝগড়া করবো না। তুমি থাক।' একসাথে বলে উঠল নিমাই আর অসতী।

—'তোমাদের জন্যে আমি কত খাবার এনেছি দেখ :—খোকার বলে যাবে বল তো।'

—'অসতী তাড়াতাড়ি বলল, 'এই যে, এই প্যাটার ভেতর।'

—নিমাই আঙুল দিয়ে বলল, 'না মিসি, ওখানে পাখী পাহারা করে দিতে পারে। —ঐ-দিকে আসবার চল।'

ওতাসিনী বলল, 'দূর পাগলা ওখানে তো রোদ্দুর। আমি কিন্তু অসতীর সাথে যাব।

—'যাও যে, আমি কিন্তু যাব না ওখানে। নিমাই-এর মুখটা যেন ভার হয়ে গেল। তাই দেখে ওতাসিনী হাসতে হাসতে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বলল, 'রাগ করা না ছাতনি—।'

নিমাইও হাসতে হাসতে এসে বসল তাদের সাথে।

১৩

নিমাই-এর সাথে মেশা করে ওতাসিনী আর মিতা যখন ফিরে এলো, সন্ধে উতীর্ণ হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে।

সন্ধ্যা আরতির শঙ্খ হচ্ছে, কর্মী ঘন্টা খোলকের আওয়াজ। সাথে মৃদু বিজ্ঞেতার হাঁকাহাঁকি। রোকেয়া মঞ্জরীকে বিদায় দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মঞ্জরী বলে উঠল, 'কি মাসী, ছেলেদের মিসি তুমি ফেরেনি এখনো? তা তিনি গেছেন কোথায়?'

রোকেয়া বিরক্তিতে বলে উঠল, 'তুই থাম দেখি। কেবল বোকা বোকা কথা। সে গেছে তার ভাইকে দেখতে।'

—'ভাইকে দেখতে? খিল খিল করে হেসে উঠল মঞ্জরী, 'ভাই বল। ও মেয়েদের জিনিস কি আর আমাদের হয় মাসী? পরেরও যাবে, তবুও ছুঁয়োবে।—তুই এক বেল বাইয়ে দিয়ে আসলে পারতি কি?—চিরাচরত না ঠিক সন্ধ্যেই এসে যাবে।'

চন্দ্রা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, 'আমা ভাই-এর সঙ্গে কথা বলে? কল পাবার সঙ্গে —এই অসুখলা, অসুখলা-কথা কি।

—'তোদের কি রে মাসী?' রোকেয়া বলে উঠল, 'যাবে একশো বার যাবে। যেখানে ইচ্ছে যাবে।'

—'মেয়েরা যাবে মাসী? কাতরে কাতরে প্রশ্ন করল ওতাসিনী।'

ওতাসিনীকে দেখতে পেয়ে চন্দ্রা একটু পিছনে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'এই আমাদের ওতাসে গেল নাকি।'

—'গেল তো ভারী বয়েই গেল, বলে উঠল মঞ্জরী।'

রোকেয়া এগিয়ে এসে বলল, 'বসি, তিনি রোকেয়া এতক্ষণ। ঘরে এসে কেবার ঘরের ঘড় দেরক বলে আমার বিকেল থেকে। আর তুই বেপাত!' হঠাৎ মিতার দিকে নজর পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'এই তুমি রোজও ঘরিয়ারী। কালকেও মেয়ে আপ এসে ফেঁদে গেল টাকা টাকা আনে, আর তুই এই সন্ধের আগের ছেড়ে ভিন খেলি যাইবে।'

—'আমা ওর দোষ কি' বলে উঠল ওতাসিনী, 'আমিই তো ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম।' এবার চলতো ওপরে—।'

—'হ্যাঁ চল। ওপরে গিয়ে তোর জামাকাপড় পালটিয়ে চুলটা একটু বেঁধে নিবি আবার।'

—'ও মাসী, সে আবার কি জন্যে?'

—'সে আবার কি জন্যে আবার। তুই কি এই পোষাকে যাবি নাকি কেবার ঘরের আছে?'

—'সেজে গুজে আমি মেজ মেজ মেতে পারব না। তাতে আসে আসবে, না আসে না আসবে।'

জল্পনে বলতে ওতাসিনী ঢুকে পড়ল তার ঘরে।

কেবার ঘর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এই যে ওতাসিনী এসে গেছে।'

ওতাসিনী হাতটা নাড়িয়ে বলে উঠল, 'অনেকক্ষণ এসেছেন? বড্ড কষ্ট হয়েছে বো!'

—'না, না কষ্ট হবে কেন। তবে তোমার হাত ধেকে পানীয় পেলাম না এটাই বড় কষ্টের।'

ওতাসিনী মো মো করে হেসে উঠে বলল, 'ও এই কথা। তা আজ কেনো চলবে-দেবী না বিকেলী।'

—'একটু কড়া জিনিষ। বড্ড হাওা লেগেছে। ব্রান্দিয়ান মাল দাও।'

—'আচ্ছা তাই দিচ্ছি। —এই, এই নিন। মদ ঢেলে মদের গ্লাসটা এগিয়ে দিল ওতাসিনী।

মদের গেলাসটা হাতে নিতে নিতে কেবার ঘর বলল, 'আজ তুমি কোথা গেছিলে বলতো ওরো। মেজ আমার জন্যে বসে থাক। তাই আমি ভাবলাম যা না হয় আমি একটু আগে আগেই যাই। যার আজকেই দেখি তুমি বাড়িনেই।'

একটা হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে ওতাসিনী বলল, 'আমরা বুঝি দিন রাতদিনটা-মেহ কেঁচে যাই। আমাদের আবার ঠিক থাকে নাকি? সময় অসময়? এক জায়গায় বসে ছিলাম, তাই গিয়েছিলাম।'

—'বুঝতে পেরেছি ; আমাকে না বললে তোমার চলে না।'

—'না ছাবব কেন? সত্যি কথা আপনাকে বললাম।'

—'আচ্ছা এই আপনি, আপনি বলাটা তুমি এখনো ছাড়তে পারলে না। দেখ আমি তোমাকে কত আপনার করে নিয়েছি।

—'ও আচ্ছা, আপনি না বলে তুমি বললে সাক্ষাৎমি আমাকে খেয়ে ফেলে না।'

—'হে, লক্ষণ! এ ; না, না সে অমন নয়। আর একটু একটু রাগ করছো যে, আর ওসবে কি চলে নাকি?'

—'এই আবোল তাঁর কথা শুনবেন না তো, আর কথা শুনবেন।'

—'কেন তোমার কথা।'

—'উঁ, ই অভ্যেস ভিন্ন ভাল নয়।'

—'আচ্ছা তো দেখে অনেক কিছুই বলে না, তাতে আমার কি এসে যা —এবার বল তো ওরো আজ ঐ অফিসের কাজ থেকে কত টাকা পেলে?'

—'টাকা কিছু এখনো পাইনি। তবে অনেক কিছু তার থেকে পাব বলে আশা করছি।'

—কেবার ঘর একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, 'অনেক কিছু পা বলে আশা করছ? —এমন কোনো আজকাল আছে নাকি? এই নাও, এই না আমি তোমাকে দিচ্ছি অনেক।'—কেন কয়েকটা টাকার বান্ডিল ছুঁড়ে দিল কেবার ঘ

—'আ-হা-হা, এত, এতগুলো টাকা দিয়ে দিচ্ছেন।

—'এই দেখ, টাকা নিতেও তোমার আপত্তি? এ পরিচয়ে এমনটি আর কাউ দেখাবে না। নাও, তুলে রাখ—তোমাকে দেব তা আবার হিসেব করে দিতে হ নাকি।'

ওতাসিনী একগাল হেসে এগিয়ে এসে তুলল কেবার ঘরের কাছ। তার হাত চেপে ধরে বলল, 'অনেক হয়েছে। আর এখন না খেলেই কি নয়। খেয়ে বাড়ি গিয়ে একটা বিশ্রাম করে ঘুমিয়ে পড়বেন।'

কেবার ঘর যো যো করে খানিকক্ষণ হেসে নিল, 'আমার সে তো আর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। আর আমার স্ত্রী লক্ষ্মী তো তার মেয়েটাকে বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই বিনা মেঘে বড় হচ্ছে। তাদের এইসব অনাবিষ্টি কাজ দেখলে যে কখন ধরে মেরে পারে। —আচ্ছা তুমিই বল, বাপের একটু আবটু মেজ-টেজ দেখে কি কারো মেয়ে খারাপ হয়ে যায়।'

—'না, না যত সব ছোট কথা, ওতাসিনী বলল।'

কেবার ঘর একটু এগিয়ে এসে ওতাসিনীর হাতটা চেপে ধরে বলল, 'সা জানি ওরো। এইটুকু জীবনে কত নাইকেই তো তোগ করলাম, কিন্তু তোমার সা কারোর মিল চলে না। তুমি, তুমি আমাকে কথা দাও যে আমাকে ছেড়ে—।' জল্প

জন্যে ওত্তাসিনীকে জড়িয়ে ধরে কেদারের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে গিল রেবার ঘরে।

ওত্তাসিনীর সারা শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'সে আর জানতে!—কিন্তু রাত যে আজ অনেক হয়ে এলো। আপনি বাড়ি যাবেন না?'

কেদার রায় হাত ঘড়িটা দেখে, হেসে উঠে বলল, 'অনেক রাত কি বলছ গো। এই তো সবে দশটা।' 'তা হোক, আজ আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।'

কেদার রায় যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। বলল, 'তাই নাকি?—এই, এই দেখ কি বিপদেই না তোমাকে ফেললাম এতক্ষণ।—আমি তাহলে এখন যাই। কাল আবার আসব।'

ওত্তাসিনী মনে মনে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'সেই ভাল।'

কেদার রায় বেরিয়ে যেতেই ওত্তাসিনী ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। পরীক্ষাটা এগিয়ে দিল বিছানায়। এতক্ষণ যে ভয়ঙ্কর কথাটা ওর বুকে ওঠানামা করছিল, সেটা এখন প্রবল বেগে বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিল চোখের পাতা।

১৪

সমস্যার দুর্নিপাকে পরে সব কিছুই একটা সময়ে সহ্য হয়ে যায়। মোহমদ-রাসী, চন্দ্রা, কমলা এমনকি মরজীও সহজ হয়ে এসে ওত্তাসিনীর কাছে। কেদার রায় আসে, যায়। কাত্তিচন্দ্রের টাকা আসল করে। নিমাই স্কুলে পড়ে। একবার পর একটা পরীক্ষার পাস করে নতুন ক্লাসে ওঠে আর ওত্তাসিনী একবার পর একটা প্রিন্টি মুখের অনুরোধ করে যায়। রিতা সেদিন একেবারে নাছোড়বান্দা। আনন্দটা যেন ওরই সব থেকে বেশি। কবে রেজাল্ট বেরুবে ঠিক সে খবর জেনে, ওত্তোসিকে না বলেই একা একা রায় নিমাই-এর আগে। সুখবরটা নিয়ে এসেই ওত্তোসিকে পাগল করে দেয়। বলে, 'এবার তুমি ওওয়ানের বন্দোবস্ত কর ওত্তোসি। গতবার তুমি দু-একটা জিনিস বাদ দিয়েছিলে; এবার তা হবে না কিন্তু।'

ওত্তাসিনী হয়তো তা বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু খাওয়াও বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। পত্তর খরিদে জোগাড়যন্ত্র করতে হবে।'

—'তাবে আমরা পিছু পা নেই। একবার তুমি অর্ডার দিয়ে দেখো না পত্তর আসছে কাহাঁ বিনা।'

চন্দ্রা বলে ওঠে, 'ঠিকই তো ওত্তোসি যে কি বলে তার ঠিক নেই। পত্তর ঘটানোর কথা আমাদের আবার বলতে হবে।'

আহত্তে রিতা আবার, 'মেনুটা তৈরি করে ফেলি।'

ওত্তাসিনীও হাসতে হাসতে সায় জানায়। নিমুর পড়ার ঘরেও বসে কথা।

এমনি করে হাসি-ঠাট্টায় কেটে যায় দিন-মাস-বছর। কিন্তু ওত্তাসিনী ভেতরে ভেতরে কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল। নিমাই যে কবে বড় হয়ে চাকরি-বাকরি করবে; কবে যে ওকে নিয়ে দেখেশুনে একটা বিয়ে দেবে,—ওত্তাসিনী তাই ভাবে। এমনি দু-একটা পাকা চুল তুলতে তুলতে রিতা বলে,

'এ কি ওত্তোসি তুমি দেখছি বুড়ী হয়ে গেলে।'

—'ওত্তাসিনী হেসে বলে, 'তা হবে না। চুলের আর দোষ কি। বয়সটা তোর আর কম হলো না।'

—'রিতা ঠোঁট বেঁকে ওঠে, 'ও কথা আমাকে বলতে হবে না। বয়সটাকে কম না হতে দেওয়াই বিধান। এই যে চন্দ্রাদি, কমলাদি ওরা সব তোমাকে দিদি বলে আমাকে বলেই কি বিশ্বাস করে বিতে হবে এদের বয়স কম?'

—'আচ্ছা, হবেও তো পরে।'

—'হয়ে কথা তুমি আর বল না। আসলে তোমার চিন্তার চিন্তার এমনটা হচ্ছে। আচ্ছা ওত্তোসি-' রিতার গলার স্বরটা একটু নেমে আসে, 'তাই-এর জন্যে তোমার মন চিন্তা হয়, তাই না ওত্তোসি?'

—'ওত্তাসিনী সস্নেহে রিতার কাঁধে হাত দিয়ে বলে, তোর কি মনে হয়?'

—'সে কথার যেন উত্তর দেয় না রিতা। বলে, 'তাই একটু দাঁড়ালেই তুমি সেখানে চলে যাবে তাই না ওত্তোসি।—নতুন করে সংসার পাতবে। শুরু করবে নতুন জীবন।'

ওত্তাসিনীর চোখ দুটো যেন জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো। বলল, 'মনে মনে তোরা তো ইচ্ছে যে যেন ; কে জানে শেষ পর্যন্ত তা সত্যি হয়ে উঠবে কিনা।'

রিতা আবার নিজে বলে, 'নিশ্চয়ই হবে। আমি জানি ঠিক হবে ওত্তোসি। কিন্তু আমার কথাটা মনে—মৃত নেই, ভবিষ্যৎ নেই—যেমন অন্ধকারময় জীবন। সামনে যেন আশার আলোও নেই।'

—'যেন থাকবে না রে। তোর মা আছে। ঘর আছে। তাই যেন আছে। কিসের চিন্তা তোর।'

—'আমার সব থেকেও কেউ নেই ওত্তোসি। মা যে সং মা আর কত। দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আর বয়সও তো অনেক হয়ে গেল। এখন যে তেমন আর নড়া চড়াও করতে পারে না।'

—'তোর তাই পড়াশোনা করে না।'

—'না তাকে আর কেবলো গেল না কু-দম থেকে। সেদিন ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল—পকেট মারার দায়ে। মান হাতে পায়ে ধরে যেন কষ্টে ছাড়িয়ে এনেছে। সবেতে অজয় অনীন। তার উপর—।

—ওত্তাসিনী কি বলে যে সান্ত্বনা দেবে রিতাকে ভেবে পেলো না। কেবল সস্নেহে টেনে নিল বুকের মধ্যে। পূর্ণ যৌবনা রিতা, ছোট্ট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, সেই কান্না আর জমতে চায় না।

● ● ● ● ●

ছারদী প্রসাদ ইদানীং ডাকে মাঝেই আসে ওত্তাসিনীর কাছে। বলে, কথা বলে। আগের মত কৃষ্ণভাব আর নেই। এখন সে আলাদা মানুষ। সেদিন দুপুর বেলা ওত্তাসিনী তখন ছেলে দেবে সবে ওঠেছে। দরজা ভেজানো ছিল। নিঃশব্দে পা টিপে ঘরে ঢুকলো ছারদী প্রসাদ। ওত্তাসিনী তাড়াতাড়ি শাড়ি থেকে নেমে যতোদূর সম্ভব পর হয়ে একটা প্রণাম করে বলল, 'এস ভাই। হঠাৎ যে আজ এই সময়ে।'

ছারদী প্রসাদ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'তুমি ঘুমাচ্ছিলে ; তাহলে যাই এখন, পরে না হয় আসব।'

ওত্তাসিনী বাধা দিয়ে বলল, 'না, না, তুমি বস। দিনের বেলায় আমার ঘুম হয় না।'

এই বলে হাতে পাখাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও তুমি চেয়ারটায় বসে একটু হাওয়া খাও। আমি বরফ চট করে এক গ্লাস সরবৎ করে আনি।—যা গরম পড়েছে কদিন।' তারপর আবার প্রতিদিন দুপুরেই মোতসোলিং।

ছারদী প্রসাদ তার হাতটা ধরে বসিয়ে বলল, 'না, না তার ঘরে তকলুফ নেই। তাতো-ত্তে।'

ছারদী প্রসাদ আজকাল ওত্তাসিনীকে আর ওত্তাসিনী বলে ডাকে না। কাত্তিচন্দ্রের ভাল-বৌ বলে ডাকটা একদিন তার ভাল লেগে গিয়েছিল। সেই থেকে তাকে ভাল-বৌ বলেই ডাকে। হাতটা ধরে কাছে বসিয়ে বলল, 'তুমি এত দিনেও আমাকে ক্ষমা করতে পারলে না ভাল-বৌ। আমার অপরাধের পরিমাণ নেই জানি। কিন্তু তোমরা নারীরা তো চিরকালই ক্ষমা করে এসেছ পুরুষদের।'

ওত্তাসিনী তাড়াতাড়ি হাত দুটো ছারদীর উপরে রেখিয়ে বলল, 'ছি : ছি : অপরাধী কর না আমাকে। এ অবসর আপেক্ষেই লেখা ছিল। তুমি তো নিমিত্ত মাত্র।'

সব কিছুরেই তো আর ভাগ করে নেওয়া যায় না ভাল-বৌ। তাহলে মর্ম-কারণের সম্পর্কটা কি কিছু নয়?

—'না তা হবে কেন ; তবে অনেক সময় তো অনেক চেষ্টা করেও কিছু হয় না। আবার অল্প চেষ্টাতেই অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়। তখন দৈবকে ভাগ্য না বলে কি বলব বল।'

—'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এখানে তো আমার ভালর জন্যে কখনও চেষ্টা করিনে ; তবে ভাল মন্দ কি করে আপনি করব বল।'

—'না, না তোমার কথা নয়, আমি আমার কথা। আমাদেরই যদি খারাপ না হবে তবে এরকম ছিন্নমূলের মত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এসে পড়ে মরব কেন? আর আমাকে মা তো অনেক ভাল মনে করেই তোমার হাতে দিয়েছিল।'

—'কিন্তু আমি তো সে সময় ভাল মনে করে নিই নি তোমার।

আমার তো এক সময় দেখে সবই ছিল, —অর্থ, ছেলে, মেয়ে, পরিবার। এখন আর কেউ নেই। আছ সব যে যার মত আছে। আর আমি, এখানে একা। সব থেকেও আমার কিছুই নেই। কাউকেই আমি দোষ দিই না। এ আমারই কর্মফল।'

—'ওসব ওখানে তুমি আজকাল আর যাও না একেবারে।'

—'না, যেতে কেমন নিজেরই সংকোচ লাগে। মত বয়স কাছে ভাল-বৌ তত যেন ভিতরে ভিতরে মুষড়ে পড়ছি। তুমি, তুমি এক আশা করতে পার ভাল-বৌ।

ওত্তাসিনী বলল, 'কি বল।'

—'হাঁ, সেই কথাই বলব মনে করে এসেছি। আমি ঠিক করেছি এ বাড়ীর সবাইকে আমি ছেড়ে দেব ভাল-বৌ। ওরা সব আবার সুস্থ জীবনে ফিরে যাক। তুমি

আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবে ভাল-বৌ।'

ওত্তাসিনী যেন চমকে উঠে বলল, 'না, না, এ তুমি কি ঠিক করছ! অমন কাজ তুমি কখনো করো না। এতদিনকার আমের টাকা দিয়ে এক একটা পরিবারের ভরতপোষণ চলে কেউ আয়ে তুমি জান।'

দারকী প্রসাদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তা হলে।—ওত্তাসিনী বলল, 'তা হলে আবার কি। যেমন চলছে, সেই রকমই চলুক। তবে যদি কেউ কখনো চলে যেতে চায়। তখন তুমি আর বাধা দিও না।'

—'তুমি যখন বলছ তখন তাই হবে। তবে আমার একটা কথা তুমি অন্যথা করো ; -তুমি এ কাজ এখন ছেড়ে দাও ভাল-বৌ।'

ওত্তাসিনী একটু হেসে বলল, 'আর কটা দিন সময় দাও তুমি। এ কাজ আমি, আর কখন করব না।'

দারকী প্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার টাকা দিয়ে তুমি ভাই-এর পড়াটা চালাবে চাও না, তাই না ভাল-বৌ।'

ওত্তাসিনী বলল, 'আহা অমন করে বলছ কেন! তবে সেও তো প্রায় হয়েই এসো। আর কটা দিনের জন্যে কেন আর—।'

—'তা আমি বুঝতে পেরেছি। তা হলে তুমি আমার সেই ইচ্ছেটায় অন্তত। করো দিও না। —আমার বাড়িটা এখন তোমার নামে লিখে দিতে চাই। তুমি নিতে রাজী হও।'

—'এতো তাড়া কিসের? সে না হয় পরে লিখলেও চলবে।'

—'না পরে নয়। আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই দিয়ে যেতে চাই। হয়তো যার বেশি দিন বাঁচবে না। শরীর আমার ভেঙে পড়েছে। আমি চোখ বুজলে আত্মিকজন যদি তোমাকে ঠকিয়ে সব হাতিয়ে নেয়।'

—'ছি ! ছি ! আত্মিকজনের নামে অমন কখনও বলো না। ও আমার সঙ্গে কোনদিন কোন খারাপ ব্যবহার করে নি।'

—'তা অবশ্য করে নি। কিন্তু মানুষের মন, বিশ্বাস নেই কতক্ষণ।'

—'তা হোক। ওটা না হয় তুমি পরেই করো।'

—'তুমি কিন্তু মনে কিছু না ভাল-বৌ। তোমার নামে বাড়িটা লিখে দিলে, আমার সেখানে বাস করতে একটুও অপমান বোধ হবে না।'

—'না, না তার জন্যে নয়।'

—'তবে।'

—'এমনিই। দারকীপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তা কি পাবাস তুমি হতে পার ভাল-বৌ।

ওত্তাসিনী কি যেন বলতে যাচ্ছিল। ঘড়াম করে হঠাৎ দরজাটা খুলে বিভা ঘরে ঢুকে দেখে দারকী প্রসাদ। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দারকী প্রসাদ উঠে পড়ে বলল, 'আজ তা হলে আমি আসি ভাল-বৌ।

ওত্তাসিনী দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন এস।'

১৫

দারকী প্রসাদ চলে যেতেই বিভা আজব ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বলল, 'একটা জোর খবর আছে ওত্তোদি। এই মাত্র শুনে এলাম। কি বল তো।

ওত্তাসিনী হেসে বলল, 'এই দেখ, শুনে এলি তুই আর আমি বলব কি খবর।'

—'ভাই বি. এ. পাশ করেছে। তুমি খবর নিতে যাও নি বলে ভাই-এর সে কি রাগ। কিছুতেই বলবে না আমাকে খবরটা।'

ওত্তাসিনী একটু অবাক হয়ে জানালাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহা তাই তো। আমারই তো রেজাল্ট বেরোনোর কথা। তা চল এখনই চল ওর সামনে বসে করে আসি।'

—'হাঁ চল। আলীও পাশ করেছে একই সাথে। তবে একটা কথা ওত্তোদি, আমি কিন্তু ধরে ফেলেছি।'

ওত্তাসিনীর মুখটে বাধা মানল না। তবু একটু হেসে বলল, 'কি ধরে ফেলেছিস তুই।'

—'ভাই কিন্তু আলীর চেয়ে মার্কস্ কম পেয়েছে।'

—'আর আলী।'

—'মুখ ফাটে তো মুখ ফোটে না।'

ওত্তাসিনী হেসে বলল, 'যে, তুই এসব কথা এখন রাখ। চল ওদের দেখে আসি।'

বিভা বলল, 'হাঁ চল।'

অনেক কষ্টাকষ্টিতে গাড়ি এনে পাওয়াতেই ওত্তাসিনী বলল, 'সেওকী প্রসাদ আজ তুমি গাড়ী নিয়ে ফিরে যাও। আমার একটু ফিরতে দেরী হবে।'

বিভা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'বুৎ, কি যে বল! আজ ওদের সুসংবাদ নিয়ে তোমার ঘরে ফেরোনো মানে গাড়ি ফেরে তা নয়, তুমি গাড়ি ফেরে দিচ্ছ।'

ওত্তাসিনী হেসে বলল, 'ও আচ্ছা, আচ্ছা। তা হলে তুমি একটু দাঁড়াও সেওকী প্রসাদ। আমরা এক্ষুনি আসছি।'

নিমাই-এর ফোটোটা পর্যন্ত আর ফেলে যেতে ভোলে না। ড্রেসিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম 'সনে' একটা গয়নার নীচে দু-জনেরই পাওয়া গেল। আলীর পরীর ঘরে চাঁদুনি উপরে ঘুমটিয়া লাগিয়ে বসে আছে। আর নিমাই ফোকাস করে কিছু ফোকাসের চেষ্টা করছে। হঠাৎ দূর থেকে ওত্তাসিনী আর বিভাকে আসতে দেখেই নিমাই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঐ দেখ, দিদি আসছে।' আলীও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। তৎক্ষণে ওত্তাসিনী আরো এসে দাঁড়াতেই নিমাই দিদিকে প্রণাম করে বলল, 'পাশ করেছি, আমি বি. এ পাশ করেছি দিদি।'

ওত্তাসিনী হাসতে হাসতে নিমাইকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'হাঁ, শুনেছি।

নিমাই ঘটিচক্ষে করে বলে উঠল, 'হাঁ তা শুনবে বৈকি! কতক্ষণ হোল ফোন করেছে আর তুমি এখন এসে। শুনলাম তুমি নাকি ঘুমোচ্ছিলে।'

ওত্তাসিনী মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'এই দেখ বিভা বুঝি আমার নামে নালিশ করেছে।'

বিভা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। 'তোমার মনে এসে যদি খবরটা জেনে না যেতাম তবে সুখবরটা দেওয়ার আনন্দটা তো পেতাম না। কি বল আলীজী।'

আলীজী কোন উত্তর করল না। শুধু নীরবে একবার হেসে মাথাটা নীচু করল

ওত্তাসিনী তাড়াতাড়ি আলীর দিকে ফিরে বলল, 'এ কি আলীজী, তুমি আজ এত গম্ভীর কেন? আজ তো আনন্দের দিন। দুজনে একসাথে পাশ করেছ।'

নিমাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'দেখ না, আমি সেই থেকে ওকে বোঝাচ্ছি আর ও বলে কিনা 'আজকের দিনটা বড় ভাল। আমার হয়তো আর পড়া হবে না আমাকে হয়তো চাকরী খুঁজতে হবে।'

ওত্তাসিনী আলীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার চিবুকটা একটু তুলে ধরে বলল 'দূর বোকা মেয়ে, যা হবার তা পরে হবে। এখন আমার সাথে মিষ্টি মুখ কর চল।'

বিভা বলে উঠল, 'আজ কিন্তু ওত্তোদি অন্যে সরলে চলবে না। মোটা খ করতে হবে।'

ওত্তাসিনী বলল, 'না রে খাবা না, তোদের সবাইকে আজ আমি পেট পুরে খাওয়াব।'

● ● ● ● ●

'আব' এক এক করে 'অর্ডার সাপ্লাই' করে যাচ্ছিল। আর ওত্তাসিনী এক একটা করে ওদের হাতে তুলে দিচ্ছিল, কখনো বা নিমাই এর আর কখনো বা আলীর হাতে। খেতে খেতে ওত্তাসিনী জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে বুঝি তোমার বাবা-মা ও পড়াতে চাচ্ছেন না। তাই না আলীজী।'

আলীজী বলল, 'না ঠিক তা নয়। মায়ের পড়ানোর ইচ্ছে খোল আনা। কি আব্বা যেন আর চান না। তাছাড়া ভেবে তুলে তুলে আব্বার শরীরে আর কিছু নে তাই আলীপ্রসাদ যদি চাকরি-চাকরি কিছু একটা জোটানো যায়।

ওত্তাসিনী হেসে বলল, 'পাগলী ফোকাবার, আমার আব্বা-মা যতদিন বেঁচে আছে ঠিক টুকটুক করে টাকা পয়সা জোগাড় করে যাবেন। একটু ভুরে নিমাই-এর দি তাকিয়ে বলল, 'কেন মেয়ের কথা—কেমন আপনার কাছ দূর করার জন্যে চল করতে চায়। —আর তুই।'

নিমাই বলল, 'আ-হা-হা আমিও তো এখন থেকে খুঁজব। বি. এ. পাশ না কি সোজা কথা চাকরীর জন্যে বলা যায়।। —নতুন চাকরী হলে কিছু প্রথম তিন মাসকে আমার জন্যে ছাড়তে হবে বলে দিচ্ছি।'

ওত্তাসিনী বলল, 'শোন আলীজী শোন। তাই আমার আদরের ছেলেটি বলে দি সাত দিনের বেশি কিছু ছাড়তে পারবে না।'

নিমাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আ-হা-হা আমি তাই বলেছি নাকি! তুমি। তাই বানিয়ে বলতে পার।'

বিভা বলে উঠল, 'ওতোদি সত্যি পড়িয়ে গেল। কিন্তু যে!'

ওতাসিনী বলল, 'ও দাঁড়া ভাই যো। চল, একবার আমরা উঠি। ওরা ওদের তোড়জোড় করছেই—জগদ্ধী বলল, 'আজ আমাকে একটু ছুটি দিতে হবে। পাশের খবরটা মা-বাবাকে এখনো জানানো হয় নি।'

ওতাসিনী চমকে উঠে বলল, 'করেছ কি। এখনো জানাও নি? দিদীকে যাও। জানিয়ে এসো।'

চেয়ারকেন্ট থেকে বেরিয়ে জগদ্ধী নিমাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?'

নিমাই একবার ওতাসিনীর দিকে তাইতেই, 'ওতাসিনী বলল, 'যা ঘুরে আয়।'

১৬

কেদার রায়ের আর আগের অবস্থা নেই। সেই সুপ্রতিষ্ঠিত কারবার, টাকা-পয়সা, সুখের-স্বাস্থ্য, ঠাঁট-বাঁট সবই গেছে। আজার মধ্যে আছে শুধু পুরানো আভিজাত্যের গুমোর, আর পূর্বের আমলের বাড়ি খানা। তাও এক এক অংশ তার বিক্রি করতে করতে সব থেকে যে পুরোন অংশটা রেখেছেন তার থাকে কেদার রায়ের। মাঝের তলার ঘুঘর ভাড়াটে। সেই ভাড়ার টাকা কটা ভাড়াটেরা কেদার রায়ের হাতেও আজকাল দেয় না। দেয় লাবণ্যদেবীর হাতে। কেদার রায় সবসময়ই পড়ে থাকে নিজের ঘরে। পূজোনো সেই নেশা ধরানো জড়ি গুলোতে বাওয়া ঘুরে থাক এখন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতেই তার কষ্ট হয়। কিন্তু ঘরের নেশাটি এখনো বজায় রেখেছেন পুরো মাত্রায়। -তবে বিদেশীর পরিবর্তে এখন দেশী মদে।

সংসারের সব কাজ করতে হয় এখন লাবণ্য দেবীকে নিজের হাতে। প্রথম প্রথম অসহযোগের ফলে সকালের কাজ সারতে সারতে হয়ে যেত বিকেল। এখন সেটা এসে দাঁড়িয়েছে দুপুরে, -ঘরে এসেছে অনেকটা ধরতাই। আজের ফাঁকে ফাঁকে লাবণ্য দেবী ভাবেন, -কি ছিল তাদের সংসারের অবস্থা আর কোথায় এসে আজ দাঁড়িয়েছে। লোকে বলে নাকি স্ত্রীর দোষেতেই স্বামী অধঃপাত হয়ে যায়। কিন্তু আকাশ পাতাল কেবেও নিজের দোষটা যে কী তা তিনি খুঁজে পান না। যখন সকল নষ্টের খোড়া সেই কেদার রায়কে দেখলে এখনও কেমন মায়া হয়। নিজের ঘরে বসে থাকেন সব সময়। চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে, মুখখানি শুকনো। মদ খেতে খেতে লিভারের আর কিছু নেই। তবু ঘন্টার ঘন্টার মদ ছাড়া আর কিছু খেতে চান না।'

লাবণ্য দেবী এক একবার ভাবেন বাসন্তীকে এনে নিজের কাছেই রাখবেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার ভাবেন, 'না, না এ নরকের ছায়ায় ওকে এনে আর কষ্ট দেব না। ও, ও থাকে পড়ুক তার কলেজের হোস্টেলে থেকে।'

আজকে জগদ্ধীর রেজাল্ট বেরবে, এ খবর ও নিজে এসেই একদিন দিয়ে গিয়েছিল। তাই আজ সারা দিনই লাবণ্য দেবী একটু উত্তেজনার সঙ্গে কাটাচ্ছিলেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল। জগদ্ধীর তবু দেখা নেই। ঘরের কাজে আর মন বসলো না লাবণ্য দেবীর। জানলার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে। চঞ্চলিত রাস্তা। ওটি গুটি পায়ে কত লোকই হেঁটে চলেছে এধার থেকে ওধারে। দূর থেকে যেন সবাইকে মনে হতে লাগল জগদ্ধী অথবা নিমাই বলে।

শেষ পর্যন্ত যখন সত্যি সত্যি ওদের দেখতে পেলেন, তখন আনন্দ আর ধরে না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন নিমাইকে, 'তোমরা আজ আসতে এত দেরী করলে কেন বাবা।'

নিমাই উত্তর দেওয়ার আগেই জগদ্ধী এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল, 'রেজাল্ট বেরিয়েছে, আমরা পাশ করেছি মা।'

লাবণ্যদেবী আনন্দে গদ গদ হয়ে বললেন, তাই বলে এতক্ষণ ধরে চিন্তায় রাখতে হয় মাকে!

জগদ্ধী বলল, 'ও তো মোটে আসতেই চাইছিল না। আমি জোর করেই নিয়ে এলাম।'

নিমাই বলল, 'মিথ্যে কথা মাসীমা, জগদ্ধী বলল মিথ্যে কথা। তুমি ইচ্ছেত করছিলে না আমাদের বাড়ি আসতে।'

নিমাই কিছু বলার আগেই লাবণ্যদেবী বলে উঠলেন, 'এই দেখ, দুপুরটা কখন তোদের আর খেল না। এখন চল দেখি সব উপরে।'

উপরে ওদের নিয়ে গিয়ে লাবণ্যদেবী প্রথমেই কেদার রায়ের ঘরে ঢুকে বললেন, 'আজকে খবরটা দে জগদ্ধী।'

জগদ্ধী ছিটে ছিটে এগিয়ে এসে কেদার রায়কে একটা প্রণাম করে বলল, 'আমরা দুজনে বি. এ. পাশ করেছি বাবা।'

কেদারবাবু তখন মদের নেশায় বিভোর হয়ে। জগদ্ধীর কথাটা ঠিক শুনতে পারলেন না। অভিকষ্টে চোখের পাতা দুটো খুলে তাকিয়ে রইলেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

নিমাই-এর সামনে জগদ্ধীর এ অবস্থা দেখে জগদ্ধী যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তবু আর একবার বলল, 'এবার আমরা বি. এ. পাশ করেছি বাবা।'

'বি. এ.'—কথাটা কানে যেতেই কেদারবাবু চোখ দুটো যেন আরও বড় হয়ে উঠল। নড়ে চড়ে বসে বললেন, 'বিয়ে। আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, আর আমাকেই না জানিয়ে। এত বড় স্পর্ধা। কে, কে বিয়ে করেছে? এই ছোকরা?

—'বি : বি : কি আবোল তাবোল বকছ তুমি' এগিয়ে এসে বলে উঠলেন লাবণ্যদেবী। —ও নিমাই, নিমাইকে তুমি চিনতে পারছ না।'

—'নিমাই? ও, হাঁ। ভুল হয়ে গেছে কিন্তু মনে কের না বাবা।'

নিমাই বলল, 'না না মনে করার আর কি আছে! অনেকদিন আপনার খোঁজ নিতে আসতে পারি নি। কেমন আছেন?

একটু ম্লান হাসি মুখে টেনে এনে কেদারবাবু বললেন, 'আমার আবার কেমন থাকা। এই চলে যাচ্ছে কোন রকমে।'

তা তোমরা বি. এ. পাশ করেছ? শুনে খুব খুশী হয়েছি ; খুব খুশী। -কৈ জগদ্ধী গেল কোথায়। গালিয়েছে নিশ্চয়ই। তা পালাবে না। ও আ সন্দুক মেয়ে।'

কথাটা মিথ্যে নয় জগদ্ধী আগেই বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। প্রথম ঘরের এক কোনে বসে লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছিল। হঠাৎ নিমাই এসে প্রথম ঘরে ঢুকতেই তাড়াতাড়ি নিজেকে আড়ালে নিয়ে বলে উঠল, 'তোমার কিন্তু আজ রাতটা এখানে থেকে যেতে হবে।'

—'যা : তাই হয় কখনো। তুমি আজকে তোমার মার কাছে। আমার তো আর মা নেই। তা ছাড়া কিনা 'নেটিভে। ছাইয়ে ছাত ঠেকালে 'অশৌচ' হয়ে যাবে আমাকে হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

—'তাই বলে এখনই তুমি চলে যাবে নাকি? একটু বস। চা জলখাবারটা অন্তত খেয়ে যাও।'

—'তুমি পাগল হয়েছ? একটু আগে সবাই মিলে খেতে দিতে দিলে এতক্ষণ :—আজব জলখাবার।'

লাবণ্যদেবী এসে বললেন, 'তবু মুখেই চলে যাবে। এক কাপ চা অন্তত খাও।'

—'তাহলে তবু এক কাপ চা মাসীমা।'

—'আচ্ছা তাই-ই দিচ্ছি, বাবা।'

চায়ের টেবিলে বসে লাবণ্যদেবীর কথাগুলো শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে গেল। পথে বেরিয়েও কথাগুলো নিমাই এর মাথার ঘুরপাক খাচ্ছিল। —'ওঁনার কথা সমস্তই তোমাকে বলেছি বাবা। কিন্তু মনে কের না। —আমারও আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। শুধু ঐ মেয়েটা—ওর তো কেন দোষ নেই। ওকে যদি একটা সৎ পাত্রে দিতে পারতাম, তবে মরার আগে একটু শান্তি পেয়ে যেতাম।'

উত্তর দিতে পারে নি নিমাই। নীরবে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে।

হোস্টেলে এসে খেয়ে দেয়ে যখন নিমাই শুয়ে পড়ল তখন অনেক রাত। কিন্তু বিছানায় শুয়ে ঘুম আসতে চাইল না। একটার পর একটা চিন্তা যেন ভেসে আসতে লাগল মাথার মধ্যে।

—'চাকরি তাকে একটা খুঁজে বের করতেই হবে। যে করেই হোক। আর পড়াশুনো? অনেকে এম. এ. পড়ে। তাই পড়বে। তারপর? তারপর করবে জগদ্ধীদের অবস্থার। ফিরিয়ে এনে রাখবে। আর, আর যদি বিয়ে করতেই হয় করবে জগদ্ধীকে-।'

১৭

কেটেছিঁড়ে দিন হয়ে গেল বাসন্তী প্রণাম আর ওতাসিনীর খোঁজ নিতে আসে নি। ওতাসিনী ভেবেই রেখেছে আজকে ফেল হয়ে আসবে। সকাল কেটে গেল ভাবে বিকেলে আসবে, আর বিকেল কেটে গেলে ভাবে কালকে নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু বাসন্তী প্রণাম আর আসে না।

ওতাসিনীর নিজেরও আজকাল কিছুই ভাল লাগে না। সবসময়ই যেন কি চিন্তা করে। দিন দিন যে বুড়িয়ে যেতে আসছে।

বিভা প্রায়ই অভিযোগ করে, 'আজকাল তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ ওতোদি।'

ওতাসিনী পাল্টা প্রশ্ন করে বলে, 'কেমন আবার কি হবে রে। এক রকম আছি।'

বিভা বলল, 'না : আজকাল তুমি আর আগের মত হাস না। তেমন গল্প কর না।'

শুভাশিনী হেসে বলল, 'ও এই কথা। তা আমার মনে হচ্ছে না। এই বয়সে কি আর হেসে মানুষি -সাজে? তোরা এখনও হেসে মানুষ, তোদের এখনো মানায়।'

বিভা আর কোন উত্তর দেয় না। শুভাশিনীও ব্যাপারটা বুঝিয়ে অন্য কথা পাড়ে। কিন্তু নিজের কানে বিভা আর ফাঁকি দিতে পারে না।

এমন কি নিমাই-এর যৌবনও যেন কিছু দিন নিতে পারে নি। বিভা মাঝে মাঝে ভাবে। ও-ই খবর নিয়ে আসে এক একদিন এক একটা। সেদিন এসে বলল, 'ভাই হচ্ছে হয়ে চাকরি খুঁজছে। পড়াশুনোয় তেমন আর করে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'পড়েশুনে কি হবে। চাকরি পাওয়া যাবে।'

শুভাশিনী বলল, 'ঠিকই তো, কত বি. এ.—এম. এ. পাশ সব পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা চাকরি যদি যোগে মন কি। নিজের পায়ে তো একদিন দাঁড়াতে হবে।'

—'কিন্তু ভাই বলে এম. এ. টা পাশ করে নিলে তবে খুঁজলে হোত না।'

—'কেন ও কি ভর্তি হয় নি। —আসরী ওকে কিছু বলে না।'

—'আসরীর সাথে তো ওর প্রায় রাপারাপিই হয়ে গেছে এই নিয়ে।'

—'শুভাশিনী একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি। তা, তা রাপারাপি আগে হয়ে যাওয়াই ভাল।'

—'বিভাও হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, 'তা ঠিক কথাই বলেছো শুভোদি। - আসরী ভর্তি হয়েছে দুপুরে। আর নিমাই যেন দাঁকে রাত্রিতে ভর্তি হয়ে সারা দুপুর চাকরী খুঁজতে বেরুল।'

—'তাই বল ভর্তি তাহলে ঠিকই হয়েছে।'

—'হাঁ তা হয়েছে বটে। তবে আজকাল জান যেমন যেন একটু পরীর হয়ে গেছে। কথা মার্তা বিশেষ বলে না।'

—'ওটা কিছু নয়। বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে একটু একটু করে। ওটা তালই লক্ষণ। এতদিন তো কলেজে পড়ার সময় ভেবে এসেছে এই করবে, সেই করবে ; এখন একটা চাকরি খুঁজতে গিয়েই বুঝতে জগৎটা কি।'

—'তা তুমি ওর জন্যে একটু ভাল দিনেই তো ওর আর এত ফাই করতে হবে না।'

—'যানি আবার করতে বলব।'

—'কেন তোমার সাথে কত বড় বড় লোকের জানাশোনা ; তাদের যে কোন একজনকে বললেই তো একটা কোন গণ্ডা চাকরি হয়ে যেতে পারে।

শুভাশিনী কোন উত্তর দিল না। একটু ম্লান হেসে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিভার দিকে। বিভা একটু আমতিয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'কি হোল এমনভাবে চেয়ে আছ।'

—'না এমনি। ওদের কালে চাকরি হয় ঠিকই। কিন্তু তাতে নিমাই কি কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে মনে করিস।—কেন মিনও না।'

—'কেন পারবে না? ওর ডোমেস্টিক কোয়ালিটি।'

—'ওর দোষ নাই বা বললাম। ওরা বিবি তো আর লোকের চোখে দোষমুক্ত নয়। সে যে এখন নষ্ট মেয়ে মানুষ।'

—'এই নষ্ট হয়ে গেছে তো তোমার দোষ নেই।'

—'নাই বা বললাম। তবু সব কিছুতেই দোষটা বর্তাবে এসে মেয়ে মানুষের উপরই।'

—'তাই বলে তোমার দোষে তোমার ভাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আর যে ছেলেগুলো তোমার কাছে মজা লুটতে আসে, তারা বড় বড় জায়গায় দখল করে মাথা উঁচু করে চলবে সমাজের বুকে।'

—'হাঁ চলবে যতদিন না সমাজে পরিবর্তন আসে। ওদের ছেলে আছে, বৌ আছে। ঘর-সংসার সব আছে। সে যে এক বিরাট আড়ম্বর। তার অন্তরালে কত কিছে ঘটে যায়, তার কি কোন খোঁজ রাখে।'

বিভা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ হতেই চুপ করে গেল।

একটু পরেই বাচ্চিকেশন ঘরে ঢুকে বলল, 'ভাল-বৌ, আজ একটু বুড়ো মানুষকে দেখতে হবে। আর বোধ হয় বাঁচবেন না।'

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আবহাওয়াটা পালটে গেল। শুভাশিনী যেন চমকে উঠে বলল, 'সে কি। আমাকে একটা খবর দাও নি? কতদিন হয়ে অসুখ।'

—'তা কেন কিছুদিন হয়ে গেল। কতদিন বলি, তোমাকে একটা খবর দিই। কিন্তু বুড়ো আমার কিছুতেই রাজী নয়। তোমার কথা বলতেই বলে, 'না, না ওকে আর বিরক্ত করিস না। আমি যেদিন যাব, সেদিন খবর দিস।'

—'কিন্তু অসুখটা কি হয়েছে। ডাক্তারও কি দেখছে নি এতদিনে?'

—'না তাও দেখানো হয় নি। ডাক্তার ডাকার কথা বললেই আমা দিয়ে বলেন, 'বলল তো আর কয় ছোল না বাঁচি ; যার, একদিন তো মরতেই হবে। তার থেকে তুই আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দে।'

শুভাশিনী হেসে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'তাই বলে একটা লোক বিনা চিকিৎসায়, বিনা চেষ্টায় মরে যাবে। আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে।'

—'আর দেখতে পারলাম না বলেই তোমার কাছে ছুটে এলাম ভাল-বৌ। তুমি চল। আর দেরী করো না। তোমার কথাই বুড়োবাপার হয়তো একটু শুনতে পারে।

শুভাশিনী আর কোন কথা বলল না। তাড়াতাড়ি দু-একটা কাপড় জামা একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে বলল, 'চল।'

বিভা বলে উঠল, 'আমাকে নিয়ে যাবে শুভোদি?'

শুভাশিনী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুই যাবি।—না : থাক। যদি দরকার লাগে তবে পরে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাবো।'

● ● ● ● ●

তিন তলার বাসরী প্রসাদের সেই পুরোন বাড়ী। ওটা আগে কত সুসজ্জিত থাকত ; থাকত পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এখন আর তা নেই। শুভাশিনী এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কিইবেবার আসেনি আর এই বাড়িতে। বাসরী প্রসাদ অবশ্য অনেকবারই বলেছে আসার জন্যে। শুধু তাই-ই নয় এই বাড়িটাই কিনে দিতে চেয়েছে তার নামে কিন্তু শুভাশিনী প্রতিবারই ঘৃণা দিয়ে বলেছে, 'তাড়াহুড়োর কি আছে। তোমার নামে আছে থাক না। দিন দিলাই তো হচ্ছে খেলা আমার।' অভিমানটা যে কোথায় তা বাসরী প্রসাদের ও বুঝতে বাকী থাকে না, আর শুভাশিনীর তো নয়ই।

সেই জ্ঞান-অভিমানের কথা এখন আর মনে এলো না শুভাশিনীর। অনেকটা ঘড়াচেতনা হারাই ছুটল এসে বাসরী প্রসাদের ঘরে।

সন্ধে পরিয়ে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘরের ভিতর তখনও কেউ এসে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায় নি। এ-পাশে, ও-পাশে ছেঁড়া নেকড়ার টুকরো পড়ে রয়েছে জোনাকিতে হয়ত বা কফ-থুতু আর জোনাকিতে হয়ত মল-মূত্র। একটা বিশ্রী গন্ধ বেরিয়ে আসছিল ঘর থেকে।

শুভাশিনী ছুটে গেল খাটের কাছে। যেখানে অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে আছে বাসরী প্রসাদ।

মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে। কাঁপা গলা ধরে একটু কাঁদিয়ে বলে উঠল, 'আমি এসে পড়েছি। শুনছো, শুনছো? তুমি একবার তাকাও।'

অন্ধকারের মধ্যে দুটো চোখ যেন জ্বল জ্বল করে উঠল। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে জড়িয়ে যাওয়া কণ্ঠে বাসরী প্রসাদ বলল, 'কে?'

—'কে? তুমি চিনতে পারছ না? আমি শুভো, শুভাশিনী।'

—'হঠাৎ যেন বাসরী প্রসাদের শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসার চেষ্টা করে বলল, 'তুমি, তুমি এসেছ? তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম। কত কথা তোমাকে বলা বাকী। তুমি বস, বস।'

—'তোমার এ অবস্থা হয়েছে কেন? তুমি কত দিন ভুগছ? আমাকে এক খবর দাও নি কেন।'

—'কি কি হয়েছে আমার? -ও কিছু নয়। এখন আমি ভাল বোধ করছি খুব ভালো।'

—'ভাল? ঘরে একটা আলো জ্বালোনি, চারপাশে আবর্জনার স্তূপ। নিজে এরম অর্ধমৃত-এ যে নরক বানিয়ে বসে আছো।'

—'নরক? হাঁ তাই। কিন্তু নরকেও কি আমার স্থান হবে ভাল-বৌ?'

—'তুমি উঠে বসলে যেন, ওয়ে থাক। আমি সব ব্যবস্থা করে যেতেছি

—'কি কি ব্যবস্থা ভাল-বৌ? ডাক্তার ডাকবে? না, না ওসব দেরী আমার সইবে না। আমি তোমাকে মিনতি করছি ভাল-বৌ তুমি এখানে একটু বসো। আমার কথাগুলো তোমাকে বলে যেতে দাও।'

—'শুভাশিনী উঠতে চেষ্টা করেও আর উঠতে পারল না। দু-চোখ যে পড়িয়ে পড়তে লাগল অঝোরধারা।'

একটু থেমে নিয়ে ভারতী প্রসাদ আবার বলা শুরু করল। 'জান ভাল-বৌ আমি সব ঠিক ব্যবস্থা করে ফেলেছি। ভাক্তিচরণের মত লোক হয় না ভাল-বৌ। জান ও আমার কেউ নয়, অথচ ও আমার সকলের থেকে আপন। ও কোন আপত্তি করে নি তোমাকে মুক্তা ছাড়িয়ে নিয়ে যেতেও। ও কিছু চায় নি। তবু ওকে আমি হাজার বিশেক টাকা দিয়েছি। আমলকী সব তোমার। —তুমি তো ঐ বাড়িতে ওদের খবরা উঠিয়ে দিতে চাও না। তবে ভাক্তিচরণকেই ওদের ঐ মেয়েগোলায় চাষ উঠাতে বলেছি। ভাক্তিচরণ শুধু এই একটা কথাই তোমাকে বলে যেতে বলেছে। ওর-ও তো ধরস কম হোল না। এই বয়সে আর কোথায় যাবে। —ভালো-বৌ, তুমি কেন কথা বলছ না কেন ভাল-বৌ?—ভাল বৌ। কৈ তুমি, তুমি এখানে নেই?'

ওতারিনী আর বসে থাকতে পারে নি। করুণ অবস্থা দেখে ঘুরেফিরে শেষ হয়ে যাওয়ার জোগাড় আর দেরী নেই। তাই এখনো বাকি জীবনের থেকে শেষ কয়টা করা যায়।

সেই জন্যে ঘরে চলে গিয়েছিল। পূজোর ছবির ঝামেলায় ভাক্তিচরণ আর দেখা পেল না। নতুনের যে কে কোথায় তা তারাই জানে। ভাক্তিচরণকে নিয়ে তাই নিজেই চলে গিয়েছিল তিলোত্তমা-তে। ডাক্তার বাবুকে নিয়ে যখন ফিরে এলো তখন সব শেষ। ডাক্তারবাবু এসে শুধু ডেথ সার্টিফিকেট-টা লিখে দিয়ে নীরবে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

১৮

একটা যেন ঝড় বয়ে গেল মনের ভিতর দিয়ে। ভারতী প্রসাদ মারা যাবার পর থেকে দিন দিন যেন ওতারিনী কেমন হয়ে যেতে লাগল। এমন গম্ভীর, এমন শান্ত আগে কেউ কখনো দেখে নি। এমন কি বিভাও আজকাল আর আগের মতন, আবোল-তাবোল গল্প করতে সাহস পায় না। তবু প্রতিদিন দুপুর বেলা, ও একবার ঐ বাড়ীতে গিয়ে ওতোমণির খোঁজ নিয়ে আসে ; তার এ বিষয়ের নতুন খবর আবোল তাবোল নিয়ে আসে। সেদিন দুপুর বেলা বিভা এসে বলল, 'ওতোমি, আজ রোজ আর জেনো নিমাই-এর কথা থেকে ঘুরে আসি। ও আজকাল বেশ হাসেই চোখের জল ফেলে। নতুন চাকরী গেল। নতুন কথা বলল আজ তুমি একটা দিনের জন্যেও গেলে না সেখানে।

ওতারিনী একটু যে, আগ্রহের সাথে বলে উঠল, 'কি, কি বলছি। নিমাই আবার জন্যে চোখের জল ফেলে?'

—'তা ফেলবে না। সে তো তুমি আর দেখতে যাও না।'

—'তা এতই যদি কষ্ট হয় তবে আমাকে একবার দেখতে আসে না কেন।'

—'একবার কেন একশোবার আসতে চায়। কিন্তু তুমিই তো আসতে বারণ করেছ। তুই তো ওকে বলেছিলে, 'আমি যেদিন তোকে নিতে আসব, সেই দিন তুই এ বাড়ীতে আসবি। একা একা কখনো আসবি না এ বাড়ীতে।'

ওতারিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ও হ্যাঁ তাই তো। তা থাক, থাক। ওকে আর বাড়িতে এসে কাজ নেই।'

ওতারিনী একটু চুপ করতেই বিভা বলতে লাগল, 'সেদিন যেদিন ও চাকরীটা গেল, সেদিন অফিস করে এসে একেবারে তো ঠিকই করে ফেলল, তোমাকে এসে খবরটা দেবে। এক ঘুমিয়ে রিটি কিনে আনল। তারপর বলে কিনা, 'আজকের দিনটা অন্তত তুমি আমাকে বারণ দিও না বিভাদি। আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। এখন আর মাসীমাবাবু আমাকে বকতে পারবে না। আমি আর কি করি। তখন রাত্রি হয়ে গেছে। কে জানে কি এসে দেখে তার ঠিক নাই। শেষে এ-কথা সে কথায় ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাই।

'আবার যেদিন কর্তা মারা যাবার খবরটা গেল, সে দিন কি কান্না। তার পরের দিন থেকেই তো মাসা খুঁজতে লেগে গেল। বলে কিনা, 'দিদিকে এবার আমার কাছে এনে রাখব। আর না। অন্তত তুমি যত রাগ করেও এ পর্যন্ত এর বিপক্ষে যেতে না।'

ওতারিনী আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'জানি, বাবা। ছেলেই তো চাই। তাদের বিভা দেখ তো, আমার শরীরটা বিষয়ে দিন কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভাক্তিচরণ যেন বিশ্রী হয়ে গেছে। বলে কি ভাল-বৌ এ তুমি কি শরীর করে ফেলেছ। আমার কথাটা শুন। পশ্চিমের যেন ভাল জায়গা থেকে কিছুদিনের জন্যে একবার ঘুরে এসো। শরীর-মন দুই-ই ভাল হয়ে যাবে।'

বিভা বলল, 'ঠিকই তো। নিজের মুখটা তো আর নিজে দেখতে পাও না। একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখো তো, কি ছিলে আর কি হয়েছ।'

ওতারিনী একটু হেসে বলল, 'তুই-ও তো কম যাস নি।'

—'তা যেব না। ভাক্তিবাবু যখন জামসেদ শুদ্ধ কিছুদিনের জন্যে মধুপুর বা দেওঘর থেকে ঘুরিয়ে এস।'

—'হ্যাঁ, তাই-তাবছি ক-দিন থেকে। তুমু আমার সাথে যাবি।'

—'নিশ্চয়ই যাব। কবে যাবে বল।'

—'দাঁড়া অত তাড়াতাড়ির কিছু নেই। ভাবছি ভাওয়ার আগে নিমাই-এর বিয়েটা দিয়ে যাব। ওকে কে দেখবে। তারপর ঘুরে বেড়াব তীর্থের পথে পথে। সেখি মন কোথায় স্থিতি লাভ করে।'

—'তার মানে? তুমি কি এ-বিষয়ের পাট সব চুকিয়ে দিয়ে যাবে মনে করছ।'

—'আমি মনে করার কে রে? এমন -পেত্নী মেয়ে মানুষের মন। সারাজন কলহে ছত্তার সংসার। অন্ত তাকেই আবার মাঝার ঘরে না ফেরালে চলে না।'

—'তবে আর নিমাই-এর বিয়ের জন্যে এত তাগাদা কি?'

—'তাগাদা আছে বৈ কি। ওর বিয়ে দিয়ে অনেক দিনের জন্যে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াব। তারপর যখন ফিরে আসব। তখন নিমাই-এর তরা সংসার। আমি তার মধ্যে ঢুকে নিজেকে বিলিয়ে দেবার একেবারে।'

বিভা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তাই এর বিয়ে কি ঠিক করে ফেলেছ।'

—'না, না কিছুই ঠিক করি নি এখনো। তবে পাত্রী তো ঠিকই আছে।'

—'কে আবার।'

—'হ্যাঁ, পাত্রী হিসাবে ও মন্দ কি। আর ওদের দু'জনের মধ্যে যা ভাব দেখেছি, মনে হয় সুখীই হবে।'

বিভা কোন উত্তর করল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ওতারিনী আবার বলে উঠল, 'কি রে তুই যে চুপ করে রইলি, কিছু বলছিস না।'

—'না—। একটা কথা ভাবছিলাম ওতোমি।'

—'কি কথা।'

—'বাসন্তীর ওদেরই পুরানো অনেক কালের মানুষ। একসময়ে ওদের অবস্থাও ছিল মন্দ।'

—ওতারিনী সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল 'হুঁ। ঐ রকমই একবার শুনেছিলাম বটে। তাহলে তুই বলছিস নিমাই-এর সাথে ওরা ওদের মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হবে না।'

বিভা যেন একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়ে বলল, 'না, না, আমি সে কথা বলছিনা। তুমি কিছু মনে কোর না ওতামি।'

'কি মনে করবে না ভাল-বৌ? কাজে কাজেই ওরে ঢুকল ভাক্তিচরণ। বিভার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই তো বিভা দেখছি এসে গেছে, এইবার আমার কথাটা মনে করা ভাল-বৌ। ওতারিনী বলল, 'এই তো তোমার কথাই জানাচ্ছিলাম বিভাকে। -কিরে বিভা আমার সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে যেতে রাজী আছিস তো। —ভাক্তিচরণ বলছে আমার শরীরটা নাকি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিছু দিন কোথাও ঘুরে না আসলে আর ভাল হবে না।'

বিভা বলল, 'ঠিক কথাই তো বলেছ ওতোমি।'

ভাক্তিচরণ বলল, 'তবে আর কি ভাল-বৌ, আমি একরে তোমাদের যাওয়ার সব বোগাড় করে দিই।'

বিভা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তার আগে কাজিমা একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। তা না হলে নিশ্চিন্ত মনে ওতোমি আর বেড়াতে যেতে পারবে না।'

ভাক্তিচরণ বলল, 'কি কাজ?'

—'নিমাই—এর বিয়েটা আগে দিয়ে যেতে হবে।'

—'সে আর বেশি কথা কি। নিমাই এখন নিশ্চিন্ত হয়েছে, চাকরী করছে ; ভাল-বৌ বলুক না তুমি তুমি মেয়ে এনে আমি হাজির করছি।'

—'তুমি তুমি মেয়েকে তো আর বিয়ে করবে না। করবে একটা মেয়েকে। আর সে মেয়ে ঠিক আছে।'

—'তবে তো আর কোন চিন্তাই নেই। পাত্র-পাত্রী যেখানে ঠিক আছে, সেখানে বিয়ের জোগাড় তো এক দিনেই করা যায়।'

—'তা হলেও যায়। কিন্তু তবে বিয়ে হবে সেই তারিখটা তো আর তুমি আমাকে বিয়ে সব কথা আগে আগে জানি।'

ওতারিনী যেন চমকে উঠে বলল, 'আমি? না, না আমি যাব না। শেষে কোথা কি হয়ে যাবে। তুমি বরঞ্চ বিভাকে নিয়ে যাও।'

বিতা বলল, 'তাই-ই না হয়ে চলে যাবিনা, ওতোমি যখন রাজী হচ্ছে না যেতে।'

কার্ত্তিকদা বলল, 'আচ্ছা বেশ। কালকে তাহলে তুমি তৈরি থেকো। আমি তোমাদের নিয়ে যাব।'

১৯

লাবণ্য দেবীর সাথে কথা বার্তা বলে বিতা আর কার্ত্তিকদা যখন বেরিয়ে এলো তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। পথে পথে তত হয়েছে আলোকিত পসরাদারীর আনাগোনা। সবাই তখন ছুটে চলেছে যে যার নিজের কাজে। তবু তারা মুহূর্তেই যেন ঠিক মানুষ পরিণত হয়ে এগিয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে।

কার্ত্তিকদা বলল, 'সবকিই তো ঠিক করে এলাম বিতা। কিন্তু একটা কথা বড় ভাবিয়ে তুলছে।'

—'বিতা জিজ্ঞেস করল 'কি কথা কার্ত্তিদা।'

—'তাল-বৌ যখন তনয়ের রাজী হোসের মেয়ে তখন ও নিজেই কি রাজী হবে বিয়ে দিতে।'

—'সে কথা আমাকেও বড় ভাবিয়ে তুলেছে কার্ত্তিদা। কিন্তু তুমি জান না, এই রাজীর সাথে নিমাই-এর বিয়ে দেবে বলে তিন তিন বার ওরে আপনার মতন করে পড়ে তুলেছে ওতোমি। এ বিয়ে যদি না হয় তবে। ওতোমি যা আঘাত পাবে, তা হোসের আর জোড়া লাগবে না।'

কার্ত্তিকদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিকই। কিন্তু—।'

—'কিন্তু, আমার মনে হয় কি জান, বলে উঠল বিতা, 'ওতোমি হোসের জানতে পেরেছে নিমরাজা। তাই আমাদের সাথে এ আড়ি আসতে রাজী হোল না।'

কার্ত্তিকদা বলল, 'হোসেও তা পারে। কিন্তু তাল-বৌ রাজী হলেও হোসের রায় কিছুতেই রাজী হবে না।'

কথাটা শুনেই বিতার মাথার শিরা গুলো যেন দপ দপ করে উঠল। বলল, 'কি? হোসের রায় রাজী হবে না? যে হোসের রায় একসময় ওতোমির জন্যে পাগল হয়ে সব কিছু বিসর্জন দিতে চেয়েছিল : আর যে ওতোমি রায় মার চেয়ে করে তাকে ও পথ থেকে ফিরিয়েছে, তার ভাই-এর সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে রাজী হবে না।-হতেই পারে না।'

কার্ত্তিকদা হেসে বলল, 'কিন্তু এরকমই হয়। দেখলে না, বিয়ে কন্যাকর্তা সব লাবণ্য দেবী বলেছেন। হোসের রায়ের সাথে যখন দেখা করার কথা বলেছিলাম তখন লাবণ্য দেবী প্রতিবারই বলেছেন 'ওকে না হয় আমিই সকল কথা বুঝিয়ে বলব। আপনাদের আর যেতে হবে না।'

বিতা বলল, 'হ্যাঁ তা ঠিক। কিন্তু আপত্তি করার কথা হোসের লক্ষ্মণদেবীর। তা নয় তিনি রাজী হলেও, আপত্তি করবে হোসের রায়।

কার্ত্তিকদা বলল, 'হ্যাঁ, তুমি দেখে নিও : শেষ পর্যন্ত হোসের রায়ই বেঁকে বসবে এই বিয়েতে।'

আর হোলও তাই। সেদিন ছিল নিমাই-এর আশীর্বাদ করার দিন। বিতা কতকার ভয়ে বলল, 'ওতোমি আমাদের নিজের মানুষ। তুমি তাই-এর কথাতে যেও না। হোসের রায় আসবে, কে জানে হয়ত যদি বেঁকে বসে।—আশীর্বাদ হয়ে গেলে, বিয়ের পিঁড়ি থেকে হোসে তুলে নিয়ে যেতে পারবে না।

কথা গুলোই ওতোমিনীর নাক-মুখ যেন রাগে লাল হয়ে উঠল। তবু সংযত হয়ে বলল, 'তুই কি মনে করিস বিতা, তাই-এর বিয়ে আমি তোদের মত দেব? অমন বিয়ে আমি নাই বা দিলাম।'

বিতা বলল, 'না, সে কথা নয় হোসের রায় তো আমার মেসোমশাই মানুষ।'

—'তোক না মেসোমশাই। -আমি নিজে থেকে তো কোন কথায় যাই নি। -আমার সমস্ত কথাই না হয় তাকে খুলে বলব।'

—'খুলে বলার আর অবসর হোল না। হোসের রায় তখন ঘাটের উপর বসে নিমাই-এর সাথে কথা বলছিল, ওতোমিনী ঘরে ঢুকতেই হোসের রায় যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠে বলল, 'এ কি তুমি এখানে?'

ওতোমিনী কোন উত্তর দিল না। দীর্ঘদিন পরে হোসের রায়ের এই তার শরীর দেখে কেমন যেন মায়া হোল, ধীরে ধীরে নিমাই-এর কাছে গিয়ে পিঠে হাত রেখে বলল, 'নিমাই তো আমার-ই ভাই।'

মুহূর্তের মধ্যে হোসের রায়ের মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করল। তারপরে বিকৃত করে বলে উঠল, 'অসম্ভব।' তার অবাধ্য মেয়ের বিয়ে দেব কিনা একটা বেশ্যার ভাই-এর সাথে? এ অসম্ভব, এ আমি কিছুতেই হতে দেব। -মেয়ে আমি খাটকিয়ে রাখব। -দরকার হয় সারা জীবন তার বিয়ে দেব না। তবু পতিতবৃত্তি করার জন্যে -তোর হাতে আমি তুলে দেব না কখনও।'

নিমাই যেন একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ যে কি হয়ে গেল কিছুই সে বুঝতে পারছিল না। তবু তার সামনে, তার নিমিত্তে একজন অপমান হয়ে যাবে। এ-কথা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারল না। বিতল স্বরে এগিয়ে এসে বলল, 'এ আপনি কি বলছেন হোসেমশাই।'

—'হোসেমশাই।' বিদ্রূপ স্বরে বলে উঠল হোসের রায়, 'যা বলেছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। তোমার নিমিত্তে জিজ্ঞেস কর।'

হুকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হোসের রায়।

নিমাই তাড়াতাড়ি উঠে দরজা আগলে একবার তাকা দিতেই ওতোমিনী বলে উঠল, 'নিমাই।'

সে এক অসহনীয় কষ্টকর। সে স্বরের কাছে নতি স্বীকার করে ফিরে এলো নিমাই। কিন্তু বিস্ময় তখনও তার কাটে নি। সন্দেহে বলে উঠল, 'তুমি।-তুমি কোন প্রতিবাদ করলে না মিনি।'

—'প্রতিবাদ আমি করব কেন ভাই। এখন তো সবার কাছে আমার এই পরিচয়টাই সত্যি।'

—'সত্যি? কি বলছ তুমি।'

—'হ্যাঁ, সবই কিন্তু সত্যি। বড় ঘৃণা হচ্ছে এখন আমার উপরে ভাই না।'

নিমাই কোন উত্তর করল না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওতোমিনীর দিকে

ওতোমিনী একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগল, 'মা আমাকে রাজবী প্রসাদের সাথে বিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু রাজবী প্রসাদের কাছে এই বিয়েটা ছিল একটা ছলনা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য ছিল তার পাপ বাসনার জন্যে নতিনো জোগাড় করা। প্রথমে সেই কারণেই একজন নর্তকির মত। বলতে বলতে ওতোমিনীর চোখে জল এসে গেল। একটুক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলা শুরু করল, —মা বেঁচে থাকতে বোধ হয় কিছু বলতে পারে নি। মায়ের সম্পদ ছিল এক বিধবা। কোলে মাত্রসাত এক পুত্র। ঘরে উঠতি বয়সের কিশোরী মেয়ে। নিজের বয়সও তখন বুঝিয়ে যায় নি। বাড়ির অভিভাবক বোধ করে কত কথাই তো বলে। ঠিক সেই সময়ই রীনার-মা এসে মোহ উপকরণ করতে সেই ফাঁদে মা পা না দিতে পারল না। —রাজবী প্রসাদের সাথে আমার বিয়েতে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি তখন পুরোপুরি রাজবী প্রসাদের আয়ত্তে।

মার শরীর এরমধ্যেই ভেঙে পড়েছিল। তারপরে এই আঘাত সহ্য করতে পারল না। —রাজবীর ভোগেচ্ছার এক্ষেত্রে বেঁচে থাকার চেয়ে নিজেকে শেষ করে দেব। কিন্তু পারলাম না। মা মারা যাবার পরে তুই যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালি -তখন থেকেই আমি আমার সব ভাবনা বিসর্জন দিলাম। জান না হতেই কারুর হারিয়েছিলি। আর পুরোপুরি জ্ঞান না হতেই মা চলে গেল। একমাত্র অবলম্বন বিনি আমার এসে দাঁড়িয়েছিস্। সেই আমিই যদি চলে যাই ; তবে কোথায় গিয়ে তুই দাঁড়াবি ভাই মনকে শক্ত করলাম। তোকে মানুষ করে তোলবার জেদই আমাকে পেয়ে বসল। ভেবেছিলাম, রাওজার অঞ্চলে তোর বিয়েটা দিয়ে ছেড়ে পারব। কিন্তু তা-ও বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছেয় বিলম্ব।'

নিমাই একভাবে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। কিন্তু আর পারল না। ওতোমিনী হাত দুটো টেনে নিয়ে নিজের মুঠোর ভেতর একেবারে দুমড়িয়ে কেঁদে উঠল।

এমন সময় সন্ধেবে দরজা খুলে রাজবী প্রবেশ করল। চুলগুলো তার আলুথালু কাপড় অবিন্যস্ত। যেন সে ভূত দেখার মতো দিয়ে ছুটে এসেছে।

ওতোমিনী চমকে উঠে বলল, 'এ কি রাজবী তুমি।'

রাজবী ওতোমিনীর পায়ের কাছে বসে বলল, 'আমি চলে এলাম দিবি। -আমি তোমার কাছে চলে এসেছি। আর যে এ বিয়েতে আপত্তি করবে, আমি তা তা কুক্ষণে পেয়েছিলাম। আর আর তার আপত্তি নিয়ে। আমি মা-র অনুমতি নিয়ে চলে এসেছি তোমার কাছে। এখন তুমি আমাকে গ্রহণ করবে তো?'

ওতোমিনী যে কি করবে ঠিক করে উঠতে পারল না। আনন্দে তার চোখে জল এসে গেল। তাড়াতাড়ি রাজবীকে তুলে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি, আমি জানতে তুই আসবি রাজবী। জীবনে কি একটা দিনের জন্যেও শান্তি পাব নারে। তখন এমন নিষ্ঠুর কল্পনা হতে পারেন না। তুই, তুই আমার কাছে শান্তির আধার হয়ে এলি। আর তোরা মুহূর্তেই আমার দুরে আর। আমিই তোদের প্রথমতরে অপরাধী যদি।

জীবিকা

অমল রায়চৌধুরী

মাঝি কাঁধের ঝুড়িটা নেমিয়ে রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল দূরে বাবার দিকে তাকিয়ে। কি জানি মেয়েটা যার আসবে কি না। হয়ত না এলেই ভাল হবে। কি অধিকার তার ওই অপরিচিতা মেয়েটির কষ্টার্জিত ধন হাত পেতে নেওয়ার। কি সম্পর্ক ওদের এই কঠিন মেয়েটার সঙ্গে। কেন নির্লজ্জ প্রতীক্ষায় দুর্বল হোল ওর আগমন পথের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই নিজে অসহ্য ধিক্কার দেয় মাঝি। কত দুঃখ কষ্টেও ও কোনদিন কারোর করুণা ভিক্ষা করেনি, আত্মসম্মানের পুঁজিকুকুর আঁচিয়ে রেখেছে যত্নে। প্রসন্নময় বৈকালের নিলজ্জ ছায়ায় ও ভিল ভিল করে পুড়েছে। ক্ষণিক অসতর্কতা মুহূর্তে দুঃখ দারিদ্র্যের অধিকৃতে পরিণত হয়েও ও নিঃশেষ হয়ে যায়নি, ওর আত্মিমান পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি কখনো। নিজেকে ইস্পাতের মত কঠিন করে তুলেছে শুধু ওই মেয়েটার মুখ চেয়ে। অথচ আজ অনেক প্রভাব, অনেক সারাদিনের ঘড়ানো হাত ও নিঃস্বেচ্ছে ঘুরে সরিয়ে দিয়েছে কি এক অজানা শঙ্কিতে অন্ধ আজ। কোথায় গেল ওর অহংকার, সেই চেতনার আত্মসম্ভ্রমবোধটা। নিজেরেই নিজে প্রশ্ন করে-ঔত্তর খোঁজে। তবে কি ওর একমাত্র আশা ভরসা অজয়ের অকল্যাণ। ধরাশায়ী হয়ে যাওয়াতেই ও হার পড়েছে বিশ্বাসিনী। অন্ধ হয়ে অজয়ের সুস্থ সবল অস্তিত্বটাই ওর অহংকারের জড় হয়ে জমাট বেঁধে রেখেছিল সামাজের উর্ধ্বে জাগিয়ে। তাই অজয়ের এই সাময়িক অসুস্থতাই ওকে করে তুলেছে এতখানি দুর্বল, এতখানি অসহায়। আর তাই আজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়ের পথখানি ওকেই চায়, মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলতেই আশার আলো ওকে দেয় ঘরে মেয়েটার দেখা পাবার অপেক্ষায়। সাদা চর্মসির মত ফেন ঢেউ ভেঙে পড়ে আছড়ে।

এই সময় দাঁড়িয়ে [illegible] মাঝি দেখতে পেল দূরে, ঢেউয়ের মাথায় লাফিয়ে লাফিয়ে নৌকোটা এগিয়ে আসছে। ওদের নৌকোটা ছাড়া আরও অনেক নৌকো ঐদিক থেকে আসছে। কিন্তু ওদের নৌকোটা সবার আগে। ওর বুকের ভিতরটা হঠাৎ দুরুদুরু করে উঠল। ওর মেয়ে ফিরে আসছে। ওর মেয়ে ফিরে আসছে। ওর মেয়ে ফিরে আসছে

ওখানেই। তাছাড়া আমি তো আছি।

অজয় আবার একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল রুমকিকে। বলল না কিছুই। নিজের মনেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বেড়াতে লাগল দৃষ্টি। কত সহজে, নিমেষেরে মধ্যে ফেলতে পারল ওই মেয়েটা—"তাছাড়া আমি তো আছি," অন্ত অজয়ের মনে সে শক্তি নেই কেন? কেন অনেক তথা বলতে গিয়েও অবলীলায় ঠোঁটে আসে? ওর প্রতি কিসের টানে আকৃষ্ট হয়েছে মেয়েটা? অজয় তো নিছক-নিরীহ একটা মানুষ। কেন নিজের পরিচয়ের উপাদানের নিখুঁত ছাপ রেখে চলেছে ওর পিছনে, ওকে সচিত্রিত করতে? ওদের কিছুই করেনি মেয়েটার জন্য। তবু আজই ওর সম্বন্ধে জেনেছে, মনে হয়েছে অনেকের চেয়ে কোথাও একটা স্বাতন্ত্র্যের রয়েছে মেয়েটার মধ্যে। অজয়ের চেনা জানা এই স্বার্থপর রাজধানীর খোলই রুমকীকে ঢুকতে চেয়েও বুঝি ঢুকতে পারেনি আজও। এই ভেবে অজয়ের মনে পড়ে গেল রুমকীর সাথে তার প্রথম পরিচয়ের ঘটনার কথা—।

সেদিন সবে ও নিয়ে পৌঁছেছে ওর নির্দিষ্ট জায়গায়। হঠাৎই নজরে পড়ল ছুতরার সাব-ওয়ের মুখটাতে একটা উত্তপ্ত ঘটনা। মনটা স্বাভাবিক কারণেই খিঁচড়ে উঠল। এখন অফিস টাইম, ব্যাতেল লোকাল, বর্ধমান লোকাল, তারকেশ্বর লোকাল সব একের পর এক ছাওড়ায় ইন করতে আরম্ভ করেছে।

ট্রেনগুলোতে ঠাসাঠাসি ভিড়। কেন কয়েকটা কর্মী নিজেদের সুবিধার জন্য এই সময়টায়। তবুও উত্তেজনা ক্রমশ এগিয়ে গেল ওই ঘটনার দিকে। কাজে ফিরেও মুখতে পারছিল না অজয়ের আসল আকর্ষণটা। তবু অনেক দূরীর একসঙ্গে কর্কশ চিৎকার, চেঁচামেচি, গালিগালাজ আর এরই মধ্যে কতগুলো মুষ্টিবদ্ধ হাত বর্ষার বন্য পর্যবেক্ষণ বর্ষিত হচ্ছে ভিড়ের মিঠে পিঠি কেন প্রতীয় উপর। অজয় অনেক কষ্টে কয়েকজনকে লরির ঝুঁকে থেকেই নিচে উঠল। একি এযে ১০/১২ বছরের বাচ্চা মেয়ে—একজনের ব্যর্থ প্রয়াস করে একজায়গায় ওটিয়ে পড়া অবস্থায় রুমকীকে কিছু বলে বোঝাবার মত ক্ষমতাই নেই যেন। তবু একটা বিকৃত জোড়নির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। অনেক কষ্টে, অনেককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, মেয়েটা ট্রেন থেকে নেমে এদিকে যাওয়ার কোন রাস্তার টিকিন বৌটোটা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অসফল প্রয়াস করে এই জন্য-নিরাময়ের পরীক্ষে আবদ্ধ হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার সত্যাসত্য কোনও জোড় নেই, অজয় সত্য করল ওরাই বেশি মুখর, তাই তাদি মেয়েটার শাস্তির বিধান দিতে সোচ্চার। ঠাসিয়ে লম্বা করে দাও—পুলিসে দিয়ে দাও—হাতদুটো ভেঙে দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় অজয় একেবারে হতভম্ব। কি করা উচিৎ?—আগে কিছু করা উচিৎ কিনা স্থির করে উঠতে পারছিল না। অন্ত সেখানে ওই বেকাবুটীয়ের মধ্যে থেকেই মাঝে মধ্যেই টাল-চড়-লাথি-ঘুষি বর্ষিত হচ্ছে মেয়েটার উপর। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে মানবিকতার তাড়ায় উদ্বেল একটি মেয়ে বড়ের বেগে, সমস্ত শক্তি দিয়ে ভিড় ঠেলে একেবারে আছড়ে পড়ল ওই মেয়েটির উপর। আশ্চর্য ধরল ওকে মায়ের স্নেহে। দু-আনটে কিল ঘুষি এসে পড়ল ওর পিঠেও কিন্তু তার পরেই মেয়েরা শান্তিরক্ষার মধ্যে অনেকেই, তাদের মেল হচ্ছে। করে যারে অনেকে মেয়েটিকে মেরেটাকেও কিছু করতে এগিয়ে যেতে যাওয়ার করল নিজ নিজ গন্তব্যে। মেয়েটার সাহস ও মানবিক নিষ্ঠতার মূল্যায়ে অভিভূত হল অজয়ও। ও নিজেও এবার এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তুলে দাঁড় করালো মেয়েটাকে। ঘুজনেই সরিয়ে নিয়ে গেল কিছুটা দূরে একটা চায়ের টঙের সামনে। মেয়েটাকে ওকরে একটা বেঞ্চে বসিয়ে এক গ্লাস জল খাওয়ালো, সামনে একটা বেঞ্চে। সেখানেই অজয় জানল যে মুখিল করে অভুক্ত ওই মেয়েটা দুএকদিন রাত্রিবাসের জন্য কোন পথ না খুঁজে পেয়ে এই পথ বেছে নিতে চেয়েছিল। কাকার কুকুরে উঠতে উঠতেও মেয়েটা বলেছিল,—"বিশ্বাস করুন বাবা, আমি চোর নই।" আসার মায়ের খুব অসুখ, টি. বি. হয়েছে। মুখিল করে ঘুরে ফেরে হয়ে পড়ে আছে। অভুক্তের আমি জানতেও পারেনি। তাই মনি-পথা ওকরে আনতে পারেনি। আজ দু-দিন শুধু জল খেয়ে আছি। তাই মাথা নিজেকে সামলাতে পারিনি।" ওখানে আসেই অজয় এও জানল যে ওই মেয়েটির সাথে কোনও সম্পর্ক নেই ওই অভুক্ত ছেলেটার। শুধু মাত্র মানবিকতার খাতিরে, ওকে এই হিংস্র ভীড়ের কবল থেকে মুক্ত করতেই এগিয়ে এসেছিল নিজেকে। ছোট্ট মায়ই প্রশ্নের সমাধান, মানব রূপ হয়ে এসেছিল অজয়ের। সেই মুহূর্তে নিজেকে ভীরু, কাপুরুষ মনে হচ্ছিল। এই মেয়েটাই আজকের রুমকী, ওর দিকে বসে।

এরপর আর সপ্তাহ অনেক সপর্কীয় দেখা পায়নি অজয়। নিজেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজের জীবিকার কাজে। কিন্তু অজয় কী রুমকীকে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল? কখনও কি অবসর মুহূর্তে অজয়ের দু-চোখ ওকে খুঁজে বেড়ায়নি? কখনও কি মনে হয়নি, আবার এক আবদিন এমনিই যেন কারুর ট্রেন থেকে নেমে ওর সামনে দিয়ে চলে যেতে পারে না ওই সাহসী মেয়েটা। কথা নাই বা হলো, তবু দৃষ্টি বিনিময়—এক টুকরো সৌজন্য করে জানা যায় সেই অজয়ের ও কি সহিত উত্তরটুকু প্রকাশে দেওয়ার মানসিক শক্তি রয়েছে? জানে সে কথা। যতটুকু অজয় আর রুমকীকে, তাদের চেয়ে জানতে পেরেছি তা হল সহিতই করেকটি স্টেশন ট্রেন থেকে নেমে রুমকী এসে দাঁড়িয়ে ছিল এই অজয়ের সামনে। ওর করুণ মুকভাষার উপরোক্তরে পড়তেই কি ভুকে অজয় একটা কর্মী পাঠিয়ে দিয়েছিল ওয়ার্কশপে ট্রেনের ক্লাস ফোর সেকিয়ন স্টাফের দরকার ছিল। সন্ধ্য করেছিল কর্মীখানা হাতে পেয়েই একটা খুশীর রেখা খেলা গিয়েই মিলিয়ে গেল মুখি হঠাৎ। রুমকীর মুখে। অনেকের মত রুমকীর হাতে ও কর্মখানা গুঁজে দিয়ে অজয় বলেছিল—মুটো টাকা তো বেশিন হবে এসে দিয়ে যেও। তোমারমত অনেক বেকার ছেলে মেয়েই কর্মের দাম নিয়ে এরা ছেলে, তর্ক করে। কুকতে পারি অভাব জ্বালা। তাই অনেকেরই কর্মটিতে কর্ম দিই।—তবু বিশ্বাসে। আমাকে তারা পয়সা দিয়েও যায়। আসলে আমার দেশের বেকার ছেলে মেয়েরা অনেক সৎ। যা কিছু ধরং কাজ করা তা শুধু মাত্র মনের জ্বালায় অভাব কারের প্রয়োজনেরই।

তাদের ছেলে রুমকী চাকরিটা পেয়েও গিয়েছিল। অজয় ওর কর্মের দামও পেয়েছিল সময় মতই। কিন্তু

[illegible] নিজেই অফিস আওয়ার পথে একটু দাঁড়িয়ে অজয়ের কুশল বার্তা করে যেত রুমকী। সামান্য কুশলের কুশল প্রশ্নোত্তরী। একদিন কি ভেবে রুমকী নিজের টিফিন কৌটোটা জোর করে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল অজয়ের হাতে। অজয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে না তাকিয়েই প ধরিয়েছিল অফিসের দিকে। তার পরের দিন ও—তার পরের দিন....এমন ছেলে। একদিন আপত্তি জানা অজয়—না, আমি আজ কিছুতেই খাবনা-এটা নিত শুধু।

শরীর খারাপ হয়নি তো। সজ্জা-সরমের মাথ খেয়ে চলেনা জনজাতের সামনে অজয়ের উপরে কপালে হাত দিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিল রুমকী তার পরের দিনও আপত্তি জানিয়ে ছিল অজয়-আমাকে খাইয়ে তুমি খেতাই না খেয়ে থাকবে এ হ না। হাসতে হাসতে রুমকী বলেছে-আমি মেয়েরাও আ ভাত খেয়ে থেকেই। টিফিন দরকার হয় না। তাছা মেয়েদের একটু কম খাওয়াই ভালো, হাল্কা থাকা তাই তো শত্রু আক্রমণের জন্য ঘরে মজুত যে পার্থনের উপোস করছে থাকে।

—না, তবুও এভাবে—

—আমুক হয়ো না। আমি আফিসে খাবি খাচ্ছি পাল্লার নীচে। সহকর্মীদের সৌজন্যে কিছু না কিছু পেটে যায় প্রায় দিনই। কিন্তু তোমাকে খাইয়ে যে কল মাত্তার করে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বড় ঘরে-পুরুষের অনেক ভেদা

অকর্মণ্য রুমকী ওর নিরিবিলি ছোটেই ওরে থাকার কোনও প্রতিবাদ কানেও তোলে না, অন্ত অজয় এত জোর করে জানতেও পারেনা—আ আজ মুহূর্তেই ও করার সবই নয়। অজয় যে মুহূর্তে তেলাকুচ মুটি পুটো আধপোড়া রুটি আর এক টুকরো গুড়। ও এনেও এক ভেতে ওরুর মুখের মধ্যে একটা রাগ হয়। তবুও কেন জানি রুমকীকে জোর করে কিছি দিতেও ওর মন চায়না। মনের সায় না থাকলেও একটা ফেলেই বসেছিল অজয়-আমার মত একটা দিন আ দিন যাই লোকের সঙ্গে কেন এভাবে নিজেকে জড়া চাইছো? অনেকেই তো চাকরি পাওয়ার পর শুধু কলা জানিয়ে সম্পর্ক শেষ করে দেয়। কেউ কেউ পাঁচ-টাকার মিষ্টিও আনে সাথে করে, স্যার.....। নি তুমি।—

—এমন করে কেন বলছ? আমি তোমাকে কি দিতে চেয়ে ছোট করতে চাইছিনা তোমা। নিজেকে মহৎ ভেবে শান্তি খুজছিনা। তোমার আগ্রহে এ নিজেকে অনেক পূর্ণ পুরুষের মূর্তি, অসহায় ইনি থেকে বাঁচাতে চাইছি মাত্র। একটা নিশ্চিত আশ্রয় চাই জোর করে চাওয়ার অধিকার নেই জেনেও চাইছি। ম তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো। তবু জানি এসে দু'জনের মিলিত চেষ্টায় সপ্তাহের একটা দিন আ বেকার ভাই-বোনেদের বিনা পয়সায় কর্ম শিক্ষায় ও করি। এই সমাজের এক অভাগার জেলে অথবা অবহেলিত থেকেও যদি আমাদেরই সমাজের এত কল্যাণ সাধনী হই, ক্ষতি কি।

সেদিন থেকে আজও এই সত্যটাই খতিয়ে দেখে অজয়—।

অন্ধকারে একা

প্রণব সেন

সঙ্কীর্ণের চোখের সামনে ঘুরছে পাইপের লম্বালম্বি সারিগুলি। মাথার ওপর
ঘুরছে লম্বা লোহার পাইপের সারিগুলি। যে সরকারের নির্দেশে আজকে বন্দিনী দিপ্রা
এখানে এই কুঠিতে সঙ্কীর্ণের সঙ্গেই বন্দী। এই সরকারের সুবিধের জন্যই তো তোলা
হয়েছিল পাইপলাইন। তারই সন্ধান পেয়ে গেল সঙ্কীর্ণ।

এ সুযোগ ছাড়া যায় না। দিপ্রার চোখের দৃষ্টির ভাষা দিপ্রার মনের সমস্ত দৃঢ়তা
যেন বোঝাতে চায় সঙ্কীর্ণকে। তবে কি সঙ্কীর্ণ ভুলই করল? এখন কী করা উচিত
ওর? এ অবস্থায় সঙ্গে রাখা মানে দিপ্রার জন্য বিপদকে ডাকা। তাছাড়া নিজের
মুক্তিলাভের সম্ভাবনাকে ফেলে রেখে সঙ্গীকে কে কী বলেছে ভাবতে পারে।

এই রাত দুপুরে এসে ওকে সঙ্কীর্ণকে ডাকে যে ভাবে মুখের ভেতরে আঙুল
চুকিয়ে শিস্ দেওয়া, তাতে ওদেরই কারো [illegible] ভেবেছে সঙ্কীর্ণ।

রাত এত গভীর আগে যে কেউ ওদের সঙ্কীর্ণের সঙ্গে [illegible] ভাবতে পারেনি দিপ্রা। সামান্য কারণেই ওরা [illegible] ফেলে দিতে পারে। এতদিন ধরে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের যোগাযোগে দিপ্রার [illegible] যেন সঙ্কীর্ণ বুঝতে পারছে, ওকে যেন ওই বিপদের সম্ভাবনার [illegible] ওদের সন্ধানকারী দৌড়ে [illegible] সঙ্কীর্ণ অনুভব করছে, সেদিন

ওটা ফাঁদ থেকে যাবে। সাময়িকভাবে ওরা সেই ফাঁদ গুটিয়ে নিলেও ওদের নজর
পাইপলাইনের আশেপাশে গভীর অভিনিবেশ করে রাখবে ওরা। ঠিক যেন এই ভয়
নিয়েই দাঁড়িয়েছিল সঙ্কীর্ণ।

সঙ্কীর্ণ দিপ্রার পায়ের উপর দা দিয়ে নীরবতার অবসান ঘটিয়ে ফিরিয়ে যেতে
চাইছে। তবে কী সঙ্কীর্ণ বুঝতে পারছে এই ভীতির ভয় তার নিজের জন্যই
রয়েছে। নিজের অবস্থানের কথা সঙ্কীর্ণকে সচেতনভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় দিপ্রা
তবে পাথর ছাড়াকুড়ো পড়ার ধরে সঙ্কীর্ণের নীরবতা ভাঙাতে চেষ্টা করে।

সঙ্কীর্ণ দিপ্রার আরও কাছে সরে গেছে তোলের উপর ভর দিয়ে। এ অবস্থায়
স্পর্শ পেতে চাইছে। তবে এই স্পর্শ-সুখের মধ্যে রয়েছে আরও কিছু পাওয়ার
আকাঙ্ক্ষা। সঙ্কীর্ণকে আরও নিবিড় করে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা। তবে নিজেকে সংযত করে নিতে
পারছে না দিপ্রা। বিধাজড়িত মনে সঙ্কীর্ণের সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে ঘোরে দিপ্রা
তার দৃষ্টিকে। তারপর নিয়ে তাকিয়ে থাকে সঙ্কীর্ণের [illegible] উদ্ভাসিত সঙ্কীর্ণের
মুখমণ্ডল চোখের দিকে।

তবুও তোলে তখন সেই সঙ্কীর্ণের মুখের। ও তখন খুঁজে নিতে চাইছে দিপ্রার
দৃষ্টিতে নিশ্চিন্ত নির্ভর তরসা আশ্বাস। দিপ্রার চোখে তখনও এই বিপত্তির ছায়া।
[illegible] হয়ে
[illegible]
হয়েছে।

সঙ্কীর্ণ যে মত
যে বিপদ সম্ভবে যে
মুখে তার উত্তর দাও
দিয়ে কথা যে মুহূর্তেই [illegible] সে সেই ভাষা, যে
তার আবেদনের [illegible] মুখের ওপর ঝুঁকে
দিপ্রা [illegible] [illegible] [illegible]
আবেদনের [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible]
সবার চেয়ে বেশিবার সঙ্কীর্ণ বুঝেছে, দিপ্রা যে সঙ্কীর্ণের [illegible] [illegible]
আছে [illegible] [illegible] [illegible]
তোলে দিপ্রা [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] সঙ্কীর্ণ [illegible] [illegible]
[illegible]

সঙ্কীর্ণ জানে [illegible] [illegible]
মুখে [illegible] [illegible] [illegible]
তোলে অবশ্যই সেই [illegible] [illegible]
ঠাণ্ডা। আমার [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

সঙ্কীর্ণের যে অবস্থানটি সবচেয়ে [illegible] দিপ্রার [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সঙ্কীর্ণের যে অবস্থানটি সবচেয়ে [illegible] দিপ্রার [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সঙ্কীর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কিন্তু এতক্ষণের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নিশ্চয়ই অবশ্যই সাময়িকের পরিস্থিতি নয় তবে দিয়ে পাবে যেন তোলে তোলে
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। আজ যদি আমি অফিসে গিয়ে মাকে তোমার এই চিঠি খোলাই, মা তোমার সম্পর্কে কী ধারণা করবে, তুমি অনুমান করতে পারো?

নিশ্চয়ই পারছি। উনি তোমাকে বলবেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে। তুমি তাই করো। আমি সুখে থেকো একথা বলেছিলাম। কিন্তু তোমার কান্না থামে যাচ্ছে না।

কথাগুলোর এখন খুব সহজে বলতে পারছো, সেই অসহ্য অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজকের এই সহজ উচ্চারণগুলো কিছুতেই মনে আনতে পারবে না। তখন মনে হবে আমি তোমাকে ঠকিয়েছি। আমি যেন তুমি নিজেই নিজের সঙ্গে প্রতারণার খেলায় মেতে উঠেছি।

রিঙ্কাকে আশ্বস্ত করতে না পেরে ধমকে ওঠে সঙ্গীপ। সত্যিই কী একে আত্মপ্রবঞ্চনা বলে। রিঙ্কার চাওয়াকে মর্যাদা দিতে আর কোনো দ্বিধা নেই। ওকে আর কতদিন অপেক্ষা করতে বলবে? আগামী সময়ের পথ হাঁটতে হাঁটতে একদিন তো আজকের স্বপ্নগুলো অবে পড়া পাতার মতো বিবর্ণ হয়ে যাবে। রিঙ্কা আকুল চুলে ধর্ষণকে লজ্জা করে বলবে, যে পুরুষের জীবনে সাফল্য নেই, তার সঙ্গে নিরুদ্যমের জন্য জীবনকে জড়াতে চাওয়া আত্মহত্যারই সামিল। রিঙ্কার সেই পালিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আহরণ করতে না পারার জন্য অনুশোচনার দগ্ধ হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হবে সঙ্গীপকে। অন্ধকারের পরিণামের স্পষ্ট ইঙ্গিতে আতঙ্কিত হয়ে সঙ্গীপ বলল, আমাকে কি করতে বলো তুমি?

আমি তোমাকে তো অনেক কিছুই করতে বলেছি, তুমি আমার কোন কথা শুনেছ? তুমি কেন এম. এ. পড়া ছেড়ে দিলে। গ্রাজুয়েট হবার পর কেন ওটিই. বি. সি. এস. পরীক্ষা দিলে না? আসলে তুমি নিজেই নিজের খোলসের শিকার। তুমি যা করতে পারো, তা তুমি কখনই করার চেষ্টা করো না। এভাবে তুমি নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করছ, আর তোমার কথা যারা ভাবে, তাদের প্রত্যাশাকে তুমি মর্যাদা দিতে চাওনি।

আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজেই নষ্ট করেছি, এ তোমার অভিযোগ। আমি তো জানি আমার দীনতাগুলো কোথায়। কোনোদিনে এম. এ. পাশ করে কী করবার আমি? তবু একটা সার্টিফিকেট যাতে পেলেই বুঝি আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

সেইজন্যই তুমি রিঙ্কাদের মৃত্যু কামনা করছ? সত্যিই তুমি একজন সার্থক পুরুষ।

রিঙ্কার কটাক্ষ সঙ্গীপের অস্তিত্বকেও আঘাত করলেও সঙ্গীপ তাকে উপেক্ষা করতে চেয়ে বলল, এ ছাড়া আমার যে আর কিছুই করার নেই রিঙ্কা। চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তো দেখা যাচ্ছে।

নিজের যোগ্যতায় যদি চাকরি যোগাড় না করতে না পারে, তাহলে সাহস কোনোদিনই খুঁজে পাবে না। যে পুরুষ অন্যের করুণার উপর নির্ভর করে থাকে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না সঙ্গীপ। ধর্ষণকে অতিক্রম করার সাহস যে দেখাতে না পারে, এ সংসারে তার কোনো মূল্য নেই।

যে সাফল্যের দিকে ইঙ্গিত করতে চাইছে রিঙ্কা, সে সাফল্য অর্জনের যোগ্যতা সঙ্গীপের নেই। এই তীব্র প্রতিযোগিতার জগতে সঙ্গীপ সামান্য খড়কুটোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। পাথরের মতো মানুষ বুকে পা রেখে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সে কোনোদিনই পারবে না। যে কথা ছিনের আলোর চেয়েও সত্য, তা যদি কেউ অস্বীকার করতে চায়, তাকে কীভাবে বোঝাবে সঙ্গীপ? সঙ্গীপের প্রতিক্রিয়ার কোনো তোয়াক্কা না রেখে রিঙ্কা বলল, আসলে তোমরা এ যুগে অচল। মার্কামিয়াল যব বি কিংটি—এ সময়ের মর্মবাণী। তাকে গুরুত্ব না দেওয়া আত্মহত্যারই সামিল। পালিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না সঙ্গীপ। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সামনে সুযোগ যা আছে, তাকে অন্য সকলের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে আয়ত্ত করতে হবে।

এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না সঙ্গীপের। অষ্টাদশম ঘণ্টার নির্জনতায় ঘুমে নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের প্রতিধ্বনি, পায়ের পাতা ছুঁয়ে পড়া জোয়ার আসতে আসতে মন করা সন্ধ্যের ঘুমে মগ্ন রিঙ্কার উচ্চারিত শব্দগুলো কক্ষ কর্কশ, রুক্ষ নির্মম মনে হচ্ছে। রিঙ্কার কী মন নেই? সেই চিরন্তনীন প্রেমের প্রতিধ্বনি করতে চাইছে না সঙ্গীপ। জীবনের কোথাও কী এতটুকু মমতা নেই। প্রতিষ্ঠা আর অর্থ এখন জীবনকে ঘিরে আছে, তার আয়নাজাল থেকে মুক্তি পাবার পথ যে খুঁজে পাচ্ছে না সঙ্গীপ। রিঙ্কা আর কোনো নারীর নাম নয়, পুরুষের ধন-সম্পত্তি নয়, সে শুধু প্রতিষ্ঠার জেদ জাগিয়ে তোলার এক নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতা।

সঙ্গীপ হাতঘড়ির দিকে চোখ রেখে বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, তুমি কী এখন বাড়ি যাবে?

বাড়ি যাবার জন্য তাড়া নিশ্চয়, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব এখনও আমি পাইনি।

সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না রিঙ্কা। উত্তর আমার জানা নেই। এই পৃথিবীতে প্রতিদিন কত প্রশ্ন জেগে উঠছে, তার উত্তর না পেলেও সময় এগিয়ে চলেছে। থাক না কিছু নিরুত্তর প্রশ্ন চিরকালের জন্য, তাদের বিসর্জন দেওয়া তাই হবে না।

তুমি আর অপেক্ষা না করো, আমার তো ভয় হচ্ছে। আমি যদি তোমাকে পুরোপুরি বুঝতে না পারি তবে আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও ফাঁক থেকে যাবে। সেই ফাঁক নিয়ে একটা সুস্থ সম্পর্ক আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। আমি জানতে চাই কেন তুমি নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা হারিয়ে একজনের মৃত্যু কামনা করছ?

একটা প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার কি লাভ হচ্ছে বলতে পারো? আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে চাওয়াই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি ঘীকার করছি আমি অপরাধ করেছি। এবার তুমি খুশি?

আমি তোমার জানতে তথা ওকে খুশি হতে চাই না সঙ্গীপ। তুমি যদি নিজের স্বার্থের কথা ভেবে একজনের মৃত্যু কামনা করতে পারো, তবে তুমি যদি কখনও অন্য কোনো নারীর সংস্পর্শে আসো, সেদিন আমার মৃত্যু কামনা করতেও দ্বিধা করবে না।

মনগড়া সম্ভাবনার আকাশ নিয়ে যে সত্যকে তুমি বরণ করতে চাইছ, তার মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে অক্ষীকার করা যায় না। সুতরাং ভবিষ্যতে কি হতে পারে, এই ভেবে তুমি নিজেকে সন্তুষ্টিত করে রাখতে চাও, আমি আপত্তি করবো না। অন্যের স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না।

আর এখানে পাশাপাশি বসে থেকে আবেগের সময় আটিয়ে লাভ নেই। যে সুতোর মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর স্বাভাবিক প্রবণতা গড়ে উঠেছিল দু'জনের সম্পর্কের সূত্র ধরে, সে সুতোর সীমারেখা এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে যে পারস্পরিক সম্পর্কের উত্তাপও কেউই অনুভব করতে পারছে না। রিঙ্কা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাচ্ছি সঙ্গীপ।

তুমি কি একাই যাবে। এখন অন্ধকার বেড়েছে, এই সময়ে তোমার একা...

আমি তো একা হয়ে গেছি সঙ্গীপ। এখন থেকে আমাকে একাই পথ চলতে হবে।

আজ অন্তত আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার সঙ্গে তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছ, তোমাকে অক্ষিতে পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব। তোমার জ...

দায়িত্বের কথা বলো না সঙ্গীপ। এই একটিদিনের জন্য দায়িত্ব পালন করলেও কিন্তু অসুখ ভয় যা। আ-কে আমিই জানিয়ে রেখ কেন তুমি আমার সঙ্গে ফিরে না।

রিঙ্কা একাই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এই সময়ে পথে একা এক যুবতীকে হেঁটে যেতে দেখলে, যে কেউ ভুল বুঝতে পারে। সঙ্গীপ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে রিঙ্কাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। বাসস্টপে এসে রিঙ্কা পেছনের দিকে তাকিয়ে সঙ্গীপকে দেখে কোনো গুরুত্ব দিল না। তাই কিছু না বলে তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়ল।

সঙ্গীপ বুঝতে পারছিল রিঙ্কা সব অধিকার ছেড়ে দেবার পথই বেছে নিয়েছে। এরপর যদি কোনোদিন কখনও হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যায়, রিঙ্কা হয়ত অপরিচিত পুরুষ ভেবে এড়িয়ে চলে যেতে চাইবে।

সঙ্গীপের বাড়িতে ফিরতে ফিরতে এগারোটা বাজলো। মা কিছু বলেননি, এত রাত পর্যন্ত বোনার আজ্ঞা মামলিমি।

ঘরের ঘর সঙ্গীপকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। কিন্তু একজন স্বার্থ মানুষের উত্তেজনা সবসময় ধারণায় করে না। সঙ্গীপ বলল, চাকরির খোঁজে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

যে তোকে চাকরি যোগাড় করে দেবে বলেছে?

উত্তর দিল না সঙ্গীপ। নিজের পক্ষে জোরালো সওয়াল করার মতো মানসিক শক্তি ছিল না সঙ্গীপের। বিমানবন্দুর কোম্পানী গত মাস থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। এক সময়ে ওখানে চাকরি করা ছিল সম্মানজনক দিক থেকে অত্যন্ত সম্মানের। বিদেশী মালিকদের পর থেকেই কোম্পানীর অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি দেখা দেয়। প্রথম পদক্ষেপে শ্রমিক ছাঁটাই, তারপরে তোলার। বিমানবাবু এখন বেকার। প্রতিদিন অফিসে আসে, আর হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। তবে কোম্পানী খুলবে কেউ জানে

না। আরও কত প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে বন্ধ হয়ে গেছে। এমন ছেলেকে চাকরি দিতে পারবে না, এ সত্য একজন পুরুষমানুষ কারও কাছেও অস্বীকার করতে পারে না। মা তাই চাকরির প্রসঙ্গ বন্ধ করে দিয়েছেন একেবারে, তুই আজ কেন হাসপাতালে গেলি না? তোর জন্য ভাবছিলাম..

ভালই তো গিয়েছিলাম। আমার প্রতিদিন হাসপাতালে যেতে ভালো লাগে না। রোগগ্রস্ত মানুষগুলির মুখ আমাকে আতঙ্কিত করে তোলে। মনে হয় মৃত্যু আমাকে ছুঁতে চাইছে।

অসুস্থ স্বামীর প্রতি তোর কিছু কর্তব্য আছে। আমরা যদি তার পাশে গিয়ে না দাঁড়াই, তবে মানুষটা বেঁচে থাকার জন্য মনের জোর কোথা থেকে পাবে!

এই মুহূর্তে স্বামীর মৃত্যুর কথা ভাবতে পারলো না সলীল। রোগ-পাণ্ডুর দুটি চোখ মেলে উঠলো, যে সলীলের কাছ থেকে একটু করুণা ভিক্ষা চাইছে। আজ ভিক্ষার সঙ্গে সময় কাটিয়েছে, এ কথা এই মুহূর্তে প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করলো। যার স্বামী অসুস্থ শরীরে হাসপাতালের শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে, তার স্নেহিকের অন্তরঙ্গ উচ্ছলতায় ভেসে যাওয়ার সামাজিক নীতিবোধ কখনই সমর্থন করবে না। মাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সলীল অনুভবের আগুনে বন্ধ হয়েই নীরবতার অন্তরালে আশ্রয় নিতে চাইলো। ভিক্ষা এই অসংগতির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করেছিল, অন্তত তখন সলীলের মনে হয়েছিল এর অর্থহীন অবেগ সর্বস্ব মানসিকতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে ভিক্ষা। সলীল শুধু নিজের কথা ভাবেনি, ভিক্ষা যে আশ্রয় খুঁজে পেতে চাইছে, তাকে নিশ্চিন্ত করে তোলার আশ্বাস জোগাতে সলীল কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক ভিত্তিতে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে, এক্ষত্রে কেন ও বুঝতে পারছে না?

সলীল ঘরে আলো জ্বালেনি। অন্ধকারে শুয়ে আছে। ভিক্ষার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার বিচিত্রতের যন্ত্রণা সলীলকে আচ্ছন্ন করে আছে। আবার অনুভূতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার অবকাশ নেই। মা ঘরে এসেন। অন্ধকারে আবছায়া, যেন এক বিষাদের প্রতিমূর্তির নিশ্চলতা। তবে কী বাবা সত্যি সত্যিই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে! মায়ের উত্তপ্ত চুলে কী সেই নিদারুণ বিয়োগান্ত পরিণতির নিশ্চয়তা! এই স্থির চিত্রের মুখোমুখি হয়ে উত্তপ্ত সলীল। একদিকে বৈধব্য ভেদে আসন্নতর মা, অন্যদিকে নববধূর বেশে লজ্জাবনতা ভিক্ষা, সলীলের এই আকস্মিক বিভ্রমের সঙ্গে কিভাবে নিজেকে জড়াবে।

মা আলো না জ্বালিয়ে সলীলের শিয়রে বসে আবার মৃদু স্বরে ফোপাতে ফোপাতে বললেন, তুই তো গিয়েছিলি করবী বা বাবা কেমন আছে!

এই জিজ্ঞাসা অত্যন্ত প্রত্যাশিত ছিল সলীলের কাছ থেকে। বাবা-ছেলের এই পারস্পরিক আন্তরিকতার মধ্যেই রয়েছে আন্তরিক সম্পর্কের উৎস। কেন তার স্বাভিমানের প্রকাশ ঘটছে সলীলের ব্যবহারে? মা প্রত্যাশা পাবার আশায় উন্মুখ। সলীলকে নিরুত্তর দেখে মা আবার, সলীল হয়ত অনুশোচনায় বিব্রত। উত্তরের জন্য আরো বিরক্ত না করে বললেন, তুই কী বাবার উপর অভিমান করেছিস? তোর চাকরী নিয়ে উনিও সমানভাবে চিন্তিত। শরীরে এত যন্ত্রণা, তবুও আমাকে প্রতিদিন বলেন, সলীলের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি। ওর জন্য কিছু একটা করতে না পারলে, আমি মরেও শান্তি পাবো না।

সলীল কথাগুলোকে একটুও গুরুত্ব দিল না। এই উচ্চারণের মধ্যে পরানুগতিক সন্তান-স্নেহের ছোঁয়া রয়েছে। আজকের ছেলেপাটা শব্দগুলোকে বিশ্লেষণ করে শুভূতার উল্লাস ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলো না সলীল।

সলীল জানে বাবার সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা। বাবা একদিন বলেছিলেন, আমার অফিসে চাকরি পাবার আশা তাকে না, কেরীর সরকার লোকসানে চলা সংস্থাগুলিকে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে কোনো মুহূর্তেই। আমাদেরই বেচে-থাকবার দিকে ঠেলে দেবার কথা ভাবছে। অবশ্য যদি আমার এখন মৃত্যু হয়, তবে তোমার চাকরি পাবার ক্ষীণ সম্ভাবনার সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য কোনো গ্যারান্টি নেই।

সেদিন থেকেই সলীল সেই ক্ষীণ সম্ভাবনাকে মনের মধ্যে লালিত করে চলেছে। আর সেই ভাবনাকে আরও তীব্রতর রূপান্তরিত করেছে ভিক্ষা। ওকে ঘিরে পাবার হোকাঙ্ক্ষা বাবার মৃত্যুকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল সলীল।

প্রায় এক মাস আগে অফিস থেকে ক্লান্ত শরীরে ফিরে এসে বিশ্রাম নিতে নিতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞানার পরামর্শে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থা না পেরোনো পর্যন্ত চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাতে হয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর অবিশ্বাস্য খেলার আমাদের পর একসময়ে বাবা মৃত্যুকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরে আসতে পেরেছেন জীবনের উপকূলে। সেই সংকটের মুহূর্তে সলীল বাবার জীবন-সংশয় নিয়ে একটুও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেনি। উপরন্তু এক অজ্ঞান মনে আবার নিজে দেখতো কর্তব্য-পরায়ণের উত্তপ্ত ছলিচিত্রের পরিচয় দিয়ে নিজের পরীক্ষিত উজ্জ্বলতায় ভাস্কর সামাজিক প্রতিষ্ঠা কায়েম করার চেষ্টা করেনি।

সলীল জানে, বাবাকে তবে হাসপাতাল থেকে আনছে?

এখনও কিছু বলেনি ডাক্তার। আরও কয়েকদিন অবজারভেশনে রেখে দেবার সিদ্ধান্ত নেবে।

বাবাকে তাহলে মাসখানেক ছুটি নিতে হবে।

ছুটি কতদিনে মেলবে বলা যায় না। আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুস্থ হয়ে উঠুক। বাড়িতে ফিরে এসে আমাকে দু'বেলা অন্তত বাড়ি থেকে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না।

বাবা সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসবেন, আবার অফিসে যাতায়াত শুরু করবেন, এর মধ্যে সলীলের মন তাড়াবে খেলা লুকিয়ে আছে। সলীলের নিরাসক্ত দৃষ্টির দিকে চোখ মেলে মা বললেন, তুই তো একটুও আনন্দ প্রকাশ করলি না!

বাবা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসবে, এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। তা নিয়ে বিশেষ আনন্দ প্রকাশের প্রয়োজন আছে কী!

কি জানি। আমি আজকাল তোকে একটুও বুঝতে পারি না।

বুঝতে পারবে না। আমাকে কেউ বুঝতে চায় না—বলেই এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুঁজলো সলীল

দুই

দিন সপ্তাহের মধ্যে রেবতীবাবু হাসপাতাল থেকে ছাড়িতে ফিরে এলেন। এখনও দুর্বলতার আক্রোশ থেকে শরীর পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। বিশ্রাম নিয়ে অনেক আরাম। অফিসে জয়েন করলেও কতদিন চাকরি করতে পারবেন সে নিয়ে একটা সংশয় ইতিমধ্যেই মনে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু মুখে যাতায়াতের কথা সে কথার শক্তি হয়ত আর কোনোদিন ফিরে পাবেন না।

রেবতীবাবু বেরিয়েছিলেন সলীল বাড়িতেই আছে। অন্তত একটি দিন পর সুস্থ স্বামীকে কাছে পেয়ে সলীলের যে প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করেছিলেন সেখানে এ হৃদয়হীনতার সুস্থ অনুভব করতে পারলেন রেবতীবাবু। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সলীল কোথায় গেছে?

আমি কিছু জানি না। ও কী আমাকে জানিয়ে কিছু করে!

আজ এমন কী জরুরি কাজ ছিল যে সে বাড়িতে থাকতে পারলো না! এ ছেলের জন্যই আমি রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না।

সলীল ফিরে এলে ওকেই জিজ্ঞেস করো। তবে বেশি কথা কাটাকাটি করো না উত্তেজিত হয়ে পড়লে তুমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে পারো।

এমন ছেলে যে বাড়িতে থাকে, সেখানে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। আমি হাসপাতালেই ভালো ছিলাম। আমার কপাল খারাপ বলেই আমাকে বাড়ি ফিরে আসতে হলো। এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো ছিল।

এই অভিযোগ ফিরোবিতা করলেই উত্তেজনা বেড়ে যাবে, তাই নির্বাক থেকে বেদনার জ্বালায় অন্তরচরে ছলতে লাগলেন রিমিতি। সলীলকেও কিছু বলতে সাহস পান না। যদি অভিমানে আহত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়! আজকাল ব্যাপারটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সলীল বাড়িতে ফিরেছে রাত বারোটা নাগাদ। রেবতীবাবু জেগেই ছিলেন। রিনি যখন সদর দরজা খুলেছিলেন, তার শব্দ কানে যেতেই রেবতীবাবু বুঝতে পেরেছিলেন সলীল বাড়িতে ফিরেছে। রেবতীবাবু আশা করেছিলেন সলীল ফিরে এসেই এ ঘরে ঢুকবে। কিন্তু তাঁর প্রতীক্ষা অর্থহীন হয়ে যেতেই তিনি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, সলীল, আমার ঘরে একটু এসো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

এখন রাতের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করার মতো শারীরিক সুস্থতায় নেই সলীল ক্লান্তি তাকে অবসন্ন করে তুলেছে। তবে এই ক্লান্তি পরিশ্রমজনিত নয়, এই ক্লান্তি অসতর্ক জীবনযাপনের ফলশ্রুতি। এই অবস্থায় বাবার মুখোমুখি হতে চায় না সলীল রিমিতি উত্তপ্ত আবিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে বলে আজ ওকে ছেড়ে দাও। সারাদিন ধোকায় ধোকায় ঘুরেছে, এখন ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।

রেবতীবাবু সহজে মেনে নিতে পারেননি রিমিতির এই ভূমিকাকে। তিনি গলা চড়িয়ে বলেছিলেন, তোমাদের মতো মায়েদের জন্যই আজকালকার ছেলেরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

রিমিতি আপত্তিকর সম্ভাষণ হয়ে চিরকালীন নারী-আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চো

জল ফেলতে পারতেন, তাতে এই ঘরের মাটিতে আর একটি অধ্যায় সংযোজিত হতো। মিনতি সে পথ পরিত্রাণ করে বললেন, তোমার যা বলার আছে, ওকে ভাল সকালেই বলো। ও তো আর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে না।

ও কেন বাড়ি ছেড়ে পালাবে। আমাকেই চলে যেতে হবে।

রেবতীবাবুর কথার প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করার মতো অবস্থায় ছিল না সদীপ। এখন ও ঘুমাতে চায়। নিরাপত্তার ঘুম। যে ঘুমের মধ্যে কোনো ভয় নেই। চিন্তার উপস্থিতি নেই।

সকাল ছোকরা রেবতীবাবু অপেক্ষা করে আছেন সদীপের জন্য। সময়ে আসে করে এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। নাকি উপেক্ষা করার জন্য ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে আছে। রেবতীবাবু সংযমের পরাকাষ্ঠা হয়ে যেতে চান না। চাকরি যতদিন আছে, তাঁর অস্তিত্বের অবমাননা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। তিনি মিনতিকে ডেকে বললেন, সদীপ কী এখনও ওঠেনি?

মিনতি বুঝতে পারছেন সদীপকে কেন্দ্র করে এক আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনা চলছে। তখন ব্যাড-মীডিয়ে ভূমিকা একেবারেই গৌণ হয়ে যাবে। মিনতিকে সদীপের পক্ষ নিয়েই কথা বলতে হবে। সদীপকে জানিয়ে এই অবধিকর পরিস্থিতিতে তিনি অবতীর্ণ করতে চান না। মিনতি বললেন, ওকে ঘুমাতে দাও।

ঘুমিয়েই থাকুক। রাত্রিকর্মা ছেলে, রাত করে বাড়িতে ফেরে, ওকে তো বিশ্রাম করার সুযোগ দিতেই হবে। এ বাপের মুখে ও চুনকালি মাখিয়ে ছাড়বে একথা আমি তোমাকে আগে বলে দিচ্ছি। তার জন্য তুমিই দায়ী।

সন্তানের মাঝেই সন্তানের জন্য যতিযুক্ত হতে হয়, এ অতিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় আছে মিনতির। প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করতে চাইলেই অশান্তি আসে। মিনতি বললেন, ছেলেটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাকরি পেলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাকরি তো আর হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই পাওয়া যাবে। শুধু গ্রাজুয়েট কোয়ালিফিকেশন নিয়ে এ বাজারে চাকরি পাওয়া যায় না। ফতবাদ ওকে বলেছি, প্রতিযোগিতার বাজারে নিজের যোগ্যতা না বাড়ালে কেউ মুখ তুলে তাকাবে না। কেউ কপর্দক করবে না। আমার কথা শোনেনি। লেখাপড়াই ছেড়ে দিল। কম্পিউটার কোর্সেও ভর্তি হলো না। এখন চেহারা করে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। কেউ ওকে চাকরি দিতে পারবে না।

কিন্তু লেখাপড়া নিয়েও কী সবাই চাকরি পাচ্ছে?

পাচ্ছে না ঠিকই। নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কী কোনো আপত্তি আছে? এখন অফেশনাল কোয়ালিফিকেশন ছাড়া কোথাও ঢুকতে পারবে না। আমি ওকে কতবার বলেছি কম্পিউটার পরীক্ষার কথা শুনতে। আমার কথা শোনেনি। কি জানো, কি করতে চায়, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওর ইচ্ছা আশা ছিল, তোমার অফিসে ঢুকতে পারবে।

সেসব দিন চলে গেছে। কাজের লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে এখন আর কোনো আগ্রহ নেই, উপরন্তু ছাঁটাই করার জন্য পরিকল্পনা রচনা করার নির্দেশ পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণী ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও আই. এম. এফ.-এর সুপারিশ অনুযায়ী।

এই ভয়াবহ রেকর্ডের মুখে কেন যে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী সংস্থার সুপারিশ মেনে নিয়েছে বুঝতে পারেন না মিনতি। অবশ্য গতকাল সংবাদপত্রে পড়েছেন, নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় এক রাজনৈতিক দলের নেতা প্রতি ঘরে এক কোটি বেকারকে চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি তাদের দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসতে পারে। এই প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে, এ শিক্ষা তিনি আগেই পেয়েছেন। এমনই প্রতিশ্রুতি বিক্রেতারা ক্ষমতা আসে অন্য এক দলের নেতা। উপরন্তু একশ দিনের মধ্যে ডিসিনসরের দাম কমিয়ে দেবার কথাও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই দল ক্ষমতায় দখল করলে অর্থমন্ত্রী বললেন, এমন কোনো আর্থিক যন্ত্র আমার জানা নেই যার সহায়তে আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব। অবশ্য এমন এক অর্থনৈতিক নীতির কথা তিনি ঘোষণা করলেন, যার সাহায্যে বিদেশী কোম্পানীগুলি এদেশে অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ পেল। অনেক কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেল। নতুন চাকরি হওয়া তো দূরের কথা, উপরন্তু চাকরি-করা মানুষগুলোই বেকার হতে শুরু করলো।

সদীপের ঘুম ভেঙেছে। এখন ঘড়িতে সময় ন'টা বাজে। সদীপের ডাক শুনতে পেলেন মিনতি। যা আমাকে কিছু খেতে দাও। এখনই আমাকে বেরোতে হবে।

মিনতি বললেন, তুই একবার এ ঘরে আয় তো। তোর কথা আছে।

সদীপ ঘরে ঢুকেই বলল, আমার একটু তাড়া আছে। এখন তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। ফিরে এসে তোমার সব কথা শুনবো।

অপমানিত বোধ করলেন রেবতীবাবু। তির্যক দৃষ্টিতে সদীপের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, তুমি এমন কোন মহাভারত রচনা করার কাজে ব্রতী আছো যে আমার সঙ্গে কথা বলার সময়টুকু পর্যন্ত নেই?

সদীপ অবাঞ্ছিত উষ্ণতা প্রকাশ না করে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, আমি তোমাকে সবই বলব। আমি চাইছি এই মুহূর্তে কিছু টাকা জোগাড় করে নিতে। এখন বাজারে টাকা উড়ছে। শুধু হাত বাড়িয়ে ধরার সুযোগ পাওয়া। আমি সেই সুযোগ পেয়েছি। এটুকু শুনে রাখো, বাকীটুকু পরে বলব।

রেবতীবাবু শোনার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। বুঝলেন, সদীপ এক মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। হয়ত ওকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেকার যুবকদের বিভ্রান্ত করার খেলায় মেতে উঠেছে রাজনৈতিক দলের নেতারা। ক্ষমতাসনে ওরা চাকরি দিতে পারবে? সে সুযোগই বা কোথায়? কত মানুষ নতুন করে বেকার হচ্ছে, এ সংবাদ কী ওদের কানে পৌঁছায় না? অন্ধকার ছাড়া ওদের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

রেবতীবাবু ধীর কণ্ঠে বললেন, কত টাকা তুমি এখন পর্যন্ত পেয়েছ?

এখনও কিছুই পাইনি। আমি তো মাত্র পাঁচদিন হলো কাজ করতে শুরু করেছি।

কিছু পাবে না সদীপ। প্রতিশ্রুতি ছাড়া ওরা তোমাদের আর কিছু দিতে পারবে না। ওরা বিভিন্ন নির্বাচনে যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা যদি পালন করতো, তবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র এত ভয়াবহ হয়ে উঠতো না।

সদীপের মনে হলো আর বিদেশী দলের নেতার মতো বক্তৃতা করছেন। সুতরাং ওকথা বলার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না। আবার কথার দিতে বলে সদীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো আবার উনি অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাইবেন। এই মানসিকতার মানুষগুলোকে নিয়ে যত সমস্যা। পুরানো মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে রাখবে। দমসাময়িক জীবনের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে গিয়ে চেতনে খেলাও নিজেদের পরিবর্তন করতে চাইবে না কিছুতেই।

সদীপ চলে গেলে রেবতীবাবু মিনতিকে বললেন, তোমার ছেলে কেন যেন ফিরেছে জানো? আমা তো তখন ক্ষমার তারাক্রান্ত। নেতাদের গায়ে আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগে না। ছত্রে ছত্রে সদীপরা। কোনদিন ওনতে পাবে ছোরা অবস্থা ওলিতে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সদীপ। আর মায়া ছেলে সহানুভূতি জানাতে আসবে নেতারা। কাগজে আমাদের ছবি ছেপেছে। পত্রপত্র একটি পরীক্ষা ফেরি স্থগিত হবে। হয়ত ছয়ে ফলী মন্ত্রীর ভাকও দেওয়া হবে। এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নেতা বা নেত্রী প্রতিশ্রুতি চাকরির অধিকারী হবে। তাকে ঘিরে প্রশস্তির ঝড়ী ঝুলিয়ে পড়বে। বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবে। কিন্তু তুমি আমি কী পাবো। সদীপের শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে আমরা চোখের জল ফেলবো। স্মৃতি নিয়েই আমাদের জীবন কাটাতে হবে। কিসের আশায় সদীপরা বিশ্বাস হয়, আমি বুঝতে পারি না। সদীপকে নিয়ে রেবতীবাবুর উদ্বিগ্নতা মিনতিকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই সদীপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা একপক্ষে মেনে নিতে পারেননি। বললেন, সদীপ যদি সত্যিই কিছু টাকা জমিয়ে আনতে পারে তাতে তোমার এত আপত্তি কেন? ওর তো ব্যবসার জন্য টাকার দরকার।

ঘুটো টিউশনি করলেই তো পারে।

লেখাপড়ার দিকে যেমন ওর মোটেই ছিল না। আর তুমি বলছ ওকে টিউশনি করতে?

তাহলে তুমিই ওকে এই পথে আসার জন্য যথেষ্ট ঘুণিয়েছ। যদি কোনো অঘটন ঘটে, তখন কিন্তু মোকের জল ফেলতে পারবে না।

আমি ওকে মদত দিইনি। আমি বিদ্রোহিতা করলেও কি ও শুনতো? ওকে তো ঘরে আটকে রাখা সম্ভব নয়। আটকে রেখেও কি ও করতে না করছে, তা কি আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হতো? তবুও তাকে বলতে হবে, ও ঘুষিয়েছেনিয়ে কিছু করছে না।

ছেলের প্রসঙ্গে ভাবতে ভালো লাগে রেবতীবাবুর। এক অনির্দেশ ভবিষ্যতের পথে ছুটে চলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াচ্ছে। যেদিন ওকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে, সেদিন আর কিছুই করার থাকবে না। অসহায়তা কখন ছায়া তখন হতাশার যন্ত্রণা

থেকে মুক্তি পাবার আর কোনো পথ খুঁজে পাবে না। এই বয়সের ছেলে হয়ে এমন পরিস্থিতিতে যেন সেওয়ার একটাই অর্থ, পরিবর্তিত ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

মুখুজ্জেই বাড়িতে ফিরে এলো সন্দীপ। অবশ্য আসার আগে ওকে পিতৃদেহটি ফিরতে হবে। তবে কী কোনো অঘটন ঘটেছে?

মিনতি উদ্বিগ্ন হয়ে সন্দীপের ঘরে ঢুকলেন। সন্দীপ মাকে দেখেই বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমাকে এখনই খেতে দাও।

অন্য যে কোন দিন ছুটে গিয়েছিলেন সন্দীপের কাছে, তা উচ্চারণই করতে পারলেন না। বাড়িতে ফিরে স্নানাদি সেরে নিয়ে কিছু মিষ্টিমুখ করলেই ওকে হবে, তোমাকে কী তখন আমি বাড়ির বাইরেই রাখি। সন্দীপ যদি নিজেই যদি আলোচনার সূত্রপাত না করে তবে শত উদ্বিগ্নতা সত্ত্বেও নির্বিকার থাকা ছেলে।

খেতে দিয়ে সন্দীপের পাশে বসে রইলেন মিনতি। সন্দীপের কথা শোনার অপেক্ষা নিয়ে। কিন্তু একটা কথাও সে উচ্চারণ করলো না। খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে যাবার আগে বলল, যদি কেউ আমাকে খুঁজতে আসে, বলে দেবে আমি বাড়িতে নেই। সেই সকালে বেরিয়েছে, আজ ফিরতেও পারে, আবার নাও পারে।

এর মিষ্টি বলা কি সম্ভব হবে? জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেলেন না মিনতি। কিন্তু এই মিষ্টি আচরণের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে, অনুমান করতে পারলেন।

ডেবরীবাবু ঘুমিয়ে আছেন। সন্দীপ ফিরে এসেছে জানতে পারলেই এখনই তাঁকে দু'জনের মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

সন্দীপের অনুমান মিথ্যে হয়নি। জিজ্ঞেস অবশ্যই নাগরা সন্দীপের সন্ধানে এসে ছিলো দুই উদ্যমন্ত মূরক। মিনতি সন্দীপের নেওয়ানো খুলি হয়ে যাজিয়ে গেলেন। খুশী সতর্ক ছিলেন যাতে কোনো ভড়তা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। একটু ত্রুটি ঘটলেই তো তুলকালাম কাণ্ড বেধে যেতে পারে অধিকারের সূত্র ধরে।

ওদের একজন যার চোখালে এক বিঘৎ লেলাইয়ের দাগ, জিভস পাল, পা নাচাতে নাচাতে বলল, আপনি সত্যি বলছেন তো মাসিমা। ওকে জেরাতে না পেরেই এখানে এসেছি।

কি প্রয়োজন আছে বলে যেতে পারো, ও ফিরলে অবশ্যি বলে দেব।

আপনাকে বলা নিষেধ। গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে আমাদের কাজ করতে হয়। ও যদি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আপনি ওর লাশ ফিরে পাবেন। সন্দীপকে এ কথা বলে যেবেন।

মিনতিকে পাল্টা কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ওরা দু'জনে এক জলচ্ছি হিন্দী গানের সুরে শিস দিতে দিতে চলে গেল।

এদের সঙ্গে মিশছে সন্দীপ। এবার আতঙ্কিত না হয়ে পারলেন না মিনতি। সন্দীপ পালিয়ে এসেছে কেন? ওদের সঙ্গে কোনো কাজে যাবার কথা ছিল। যদি ওদিকেই কোনো মতবিরোধ ঘটে যায়, তবে ওরা সন্দীপকে খুন করতে পারে। সন্দীপকে এখন থেকে আড়াই তোপাও পাঠিয়ে দিতে হবে। সন্দীপ জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ওদের আসতেই দেখতে পেয়েছিল। ওদের দিকে তেড়ে যেতেই সন্দীপ অনুমান করতে পেরেছিল, মা তার ভূমিকা সঠিকভাবেই পালন করতে পেরেছে। কিন্তু কাল তো আবার ওদের সঙ্গে তেজতে দেখা হবে। কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে অভিযুক্ত করে ওরা নালিশ জানাবে পরমেশবাবুর কাছে। তার জন্য কী শাস্তি হতে পারে, অনুমান করতে পারছে না সন্দীপ। এই সামান্য অপরাধে কি ওরা জীবন কেড়ে নিতে পারে?

মিনতি ডায়রির কাগজ সন্দীপের হাতে দিয়ে বললেন, ওরা কেন এসেছিল তোর কাছে? তুই ওদের সঙ্গে মেলামেশা করিস না। ওরা ভালো কাজ করতে পারে না।

এ কী কথা বলছ তুমি। ওরাই তো জয়দেবের খনির সহযোগী। ওদের সাহায্যেই উনি মানুষের চোখ ফোটান।

মিনতি চেয়েছেন তাঁর কলেজ-জীবনে দেখা ব্রাহ্মণৈতিক নেতাদের সঙ্গে আজকের ব্রাহ্মণৈতিক নেতাদের। চেহারা না কিছুতেই। তাঁরা বিত্তির পেশার নিযুক্ত থেকে যেমন সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তেমনি তাঁরা চেয়েছিলেন সামাজিক প্রয়োজনে নিজেদের কর্মযজ্ঞকে উৎসর্গ করে দিতে। এখন ব্রাহ্মণীতিতে আসতে তারাই, যাদের যোগ্যতা নেই, যারা ক্রিমিনাল, যারা ব্রাহ্মণৈতিক ক্ষমতা লোভী।

মিনতি বললেন, তুই কেন ওদের সঙ্গে মিশতে গুরু করলি? আমাকে কিছু আগে জানাসনি।

আমাকে টানার লোক খেলিয়ে নিয়ে ফেলেন পরমেশবাবু। আমাকে উনি বলেছিলেন, পোস্টের ডিজাইন করা, মিটিং-মিছিল আয়োজন করা, শহরের বিভিন্ন জায়গায় হোর্ডিং লাগানোর ব্যবস্থা করা—ইত্যাদি কাজে সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে। কিন্তু আজ ওখানে যেতেই পরমেশবাবুর সহযোগী পুলকেশ আমার হাতে দু'শো টাকা দিয়ে বলল, আজ বিকেলে পূর্ব কলীতে অ্যাকশন আছে, তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। আমি রাজি হইনি। অবশ্য ওই কলী কমিটির নেতা জয়দেব আমার কলেজের সহপাঠী ছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শে আমাদের বিপরীতে থেকেও ওর সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। ওকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য পরিকল্পনাকে আমি কেন মদত দিতে যাব। তাছাড়া, পরমেশবাবু আমাকে যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতে ওখানে নিয়ে গেছেন, তার বাইরে আমি অন্য কাজ কেন করব? ওরা এভাবে আমাদের অ্যাকশনে নিয়ে গিয়ে একজন নিরীহমানুষ খুনের উদ্যোগ নিচ্ছে।

তুই কেন পরমেশবাবুর সঙ্গে তর্ক জুড়লি?

উনিই তো এই পরিকল্পনার রূপ-চিত্র তৈরি করেছেন। জয়দেবকে সরাতে না পারলে ওই কলী এলাকায় পরমেশবাবু ঢুকতে পারবেন না। জয়দেব ওই অঞ্চলে খুশী জনপ্রিয় নেতা। অ্যাকশন হলেই এককাউন্টারে জয়দেবের উপর হামলা চালানোর সহজ সুযোগ পাওয়া যাবে এবং খুন করতেও বিশেষ কষ্ট করতে হবে না।

এই ঘটনা ঘটলে তো তোদের নেতাকেই সন্দেহ হবে। জনগণে ঘৃণা ছিটবে, কাগজে ঢি-টি-টাই লেখা হবে। জয়দেবকে শান্ত মিছিলের ওপর হামলা চালিয়েছে বলেই প্রতিক্রিয়াতে জনসাধারণ হামলা করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জয়দেব মারা যায়। আমাদের নেতা সহদেববাবুর বিবৃতি প্রচারিত হবে সব চ্যানেল মাধ্যমগুলিতে। একা বুঝতে পারছ, মানুষ কথা সহজে বিশ্বাস করবে। জয়দেব যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, তার নেতাদের প্রতিক্রিয়া কোনো সংবাদে গুরুত্ব পাবে না।

তাহলে তো ষড়যন্ত্রের বিষয়। তোদের দল কি প্রত্যেকবারই এমনভাবে মিস ফেলেছে?

তুমি দেখো না সংবাদপত্রগুলি কেন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী প্রচারে সাহায্য বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে? সংবাদপত্রের মালিকরা ব্যবসায়ী। মুনাফা অর্জনই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ওরা সেই দলকেই সমর্থন করবে, যাদের সাহায্যে সংবাদপত্র প্রকাশনা ব্যবসা চালার সাহায্য করতে পারবে। মহাদেববাবু অন্য অনেক নেতার চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে আছেন। তিনি কয়েকটি সংবাদপত্র-সম্পাদক অথবা মালী সাংবাদিকদের ভাই, যে অথবা শালককে ভালো ভালো চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন।

তুই যখন এত গভীরভাবে ওদের চক্রান্তের রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাহ কেন কিছু ঘটার আগে ওদের পাতা ফাঁদে ধরা দিলি?

আমি আগে কিছুই জানতাম না মা। ভেতরে না ঢুকলে বাইরে থেকে কতটু বোঝা যায়। সাধারণ মানুষ ঘুণাক্ষরে পরা নেতাদের দেখেই বিভ্রান্ত হয়। ওদেরকে ভোট দেয়। নেতারা ভোটে জিতে সমাজ-সেবকদের মর্যাদা পেয়ে নিজের আখে গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জয়দেববাবুর বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে বিলাসী-জীবনযাপ চিত্র আমি নিজের চোখে দেখেছি। অবশ্য উনি বলেন, ওটা ওনার শ্বশুর বাড়ি। নিজে ভালো চাকরির ছাড়ওয়ালা পড়েশুনার খরচা বাড়িটাই তাঁর একমাত্র সম্বল।

এত সব জেনেও তুই ওদের দলে আসবি?

আর তো কোনো উপায় নেই। এখন পালিয়ে আসতে চাইলে ওরা জয়দেবে মতো আমাকে খুন করতে চাইবে। তুড়ি দিন পরেই নির্বাচন। এই ক'টা দিন কো মতে কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি। তারপরেই সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেব।

সে কাজ সহজে করা সম্ভব হবে কিনা, এ নিয়ে মিনতির মনে এক সন্দেহ আবর্ত তৈরি হয়ে উঠলো। ওদের সাহসী এড়ানো গিয়ে আবার না চরম বিপা মুখোমুখি হতে পড়ে! জয়দেবকে খুন করার চক্রান্ত যেভাবে ওরা ছকেছে, ও আরো আর একটা খুন করা খুবই সামান্য ব্যাপার। সন্দীপ যোগদান সংবাদ বাইরে প্রচ হয়ে পড়ার সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে ওদের হাতে এই একটাই ফলপ্রসূ অস্ত্র আছে সন্দীপকে হত্যা করলে যে এগিয়ে যাবে প্রতিবাদ করার জন্য। সেই আশঙ্কায় মো খেয়ে মিনতি জিজ্ঞেস করলেন, তুই কী আজ বেরোবি।

বেরোতেই হবে। বেরোনা না গেলে পরমেশবাবু নেতৃত্ব পাঠাবেন আমাকে তু নিয়ে যেতে। আজ না গেলে উনি ভাববেন জয়দেবকে গোপনে খবর আমি দে দেবার চেষ্টা করেছি, ওকে সতর্ক করে দিতে।

একা একা যাবি, যদি বেজায় বিপদ ঘটে।

একলাই যাবে তেমন কিছু ঘটবে না। পরমেশবাবু সতর্ক করে দিতে পারেন। আ

নির্দেশ অমান্য করলে তার ফল কী মারাত্মক হতে পারে, সে সম্পর্কে আলোচনাও করতে পারেন।

সন্দীপ স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার নিতে নিতে পরমেশ্বরার অভিপ্রায় দূর করে হাসির। ওকে কেন গ্রেপ্তার দেখাতে চেয়েছে? নাম মনে নেই। পরমেশ্বরাই ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। দূত পরমেশ্বরার দেখানো ঘুলি উপরতে শুরু করলো। আপনি আমাকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে এসেছেন কেন। ফিরলে জনবিহারীর মেয়ের ডেলিভি চেয়ারের কথা ছিল, আপনি না থাকতে সেই কাজ আটকে করতে হয়েছে।

দূতের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অ্যাকশন করার জন্য ওরা টাকা দিয়েছিল কেন? ঠিক একই সময়ে পূর্ব বঙ্গীর দিকে নির্বাচনী-প্রচারের মিছিল নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সন্দীপ একটু গলা চড়িয়ে বলল, আপনি সঠিক জানেন আমার জন্য ওই কাজ আটকে করতে হয়েছে?

আমি আপনাকে ইনফিরিয়ে দেবার জন্য এখানে আসিনি। পরমেশ্বরার কাছে গেলে আপনি নিজেই সব জানতে পারবেন। আর অনর্থক সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি চলুন।

নিয়ে যাবার জন্য এত তাড়া কেন? তবে কি যেমনো ষড়যন্ত্র চলেছে এর আড়ালে। কিছুটা কেন আঁচ করতে পারছে সন্দীপ। পরমেশ্বরার নির্দেশ মান্য করার ছলে ফেরে বিপদের দিকে ঠেলে দেবার মতলব নেই তো। কিন্তু ওর সঙ্গে না গিয়েও তো উপায় নেই। বিপদের আশঙ্কা নিয়েই সন্দীপ গাড়ি থেকে নেমে এসেছে ঘাড় হলো। মিনতি বললেন, তুই তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস। আমরা কিন্তু খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকবো।

সন্দীপ নিজেই জানে না পরমুহূর্তে কি ঘটতে চলেছে। এক চরম অনিশ্চিতের পথ ধরে সে এগিয়ে চলতে শুরু হচ্ছে। তবুও ভয়কে আড়াল দিয়ে সন্দীপ বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ফিরে আসবো।

চেম্বারে এসেই সন্দীপ দেখলো, পরমেশ্বরা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছেন। তাঁর হাতে ছলন্ত সিগারেট আর কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। তবে কী আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে? সব ষড়যন্ত্র কেউ ফাঁস করে দিয়েছে। সন্দীপকে দেখেই পরমেশ্বরা চরম উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করে আড়ি চাল দিয়েছিলে কোন সাহসে?

আমাকে অ্যাকশনে যাবার জন্য আপনিই কি নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজের জন্য আপনি তো আমাকে এখনে ডেকে আনেননি।

সন্দীপের আত্মরক্ষার সওয়ালকে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ বলে মনে করলেন পরমেশ্বরা। এত সাহস বে ওরে জোগালো? তিনিও আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে বললেন, তুমি কী এখনে প্রশ্নবাণ করতে এসেছে যে নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া তুমি আর কিছু করবে না? প্রয়োজন হলে তোমাকে অন্য কাজও করতে হবে। তোমাকে দু'শো টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। অ্যাকশনের পর আর এক হাজার টাকা পেতে। তুমি পালিয়ে গিয়ে অমার্জনীয় অপরাধ করেছ। তার শাস্তি কি হতে পারে তুমি অনুমান করতে পারছ? এর জন্য মৃত্যুই তোমার একমাত্র প্রাপ্য।

চরম শাস্তির কথা শুনে সন্দীপের শরীর আতঙ্কে কেঁপে উঠলো। এই ঘর-বাড়ি চেয়ের সামনে দুলছে। এখনই তলের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না সন্দীপ। চেয়ারে বসেই হাঁপাতে লাগলো। পরমেশ্বরা বললেন, তুমি সবে বলে এসেছ, তাই বোধহয় জানতে না কত কঠিন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বেখে আমাদের কাজ করতে হয়। তাই এবার তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। ভবিষ্যতে এমন ভুল আর করবে না আশা করছি। যদি করো, তখন কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারবো না। পৃথিবীর আলো চিরকালের জন্য তোমার চোখ থেকে মুছে যাবে।

দুর্বাসার অভিশাপের নির্দেশ শুনেই সন্দীপ চেতনা ফিরে পেল। কিন্তু এই বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রতি মুহূর্তে অন্তর্বিশ্বাসের অভাব প্রকট হয়ে উঠবে। এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে চায় সন্দীপ। তাই বলল, আমাকে ছেড়ে দিন পরমেশ্বরা। আমি আপনার মতের ছয়ে আর কাজ করতে চাই না। যদি আমার ভুল করে থেকি, তখন—

সে কী কথা সন্দীপ! তোমাকে একবার যখন অপরাধমার্জনা তোমার সুযোগ দিয়েছি, তখন কি তুমি নিজের খুশি মতো বেরিয়ে যেতে পারবে? এখন তুমি আমার খাঁচার পোষা পাখি। আমি খাঁচা খুলে না দিলে তুমি পারবে উড়ে যেতে? তাছাড়া, এখনে ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে আড়াই টাকা। তুমিই তো ফেরেছিলে টাকা আমাতে। সে টেকা এর মধ্যেই ছুটে গেল। তুমি আমাদের মতো এসে যে কাজ করছে, তার বিনিময়ে তুমি কত টাকা পেতে পারো, সে হিসেব আমি করে রেখেছি। তুমি পাবে দশ হাজার টাকা। এখনই তোমাকে আমি পুরো টাকা দিয়ে দিচ্ছি। এত টাকা তোমাকে আর কোনো রাজনৈতিক দল দিতে পারবে না। এত টাকা তোমাকে দেব, আর তুমি আমার নির্দেশ মেনে কাজ করতে চাইবে না?

সন্দীপের হাতে ক্রড়বড়ে একশ টাকার একটি আভিল। টাকার ঘ্রাণ নাকে ভেসে আসছে। এত টাকার স্পর্শ সন্দীপ আগে কখনও পায়নি।

পরমেশ্বরা বললেন, এবার তুমি যেতে পারো। কাল সকাল ন'টার মধ্যে এখানে আসবে। কি করতে হবে আমি তোমাকে বলে দেব।

তিন

সকালে কাগজ আসতেই সন্দীপ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজতে লাগলো গতকালের পূর্ব বঙ্গীতে আক্রমণের খবর। নির্বাচনের আগে দলীয় সংঘর্ষের নিত্যনৈমিত্তিক সেই খবর ছাপা হয়েছে পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রথম কলামে। অবশেষ গুরুতর আহত। এস. আর. এস. হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই সংঘর্ষের জন্য উভয় দলের নেতা অন্য দলের ঘাঁড়ে সমালোচনা করেছে। শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর আমলেন আক্রমণ চালিয়েছে। তাই পরিস্থিতিতে এই ভয়ানক সংঘর্ষ। দুষ্কৃত অপরাধীর শাস্তির দাবিতে নেতারা মুখর।

কাগজে সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গী দেখে সন্দীপের হাসি পেল। এভাবেই ওরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সন্দীপ যে জানে আসল অপরাধী কারা। কিন্তু ওর পক্ষে সত্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জীবনের ঝুঁকি আছে। পরমেশ্বরা কাউকেও করতে চাইবেন। সন্দীপ একবার ভেবেছিল, অবজেশের কাছে যাবে। পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, ওকে জানাবে কারা আসল অপরাধী। কিন্তু যাওয়া তো সম্ভব নয়। পরমেশ্বরার ওণ্ডাবাহিনীর কাছে ধরা পড়ে গেলে চরম শাস্তি পেতে হবে। পুরনো বন্ধুত্বের মর্যাদা দেবার জন্য যে মনুষ্যত্ব বোধের প্রয়োজন হয়, তা পরমেশ্বরা অনেকদিন আগেই হারিয়ে ফেলেছেন। পরস্পরের স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে জটিল বজায়তে পেরেছে দলীয় রাজনীতি। আর এই মানসিক সংকটের সুযোগ নিয়ে ভয়ানক লুটের ওপরাধিক রাজনৈতিক নেতারা। সন্দীপের মনে হলো এদের মুখোশ খুলে দিতে পারলেই মানুষ প্রকৃত চেহারা দেখে ঘৃণাতে উঠবে। বুঝতে পারছে কাদের ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে। কিন্তু মানুষ কি সহজে বিশ্বাস করবে। কাগজের পাতা জুড়ে যাদের সমাজ-সেবার মুখোশ ছাপা হয়, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করবে না।

সন্দীপের নাকে ভেসে এলো নতুন টাকার গন্ধ। প্রতিরক্ষী সত্তার উপর মুখ নিরাসক্ত ভেবের ছায়া নেমে এসে ঢেকে দিল। অন্তর্দ্বন্দ্ব এর সঙ্গেহীনী শক্তি। অবজেশকে খুন করার চক্রান্ত ওরা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের প্রকাশের তাগিদ কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

একশও মাকে জানাতে পারেনি সন্দীপ, পরমেশ্বরা পরিচয়ের বিনিময়ে কত টাকা দিয়েছেন। নতুন টাকার গন্ধ মাকেও কী শক্তি দিতে পারবে? মাকে ভাবলেশ সন্দীপ।

মিনতি এলে সন্দীপ অবজেশের উপর আক্রমণ নিয়ে যে বিকৃত সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কে একটিও কথা না বলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে নোটের আভিলটা বের করে মায়ের হাতে দিয়ে বলল, পরমেশ্বরা আজ আমাকে দিয়েছেন।

নোটের আভিল হাতে নিয়েও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মিনতি। বললেন, সত্যিই তোকে দিয়েছে? আবার কেনার চাইবে না তো?

আমার পারিশ্রমিক। কেনার চাইবে কেন?

তাহলে তোর পরমেশ্বরা নিশ্চয়ই তোকে খুব ভালোবাসে। না হলে তোকে দিয়ে দিয়ে কেউ এত টাকা দেয়?

ভালোবাসার প্রসঙ্গ তুলতেই সন্দীপের মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরার রমকির কথা। নির্দেশ অমান্য করার অপরাধের শাস্তি দিতে পরমেশ্বরা কতটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেন। মিনতিকে আবার পরমেশ্বরার ঘটনার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানায়নি সন্দীপ। বলল, তুমি ভুল করছ মা। এখানে ভালোবাসার কোনো প্রশ্ন নেই। আমি কাজ করেছি, তার মূল্য পেয়েছি।

মিনতি রেবতীভূষণের টাকা ফেরতের জন্য প্রায় ছুটে গেলেন। এই ছেলে তোমার ছেলে কত টাকা রোজগার করেছে। তুমি তো আমাকে বলেছিলে, ওরে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে ফাঁকি দেবে। কেমার খোট লাভ কী? এখন বুঝতে পারছ ওরে ওর করলে মর্যাদা দেয়।

কিন্তু এত টাকা যদি তার একজনকে দেয়, তবে কত টাকা একজন নেতা নির্বাচন

উপলক্ষ্যে খরচ করছে? কেন উদ্যোক্তা এত টাকা ঢালছে? কোথা থেকে এত টাকা পাচ্ছে?

রেবতীবাবুর এসব মিনতির বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি। উপরন্তু প্রশ্নগুলিকে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, সে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? যেখান থেকেই টাকা পাক, টাকা খরচ না করে তো নিজের ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। সদীপনের মতো যেকোন ছেলেরই এই মহৎকাজে কিছু টাকা ডোনেশন করার সুযোগ পাওয়া।

রেবতীবাবু টাকার ব্যাপারে নেতিবাচক ভাব দেখাতে চেষ্টা করছেন, মিনতির মতো উদ্ভাস তাঁর নেই। একটাই জিজ্ঞাসা তাঁর মনে জাগছে, এত টাকা দেবার পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য লুকিয়ে নেই তো? জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেই রেবতীবাবুর আশঙ্কা ভালকেলেঙ্কারীর ভয়ের মতো তীব্রতার সঙ্গে পরিণত হয়ে গেল। তিনি ব্যাপারটা ভুলে যেতে দিলেন। পুলিশের গাড়ি ছুটে আসছে এ বাড়ির দিকে। সদীপকে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করতে চায়।

রেবতীবাবু মিনতিকে বললেন, এবার বুঝতে পারছ, তোমার ছেলে কেন পথে পা বাড়িয়েছে? টাকার ব্যাপারটা ঝুলে ঝুলিয়ে রাখো। সদীপ আপনার। বিশ্বাসেই মেনে নিতে পারছেন না মিনতি। নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে সদীপ। পুলিশ কি সে কথা শুনতে চাইবে?

রেবতীবাবু নিজেই এগিয়ে গেলেন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে। পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে বললেন, সদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। সদীপবাবু অত্যন্ত ঘিনঘিনে হত্যা করার চক্রান্তে যুক্ত ছিলেন।

রেবতীবাবু চিৎকার করে উঠলেন, জঘন্য মিথ্যে কথা। ও তখন বাড়িতেই ছিল।

এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছি না। আমি শুধু নির্দেশ পালন করতে এসেছি। তবে আমি শুনেছি, সদীপবাবুই আক্রমণের নেতা ছিলেন। এই কাজে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ছত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে। আমাদের চোখে উনি একজন পেশাদারী খুনী। আপনার যদি কিছু বলার থাকে আপনি কোর্টে গিয়ে বলবেন। আইনের পথটা তো খোলাই আছে।

মিনতি কাঁদতে কাঁদতে পুলিশ অফিসারের কাছে আবেদন জানাতে থাকলেন, বিশ্বাস করুন, সদীপ বাড়িতেই ছিল। ওকে ফোন করেছিল পরমেশবাবু। কিন্তু ও যায়নি। মমতেশ ওর কলেজের সহপাঠী ছিল। ওর সঙ্গে কথা বলতে সদীপ চায়নি। কেউ ওকে এই জঘন্য ঘটনার সঙ্গে জড়াতে চাইছে।

আমি কিছু জানি না। আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। কোর্টে কেস উঠলে আপনি আপনার কথা বলবেন। বিশ্বাসক যদি মনে করেন আপনার ছেলে নির্দোষ, ছাড়া পেয়ে যাবে। আমার কাছে আপনি আর কিছু বলবেন না। সদীপবাবুকে ডাকুন।

সদীপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের গাড়ি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই পরমেশবাবু এসে হাজির। সদীপের ফোনা-বিকৃত চা-জগতের সমবেদনা জানানোর জন্যই তিনি এসেছেন।

রেবতীবাবু ঘটনার আকস্মিকতার জন্যই বিভ্রান্তভাবে পুরোপুরি বিধ্বস্ত। সদীপ পেশাদারী খুনী। পুলিশের এই অভিযোগ কেমন করে তিনি মেনে নেবেন? প্রতিবেশীদের কাছে এ বাড়ির সম্মান কতখানি বিপন্ন হয়ে পড়ল। তাদের মুখোমুখি কিভাবে সহজ হবেন? মিনতিও আতঙ্কিত। আবার যদি উনি পুরানো অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এবার হয়তো ওনাকে বাঁচানো যাবে না।

পরমেশবাবু এখন এসেছেন কী করতে? রেবতীবাবুর সন্দেহ, সব ষড়যন্ত্রের মূলেই আছে এই মানুষটি। তবুও অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার সাহস পেলেন না। পরমেশবা জানালেন, আমি খবর পেলাম, পুলিশ সদীপকে থানায় নিয়ে গেছে অত্যন্তের উপর আক্রমণের অভিযোগে। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি যতক্ষণ আছি, সদীপের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ব্রাহ্ম পুলিশ-প্রশাসনের এই তো অবস্থা। প্রকৃত অপরাধীরা মুক্ত ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। আর নির্দোষ নিরপরাধীদের ধরে নিয়ে জেলে পুরছে। এই অরাজকতা আমাদের দল কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। আমি সদীপকে ছাড়িয়ে আনার জন্য জামিনের ব্যবস্থা করছি। আজ হবে না, কাল বিকেলের মধ্যেই সদীপকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজেই আসবো। সদীপ আমার ছোট ভাইয়ের মতো। ওর উপর কোনো অবিচার হোক, আমি চাই না।

রেবতীবাবু পরমেশবার কথা শুনে বুঝতে পারছেন না, কার এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। যাকে প্রথমে সন্দেহ করেছিলেন, সেই তো এগিয়ে এসেছে ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে। তবুও অবিশ্বাসের ছায়া মন থেকে পুরোপুরি মুছে দিতে পারলেন না। মিনতি বললেন, আমি নিঃস্বার্থ হয়ে পরেছিলাম। বলতে পারেন, যে পার্টিতে ছেলে এলো, তারাই পেশাদারী-খুনী দিয়ে হিটলিস্ট করালো কেন পুলিশ। কারা ওর নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে পুলিশের কাছে নালিশ করেছে?

বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না। কাল আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম তা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। ও কী আমার বিরুদ্ধে আপনাদের কিছু বলেছে?

সদীপ আমাদের কিছু বলেনি। ওকে অ্যাকাউন্টে পাঠানোর জন্য কে উদ্যোগ নিয়েছিল? ও যায়নি। সেই অ্যাকাউন্টেই কী ওর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে? আপনি কিছু জানেন না, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি ওকে ডেকে নিয়ে গেছেন, আপনার বাড়িতে ছিল, ও যাতে বিপদে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

আপনি কেন আমাকে অবিশ্বাস করছেন? আমি যদি এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকতাম, তবে কী এখানে ছুটে আসতাম? আমি কী পারতাম ওকে জেল থেকে মুক্ত করে আনার জন্য জামিনের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিতে?

এটাও আপনার রাজনৈতিক চাল হতে পারে।

কোন ঘটনার ভিত্তিতে আপনি আমার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমি সদীপের ক্ষতি করতে চাই না। নির্বাচনের কাজে আমি যাদের ছেলেদের ডেকে নিয়ে এসেছি। আমার উদ্দেশ্য একটাই। আমাদের পক্ষে সকলকে টাকাটা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যেকারণে যাতে এই সুযোগে কিছু টাকা ডোনেশন করতে পারে, সেই চেষ্টাই আমি করছি। আমার এই সামান্য উদ্যোগকে যে নিশ্চয়ই জঘন্যতম করে দিতে চাইবে। সদীপকে হয়ত সেই কারণে খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। যে কেন উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করেছে, আমি এখনও জানি না জানতে আমি পারবোই। ও যাতে তাড়াতাড়ি মুক্তি পায়, সেই ব্যবস্থা করাই এখন আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী কাজ। পরে বুঝবেন, কে অপরাধী। আর একটা কথা পুলিশ-প্রশাসন তো আমাদের হাতে নেই। ওদের ভুল আচরণের জন্য কৈফিয়ৎ আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

সদীপকে পুলিশ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেল, প্রতিবেশীরা দেখেছে। ওর জীবনের উপর কলঙ্কের যে ছাপ পড়ল, তা মুছে ফেলার দায়িত্ব কে নেবে?

পরমেশবা এই জঘন্য ওজর না দিয়ে বললেন, আপনি অনর্থক দুশ্চিন্তা করছেন। রাজনৈতিক কারণে অনেকেরই একদিন না একদিন জেলে যেতে হয়। ও জেলে নতুন নয়। যে যতবার জেলে যায়, তার ইমেজ ততো বাড়ে। সদীপ একবার ঘুরে এলেই একজন নামী নেতা হয়ে উঠবে।

ইনি কী বিদ্রূপ করতে চাইছেন? একজন নিরপরাধ ছেলেকে মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, তাকে সমর্থন করতে ইমেজ বাড়ার কথা বলে? এই প্রস্তাবের জন্য রাজনৈতিক নেতারা জেলে যায় উদ্দেশ্য মনে। পরমেশবার বক্তব্য শুনে মিনতির মনে হয়েছিল ওনাকে এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারলেই সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূলতা মিনতিকে সংযত করে দিয়েছে। উপরন্তু বিনীত হতে মিনতি বলল আমাদের জন্য যথা যেবার চেষ্টা করুন। আপনি যদি এই সময়ে...

আমি বুঝতে পারছি ছেলেই তো ছুটে এসেছি। আমারও দায়িত্ব ছিলো পুলিশ হেফাজত থেকে সদীপকে উদ্ধার করে আনার। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি ওকে পৌঁছে দেব আপনাদের কাছে।

পরমেশবার আশ্বাস বাণীতে মিনতির মন ভরলো না। রাজনৈতিক ব নেতৃত্বদের কথার আস্থা রাখা এই সময়ে সবচেয়ে বড় পাপ। তবুও সেইমুহূ ওনাকে ধরে রাখা কিছুতে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ছেলের ঘরে পুলিশ সদীপের উপর শারীরিক অত্যাচার করে। ওকে যদি পঙ্গু হয়ে ঘরে ফিরতে না। আর ভাবতে পারছেন না মিনতি। একটা হাত মাথা ঘুরে মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

পরমেশবা চলে গেছেন। রেবতীবাবু চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। অনেকক্ষণ কে কথা বলেননি। আবার কী ঘুমের যন্ত্রণা ফিরছে। মিনতি ঘুমের উপর হাত রাখ রেবতীবাবু চোখ মেললেন। চোখের দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে। মিনতি জিজ্ঞেস করল শরীর কী ভাই হচ্ছে আজকে বলুন।

রেবতীবাবু উত্তর দিতে পারলেন না। দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মি

উদীপ্ত হয়ে উঠলেন। এখনই ডাক্তার ডেকে আনা প্রয়োজন। কিন্তু অসুস্থ মানুষকে ফেলে এক মেঝে থেকে সরতে সাহস পাচ্ছিলেন না। যদি তাঁর অনুপস্থিতির মুহূর্তে কোনো অঘটন ঘটে যায়! মিনতি বলছিল, ডাক্তারবাবুকে আনার জন্য কী করব পরাগ!

রেবতীবাবু হাত নেড়ে ইশারায় নিষেধ করছিলেন। তবে কি পরিস্থিতি অবস্থা এতই খারাপ যে কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন! কি হবে, কি হবে, এই দুশ্চিন্তা নিয়ে মিনতি রেবতীবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করলেন। রেবতীবাবু ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, সলীল কখন ফিরবে?

জানা ছিলো। পরমেশবাবু আমাকে কথা দিয়ে গেছেন।

পরমেশবাবুর নাম শুনে রেবতীবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, ওই লোকটার মুখ আমার সামনে উচ্চারণ করো না। উনিই তো সলীলকে টাকার লোভ দেখিয়ে ওই পথে টেনে নিয়ে গেছেন।

আর কথা বলতে পারছিলেন না রেবতীবাবু। ক্লান্তে ঘেমে ক্লান্ত হলেন। অনেক প্রতিক্রিয়ার তাঁর বুকের মধ্যে পাঁজরের মতো জমাট বেঁধে আছে। সুযোগ পেলেই বেপরোয়া কর্তার মতো বেরিয়ে আসবে। পরমেশবাবুকে অভিযুক্ত করে তাঁর আক্রমণ চালাতে পারলে তবেই তৃপ্তি অনুভব করবেন। সলীল ফিরে এলে ওকে বলবে পরমেশবাবুর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে।

রেবতীবাবু কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বললেন, সলীলকে পরমেশবাবু যে টাকা দিয়েছেন আমার চিকিৎসার জন্য সে টাকা খরচ করবে না। আমাকে না জানিয়ে যদি করে, তাহলে আমি কোনোদিন সুস্থ হয়ে উঠব না। তুমি যদি আমার মৃত্যু চাও, তবেই আমার নিষেধ অমান্য করো।

মিনতি সান্ত্বনা প্রতিবাদ করতে চাইলেন। গত দু'মাসে চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, হাতে আর টাকা নেই। এখন যদি আবার ডাক্তার ডাকতে হয় তবে কোথা থেকে টাকা পাবেন? মাস শেষ না হলে অফিস থেকে কোনো টাকা পাওয়া যাবে না। রেবতীবাবুকে বোঝাতে চাইলেন, সলীল এই টাকা পরিশ্রমের বিনিময়ে রোজগার করেছে। পরমেশবাবু দয়া করেননি। সুতরাং চিকিৎসার জন্য খরচ করতে তোমার আপত্তি কেন?

এই টাকায় ওদের পাপের রক্ত লেগে আছে। তুমি ছুঁয়ো না। সলীল যদি টাকা না পেত, তাহলে কী আমার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যেত?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন মিনতি। কিন্তু রেবতীবাবু কথা বলতে বলতে এবারে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে নীরবতা পালন না করলে তাঁকে মারাত্মক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যেত না। মিনতি বুঝেছিলেন, রেবতীবাবু তাঁর বিশ্বাসের বিরোধিতা সহ্য করতে পারছিলেন না। এই শারীরিক অবস্থায় উত্তেজনা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

পরমেশদা কথা রেখেছেন। মানুষের মনে বিশ্বাস জাগানোর জন্য অনেক সময় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হয়। সলীলকে জামিনে মুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। রেবতীবাবুর সঙ্গে দেখা করে পরমেশদা বললেন, এবার আমার বিরুদ্ধে আপনার কোনো অভিযোগ নেই তো! পুলিশ ইচ্ছে করলেই মনগড়া অভিযোগ এনে আবার তুলি গ্রেপ্তার করতে পারে। তাতে আবার বাধার কিছু নেই। আমরা তো আছি। দেশে আইন আছে। পুলিশকে কীভাবে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হয় আমরা জানি।

সলীল সুস্থ শরীরে বাড়িতে ফিরে এসেছে, তাই রেবতীবাবুর মনে আর অসুখ নেই। পরমেশবাবুকে এবার কিছুটা বিশ্বাস করতে পারছেন। তিনি মিত হাসিতে ঠোঁটদুটোর মুখে সামান্য উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে এনে বললেন, আপনারা রাজনৈতিক নেতা। আপনারা অনেক কিছুই করতে পারেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ এত ক্ষমতা কোথা থেকে পাবে!

আমাদের নিজেদের কোনো ক্ষমতা নেই রেবতীবাবু। আপনাদের মতো সাধারণ মানুষেরা আমাদের ভোট দেন, তাই আমরা নির্বাচিত হিতি। আপনারাই আমাদের আসল ক্ষমতার উৎস।

আপনি যা বলছেন, তাই কী সত্যি? আপনারা অত টাকা কোথা থেকে পান?

রেবতীবাবুর আকস্মিক প্রশ্নে পরমেশদা নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। তখনই মুখের ভাবে আসন বদল উঠেছিল। উনি অভিব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। কিন্তু বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত্বের ব্যবসার এখন উপযুক্ত সময় নয়। পরমেশদা মৃদু হেসে বললেন, আপনাদেরই দান থেকে আমরা পাই।

আপনাদের সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অবশ্য নেই বলেও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে মানুষকে আমাদের পর ভেবেছ, আপনারা কী মনে করেন মানুষ সে কথা বিশ্বাস করে?

বিশ্বাস করা না করার ভার আপনাদের হাতে। অভিযোগ করলেও আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। পরমেশদা আর কোনো আলোচনা করতে আগ্রহী নয়। ফাইলিংয়ের প্রকাশ নজরে পড়তেই রেবতীবাবু বললেন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। সলীলকে আপনি পুলিশের কবল থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছেন, তার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ আমাকে কেন দেবেন? আপনাদের সেবা করাই আমাদের জীবনের ব্রত। আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, যদি আমি স্বার্থ হতাম তাহলে কিন্তু আপনারাই আমাকে ফিরে এসেছি করবেন। ঘাইহোক, প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকবেন, আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব আপনাদের সাহায্য করতে। পরমেশদা যাবার আগে সলীলকে বললেন, তুমি কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া কোথাও যাবে না। তুমি এখন জামিনে মুক্ত, তাই পুলিশ তোমাকে যে কোনোদিন ডেকে পাঠাতে পারে। তোমাকে না পেলে কিন্তু কেস তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে।

পরমেশদা চলে গেলেন। সলীল পুরো ঘটনার মর্মে কোনও রোশনাই খুঁজে পাচ্ছে না। অ্যাকশনে না যাবার জন্য পরমেশদা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অথচ সমবেতদের উপর আক্রমণের অজুহাতে পুলিশ অপরাধী হিসেবে অভিযোগ এনেছে। কে পুলিশকে এই কাজে সাহায্য করেছে? পরমেশদাই বা কেন জামিন নিয়ে মুক্ত করে নিয়ে এলেন?

মিনতি পরমেশদার কাছে মুক্ত। সলীলকে ছাড়িয়ে আনার দায়িত্ব কোনোরকম নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে একজন প্রকৃত সমাজসেবীর পরিচয় দিয়েছেন। এমন মানুষকে অশ্রদ্ধা করা সম্ভব নয়।

রেবতীবাবু সন্দেহ পরমেশবাবুই সব ষড়যন্ত্রের মূলে। সলীল অ্যাকশনে না গিয়ে যেহেতু পালিয়ে এসেছিল, তাই তিনি সলীলকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়েছেন নিজের। অবশ্য তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। সলীলকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে পুলিশ কি কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?

কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। সাক্ষ্যের সময় আমি কোথায় ছিলাম? কেন বাড়ি চলে গিয়েছিলাম? কিন্তু অফিসার যখন আমাকে বলল, আপনিই তো সাক্ষ্যে আপনার দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, একেবারে মিথ্যে কথা। আমি যেহেতু দলের সঙ্গে ছিলাম না, তাই তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে।

অফিসার বলল, কে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে বলে সন্দেহ করেন?

আমি বললাম, এই মুহূর্তে আমি কারোর নাম বলতে পারছি না। তবে তিনি যে আমারই দলের লোক, সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

পুলিশ অফিসার হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন আমার অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে নয়, তাই আমাকে আর একটাও প্রশ্ন করেননি।

রেবতীবাবু সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, তুমি কী পরমেশবাবুকে সন্দেহ করো?

আমি প্রথমে দাঁড়িয়ে পরমেশদাকে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু উনি আমাকে মুক্ত করার জন্য জামিনের ব্যবস্থা করতেই আমাকে সিদ্ধান্ত বদলাতে হলো। যদিও উপযাচক হয়ে এই কাজের দায়িত্ব উনি কেন নিলেন, তার কোনো যুক্তি খুঁজে আমি পাচ্ছি না।

রেবতীবাবুও সলীলকে সমর্থন করে বললেন, আমিও ঠিক একই কথা ভাবছি।

মিনতি বললেন, পরমেশবাবু সলীলকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসেন। উনি ওর ক্ষতি নিশ্চয়ই করতে চাইবেন না।

রেবতীবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞার সঙ্গে বললেন, আজকের রাজনৈতিক নেতাদের অতখানি বিশ্বাস করা ঠিক নয়। নিজের অবশ্য লাভের জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা ওরা করতে পারে না।

চার

পরমেশদার প্রতিদান নেতা ভাল্লু কৃষ্ণ লক্ষাধিক ভোট তাঁর নিরঙ্কুশ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। মিছিল করে আর আতসবাজি ফাটিয়ে সমর্থকরা মানুষের মধ্যে পৌঁছে নিজে সেই জয়ের সংবাদ। জয়ের কৃতিত্ব এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, আমার এই জয়ের জন্য আমি অভিনন্দন জানাই আমার এলাকার বসবাসকারী প্রতিটি মানুষকে। তাঁরা আমার হাতে ওকালতির ভার অর্পণ করেছেন। আমি চাই আরও ভালোভাবে মানুষের সেবা করতে। আমার এলাকার উন্নতির জন্য আমি কঠোর পরিশ্রমের প্রতিশ্রুতি করছি।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, গতবারও আপনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এলাকার উন্নতির জন্য আপনি অনেক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনি

কি কি কাজ করেছেন?

জহরবাবু কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এমন মোক্ষম সাংবাদিকের মুখোমুখি জীবনে এই প্রথম। তিনি ঢোঁক গিলে কষ্টে জবাবদিলেন, আমি কি করতে পেরেছি আর কি করতে পারিনি, সে বৈষয়িক আমি আপনাকে দেব না। এলাকার মানুষই জানেন আমার সাফল্যের কথা। তাই আমাকে আবার ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন।

আপনি তো এবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপনার এলাকার প্রত্যেক ফেমিলিকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন। কোথা থেকে অত টাকা পাবেন?

আমি কোথা থেকে টাকা পাব, সে নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন? আমি যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যেমন করে পারি, টাকা জোগাড় করব। যদি সফল হই, মানুষ আমাকে আর ভোট দোষেন না।

সে তো আপনার বলের এক নেতা অন্তোকবারই নির্বাচনের আগে যেসে ফেলাদের চাকরি দেবেন বলে গোপনে অনেক লক্ষ টাকা তিনি করেন। তিনি কখনই চাকরি দিতে পারেননি। তবুও তিনি অন্তোকবার নির্বাচনে জেতেন। এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া?

বাজে ওসবকে ভোটে যেন তাঁদেরকেই জিজ্ঞেস করুন।

এরপরে সাংবাদিককে আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ দেননি জহরবাবু। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে এই ধরনের প্রশ্ন করার সাহস কোথা থেকে পেলো ওই সাংবাদিক, তা নিয়ে জহরবাবুর মনে যেন ক্ষোভ জমা হয়েছে। প্রতিজ্ঞা করলেন ওই তিপের সংবাদপত্রের কোনো সাংবাদিককে ভবিষ্যতে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। মানুষের অন্তঃদুর্বলতাকে যারা মর্যাদা দেয় না, তারা গণতন্ত্রবিরোধী। জহরবাবু নিজেও আশা করেননি এত ভোটে জিততে পারবেন। হরিদেবপুরে প্রশাসোমপুর বাড়ি তৈরি, তিনটি ইটভাটা কেনা, হার্ডওয়্যারের শপগুলি ফাঁকা, ইত্যাদি আপনার নিয়ে বিরোধীরা কেন পরশেপ্ল তুলেছিল। তাদিকে মানুষ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তুচ্ছ সংবাদপত্রের কথা তিনি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ওরাই তো ভোটে দাঁড়ির নিয়েছিল। তিনি মিটিং-মিছিল করেও মানুষের মন এতখানি জয় করতে পারতেন না। ওই তুচ্ছ সংবাদপত্রে তাঁর অতীতকালীন জীবনযাপনের যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তা পড়েই মানুষের বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় হয়েছে। ওই তুচ্ছ সংবাদপত্রকে সাত্ত্ব ধারে বিজ্ঞাপন তুলিয়ে সাহায্য করার কথাও ভেবেছেন জহরবাবু।

জহরবাবু যখনই নির্বাচনী-প্রচারে বেরিয়েছেন, পত্রিকা তুচ্ছির সাংবাদিকরা তাঁর পছিয়ে চলে তাকে সব লিখেছেন। অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কাছে প্রস্তাব দেবেন অনুগত সাংবাদিকদের বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করতে। দলের স্বার্থের কথা ভেবে কোনো মন্ত্রী প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারবেন না। উপরন্তু তাঁর অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিকে ধনীয় স্বার্থে ক্রয়ের করতে উদ্যোগী হবেন।

পরমেশ্বরায় কার্যভারগ্রহণের জহরবাবু খুবই খুশি। এলাকার বেকার যুবকদের চাকরি এবং চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে কোথায় কত টাকা তিনি এনেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পরমেশ্বরাকে পেট্রোল-ডিজেলজনিত লাইসেন্স, কিরোসিন থেকে ইথেনিয়া আমদানি করার লাইসেন্স পাইয়ে চাকরি ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দিতে না পারলে পরমেশ্বরা খুব হাসেন এবং অন্যের মতো কাজে ঝুলিয়ে পড়তে চাইবেন না।

দিল্লিতে কয়েক দিনের মধ্যেই যৌথকে জহরবাবুকে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে দিদার নেত্রীর প্রয়োজনে দলের সভাপতি হিসেব যৌথকে কোথায়ের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়েছেন।

জহরবাবু ভেবেছেন দিল্লি যাবার আগে দলের কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এক জোরদলার আয়োজন করবেন। সে ব্যাপারে আলোচনা করতে তিনি পরমেশ্বরার সঙ্গে এক জরুরী যৌথকে মিলিয়ে হয়েছেন।

পরমেশ্বরা বিশেষ চিন্তিত। নির্বাচনের আগে অনের চাকরি কিংবা টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আজ যে কথাবলা ভোবলার অনেক দিন পার্টি সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। অনেক সকলকে ভোবলার চাকরি দেবেন। এত সুযোগই বা কোথায়! আর তাদের প্রত্যেককে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হলে টাকা জোগাড়ের মেশিন কিনতে হবে। পরমেশ্বরার কথা শুনে জহরবাবু কিছুটা ঘেমে উঠে জবাবদিলেন, আপনার কী মাথা খারাপ হয়েছে? প্রতিশ্রুতি দিলেই চাকরি দিতে হবে। প্রয়োজন এক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে ভোবলা করেছিলেন বন বছরে বন কোটি বেকারকে চাকরি দেবেন এবং আগামী ১০০ দিনের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেবেন। তাঁরই মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমার এমন ভোবে আর্থিক মন্ত্র জানা নেই যার সাহায্যে প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব। মানুষ কিন্তু ভেবে নিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রীর উক্তি। তা নিয়ে দেশের ভোবও চিন্তিত হয়নি। উপরন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আপনিও সে কথাই ওদের শোনাবেন।

এই কথা শোনালে তো ওরা দাবী প্রত্যাহার করে নেবে! সে সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। দু'মাস ধরে চাকরি পাবার আশায় ঘির স্থির পরিশ্রম করেছে। চাকরি না দিতে পারলে পাঁচ লক্ষ টাকা চাইবে। পরমেশ্বরা বললেন, আপনি তো দিল্লিতে গিয়ে দু সাঁতারে, আমি ভোবার পাদিবে গিয়ে আত্মহত্যা করব।

জহরবাবু ফেরার আগে দুদিনে পরমেশ্বরার সমস্যা এত জটিল হয়ে উঠবে। প্রতিশ্রুতি দেবার রেওয়াজ এলাকে অনেক দিন ধরেই চালু আছে। তিনি নিজেই বহু নির্বাচনে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ভোবো সমস্যা তো হয়নি। কিন্তুদিন যেতেই না যেতেই মানুষ সব ভুলে গিয়েছিল। আর এই ভুলো-মনা মানুষগুলিই তো উৎসাহিত করে প্রতিশ্রুতি দিতে। সেই ঐতিহ্য রক্ষা করতে চাওয়া আদৌ অপরাধ নয়। সত্যিই যদি পরমেশ্বরাকে বিনামূল্যে চাকরি দেবার জন্য উঠেপড়ে ভবে উনি কিভাবে শক্তিয়ে থাকবেন? ঘর ছেড়ে ভোবার পালাবেন। জনমিন আত্মগোপন করে থাকবেন।

প্রতিশ্রুতি না দিয়ে নির্বাচনে জেতা আর যায় না। এখন জল ভেল ভোলা হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই দিয়েছেন বলে ভোবলাদের উপর নির্ভর। হয়ত তাঁর নয় পক্ষে ভোবে একাধিক নির্বাচনে পরাজিত এক জননেতার নাম। তিনি একবার প্রার্থী হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, এই রাজ্যের সব বন্ধ কলকারখানা খুলে দেবার চাবি তাঁর হাতে রয়েছে। মানুষ বিশ্বাস করে তাঁকে ভোট দিয়েছিল। তিনি নির্বাচিত হয়ে দিল্লিতে গিয়ে যেমানু প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলেন। তাঁর এলাকার মানুষ যখন ভিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করলো, তিনি জানালেন বন্ধ কারখানা খোলা তাঁর সাধ্যে নয়। তিনি কেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? তার উত্তরে তিনি নীরবতা পালন করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। সে ঘটনাকে স্মরণ করে জহরবাবু অনুপ্রাণিত হয়ে জবাবদিলেন, আপনি সকলকে বলে দেবেন চাকরি হাতের ভোরা নয় যে চাইলেই পাওয়া যাবে।

চাকরি না দিতে পারলে প্রতি জনকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন বলেছিলেন, ে ব্যাপারে..

বলে দেবেন, টাকা যোগাড় করতে পারলেই দেওয়া হবে। কবে দিতে পারবে তা অবশ্য বলবেন না।

এই কথা শোনার পর বেকার যুবকদের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে জ্ঞানেভোবেই অনুমান করতে পারছেন পরমেশ্বরা। এমন কী জীবনজুনির আশঙ্কা তিনি করছেন। পরমেশ্বরা স্পষ্টই পরিস্থিতির ভিন্ন স্পষ্ট দেখতে পেয়ে বললেন, আমি কিন্তু আপনার ভরসাতেই ওদেরকে পাঠিয়ে দেব। আপনি যা মন চায় তাই বলবে।

একজন সর্বভারতীয় নেতাকে বিশ্বজোড়ের মুখে ঠেলে দিতে চাওয়ার ষড়যন্ত্র বিস্তৃত হয়ে জহরবাবু বললেন, আপনাকে দু-হাতে আমি টাকা দিয়েছি, এবং বিপিনা আপনি আমাকেই বিপদে ফেলতে চাইছেন? কাজাড়া, আপনি আমার নিজ ইলেকশন এজেন্ট ছিলেন, কিছুটা কর্মি তো আপনাকে পোয়াতেই হবে। আমাকে জনরোষের সামনে ভোবে আপনি পিঠ বাঁচাতে পারবেন না।

টাকার কথা তুলে জহরবাবু পরমেশ্বরাকে কিছুটা সতর্ক করে দিতে চাইলেন জহরবাবু টাকা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। সেই টাকার একটা অংশ দিয়ে রোবপুর পার্কে ঘেঁড়ে হাজার খোয়ার ভিটের একটি প্লটে কেনার জন্য ভোবাকাবকে তিনি আর্থি দিয়েছেন। জহরবাবু কিছুই জানতে পারেননি। নির্বাচনী-হলফনামে যে টাকা জমা পড়ো তার হিসাব দিতে হয়নি বলেই এই সংবাদ গোপন করে রাখতে পেরেছেন পরমেশ্বরা জহরবাবুকে ব্লাকমেল নিজেরই আর্থি হয়ে যায়, এই কথা ভেবেই পরমেশ্বরা অনেক সময় নিয়ে আলোচনা করতে করতে অনেক সময় কেটে গেছে। আপনি যে আমাকে ভেবে পাঠিয়েছেন, সে ব্যাপারে আমি এখনও কিছু জানতে পারিনি। আপ এখন বিশ্রাম করতে পারেন।

জহরবাবু যেন হিংস্র নেকড়ের আস্ত থেকে মুক্তি পেয়েছেন, তেমনি এত অর্থি প্রকাশ ভেবা ভেল তাঁর চেহারাতে। তিনি মৃদু ভেসে গলা পরিষ্কার করে বললে আপনি ভেবেই দলের সব কর্মীদের একদিন মটন বিরিয়ানী ও চিকেন চাপ খাওয়া আপনি আমাকে কতুন অনুপ্রেরণা কত যন্ত্র ছুড়ে পারে।

হিসাব না করেই পরমেশ্বরা বললেন, সে তো বিশাল খরচ। আপনি এত টা ভোবা থেকে পাবেন?

জনগণের ভেবায় কত টাকা খরচ করতে পারে, পরমেশ্বরা এতদিন ধরে রাজনীতি করে

সে জান অর্জন করতে পারেনি। জহরবাবু বিজেন্দীনাথের সমালোচনাকে যেমন শক্তভাবে সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন, তেমনি অমায়িক ভঙ্গীতে বললেন, সে তাকনা আমার। আপনি এ ব্যাপারে নাক গলাবেন না। আমি আপনার কাছ থেকে যা জানতে চেয়েছি, তার জবাব দিন।

পরমেশ্বরা রিমিট মনের ছোটার পর সন্তান্ত কর্মী সংখ্যা নির্ধারণ করে এবং প্রতি ছোটের মূল্য দিয়ে তাকে ওপ করে যা ওপফল ফেলেন, জহরবাবুকে তা জানাতে একটু সময়ের নেন করলেন।

পরমেশ্বরাকে অপ্রতিভ অবস্থায় দেখে জহরবাবু বললেন, এ কী। আপনার জবাবের হয়ে গেল কেন? আপনি নির্দিধায় টাকার পরিমাণ আমাকে জানাতে পারেন।

আশ্বাস পেয়ে পরমেশ্বরা বললেন, প্রায় হাজার চল্লিশ টাকা লাগবে।

এত টাকা লাগবে কেন। আপনি কতজন কর্মীকে খাওয়াতে চাইছেন?

কম করে হাজার তো হবেই।

এতজন কর্মী আপনি নিয়োগ করেছেন?

তবুও অনেকেরই বাদ দিতে হয়েছে। পার্লামেন্ট নির্বাচনে কতজন কর্মী লাগতে পারে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। যাদেরই আপনি ডাকবেন না, সেই ভেবে বসবে।

জহরবাবু বুঝতে পারলেন সমস্যা কোথায়। তবুও একজন যখন কর্মীদের মনোরঞ্জন করার কথা ভেবেছেন, কিছুতেই তিনি পিছু হটতে রাজী নন। এখন তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাই আত্মসম্মানের পারদ অনেক উঁচুতে উঠেছে। জহরবাবু বললেন, আপনি সব কর্মীকেই বলবেন ভোজনের অনুষ্ঠানে যেন দিতে। কাউকেই আমি বঞ্চিত করতে চাই না। সবকে আমার কাছে দিন।

পরমেশ্বরা পুরোপুরি বিশ্বেষিতা না করেও বললেন, সবাইকে জানালে তো হৈচৈ পড়ে যাবে। ভাড়া করতে হবে।

কিন্তুমাত্র বিচলিত না হয়ে জহরবাবু বললেন, তেমন হলে তাই করবেন। আমি লিখিয়ে দিতে চাই যাদের প্রতিটি কর্মীকে আমি কত ভাতাদাবাদি।

দেড় হাজার কর্মীকে তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিলেন জহরবাবু। এবার পরমেশ্বরা নিজেই অবাক। এক হাজার জনকে খাওয়াতে তিনি কিন্তুক্ষণ আগে আপত্তি করেছিলেন, তিনিই আবার দেড় হাজার জনকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন কী করে। জননেতা হলেই বোধহয় এমন ঝুঁকিবাজ হয়ে ওঠাই নিয়মসঙ্গত।

টাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই জহরবাবু বললেন, নির্বাচনে যে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে, তার কাছে এ তো নস্যি। আমি অনেকজন ব্যবসায়ীর কাছে আপনাকে পাঠাবো। তারাই টাকার যোগান দেবে। ওদের সঙ্গে আমার দেনাপাওনার সম্পর্ক।

পরমেশ্বরার রাজনৈতিক জ্ঞানের সীমা কমশই বড়ছে। জহরবাবুর সেবা করে অর্থের সোচ্চারের ঘটছে। তার ব্যবসায়ে সন্দেহও খুঁজতে পারছেন, দেশ সেবার বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে তিনি এ যাবৎ যা পেয়েছেন তার কোনো তুলনাই চলে না। এবার থেকে তিনি আরও বেশি দেশের কথা ও মানুষের কথা ভাবনার সুযোগ পেলে।

দলের কর্মীদের খাওয়ানোর জন্য টাকা পার্টাতে আপত্তি করতে হয়নি পরমেশ্বরাকে। পলিথিন প্যাকেটে চিকেন চাপ আর কাগজের প্যাকেটে বিরিয়ানী পুরে প্লাস্টিক ব্যাগে ভরিয়ে আমন্ত্রিতদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। দলের ছেলেরাই এই আয়োজন করতে অসুবিধা হয়নি। পরমেশ্বরার দেওয়া পরিমাণের চেয়ে বেশিই খাদ্য নিতে হচ্ছে।

শরীফ আসেনি কেন? পরমেশ্বরও ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন তো বলেনি আজ আসবে না। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো। আজব অন্য কোনো ঘটনা। সন্দেহের পৌঁয়ায় ভড়ছে। আজ চাকরির প্রসঙ্গ নিয়ে শরীফের উক্তি যেন আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। পরমেশ্বরা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, তোমার যদি আমাদের উপর আস্থা না থাকে, তাহলে এখানে এসো না। চাকরি হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই পাওয়া যাবে।

তাহলে আপনি কেন আমাকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

প্রয়োজন হলে অনেক প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। প্রতিপক্ষকে মুছে ফেলতে পেলে এই সব ব্যক্তিগত কথা ছড়া আর কেনো উপায় থাকে না। রাজনীতি ক্ষেত্রের প্রথা ওটে না।

তার মনে আপনার প্রত্যাঘাত। মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি ক্ষেলেন। এখনে আমি আর ক্ষেত্রেছিন আসব না।

শরীফের উক্তিতা দেখে পরমেশ্বরা ভাবলেন, আসবে তোমাকে হবেই। তুমি ক্ষেত্র না তুমি এখনও একজন আসামী। জামিন দিয়ে আমিই তোমাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি। যেমি ঝড়াঝড়ি করলে আবার তোমাকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।

শরীফ কিছু না বলেই চলে গিয়েছিল। সেই আজগেই কি ও আজ এখানে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? পরমেশ্বরা একজন বিশ্বস্ত কর্মীকে পাঠালেন শরীফের বাড়িতে, ওকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য। শরীফকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। বিকেলের দিকেই ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কোথায় গেছে বাড়ির কেউ জানেন না। এত ক্ষোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইছে কেন শরীফ। ও ক্রমশই কেন রহস্যময় হয়ে উঠছে। এবার থেকে ওর গতিবিধির উপর নজর রাখা খুবই জরুরী। যদি প্রয়োজন হয়, আরও কয়েকটি ক্ষেলে ওকে বাড়িতে ফেরাতে পোরার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঁচ

শিক্ষার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি। এতদিনে সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে চিরকালের জন্য, একথা ভাবতেই এক ধরণের অস্থিরতা গ্রাস করেছিল শরীফকে। আজ এই বিশ্বাসঘাতকতার সময়ে যে আশ্রয়ের শরীফকে প্রয়োজন ছিল, তার হাত থেকে মুক্তি পেতে একজন বিশ্বস্ততম মানুষের কাছে আশ্রয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠেছে। শিক্ষা শুধু আশ্রয় নয়, উষ্ণতাও দিতে পারে।

আজকাল অবসরের মুহূর্তে শরীফ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, নীরবতার ভিতরে যাঁকিয়ে ধরে শিক্ষা এসে উপস্থিত হয় অনুভূতির প্রান্তর জুড়ে। তবে কি শিক্ষা অন্য কোনো পুরুষের বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে? দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাই তো কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে ওঠে। শিক্ষা যদি সত্যিই দূরে চলে গিয়ে থাকে, কাছে পেলে তার স্বরূপ অনাবৃত করার সুযোগ পাওয়া যাবে। দূর থেকে অনর্থক মনের সন্তাপকরা সুর খুঁজে খুঁজে এক অদৃশ্য পাঁচিলের আড়াল তৈরী করার মধ্যে অজ্ঞাতে আগুন জ্বালানোর প্রচেষ্টাই থাকে। সেই আগুনে নিজেকেই পোড়াতে হয়। অথচ মুখে নিয়ে এত খেলা সে নির্বিকার দূরত্বে থেকে ফেলে কিছুই যাঁচ করতে পারে না। শরীফ স্থির থাকতে না পেরে শিক্ষার কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিল।

শিক্ষার মা তাপসীদেবী শরীফকে এতদিন পরে দেখেও কিন্তুমাত্র উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। তবে স্বরত শিক্ষা সেদিনের ঘটনা বিস্তৃত করে মায়ের মনে ঘৃণার উদ্রেক ঘটিয়েছে। শরীফ ভাবল, ভালো আছেন মহিলা।

এখন কী ভালো থাকা যায় শরীফ? আষাঢ়ের সময় তো প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এবার তো শ্রাবণ পড়ল। যে সময় এসেছে, তাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা অযুহাত।

এতদিনে কথা বলতে আগে কখনও ক্ষোভেনি শরীফ। অভিজ্ঞতার ভারে উনি কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন? নাকি শিক্ষা ওঁকে এই বিশেষ মানসিকতার অধিকারী হতে সাহায্য করেছে? শরীফ বলল, আমি আপনাকে ভেবে কি করবো? আমরা তো আর সমস্যাকে বলাতে পারবো না।

আমরাই বলাতে পারি। সময়ের ঋণ বলে গেছে মানুষেরই জন্য। তোমার আমার মতো অন্য সবকে ঘিরে সংকটের দ্বার চেঁটা করে তবে অবক্ষয়ের পরিণতি অবধারিত হয়ে উঠবে না।

শিক্ষার দেখা এখনও পায়নি শরীফ। তবে কি ও বাড়িতে নেই? শিক্ষাকে দেখতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষিত সময়ে তাপসীদেবীর কথাগুলো অর্থহীন ভাবাবেগে আচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে শরীফের। শুনতে মন চাইছে না। শরীফ জিজ্ঞেস করলো, শিক্ষা কি বাড়িতে নেই?

আছে। স্বরত ঘিতিতে বিশ্রাম ক্ষেরছে।

শরীফ ঘরে ঢুকেছে খুঁজতে পেরেও শিক্ষা আয়োজিত একান্তরের চিঠির পর্দার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলো। শরীফ যেন তার জীবনের পর্দায় থেকে হারিয়ে যাওয়া এক অধ্যায়। তাকে আর ওরুত্ব দিয়ে নিজের জীবনকে যন্ত্রিপ্ত করে তুলতে চায় না। শরীফ দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমি কেন তোমার কাছে ছুটে এসেছি, তুমি জানতে চাইছো না?

আমার কোনো কৌতূহল নেই। তাকে নিয়ে আমার কোনো ভাবনা নেই, তাকে নিয়ে কথা বলার অধিকারও আমার নেই। তুমি তো পরমেশ্বরার বিশ্বস্তজন। আমেশ্বরাকে হত্যা করার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছো তুমি। তোমাকে জেল থেকে জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছেন পরমেশ্বরা। এমন একজন পুরুষের সঙ্গে কথা বলতেও আমি ঘৃণা বোধ করি।

আমার বিরুদ্ধে তোমার অনেক অভিযোগ, কিন্তু তুমি কি জানো, আমেশ্বরাকে

হত্যা করার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমি যুক্ত হতে চাইনি, তাই প্রতিশোধ নিতে ষড়যন্ত্র করে আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাই যদি সত্যি হবে, তুমি এখনও কেন পরমেশ্বরদার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছ? শুধু বিন্দু টাকার পাওনার জন্যে আর চাকরির লোভে প্রতিশ্রুতিতে ভুলে কেন তুমি ওঁর হাতের হাত নির্বাচনের ব্যাপারে নিজেছিলে? তোমার আদর্শ ও ন্যায়নীতি তখন কোথায় বিন্দু ছিল?

সত্যি ছিল একদিন, যা তো তুমি অন্য সকলের চেয়ে বেশি ভালো করে জানো। কিন্তু আজ নিজেকে বদলাতে হয়েছে। আমি বিন্দু করতে পারিনি যা, হতাশার প্রবল হয়ে উঠেছে—এই পরিস্থিতি আমাকে কিভাবে জর্জরিত পুরিয়ে শুধু করে দিয়েছে, তুমি বুঝতে পারবে না। চারদিকের অনুশাসনের ঘানি যেন মনে হয় আমাকে বিদ্রূপ করতে চাইছে। তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় সব কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে। কিন্তু পারি না, সে সামর্থ্য যে আমার নেই।

তুমি আত্মসমর্পণ করেছ সদীপ। কি লাভ হবে ভাবে? যা ভাবতে পারলে সত্যিই কিছু করার সুযোগ আসে সে পথে না গিয়ে তুমি ভুল পথে চলেছ। অবশ্যম্ভাবিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি মস্ত বিন্দু পুরানো মেডিসিনের ব্যবস্থাপত্রে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছ। আর সেইজন্য অহরহ মুখে নির্বাচনে জয়ী হয়ে পরমেশ্বরদার ভূমিকা পালন করছ। তুমি যদি ব্যক্তিজীবনের অন্তরে নিজেকে বদলাতে চাইতে, তবে ও পথে যেতে না। অবশ্য তোমার কাছ থেকে আত্মশুদ্ধির দাবি করা যায় না। যে নিজের চাকরির জন্য অন্যের মৃত্যু কামনা করে তার কাছে মনুষ্যত্ব, সুস্থতা ইত্যাদি শব্দগুলো মৃত। তুমি আমার কাছে আর কখনও এসো না সদীপ। তোমাকে ভুলে যাওয়াই এখন আমার একমাত্র কাজ।

ভুলে যাবে রিঙ্কা? আমি যে তোমাকে...

কোনো লাভ নেই সদীপ। শুধু শরীর নিয়ে তো আমি তোমাকে পেতে চাই না। যেখানে আমাদের দু'জনের আদর্শের মধ্যে এত ব্যবধান, সেখানে শুধু একটা সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে আমি সারা জীবন ধরে অভিনয় করতে পারব না।

আমার বিরুদ্ধে তোমাদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ, আমার কিন্তু কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। আমার ব্যক্তিত্বকে তোমরা সবাই মিলে ভেঙে আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে দিতে চাইছ।

ব্যর্থতা নয় সদীপ। আত্মশুদ্ধির একটা জন্মুরের আমার কাছে কোনো মূল্য নেই। আমার মনে হয় সমাজে তাদের অস্তিত্বের আদৌ কোনো ভূমিকা নেই। জন্মের প্রাকৃতিক নিয়মে একদিন মরে যাবে। এভাবেই হয়তো শুরু আর এভাবেই হয়তো শেষ।

কিন্তু তুমি যাদের আত্মশুদ্ধির মানুষ বলে চিহ্নিত করতে চাইছ, তারা তো মানুষের সমর্থন পেয়েই নেতা হয়ে ওঠে! যে মানুষগুলো সমর্থন করে তারা সবাই কেরা? আত্মশুদ্ধিবাদের পক্ষে?

রিঙ্কা মৃদুকি হেসে বলল, তোমার আসলে ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখবে এখনও দেখোনি। হিটলার মুসোলিনী ইতিহাসের চরম ঘৃণিত দুই নায়ক, জনসমর্থন নিয়েই একদিন তারা ক্ষমতা দখল করেছিল। তারাই একদিন আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন করেছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ' তো দেখেছ। মনিবের চরণামৃত নিয়ে যে কৃষকের মানুষের মনে প্রভাবিত করে রেখেছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাদের অনেক শুধু যতাত একলা হয়ে গিয়েছিল। সত্যের জন্য লড়াই করলে সমস্ত মানুষ বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য আত্মশুদ্ধিত হওয়ার অর্থ নিজের অপমৃত্যু ডেকে আনা। সুতরাং জনসমর্থন নিয়ে বড়াই করে লাভ নেই। আমাদের দেশে ডিক্টেটরশিপ, অসাধু ব্যবসায়ীও নির্বাচনে জয়লাভ করে। তাদেরকেও মর্যাদা দিতে হবে?

সদীপের অস্তিত্ব বজায় রাখার শেষ যুক্তিটাও কেমন অর্থহীন হয়ে গেল। রিঙ্কা যুক্তিজালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে আদর্শের বিশ্বাসহীন পরিবেশে অসহায়ের মতো বাঁচতে শিখেছে। এর বিরুদ্ধে-বিদ্রোহের ডাক নিরর্থক হয়ে কি জীবনকে উপভোগ করা যায়? অনুভূতির জগতে যদি সামান্যিক উত্তেজনার স্পর্শ না থাকে, তবে আনন্দ কোথায়? রিঙ্কাকে একদিন অনুশোচনা করতে হবে। যৌবনের এই কল চলে গেলে রিঙ্কা যেদিন নিজের দিকে তাকাবার সুযোগ পাবে, তখন ওর নিশ্চয়ই মনে হবে অর্থহীন আপসের জীবনধারাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল।

সদীপ ব্যর্থতার গ্লানি রেখে রিঙ্কাকে আর কিছু না বলেই চলে গেল। রিঙ্কা ওকে ডাকেনি। জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সদীপ আপন মনে প্রেট চলেছে। একবারের জন্য জানলার দিকে তাকায়নি। জানলার রিঙ্কাকে দেখে হয়ত কোনো আশার আলো খুঁজে পেত।

অমরেশের গাড়ির কাছে এসে হঠাৎ ওকে দাঁড়াতে। পরমেশ্বরই মনে হলো কেউ ওকে অনুসরণ করছে। সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত পা চালালো। অমরেশের গ্রেট তাই দেখতে পেয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ছুটে এসে বলে, আপনি কেন আমার দলকে ফ্রেজেছেন।

অমরেশের খাতক হিসাবে সদীপের নাম চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে গেছে। লজ্জায় অপমানে তুলে জানবে, তুমি অপরাধী। কি করে বুঝবে সে অপরাধ। সদীপ যেন চিৎকার করে বলে উঠতে চায়, বিশ্বাস করুন, আমি অমরেশকে খুন করিনি।

কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। উপরন্তু মানুষের ঘৃণার বৃষ্টি যন্ত্রণাদায়িত্ব বুকে আরি চিহ্ন এঁকে দিতে চাইবে। নিজের গাড়ির দিকে পালাতে চাইলো সদীপ। পারলো না। পাশ থেকে ছুটে এসে বিমান সদীপের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে জানল, আজ রোজ রেজাল্ট জানার কথা ছিল অঙ্ক পেশি না কেন? পরমেশ্বরদা আমাকে তোর অফিসে পাঠিয়েছিলেন। তুই কোথায় গিয়েছিলি?

চাকরির সন্ধানে। আমি এক আত্মীয়ের অফিসে গিয়েছিলাম। আমার চাকরি চাই। জানা অনুযায়ী। আমাকে সংসারের ভার নিতে হবে।

পরমেশ্বরদা তো তোকে চাকরি দেবেন বলেছেন।

কবে, কোথায়? আমি কোনো প্রতিশ্রুতি শুনতে চাই না।

তুই কি ভাবছিস পরমেশ্বরদা তোকে মিথ্যে কথা বলেছেন?

মিথ্যে কি সত্য তা মানুষের কথা দিয়ে বিচার করা যায় না। আজ দিয়েই একমাত্র যাচাই করা সম্ভব।

পরমেশ্বরকে অসম্মান করতে চায় না সদীপ। উনি সত্যিই ভালো মানুষ। মানুষ যারা নির্বাচনে খোটাছিলেন অমরেশবাবু জন্য, পরমেশ্বরদা আর সকলকে শুধু ছড়িয়ে দিলেন। মটন, বিরিয়ানী আর চিকেন চলল। কত টাকা খরচ হলো বল তো?

একবেলা খাওয়া খেলেই কি আমার জীবনের সব সমস্যা মিটে যাবে। পরমেশ্বরদা নিশ্চয়ই অনেক টাকা সবিতেছেন নির্বাচনী-তহবিল থেকে। তার একটা অংশ খরচ করলেন আমাদের হাতে রাখতে। ভবিষ্যতে কেউ তহবিল তছরুপের অভিযোগ এ আনতে পারে।

সদীপ কী জানতে পেরেছে পরমেশ্বরদা খোলপুর পার্কে নতুন ফ্লাট কিনেছেন। এ সংবাদ কেউ হো জানে না। অমরেশবাবুকে এখনও পর্যন্ত পরমেশ্বরদা কিছুই জানাননি। সদীপের মাধ্যমে আই এই সংবাদ অমরেশবাবুর কানে পৌঁছে যায় তবে এক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। বিমান-ফোনে সদীপ বলল, পরমেশ্বরদা অনেক টাকা হাত সাফাই করেছেন, তুই কী জানিস?

আমি কি করে জানবো! চাষাভুষা, ঘড় ঘড় মানুষের টাকা জামাকাপড় হিসাব রেখে আমার লাভ কি? আমি তো ভাগ পাব না?

পরমেশ্বরদা নাকি খুব সৎ লোক? সৎ মানুষরাই তাহলে আজকাল খোপরে খোপরে চাকরি বানায়। আর এমন ভান করে যেন তারা খুবই সাধারণভাবে জীবনযাপন করে।

পরমেশ্বরদার সমালোচনা সহ্য করার মানুষ নয় বিমান। কিন্তু পরমেশ্বরদার খোপরে ফ্লাট কেনার সংবাদে যখন সদীপের জানা, তখন ওর কথার প্রতিবাদ না করাটাই সিদ্ধান্ত নিল বিমান। সদীপ যদি ওঁকে শুরু করে পরমেশ্বরদা খুবই বিপদে পড়ে যাবেন বিমান অনুরোধ জানালো, তুই পরমেশ্বরদার বিরুদ্ধে যাওয়ার কিছু বলিস না।

আমি না বললেও বেশিদিন সকলে মুখোশের আড়ালে লুকানো পরমেশ্বরদার আসল রূপ খুঁজে পাবে, সেদিন উনি কি জবাব দেবেন?

সে পরমেশ্বরদা বুঝবেন। আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?

মাথা ঘামাতে চায় না সদীপ। কিন্তু সততার মুখোশ পরে যে ভেতরে মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, যাদের সাধারণ জীবনযাপনের বিবরণ হাপিত্যেস করেছেন তাদের খোলস খেতে উঠেছে, তাদের বিরুদ্ধে সদীপ লোড়ার হয়ে উঠতে চায়। রিঙ্কা ওকে সে লৌকিকের অধিকারী হবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে, অমরেশের খুনের সঙ্গে কেন ওকে মিথ্যে জড়ানো হয়েছে, তার উত্তর চাইতে পরমেশ্বরদার কাছ থেকে। বিমান ওকে আবার বলল, তুই যদি পারিস, আজই পরমেশ্বরদার সঙ্গে দেখা করিস। কেন পরমেশ্বরদার বিরোধিতা করে অশান্তি ডাকতে চাইছিস? এখ আছা-পুলিশ, লোক-বল সবই পরমেশ্বরদার আছে। তুই অকারণে বিপদের ঝুঁকি কেন নিবি?

পরমেশ্বরদার অসততার পরিচয় পেয়েছে সদীপ। একজন সর্বভারতীয় নেতা লক্ষ্যের মতো ভাববে না, তা কি হয়? কিন্তু ওঁর বড় কত সহ্য করা সম্ভব?

অফিসে ফিরেই সদীপ দেখলো পরমেশ্বরদা ঘরে বসে অপেক্ষা করছেন। আশ করেনি সদীপ। চৌকিদার উপায় বন্ধ একটা প্যাকেট। সদীপের হাতে সেই প্যাকেট

তুলে নিয়ে পরমেশ্বরদা বললেন, তুমি তো আমার ওপর অভিমান করে আজ খেতেই চাও না। তাই আমি ছুটে এসেছি, তোমার পছন্দ মিনিস তোমার হাতে তুলে দিতে।

অমৃত এক বিরাট্ব অধিকারী পরমেশ্বরদা। উনি কি এসেছেন সমীপকে কতটা ভালোবাসেন, প্রমাণ করতে? আসলে উনি জানতে এসেছেন সমীপ কোথায় গেছে। কিন্তু সে স্বীকারে এখন পর্যন্ত একটাও শব্দ খরচ করেনি। সমীপের বাবারা যে মিথ্যে নয়, তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো পরমেশ্বরদা যেই বললেন, তুমি আজ নিশ্চয়ই রিদ্ধার কাছে গিয়েছিলে। অনেকদিন দেখা হয় না।

রিদ্ধার সঙ্গে উপাপন করতে এত আগ্রহী কেন পরমেশ্বরদা তাহলে কি উনি জেনে গেছেন রিদ্ধার কাছে কেন গিয়েছিল? রিদ্ধা কোন অর্থনৈতিক ঘটনাবর্তে বিশ্বাসী, পরমেশ্বরদা হয়ত জানেন।

সমীপের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে পরমেশ্বরদা বললেন, রিদ্ধা বোধহয় তোমাকে আর আগের মতো ভালোবাসে না। বিশেষ করে অমরেশের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে পড়ার পর। তুমি হয়ত জানো না অমরেশের সঙ্গে রিদ্ধার বিশেষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

রিদ্ধা অমরেশের রাজনৈতিক-আদর্শকে শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু কিসের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উচ্চারণ করে যে ইঙ্গিত পরমেশ্বরদা দিতে চাইছেন, তার কোনো প্রমাণ কখনও রিদ্ধার ব্যবহারে লভ্য হয়নি সমীপ। পরমেশ্বরদা কি পারস্পরিক বিশ্বাসকে বিষিয়ে দিতে চাইছেন? বোধহয় নতুন এক রাজনীতির খেলা শুরু করেই তাঁর উদ্দেশ্য। রিদ্ধাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারলে সমীপকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে তোলা যাবে। সেই সুযোগটাই পেতে চান পরমেশ্বরদা।

রিদ্ধা কি সত্যিই অমরেশের দিকে ঝুঁকেছিল? সেই জন্যই কি অমরেশকে খুন করেনি? এ জড়িয়ে আসেনি? এতদিন ধরে কিসের রিদ্ধাকে চিনতে পারেনি, এ মুহূর্তটার জন্য নিজেকে দায়ী করা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে সমীপ? বিশ্বাসঘাত হয়েও সমীপ প্রতিবাদ করতে চাইলো। রিদ্ধার সঙ্গে অমরেশের বন্ধুত্ব ছিল আমি জানি, কিন্তু 'কিসের ব্যক্তিগত সম্পর্ক' ছিল না।

তুমি নিজের এক মনগড়া ধারণা নিয়ে সত্যকে খুঁজে পেতে চাও। কিন্তু যেখানে তোমার সঙ্গে রিদ্ধার আদর্শের বিরোধ, সেখানে কি মানসিক সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে? রিদ্ধার পক্ষে অমরেশের দিকে ঝোঁকা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তুমি যখন আমাদের দলের হয়ে রাজনৈতিক কাজে আলোড়ন করতে শুরু করেছিলে।

আমি আপনাদের মতাদর্শকে সমর্থন করি না, এ সত্যকে রিদ্ধা জানে। আমি আপনাদের দলের হয়ে কাজ করেছি শুধু টাকা ও চাকরীর পাওয়ার আশায়। কিন্তু তার বিনিময়ে পেয়েছি অমরেশকে হত্যা করার অপরাধ। আপনি বলতে পারেন কেন আমাকে মিথ্যে জড়ানো হয়েছে?

আদর্শকে না মেনে শুধু প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ, তোমাকে স্বেচ্ছাসেবিকই চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়।

আমি জানি। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর...

দিতে পারছি না। কারণ আমি কিছুই জানি না। তুমি পুলিশকেই জিজ্ঞেস করতে পারো।

আমরা ধারণা, আপনি সব জানেন। আপনারই মদতে দলের কেউ এই জঘন্য কাজ করেছে। তার উদ্দেশ্য কি, আমি এখন বুঝতে পারছি না। কিন্তু একদিন না একদিন আমি ঠিক জানতে পারবো, সেদিন আমি আউটলুকই হারাবো না।

সে ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, তুমি নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবে।

আলোচনার গতি স্তব্ধে যেন দিকে ইঙ্গিত করতে চাইছেন পরমেশ্বরদা। এমন কেউ কি জড়িয়ে আছে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে, যার বিরুদ্ধে কথা বলা অসম্ভব!

ছয়

রিদ্ধা নিজেই এসেছে সমীপের সঙ্গে দেখা করতে। এ কী কখনও আশা করতে পেরেছিল সমীপ? অমরেশকে হত্যাকারীর খোঁজ কি এখনও রিদ্ধাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে? সেই জন্যই কি রিদ্ধা একদিন আসার কথা ভাবতো পাঁচদিন পর? কেন এসেছে আজ? আদর্শনিষ্ঠতার দাবী করে অভিযুক্ত করেছে তার বন্ধু থেকে কিছু পাওয়ার আশা কি করা যায়। এখন সমীপ কোনো নারীকে নিয়ে ভাবতে চায় না। রিদ্ধা বলল, আমি নিজের প্রয়োজনে এ বাড়িতে আসিনি। তুমি হয়ত জানো, সেদিন তোমাকে বিষিয়ে দিয়ে অনুশোচনার দগ্ধ হয়ে তোমার কাছে এসেছি ক্ষমা চেয়ে নিতে। সেটা অবশ্যই সঠিক নয়। অমরেশকে খুন করার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তোমাকে অযৌক্তিক জড়ানোর হয়েছিল, তা তুমি নিজেই জানো। কে এই ষড়যন্ত্রের হোতা তা কি তুমি জানো?

রিদ্ধা এই জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করে সমীপকে হতচকিত করে দিয়েছে। রিদ্ধাকে এক ছলনাময়ী নারী মনেই দেখতে শুরু করেছিল সমীপ। কখন ও তো সমুদ্রমন্থনে গরল থেকে উঠে আসা অমৃত-কলসী হাতে সেই নারী। সমীপের বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে উপেক্ষা করে রিদ্ধা বলল, তোমাকে যে প্রশ্ন জর্জরিত, তার উত্তর দাও।

তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তুমি কি বিশ্বাস করো আমিই অমরেশকে খুন করেছি?

এতদিন তাই বিশ্বাস করেছি, কিন্তু আজ করি না। তার জন্য তোমার যথেষ্ট কোনো ভূমিকা নেই। তুমি পরমেশ্বরদাকে জনদরদী নেতা বলে শ্রদ্ধা করো, বিশ্বাস করো, তিনি ঠিক তাই বিপরীত। ভদ্রতা সৌজন্য, অর্থ খোজী, খুনি এবং সর্বোপরি নারীলম্পট। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের পার্টিকে নতুন প্রাণ দিয়েছেন। কোনো সুন্দরী নারী তাঁর সংস্পর্শে এলেই, তিনি তাকে ভোগ করার জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠেন। একজন মেয়ের কথা আমি জানতে পেরেছি, যে পরমেশ্বরদার পদ্মাসঙ্গিনী হতে গিয়ে এক সময়ে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। সেই পাপ ঢাকা দিতে তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন।

তুমি কেন আমাকে এসব কথা আগে জানাওনি?

আমি নিজেই জেনেছি কয়েক দিন আগে। সেদিন তোমাকে জানাতে ভেবেছিলাম, কিন্তু সাহস পাইনি। মনে হয়েছিল, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। পরমেশ্বরদা তোমাকে এক মন্ত্রবলে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। তুমি খেলছিলে অভিমন্যুর মতো। আজ তোমার মোহভঙ্গ হয়েছে আশাকরি। আমার তাই মনে হয়েছে, এটাই উপযুক্ত সময় তোমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার।

আমি কি এখন ফিরতে পারবো রিদ্ধা? আমি যে অনেক দূরে চলে গেছি, সেখান থেকে আর ফেরা যায় না। পরমেশ্বরদা আমাকে কিছুতেই ফিরতে দেবেন না।

ইন্সোমনিয়াক হয়ে পড়লে সমস্যার তীব্রতা আরও বাড়বে সমীপ। তুমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ, এখন নিজেকে সংশোধন করে নেওয়ার ক্ষমতা তোমার। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বা না রাখা অন্য কারোর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

তুমি তো জানো পরমেশ্বরদা কী সাংঘাতিক মানুষ। তিনি অমরেশকে খুন করার ষড়যন্ত্র করতে পারেন, তার পক্ষে আমাকে খুন করা কী খুব শক্ত কাজ?

তাহলে তুমি কি করতে চাও?

আমি জানি না আমার কি করা উচিত। পরমেশ্বরদার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখাও সম্ভব নয়। কিভাবে তাঁদের সংস্পর্শ ত্যাগ করবো আমি বুঝতে পারছি না।

রিদ্ধাও দ্বিধাগ্রস্ত। পরমেশ্বরদার বিরোধিতা করতে গেলে সমীপের জীবন-সংশয় হতে পারে। আবার তাঁর সহযোগী হয়ে থাকার অর্থ জীবন-বিরোধী আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ। সে পথ তো মানবিকতার পরিপন্থী। রিদ্ধা বলল, তুমি মনে করো, আজ যেভাবেই বেঁচে আছ, তেমনিভাবেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে, তাহলে তোমাকে কিছুই করতে বলবো না। আর যদি মনে হয় পরমেশ্বরদার মুখোশ খুলে দেওয়া তোমার সামাজিক দায়িত্ব, তবে মৃত্যু-ভয়কে উপেক্ষা করার মানসিকতা তোমাকে অর্জন করতে হবে। সেই পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে আমি কতক্ষণি স্থির থাকতে পারবো, সে ভাবনা তোমাকে বিসর্জন দিতে হবে।

রিদ্ধা প্রয়োজনে এত কঠিন হয়ে উঠতে পারে? কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ওর মনের কোমল অংশ জুড়ে হয়ত স্থান করে নিয়েছে কঠিন পাথরের মতো নিশ্চল অনুভূতি। সেখানে প্রেমাস্পদের জন্য আর মায়া আছে এতটুকু স্থান খুঁজে নিতে পারছে না। এভাবে কোন নারী বেঁচে থাকতে পারে? জীবনের সবচেয়ে প্রিয়জনকে কেউ কি করে ফেলতে পারে অবধারিত মৃত্যুর পথ ঠেলে নেবার নিষ্ঠুর সংকল্প?

সমীপের বিষাদময় প্রতিমূর্তি দেখে রিদ্ধা বলল, সমীপ, তুমি যে মুহূর্তে ভুল পথ বেছে নিয়েছ, তখনই তোমার আত্মিক-চেতনার অপমৃত্যু ঘটেছে। আজ তখন বিষে যন্ত্রণার সাগরে ডুবিয়ে পড়ার প্রয়োজনে পা বাড়াচ্ছ, সে সময়ে মৃত্যু যদি আসে সহজে তোমার যৌবন ফিরবে। সারাজীবন ধরে আমি সেই যৌবনের আলোর স্পর্শ নিয়ে পথ চলবো।

রিদ্ধাকে মনে হলো একজন নারী নয়, প্রাগৈতিহাসিক এক মেধী মানবী-রূপে এই পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছে। তাই মৃত্যু-যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করার মন্ত্র শুনিয়ে অনুপ্রাণিত করার শক্তি তার আছে। সমীপ বলল, আমি তোমাকে একবার স্পর্শ করতে চাই রিদ্ধা, তুমি কি অনুমতি দেবে?

অনুমতি দিতে হবে না সমীপ। আমি তো তোমারই। তার সেই জন্যই আমি

তোমাকে বাইরে পথে এগিয়ে যাবার কথা বলতে পারছি।

যে নিজেকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাকে ছুঁয়ে চাইবার প্রলোভন হারিয়ে ফেললো সঙ্গীত। রিক্তা অন্তরঙ্গতাকে হারিয়ে আরও দূরে পাবার আশায় এখানে ছুটে এসেছে, এ ধারণা থেকেও নিজেকে মুক্ত করে নিল। জিজ্ঞেস করলো, অন্তরঙ্গতার খুনের ষড়যন্ত্রের সময় আমি জড়িত ছিলাম, এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আর হাত আছে?

পরমেশ্বরা। উনি নিজেই তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে থানায় ডাইরি করেছেন। আবার নিজেই তোমাকে আমিন দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছেন। এ এক খুব রাজনীতির খেলা।

আশ্চর্য! একই ব্যক্তি এই দুটি কাজ একসঙ্গে কি করে করতে পারে? তিনি পুলিশের কাছে নালিশ করেছেন, তাঁরই জামিন কিভাবে গ্রাহ্য করলেন তিনি?

ডাইরি করার সময়ে নিজের নামের পরিবর্তে অন্য নাম ব্যবহার করেছেন পরমেশ্বরা। পুলিশকে কম আমার কৌশল উনি কেন ভালোই জানেন।

পরমেশ্বরা এখন সঙ্গীতের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত জীব। ওর ইচ্ছে হলো এখনই ছুটে গিয়ে পরমেশ্বরাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে। মুখোশ খুলে দিয়ে মানুষকে দেখাতে একজন জনদরদীর আসল চেহারা। মানুষের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এঁদের মতো রাজনৈতিক নেতারা কী ভয়ংকরভাবে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে।

সঙ্গীতের জানার কৌতূহল, রিক্তা কোথা থেকে এই গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের অপপ্রচারও হতে পারে। তাকে বিশ্বাস করে জীবনের পুঁজি নিয়ে পা বাড়ানো নিতান্ত বোকামি। রিক্তা সঙ্গীতের যথেচ্ছাচারী জিজ্ঞাসার কিছুমাত্র খুশি না হয়ে বলল, তোমার মনে এই প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। তোমাদেরই দলের একজন—যার বলাতেই তুমি তাঁকে চিনতে পারবে। আপাতত তাঁর নাম আমি প্রকাশ করছি না—পরমেশ্বরার সব চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিয়েছেন 'জনমানস' পত্রিকার এক সাংবাদিকের কাছে। সেই সাংবাদিক অন্বেষণের বন্ধু। তোমাদের দলে যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, এই ঘটনা সে কথাই প্রমাণ করে। অবশ্য এই গোপন তথ্য ফাঁস করার পুরস্কারস্বরূপ তিনি 'জনমানস' পত্রিকার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছেন। অন্তর্ঘাতমূলক সাংবাদিকতার জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে অর্থ দেওয়া নৈতিক অপরাধ নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সংবাদ কেনার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

তিনি গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন, তিনি তথ্য প্রমাণ দিতে পেরেছেন?

অবশ্যই। তথ্যপ্রমাণ ছাড়া এই ধরনের সাংবাদিক-প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধু মনগড়া অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করার অর্থ জনসাধারণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

'জনমানস' পত্রিকায় এই প্রতিবেদন কবে প্রকাশিত হবে?

কয়েক দিনের মধ্যেই। প্রথমে যেখবর যোধপুর পার্কে গোপনে ফ্লাট কেনা নিয়ে লেখা হবে। তোমাকে আমার একটাই অনুরোধ, এই প্রতিবেদন লেখার উৎস সম্পর্কে কোনো কথা পরমেশ্বরার কাছে প্রকাশ করো না। কোনো সংবাদপত্র সংবাদের উৎস প্রকাশ করতে বাধ্য নয়, এমন কী কোর্টও নয়।

পরমেশ্বরার নতুন কেনা ফ্লাটের ঠিকানা আমাকে জোগাড় করে দিতে পারো?

আমি ঠিক জানি না। তবে আমি জেনে তোমাকে দিয়ে দেব।

সঙ্গীত পরমেশ্বরার রক্ষিতাকে দেখতে চায়। রিক্তার অভিযোগ কতটা সত্যি, তাও যাচাই করে নিতে পারবে। কিন্তু রক্ষিতার সঙ্গে স্ত্রীর পার্থক্য কোথায় কী কোনো উপায় আছে। উনি যদি নিজেকে পরমেশ্বরার স্ত্রী বলে পরিচয় দেন?

রিক্তার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে সঙ্গীত এরপর ঘিয়েতোরার দিকে গিয়ে হাজির হলো জোড়াপুর পার্কের ফ্লাটে। নতুন বসতে আছি। অফিস একতলায় ঝিলাল কার পার্টির-এর আস্তানা। সমাজের উঁচুতলার মানুষের ফ্লাটগুলো কিনেছেন। পরমেশ্বরা এত টাকা খরচ করে রক্ষিতার জন্য ফ্লাট কিনেছেন। এই পরিবেশে রক্ষিতাকে রেখে হয়ত তার সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে চেয়েছেন।

কলিং বেলের সুইচে হাত দিয়ে ছিল হাত কেঁপে উঠেছিল সঙ্গীতের। যদি রক্ষিতার পরিবর্তে পরমেশ্বরাই দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী জবাব দেবে সঙ্গীত। কিন্তু সে ভয়ে পালিয়ে তো অনুসন্ধিৎসু মনকে শান্ত করা যাবে না। মনের ভেতরে সেই তাড়িত কেবলই দংশিয়ে বেড়াবে। তখনো যা আরো বাড়বে, এই কথা ভেবেই সঙ্গীত কলিং বেলে হাত রাখলো। মিষ্টি টুংটাং শব্দ সঙ্গীতের বুকে অজানা আতঙ্কের ঢেলেপড়ে তুলেছে।

আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল এক সুন্দরীর মুখ। পরমেশ্বরা এমন এক সুন্দরীকে রেখেছে ফ্লাটে খুঁজে পেলেন। রাতের দুষ্কৃতকারী বিছানায় শুয়ে এমন সুন্দরীকে জড়িয়ে ধরতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে কোনো পুরুষকেই পাগল করে দিতে পারে।

সুন্দরীর প্রশ্ন, আপনি কাকে চান?

পরমেশ্বরার নাম মিতে এসেও উচ্চারণ করতে পারলো না সঙ্গীত। বলল, আমি এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আপনি এখানে কবে এসেছেন?

একজন অপরিচিত পুরুষকে বৈঠকিয়ে বিতে চাইলো না সুন্দরী। বললেন, আপনি কে। কেন এসেছেন এখানে?

সঙ্গীত আত্মগোপন করতে চায়। তাই বলল, আমার পরিচয় জেনে আপনি কি করবেন? আপনি তো পরমেশ্বরা।

'রক্ষিতা' শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে থেমে গেল সঙ্গীত। সুন্দরী সঙ্গীতের অসমাপ্ত বক্তব্যের খেই ধরে বললেন, হাঁ, আমি ওনার স্ত্রী। কিন্তু আপনাকে আমি কখনো দেখিনি।

একজন রক্ষিতা নিজেকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে পারে, এ তো আগেই অনুমান করতে পেরেছিল সঙ্গীত। সুতরাং বিস্ময় প্রকাশ করার কোনো অবকাশ ছিল না সঙ্গীত বলল, আমি এ অফিসে আগে কখনও আসিনি, তাই আমাকে দেখেননি।

আসুন তবে এসেন ভেতর।

পরমেশ্বরা গোপনে বিয়ে করেছেন, এ সংবাদ পেয়েই আমি ছুটে এলো আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি ভেবেছিলাম পরমেশ্বরার সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে

গোপনে বিয়ে করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেও সুন্দরীর চোখে বিরূপ ভাবের প্রতিফলন নেই। উপরন্তু কোনো এক পরিচ্ছিতির খোঁজা খুঁজে পেল সঙ্গীত। সামান্য পরিচয়ে অস্বাভাবিকভাবে উপস্থিতি কিছুটা মুছে গেল্লো, এই ভাবনাই হয়ত সুন্দরী বলি নিয়েছে। সঙ্গীতের ভেতরে আসার জন্য অনুরোধ জানানোর রীতিকে মূল্য দেওয়ার সঙ্গীত বুঝতে পারলো, অপরিচিত কোনো পুরুষকে ঘরে ডো নিয়ে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন পরমেশ্বরা। সুন্দরী বললেন, ওর আসার সময় হয়ে গেছে। এখনই এসে পড়বে। আপনার সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে।

সঙ্গীতের পক্ষে আর এখানে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। হাতঘড়িতে সময় একবার তাকিয়ে সঙ্গীত বলল, আমার একটা জরুরী কাজ আছে। আমি এখনই চলে যাবো।

সঙ্গীত পালিয়ে যেতে চাইলেও সুন্দরী কথা দিয়ে বলল, আপনি আপনার পরিচয় না দিয়েই চলে যাবেন?

নিজের পরিচয় গোপন রাখতেই সঙ্গীত বলল, আমার নাম অন্বেষণ। আমি পরমেশ্বরার দূর-সম্পর্কের ভাই। আমি যাচ্ছি।

আপনি আরেকদিন আসবেন। আমার মুখে ওকে জানাবেন। তাহলে ও একা থাকবে।

সঙ্গীত সুন্দরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনতলা থেকে একতলায় নেমেই দেখ গোটা পরমেশ্বরার বিদেশী গাড়ি পার্কিং করার জন্য এসেছে।

যেখানে যাবের জন্য সেখানেই সরে যায়। এই প্রবাদের সত্যতা যাচাই করে নি পারলো সঙ্গীত। সুন্দরীর সঙ্গে আর কয়েক মিনিট বেশি কথা বললেই ধরা পড়া যে সুন্দরী এক পরপুরুষের সঙ্গে যোগসাজশে মেতে আছে, সেই দৃশ্য সহ্য করা পরমেশ্ব পক্ষে সম্ভব হতো না। হয়ত পাইকিক অত্যাচারের আঘাত সহ্য করার মতো আঘা পৌঁছে যেতে হতো সুন্দরীকে। সঙ্গীত পরমেশ্বরার নজর এড়াতে অন্য একটি পার্ক আড়ালে বিয়ে দাঁড়াল। অবশ্য লুকোতে চাইছে এমন ভাবী করলে নজরে পড়ে যে বিপদ যেতে যাওয়ার সম্ভাবনা। পরমেশ্বরা গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন বিল্ডি দিকে। এখানে নিশ্চয়ই প্রতিবেশীরা কেউ কাউকে চিনতে চায় না। তাই গোঁ বিনিময়ের প্রশ্ন নেই। সঙ্গীত এবার খুব সহজেই বেরিয়ে এসে পরিষ্কার রোদ ধর পারলো।

ঠিক এই সময়ে প্রতিবিম্ব পরমেশ্বরা সুন্দরীর কাছে আসেন। সুন্দরীর স আলোকমালার অভিনন্দনে মেতে ওঠেন। সারাদিন জনসেবার ক্লান্তি, জীবনের একঘেয়ে ভুলতে পরমেশ্বরা তাঁর পুরুষ হয়ে উঠে বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পেতে চ সুন্দরীও এক নারী থেকে রমণী হয়ে ওঠেন।

সুন্দরীর শরীরে এখন সম্ভ্রান্ত অন্তর্বাস। যৌবনের রূপসাবল্যের পসরা সাজি তিনি উত্তেজনা হয়ে উঠতে চান। পরমেশ্বরাকে জড়িয়ে ধরে উপর মাথা রেখে আদ্রে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, এ সংবাদ জানতে পেরে তোমার এক ঘনিষ্ঠসম্পর্কের ব আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

পরমেশ্বরা এই কথা শুনেই রাগে স্থির হয়ে উঠে সুপর্ণার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঠেলিয়ে উঠলেন, তুমি কেন ওই অপরিচিত পুরুষকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছিলে? অমরেশ নামে আমার কোনো ভাই নেই।

পরমেশ্বরার রুদ্রমূর্তি দেখে ভীত হয়ে পড়লেন সুপর্ণা। অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলে স্বামীর অপরাধ করে ফেলেছেন। তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করে ভীত স্বরে বললেন, বিশ্বাস করো, আমি ওকে ঘরে ঢুকতে দিইনি। ওধু পরিচয়টা জানতে চেয়েছিলাম। আর কেন এসেছিল জিজ্ঞেস করতেই নিজের কথা বলেছিল।

পরমেশ্বরার বিক্ষুব্ধ মন কিছু স্বস্তির উত্তর খুঁজছে। এ বাড়ির সন্ধান ওই ছেলেটা কোথা থেকে পেলো। তবে কি কেউ এই বাড়ির ওপর নজর রাখছে? কে সে? তার উদ্দেশ্যই বা কি? সে কী আমারই মতোর বিক্ষুব্ধ কেউ? ঈর্ষায় হৃদয় তারে এই ভাবে উৎসাহ জুগিয়েছে।

রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই পরমেশ্বরার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এক সময়ে থাকতেন ভাড়া বাড়িতে। টাকাইয়ের কেনার পরে। এখন আছেন আপুনিক ফ্ল্যাটে, দামী গাড়িও কিনেছেন। তাঁর এই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা দেখে বান্ধবীজনেরা, বন্ধুস্থানীয়রা কেন ঈর্ষা গোপন করেন, তাদের মধ্যেই কেউ হয়ত নতুন ফ্ল্যাট কেনার সংবাদ পেয়ে ওপরচালাকির সাহায্য নিয়েছেন। সুপর্ণার কাছ থেকে আগন্তুকের ফোয়ারার বর্ণনা শুনে সম্ভাব্যের তালিকার কারোরই সঙ্গে মেলাতে পারলেন না।

হঠাৎ সন্দীপের ফোয়ার পরমেশ্বরার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তবে কি সন্দীপ এসেছিল। ও এ বাড়ির সন্ধানই বা পেলো কার কাছ থেকে। চারদিকে শত্রুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে রাজনীতি করা খুবই কঠিন।

মনের অন্তর্দ্বন্দ্বোদ্বিগ্নতা ঔদ্ধত্যেই সুপর্ণার পরিচয়ের উজ্জ্বতা পাবার আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলেছেন পরমেশ্বরা। অনাসক্তি জীবিয়ে বসেছে মেহেমনে। এতোদিন হয়েও সুপর্ণা চাইছেন পরিচয় আকর্ষণে পরমেশ্বরাকে আত্মনিবেদিত করে তুলতে। কিন্তু পরমেশ্বরা তাতে বাধার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সুপর্ণা বললেন, এই তো এলো, একটু পরে চলে যাবে।

আমার কিন্তু ভালো লাগছে না সুষমা। কে এখানে এসেছিল আমি ততক্ষণ না জানতে পারছি, আমার মনে শান্তি নেই। আমাকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, আমি কেন বুঝতে পারছি।

কিন্তু তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে কি সব জানতে পারবে। ঘণ্টা তিনেকের জন্য তুমি আমার কাছে আসো। আমি তোমাকে অবশ্য বেশি সময়ের জন্য কাছে পেতে চাই, সে সুযোগ পাই না। এইটুকু সময়ের জন্য আমি তোমাকে পাই, তা থেকেও আমাকে বঞ্চিত করতে চাইছ?

তোমাকে বঞ্চিত করতে যদি আমি চাইতাম, তাহলে এত দামী ফ্ল্যাট কি আমি কিনতাম?

আমি ফ্ল্যাট চাইনি, আমি চেয়েছি শুধু তোমাকে।

একজন স্ত্রীলোকের এই চাওয়াকে সমর্থন করতে পারে না কোনো পুরুষ। যার শুধু পদাশ্রিতা হবার কথা, সে কোন অধিকারে পুরুষকে বেঁধে রাখার দাবী জানাতে পারে? পরমেশ্বরা এই নিয়ন্ত্রণ-নীতি উপেক্ষা করার পক্ষপাতী না হয়ে বললেন, আমি তোমাকে যা দিয়েছি, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করো। অতিরিক্ত কিছু আশা করো না।

স্ত্রীলোকের মন থাকতে নেই। অর্থের বিনিময়ে নিখিল পুরুষের শারীরিক চাহিদা মেটানো আর জীবিকা তার আলাদা মন কী? সুষমা তাঁর ভূমিকা পালন করতে করতে কোন যে স্ত্রী হয়ে ওঠার তাগিদ অনুভব করেছিলেন, তা তিনি নিজেও টের পাননি।

বিকল্পের সীমা সন্ধান করার জন্য সত্যিই সুষমা অপরাধী। পরমেশ্বরা চলে গেলে একাকিত্বের যন্ত্রণায় পুড়তে পুড়তে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। এক অধীর আকাঙ্ক্ষায় মন যে এক রূপ নিয়ে জেগেছিলেন। তারই অভিঘাতে নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এখানে এসে উঠেছেন। এ ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি পেতে চান সুষমা। শরীরের বিনিময়ে যদি পুরুষের হাত থেকে ভালোবাসা না পাওয়া যায়, তবে কত দিন সহজ জীবনকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে বেঁচে থাকা।

সাত

সন্দীপের অফিসে এসে হাজির পরমেশ্বরা। তিনি উৎপীড়িত উদ্যমের মতো বাড়ছেন, যদি অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারেন, এই আশা নিয়ে। তাঁর হাতে এই পর্যন্ত কারুর অনুকূল করতে চাইলো সন্দীপ। গভীর বিষাদ সাগরের মতো ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল সন্দীপের মুখে শরীরে। আতঙ্কিত হয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন?

ফোন থেকে। তোমাকে ওখানে না পেয়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি।

আপনি নিজে এলেন কেন? কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিলে আমি নিজেই যেতাম।

তোমার এখন সময় কোথায়! তুমি তো আমার সঙ্গ এড়িয়ে বিস্তার ছড়িয়ে ছড়াবার শুরু করেছ। অমরেশকে হারিয়ে ও এখন তোমার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

ঝিকাকে নিয়ে পরমেশ্বরার উক্তি শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে কেন উনি অযথা কটূক্তি করেন। পরমেশ্বরাকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ভক্তিমতে জীবন প্রবাহে অনধিকার মন্তব্য করার শক্তি তারেরই থাকে না। সন্দীপ আক্রমণাত্মক ভাষায় বলল, আমাকে ওর কাছে যেতেই হবে, যতদিন না আমি দামী ফ্লাট কিনে সুপর্ণা রক্ষিতা রাখতে পারছি।

আঘাতের প্রতিক্রিয়াতে প্রত্যাঘাত যত তীব্র হয়ে ওঠার কথা ছিল, পরমেশ্বরা সেই কৃপনায় ক্রিয়মান। কিন্তু অভিযোগের তালুকে তাঁকে অভিযোগিত পক্ষের অধিকারী হতে সাহায্য করতেই মেজাজ যথাসম্ভব কড়া করে বললেন, তোমার ঔদ্ধত্য কিন্তু আমার সহ্যশক্তির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তুমি কি বলতে চাইছ আমি ফ্লাট কিনে রক্ষিতা রেখেছি?

আমি আপনার বিরুদ্ধে কি সেই অভিযোগ করেছি? আপনি নিজেই তো প্রমাণ করে দিলেন, আপনি সত্যিই অপরাধী কিনা।

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে সন্দীপ। এখনও সময় আছে। আর যদি আমাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ অমরেশের মতোই হবে।

সন্দীপ ও পরমেশ্বরার উত্তপ্ত কথা-বিনিময়ের শব্দ কানে পৌঁছাতেই আদুর শরীরে রেবতীভূষণ দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। রাজনীতির কূটতর্ক ঝলসিয়ে চলে এসেছেন মিনতি। পরমেশ্বরার নজরে পড়েনি তাঁদের উপস্থিতি। রেবতীভূষণ পরমেশ্বরার সংলাপের শেষাংশ শুনেই বললেন, আপনিই তাহলে অমরেশকে খুন করিয়েছেন! আর সন্দীপকে খুনের দায়ে জড়িয়ে মিথ্যে অভিযোগ এনে জেলে পাঠিয়েছেন! আপনাকেই আমি জেলে পাঠাবো।

পরমেশ্বরা এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত না থাকলেও, ঘটনার আকস্মিকতাকে মুহূর্তেই সামলে নিয়ে বললেন, আপনি কেন মিছিমিছি এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন! আপনি শত চেষ্টা করেও আমাকে জেলে পাঠাতে পারবেন না। তাছাড়া, সন্দীপের নাম এখনও পুলিশের ডাইরীতে আছে। ও কিন্তু এখনও নির্দোষী প্রমাণিত হয়নি। আপনি যদি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করেন, তবে সন্দীপকে আবার জেলে যেতে হবে। এবার কিন্তু সহজে ছাড়া পাবে না।

এই মন্তব্যটিকেই তো সেদিন কত হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে সম্মানিত করেছিলেন মিনতি। আজ বুঝতে পারছেন এঁরা মুখোশ পরে মানুষকে জিম্মায় বিভ্রান্ত করে। এমন নেতাদের বিকৃত মনের সন্ধান পেলে মিনতির মতো সকলেই ঘৃণা করে উঠতে হয়। মানুষকে সেবা করার ভনিতায় ওঁরা ক্ষমতা হস্তগত করার খেলায় মেতে ওঠেন, তাই কেউ ওঁদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। রেবতীবাবু পরমেশ্বরার হাবভাবের কাছে মাথা নোয়াতে চাইলেন না। বললেন, সন্দীপকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এলে আমি বাধা দেব। আমি তো মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েই আছি, সুতরাং জীবনের ভয় আমি করি না। যন্ত্রর আগে আমিও দেখতে চাই আপনার কত ক্ষমতা আছে, আর আমি কতটা লড়াই করতে পারি।

সন্দীপ জানে একজন সাধারণ মানুষকে কত সহজে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারেন পরমেশ্বরা। বলে কতজনকে আছে, যাদের দিয়ে এমন কত খুন করিয়েছেন। শেষ সিদ্ধান্ত অবশ্যেন। আজ পর্যন্ত একটা খুনেরও কিনারা হয়নি। পুলিশী-তদন্ত মাঝ পথে থেমে গেছে। অপরাধীরা নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাতে কেউ শাস্তি না পায়, তার জন্য পেছন থেকে কলকাঠি নাড়েন পরমেশ্বরা। রেবতীবাবুকে থামাতে চাইলো সন্দীপ, শরীরের অবস্থার কথা ভেবে। বলল, তুমি আমার অসুখ হয়ে পড়বে, ঘরে চলে যাও।

আমাকে বলতে দে সন্দীপ। এঁদের জন্যই আজ সমাজের এই অবস্থা। দিনকে দিন অরাজকতা বাড়ছে। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না তাই অন্যায় চলছে।

পরমেশ্বরা একদিনের জন্যও জীবনে এভাবে হেনেস্থিত অপমানিত হননি। গত পনেরো বছরে যখন নিজের স্বভাব অনুযায়ী অন্যায়ে সমর্থ হয়েছেন, অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে। পরিস্থিতি আজকের

মতো বিশ্বাসের আইরে চলে যায়নি কখনও। অথচ কেউ কি বিশ্বাস করে খোপনে রাখত নিজের সর্বনাশের? ওই কি সর্বনাশকে ফ্ল্যাটের ঠিকানা দিয়েছে? অন্তরঙ্গতার কারণে ফ্ল্যাট কেনার সংবাদ দিয়ে পৌঁছনো নির্বাচনের কাজে কত টাকা ধার হয়েছে তার পুরো হিসাব চাইবেন। তখন তো তাহিল তহবিলের দায়ে অতিরিক্ত হতে হবে। নিজেই পাপের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন, মুক্তির উপায় নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে। সর্বনাশকে আবার ফেলে পাঠানোর নিষ্ঠাস্ত নিপুন প্রতিশোধ নেবার জন্য।

পরের দিন সকালে পরমেশ্বরা ঘুম থেকে সবে উঠে বাথরুমে গেছেন। ফোন বেজে উঠলো। পরমেশ্বরা বিরক্ত হলেন। এত সকালে কে আবার ফোন করছে। রিসিভার তুলে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের গলা পেলেন। আত্মপরিচয় প্রদান না করেই অপরিচিত মানুষটি বললেন, 'জনমানস' পত্রিকার বাসনাকে নিয়ে একটি লেখা বেরিয়েছে, আপনি কী পড়েছেন। যদিনা পড়ে থাকেন, এখনই কিনে নিয়ে আসুন।

'জনমানস' পত্রিকার নাম শুনেই মুখটা বিকৃত করলেন পরমেশ্বরা। বললেন, ওই পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে যা খুশি লিখতে পারে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

এবার কিন্তু বাধে পরমেশ্বরবাবু। আপনার রঙ্গিতা জোশার আছে, সে বাড়ির ঠিকানা ও ছবি ছাপা হয়েছে। আপনার বাড়ির নম্বর ও আপনি গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢুকছেন, এ ছবিও ফটোগ্রাফের কায়দেরও ধরা পড়েছে। এবার কিন্তু আপনি ফেঁসে গেলেন। সমাজ সেবার মুখোশও খুলে গেল।

পরমেশ্বরা একরার ভৈরব হাঁকিয়ে গর্জন করে উঠলেন, আপনি কে? কেন আমাকে অযথা বিরক্ত করছেন।

আপনি আমার পরিচয় জেনে কী করবেন।

পরমেশ্বরা উত্তেজিত হয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সজোরে, যেন তিনি চাইলেন অপর প্রান্তে কিতোত পৌঁছে নিতে।

চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছে। সুবমার কাছে নিশ্চয়ই 'জনমানস' পত্রিকার সাংবাদিক গিয়েছিল। অন্ত সুবমা সে সংবাদ গোপন করেছে। সুবমা ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব সংবাদপত্রকে গোপন তথ্য যোগান দেওয়া? ওই তাহলে ফ্ল্যাটের ঠিকানা পত্রিকাকে জানিয়েছে। মুখ-কালা নিয়ে এতদিন কালযাপন পুষেছেন। সুবমার বিশ্বাসঘাত ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর পরমেশ্বরা।

সুবমাকে পেলেন না ফ্ল্যাটে। ফোনও পেয়ে। ওকে পরমেশ্বরা নির্দেশ দিয়েছিলেন বিনা অনুমতিতে ফ্ল্যাটের ত্রিসীমানায় না ভেড়ে। ত্রিসীমানায় ভেড়ানোর অধিকার যদি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে যায় সুবমা। তখন পারস্পরিক সম্পর্কের গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অন্তরায়ের সৃষ্টি হবে

সুবমা নির্দেশ অমান্য করে ফ্ল্যাটের বাড়িতে গেল কেন? এত সাহস কে ওকে জোগাচ্ছে? ও আজও এখান থেকে পালিয়ে যায়নি তো? কিন্তু কোথায় পালাবে।

প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা কি ওকে চালিত করছে। যদিতে থাকলে এতদিনে ওকে দেহ-ব্যবসায়ে নামতে হতো। এখন তো সেই গ্লানি থেকে ও মুক্ত। ওর জীবনে একজন মাত্র পুরুষ। অন্যেরা পুরুষরা এসে টাকার বিনিময়ে ওর শরীর নিয়ে খেলা করছে না। এটুকু কৃতজ্ঞতা জোর সেই সুবমার?

সুবমা নিজের ইচ্ছায় বাড়িতে ফিরে না এলে কোথায় খুঁজে বেড়াবেন পরমেশ্বরা। পুলিশ কিংবা দলের কারোর সাহায্য নেওয়া যাবে না, আর সাহায্য নিতে গেলে 'জনমানস' পত্রিকার অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে।

সেদিনই গভীর রাতে মিলী থেকে ফোন এলো। জয়ন্তবাবু কথা বলছেন, পরমেশ, তুমি কি আজ ঝাঁঝিয়েছ? তুমি যোধপুর পার্কে ফ্ল্যাট কিনেছ তোমার প্রেমিকার জন্য, তুমি তো এ ব্যাপারে আমাকে তখনও কিছু জানাওনি। তুমি ওখানে ফ্ল্যাট কেনার টাকা কোথা থেকে পেলে? তোমার জন্য আমাকে ওপরে অনেক নেতার কাছ থেকে কথা শুনতে হচ্ছে। তোমাকে দল থেকে বহিষ্কারের কথাও কেউ কেউ বলছে। আমাকে এই ব্যাপারে প্রোলিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করতে হবে। সেই কারণে আগামী রবিবার আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। তুমি এয়ারপোর্টে যেয়ো। হ্যাঁও লাইনটা কেটে গেল। কোন ফ্ল্যাটে উনি আসছেন, সেটা জানার সুযোগ দেলেন না, পরমেশ্বরা।

'জনমানস' পত্রিকাই পরমেশ্বরার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য দায়ী। পত্রিকা অফিস ভাঙচুর করার কথাও একবার ভেবেছিলেন। কিন্তু তাতে যে হিতে-বিপরীত হয়ে যাবে, খবি আসে জানতে পারতেন, তাহলে ওই সাংবাদিকদের আক্রমণের প্রয়োজন দেখিয়ে অর্থ আদায় চেষ্টা করতেন। অন্যেরা মতো ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হলেও জনপ্রিয়তার মুখোশে যে কালির দাগ লেগে গেছে তা তো কিছুতেই মোছা যাবে না।

পরমেশ্বরা নিজেই কিনে জনমানস পত্রিকা কিনে নিয়ে এলেন। প্রতিবেদনে লেখকের নামের পরিবর্তে ছাপা হয়েছে, কিনের সাংবাদদাতা। অর্থাৎ সম্পাদক প্রতিবেদকের নাম গোপন রাখতে চাইছেন। এই সাংবাদদাতা অজ্ঞাতকুল্য করার একটি কারণ, যাতে সাংবাদিকের উপর কেউ আক্রমণ চালাতে না পারে। প্রতিবেদকের নাম খুব সহজে জানা সম্ভব নয়। প্রতিবেদনের সঙ্গে যে দুটি ছবি ছাপা হয়েছে, তার নীচে ফটোগ্রাফারের নাম ছাপা হয়নি। লেখা রয়েছে—জনমানস টিম।

রিঙ্কা হয়ত জানে, অনুবেদনের সঙ্গে ওর বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রতিবেদন লেখকের পরিচিত হতে পারে। রিঙ্কার কাছ থেকেই হয়ত গোপনীয় পার্কের ঠিকানা পেয়েছে সর্বনাশ। পরমেশ্বরা একবার ভেবেছিলেন রিঙ্কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কিন্তু রিঙ্কাকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না। 'জনমানস' পত্রিকা তখন শুরু করলে পুরো ঘটনা ওরা ঠিক জানতে পারবে। সুতরাং যত কুঁকি নিতে রাজী হলেন না পরমেশ্বরা।

পরমেশ্বরা ট্যাক্সি চড়ে এয়ারপোর্টে যাচ্ছিলেন। আসানসোল থেকে আসবেন জয়ন্তবাবু। দলের জন্যে তিনি নিজের গাড়ি ব্যবহার করেন না। দামী গাড়ি চড়ে ঘোরা ক্ষেত্রে কারণে মানুষ-প্রতিনিধি তৈরি হয়েছে কিছুটা ক্ষমির কারণ লাগে। যদিও দলের অনেক নেতাই ব্যবহার দামী গাড়িগুলো দলের সম্পর্কিত তালোকেসে নিয়েছেন তবে তারা সত্যকে আড়াল করে আনন্দ পান। পরমেশ্বরা সেই দলভুক্ত নন।

বি. আই পি রোডে সেক্টরটাউন জনপদোতে রিঙ্কাকে দেখতে পেয়ে ট্যাক্সি থামালেন পরমেশ্বরা। রিঙ্কা পরমেশ্বরাকে দেখতে পেয়েও না চেনার ভান করে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। পরমেশ্বরা ট্যাক্সিতে বসেই রিঙ্কাকে ডাকলেন। পরিচিত নেতা ডাকে ওদের সাড়া না দিয়ে উপেক্ষা করতে পারেনি। ট্যাক্সির কাছে এগিয়ে আসতে পরমেশ্বরা বললেন, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কার জন্য অপেক্ষা করছ?

আমার এক বন্ধু আসবে। ও এলেই আমরা অন্য এক বন্ধুর বাড়ি যাব।

তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। তোমাকে আমার বাড়িতে আসতে বলা তুমি হয়ত আসবে না। আমিই তাই রাত আটটা নাগাদ তোমার বাড়িতে যাব। তু কি একটু সময় দিতে পারবে।

কোন জরুরী ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চান পরমেশ্বরা। রিঙ্কা সেই ক্ষেত্রে উনি বললেন, এখনই তোমাকে জানাতে হবে। আসলে আমি এখন খুবই ব্য আছি। হাতে বেশি সময় নেই। আমাকে মিনিট দশেকের মধ্যেই এয়ারপোর্টে পৌঁছা হবে।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করতেই রিঙ্কা পরমেশ্বরার উত্থাপিত জরুরী আলোচনা প্রস নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। বাড়িতে আসতে নিষেধ করলে উনি খুবই ক্ষু হতেন। অন্যত্র পরমেশ্বরের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তাব মেনে নেওয়াও সম্ভব ছিল ন ওই দলের কাউকেই বিশ্বাস করে না রিঙ্কা। ওরা এমন পেছে এমন জঘন্য কাণ্ড ঘটি করবে তাতে আত্মরক্ষার দাঁড়ানোই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ওদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সংবাদপত্র মারফৎ জানা এই ঘটনাকে হিন্দী ছবির কাহিনীর মতো পরিবেশন করে আম সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করবে। 'জনমানস' পত্রিকা সঠিক রিপোর্ট প্রকাশ করলে পাঠক গুরুত্ব দেবে কলাকে কাহিনীকে।

রিঙ্কা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল চোখের সামনে ভেসে উঠছিল হিংস্র নেকড়ের মতো পরমেশ্বরার মুখ। রিঙ্কার এ অন্যমনস্কতা বন্ধুদের নজর এড়ায়নি। হয়ত ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে চিন্তিত রিঙ্কা, ত কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি। সেদিন অনেক তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে এসেছিল

পরমেশ্বরা আসেনি। রিঙ্কা বাড়িতেই ছিল। একরাশ দুশ্চিন্তা ওকে ঘি রেখেছিল। কেন পরমেশ্বরা আসতে পারেনি, তার কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠল ফোনি সংবাদ শুনে। পরমেশ্বরা সন্ন্যাসরোগে এক বছরের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তিনি অবশ্য বিদেশী চাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দুপুরিশ করেন পার্টির অন্যতম নেতা জয়ন্ত বসু। তখন কমিটির এক বিশেষ সভ এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বহিষ্কারের সংবাদ প্রকাশিত হতেই সংবাদপত্রের সাংবাদিক পরমেশ্বরপুর বাসভবনে ভিড়ে গেছিলেন তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে। তিনি কোনো সাংবাদিকে সঙ্গে দেখা করেননি, সাংবাদিকদের জানানো হয়, তিনি খুবই অসুস্থ। এখন ঘুমি আছেন। কাজেই সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না।

রিঙ্কা সংবাদ শুনেই বুঝতে পেরেছে পরমেশ্বরা সাংবাদিকদের এড়াবার জন্যই অসুস্থ ভান করে বিছানার ওপর আছেন। প্রতিক্রিয়ার চলন নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের উত্তর দেও জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সর্বনাশ হয়ত এখনও কিছু জানতে পারেনি। তেমনি ওর কাছে আসবে। মায়ের আপত্তি শুনে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হলো রিঙ্কা। পরমেশ্ব

অনুষ্ঠানটা কিভাবে মিছিলে যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

পরমেশদা জনা-তারা পাখির মতো মুক্তাদের কাতরাতে কাতরাতে তাকালেন, কেউ নিশ্চয়ই দেহান্ত থেকে দৃষ্টি সেরেছে। জহরবাবু নিজেই যদি এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে তার আগে অবশ্য তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। 'জনমানস' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে দলের সিদ্ধান্ত খুবই বিশ্বাসযোগ্য। আগেও দলের অনেক নেতাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তখন তো কেউ ওকথা বলেনি। আজ হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন। পরমেশদার সন্দেহের তীরটা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। তাঁর সন্দেহের তালিকায় একটি নামই বারবার ভেসে উঠছে। অমিত নন্দী।

অমিত নন্দী বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা। যদিও সে প্রকাশ্যে জহরবাবুর সঙ্গে কোনো বিরোধে জড়িয়ে পড়তে চায় না। কিন্তু সুযোগ পেলেই দলীয় কর্মীদের মিছিল-এ জহরবাবুর বিরুদ্ধে স্লোগানের মুখর হয়ে ওঠে। ও পুলিশ-গোষ্ঠীর সক্রিয় কর্মী। একবার নির্বাচনে অমিত আশা করেছিলেন জহরবাবুর পরিবর্তে পুলিনবাবুই টিকিট পাবেন। কিন্তু জহরবাবুর লিস্টিতে অনেক বেশি প্রভাব। পরপর দু'বার নির্বাচিত হবার জন্যই জহরবাবু সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বেশি পরিচিত। তাই জহরবাবু প্রার্থী-নির্বাচন প্রতিযোগিতায় অনায়াসে পিছনে ফেলে দিতে পেরেছেন পুলিনবাবুকে। সে নিয়ে অমিতের যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। তাছাড়া, অমরেশের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিয়ে তাঁর মতবিরোধের ঘটেছিল অমিতের সঙ্গে। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার পথ ছেড়ে হিংসাত্মক ঘটনার সাহায্য নিয়ে কাউকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনাকে জহরী সমর্থন করতে পারেনি অমিত। কিন্তু জহরবাবুর সম্পত্তি পেয়েই পরমেশদা উদ্যোগী হয়েছিলেন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে।

অমিত হয়ত আগে জানত না যোবপুর গার্ডের ক্লাস্ট কোথায় সংঘাত। জানলে নিশ্চয়ই এতদিন সমালোচনার মুখর হয়ে উঠত। সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার পরই পুলিনবাবুকে দিয়ে অমিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের কাছে তাঁর অভিযোগ জানিয়েছে। তারই পরিণামে এই বহিষ্কার। পরমেশদার মনে একটাই প্রশ্ন জাগছে, কে এই গোপন সংবাদ ফাঁস করে দিল। বিমলাই একমাত্র জানে? ও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তো। ওকে কর্পোরেশনে চাকরি যোগাড় করে দিয়েছেন পরমেশদা। ওর কি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা উচিত নয়?

পরমেশদার সন্দেহের তীর এবার সুষমার দিকে। ও ছাড়া আর কারুর পক্ষেই সম্ভব নয় সংবাদপত্রকে গোপন সংবাদ জানিয়ে দেওয়া। সেদিন কে ফিরেছিল সুষমার সঙ্গে দেখা করতে। সে কেন যমরেশের নাম স্মরণ করেছিল। সন্দীপই বা গোপন সংবাদ জানালো কার কাছ থেকে?

ক'দিনধরে সুষমার কাছে যাবার সুযোগ পাননি পরমেশদা। মানসিক অস্থিরতা ওঁকে খুবই ক্লান্ত করে তুলেছে, এ সময়ে নারী-সান্নিধ্য উপভোগ করার বাসনা জাগে না। সুষমা সেদিন অনেক রাতে ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিল। জেনে সে সংবাদও জানিয়েছিল পরমেশদাকে। কিন্তু তিনি তখন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে জরুরী বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন, তাই পরমেশদা কড়াটি কথা বলার সুযোগ পাননি।

পরমেশদাকে কাছে পেয়েই সুষমা উপোসী শরীর নিয়ে পরমেশদার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো। অবশ্য স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, রক্তিমের উপযুক্ত অভিনয়। পরমেশদা বাধা দিয়ে বললেন, এখন তোমার এই আদিখ্যেতা সহ্য করার শক্তি আমার নেই। তুমি আমার বিনা অনুমতিতে কেন ফ্ল্যাট ছেড়ে কাঁথিতে গিয়েছিলে। কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে?

প্রত্যাঘাতে হতচকিত সুষমা যথাযথ অভিমান প্রকাশ করে বলল, মায়ের কাছে গিয়েছিলাম। দুপুরে ঘুমের মধ্যে এক দুঃস্বপ্ন দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়িতে আসার পর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই না গিয়ে থাকতে পারিনি।

তুমি একবার আমাকে জেনে করতে পারতে। অন্তরঙ্গতার সংবাদ আমার কানে আসেনি।

অন্তরঙ্গতা শরীরের নয় মনের। টাকা দিয়ে কি মনের শূন্যতা মেপে যায়। মেয়েকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ তুমি বুঝবে কি করে?

আমাকে জেরবার চেষ্টা করো না। মেয়ে কিভাবে টাকা ব্লেকমেল করছে, তা জেনেও কি মাতৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। ওসব কথা আমাকে শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। সেদিন অমরেশ নামে যে ছেলেটি তোমার কাছে এসেছিল, তাকে তুমি কি বলেছিলে। গোপন করার চেষ্টা করো না। তার ফল কি ভয়ানক হতে পারে, তুমি এখন কল্পনাও করতে পারছ না।

পরমেশদা মেয়ে পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করতে চাইলেন, বুঝতে পেরেছে সুষমা। কিন্তু নিজেকে ওর্মেনি যা আতঙ্কিত বোধ করেনি। যে পথ বেছে নিতে যাচ্ছে, সেখানে জীবন ও মৃত্যুর হিসেব তফাৎ নেই। এভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ? যৌবন শেষ হয়ে গেলে কঙ্কালটার মতো ভেসে বেড়াতে হবে। সুষমা ক্লান্তকিন্তে জবাব রেখে বলল, আমি তোমার টাকায় বেঁচে আছি, সেই কৃতজ্ঞতায় আমি কখনো তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। রক্তিমা হলেও আমার সেই মূল্যবোধটুকু আছে। মিতিকে না জানালে আমাকে এ পথে আসতে হতো না।

পরমেশদা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। মেজাজ চড়িয়ে বললেন, বেশি কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে না। তোমাকে যা বলতে এসেছি, শুধু সেটুকুই বলো।

আমি তোমাকে আগে যা বলেছি, তার অতিরিক্ত কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সঙ্গে অন্য মেয়েদের তুলনা করার সুযোগ ও পাওনি। আমি ওকে ভেতরে ঢুকতেও দিইনি।

তুমি জিজ্ঞেস করোনি এখনকার ঠিকানা ও ফোন নম্বর কোথা থেকে পেয়েছে?

জিজ্ঞেস করার সুযোগ ছিল না। তুমি তো এসেছিলে বিদ্যুৎগতি পায়ে, তোমার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হওয়া উচিত ছিল।

তোমাকে যদি যদি দেখাই, তুমি কি ওকে চিনতে পারবে?

সুষমা চিনতে পারবে, এই জবাব উপর ভরসা করেই পরমেশদা ব্যাগ থেকে কয়েকটা রঙিন ছবি বের করলেন। সুষমার হাতে দিয়ে বললেন, এদের মধ্যে ওকে তুমি চিনতে পারো।

সুষমা খুঁজছে। আজার চেষ্টায় বিশেষত্ব না থাকলে ভিড়ের মধ্যে নির্দিষ্ট মুখ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। সময় নিচ্ছে সুষমা। পরমেশদা তাড়া লাগাতেই সুষমা দু'জনকে দেখিয়ে বলল, এদের মধ্যে একজন এসেছিল। দু'জনের মুখের মধ্যে এতটা মিল যে একজনকে বেছে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এই দু'জনের মধ্যে সন্দীপ আছে। অন্যজন সুনীল। দুষ্টিলের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব নয়। ও তো পার্টি-অফিসের কর্মী। সন্দীপই এখানে এসেছিল, এ ব্যাপারে পরমেশদার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন জানা প্রয়োজন, কে ওকে ঠিকানা দিয়েছিল।

সন্দীপকে চাই। খবর পাঠালেও ও আসবে না। কিন্তু নিজেই বা কিভাবে যাবেন সন্দীপের বাড়িতে। রেবতীবাবুর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আর নেই। 'জনমানস' পত্রিকার প্রতিবেদন আর দল থেকে বহিষ্কারের সংবাদ ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই রেবতীবাবুর কানে পৌঁছে গেছে।

এই দুর্যোগের সময়ে কেউ আগের মতো মর্যাদা দিতে চাইবে না। ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে গেলে কিভাবে অপমানিত হতে হয় দলের কর্মীদের কাছে, এখন অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পরমেশদা। এই অবস্থার পড়তে হবে। পরমেশদা কল্পনাও করতে পারেননি। সুষমাকে বললেন, আমি তোমাকে আর পুষতে পারব না। এই ফ্ল্যাট ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে।

সুষমা এখন আশ্রয়চ্যুত বিপন্নতার ক্রান্তকালীন পাখির মতো অসহায়। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, আমি কোথায় যাব। আজকে কে আশ্রয় দেবে।

তোমার তো রূপ-যৌবন আছে। আমার মতো একজন বাবু জোগাড় করতে তোমার বিশেষ অসুবিধা হবে না।

হঠাৎ কেন এই পরিবর্তন। এমন কী ঘটনা ঘটেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে উনি এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন, বুঝতে পারছে না সুষমা। একদিন এই শরীরের আকর্ষণ ওনাকে উন্মাদ করে তুলেছিল। সেই জন্য টাকার জোগানও বন্ধ করে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। সুষমা বলল, তুমি যদি আমাকে তাড়িয়ে দাও, আত্মহত্যা করার পথ আমাকে বেছে নিতে হবে। আমি অন্য কোনো পুরুষের আশ্রয়িনী হতে পারব না।

তুমি তো জন্মেছ, বহু পুরুষ ভোগ্যা হবার জন্য। আমার নজরে না পড়লে এতদিন তোমাকে সে পথই বেছে নিতে হতো। তোমার মা-ই একমাত্র জানেন তোমার জন্মদাতা পিতা কে।

সুষমা একেবারে স্থির হয়ে গেল। যে জন্মের জন্য তার কোনো অপরাধ নেই, জ্ঞান হবার পর থেকেই এক অপরাধের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। অতিশপ্তপ্রায় এই জীবনের উপর এতটুকু মায়া নেই সুষমার। তাই করুণা ভিক্ষা করতে মন চাইলো না। সুষমা বলল, তুমি তাড়িয়ে দিলে আমাকে চলে যেতেই হবে। কিন্তু আমার দেখা আর কোনোদিনই পাবে না।

উচ্চমহলের জন্য সুষমা তাহিরা হবে এ সত্য মেনে নিতে বিব্রতবোধ করলেন পরমেশদা। বললেন, তোমাকে নিয়ে আমি এই মুহূর্তে কিছুই ভাবতে পারছি না। আমার

এখন খুবই ঘুরপথে চলছে। তুমি কয়েক মাস সময়ের কাছে দিয়ে আসো। আমি কিছু টাকা পাঠাবার চেষ্টা করছি।

আমার এক অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়াতে হচ্ছে সুবনাকে। এতদিন যাকে নিয়ে শুধু স্বপ্ন দেখেছে, তাকে পুরোপুরি ভুলে যেতে হবে। কিন্তু প্রেরণা কি কখনও ভুলতে পারবে? অবশেষে সর্বীপকে ছেড়ে পরিবেশের সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন পরমেশ্বরা। সর্বীপ এসেছে। অবশ্য করেনি। হয়ত সৌকুমার প্রেমিকেই ও এসেছে। চোখমুখ হাসি মুখে ছড়িয়ে সর্বীপকে অভ্যর্থনা জানাতেই সর্বীপ বলল,—আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? এখন তো আপনি দলের নেতা নন।

আমি সে কথা জানি সর্বীপ। তোমাকে আমার কিছু প্রয়োজন। আমি যদি তোমাকে একটা কাজ করি, তুমি কি সঠিক জবাব দেবে? তুমি তোমাদের পার্টির ঠিকানা জানতে পেরেছ আমার কাছ থেকে?

আমি তার নাম প্রকাশ করতে পারবো না। তিনি আপনার দলেরই একজন সক্রিয় কর্মী।

সর্বীপের ইঙ্গিতাত্মক থেকে পরমেশ্বরা বুঝতে পারলেন অরিত কিংবা পুলিনবাবু সর্বীপকে টাকার লোভ দেখিয়েছে। একবার ভাবলেন প্রতিশোধ নেওয়ার। নির্বাচনে টিকিট না পাওয়ার জেদ মেটাতে চাইছেন। জহরব্রতবাবুর পরে হয়ত দেওয়ার সাহস নেই, তাই তাঁর অন্যতম অনুগামীকে বেছে নিয়েছেন। পরমেশ্বরা বললেন, তুমি সুবনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে কেন? নিজের নাম গোপন করে অমরেশের নাম ব্যবহার করেছিলে কি না কেন?

আপনার গোপন প্রতিভাকে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই গিয়েছিলাম। অপরাধ করেছি কি? আমি আপনার প্রতিভার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিনি, যার জন্য আপনি আপত্তি জানাতে পারেন। আর অপরেশের নাম ব্যবহার করে আমি কি আপনার ভোটে কারচুপি করেছি? অমরেশের নাম শুনে আপনি রেগেছেন আন্দাজ করে ঠাট্টা করেছিলাম। যাকে আপনি চক্রান্ত করে খুন করিয়েছিলেন, সে আবার কোথা থেকে এসে উদয় হলো? আসলে, আপনার ভয়, অমরেশকে খুন করার জন্য কেউ না এসে আপনাকে অভিযুক্ত করে। আপনি কিন্তু কিছুতেই রেহাই পাবেন না।

পরমেশ্বরা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আমার কাজের জন্য তোমার কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই। আমি যদি সত্যিই অমরেশকে খুন করিয়ে থাকি, তার বিচার করবে আদালত।

আদালতের বিচার নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আপনি যে আমাকে অমরেশের খুনের সঙ্গে মিথ্যে জড়িয়েছেন, তার বিচার কি আদালত করতে পারবে?

সময় হলেই জানতে পারবে। আগে বলো, তুমিই কি 'জনযানস' পত্রিকাকে সব তথ্য যোগান দিয়েছ?

আমার সঙ্গে 'জনযানস' পত্রিকার যোগাযোগ নেই। ওরা অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। আমি যদি ওদের সাহায্য করতাম তাহলে আপনার রক্তিমার ছবিও প্রতিবেদনের সঙ্গে ছাপা হতো। আপনার দলের কেউ আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি একটু ভাবলে হয়তো জানতে পারবেন সেই বিশ্বাসঘাতকটি কে।

পরমেশ্বরার মুখ থেকে এক দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল। এখন কেউ কী সাহায্য করতে চাইবে? দল থেকে বহিষ্কার হবার পর থেকে লক্ষ করছেন এক সময়ে যারা এঁদুলি পোকার মতো পায়ে লেগে থাকতো, তাদের কেউই এখন ছায়া মাড়ায় না। ওদের অবশ্য তেমন দোষ নেই। ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে গেলে নেতার সামর্থ্য কমে যায়। কিছু না পাওয়ার সম্ভাবনা জানলে কেন তারা মিথ্যে সময় নষ্ট করবে?

আট

'অমরেশকে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত পরমেশ সান্যাল'—এই শিরোনাম নিয়ে আবার এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে 'জনযানস' পত্রিকায়।

কিভাবে ও কেন অমরেশকে খুন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, দলের মধ্যে কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কেন সর্বভারতীয় নেতা জহর কুণ্ডু এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছিলেন—সবই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন প্রতিবেদক। প্রতিবেদনের শেষ দিকে রয়েছে সর্বীপের প্রসঙ্গ। পরমেশ সান্যাল নিজেকে এই অপরাধের অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে তাঁদের এক কর্মী সর্বীপকে অভিযুক্ত করে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সেখানে নিজের নাম ব্যবহার করেননি। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারও করেছিল। আদালত সেই পরমেশ্বরাকে সর্বীপদের পুলিশ হেফাজত থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য জামিনেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এই পরস্পরবিরোধী কাজের মধ্যে চরম মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। একদিকে জনসাধারণের সন্দেহের তীর সর্বীপদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয়বার সর্বীপদের কাছে নিজের বাক্তিগতিকে উজ্জ্বল করে তোলা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে প্রতিবেদনে। তিনি ভাইরি করলেন, তিনিই আবার জামিনের ব্যবস্থা করলেন, এই দুই বিপরীতমুখী ভূমিকা গ্রহণে কেন আপত্তি জানাননি পুলিশ?

পরমেশ্বরা পুরো প্রতিবেদন পড়ে একটাই সিদ্ধান্ত করলেন, আমার রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দিতে তীব্র ষড়যন্ত্র চলছে আমারই দলের মধ্যে।

এই ষড়যন্ত্রের গোপনে কার সমর্থন রয়েছে, তিনি অবশ্য এখনও খুঁজে উঠতে পারেননি। দলের বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা পুলিনবাবুকেই তিনি বেশি সন্দেহ করেন। সর্বীপের সঙ্গে নিশ্চয়ই দলের ভেতরে ক্ষমতাশালী নেতার গোপন যোগাযোগ রয়েছে, সর্বীপ সেদিন নাম জানাতে রাজী হয়নি। সেই নেতাই হয়ত জনজাগরণ পত্রিকাকে সব তথ্য যোগান দিয়েছে। শত্রুতা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী একটি সংবাদপত্রকে সাহায্য করার পথ অবলম্বন করা নীতি-বিরোধী। কোনোদিনে ছাপা হোক, দলের প্রভাব বজায় রাখতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে খুন করা—এমন ঘৃণ্য সংবাদ নিয়ে জল ঘোলা করা অনুচিত। আর যেন মুছে কত রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটেছে, কত নেতা সম্পত্তি বাড়িয়েছে, সেসব ব্যাপার নিয়ে কিন্তু কিছু হয়নি। তবে সময়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে জনসেবা সেরে কলে যাবে। বিশেষ করে জনজাগরণ পত্রিকা প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত কিছুতেই পরমেশ্বরা মেনে নিতে পারছেন না।

জহরব্রতবাবু যে কেন বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি? এখন কী তিনি একবারের জন্যও কেন করে পরমেশ্বরাকে সমবেদনা জানাতে পারবেন। এই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তত পরিষদে এসেছেন পরমেশ্বরা, এ কথা কী উনি ভুলে গেছেন? এলাকার মুখকদের দলে টেনে এনেছেন। নির্বাচনে নিতে জহরব্রতবাবু এত নিশ্চিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মন্ত্রী হবার জন্য। সেদিন এয়ারপোর্টে দেখে আমার প জহরব্রতবাবু একটা কথাও বলেননি পরমেশ্বরার সঙ্গে। উনি হয়ত মোক্ষত্ত অবাক হয়েছিলেন, কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশ প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে তবে কেন এয়ারপোর্টে আসতে বলেছিলেন জহরব্রতবাবু? এখন নিজের ভুল ধরা করতে বিধাগ্রস্থ নন পরমেশ্বরা। ঘোষপুর পার্কের ছাপা কেলার সংবাদ জহরব্রতবাবু জানানো উচিত ছিল। এই ভুল কারণে উনি নিজের এতদিন অনুগত কর্মীর বিরু চলে যেতে পারলেন। নির্বাচন আসার হবে। কেন্দ্রের এই সরকার দু'বছরের বে টিকবে না। তখন জহরব্রতবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না পরমেশ

পরমেশ্বরা এই মুহূর্তে অনেক বেশি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন আসন্ন আর্থিক দা নিয়ে। দলের তহবিল এবং অন্যান্য সূত্র থেকে যে আয় হতো তা তো পুরো বন্ধ হয়ে গেছে। জমানো টাকা থেকেই জীবিকা নির্বাহের খরচ চালাতে হচ্ছে। ব হয়ে জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে ব্যয়-সংকোচ নীতি গ্রহণ করেছেন। প্রতিদিন হাতে কত ছে যেতে সন্তার দিকার আছেন। সুবনাকে চলে যেতে বলে মনের অন্তর্নিহিত দুর্গত কিন্তু ওকে ধরে রাখার মতো আর্থিক সামর্থ হারিয়ে ফেলেছেন। সুবনাকে যদি স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারতেন, তবে এই দুর্দিনে উনি ওকে পাশে পেতেন। এখন আর ভেবে সেই অধিকার দাবীও করা যায় না। ও চেয়েছিল সামান্য একটু ভা পেতে, যেখানে শরীর নয় মনের ভূমিকা বেশি। পরমেশ্বরা ওকে উপহাস করে দুঃখ দিয়েছেন। সুবনাকে সরল করিয়ে দিয়েছেন তার সামাজিক অবস্থানের ক এই সময়ে বিধায়ী হয়ে সুবনার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস নেই পরমেশ্বরার। ভেবেও ভুল করেছেন।

পুলিনবাবুর কথা মনে এলো। জহরব্রতবাবুর কাছে পরাজিত হবার ক্ষোভ এ ভোলবার ভুলতে পারেননি। সেই ক্ষোভকে হাতিয়ার করার জন্য জনযানস জহরব্রত উচিত শিক্ষা দেবার জন্য। পুলিনবাবুর কাছে সাহায্য চাওয়া কী ঠিক হবে। দুর্যোগের গ্রেতে ভাসা মানুষ বাঁচার আকস্মিকতায় সামান্য খড়কুটোর দিকেও হাত বা সাহায্য পাবার প্রত্যাশা নিয়ে।

পুলিনবাবুর কাছে গেলে কী হতাশ হয়ে ফিরতে হবে? মনের জোরের এ ঝীণ আশা জেগে উঠে পরমেশ্বরাকে উৎসাহিত করে তুলছে। অপমানিত হয়ে ফি আসার ঝুঁকি আছে জেনেও এক বিধায়কাঙ্ক্ষির মনে গেলেন পুলিনবাবুর বাড়ি পুলিনবাবু পরমেশ্বরাকে দেখে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে বললেন, আ অনেকদিন ধরে মনে হচ্ছিল আপনি আমার কাছে আসতে পারেন।

পুলিনবাবু হয়ত বিদ্রূপ করতে চাইছেন। আশ্চর্য করতে পেরেও পরমেশ্বরা চেহারার পরিবর্তন ঘটালেন না। বিশ্লেষণ করতে পারছেন, এমন মনে হবার কারণ কি? প্রতিক্রিয়াহীন পরমেশ্বরার চোখের দিকে তাকিয়ে পুলিনবাবু বললেন, আপনি এখন নিশ্চয়ই জয়ন্তবাবুকে চিনতে পেরেছেন। উনি এখনই চরিত্রের মানুষ। যাদের সাহায্য নিয়ে উনি রাজনীতিতে উন্নতি করেন, প্রয়োজন হলে তাদের সর্বনাশ করতে দ্বিধা করেন না।

পুলিনবাবুর কথাগুলো কেমন ধোঁয়াশায় জড়ানো। তবে কি জয়ন্তবাবুই সব ষড়যন্ত্রের পেছনে রয়েছেন? সেজন্যই এক ইঙ্গিতের ইশারা পেয়ে পরমেশ্বরা বললেন, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি না।

আপনি এখনও কিছু বুঝতে পারেননি! আর কবে বুঝবেন? এত দিন ধরে রাজনীতি করলেন, অথচ এই সামান্য ব্যাপারটুকু বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই!

সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না পুলিনবাবু। আমার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন...

পুলিনবাবু জোর গলায় হেসে উঠে বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব? সে যোগ্যতা আমার আছে?

হাসির শব্দ যেন চাবুকের মতো গিয়ে বিঁধেছে পরমেশ্বরার বুকে। এখন বিদ্রূপ, উপহাস—সবই সহ্য করতে হবে।

পরমেশ্বরা বিচলিত হয়ে বললেন, আমি খুব অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। আপনি প্লিজ—

আপনার সেই কবিতা কোথায় গেল? সেও কি আপনাকে ছেড়ে পালিয়েছে?

পরমেশ্বরা আহত হলেও পুলিনবাবুকে প্রত্যাঘাত করতে চাইলেন না। বললেন, এখন কে আমার কাছে থাকবে বলুন? আপনি ছাড়া আমাকে কেউ আর সাহায্য করবে না।

আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু। জয়ন্তবাবু একদা মন্ত্রী হতে না পারলেও ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকবেন। এখনকার সংবেদশপত্রগুলি ও স্বাক্ষরসংগ্রহে জয়ন্তবাবুকে সাহায্য করেছেন। সুতরাং তিনি যখন আপনাকে বন্ধন দল থেকে বহিষ্কারের মতন মুক্তিয়েছেন, তখন আমার পক্ষে কি কিছু করা সম্ভব।

আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রতিবেদন লেখার কাজে কি উনিই সহযোগিতা করেছেন?

আপনার এখনও সন্দেহ রয়েছে। ওই প্রতিবেদন যিনি লিখেছেন, তিনি জয়ন্তবাবুর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে। যদিও রাজনীতির ক্ষেত্রে দুজন দুজনের প্রতিপক্ষ, তবুও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েনি।

এ তো অবিশ্বাস্য ঘটনা।

এ ঘটনা নতুন নয়। স্বাধীনতার আগেও ঘটেছে। এ দেশের একজন স্বাধীন স্বকলাকী বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে সব অভিযোগ থেকে তাদের মুক্ত করতে পেরেছিলেন, কারণ বিচারক ছিলেন ওই স্বাধীন স্বকলাকীর সহপাঠী। তাঁর নাম আমাকে বিশ্লেষণ করবেন না।

পরমেশ্বরা বিব্রত হয়ে পড়লেন। জয়ন্তবাবু পরমেশ্বরার এমন নির্মমভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে? সদীপ বোধহয় জয়ন্তবাবুর কনিষ্ঠ কাজের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল ফ্লাট কেলার গোপন সংবাদ। কিন্তু সদীপের উচিত ছিল আমাকে জানানো। ওকে নিশ্চয়ই জয়ন্তবাবু টাকা দিয়ে নিজের পক্ষে টেনে নিয়েছেন। পুলিনবাবু পরমেশ্বরার মানসিক অবস্থা অনুমান করতে পেরে বললেন, এখন আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। একটা বছর কোনোরকমে কাটিয়ে দিন। তারপরে আমি দেখব, আপনার জন্য কি করতে পারি। এখন জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমার আর ভালো লাগছে না। আপনার সঙ্গে অন্য বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো?

আপত্তি জানিয়ে পুলিনবাবুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ সৃষ্টি করতে চাইলেন না পরমেশ্বরা। এই সময়ে একমাত্র উনিই তাঁকে ভুমিকা পালন করতে পারেন। সম্মতি পেয়েই পুলিনবাবু বললেন, আপনি কোথা থেকে এমন সুন্দর রমিলা যোগাড় করেছিলেন? কত টাকা দিতেন ওর মাকে?

আকস্মিক প্রশ্নে উদ্বাপন হয়েছেন পুলিনবাবু। উনি সুষমাকে ভোগের দেখেছেন? সুষমাকে পাবার জন্য উনি কী উন্মাদ হয়ে উঠেছেন? পরমেশ্বরা বললেন, হাঁপ পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রতি মাসে ওর মাকে আড়াই হাজার টাকা দিতে হত। তাছাড়া, আমার জামার দেখবা ও খাওয়াপরার দায়িত্ব ছিল আমার।

ফ্লাটটা কিনেই আপনি ভোগদখল বাঁচিয়েছেন। আপনি ওর জন্য এক লক্ষের ফ্লাট ভাড়া দিতে পারতেন।

সুষমাকে ঘরে রাখতেই আমি ফ্লাটটা কিনতে বাধ্য হয়েছিলাম। ওর পক্ষে এক পুরুষের পরিবর্তে অন্য পুরুষ যোগাড় করা খুব সহজ ছিল। আমার কাছ থেকে যাতে ওকে কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে, তাই...

পুলিনবাবু বিব্রতবোধ করে বললেন, ফ্লাটটা আমাকে বিক্রি করে দিন পরমেশ্বরবাবু। প্রয়োজনে সুষমার দায়িত্বও আমি নিতে পারি। অবশ্য ওকে আমি আমার শয্যাসঙ্গিনী করতে চাই না, সে বয়স আমার নেই। আমার স্বকলাকের প্রয়োজনে ওকে ব্যবহার করব। বুঝতেই পারছেন, প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হলে সুষমার মতো সুন্দরীদের ভূমিকাটি গুরুত্ব। আমি ওকে মাসে পাঁচ হাজার টাকা দেব। থাকার জন্য ফ্লাট দেব।

সুষমার শরীর হবে পুলিনবাবুর স্বকলাকের মূলধন। আচেনা পুরুষের সুষমার দেহ নিয়ে রক্তের অন্ধকারে নারী হোটেলের বিছানায় অথবা পোর্ট, লেক, পার্কস্ট্রিটের কোনারা ছড়িয়ে পার্টিতে ঝিনিমিনি খেলবে—এ দৃশ্যের কল্পনা চোখে ভাসতেই কেমন অস্থির বোধ করলেন পরমেশ্বরা। পুলিনবাবু সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইছেন। পরমেশ্বরা বললেন, সুষমাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। ও এখন স্বাধীন। ওর স্বাধিকার ব্যাপারে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

আপনি এতদিন ওকে কাছে রেখেছেন, আপনি বললে হয়ত আপত্তি করবে না।

আপনি আমাকে আর ওর সঙ্গে জড়াবেন না। টাকার বিনিময়ে সুষমা আমাকে সঙ্গ দিত। মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ সেখানে নেই। আমি ওর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি গিয়ে দেখা করুন।

বুঝতে পারছি, আপনি চান না সুষমা ফেরত হয়ে যাক। আপনি যদি ওকে এতই ভালোবাসেন, তবে ওকে ছিনে করেননি কেন।

সে আমার অক্ষমতা পুলিনবাবু। সুষমা আমাকে স্বামী হিসেবে পেতে চেয়েছিল, আমি কিন্তু পারিনি ওকে সেই মর্যাদা দিতে। রমিলা স্ত্রী হতে চাইছে দেখে, আমি তাকে অপমান করেছি। আপনি পারলে সুষমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিন, ওর শরীরকে ব্যবহার করবেন না।

এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে উনি রাজী নন, বুঝতে পারলেন পরমেশ্বরা। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কেন উনি সুষমাকে এত তীব্রভাবে পেতে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছেন? ওধুমাত্র স্বকলাকের প্রয়োজনে?

সুষমাকে ফ্লাট থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য অনুশোচনায় আকুল হয়ে উঠেছে পরমেশ্বরার বুক। সুষমাকে রক্ষা করতে ফিরিয়ে আনতে পারেন, কিন্তু ওর চাহিদা মতো টাকা কোথা থেকে দেবেন? সুষমা যদি কোনো নতুন পুরুষের সন্ধান পায়, তাতে বাধা দেবার অধিকারও হারিয়েছেন পরমেশ্বরা।

সুষমা আবার কোথায় চলে গেছে, এ সংবাদ ওনেই পরমেশ্বরা যেন ভয়ঙ্কিতাহত হয়েছেন। যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে দাঁড়াল। ও কী পুলিনবাবুর কাছে পাওয়া টাকার লোভে! সুষমার ওধু টাকা চাই, মন বলে কিছু নেই। বৃদ্ধা মা বলেছেন, তোমার কাছ থেকে চলে এসে দিন দুই খুব অন্যায় করেছিল। ভাতারঘুম ভুলে গিয়েছিল। পরশুদিন রাতে চলে গেল। একটাই দেখা। কোথায় গেছে, আমি জানি না। জিজ্ঞেস করতেই বলল, জেনে কী করবে? বিয়েই সুখ পাবে। যে জীবন আমাকে দেছে নিতে চেয়েছে মৃত্যু ছাড়া তার হাত থেকে আমার রেহাই নেই। আমি ঠিক সময়ে এসে তোমাকে টাকা দিয়ে যাব। বৃদ্ধা মা কাঁদছেন, আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাকে যেন যে ভগবান বাঁচিয়ে রেখেছেন।

আমি ভোগার মনেরও অবস্থা।

সন্ধ্যা

ভেবেছিলাম তৃতীয়বার হাদয়ঙ্গমে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবেন। দ্বিতীয় মৃত্যু সামলে পেয়ে সদীপের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ভেবেছিল সদীপকে জানাবে, এতদিনে তাদের ভোজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন কাঁদছে কেন? তুমি তো চাকরি পেয়ে যাবে। আমাকে বিয়ে করে সুখের সংসার পাতবে। যার মনে এত সুখের জীবন, তার চোখে জল মানায় না।

কান্না থামাতে পারেনি রিমি। এই সময়ে পুরনো প্রসঙ্গের অবতারণা করা অবিবেচনা হয়েছে। সদীপকে আরও কতদিন ভুল বোঝাবুঝির পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

একেই তো জীবন অবশ্যে জটিলতার ভরা, তার মধ্যে আজকে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই মেয়েটিকে দেখে তার মনোভাবের প্রতি বিদ্রূপাত্মক শব্দ নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি আরও অন্ধকারময় করে তুলতে পারস্পরিক কেবের মূলে আঘাতটাই হবে। সেখানে মুখ্যার ভূমিকাই বেশি।

সন্দীপ রিঙ্কাকে কাছে পেয়েই যেমন এক অসঙ্গতিপূর্ণ অনুভূতির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আছে। রিঙ্কা কি সেদিনের কথাগুলো উল্লেখ করে আঘাত করার জন্যই এখানে এসেছে? এখানে ও এসেছে প্রায় আধ ঘণ্টা আগে, এতক্ষণে একটিও কথা বলেনি কেন? সমবেদনা জানানোর তাগিদও কী ও ভুলে গেছে? আজ সন্দীপ স্বভাব নৃত্যের কাছে পরাজিত হতে পারছে, সেদিনের ভাবনার মধ্যে শুধু হতাশার প্রকাশ ছিল। সাফল্য না পেলে রিঙ্কা অবশ্যই ফিরবে, অন্য কোনো পুরুষ এসে রিঙ্কাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে—এই ভাবনাগুলো উত্তাক করে তুলেছিল সন্দীপকে। রিঙ্কা বলল, তুমি পরমেশদাকে মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছ?

এই মুহূর্তে পরমেশদার কথা কেন মনে এলো রিঙ্কার? ওনাকে খবর দিতে হবে কেন? সন্দীপের দৃষ্টিতে প্রশ্ন ছড়ালো। রিঙ্কা সন্দীপের নিরাসক্তির মনের সন্ধান পেয়ে বলল, পরমেশদা এখন নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন। দল থেকে অপসৃত হবার পর কাছের মানুষগুলোও অনেক দূরে সরে গেছে। তুমি যদি ওনাকে খবর দিতে, উনি ছুটতে পারতেন, তুমি এখনও শ্রদ্ধা করো।

রিঙ্কা কেন পরমেশদাকে নিয়ে আলোচনা করতে চাইছে? তবে কি ওনার জন্য রিঙ্কার মনে সহানুভূতির ঢেউ জেগে উঠেছে? আজকের এই পরিবেশে এমন আলোচনা অত্যন্ত অশোভন। একজন ঘৃণ্য, চরিত্রহীন রাজনৈতিক নেতাকে মর্যাদা দেওয়া রিঙ্কার পক্ষে শোভা পায় না। তবে কি পরমেশদা জহরবাবুর বিরোধিতা করতে পুলিনবাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, সেই কারণেই রিঙ্কা পরমেশদাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে? সন্দীপ বিস্ময় হয়ে উঠতেই রিঙ্কা অত্যন্ত গাঁভীরতার সঙ্গে বলল, তুমি এবার তাহলে বুঝতে পারছ, সেদিন তুমি যখন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে আমাকে যে অনুরোধ করেছিলে, সেদিন আমার মনে কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। পরমেশদার মতো মানুষগুলোকে ভুল বোঝার আগেই নিজেকে প্রতারণা করা। আসলে এত মূল্য দিয়ে যদি আমাদের মানবিকতা বোধের গুরুত্ব বুঝতে হয়, তবে সংসারে নৈতিক চেতনার উপস্থিতি ক্রমশ হয়ে আসে।

রিঙ্কার বিরোধিতা করতে চাইলো না সন্দীপ। সে সামর্থ্যও ছিল না। মিনতি ঘরে এলেন অশ্রুসজল চোখে। রিঙ্কা পাশে বসতেই সমবেদনা জানাতে না পেরে মিনতির দিকে তাকালো প্রশ্রয়ের অনুভূতি নিয়ে। রিঙ্কার পাশে বসতেই রিঙ্কা মিনতিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বোঝাতে চাইলো মৃত-পথযাত্রী মানুষকে তাড়াহুড়া দিয়ে ধরে রাখা যায় না। যার যাবার, তাদের জন্যই হয়ত তবিতে যাবা প্রয়োজন আত্মিকতার অনুভূতিতে। মৃতের মানুষের জন্য শোক প্রকাশ নিশ্চয় করে যেয়। মিনতি কাতরে, তুমি কেন আরেকদিন পরে এলে। উনি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। সন্দীপকে বলেছিলাম, তোমাকে খবর দিতে। ও বোধহয় তোমার কাছে যায়নি।

রিঙ্কা অনায়াসেই অভিযুক্ত করতে পারতো সন্দীপকে। কিন্তু সন্দীপের অভিমান নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই রিঙ্কার। আর এই অভিমানই জীবনকে নতুন করে দেখতে শেখায়। রিঙ্কা বলল, সন্দীপ বাড়িতে থেলেও আমার দেখা পেত না। আমি চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম বাঁকুড়াতে। ওখানকার একটা স্কুলে শিক্ষিকার—

সে কী। তুমি আমাদের ছেড়ে অত দূরে চলে যাবে?

এখানে কে আমাকে চাকরি দেবে বলুন? তাছাড়া, আমি কারোর কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করতে চাই না। যোগ্যতার ভিত্তির ওপর কেউ যদি আমাকে চাকরি দেয়, তাতেই আমি খুশি।

সন্দীপ শুধু দূরত্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রিঙ্কার দিকে। তার মধ্যে অভিমান নয়, ধনাত্মার মনের কারণ দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে রয়েছে। রিঙ্কা যদি দূরে চলে যেতে চায়, তাকে কিভাবে বাধা দেবে? সেই যোগ্যতা এখনও আয়ত্ত করতে পারেনি সন্দীপ। নিজেকে বিকার দিয়েও অন্যান্যদের আসন নেওয়াতে সে পারে না। রিঙ্কা ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে। তার মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই, আবেগের তাড়না নেই, জীবনকে এত গভীরভাবে দেখতে শিখেছে, সন্দীপ সেখানে জল ঘোলাতে গিয়ে ব্যবহার ব্যর্থ হয়েছে।

রিঙ্কা হাসল, সন্দীপকে ভিজিয়ে করলো, আমি যদি ওখানে চাকরি পাই, তুমি খুশি হবে তো।

আমাকে খুশি করতে কি তুমি চাকরি করতে চাইছ?

আমি তোমাকে খুশি করার জন্য কিছু বলি না। আমি কিছু করলে আমার নিজেরই যদি খুশি হয়, আমি আনন্দিত হই।

আমি খুশি হবার কিছু। আমি তোমাকে আনন্দ দিতে পারছি না।

আমি জানতাম তুমি এই কথাই বলবে। আমরা তুমি আমোদ কারা থেকে বড় বেশি পাওয়ার আশা করো। নিজের ভূমিকা পালন না করেই।

মিনতিও রিঙ্কাকে সমর্থন করলেন। সন্দীপের ভবিষ্যতকে এখনও ঘিরে রয়েছে এক চরম অনিশ্চয়তার কুয়াশা, এই অবস্থায় কেউ কি পারে ওর সঙ্গে জীবন জড়াতে।

রিঙ্কাকে আরো ধরে রাখার কোন প্রয়োজন শুধু একটা চাকরির। সন্দীপ আশা করেছিল আজকের অফিসে চাকরি হয়ে যাবে। এই জন্যই এতদিন অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে অপেক্ষা করেছে মৃত্যু কামনা করেছিল।

আরও তিন বছর চাকরি করতে পারবেন রেবতীবাবু। এক সময়ে উনি পার্টির অত্যন্ত দক্ষিণ-পন্থার নেতার বক্তব্যও ভেবেছিলেন। কিন্তু নিতে পারেননি সন্দীপের বক্তব্য ভেবে। চরমবিরোধী অবস্থায় আসা থেকে ছেলেটা হয়ত চাকরি পাবে। জীবনের শেষ পর্বে এসে অবশ্য এই ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তিত নীতির জন্যই। সন্দীপকেও জানিয়েছিলেন।

সন্দীপের চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেপার পাঠিয়ে দিয়েছেন কোম্পানীর পার্সোনেল ম্যানেজার। দুঃখ প্রকাশ করতেও তিনি ভোলেননি। তবে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন, সে সম্পর্কে আলোচনাপাতে তবে তিনি পার্টিয়েছেন কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের কাছে। তিনি লিখেছেন, রেবতীবাবুর পরিবারের প্রতি তিনি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। কিন্তু কেন্দ্রীয় আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ পাঠিয়েছেন সবরকম নতুন নিয়োগ বন্ধ করে দিতে। বর্তমানে অনেক অতিরিক্ত কর্মচারী রয়েছে, তাদের জন্য যথেচ্ছানুদান অবসরগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই অবস্থায় রেবতীবাবুর ছেলেকে নিয়োগ করার কোনো আমার নেই, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন

চিঠিটা সন্দীপের হাতে দিয়ে নেতা বললেন, পড়ে দেখো।

পড়ে দেখার ইচ্ছে হলো না সন্দীপের। এই সব যুক্তি আর অজুহাতের সাফাই ভরা চিঠি পড়ে তো কোনো সান্ত্বনা পাওয়া যাবে না। রিঙ্কাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিল তা ভেঙে যাওয়ার মধ্যে যে নির্মম খেলা হয়েছে, তাকে তো ভোলা যাবে না। এর উদ্দেশ্যবিহীন পথে বিবাগী পথিকের মতো ঘুরে বেড়াতে শুরু করবে। এভাবে হারিয়ে ফেলতে চাননি সন্দীপ।

রিঙ্কাকে এই মুহূর্তের সংবাদ শোনাতে চায় না সন্দীপ। ও চাকরি পেয়ে চলে যাক সেই সুদূর বাঁকুড়াতে। দূরত্ব বাড়লে যদি ওকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে পাবে সন্দীপ। ওকে ঘিরে আশার জন্য কোনোদিন অনুরোধ জানাবে না। এভাবে একদিন দেখা হবার দুঃখেগুই চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে।

বড়িতে বিশ্রামেও ইচ্ছে করছে না। বুক পকেটে চাকরির জন্য প্রত্যাখ্যান আবেদনপত্র মাঝে মাঝেই বিদ্রূপ করে উঠছে। ওকে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিল আকাশে। উদ্ভ্রান্ত কেন্দ্রুবে পিওনের হাতের ঘুরে আসার নিল কাগজের টুকরোগুলো সন্দীপের ব্যর্থ স্বপ্নের মতো।

সেদিন যেখানে রিঙ্কাকে নিয়ে বসেছিল, সেখানে ঠিক সেই গাছের নীচে এসে দাঁড়ালো সন্দীপ। সেদিনের স্মৃতি ছড়ানো রয়েছে সবুজ ঘাসে ঘাসে, তার শেষ ছাপ পেতে চায় সন্দীপ।

দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নাটাই ঘুরে, ঘাসের গায়ে পাতায়। আজ আকাশে চিল ওঠেনি। অন্ধকারে নদীর জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে সন্দীপ যেন ওনতে পেল অনেক অনেক আগে আসার জন্য। সেই ডাক আজকে করে ফেললো সন্দীপকে। এক মায়াবী মায়া ওর মন জুড়ে। এই জগৎ-সংসারের নিয়ন্ত্রণে ওর কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে। রিঙ্কা—কারোর কথা মনে নেই। এখন শুধু আকাশের তারা অনিমেষ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে ওর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

জলের কাছে এগিয়ে গেল সন্দীপ। কুলকুল্ করে যাওয়া নদীর বুক এখন সন্দীপের কাছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের শয্যা। সেখানে অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই এই তিন সময় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রিঙ্কার জন্য আর প্রতীক্ষা অতিক্রম পুড়তে হবে না।

সন্দীপের দেখে অনেক ঘুম নেমে আসতে চাইছে। চির শান্তির আশ্রয়ে ওকে বুকে টেনে নিতে ছুটে আসছে।

মধ্যরাতের সঙ্গীত শুনতে ও বসেনি। এ তো সঙ্গীত নয়, আহ্বান। সন্দীপ সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে আরও এগিয়ে গেল অন্ধকারের অতলান্তে জড়ানো রহস্যময় পথে

একদা একরাতে

[থর্নটন-ওয়াইল্ডার রচিত বর্ষী ছোট গল্পের (ONCE UPON A NIGHT) অনুবাদ]

সমুদ্র ঘোষ

মাই মানুষের বর্ষি। অনেকটা টাল বয়সের বৃদ্ধাদের ওপর কাপড়টি ফেলে দিয়েছে। হবরকমের ওপর একটা অপরাধী ভাবভঙ্গি। পাশ পাশা সর্বাঙ্গসুন্দর বর্ষির মধ্যে ঢুকিয়ে। পশ্চিম দিকে একটা ঢুঁইলাস্ত বৈঠকের মতো মানুষের ভঙ্গিতে বসিয়ে আছে। পাশের বেই-হাউসের ভেতি খোলানো ছুতোর বা কাঠের অবশিষ্টের মতো সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেছে। এ ঘরে অনুত কাজের যে মানুষ যেখানে আসছে সব পাশ সেখানে আছ মনোরম পরিষ্কার ও সৌন্দর্যে।

কিন্তু মা-তিন-মে-র কাছে বৃদ্ধাটি আগেই মানুষের নয়। চক্ষুসম্পর্কিত বর্ণবিশেষ সম্পর্কেও সে সচেতন নয়। নিজস্ব পোকস্থানের ভয়ানক পরিবেশেও আজ তার মনে কোন ভয়-ভয় নেই। সমস্তের পাশ মাস্টারীর পিস্তলই তার বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ হয়ে আছে। সে শুধু ভাবছে এই মিস্টই সর্বশ্রেষ্ঠ বয়েছে তার জীবনের পথম অপরাধ।

কিছুক্ষণ হ'ল মা-তিন-মে ফিরে এসেছে এই ভুবনের নিষ্ঠুর রহস্যে অন্ত সে নিরাসক্ত, একা। এতক্ষণ তার ছোট্ট সন্তানটি ছিল একটা দু' চক্কা-ওলালা হুন্ডা গাড়ির মতো। আজ সেই গাড়ির একটা চক্কা গেছে ভেঙে। গাড়িটাকে আজ সে আর একা চালাতে পারছে না। তবু চলছে। সেই ভয়েই তাকে তাড়া হচ্ছে দ্রুত বর্ষি। মা-তি ইন্ড-এর ওপর মনে তার আজ যে শুধু রাগতে এসেছে মানুষটা ছিল খুব ভালো, তাকে খুব ভালোবাসত। মনে বহিল বছর বয়সে সে মারা গেছে। মা-তিন-মে-র বয়স তখন সাতাশ। আজ সেই সব কথা মনে করে সে শুধু কাঁদতে এসেছে।

মা-তিন-মে সঙ্গে যে কৌতুকটি এনেছিল তার ঝোলা থেকে সবার সে একটা খুব বর্ষি দৃষ্টি বার করল, ঝরবের ওপরে মেলিয়ে বিছিয়ে দিল। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে তার স্বামী সেই দৃষ্টি পরে দাঁড়িয়ে আছে। মা-তিন-মে মনে মনে কল্পনাটা ঝরঝরে করল। মনটা একটু শান্ত হ'ল। তারপর বৈঠকা থেকে আর একটা বৃদ্ধি বার করল। তখন তার মনের সামনে মার-ডি-তিনের পাশে ছবি। (মাথায় বাঁধার রাপড়)। এবং মাইকেলের সবশেষ অপারেশন-পরা মূর্তিটা উজ্জ্বল হয়ে ফেটে উঠল। সে যেন তার বর্ষি ওনতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে তার কর্তিত চলার ভঙ্গি।

বর্ষি দুটিকে একে একে বৈঠকা থেকে বার বার করে সে ঝরবের ওপরে বিছিয়ে যেতে লাগল। এরপর ধরিত্রী মাস্টারী বার করে ঝরবের ওপরে রাখল। তার মনে হচ্ছিল তার ছেলে ধরিত্রী হয়ে, আর এইভাবে তার মুখের সামনে। তারপর সে শুধু পাশে দুটোতে ঝরবটাকে ওটিয়ে বাঁধে টাকেপ করে ঠেলে উঠল।

মা-তিন-মে-র মনে পড়ল তাদের বিয়ের দিনটার কথা। কি ভয়ঙ্কর করেই না সে তার দুইপাশে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। সেই অনুভবের রোমাঞ্চ আজও যেন তেমনি লেগে আছে, সে যেন অনুভব করতে পারছে। তার ধরিত্রী তখন ভাবলেই তার মনে হত সে ছিল এরকমই যেমনটি ধরিত্রী, আদরের বড়ো ভাই এবং অনেক এক শিক্ষা গুরু। আট বছর ধরে তারা কি সুখেই না কাটিয়েছে। এই কথা মনে হতেই অবশ্য তার বুক ঠেলে কান্না এল। মনে হ'ল সে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন।

পোকস্থানের পশ্চিম কোণে পাশ মানুষ তৈরির ঘর। তার ছাউনি টিন শুধু অর্ধেকটা আছে। তার নীচে বসে বেয়েরেরা তার (হুন) খেয়াই। মা-তিন ছিল তেমনি এক খেয়ুড়ে। পেশায় সে ঘুড়-মাস্টার, ঝইপড়া আর তার খেয়াই তার পেশা। সেদিন সে কোনও উঁচুতারের হেরে গেছে। মা তিন বিয়ে-থা করেনি বলেই তার ছেলে ছাওয়া নিয়ে বিশেষ কেউ খুব একটা মা বরবনি। এদিকে সে তার গাবের অ্যাকেটে এবং আটি বর্ষি ধরে বসেছে। যাবও পরের টাকা বকেয়া। কোথায় গেলে এই টাকা পাবে, কার কাছে গেলেই বা ধার পাওয়া যাবে, এইসব ভাবতে ভাবতে সে প্রসেই দিকে যাবে ঠিক করল। ওদিকে রাতও অনেক হ'ল। ভাবতে ভাবতে সে উঠতে লাগল এবং ঝরবখানার কাছে এসে পড়ল। পোকস্থানের শেষ দিকেই গ্রামের দিকে যাওয়ার একটা পাকদণ্ডীর পথ চলে গেছে। এই পথ ধরে সে রওনা দিয়েছে। তার কাছে এটা নিশ্চিত পেকস্থান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু অন্যান্যটা আজ যে বড়ই সুন্দর লাগে! মনোরম পরিবেশটাকে উপভোগ করার জন্যই সে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। তার যে টাকার দরকার সে-কথাটা ভুলেই গেল।

হঠাৎ পোকস্থান থেকে একটা আওয়াজ তার কানে এল। প্রথমে ভাবলো বোধ হয় ভূত। কিন্তু ভূত-প্রেতে তার বিশ্বাস ছিল না। কানখাড়া করে ওনে বুঝতে পারলো এটা মানুষেরই গলা। একি কোন জীবন্ত মানুষকে জোর করে কবরস্থ করার কান্না না মৃতের পোকসম্বন্ধীয় আত্মীয়-পরিজনের। মিনিট খানেক সে আরও কাছে এসে দাঁড়াল। ওনতে পেল একটি যুবতী মেয়ের কুলোনো কান্না, দু' ধরিত্রী উদ্দেশে সে তার ভাবিষ্য জিনিষ জানাচ্ছে, 'ওগো ফিরে এসো, আমাকেও তোমার কাছে নিয়ে যাও। কেন, কেন আমাকে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে ফেলে রেখে গেলে!

মা-তিন এবার বুঝতে পারল মেয়েটা কে। সে জোরে উঠল, ও মা-তিন-মে, মা-তিন-মে, শান্ত হও।

—ধরি হারিয়ে কি করে শান্ত হবো। যাও, যাও, তোমরা-যা, তুমি যাও যাও।

—বাছা, তুমি তোমার ধরির জন্যে যদি শোক করতে চাও তবে মিলনস্থানে কান্নার সঙ্গে এসো, সেখানে বাধা পাবে না। এই মাঝরাতে এক একেছে বলেই বাধা পাচ্ছো। এই বলে মা-তিন তার মুখের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো, দেখতে পেল তাঁদের আলোয় তার চোখের জল চিক চিক করছে। বাচ্চাটা তার পেল চোখদুটিতে মনে হ'ল যেন ছোট পুকুর যার চোখের পাতায় রানবাজি যেন পুকুর পাড়ের সারি সারি নারকেল গাছের পাতা।

—দিনের আলো যেটা সবচে আমি দেখতে পারবোনা। তুমি তো জানো আমরা দু'জনে দু'জনকে

কত ভালোবাসতাম!' এই ব'লে আবার সে কান্না জুড়ে দিল। মা-দিন কোনদিন ভাবতে পারেনি যে মানুষকে দেখে এত কান্না থাকতে পারে!

—হাঁ, মা-তিন-মে, আমি সব জানি, তোমাদের দু'জনকে কত ভালোবাসতে, একজন চলে গেছে। তাইতে তোমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, তাই না? কিন্তু কাঁদলেই যদি সান্-লি-উন্‌ত-কে পাওয়া যেত তা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদতাম। কিন্তু বুঝতে পারছ তো, কেঁদে কোন লাভ নেই।

—কিন্তু আমি যে তার জন্য না কেঁদে থাকতে পারছি না, মা-দিন।

—আচ্ছা, শোন, তুমি তোমার স্বামীর খাবার আও কেন মা-তিন-মে? কেঁদে থাকবে বলেই তো। তাই না!

—হাঁ

—মা-তিন-মে, তুমি দুঃখী আর তুমি কিনা দুঃখকষ্টে কান্না কাঁদছ, ওমুই মিহিমিহি! আর কোনই মানে নেই। শোন, তোমার স্বামীর বেঁচে ওঠার কোনই আশা নেই। জানোই, এই অর্থহীন কান্নার কি লাভ, বল!

—কিন্তু আমি যদি না কাঁদি লোকে বলবে কি! তারা ভাববে যে মেয়েটা স্বামীর প্রতি অনুগত নয়।'

মা-দিন বলল, 'অবশ্যই তুমি তাকে ভালোবাসবে এবং তার প্রতি অনুগত থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু এখন সে বেঁচে নেই সেহেতু কি ক'রে তুমি তাকে ভালোবাসতে পারবে? ধরো, তুমি আমার কাঁধে একটা কমাল রাখতে চাও।—'

মা-তিন-মে তার ওড়না খানিক কাঁধের দিকে তুলল।

—কিন্তু যদি কোন কাঁধই না থাকে তবে তোমার রুমাল রাখবে? কিংবা ধরো, তুমি টেবিলে একটা ঘড়ি রাখতে চাও। যদি কোন টেবিলই না থাকে তবে তোমার ঘড়ি রাখবে ঘড়ি? এটা তখন পড়ে গিয়ে ভেঙে যাবে। আমি তুমি কাউকে ভালোবাসতে চাও, তার প্রতি অনুগত থাকতে চাও কিন্তু সে যদি বেঁচেই না থাকে তবে কাকে তুমি তোমার ভালোবাসা জানাবে? তার প্রতি তোমার অনুগত্য ও বিশ্বস্ততা দেখাবে? সান-লি-উন্‌ত যখন বেঁচেছিল তখন তুমি তাকে ভালোবাসতে, তার প্রতি অনুগত ছিলে, একথা সত্যি। কিন্তু এখন তো সে নেই, কাজেই কেন তুমি শোকের সমুদ্রোচ্ছ্বাসকে ভয় করবে! লোকে বলে নিন্দা-গুজনা সে তো হস্তান্তরেরই কাপড়! এই কথা বলে সে হাসি মুখে মা-তিন-মে-র মুখের দিকে তাকালো।

—কিন্তু, আমি যদি কাঁদি তবেই তো পরলোক থেকে সান-লি-উন্‌ত আমার কথা শুনতে পাবে, বুঝতে পারবে আমি এখনও তার অনুগত স্ত্রী, এখনও আমি তাকেই ভালোবাসি। এখনও আমি তাকেই ভালোবাসি। এই কথা বলে সে মা-দিনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটা এড়াতে চাইল।

—শোন। আমি ৫৫০ টি জাতক কাহিনী থেকে একটি গল্প তোমাকে শোনাতে চাই। শুনতে চাও কি? বলবে কি!

—হাঁ, বলো, এতে যদি আমার দুঃখ দূর হয় তবে তোমার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ থাকবে।

—শোন, একসময়ে বারানসী থেকে এক রাজা ছিলেন, তিনি তাঁর রানীকে খুবই ভালোবাসতেন। রানী ছিলেন খুবই সুন্দরী। একদিন সেই রানী মারা গেলেন। রাজা তো খুবই শোকে পড়লেন। তিনি ভাবলেন কি, না, রানীর মৃতদেহ মাটিতে সমাধিস্থ করে একটা বাঁচের বাক্সে রেখে দিলেন যাতে প্রত্যেকদিন তাকে দেখতে পান। তিনি তাঁর এক সোনার প্রতিমূর্তিও তৈরি করালেন। একদিন রাজপুরীতে এক মুনি এলেন। তিনি বললেন মৃত পত্নীর জন্য এত শোক করা অনুচিত। রাজা তাও শুনলেন না।

একদিন মুনি বললেন, শুনতে চাও তোমার রানীর কি হয়েছে? রাজা শুনতে রাজি হলেন। তখন মুনি তাকে ছয় রকমের উত্তরণ নিয়ে এলেন এবং মৃত রানীকে ডেকে আনলেন। রাজা দেখলেন রানী তখন আর জীবন পেয়ে একটা শূন্য গহ্বরে শোকার পরিণত হয়েছে। সেই শূন্য শোকাটা উড়ে এল তার পিছন পিছন একটা পুরুষ শোকাও ছুটে এল। মুনি শূন্য শোকাকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পেছন পেছন যে ছুটে এল, সে কে! রানী (শূন্য শোকাটা) জানাল, 'সে আমার পরম প্রেমের স্বামী।'

সব শুনে মা-তিন-মে সজোরে হেসে উঠল। মা-দিন বলতে লাগলো, 'এরপর শূন্য শোকাকাকে মুনি জিজ্ঞাসা করলেন, পূর্বজন্মে তুমি কি ছিলে? জবাবে সে জানালো পর জন্মে সে রানী ছিল। এবার মুনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কাকে বেশি ভালোবাসা? পূরুষ শোকাটাকে, না তোমার পূর্বজন্মের স্বামীকে? সে জানাল যে পূরুষ শোকাটাকেই সে বেশি ভালোবাসে এবং অবোধ্যের ছেলে রাজার চেয়ে সে তার শুকরে স্বামীকেই আরও বেশি ভালোবাসে।

এই কথা শুনে রাজা এত জোরে হেসেন যে সেইসঙ্গেই তিনি রানীর মৃতদেহ ও কাঁচের বাক্সটা ভেঙে ফেললেন।

—বুঝলেই, মা-তিন-মে, দেখতে পাচ্ছ যে মানুষ মরে গেলে যে যিয়জনের পেছে থাকে তারাই নিয়ম হয়ে পড়ে এবং তারাই মৃতজনকে ভিয়ে পেতে চায়। মৃতেরা কিন্তু চায় না কারোই, সেই থেকে যে কেঁদে যাচ্ছ, এতে কোন লাভ আছে কি! কেমন তোমাকে একটা চমৎকার গল্প শোনালাম, যাব কোন্দা।

তখন মেয়েরা আবার ওক করেছে, শেষরাতের নিস্তব্ধতাকে উতুরে হাওয়া ঘাঁটতে ওক করেছে। মা-দিন যখন এইসব ব'লে কবরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে তখন মা-তিন-মে নিস্তব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চোখ তুলে তাকালো। সে দেখলো একটা শান্ত সুন্দর মহীয়ান মুখ। সে মুখ এক পুরুষের। মা-তিন-মে তার দিকে নির্নিমেষ কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, চোখ ফেরাতে পারল না। একটা অস্বস্তি ও অন্য কোনো ভাবনা তার বুকের মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল। কিন্তু সে জানতো, এই সময়ে এই ধরনের ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে একটা বিশ্রী শব্দ শোনা গেল। মা-তিন-মে প্রচণ্ড জোরে কেঁদে উঠল এবং উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মা-দিনকে জড়িয়ে ধরল। মা-দিনও তাকে বুকের মধ্যে আগলে রইল এবং শান্ত করতে চাইল। একটা কালোমূর্তি এগিয়ে আসছে দেখা গেল।

—ওই তাকাও, কালো মতন কি একটা এদিকে আসছে।

এবার মা-দিন তাকে আরও জোরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। মা-তিন-মে তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ভয়ে আরও জোরে কেঁদে উঠল।

কিন্তু অন্ধকারে চোখ করে দেখা গেল ওটা একটা ষাঁড়।

—'ভয় নেই, আমি আছি।' এই বলে মা-দিন আরও জোরে তাকে বুকের ওপর চেপে ধরলো। তার জীবনে এ এক সুখকরতম সুখের মুহূর্ত। মা-তিন-মে-র মনে তখন মৃত স্বামীর বলিষ্ঠ আলিঙ্গনের স্মৃতিসমূহ ভেসে বেড়াতে লাগলো।

—ওটা কি এখনও আছে, না চলে গেছে মা-দিন?

—হাঁ, ওই দেখ চলে যাচ্ছে।

—ও, তাইতো, সত্যিই তো। এত জোরে আর আমাকে চেপে ধ'রো না, এখন সত্যিই আর ভয় নেই আমার। ছেড়ে যাও।

—হাঁ, ছেড়ে দিতে পারি, যদি একটা কথা দাও।

—কি কথা?

—কথা দাও যে তুমি তোমার স্বামীর জন্য আর কাঁদবে না। আমার মনেহয় মনে হয় আমাকে স্বী নিয়ে পরলোকে সে বেশ সুখেই আছে। আর এখানে কিন্তু আর বিধবা স্ত্রী মা-তিন-মে তারই জন্য কেঁদে কেঁদে চুল পাকিয়েছে। এই বলে মা-দিন একহাতে তার চোখের জল মুছিয়ে দিল, অন্য হাতে তখনও তাকে জড়িয়ে ধরে আছে।

—ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি। একবার হ্যাঙো আমি যাই।

—উঁহু আর একটা কথা দিতে হবে। কবরে হেতকরবার ওই পচা-গলা মেয়েটার কথা মুছে ফেলে হবে, তার বদলে আমার এই রাজা-রাণার মেয়েটার কথা এখন থেকে ভাবতে হবে। তুমি কথা দিচ্ছ তো?

—ওসো না, একলো সময় নয়নি। তুমি বড় তাড়াহুড়ো করছ।

—কি? এখনো তুমি তাকাচ্ছ লোকে কি বলবে আমি তো আগেই বলেছি নিন্দা-গুজনা হস্তান্তরেরই কাপড়। অন্যেরা কি ভাবছে না ভাবছে যদি সেই ভেবেই চল, তবে কোনদিনও তুমি সুখী হবে না। সত্যি যদি আমাকে ভালোবাসো তবে কথা দাও।'

—আচ্ছা, বিনায়ে। এবার আমার যেতে দাও লোকে দেখে ফেলবে।

—কি। এই শেষরাতে! মৃতের পাড়ায়! না কখনোই না, প্রতিজ্ঞা করো। কথা দিলে তো!

—হাঁ, কথা দিচ্ছি। তোমাকে ভালোবাসলে। তা এই ভর দুপুরে তুমি এসে জোটেছো।

—সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাদের আড্ডা থেকে ফিরছিলাম।

আমি আমার আটো আর জ্যাকেট বাজি রেখেই তাসখেলা আর মদ খেয়ে নেওয়া—দু'জনের মধ্যে আমি বউটাকে জেতে নিতে চাই। তাসখেলা আমি ছেড়েই দেব

—ছেড়ে দেবে তো? কথা দাও, কথা দাও যে আর ছুঁয়ে ফেলবে না। এই নাও আংটি, আর দুটিগুলো সব নিয়ে এসো। চল, এবার আগুয়ান যাব।

সেই কবরস্থান থেকে মা-দিন আর মা-তিন-মে পরস্পরকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে রাস্তার দিকে রওনা হ'ল।

চাঁদ তখনও পশ্চিমে হেলে পড়েনি। আজ রাতে যা যা ঘটল একমাত্র সে-ই তার সাক্ষী হয়ে রইল

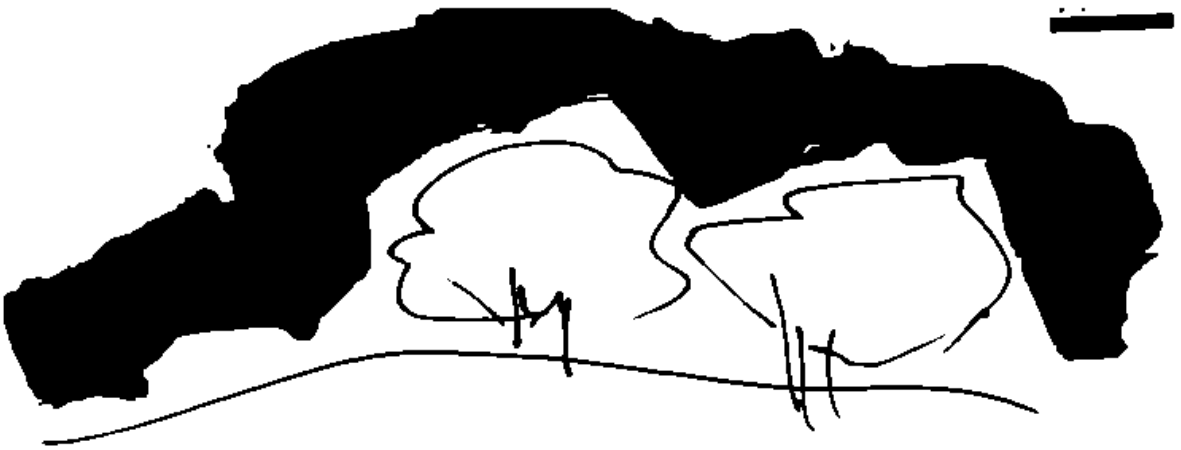

গভীর আঁধারে

অমল চট্টোপাধ্যায়

এবার ট্রেন ছিল ঘণ্টা তিন লেট। যাই একই ট্রাকিটে পাটির সদস্য হয়েও ওদের ঠিক সেরেটি ছিল মনে পড়ে না। তাদের সোহরকলে আরও এক বার কাটোয়ার হবুও মনে করতে পারছি না। ট্রেন যা হোটেলে একই কোচে ছ একই ঘরে আমরা কেউ উঠিনি সোজাও একটা কারণ হতে পারে।

'কৃষ্ণ শেলটার' ট্রাকিটে কোম্পানির চত্বরাবাসে আমরা সবাই ৩জনেই ও কলকাতা সদরে বেরিয়ে পড়েছি। হাওড়া থেকে আনেকবার এক্সপ্রেসে রাত সাড়ে আটটায় বর্ধমানে সদর কর্তার ছেড়েছে। এই সময়টুকু ট্রাফিকদের নির্দিষ্ট কর্মসূচির পার্টির দোষেরা ছোট ছোট অঞ্চলের নিম্নোদের মধ্যে পরিচিত হতে শুরু হল। তখন গোপ বড় মাঝারি স্টেশন মাত্র। যাত্রীরা স্টেশন থেকেও কেউ কেউ উঠেছেন। আমাদের কোচটিতে 'কৃষ্ণ শেলটার' ছাড়াও মাইলের বেশ কিছু যাত্রী ছিল। তাদের নিয়ে বিশ্ব আমরা চলেছি নোতুন নোতুন বেশ সেবকের সন্ধান সার্থক করতে।

পূর্বে তিন বার কাটোয়া ট্রেন থেকে আমরা প্রথম নামলাম গোবরহাটে। ভেড় না করে আমরা ঘাটে মোপ গোবরহাটে নামতে পারি কোনো স্টেশনারাজে আমাদের হোচলাটিকে অন্য গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। স্টেশনের বাইরে একটা ফোরস্টার হোটেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। কখনও হোরের অপেক্ষা করেনি। একটানা তিনদিন ট্রেন জার্নির ক্লান্তি দূর করতে সান। সবাইকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়। কিন্তু বেশির নিতে আমরা বাড়ে পিঠে ঘুরে আসি।

এখন থেকে শুরু হবে পরীক্ষার পালা। কাছে ডাইনিং হলে মালপত্রের জন্য আসিয়ে নিয়ে খোল ছটায় আমাদের গাড়ি ছাড়বে। পাঁচটার মধ্যে ঘরে ঘরে কোটি ছেড়ে সবাই যেন তৈরি হয়ে থাকি। পাঁচটার মধ্যেই আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। ছাও সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে। ঠিক ছটায় বাসের বাছে এসে গেছি সবাই নির্দিষ্ট করে দেওয়া চারটি বাসের একে সেটি ভেগেও হয়েছে। ব্যবস্থার বরাদ্দ করা হয়েছে গেট থেকে বৃত্তীয় সারিতে দাঁড়িয়ে একটা ভাবল সীট। জান দিকের দুজন ডক্টরও আসেন না। বর্ধমান ডাইনিংয়ের ঘুমেরাত আমরা বলে পারি। কিছুক্ষণ বাদে বাসে ড্রাইভারটি হর্ন-দিয়ে একটা এসে [illegible]। তার চেহারায় [illegible] আমাদের ভয় দিয়ে চলি দুটি বসে ওরা এসে আসছে [illegible] একই বেশ ছিলেন, সঙ্গে তাদের ভাইদের ছোট বাস ছাত্রদের [illegible] নিজেদের মধ্যে হাসি মাঝে মাঝে ওদের [illegible] ভাদের কারোর কারুর সঙ্গে মাঝে মাঝে একটি কথা বলে নেওয়া [illegible] সুবিধার জন্য ওরা ঘুরে পুরোটাই। আমরা সবাইকে চিনতে এবং [illegible] কলকাতা [illegible] কথা না হয় আমাদের [illegible] ও আমার মনে হয়েছে [illegible] মনে এবং মনে [illegible] আমাদের ভয়ঙ্করটির কথা যে তার মনে মনে [illegible] আমাদের বাইরে [illegible] বেলমাথ, পলাশ এবং [illegible] [illegible] ছবি পড়ি। [illegible] সবুজ ঝলমলে [illegible] এবং ছবি মনে হয়। [illegible] আমাদের বাস সবকিছু ছিনে ছুটে চলেছে। [illegible] মোহ ছড়িয়ে ছুটে [illegible] মোহনা মাঝ রাত [illegible] ছিনে ছবি [illegible] বলে। ছিন্না ওলে [illegible] [illegible] [illegible]

বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ আমরা সোমনাথে এসে পড়ি। মন্দিরের উপর ছায়া সূর্য ঝলমুর্তি ধারণ করে যেন অধিকর্ষণ করে চলেছে। ম্যানেজার ঋষুর কক্ষের আমরা নেমে পড়ি। তিনি সমুদ্রপারে সেই ঐতিহাসিক মন্দির দেখিয়ে দিতে আমরা সোহিনীকে তাকিয়ে থাকি। ট্রোটেকোরা ইতিহাসের পাতায় এই মন্দির আর তার সৃষ্টি হবার ফটল পড়ে তেতরে তেতরে পাথরে বাহুর মোচ করেছিল। ঐতা সময় নষ্ট না করে একটা মাঝ বিদে তার পূজোর জন্য সজ্জার নিয়ে মন্দিরের দিকে চলতে থাকে, আমিও তাকে অনুসরণ করি। সোমনাথ মন্দির উপর নীচে একটি অবস্থানে শিবলিঙ্গের পূজা হয়। ঐতা দু জায়গাতেই পূজা দেয়। অবশ্য একজায়ও শুনলাম যে আসল মন্দির যা সুলতান মাহমুদ আবা আর তার সৃষ্টি হয় তা এখন সমুদ্রের গর্ভীরে চলে গেছে। শ্রদ্ধিলাসের কেউই শিবলিঙ্গের পূজা দেওয়ার সুযোগ নষ্ট করেন না। বিলাসকে যেন দেখলাম এক সময় মন্দিরে ঢুকে নমস্কার করে বেরিয়ে আসতে। ঐতাই আবার সাগরের সমুদ্র তলরর্শিব নিরন্তর চঞ্চলতা। এই মন্দিরের পঞ্চাশ গজ দূরে সমুদ্র-গায়ে জনবাসো আরও একটি মন্দির চোখে পড়ল। সামনেই এক সুলাম পুরুষের মর্মর মূর্তি। ওইই জানলেন, জনশ্রুতো মন্দিরটি সোমনাথের নয়া মন্দির যার সামনের মর্মর মূর্তি হল ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভাস্কতের প্রকল্প বরাণ্ড মন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। প্রভত রেল উপেক্ষা করে আমরা ঐ নয়া মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম। কিশল চত্বরের উপর থেত পাথরের এই মন্দিরটির নির্মাণ কার্য আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছে। এমন জায়গায় উহার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে দেখলে মনে হবে যে আরব সাগর উহার পেছন দিক থেকে ঘুরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই মনোরম দৃশ্য চোখে ঘলে ফিরতে চায় না। এদিকে সবার ক্ষুধা পায়। প্রভাস তীর্থ আমাদের দুপুরে খাওয়ানর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমা পাথরানের দেওয়া অনেক দেখানে আগেই ভাবনা নিয়েছে। তাদ তাদ ক্ষণের ঘর্ম পড়াতে সন্ধ্যা ঘন হয়।

ফল খেয়ে বিছে জানদিকে তাকিয়ে দেখি বিলাস চুপচাপ বসে। এই বয়সে মন্টার ওর কাছাকাছি থাকতে থাকতে ওর এই ভাবখানা আমার কাছে একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। আমি জিজ্ঞেস করি,

—কেমন লাগল বিলাস বাবু? আমার কথায় সে উঠে প্রশ্ন করে,

—আপনি লাগবে জানলে আপনি কি এত খরচ করে এখানে আসতেন। একটু ভেবে নিয়ে আমি উত্তর দিই।

—ভাল, অবশ্য লাগার ব্যাপারে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে একমনার আকর্ষণ, ব্যতীত, মাটী করে ফেলেছে, যা আজকের উনে। আমার কথায় বিলাস একটু হাসলেন। মুখ ফুটে কিছু বলতে চাইলেন না। হাসি পাওয়ার মত কিছু মনে না পড়ায় অবাক হতে বলি,

—আমি কি এমন কিছু বলেছি, যার জবাব শুধু হাসিতেই দেওয়া চলে?

—সে কথার উত্তর পেলে আপনি হয়ত খুশি হতেন না। বিলাস বলেন।

—ব্যক্তি বিশেষে চিন্তা ও মতামতের ফারাক থাকতেই পারে। অবশ্যই অসোজন্য আটকে যেতে পারে না।

আমার কথার জের টেনে এবার বিলাস বলেন,

—সেদিন আলকাজ এ ওপরে আজমান কাল করে অনবরতই ভাল ও মন্দ কিছু না কিছু ঘটে চলেছে। কিন্তু ঘটনা যত ভাল ও খারাপই হোক না কেন তার পেছনে যত যত ভাল, মহত্তাজ, অহমাকারী শাসক ও বিদেশী হতো ও দূরদর্শনী না থাকলে সেগুলি ঐতিহাসিক আখ্যা পেয়ে মহিমান্বিত হয় না।

বিলাসের যুক্তি খণ্ডনের উড়িয়ে দেবার মত নয়। তার মতবাদকে খণ্ডন করে আমাকে যুক্তিগ্রাহ্য কিছু বলতে হয়। কিন্তু টপপ্ট সে সব গুছিয়ে বলাও আমার সম্ভব হচ্ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে ম্যানেজার ঋষু জানালেন আমার প্রস্তাবানুযায়ী এসে পৌঁছি। এবার নামতে হবে। অপরি একটু স্বস্তি পেয়ে বিলাসকে বললাম,

—তাহলে এসব নিয়ে পরে কোন এক সময়ে আলোচনা করা যাবে।

বিলাস হেসে বলেন-

—সেই ভাল।

বাস থেকে নেমে আবার আমরা আরব সাগরের দিকে এগিয়ে গেলাম। ম্যানেজার ঋষু আমাদের আগে আগে চলছিলেন। সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসা একটা

জন্মভূমির পাড়ে এসে তিনি আমাদের জানালেন এটাই হল প্রভাসতীর্থ। যদু বংশকে ধ্বংস করতে শ্রীকৃষ্ণ এখানে যে লক্ষ লক্ষ মহিলাদের তাঁর পরবর্তী জন্মে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। সূর্য তখন প্রায় মধ্যাকাশ বিস্তার করে মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পড়েছে। প্রভাসতীর্থের জল আমার সঙ্গী, পরে মাথায় ছিটিয়ে নিয়ে পুণ্যলাভের উৎসাহ হই। অনেকে অবশ্য তীর্থ জলে স্নান করতে নেমে পড়েন। এতবড় জীবনে ক'জনই বা আর যাব আসতে পারে। সুতরাং পুণ্যার্জনের এমন সুযোগ কেউ কি সহজে ছেড়ে দেয়। প্রবালের পাড়ে দাঁড়িয়ে বিলাস পুণ্যার্থীদের ভাও অবজ্ঞার দেখছিল।

বেলা কেশ গড়িয়ে গেছে। ম্যানেজার বাবুকে ঘিরে পেয়েছে বলেই তিনি জানালেন খাবার বেলি হয়ে গেছে, আমরা যেন দেরী না করি। তখনকার ওখানকার একটা ধর্মশালার আমাদের নিমন্ত্রিত আজ খাওয়াতে হবে। আমি ওই এলাকার অচল। আমরা কেন অযথা সময় আর নষ্ট না করে সেখানে গিয়ে হাজির। বিলাসও আমাদের সঙ্গে ছিল। গিয়ে দেখি বিশাল এক হলঘরের মেঝেতে কলার পাতা বিছানো হয়েছে, সব কিছুই সনাতন প্রথামত ব্যবস্থা। সময় নষ্ট না করে আমরা বসে পড়লাম। কিসের তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রিত আমাদের মুখে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছিল।

ঘরীয়ের সন্ধ্যার আহ্নিক পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা জেগেছিলাম। পাছতলায় বসে বিশ্রাম নিতে থাকি। ঘন্টা খানেকের মধ্যে সে পর্ব শেষ হতে আমরা বেরিয়ে পড়ি শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের স্থানটি দেখতে। প্রভাস থেকে সামান্য দূরে সেই জায়গা। তখনও রোদের প্রখরতা খুব একটা কমেনি, তবে জায়গাটা ছিল ছায়াবহুল। কৃষ্ণভাসে প্রবেশের অবস্থায় বিশ্রামরত শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পরমভক্ত নিরত জরা নামক ব্যাধের অবস্থানে ভাস্করের নিপুণ হাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সময়ের বয়স বেশি ছিল না, সামনে দুর মাঠে ঘন্টায় জার্সি ও টিশিনের পাট যাচ্ছে। গরমে বিভাসের গলা দিয়ে তখনও ঘাম ঝরছিল। তাই মাঝে মাঝে পানের ডিব্বা বের করে পানের সঙ্গে কড়াগুরি জর্দা মুখে দিচ্ছিলেন। আমি ওর দিকে তাকাতে একটু মুচকী হেসে তিনি বলেন, সন্ধ্যেটের দি আছে, একটা হলে ভাল হত আমি কৃষ্ণকে পাচ্ছি। যদিও হাসিমুখে বলি তবে লজ্জা ছাড়া। বিভাস অবশ্য সন্ধ্যা সম্বন্ধে যে কোন বিষয় নিয়ে চ্যালেঞ্জের ঢঙে জোর গলা বলছিলেন, আমার ক্ষেত্রে তার মনোভাব অনেকটা নরম দেখে অবাক লাগছিল। হয়ত তার মনে হয়েছিল আমি বয়সজ্যেষ্ঠ হলেও ব্রহ্মচারী। আমরা সভ্যানুসন্ধিৎসীরা জানি যে বিভাসের কাঠিন্যের আবরণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সাহসে তার ভেতরকার লালিত রহস্যের সন্ধানে তৎপর হয়ে তার সঙ্কেত সে পেয়েছিল। বিভাসের হাতে ছোট্ট সাদা পানটি তুলে নিয়ে মুখে দিলেও সঙ্কোচে তার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। আমার মনের ভাব বুঝে তিনি বললেন, 'এতদিন সব সময় একসঙ্গে ঘুরলি, কিন্তুরি, খেয়ালি এখনও এত পরপর ভাবেন কি করে? ওর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল কি ঘটে গেল, কেন কিছু ভাববার আগেই নিজের অজান্তে কখন যে আমি ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছি ভাববারও অবকাশ পাইনি। পর মুহূর্তে একটু সামলিয়ে নিয়ে ওকে বলি, পরপর ভাবলে এতোক্ষণ আবতে আপনার কষ্টকাহিনি হয়েছি কেন। নীতা একদিনে তার মনের মত জনাকতেক আত্মীয় জোগাড় করে তাদের নিয়ে ঘুরে ছিল। দূর থেকে আমাদের ঐ ঘনিষ্ঠতা দেখে আমার এসে হাসতে হাসতে বলে ঘুরতে একেবারে হরিহর আত্মা হয়ে গেছেন। নীতার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বিভাস বলেন, যিনি আপনার ঘুরনে যদি হর-পার্বতী হতে পারেন তবে আমাকে 'হরি' হতে দাও দেখবার। বিভাসের মুখে আমাকে 'যিনি' ডাক শুনে নীতা মুহূর্তের জন্য অবাকও হয়। মনে হল কতকাল পরে যেন সে ঐ ডাক তার কানে এল। সেই ছোট্ট ভাইটিকে অনেকদিন আগে কোন একটা অবাঞ্ছিত কাজের জন্য সে তিরস্কার করেছিল। যিনি-তৎসনার অভিমানাহত হয়ে সেই যে বেরিয়ে গিয়েছিল আর তার আজ আসেনি। এমন কি ভাইফোঁটার অর্ঘ্য গ্রহণ করতেও তাকে সে আনতে পারেনি। নীতার মনে সেই দুঃখ মাঝে মাঝেই রোদের মত। আজ বিভাস যেন সেই উপে মুখ খুলে দিয়ে হাসতে হাসতে তার সামনে এসে দাঁড়াল। নীতা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'যিনি বলে যখন ডেকেছেন, আর দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াতে দিচ্ছিনা'। নীতার কথা শেষ না হতেই মন মন আনন্দে হর্ষে কর্ণকুহর বিদীর্ণ হবার উপক্রম হয়। আমরা ছোট্ট আনন্দে দিকে এগোতে থাকি। আনে উঠতেই ছায় বিলী দলা ছেড়ে দিয়ে বলেন, কি ব্যাপারটা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না, তাই না? পাশ থেকে তা ভদ্রমহিলা বলেন, 'সারা ভারতবর্ষই তো শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি', তার ভদ্রমহিলা শেষ করে দি। লাহিড়ী আমার, 'সারা ভারতবর্ষই কৃষ্ণের লীলাভূমি হলেও এসব জায়গায় তিনি জীবনযাত্রার স্বাভাবিক কর্মধারায় নিরত ছিলেন। তার পদস্পর্শে এজন্যেই সব কিছু মাত্র কৃত্রিমতা পর্যন্ত পবিত্র হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি যা ভবিষ্যৎ ভারতে তার পদার্পণ ঘটেনি কিনা সন্দেহ। লাহিড়ী আবুর যুক্তিখণ্ডন করে নন্দীবাবু বলেন, আপনার সঙ্গে আমুলক লাহিড়ী আবু'। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অর্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া অনুসরণ করে মণিপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ বেহেতু সকলময় অর্জুনের সঙ্গে অবশ্যই তাঁকেও মাতৃভূমি অতিক্রম করে মণিপুর যেতে হয়েছিল। যাদোচনা জমে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আমের পরিও তাল কেটে যাচ্ছিল। একসময়ে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা তিন সাড়ে পাঁচটা। সূর্যাস্তকে দেখে মনে হচ্ছিল সমুদ্রজলে ডাইভ দেওয়ার জন্য লাল সুরকির ঘটিটাম পরতে চলেছেন। তার সেই পোষাকের পক্ষ প্রতিফলন বর্ণ সমুদ্র ও পশ্চিম দিগন্ত প্রতিবিম্বিত হয়ে অপূর্ব এক মনোমোহিনী সৌন্দর্য প্রকাশ করে সকলের মন কেড়ে নিচ্ছিল। ম্যানেজার বাবুর নির্দেশমতে আমরা এখানে নেমে পড়লাম। বৈজ্ঞানিক টিফিন এখানেই সারতে হবে। এই মনোরম জায়গায় কিছুক্ষণ কাটাতে হবে ভেবে সবাই খুশী।

নেমে দেখি যাত্রীরা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে মাঝে অনিকেত ঘুরছ কেন গোপ-বালকের কাছে জমিয়ে বসেছেন। কিন্তু বিভাসকে কোথাও না দেখে আমি তাকে খুঁজতে থাকি। হঠাৎ তাকে দেখি কেন কিছুদূরে সমুদ্র পাড়ে একটা পাথরের ঢাঁইয়ে উপর বসে একদৃষ্টে সে সমুদ্র ও সূর্যের মিলনের প্রতীক্ষা করছে। আমাকে কাছে আসতে দেখে বলে, 'ফরেস্ট অফিসে এই রুক্ষ উপকূলেও স্বাস্থ্যের খোঁজে পাওয়া কেন পালিয়ে এসেছি।' মনে মনে বিভাসের প্রকৃতি প্রেমও সৌন্দর্যবোধের তারিফ করি বলি 'ধরা করে মরতে আমি আসিনি। তবে বোঝার আগেন জানাটাও যে দরকার।' আমার কথায় বিভাস লজ্জিত হয়ে বলেন 'কতগুলি কিন্তু আপনাকে উদ্দেশ করে বলিনি। শুধু নিজ আমার এই ঘরছু অবস্থানের একটি কৈফিয়ৎ দিয়েছি। ও মনের ভাবনাকে কথা আর না বাড়িয়ে আমি ও প্রকৃতি-সৌন্দর্য পানে ওর সঙ্গী হয়ে বসি।

ভারতের শেষ পশ্চিমে মার্চমাসের শেষে সূর্য পাটে নামতে প্রায় সাতটা বেজে যায়। সুতরাং সমুদ্রজলে সূর্যাস্তের ডুব দেওয়া দেখতে আমাদের আরও ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু-মানেজার বাবু সে সময় আমাদের কিছুতেই থেকেন না এখানে মশা নাকি প্রচুর, যত যত তাড়াতাড়ি নেমের সাথি সূর্যের বর্ণালীর স্পর্শে অপরূপ রূপে দেখা যেত তা ভাষার বর্ণনা করা সহজই কঠিন।

নীতাকে তার আত্মীয়দের সঙ্গে গল্প করতে দেখে এসেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ তার কথা শুনে তাকাতেই সে বলে 'তোমরা এখানে বসে আছ, তখন থেকে যা তোমাদের খুঁজছি। এদিকে টিফিন দিয়ে ওরা বসেছে। আমার কিছু বলার আগে বিভাস বলে, সত্যিই এই পরি মেঘটাকে নিয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠার শেষ নেই। বিভাস কথা শেষ না হতেই নীতা বলে, 'যা বলেছেন ভাই, এতদিন একজনকে নিয়ে চিন্তি ছিলাম, এখন তো দুজন'।

—অর্থাৎ ভিন্ন মানের ঘোলের সৃষ্টিও। বিভাস মৃদু হেসে বলে:

—বিভাসের কথা শুনে নীতা কিন্তু কোট বলে.

—ছি ছি নিজের সঙ্গে দিদিকেও নামান হচ্ছে।

—বিভাসকিছু বলার আগেই নীতা বলে।

—চলুন, ম্যানেজারবাবু ডোর তাগাদা দিচ্ছেন। টিফিন শেষ হতেই বাস ছে দেবে। এরপরেই আমাদের ফিরতে ঘন্ট সাড়ে আটটা কেটে যাবে।

অগত্যা আমরা সমুদ্রের খেলাভূমি ছেড়ে উঠে পড়লাম। আবার বাস চল শুরু করে। অন্ধকার নাগরের তীর ধরে আমরা পোরবন্দরের দিকে ছুটছি। বৃষ্টি শ আকাশে পশ্চিম দিগন্তে অস্তায়মান সূর্য এবং সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে ক্রম ধাবমান ব্যব মাপতে যাতে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সূর্যদেব আমাদের নজর এড়িয়ে অস্তাচল সম্ব ডুব মারতে না পারেন। অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে ঠিক সাতটা অন্তরার মুহূর্তে আমরা ে অবিস্মরণীয় সোনাজবর দৃশ্য দেখে এক অপূর্ব ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে চোখদুটি বন্ধ করলাম। একটি প্রচণ্ড বিশ্বাস অভিজ্ঞতার মুহূর্তে যেন সমুদ্রের অতলে হারিয়ে যে বিশ্বাস জলমানির উপায় এক দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া রেখা এঁকে দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে ও থেকে বিভাস উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, 'দেখলেন, দেখলেন আনন্দবাবু, কি ঃ অপরূপ লজ্জিনজন ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যদেব সমুদ্রজলে ডুব দিলেন'। বিভাসের ক

আমি বলি, 'সত্যিই মানে করে সমুদ্রের মধ্যে সূর্যাস্ত দেখা এক বিরল অভিজ্ঞতাই বটে, জীবনের মনে রাখবার মত ঘটনা'। তখনকে কি একটা ভেবে নিয়ে বিভাস বলে 'অসমবাবু পৃথিবী থেকে প্রতি মুহূর্তে শতশত লোক হারিয়ে যাচ্ছে। কি যেমনভাবে হারিয়ে যায় ক'জন। বিভাসের কথার মধ্যে হঠাৎ সে এক গভীর ভাব থেকে বেরিয়ে এসে বক্তব্যটি বলল। সূর্যাস্তের হারিয়ে যাওয়া তাকে জীবনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিভাসের কথা আমার মনেও এক ধাক্কা দেয়। এক দার্শনিক ভাবনা যেন আমাকেও পেয়ে বসে। কিন্তু সঙ্গে সেই ভাবনার ঘর থেকে উজ্জ্বল জ্যোতির মত এক সত্য আমার মনে উঁকি দিয়ে যায়। আমার মনে হল আসলে সত্যিই কি সূর্য হারিয়ে যায়? আমরা হারিয়ে যাই। যা আমাদের এই পৃথিবী হারিয়ে যায়। উত্তরের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয় না। সূর্য, পৃথিবী বা তেমন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্র হারিয়ে যায় না কারণ তেমন পরিবর্তনশীল পদার্থ চোখের আড়ালে গেলে তাকে হারিয়ে যাওয়া বলা যায় না, তাই ঐসব বস্তু নির্দিষ্ট কক্ষপথে আমাদের চোখের সামনে আবার ভেসে ওঠে। কিন্তু যে অর্থে বিভাসের মনে হয়েছিল সেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বেলায় তা কতটা সামঞ্জস্যিক ভাববার বিষয়। অবশ্য উভয় পক্ষে এ বিপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হোকনা কেন তা সবার পক্ষে গ্রহণীয় হবে কিনা ভাববার বিষয়। মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব কোনভাবে থাকে কিনা তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু পক্ষে বা বিপক্ষে নিরপেক্ষ প্রমাণ সহ বিষয়টা সাধারণের কাছে উপস্থাপন করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই মানুষ যে মৃত্যুর পর সব সত্তা হারিয়ে ফেলে তা বলা যায় না। আমি আমার চিন্তায় কতক্ষণ বিভোর ছিলাম জানি না। হঠাৎ সম্বিত ফিরে রবীন্দ্র সংগীতের একটা কলি 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ...। তাঁকে আনতে আমি সভাস হই। তাকিয়ে দেখি বন্ধুরা অনেকক্ষণে দুপাশের জনপথ ঘন আঁধারে নিমজ্জিত। ফলের সূত্র অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি মৃদুলা যে ফিরে গর্ভার সঙ্গে মন্ত্রকল্পিনায় মেতেছিল 'আজই পরা। ওদের লালে মুকরা মৃদুলা যে এমন সুন্দর রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে পারে ধারণা ছিল না। সমুদ্রের তীর ঘেষে ঘন আঁধার ভেদ করে বালোর দূর্গার প্রতিমা সঙ্গে তার মেলে রবীন্দ্র সংগীতের সেই সুন্দর কলিটা ওদের চেতনা নিয়ে সমুদ্রে পশ্চিম সমুদ্রকে যেন সাক্ষাহিত করে তোলেছিল। ভাবলাম বিভাসকে ডেকে বলি, "জীবনে এমন লগন ক'জন আসে। কিন্তু মনের মধ্যে ওদের কেন যে আবেগ পড়ে তুলছিল হয়তে আমাতে ঘটতে পারে ভেবে চেপে গেলাম। মৃদুলার গলায় সেই আনমনা ভাব হয়তে তাকে আরও অনমনস্কের পাওয়ার জন্য সবাই কলতে সে আপত্তি না করে বলে পাটিতে আরও কিছু গান জানেন তাদেরকেও গাইতে হবে। মন্দ সবাই যখন বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার সন্ধানে ব্যস্ত আমি বিভাসকে সেই জায়গা ছেড়েই দেখি। দেখি বিভাস যেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে ক্ষণিক ভাবনার অতলে তলিয়ে যেতে থাকে। ওর ওই ভাবান্তর দেখে আমি কিছু বলা ঠিক হবে কিনা ভাবি কূল পাইনা। উত্তরের অপেক্ষায় ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কয়েকটি মুহূর্ত অতিবাহিত হওয়ার পর বিভাস চোখমুখে আবার চেতনের উপর ফিরে কিছু যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় সমস্বরে ঘোষণা হল 'এবার বিমানবাবু আমাদের গান শোনাবেন'। শীতা আমার পাশ থেকে বলে, 'আরে দাদা গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যাবেন মজার ব্যাপার। কি বলেন বিভাসবাবু। বিভাসের সেই যন্ত্রণার কথা হয়না। সে বলে 'অসমবাবু আপনার সেই প্রশ্নের উত্তর পাবে এক সময় দেব'। বিভাসের কথা শেষ না হতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাওয়ার ফেনোমেনার অনুকরণে এক পুরুষকণ্ঠে সেই বিখ্যাত 'কালাপাহাড়' গানটি শুরু হয়। দূর ও কাছের জ্যোতনার সবাই নীরব, মুগ্ধ। গানের পাশের ভাবলেশ অনেকের জানা থাকলেও সে মুহূর্তে আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হল। জন্মদিনের মত আমরাও বৃদ্ধ হচ্ছি এক ধেয়েরীর গতি পেরিয়ে জীবনে কিছু নতুন স্বাদ, নতুন কিছু পাওয়ার তাকিদে। ম্যানেজার বাবুর চেয়ে সমবয়সের বড় অভাব। তার অনুরোধ কোনদিন অবহেলা বেশিক্ষণ হিসেবে পরিনি, জন্মদিনের মত ছুটে চলেছি। আমার মেন আজ অন্যকোন গান শুনতে ভেসে এল। তাঁহার দিকে তাকাতে সে বলে 'কিশিন্ত, রায়বাবুর মেয়ে'। জন্মবাবুর মত সজ্জন, নির্লিপ্ত ও অমায়িকতাপূর্ণ মানুষ আমাদের অফিসের মধ্যে কজন আছেন জানা নেই। ছাওয়া টেবিলে সেই জন মেয়ে ছেড়ে সব সময় তার সঙ্গ আমরা পেয়েছি। প্রতিটি বিষয়ে তিনি আমাদের খোঁজ খবর, সহায়তা নিয়েছেন। কাজ-খেলিকে খুব নিপুণে করার মত নিলিপ্তাই তার চেয়ে পড়ে সকলেই তার অনুকরণ চেষ্টা করেছে। তার সঙ্গে গল্প নিয়ে মুহূর্তে অনেকেই পারেননি। লাল ছেড়ে নিয়ে মনে পড়েছেন। দীর্ঘ আলাপচে টেনে লালপন্ন আমরা হয়ত ঠিকমত সাক্ষিয়ে রাখতে পারিনি। তবুও যখন ডিনারলেও অপেক্ষায়ালে। হঠাৎ দেখা গেল রায়চৌধুরি কোম্পানির কর্তাং যাঁচনা জড়িয়ে নীতাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের মাঝখান দেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে দিয়েছেন। এ দিকে রায়বাবুর দিকে তার নজরে কোন বিধিনিষেধ নেই। তাকে কখন কি চাহতে কিম্বাতে হবে সে নির্দেশও আর বৌদি ঠিকমত দিয়ে গেছেন। ওদের মেয়ে বিদিশার যে এমন সুন্দর গলা তার পেছনেও আর বৌদির অবদান যথেষ্ট সামান্য নেই। একটু মনোযোগ দিয়েই গানের দুটি কলি সবি তাকনা আমার কলা. । কিছুক্ষণের জন্য আমরা সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলাম। সম্পূর্ণ বিদেশ বিভূঁইয়ে বসা পঞ্চাশেক বাঙালী ভিন্নদিনের জন্য একই মঞ্চের। একই পথের পথিক হয়ে চলার পথে একাত্ম হয়ে এমন মধুর সাঙ্গীত সুধায় আপ্লুত হয়ে চলেছি যেন কল্পরাজ্যে আ পশ্চিমকাশে র মধ্যে কোথাও তারা যায় না। বিদিশা মেয়ে মেয়েই বিভাস ভাক্তারের আমার মন রাত রাখা টেনে নিয়ে বলে 'মিঃ চ্যাটার্জী আমার কি মনে হয় জানেন গান শুধু শোনা, মানুষকে দেখও অনেক কিছু'। আমি অবাক হয়ে বিভাসের মুখের দিকে তাকাতে সে আমার মনের ভাব বুঝে বলে 'অসমবাবু কোন্নন যেন হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে। তাই না। তবে শুনুন আমাদের মনের অনেক জ্বালা, অনেক যন্ত্রণা যেমন গান শুনতে শুনতে ভুলে যাই অর্থাৎ গান সেগুলি নিয়ে নেয়। তেমনি আমাদের ভাঙা মনকে জোড়া দিয়ে যায়। মনে হল অন্ধকারে বিভাস তার মনের অতিথ পথের একটা আবছা নিশানা দিল। ওর সারাদিন চলন, বলন এবং আপাত ভূতের আড়ালে কোন এক ভয়ঙ্কর মেলনা মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে ওকে অবশ করে দিচ্ছে। তাই ভ্রমনার্থীদের স্বাভাবিক কথাবার্তা, হাসি ঠাট্টা, হৈ হুল্লোড় থেকে কিছু কিছু উপাদান তার কোন হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তকে স্মরণ করিয়ে দিয়েই সে আনমনা হয়ে উঠছে। কেবলার ভয়ে ভিজে হয়ে পড়ছে। আমার চিন্তার মাঝখানে ওকে শোনাম সামনের সীট থেকে দত্তবাবু আমাদের পেরিবন্দর কিম্বদন্তি কত সময় লাগবে জিজ্ঞেস করতে ড্রাইভারের বাবু জানালেন 'আরও ঘন্টাখানেক'। সঙ্গে সঙ্গে আবেগীতা মৃদুলাকে আরও একখানা গাইবার জন্য অনুরোধ জানায়। মৃদুলা না করতে পারে না। কি গাইবে ওকাল জন্য মনোযোগী হতেই কানে এল, 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলে ঝড়ে'

ভারীয়ের কণ্ঠস্বরটি নিজেকে নিমিয়ে রেখেই এক আবেশী মুহূর্তেরি ওঠানামা করতে করতে বাঙীদের সম্মোহিত করে রেখেছিল। গান শেষ হলেও তার রেশ তখনও কাটেনি। সবাই গভীর এভাবে মগ্ন।

রাতের গতি যেন আরও বেড়েছে মনে হল। মাঝে মাঝে উজ্জ্বল আলোও নিওন লাইনের আলোকোজ্জ্বল দেখে মনে হচ্ছিল আমরা শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছি। আগামী দিনের প্রোগ্রাম নিয়েও কেউ কেউ কথা বলছেন। জানালায় তাকিয়ে দেখি বিভাস মাথা নীচু করে আছেন। ওকে ওঁর মত থাকতে দিয়ে আমি অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে ঘন ঠিক তখনই ও কেন জানতে আমাদের মধ্যে চোখাচোখি হয়। বিভাস বলে, 'অসমবাবু আপনার সেই প্রশ্নটির উত্তর তখন দেওয়া সম্ভব হবে না। যেন কিছু বলেরা আশা ঠিক হবে না। তবে শুনুন। নীতা এতক্ষণ চুপ করে থাকলেও বিভাসের কথা সে শুনছিল। বিভাস তার সেই পরম লগনের কাহিনী বলতে উদ্যত হতেই নীতা বলে, না বিভাসবাবু, এখনে নয়। এত লোক ও মাসের আওয়াজে আপনার সেই কাহিনী ভালভাবে শোনা যাবে না। বরং আজ রাতে ওপাশা ওপাশার পাশ ঘুরিয়ে হোটেলের বালকনিতে বসে আপনার বলা ভাল। নীতার প্রস্তাব বিভাসের মনে ধরে। সে বলে 'মিঃ ঠিকই বলেছেন, কালের এই হট্টগোলে যাত্রার কথা হয়ত আপনার কানে আওয়াজ আসেই হারিয়ে যাবে।

হোটেলে নিজে রোম হয়ে ডাইনিং হলে আসতে রাত দশটা বাজে। ক্লান্ত বিদায়ের মুখে ওদার পরে ভর্তি মাংসের সুস্বাদু ঘ্রাণ কিন্তোটা যেন আরও বাড়িয়ে দেয়। খেতে শুরু করেছি এমন সময় ম্যানেজার বাবু এসে জানালেন আগামীকাল ভোর ছটায় আমাদের যাত্রা শুরু হবে। রোমগুলের মধ্যে মাত্র দুদ ঘন্টার, বেশি ঘন্টার এবং ঘন্টার। তিনি আরও জানালেন মালপত্র ওজনে সবাই ডাইনিং হলে আসতে, এখনকার পাট চুকিয়ে দিয়ে তোরেই যাত্রীদের বেরিয়ে পড়তে হবে। কালকের জন্য মনের সময় আমরা এমন যে কোনপথটা ভালভাবে নেয়ে নিই এমন একটা তাকিদে আমরা খাওয়ার মন দিই। বিভাস নীতাকে লক্ষ্য করে বলে, 'ওসলেন মো মিঃ এবার ঘরে আলোচনায় বসে পরা ওনবার মত সময় পাবেন'। নীতা একটু হেসে বলে 'সত্যিই তো'। মিনিটপনর পরিয়ে হেসে ওরে ওতে এমনিতেই তো একঘন্টা, সঙ্গে একঘন্টা যেতে হবে। তারপর তোর পাঁচটায় উঠতে হবে। আর মাত্র একটা দিন সেই পর

নিশ্চয়ই। সেদিনেই অবশ্য মনোযোগ সহকারে আপনার একান্ত সেই কাহিনী শোনা যাবে। আমি জানি, সত্যিই সীতা আমার মনে যে বিশ্বাসস্থান সেই ঘটনাবলী এতই দৃঢ়ভাবে এবং অনুভূতিসহজ যে অন্যত্র মনোযোগ দিয়ে না শুনলে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। বিশ্বাস আমার কথার শেষ অবধি হয়ে তার চোখদুটি আমার দিকে তুলে ধরে।

তিন

ভোর পাঁচটা বাজতে না বাজতে বাসি। বেশ আওয়াজ হোলো। আমরা অবশ্য আগেই উঠে পড়েছি। দরজা খুলে দিতেই ডাকেজমেন্টের লোক এসে টেবিলে চা রেখে লগেজ নিয়ে চলে যায়। চায়ের পাট শেষ করে আমরা চটপট বেরি হতে থাকি। ছ'টা বাজবার আগেই আমরা দরজার তালা লাগিয়ে নীচে নামিয়ে এসে বসি। দেখি দু'চারজন বৃদ্ধ বিপত্নিক ইতিমধ্যেই সেখানে এসে পেয়েছেন। আরও দু'চারজন আসতে আমি সীতাকে নিয়ে ফুলে উঠি মিসিস সীতা লিয়ে বলি। দেখতে দেখতে সবাই এসে পড়েন। বিশ্বাস আমাদের দেখে হেসে বলে 'রোয়ে উঠবার তাড়নায় ঘুমের ঘুনে বাঘাত ঘটেনি তো'। সীতা উত্তরে বলে সে আর বলতে। গতকাল চড়ুইভাতির মত বেরাবে বুঝিয়েছে যে বিছানার পড়তেই বেলা, এত ভুলে সাড়ে চারটে। সীতার কথা শুনে বিশ্বাস বলে 'মিসি কতাকটের ট্রাবে বেরলে এরাগেই ঘুমতে হয়। মিসিস সময়ের মধ্যে ওরা সব দেখাবে, কারণ তোপাও ওভারস্টে করলে ওদের সময় প্রোগ্রাম অপসেট হতে পারে। বিশ্বাসের পেছনের সীট ভানার্জী বসতিত ছিলেন। তার কথায় সায় দিয়ে মিসেস্ ভানার্জী বলেন, বিশ্বাসবাবু ঠিকই বলেছেন মিসেস সীতাদি। দেখবেন পরেরদিনের থেকে আজ আরও বেশি ঘুরতে হবে। সীতা বেশি হাঁটা চলায় অভ্যস্ত নয়। সে একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে বলে কি! মনোরমা প্রত্যুত্তরের সঙ্গে বলেন হাঁ মিসেস সীতাদি, হবে আমরা এসেছি তো ঘুরতে। আর সেটাই যদি না হয় তবে এত কষ্ট করে বাড়ি থেকে না বেরোনোই হত। মনোরমার যুক্তিপূর্ণ কথায় সীতা একটু লজ্জিত হয়ে বলে, না, আমি ঠিক সেইভাবে বলিনি, তবে এসেছি এত তাড়া যে কোথাও ঘুমও সময় দিতে চাননা। সীতার কথায় বিশ্বাস বলে কাজটা তো আমি আগেই বলেছি দিদি। সীতা জবাবে বলে 'আজ আমি তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুরব বলো। রমা বলে বেশ তো আমি তোমাকে দেখবাল করব সীতাদি।

দুটি দম্পতিই পৌরবর্গা রমা তার স্বামী বিনয় ভানার্জীর সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছে। বয়সে সীতার থেকে হয়তে পাঁচ ছয় বৎসরের ছোট হবে রমা। স্বামী বিনয়ভদ্রও বেশ হাসিখুশি মানুষ। ওদের বৈবাহিক, চাকচমনে বোঝা যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ ভালই বোঝাপড়া আছে। ট্রেনের কামরায় যা আলাপ পরিচয় হয়েছিল তাতে সবার সঙ্গে সবাইকে মিশতে, গল্প করতে বেশ দেখা গেছে। আমরা তাই মনে মনে বেশ আশ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম। পোরবন্দরে আসবার সময় আমাদের স্টেশনে আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কারণ আমাদের কোচটি পোরবন্দর স্বামী একটা ট্রেনের সঙ্গে ওখানে জুড়ে দেওয়ার কথা ছিল। আমরা অনেকেই প্লাটফর্মে এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করি। একসময় সীতাকে দেখি দূরে একটা বেঞ্চে বসে রমার সঙ্গে খুব গল্প করছে। সীতার উপর আমার যেমন নজর ছিল রমার উপর বিনয়ের তার থেকে কম ছিল না। তাই প্রায়ই একই সময়ে আমরা ওদের কাছে চলে যাই। দুজনা দুই দম্পতির মধ্যে আলাপ পরিচয়ের সূচনা হয় যা পরে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। আমার দুটি সন্তান থাকলেও তারা এখন বড়দের আপন করে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত জেনে বিনয় হাসতে হাসতে বলে তাহলে আপনাদের জন্য অন্তত বিভাজিত হয়ে তার অনেকটাই সন্তানদের দিকে ঝুঁকিত হয়। কিন্তু আমাদের ওদের ঘাড়ে আছে : আমরা উত্তরে উত্তরদের পুরোটাই উপহোগ করি। রাতবেলা বিনয়ের মুখে তিন ধরনের কথা শুনে আমি ও সীতা পথমটায় একটু হতচকিত হলেও ছুটির ব্যাপারটা বুঝে ফেলি। সীতা বোধ হয় আগেই বুঝেছিল তাই আমার চোখের উপর চোখ রেখে তার ইঙ্গিত দেয়। আমি বিষয়টা ধামা চাপা দিয়ে বলি মনের কথা বলছেন-মুনি ঋষি ছাড়া আমাদের মত আমাদের মানুষের মন সব সময় বিভ্রান্তিতে। আমার এখন মনেও পড়ে যায় "মুনিনামপি মতিভ্রম"। আমার কথা শুনেনমার কিনা হেসেই ফেলে বলেন, 'আপনি যে আজা লোক মশায়, তা আগেই, আগেই, কেচেকেই পুরুষজাতি নষ্ট বলে'। সীতা ও রমা আমাদের কথায় যেন মজা পেয়েছিল মনে হয়। সীতা আমাকে বলে বুঝলে রমা মনের-কথাটাকে সময় ঠিক মুখ ফুটে বেরিয়ে আসবেই। পুরুষের তো এটাই ভিন্নি। সীতার কথায় উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় বিনয় বলেন চলুন, চলুন এবার ছেড়ে হয় গাড়ী ছাড়বে। আমরা ট্রেনের সেই কামরার দিকে এগোতে থাকি।

ট্রেন ধীরে ধীরে বিদায় জানাতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে বাসের পরিচয় বাড়ে। দুদিন যাতায়াত পথে আমরা দেখেছি, মনটাও যেন দেহের বিদায়ে ক্ষিপ্রতে সুদূর ভবিষ্যতে কোন এক বিশ্রামাগার স্থির হয়ে যায়। চোখে পড়ে দিক চোখিয়ে দুই যন্ত্রিত শকিত অধিবাসী এক রক্তপুর হেডকুয়ার্টার সব চতুষ্টয়সহিত এক দিন যাতে আমিন হয়েআমাদের যাবে আসে চলেছেন। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে নাচ্চি পুরুষ নির্দেশে বিশাল বিশাল জনতা চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। দুরন্ত শঙ্খধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি ও রঙ্গন দিনের ভিন্ন আলো এবং মুখরিত কুলের বিলোমিত যাদুমন্ত্রে সবাই যেন মুক হয়ে সেই বর্ণাঢ্য দৃশ্যের অনন্ত হয়ে পড়ছে। জনতার মাঝখানে এসে রথ থেকে নামা প্রাথমিক থেকে আওয়াজ ওঠে 'আমাদের পিতা কি জয়' সমস্তপুর দুই হাত তুলে জনতার সম্বর্ধনা গ্রহণ করে সব থেকে নেমে পড়েন। তার মুখের বিজয়োল্লাসে ভিড় ভিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁদের উপর বৃষ্টি ঝোলাতে ঝোলাতে এক সময় তিনি এক মুহূর্তের পরে জনতার মাঝখান থেকে হাত ধরে সামনে টেনে এনে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আবার চারিদিক থেকে মেঘমন্দ্রস্বরে আওয়াজ ওঠে 'আমাদের পিতা কি জয়'। আমি সেই দৃশ্য দেখে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সেখানে ছুটে যাই সেই জনপুরুষের পদচুম্বনে যে মুহূর্তে মাথা নোয়াতে যাব ঠিক তখনই তার স্পর্শে আমি যেন অবশ হয়ে যাই। চোখ মেলে দেখি মৃদু হাসিতে তিনি আমাকে কাছে টেনে গায়ের একটা কম্বল তার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মুখে কিছুতে আমার মুখ থেকে কোন কথা সরেনা। ঠিক সেই সময় সীতার হেতে এক ধাক্কায় আমার সম্বিত ফেরে। হাসিমুখে দেখি সজল মুগ্ধ এক দৃষ্টি ধরে কাঁদ চোখে। দুজনে নানা বিশ্বয়ের অবতারণা, প্রতিক্রিয়ের আকর্ষণ গড়ে উঠেছে। বিশ্বাস বিনয় আর্টারিয়া, চোখ বাঁধানো হোটেল, সাঁড়াঘর সুসজ্জিত যেন একে একদের ভেতরের দিয়ে সবার এগিয়েছি। সীতা বলে আমরা মূল ঘাতায়াত এসে পেছি মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমরা সবুজ পুরুবাজি পরিবেষ্টনের একটা ফাঁকা জায়গা আসতেই থমকে যাই। মাঝেমধ্যে মাঝ মাঝবর সৌন্দর্য দিয়ে আমরা গেটে দিকে এগোতে থাকি। বেশ কেতে মেতে আমরা পায় পাঁচমিনি হেলে একটা উদ্যানে এসে হাত হই। বেলা হলে সবে সাতটা। জন কলরব। একটা মুক্তমুখে হাওয়া এসে সবার ক্লান্ত মন যেন জুড়িয়ে দেয়। উদ্যানের ছোটবড় এখানে সেখানে প্রচুর আম, জাম, ঘাস, অশ্বত্থ ও নিম গাছ মাথা তুলে দাড়িয়েছে। ছায়াদেকে এ আরামের পক্ষ, আঙুর ও ঘাস বিশ্রাম নিচ্ছে ভরে। বেঞ্চগুলি বেশ কিছু ধনীদি ও ছায়ায় আচ্ছাদনের আশ্রয়ে ঐ ঘন হেতে চলে যাচ্ছে। ঐ উদ্যানের পূর্বদিকে খানি হেলে বেঁটে কম্পাউন্ডে ব্যবসায়ীরা ও অন্যান্য বেড়-বেজীর মন্দির। ম্যানেজারবাবু আমাদের সেখানে নিয়ে আসেন। মন্দিরগুলি তখন আর্চই চলছিল। সীতা, রমা এ অবশ্য অনেকে সেখানে পূজা দেয়। ম্যানেজারবাবু সময় নষ্ট না করে আমাদের সে উদ্যানের ফোলমোলা তথ্যগুলি এনে ব্রেকফাস্টে করেন। ঐ সময় পলকাবাবুরা পাশে চলার যা পরিচয় তাই-এর উপর ভর করে আমাদের আসন্ন এক মধ্যে পরিচয়ের সূচনা করেন। বিশ্বাস ম্যানেজারবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, স্বয়ং কুবেরের পাশিতে আমার রেকমমেন্ট আপ্যায়িত হচ্ছে। একটু হেসে সৌজন্যে বা, মন্দিরবাবুর কথার রেশ টেনে ম্যানেজারবাবু বলেন, 'এই মন্দিরটি মহারাজ আপনাদের জন্যেই হয়েছে। এই সেই স্থান যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে এসে প্রথমে বসবাস করেন। সেই কথা মনে রেখে এখানকার মাল হয় মুল আরকা।

ব্রেকফাস্ট শেষ হতে আবার যাত্রা শুরু। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল হল সে দ্বারকা। বাস ছাড়তেই দরবারু বিজয়কে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলেন, কৃষ্ণের জায়গা এলাম, কিন্তু সেলেস্টিয়ালের দেখা মিলল না, এ কেমন কথা'। বিশ্বাস উত্তরে বলে, 'ঠি বস আপনি ভুল বলছেন, এটা কৃষ্ণের নয়, দ্বারকা। শ্রীকৃষ্ণ তৈখোক্তিমা সমস্ত করে মথুরায় রাজা হয়ে তারও অনেক পরে এই নিরাপদ দ্বারকায় নতুন রাজ্য পত্তন করেন। এখানে তাঁর নিজস্বতো করবার সময় খুবই কম ছিল, রাজনীতি কূটনীতিতে তার অনেক সময় কেটে যেত'। দরবাবু বিজয়ের কথা শুনতে রাজি নন। বলেন, 'তাঁদের যোগার ব্যক্তিদের কখনও সময়ের অভাব হয়'। তার কথা শেষ হবে না হতে চোখে পড়ে দ্বারকা পুরী বেশ কয়েকজন তরুণী মাথায় একটি গাগরী নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে জল আনতে চলেছে। দরবাবু রহস্যভরে বলে ওঠে 'দেখুন তো বিজয়বাবু আমি মিছা বলিনি। কৃষ্ণের যুগে গোপীরাই থাকবে

একটা জানাই যায় না। আমাদের জন আসতে দেখে তরুণীরা জলের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে আর জল ওদের পাশ দেখে যাওয়ার সময় অপরিচিত তিন দেশের আগন্তুকে দেখে কৌতূহলাক্রান্ত এক জনির মনে হোলো। সেই সঙ্গে ভক্তবন্ধুর হাসির ছবে মেখে মনে হল তিনিও ওদের সামিল হয়েছেন।

জল চলতে থাকে। ঘন্টাখানেক না চলতেই আমাদের জন্মার বাঁ দিকে বেশ কয়েকটা ছোতরে এক বিশাল মনোরম মন্দির দেখা যাচ্ছিল। ম্যানেজারবন্ধু জানালেন, ওটি ভবিষ্যৎ দেবীর মন্দির। শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম মহিষী ছিলেন এই ভবিষ্যৎ দেবী। শ্রীকৃষ্ণের ভালজলার দীর্ঘ জল লাভের ফলিবিচ্ছিন্নের ভবিষ্যৎ দেবীর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। আরও প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর আমরা আরও সামুদ্রের তীরে চলে আসি। ম্যানেজারবন্ধুর কলবার আগেই বিলাস বলে, 'এবার আমাদের নামতে হবে। নেমেই আমার জায়াজঘাটের দিকে এগোতে থাকি। সেখানে এসে দেখি সমুদ্রের মাঝে ছোট্ট একটা দ্বীপ যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওনলাম ওটাই নাকি সেই আরব্য। ম্যানেজারবন্ধু একজনকে লক্ষ দিয়ে আমাদের উঠতে বলেন। মোটা গাঁড় বাঁধা তক্তা বিছানো ছোট ছোট নৌকার উপর পা ফেলে আমরা সেই লক্ষে গিয়ে বসি। সমুদ্রে সাগরের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে সেই সমুদ্র দ্বীপে যেতে মারুণ লাগছিল। আমাদের সঙ্গী সেনবন্ধু আমাদের মতো প্রথমবার মানুষ। অকৃতদার, জল পঞ্চাশের-হিসাবের উপর হবে। ছিপছিপে বিদুষীদের দীর্ঘস্থায়ী দূর ভ্রমণে একা আসতে সাহস পাননি। কিন্তু ঘোরানোর নেশা এখনও কাটেনি। মানব মনে ভাব বুঝে জন্মর তার সঙ্গী হয়ে এসেছে। উজ্জ্বল এই তরুণটি আজে ভাল চাকরি করে। মানুষ নব ঘোরানোর নেশাও আছে। হঠাৎ দেখা গেল আমাকে তুলে নিয়ে জন্মর জন্মবন্ধুর মেয়ে বিদিশার হাত ধরে তাকে লক্ষে তুলে তারই পাশে এসে বসিয়েছে। বিদিশা রূপে যেন ফেটে ওলেও সবার সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। পরক্ষণেই জলের মতো তার পাশ সকলকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। তাই তার চলন, বলন নাম সব কিছুই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সবে তারুণ্যে উত্তীর্ণা, সৌন্দর্যে উদ্ভাসিতা বিদিশাকে জন্মরের সঙ্গে গমন করতে করতে সাগর পাড়ি দিতে দেখে অনেকেই কেমন হিংসে হয়ে পড়েন। ভক্তবন্ধু মনের রাশি চেপে রাখতে না পেরে বিলাসকে বলেন, 'কুতকর্ম বিলাসবাবু, একেই বলে ছান মাহাত্ম্য। এখানে প্রেম নিজের পরিচয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে। সেই প্রেমের ঠাকুরের ধরবারে আমরা চলেছি ; প্রেমকে জয় দিয়ে দেখি সম্ভব'। ভক্তবন্ধুর কথার সাড়া দিয়ে বিলাস বলেন, 'সমস্ত সাধা জীবন তো টাকাই রোজগার করে গেলেন। টাকার প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে মানবিক প্রেমের কিছু বুঝেছেন বলে মনে হয় না'। বিলাসের কথায় ভক্তবন্ধু চুপ করে যান। তার মুখে আবার কোন সরস উত্তর আশা করেছিলাম। কিন্তু তাকে এইভাবে চুপ করে যেতে দেখে আমি কেন বিলাসও কেন অবাক হয়েছিল। সে ভক্তবন্ধুকে বলে, 'কি মশায়, পারলেন না তো উত্তর দিতে'। এবার ভক্তবন্ধু ধীরে ধীরে মুখ তোলেন। তার চোখ দুটি জলে জল করছিল। তিনি বলেন, 'আপনার কথাই ঠিক বিলাসবাবু। এই টাকার নেশা আমাকে মানবিক প্রেমের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছে। টাকার পর্বে গর্বিত হয়ে বুঝতে আমি প্রেমের অঞ্জলি সঞ্চিত দিয়েছি। কত দুঃখ নিয়ে তারা চলে গেছে। তাই কারুর কাঁধে কখনও মমতা হাত রেখে আমাকে আকুল করে তোলে। ভক্তবন্ধুর কথা শুনে আমি বলি, 'জন্মর, আপনার জীবনে যে অনেক জলা লুকিয়ে আছে মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু আপনাকে ছুতছি না'। এরই মধ্যে লক্ষ্যজন সেই উঁচুর কাজকর্মে চলে আসে। ভক্তবাবু বলেন, 'আমার জীবনচরিত জানতে আপনি যদি আগ্রহী হন, বেন কোনদিন সময় পেলে জানাব'। আমরা ছোট জাহাজের পা ফেলবার জন্য মনে মনে তৈরি হতে থাকি। দেখতে দেখতে লক্ষ ছোটিতে এসে লাগে। আমরা সারিবদ্ধভাবে একটির পিছে একে একে ছোটিতে পা ফেলে কড়িয়োরের মত লক্ষ পাছে ছোট একটা সেতু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেই নগরীর দিকে এগোতে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সেখানে পৌঁছে যাই। ম্যানেজার সেখানে পূজোর জন্য টাকা পয়সা জমা দেন। জেলেরাই অনেক পূজোহিত ও দানসত্র সমাধান সেখানে মেলে। পূজোর জন্য নীতা এক পূজোহিতকে একশ টাকা দিয়েই সে টাকাগুলি পকেটে পুরে নিজের সেখান থেকে চাওয়া হয়ে যায়। নীতাকে ঠকে বারেবারে প্রতি থাকা ভাল। কিন্তু তাকেকেন কিছু বলে ভরাটির হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। নীতার কলবার কিছু আছে না।

পরিষ্কার ছোটির এক বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেকগুলি ঘাটুলিকা সমন্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদপুরী গড়ে উঠেছিল। কালের আঘাতে এখনও বিলীন হয়নি, কিন্তু কিছু এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পরিখার মধ্যেকার জলপদ্ম, লোকান, বাজার আছে। সমুদ্রতীরের এই মনোরম দ্বীপটি শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী হওয়ার মত উপযুক্ত জায়গাই বটে। দেখলাম শুধু ভারতবর্ষের নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও ভ্রমণার্থীরা দলে দলে সেই দ্বীপে এসে নামছেন। ট্রাফিকদের মধ্যে একজনকে ঘনিষ্ঠভাবে জীবিকার্জন চলে। পূজা পর্ব ও ছেলেবেলা সেবে আমাদের দলে কিরতে পায় একটা মাসে। আবার দলে উঠে সাগরের জলে ওঠানামা করতে করতে ওপারের দিকে এগোতে থাকি। বেশ কিছে পাচ্ছিলাম'। সঙ্গে আনা চানাচুর, বিস্কুট এবং কমলা সেবুর সদ্ব্যবহার এবং দুপিবাটুর মধ্য দিয়ে তীরের দিকে এগোতে ভালই লাগছিল। নীতার ছোট্ট এক ছেলের আমি কিছু দূরে যেমাঝেমি বসা জন্মর ও বিদিশাকে দেখে কৌতুক করে বলি, 'ছেড় জন ঠিক আমার, জায়জবুর বেড়াতে বেরোনো সার্থক হয়েছে'। নীতা বলে, 'উঁ, পাশ খৌজবার অভ্যাসটি থেকে ভালসোক রেয়াই পেয়েছেন'। নীতার কথা শুনে বিলাসের জানে ছিয়েছিল। সে বলে, 'অনেকদিন, সেই পঞ্চম দশকের কথা আসেছিলাম না, আরও কারও জীবনে সবাই আসে'। বিলাসের কথার নীতা বলে, 'আপনার জীবনে কীরকম এসেছিল শেনবার অপেক্ষায় আমি কিন্তু'। কথাটা এক হাসি বৃষ্টিতে বিলাস বলে, 'এসেছিল, কিন্তু জানতে পারলাম নই'। ওই মুহূর্তে বিলাসের মুখের দিকে চেয়ে কিছুই ব ল ত পারলাম না।

ধীরে ধীরে লক্ষগুলো ভেড়িতে এসে লাগে। আবার সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে একে একে সবাই তীরে উঠি। কাছেই আমাদের জন অপেক্ষা করছিল। সময় নষ্ট না করে আর বার জায়গায় গিয়ে বসি। কিসে আর পিপাসায় উৎপীড়নে সবাই যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে মনে হল। ঘড়ির ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখি বেলা দুটোয় কাছাকাছি। সঙ্গে থেকে সন্তান যার যা ছিল বের করতে সময় হয়। এবার আমরা চলেছি জন্মরের দিকে। ওখানেই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রাম বিলয়। জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের মঠ বা জরি বলের এক ধাম হয়ে বিশ্রাম হয়ে আছে। টিকটা সাড়ে তিনটায় জলে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারব কি না সন্দেহ। ওওয়া-ধাওয়া তো তারপর। জল চলতে থাকে। সূর্যের রক্তমুখি আভিরিকে আগুন ধরাতে আকাশের জন্মর দু'পাশের অপার সৌন্দর্যের প্রাপ্তি, অজানা আগ্রহের জাগরণের সব কিছু যেন আমাদের চেতনে ভিন্ন এক অনুভূতি আনছিল।

সত্যি সত্যিই বেলা টিনটা নাগাদ আমরা দ্বারকায় এসে যাই। এক মারুণ জনকলাল হোটেলের কম্পাউন্ডে আমাদের জল এসে দাঁড়ায়। গেটের মাথায় লিখীর তুলিতে বড় বড় হরফে লেখা 'ম্যাডাম শ্রীরুক্মিনী'। নাম দেখে মন জুড়িয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী 'শ্রীরুক্মিনী' আমাদের আপ্যায়নের ভার নিয়েছেন এত সৌভাগ্যের কথা। বিশাল কম্পাউন্ডের কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথাও হলুদ নানা বিচিত্র ফুলের বাগিচা ও মাঝে মাঝে দোলনা ও ফলার ব্যবস্থা সব কিছু নিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি মনোরম লাগছিল। লাফিয়ে আমরা আসতেই ম্যানেজারবন্ধু ঘরের চাবি ধরিয়ে দিতে বলেন, 'আপনারা ঘরে গিয়ে তৈরি হতে থাকুন। দুপুরের লিল ঘরেই পাবেন'। ওনলাম হোস্পানির লোক আসেই এখানে এসে রাজাবাজার কাজ করছিল। মোটেলের আমার জন্য বরাদ্দ ঘরের ধরজা খুলেই পুলকিত হলাম। আধুনিক জীবনের সব কিছু নিয়ে সজ্জান-গোছান ঘরটি মনে ধরার মত। দোরকম্বর হোটেলের সেই ঘরটিতেও সব ছিল, কিন্তু। ঘরটি যেমন বড় তেমনি নিপুণ হাতে সাজান-গোছান। পেটে যাওন ছুলছিল। কোনরকমে তৈরি হয়ে আমরা ডাইনিং টেবিলে বসতে যাব এমন সময় ধরজার কড়া নড়ে ওঠে। খুলে দেখি শ্রীমান ও শ্রীধর আমাদের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে। টেবিলের উপর ট্রে দুখানা ও মাংসের বাটিগুলি রাখতে আমাদের ক্ষুধাও শতগুণে বেড়ে যায়। সময় নষ্ট না করে আমরা খেতে বসে যাই। বেলা শেষে ঐরূপ গুরু ভোজনের পর বিশ্রাম এগিয়ে আসতে নিদ্রাদেবী আমাদের নিতেই চোখ দুটি বুজে আসে। ধরজায় শব্দ হতে ধড়মড় করে উঠে দেখি ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজে। যাবার শ্রীমান শ্রীধরের আবির্ভাব সঙ্গে চা ও টা। চোখে মুখে জল দিয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসি। বিকেলে আমাদের কোন প্রোগ্রাম ছিল না। তবে কাছেই কৃষ্ণের মন্দির ও শঙ্করাচার্যের মঠ। বিশ্রাম না নিয়ে আমরা বেতে পারি। আমাদের অনেকেই সেখানে আরতি দেখতে যাবেন জানিয়েছিলাম। আমরাই বা কম যাব কেন। মনে মনে আমরাও তৈরি হয়েছিলাম। সন্ধীক জন্মবন্ধু, নবীনবন্ধু অনেকেই সঙ্গী হন। বিলাসও পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তখনও বিদিশা জন্মরের সঙ্গে অনেকই রঙ্গরস নিয়েছে। জন্মর নেমে চিৎ হল

আমরা মাইল দেড়েক রাস্তা আমরা হেঁটে যাব। সকালে আর নষ্ট করা নয় বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। প্রভাবতী দিদি পর্যন্ত অপত্তি করতে পারেননি। সেই বনিয়ে পৌঁছতে আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। চারদিকে পলাশ মাঝিদের ঘর বসবার যে দোকান গড়ে উঠেছে তার ইতর নেই। মন্দিরের সেই বিরাটত্বের ঘিরে একদল ভাঙাচোরা বৃদ্ধি যেরকম ভীড়িল। জানি না কবি পাথরের মূর্তি এত লাবণ্য পায় কিভাবে মন্দিরের সামনে খোলা নাট মন্দিরে পর্দানার্দির ছিটেফোঁটা ছিল এরকমের আরণ্য ছিল না। মেয়েদের কোনরকমের সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে আমরা পেছনে দাঁড়াই। কিছুক্ষণের মধ্যে ভজন শুরু হয়। ভিড় বাড়তে থাকলেও কোন টুঁ চুঁ ছিল না। ভজনের মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার পূর্ণার্থীর মনের ভাষা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হচ্ছিল। ভজনের পর আরতি শুরু হয়। আমরা কিন্তু পরেই জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত দ্বারকার সেই মঠ দেখতে যাই। মঠের অধ্যক্ষ ওনলাম বেশ পরিবারের ছেলে। সাজান-গোছান বেশ পরিচ্ছন্ন মঠটি। শঙ্করাচার্যের কথা মনে হতেই দৃষ্টি চলে যায় দূর অতীতে। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে এক জ্যোতিষ্মান তরুণ সন্ন্যাসী যিনি খড়কুটো বস্ত্রপাতে, বিপদ-সঙ্কুল দুর্গম পথ, দস্যু বা হিংস্র জন্তুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে নিঃসম্বল অবস্থায় সমস্ত ভারত ঘুরিয়ে বেড়িয়েছেন; যার জ্যোতির্ময় দৃষ্টি পথে কেউ একবার পড়লে সে মুখ ফেরাতে পারেনি। অসামান্য, অবতারী নিরন্তর দিগ্বিজয়ের তিনি ধর্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বেদ-বেদান্তের যুক্তি-পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে যিনি অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করে মানব জাতির মন থেকে হীনমন্যতা দূর করে মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ নির্দেশ করেছিলেন। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, দৃ'চোখের বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে যে মঠ দেখছি সেই মাটি, সেই মঠ সুদূর অতীতে কোন একদিন শঙ্করাচার্যের পদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল ভাবতেও শিহরিত হচ্ছিলাম। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পড়িয়ে গেছে। সব লাগীদের তাড়া আসছিল। আর অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না ভেবে আমরা পূজার জন্য টাকা জমা দিয়ে ধীরে ধীরে হোটেলের রাস্তা ধরি।

রাস্তা থেকে অনিলটা এগিয়ে কি একটা মনে করে পেছন ফিরে বেশি জয়ন্ত মিশিলার সঙ্গে গল্প করতে করতে আসছে। রায়বাবু ও বৌদি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। জয়ন্তর মামা বৃদ্ধ সেনবাবু ক্লেশ হয়ে সবারদের বাকে কাটাতে হোটেলে বিশ্রাম নিচ্ছেন। মিশিলার মুখের চেহারা, চোখের ধরন দেখে মনে হচ্ছিল সে কোন এক ঘরের ঘরণীর সন্ধান পেয়েছে। জয়ন্তের হাত ধরে সেখানে সে পৌঁছে দেতে চায়। জয়ন্তর চেহারাখানায় বিস্ময়ের পরিতৃপ্তি। রায়বাবু এক গাল হাসি নিয়ে বিমানের কাঁধে একখানা হাত রেখে বললেন, 'যাই বলুন ভাই পুরুষের পদে প্রকৃতি এসে দাঁড়ালে সত্যি সত্যিই ঈশ্বরীয় অবতারনকা হয়'। বিমান রায়বাবুর কথায় বলে, 'আমি ভাবছিলাম না মেয়ে জন্ম ইতি আমার। এই জন্যেই তো মানুষ ঈশ্বরীয় অনুভূতির ঘাম উপলব্ধি করে'। রায়বাবু বলেন, 'আর তার জন্যে আমরা এসেছি তিনিই তো এই প্রেমকে ঈশ্বরীয় মহিমায় উত্তীর্ণ করেছেন'। ওদের কথা শুনতে শুনতে আমরা এগোতে থাকি। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ ঘুরে গেছে। খাবারের সময় রাস্তা ঘটটা মনে হয়েছিল ফিরবার সময় তার থেকেও বেশি বোধ হচ্ছিল। শুধু তা নয়, যে সব বাড়িঘর, দোকান প্রভৃতি আমরা দেখে এসেছিলাম সে সব কিছুই চোখে পড়ছিল না। রাস্তা বা রাস্তার আলো আসবার আমরা সেগুলি লোকও দেখিনি। আরও অনেক পর এগিয়ে বেশি লাহিড়ী-চক্রবর্তী গ্রুপের কয়েকজন ভাঙা আগেই ফেরার পথে দাঁড়িয়ে পড়ে কি সব জলাবলি করছেন। আমরা কাছে আসতেই ওক লিজ্ঞাসা করেন আমরা ঠিক পথে চলেছি কি না। যে রাস্তা আমার মনে আসছিল ভেবেছিল লাহিড়ীবাবুর কথায় সেটাই আবার মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করে। পরে ওনলে এক লোকানীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল আমাদের আশঙ্কাই ঠিক, আমরা ভুল পথে চলেছি। একটও রাস্তা অনেক। কিন্তু ওনলে পরোক্ষভাবে সন্ধ্যের বিদ্যা বা অটো না পেয়ে আমরা হাঁটা পথেই যাওয়া ঠিক করে এগোতে থাকি। রাস্তার আলোয় হাঁটতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল।

রাত প্রায় দশটা বাজে হোটেলে ফিরতে। ঘরে ঢোকবার আগে বিমানকে বলি, 'কাল দুপুরের পর আমাদের ছেড়ে। অর্থাৎ ভোরে ওঠবার তাড়া নেই। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সবের ঐ বেরুতলিতে বসে আপনার সেই উপন্যাস বলা শোনা যাক। আমার প্রস্তাব বিমানের মনে ধরে। সীমা উৎসাহিত হয়ে বলে, 'তাহলে এখানে আপনার অন্তরে লুকোন ইচ্ছা অপিকাংশের ছেলেবেলার জানা পাবে'।

(ক্রম)

খাওয়া-দাওয়া সেরে সবার সেই জায়গায় আসতে প্রায় একঘণ্টা লাগে। কারুরের শেষ, ওপর কয়েকদিনের জ্যোৎস্নার রাতের বালুর সৃষ্টি আর সবই যেন ভেসে চলেছে। মনে হচ্ছিল চারদিক ঝাঁঝাঁয় যেমিল তারদের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গ একযোগে আমাদের ঘেরিন করে রেখেছে। মাঝে মাঝে ঘুরঘুর হাওয়া এসে আমাদের চোখে মুখে মিষ্ট পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল। সেন গাঁ ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরদে যেন এক ছোটদের দলের বিস্তৃত জোগে একদল চলিসী ছাড়ে কোন এক অজানি সন্ধ্যাবীর জীবনের মাঝের মধুর কাহিনী শোনা সবাই এক অভিনব উপলব্ধি।

বিমান আমাদের সামনের সিমেন্টের বেঞ্চটিতে এসে বসে। তার চোখেমুখে কেমন যেন উদাস উদাস ভাব। কিছুক্ষণের জন্য তার মুখে যেন কথা সরে না। মনে হল অতীতের কোন এক মধুর পথুরে সে ডুব দিয়েছে। যেখানে তার জীবনের কিশোর বিদেশ ঘটনাগুলি ছিঁড়ে ছুড়ে হয়ে ওর ধরে সাজান রয়েছে। আজ হয়ত সে তাদেরই কিছু কিছু তুলে ধরে দেখবে যে জীবনে পরম লগনের স্পর্শে সেও একদিন ধন্য হয়েছিল। কিন্তু বিমান কি তাকে ধরে রাখতে পেরেছিল? বিমানের মুখেই শোনা যাক। বিমানের মনের ভাব বুঝে আমরা নির্বাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কখনও বা নীল আকাশে ভাসমান চাঁদের ভাসায় সুতোকাটা সেই বৃদ্ধির সঙ্গে তার কিনিময়ে তংপর হই। এরই মধ্যে বিমানকে তরুণ থাকা উদাসী গলায় বলতে শোনা যায়, 'অনকবন্ধু, বিধি আমি জীবনে যে অধ্যায় পার হয়ে এসেছি তাকে কোনদিন কোন আলোচনায় বিষয়বস্তু করিনি বা সেরকম কোন আবেগও বোধ করিনি। সে একরাই আমার হয়ে আমার চেতনা অবচেতনার তাঁর ও গভীরায় নিবন্ধন সম বিয়ে এসেছে। কিন্তু এই ক'দিন আপনাদের আন্তরিক সাহচর্য, সহানুভূতিশীল মনের সংস্পর্শে সেগুলি হঠাৎ হয়ে আমার মনের কঠিন ধর্মটেপ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাই বাস্তবিক পক্ষে তাকে আপনাদের কাছে উন্মুক্ত করে আজ আমিও খানিকটা হাল্কা হতে চাই'। এরপর আরও একটু সময় নিয়ে সে শুরু করে'।

আমি খুব অল্প বয়সে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স' সহ বি. কম পাশ করে সি. এ পড়বার জন্য একটা নামকরা অডিটিংফার্মের সঙ্গে যুক্ত হই। তাদের আমার মননশীলতা ও দক্ষতার কর্মের কর্তৃপক্ষ বেশ খুশিই হয়েছেন বলে আমার মনে হত। অবশ্য কর্তৃপক্ষকে খুশি করার থেকেও সি. এ কোর্সে ভাল রেজাল্ট করবার তাগিদে অডিটের খুটিনাটি বিষয়ে আমি বিশেষভাবে মনোযোগী হতাম। ফলে আমার অডিট রিপোর্ট এত নিখুঁত ও তথ্যসমৃদ্ধ হত যে কোম্পানির সুনাম বাড়ত। দেখতে দেখতে সরকার আমদানিতে ক সাহায্য আমাদের কোম্পানিকে নিয়ে অডিট করতে শুরু করে। কর্তৃপক্ষ চৌধুরী সাহে খুবই উৎসাহি মানুষ। আমার প্রতি তার দুর্বলতা অবশ্যই কোনদিন তা প্রকাশ করেননি। আমিও তার মনবক্ষা করার থেকে কাজের প্রতি বেশি সতর্ক ছিলাম। যখ সময়ে সি. এ ফাইনাল পরীক্ষার ফল বেরোতে দেখা গেল আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকা করেছি। অফিস, বন্ধুমহলে ও আত্মীয়স্বজনের কাছে আনন্দের জোর হাওয়া এক ধাক্কা অনেকখানি বেড়ে গেল। কর্তৃপক্ষ খবরটা আগেই পেয়েছিলেন। আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠিয়ে তার খুশির খবর জানিয়ে আমাকে অভিনন্দিতও করেছিলেন তিনি এর বেশি কিছু নয়। হাজার হলেও আমি একজন কর্মচারী, কারুরও পরিচালক নই, কেই কিছু করলে হয়ত প্রশ্রয় পেয়ে যেতে পারি। চৌধুরী সাহেবের মনের ভাব বুঝে আমি চাকুরির সন্ধান করতে থাকি। একদিন স্টেটসম্যানে এক নামকরা বিদেশি কোম্পানিতে সি. এ পোস্টে আবেদনপত্র ছেড়ে বিজ্ঞাপন দেখে আমি একটা দরখাস্ত জমা দিই। দিন পনের পর না হতেই আমার কাছে ইন্টারভিউ লেটার চলে আসে। তাদের দিন আমি মুচিব একজনা দরখাস্ত নিয়ে সাহেবের ঘরে নিয়ে তার টেবিলে রাখি। দরখাস্তখানার চোখ বোলাতেই সাহেব যেন চমকে ওঠেন। চোখ দুটি তুলে আমার চোখের উপর রেখে বলেন, 'বিকাশ, তোমার উপর আমার অনেক আশা যোগ্যতা অনুযায়ী ভাল মাইনের চাকুরির হয়ত তোমার হয়ে যাবে। তবে ইন্টারভিউ এই কোম্পানির ভাল দরও তোমাকে দেখতে হবে। আমার ছেলে কোনদিন ফে ফিরে এই প্রতিষ্ঠানকে দেখবে কি না সন্দেহ। নিজের হাতে তৈরি এই প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার ভাতের ঘুম চলে যায়। চৌধুরী সাহেবের কথায় আমি কেন অবাক হই, তার মত লোকের মুখে যে আমি এতখানি দাম করে নিয়েছি তাকেই আমার সারা দেহ-মনে শিহরণ খেলে যায়। আমার মনের ভাব বুঝে তিনি বলেন, 'আমার কথার অবাক হচ্ছ তাই না। তবুও তোমাকে কথা দিতে হবে'। চৌধুরী সাহেবের কথায় আমার চেতনের চাপা ক্ষোভ নিমেষে বিলীন হয়ে সেখানে তার প্রতি নমনীয় শ্রদ্ধার ভাব ফুটে ওঠে। আমি চোখ দুটি নামিয়ে বলি, 'ইন্টারভিউ দিলো

চাকুরি হবে বলা যায় না। আর হলেও আপনার কথা আমার মনে থাকবে'। আমার কথায় তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমার পিঠ চাপড়িয়ে তিনি বলেন, 'জেন্টে হবে মান, চাকুরি তোমার হবেই আমি বলে দিচ্ছি'।

(পাঁচ)

ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে আমি হাজির হতেই জেন্টে'র চেয়ারম্যান উইলিয়াম প্যাটারসন আমাকে বসতে বলে জিজ্ঞাস করেন, 'তুমি তো মি। চৌধুরীর কার্ডে হাত করছ। তোমার জন্য তিনি দারুণ সুপারিশ করেছেন। তুমি পাশের ঘরে অপেক্ষা কর। এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা রেডি হলে নিয়ে যেও'। মিঃ প্যাটারসনের কথার আমি ইতিমধ্যে তাজ্জব বনে যাই। চৌধুরী সাহেব আমার জন্য জোর তদবির করেছেন। অবশ্য চাকরিতে তার কর্মও আমাকে দেখতে হবে বলেছেন। আমি ভাবতে পারছিলাম না। নিজেকপাত্রকানা হাতে আসতেই আমি সোজা চৌধুরী সাহেবের ঘরে এসে তাঁকে ধন্যবাদ জানি। তিনি মু'হাতে আমাকে টেনে তুলে বলেন, 'এই ভাল হল', তাকিয়ে বসি মেয়ে বিগলিত তার চোখ দুটি যেন ঘাস হল করছে। আমি বলি, 'এ চাকুরি তো আপনার জন্যই হল'। আমার কথায় চৌধুরী সাহেব খুশকের সুরে বলেন, 'কে বলেছে'। আমি প্যাটারসনের নাম করতে তিনি বলেন, 'প্যাটারসনটা অত্ত আস্যাকুক'। পর মুহূর্তে তিনি বলেন, 'তুমি তো জান জেন্টে ভবন, ছুটির পর আমার অফিসে আসবে, আমি অপেক্ষা করব'।

পরদিন সেই চাকুরিতে জোন দিতে আমার জন্য গাড়ি এবং ওয়েল ফার্নিশড কোয়ার্টারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং চিফ অব ফাইনান্স এন্ড এ্যাকাউন্টস মিঃ নরীম্যান এবং মিঃ ফেড্রিল আমার জয়েনের উপর একটা ব্রিফ দেন। ছুটির আধঘন্টা আগে বেয়ারা ড্রাইভারকে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ছুটির পর লিফটে নিচে নামতেই ড্রাইভার সেলাম ঠুকে আমাকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসায়। আমি সোজা অফিসে এসে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়ে বলেন, 'চল আইবে কথা হবে'। বাইরে এসে আমি গাড়ি এনেছি দেখে তাতেই উঠে পড়েন, নিজের গাড়ি ছেড়ে দেন। তার মত একজন অভিজাত ব্যক্তির ঐ কাণ্ড দেখে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। সামনে আরও কি অপেক্ষা দেখবার জন্য অপেক্ষায় থাকি। চৌধুরী সাহেবের নির্দেশ মত গাড়ি এগিয়ে চলে। চৌধুরী সাহেব এক সময় আমার দিকে ফিরে বলেন, 'এর আগেই তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও নিইনি, কারণ পরে তোমার কোন অসুবিধা হয়'। চৌধুরী সাহেবের কথা শেষ না হতেই গাড়ি তার বাড়ির গেটে এসে দাঁড়ায়। পাঁচিল ঘেরা বিশাল কম্পাউন্ডের ভেতর রাজপ্রাসাদ বাড়ি। বারোয়ান অন্য গাড়িতে প্রিন্সকে দেখে একটু অবাক হলেও তাড়াতাড়ি সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দেয়। ভেতর জগতে গাড়ি আসতেই প্রায় প্রত্যেকে ভেতর থেকে ছুটে এসে একটা গাড়ির কাছে এসে থমকে যায়। পরমুহূর্তে চৌধুরী সাহেবকে ভেতরে দেখে দরজা খুলে পাশে এসে ও দাঁড়ায়। আমি অবাক পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসি। চৌধুরী সাহেব নেমেই যেন খুশির মেজাজে আমাকে দেখিয়ে সেই তরুণীকে বলেন, 'তিয়াস, এই সেই তিয়াস সেন। প্রিন্সিপাল কারিবার, একটি বিখ্যাত মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির চেয়ারম্যান চিফ অব ফাইনান্স এন্ড এ্যাকাউন্টস। আমাকে যথেষ্ট রিস্পার্ট করে। অফিসের পর দেখা হতে ওর গাড়িতেই চলে এলাম। তরুণী দুই হাত এক করে আমাকে নমস্কার জানাতে আমিও প্রতি নমস্কার জানাই। এরপরও চৌধুরী সাহেব আমার মনে একটা বিস্ময়ের জন্ম দিয়ে ভেতরে চলে যান। আমি যে তার কর্মচারী ছিলাম একবারও তিনি ভেবে দেখেন কেন বুঝলাম না। এরপর আমার দিকে ফিরে তিনি বলেন, 'তিয়াস, আমার ভেতরে, এ ছেলে আলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনমিক্সে এম. এ পাশ করেছে'। তিয়াসকে একবার দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। চৌধুরী সাহেব তিয়াসকে বলেন আমাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করতে। উনি ফ্রেশ হয়ে আসবেন। তিয়াসের পরনে সেই প্রথম অনুভূতি একবার অবসর মুহূর্তে আমার কানে বাজে। টানা টানা দুটি আয়ত চোখের গভীরে যেন কোন যুগের জগতের হাতছানি। ফৌজদারিনে চুলের দুই একটি লম্বা কপাল ও কানের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার মুখমণ্ডলের সুন্দর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য যেন শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত তার উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আমার দিকে নিবিষ্ট করে তিয়াস বলে, আসুন বিভাসবাবু'।

তিয়াসকে অনুসরণ করে ওদের ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করি। বিশাল ড্রয়িংরুমের দেওয়ালগুলিতে চৌধুরী পরিবারের উর্ধ্বতন কয়েকপুরুষ ছাড়াও দেশ বিদেশের অনেক ঐতিহ্যের তৈলচিত্র শোভা পাচ্ছিল। মেঝেতে, কোথাও উচু জমিতে মূল্যবান কার্পেটের আসবাবপত্রে পরিপাটি সাজানো-গোছানো ড্রয়িংরুমটির প্রতিটি জিনিসেই অভিজাত্যের ছাপ ছিল। তিয়াস আমাকে ঘরে বসিয়ে পাখা চালিয়ে দিয়ে বলে, 'আপনি বসুন। আমি ফোন ডিরেক্ট পাইয়ে দিচ্ছি'। টেবিলের উপর অনেকগুলি ম্যাগাজিন থেকে তার একটা টেনে নিয়ে আমি বলি, 'ও ঘরের দরকার নেই, সময় কাটানোর মত জিনিস আমি পেয়ে গেছি। বরং আপনার তাড়া থাকলে আমিযাব না'। এই কম সময়ের মধ্যে আমি লক্ষ করেছিলাম তিয়াসের চলাফেরা এবং কথার মধ্যে যেমন মার্জিত রুচিবোধ তেমনি ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিদ্যমান। আমি এও দেখলাম আমার কথা বলার সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ায় সে যেন আহত স্বরে অস্বাভাবিক যেন কারণ জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে, 'না, ...সাহেবব্, আমার কোন তাড়া নেই, আমি এখানেই আছি'। কথা কটি বলেই সে ... হয়ে' বলে পরীর অন্তঃ আড়াল পালায় চলে যায়। তার গলার স্বরে এমন একটা মাদুর্য ছিল যা মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণন তোলে। মুহূর্তের মধ্যে চোদ্দ পনের বছরের একটি ছেলে সেখানে চলে আসে। তিয়াস তাকে কি নির্দেশ দিতে সে বেরিয়ে গিয়ে একখানা ট্রে হাতে ফিরে আসে। তিয়াস নিজের হাতে ট্রে থেকে সরবতের গ্লাস এবং বিস্কিট প্লেটখানা আমার সামনে রেখে অনুপম লাবণ্যের সঙ্গে মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত মুখখানা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে বলে, 'অফিসের পর এসেছেন, সামান্য এই জলযোগটুকু সেরে নিন'। কিন্তু ঐ 'সামান্য জলযোগ' আমার কাছে অসামান্যরূপে দেখা দেয়। তার চোখের উপর চোখ দুটি রাখতেই পলকের মধ্যে আমাদের উভয়ের চোখে কি এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যায়। আমি কিছু ভাববার আগেই দেখি তিয়াস সেখানে নেই। কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই বিদ্যুৎ তরঙ্গের আকস্মিক আঘাতে আমি যেন কিছুক্ষণ হতে পড়ি। জলযোগের কথা বেমালুম ভুলে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যে চৌধুরী সাহেব সেখানে এসে পড়েন। আমার তখনও জলযোগ হয়নি দেখে তিনি কি একটু ভেবে তিয়াসকে ডেকে বলেন, 'দিঃ মা, কাউকে আপ্যায়ন করে আনতে হলে তুমি জান না'। অপরাধবোধে তিয়াসের নির্বাক হয়ে যায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, 'স্যার উনি তো এখানেই আছেন'। পলকের জন্য চোখ তুলে দেখি তিয়াস আমার কথা শুনছিল, চোখেমুখে তার কৃতজ্ঞতার লোভনা।

বিশ্বরঞ্জন চৌধুরী আমার সামনে একখানা সোফায় এসে বসেন। চোখে মুখে তার খুশি যেন উপচে উঠছিল। আজ অফিসের সেই জাঁকালো চৌধুরী সাহেব নন, ঘড়ির কাঁটা, কাজের মত একেবারে কাজের মানুষ হয়ে তিনি কথা বলছিলেন। নিজের সংগ্রামী জীবনের বিচিত্র ঘটনার কথা শোনাতে শোনাতে তিনি যেন মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। তিয়াস মাঝে মাঝে সেখানে এসে কফির পাশের সোফাখানায় বসছিল। কফির ট্রেতে করে আবার কি সব আনতে তিয়াস তার থেকে স্যান্ডউইচের ডিসগুলি আমাদের সামনে রেখে গট থেকে কফি ঢালতে থাকে। মনে হল বিশ্বরঞ্জনবাবুর আজ কি যেন পেয়ে বসেছে। তিনি সমানে গল্প করে চলেছেন। তিয়াস একবার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাবা, তোমার এ গল্প আর কতদিন শোনাবে'। পর মুহূর্তে আমার দিকে তার স্নিগ্ধ দুটি চোখ তুলে বলে, 'জানেন বিভাসবাবু, বাবার মনের মত কাউকে পেলে হল'. গল্প শেষ হয় না পর্যন্ত তাকে বসে থাকতে হবে। দিন আরও আরও অনেকক্ষণ থাকতে হবে, খালি পেটে ভাল লাগবে না'। এরপর কথাকে সে আপাদা দেয়। চৌধুরী সাহেব এক পিস স্যান্ডউইচ মুখের কাছে আনতে আনতে বলেন, 'মাঝ মা, আমার জীবনের ঘটনাবলী তোর কাছে পুরনো হলেও বিভাসের কাছে একেবারেই নতুন। ওর হয়ত খারাপ লাগবে না'। 'কি বল বিভাস' বলে তিনি আমার দিকে তাকান। মেয়ের মায়ায় আমি তাকে কাকাবাবু বলে সম্বোধন করে বলি, ' জীবনে কত বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আজ আপনি এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন তাকতেও রোমাঞ্চ লাগে'। আমার মুখে কাকাবাবু ডাক শুনে বিশ্বরঞ্জনবাবু গল্প করতে আরও উৎসাহ বোধ করেন। তাবপর আর স্টেক একদিনেই শেষ করে দিলে এরপর কখনও এসে পুনরাবৃত্তি ভাল লাগবে না। তাই কফির কাপ শেষ হতেই আমি বলি 'কাকাবাবু, এখন আমাকে উঠতে হবে, পরে কখন এসে আপনার আরও সব ঘটনা শুনব'। আমার কথায় চৌধুরী সাহেব ধমকের সুরে বলেন, 'আজ কখনও কি, সময় পেলেই আসবে'। আমি দরজার দিকে এগোতে 'আফি'। ফিরে দেখি তিয়াসও আমার পেছন পেছন আসছে। গাড়িতে ওঠবার মুহূর্তে তিয়াস তার আয়ত চোখের দৃষ্টি তারা আমার চোখের উপর স্থির রেখে বলে, 'আজ তো আব্বার সঙ্গে গল্প করে তার বিভিন্ন সব অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে গেলেন। আব্বার আসলেন তখন আপনার গল্প শুনব'। গাড়িতে

ভয়ের ভয়ের আমি ওর কথার উত্তরে বলি, 'সে কথা আজ থাকবে কি না সন্দেহ আছে, যদি আজকের পর মেয়ের পাশেই আমার কাছে থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে'। আমার কথায় তিয়াসের সুন্দর মুখখানায় লাল আভা ফুটে ওঠে। সলজ্জ হাসিতে সে সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে সে বলে, 'বেশ তাই হবে'।

গাড়ি চালাতে শুরু করে, আমিও তিয়াসকে ভালো দেখা, তার চলাফেরা, কথাবার্তা, এমন কি উত্তরের সেই চোখ ঝলসে দেওয়ার মতো যে বিদ্যুৎচমক খেলে তার একটু একটু করে বিন্দু আকারে আকারে এক সময় তিয়াসের কাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। তিয়াসের সৌন্দর্য দেখবার চেয়ে যেন আমাকে পেয়ে বসে। মনে মনে তাবি তিয়াস সত্যিই সুন্দর। কতক্ষণ তার ধ্যানমগ্ন ছিলাম মনে নেই। হঠাৎ ড্রাইভারের গলায় শুনতে পাই, 'স্যারের ঘর এ আসা'। কোম্পানির ফ্ল্যাটে একদিনও নিজে বসিনি। কেন এক দুটির দিনে করব ভেবে রেখেছি। ড্রাইভারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিই।

গ্রামে কেন কয়েকদিন কেটে যায়। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা হলেও অফিসে আর যেতে পারিনি। এদিকে নতুন অফিসের কাজের সঙ্গে পরিচিত হতেও সময় কিভাবে চলে যায় বোঝার আগে না। সেদিন একটা জরুরি ফাইল খুলে বসেছি তখন ফোন বেজে ওঠে। রিসিভার তুলে কানে লাগাতেই মনটা ফুরিয়ে যায়। ওপার থেকে ভেসে আসে সেই সুরেলা পলা অভিজ্ঞেগ আসে আমি সেদিনের পর আর কোন যোগাযোগ করিনি বলে। আমার অসুবিধার কথা জানতে সে অফিস সেবিকা ওদের ওখানে ঘুরে যেতে অনুরোধ জানায়। আমি কথা দিই।

তিয়াস হয়ত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়ি সদর ফটকে থামা হতেই সে ছুটে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। সেদিনের থেকে আজ ওকে অনেক চঞ্চলা লাগছিল। খুশির আবেগে সে আমাকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে নিজেও পাশে বসে নতুন অফিসের খোঁজখবর নিতে থাকে। আমি ফোম্পানির ফ্ল্যাটে শিফট করব শুনে বলিনি, ঐরিফ ও সাদে কে কে থাকবে জিজ্ঞাসা করে। কোম্পানির একজন কর্মচারীসহ জনাকয়েক চাকুরে থাকবে শুনে আপত্তি না থাকলে সেও যেতে পারে জানায়, কারণ আমার থাকা ঠিকমত হচ্ছে কিনা সরজমিন হবে কিনা তার মনে সন্দেহ আছে। বিজ্ঞান চৌধুরীর একমাত্র আদুরিনী কন্যা আমার ফ্ল্যাট সাজিয়ে তছিয়ে রেখে আসি ভয়েও ভাবতে পারি না। আমি তাকে বলি, 'আমি পারব না, কিন্তু আপনি পারলেন কি করে সেও তো ভাববার বিষয়'। আমার কথা শুনে সে মৃদু হেসে বলে, 'ওটা তো মেয়েদের সহজাত নৈপুণ্য'। আমি বেশ খুশি হয়ে বলি, 'তাহলে সামনের রবিবার ছুটির দিনে কাজটা সেরে ফেললে হয়ে। আমার কথা শেষ না হতেই চৌধুরী সাহেব ঘরে ঢোকেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কি নেয়ে ফেলবে বিয়াস'। আমি বিন্দু বলবার আগেই তিয়াস বলে, 'বাবা উনি সামনের রবিবার ফোম্পানির ফ্ল্যাটে শিফট করবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু আমার বান্ধবী ফ্ল্যাট সেভাবে সাজান ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তিয়াসের কথা লুফে নিয়ে চৌধুরী সাহেব বলেন, 'বেশ তো, তাহলে তুমিই না হয় গিয়ে ওকে সাহায্য করবে'। তিয়াস বলে, 'আমি সেই কথা আগেই বিজ্ঞানকাকুকে।

রাতে বিছানায় শুয়ে যতবার ঘুমোবার চেষ্টা করেছি তিয়াসের মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমাকে আলমনা করে তোলে। দুদিন পরেই সেই নির্ধারিত দিনটি এসে যায়। ব্রেকফাস্ট করেই আমি গাড়ি নিয়ে তিয়াসদের বাড়ির দিকে ছুটি। তিয়াস তৈরি হয়েই ছিল। আমি যেতেই সে গাড়িতে উঠে আমার পাশে বসে। তিয়াসের চোখের কোরল ঠোঁটের চাপ থেকে তারি সুন্দর একটা মিষ্টি সুবাস এসে আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে তুলছিল। ওকেও যারপর নাই সাবলীল ও স্ফূর্তিবাজ বলে মনে হচ্ছিল। পাঁচ-ছ'খানা ঘরের বিশাল ফ্ল্যাট দেখে তিয়াস বেশ খুশি হয়। কোন ঘর কি কাজে ব্যবহার করা হবে ঠিক করে সে লোকজন নিয়ে সাজাতে শুরু করে। আমি ওর উৎসাহ দেখে মুগ্ধপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হই। ঘর সাজাবার কাজ শেষ করে একসময় সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি ওর চোখের উপর চোখ দুটি রেখে বলি, 'ঘর তো প্রবিষ্টের রূপ নিল, কিন্তু সেই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হল কই'। এই শূন্য মন্দিরে তো টাকিয়ে উঠতে হবে'। তিয়াস বোধহয় এই কথা কটি শুনবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। চোখে মুখে তার আনন্দের ঝিলিক খেলে গেলেও বাম পড়ার ভয়ে সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'পুরুষের কাছে সে কি খুব একটা কঠিন কাজ। একবার ঘুম ভাঙুক তারপর, কত এসে হাজির হবে'। ওর কথার আমি যেমন যেন হয়ে যাই। বলেই ফেলি না তিয়াস, খুব ঘুমে বলবার মত সাহস আমার নেই'। তিয়াস উত্তরে বলে, 'তাহলে সাহস না আসা পর্যন্ত শূন্য মন্দিরে তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে'। কথা বলতে বলতে তিয়াস আমার দিকে আসতেই আমি ওর হাত দুটো ধরে আমার কাছে নিয়ে এসে বলি, 'তোমার ধৈর্যের কি মাপ আছে জানি না তিয়াস, মুহূর্তে আমি কী ভাবে এর সাজানী হলাম খুজে পাই না'। তিয়াস কোন জবাব না দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি ওর হাতদুটো ছেড়ে দিয়ে বলি, 'কৌতুকের মাথায় হয়ত তোমাকে অসম্মান করেছি ; আমাকে পারতো ক্ষমা করো তিয়াস'। আমার কথায় তিয়াস খুব সহজ হয়ে বলে, 'এই মনে তোমার সেই সাহস উবে গেল কিভাবে'। আমি বলি সে সাহস তো তুমিই জুগিয়েছিলে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিয়াসকে নিয়ে আমি পার্ক হোটেলে লাঞ্চ সেরে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিই।

৮৮

তিয়াসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ওদের বাড়ি থেকে এর জন্য কোন প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি হয়নি। মাঝেমধ্যে একদিন আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কটাকে ওদের বাড়ি থেকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসেন কোন বুজুর্গজনের সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে হয়।

ছিয়ের পর আমার একার নিজস্ব কতগুলি কাজ ছাড়া বাকি সব কিছুই তিয়াস নিজের হাতে তুলে নেয়। ফলে সংসার তথা আমার নিজের খোরাকও সে অনেকখানি ছাড়া করে দেয়। ছুটিটাকে আসবার আগেই সেভাবে কিভাবে সাজাবে ঠিক করে রাখও সুন্দর পরিচ্ছন্নভাবে তিয়াস ভরে রাখে। অফিসও এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতাম না। তিয়াস আমার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অফিসের কাজে আমার মনোযোগ ও একাগ্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় প্রতি মাসেই অফিসের কাজ নিয়ে আমাদের ঢাকায় যেতে হত। তিয়াসকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাকেও সঙ্গে নিতাম ঢাকাতে মৃদু-মুদ্রণ ঘরে আমি অফিসের কাজে পেতাম। সেই সব জায়গায় আমি অবসর সময়ে তিয়াসকে নিয়ে দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতাম। বিয়ের পর এভাবে খুশির আমেজে পাঁচটা বছর কেটে যায়। এর পরই একদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে টিভির সামনে বসে এক আত্মীয়ের দেখছিলাম এমন সময় তিয়াস এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। বিন্দু কারণে বিয়েও যেন সাজতে পারে না। চোখ মুখ তার লজ্জা মেশানো আভা ধরে। আমি ওর চোখের উপর চোখ দুটি রেখে বলি, 'বিন্দু যে কারণে মনে হচ্ছে। তা বল, শোনা যাক'। তিয়াস আমার কথায় বলে, 'তোমার শোনবার মত সময় আছে'? একথা বলেই ও হাতঘড়ি ধরে টেনে এনে আমার চোখে ধরিয়ে 'আমার সময় নেই'। বলে চুমুতে চুমুতে আমির করে তুলি ওকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি আবারও তিয়াস বলে, 'তুমি জীবনভর আমাকে এমন করে আদর করবে তো আমি বলি, 'একশ বার'। তিয়াস বলে, 'সে কথাই তো বলতে এসেছিলাম কিন্তু বলতে পারলাম কই।' ওর কথার ধরন কেমন যেন অন্যরকম মনে হওয়া আমার কৌতূহলেও ঘাড়ে। আমি উৎসুক দৃষ্টিতে ওর মুখের উপর তাকাতে সে ধরে 'আমাদের আলোআলায় একজন তাশিরার আসছে'। এই কথা শোনামাত্র আমি দুহাতে তিয়াসের কোমর বেষ্টন করে ওকে তুলে ধরে ওর কপালে, ওঠে চুমু খেয়ে বলি তিয়াস একজন সত্যি সত্যিই আমাদের বিবাহিত জীবন পূর্ণতা পেল'।

মেয়েদের মেজাজ তিয়াসের শরীর ভারি হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও প্রথম দিকে দু এক মাস সে আমার সঙ্গে যাইবে গিয়েছিল। কিন্তু পরে তবে এবং বাড়ির লোকে আপত্তির কারণে সে কোন বিশ্বাসিনের জন্য আমার সঙ্গিনী হতে পারেনি। সে বিদেশিতে আমিও যাইবে বেরোবার কোন চার্ম পেতাম না। কয়েক মাস পরে আমাদের জীবনে খোলাপ ফুলের মত একটি কন্যা সন্তান দুলে করে নিল। আদর করে আমার শ্বশুর তার নাম রাখলেন বিয়াস। তিয়াসকে পেয়ে তিয়াস তাকে নিয়েই মেতে থাকে। দিন রাত যে কীভাবে পার হয়ে যায় সে খেয়ালও তার থাকে না। অফিসে কাজ যতো একবার যাইবে হাওয়ার প্রোগ্রাম থাকলেও আমার কথা ভেবে তিয়া তখন থেকে আমাকে আর সঙ্গ দিতে পারত না। আমিও আর জোর করতাম না কিন্তু বিয়োগ বিচ্ছেদে একা একা কতদিন আর লাগে। যদে আমি ঐ সব জায়গা পাটি বা ক্লাবে আওয়ার নিয়মন পেলেও হতো সম্ভব পরিবার করে তিয়াসকে নি খুশিমত ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু তিয়াসের অন্তরে সেভাবিতেই সময় কাটানর উপযু অবলম্বন ছন করে থাকতে বাধ্য করলাম। ক্লাব, পার্টির তাগিদ যেন আমাকে সঙ্গেনিত হতে থাকে। ফলে ছুটিতে কেন কলকাতাতেও কেন কোনদিন অফিসে পর আ ছুটির দিনেও অনেকের চোখে ধা ভাসিয়ে দেওয়ার মত উপকরণ, আমা

আসতে আসে। অফিসের পর ফিরতে দেরি হলে এবং দুটির দিনে বেড়াতে গেলে তিয়াস প্রথম প্রথম বিরক্তি প্রকাশ করত। পরের দিকে সেসবও ছেড়ে দিয়ে তোমন যেন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে যেত। ধীরে ধীরে বিয়াস বড় হল। তার স্কুলে ফলাফলের পাঠ শেষ হতে তাকে পায় পেতে বিরোধ হয়ে গেল। কিন্তু সেই তিয়াসকে আমি আর ফিরে পেলাম না। তিয়াস হওয়ার পর তার শরীরের দুর্নিবারতি অসুবিধার কথা আমাকে বলত। ডাক্তার বৈদ্যও কম দেখান হয়নি। কিন্তু সেরকম কোন কারণ হয়নি। খানিকটা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের আশায় আমি কয়েকবার তাকে জোর করে ঘুরতে নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু সেসব জায়গায় নিজেও সে ঘর থেকে বেরোতে চাইত না। অনেক সময় আমাকে একাই ঘুরতে হত। হয়ত এতদূরে ঘরকুনো হওয়ার জন্যে তিয়াসের মধ্যে হতাশবোধের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। একটু এদিক ওদিক করলেই তার মুখের মাংস থরথর করত। কিন্তু নিয়মিত ওষুধ-দাওয়া যা ইঞ্জেকশন সে কোনটাই করতে না। ফলে এই রোগ তার মধ্যে প্রকট হয়ে থাকে। এইভাবে নিজের খেয়াল খুশি মত চলার জন্য আমিও ক্রমশ তার প্রতি উদাসীন হতে থাকি। কিন্তু সেদিন আমি সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরে দেখি তিয়াস বিছানার ওপর আছে। মুখখানা মলিন, শরীরও যেন দুর্বল মনে হল। কোনমুখ ছেড়ে আমি ওর পাশে গিয়ে বসে কপালে হাতখানা রেখে আঁতকে উঠি। মনে হল একখানা গরম চাটুর উপর হাত রেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে তোমন ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাই। তিয়াস দুর্বল কণ্ঠে বলে, 'ডাক্তারের দরকার নেই'। আমি ওর হাতখানা টেনে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তাকে বলার জন্য বলি, 'আমাকে এভাবে শাস্তি দিয়ে তুমি কি আনন্দ পাও বলতে পার তিয়াস'। মনে মনে তিয়াস কী না বলল, 'ও কথা আসে কেন, তুমি কি জান অন্যায় করেছ'। আমি তখন বলি, 'তাহলে এখন থেকে আমার কথামত চলবে বল'। তিয়াস আমার কথার চোখ দুটি হল হল করে আসে, 'হ্যাগো, আমার ভয় হয় তুমি হয়ত কোনদিন ফিরে এসে দেখবে অন্ধেরে আমি মরে একা পড়ে আছি'। আমি তিয়াসের মুখখানা চেপে ধরে বলি, 'কের যদি এরকম শুনি আমি ঘর থেকে বেরুবও বেরোব না'। তিয়াস তার দুর্বল হাতে কোনরকমে আমার হাতখানা ধরে বলে, 'নাগো আমার উপর অভিমান করে তুমি নিজেকে কষ্ট দিও না'।

তিয়াসকে সুস্থ করবার জন্য ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী সবরকম ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও কারুর কাজ কিছুই হল না। ক্রমশই তার শরীরের ওজনটি কমতে থাকল। একবার ঘাইরে বেড়াতে গিয়ে কোন এক রিউনিয়নে এক অ-জরুরি অভিজাত মহিলার হাতে বেল জনকয়েক সৃষ্টি কমন দেখে তিয়াস বলেছিল, 'আমি ঠিক এরকম সৃষ্টি জনাব'। কিন্তু প্রার্থনায় ওকে নিয়ে নানা চিন্তায় সে আর হতে ওঠেনি। সেদিন অফিসে যেতেনের আগে তিয়াসের হাতখানা টেনে নিয়ে ওর শারীরিক অবস্থা বুঝতে গিয়ে সেই কতন জোড়ার কথা আমার মনে পড়ে যায়। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবার সময় পি সি চন্দের মোকান থেকে আমি অফিকল সেই কতন জোড়ার মত এক জোড়া কিনে নিয়ে আসার সিদ্ধি। নিয়মমত তিয়াসকে দেখবার সময় ওর হাত দুখানা টেনে নিয়ে সেই কতন জোড়া পরিয়ে দিতেই সে হাত দুখানা টেনে নিয়ে বলে, 'একি করলে। এই মসৃণ শরীরে আমাকে নতুন গয়না পরিয়ে দিলে'। ওর কথায় আমি স্তিমিত হয়ে বলি, 'তোমার এসব শারীর নিয়ম আমার জানা ছিল না। আজ বেরবার সময় সেই কতনের কথা মনে পড়তেই আমি আর দেরি করিনি'। আমার মনের ভাব বুঝে তিয়াস করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ক্ষীণ গলায় বলে, 'ওগো আমি মৃত্যুতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করো'। তারপরেই হাত দুখানা তার চোখের সামনে এনে কতন জোড়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঠিক সেইরকম। কোন ভেদে আনলে গো'। তিয়াসের কথা শুনে ওর উপর মনের সবরু গ্লগ গলে জল হয়ে সেখানে অনুকম্পা জেগে ওঠে। আমি বলি, 'পাগল হয়েছ তো'। ও সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে'।

কেন কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন ছিল শনিবার। অফিসের পর আমি ঘরায় এসে প্রতিদিনকার মত তিয়াসের বিছানার পাশে বসে ওকে কেন নিয়ে বলি, 'কাল রাতনজ্যারুকরে আমাদের ক্লাবের একটা ফাংশন আছে, যাব কিনা তাবছি'। তিয়াস সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'যাবে না কেন, নিশ্চয়ই যাবে, নইলে ঘরেতে আমার পাশে থাকতে থাকতে তুমিও অসুস্থ হয়ে পড়বে'। আমি ওর কথা শুনে বলি, 'না তিয়াস, তোমাকে এই অবস্থায় কেন যাওয়াটা কেন হয় ঠিক হবে না'। তিয়াস আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে বলে, 'আমি বলছি, তুমি যাবে। আমাকে নিয়ে অত ভাবতে হবে না'।

পরদিন ভোরে উঠে দেখি তিয়াস বিছানায় নেই। অবাক হয়ে ওর খোঁজ করতে গিয়ে দেখি ও রান্নাঘরে ঠাকুরকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি ওর কাণ্ড দেখে বিস্ময় হতে ও আশ্বাস দিয়ে বলে, 'তয় পাচ্ছ কেন, চুকাদাকে কাজের মধ্যে আজকে শরীর খারাপ থাকে। ওর কথায় আমিও মনে একটু জোর পেলাম। তৈরি হয়ে ডাইনিং টেবিলে এসে দেখি তিয়াস আমার সামিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি বসতেই সে নিজ হাতে আমাদের প্লেট এগিয়ে দিয়ে পট থেকে কফি ঢালতে থাকে। আমি ওর দিকে চেয়ে বলি, 'তোমার অসুস্থতাকে দেখে আজ আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি'। আমার কথায় ও বলে, 'অবাক হওয়ার কি আছে। অনেকদিন নিজের হাতে তোমাকে ব্রেকফাস্ট করতে পারি না। তোর হতে সে কথা মনে হতেই উঠে পড়েছি'। এর পর আমার মুখ থেকে কোন কথা সরে না। আমি এক মনে ওর তৈরি ব্রেকফাস্ট শেষ করে উঠে পড়ি। অন্যদিন বেরোবার সময় আমি বিদায়ের দিয়ে তিয়াসের কাছ থেকে বিদায় নিতাম। আজ দেখি ও দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তিয়াসের এর উদ্বেগ দেখে সত্যিই আমার অন্তর কাপে। বেরোবার সময় ওকে শরীরের উপর বেশি ধকল না দিয়ে বিশ্রাম নিতে বলে ওর কাছে বিদায় নিই।

জয়নগরজায়রাতে মন্ত্রিবরের স্বপনবাড়ি সেদিন মহাউৎসবে মেতে ওঠে। কলকাতা থেকে হাই সোসাইটির অনেক মেয়ে যেমন মিস পলি, মিতি, লিলি সহ কেন কয়েকজন অই এ এস অফিসার, স্থানে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের টপ অনেক লক্ষিক সেখানে হাজির ছিলেন। দুইদিন পূর্বে নয় শরীরে সাঁতার কাটা থেকে ড্রিঙ্ক, ডান্স এবং পছন্দসই নারী-পুরুষ জুটি ঠিক করে বাগানবাড়ির আনাচে-কানাচে রিলিজ হয়ে স্ফূর্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেওয়ায় কেন বাধা নিষেধ ছিল না। এমন জায়গা আসর ছেড়ে আসতে অনেকেরই মন চায় না, ফলে ওখান থেকে বেরোতে কেন রাত হয়ে যায়।

রাত তখন প্রায় আড়াইটার কাছাকাছি। আমি গাড়ি থেকে নেমে টলতে টলতে কোনরকমে উপরে উঠে বাসিং বেলে হাত রেখেছি দরজা খুলে যায়। দেখি আশপাশের ফ্লাটের কয়েকজন মহিলা ঘরের মধ্যে বসে। ছাপাবাটা কুকে উঠতে না পেরে লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সে ফুকরে ওঠে বলে, 'আবু নাইজী নেই'। ওর কথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে। এক ঘুটে তিয়াসের নিয়ানাথ গিয়ে আছড়ে পড়ি। চোখ মেলে ওকে দেখে মনে হল পরম শান্তির মাঝে নিমীলিত চোখে তিয়াস শুয়ে আছে ; জাগতিক কোন ভাব তাকে সেখানে গিয়ে তাকে আর বিচলিত করতে পারবে না। পরে শুনলাম আমি বেরিয়ে আসবার পর তিয়াস বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। দুপুরে খাওয়ার জন্য ঠাকুর ডাকতে এলে জানায় তার খিদে নেই। ঠাকুর ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়ার কথা বললে সে নিষেধ করে। বেলা চারটের পর তিয়াস ঠাকুর চাকরদের ডেকে বলে, 'তোরা ডাক্তারে যেকিস। আমি চলনুম'। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হয়। তিনি এসে নাড়ি পরীক্ষা করে বলেন, 'সব শেষ'।

পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। তার রুপালী আলোর ঢেউ কেন ধূসর হয়ে আসছে। বিছানার আমি পাঁজর ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, তার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় তার স্বগোক্তি, 'দিদি তিয়াস সেদিন চলে যাবে জেনেই কি নিজ হাতে খাবার তৈরি করে আমাকে খাইয়ে, পরদার সামনে দাঁড়িয়ে বিদায় জানিয়ে গেল? কিন্তু...'

আমাদের উঠতে দেখে বিছানাও উঠে পড়ে। মন খারাপ হয়ে যেতেনের দিকে হেতে যেতে সে বলে, 'তিয়াস আমার সামনে যে সত্য ছেড়ে গেল তাই আমি ধরে রেখেছি আলকাবাবু। ও আওয়ার পর চারদিকচুরি কিছুতেই আমার মন লাগত না। কোন কিছুর বন্ধনই আমি যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই একদিন সব কিছু ছেড়ে আমি পথে বেরিয়ে পড়েছি। এখন পথই আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি বিছানার কথা শুনে বলি, 'তাহলে জীবনের পরম লগন আপনার কাছে এখন চরম সত্য হয়ে উঠেছে।

সাত

সকালের ঘুম ভাঙতে আজ খুব দেরি হয়। ঘরের বাইরে এসে লনের দিকে তাকাতেই মনে পড়ে গতকাল বেলা তিনেক আগেও আমরা ওই বেতকাঠিটে বসে তিয়াসের জীবন কাহিনী শুনেছিলাম। আমাদের দরজা খুলতে কোম্পানির লোকেরা চা, ব্রাকফাস্ট দিয়ে যায়। শুনলাম ওরা নাকি একবার এসে ঘুরে গেছে। ঘরের পাট শেষ করে মান আহ্নিক সেরে বসেছি এমন সময় ম্যানেজারবাবু এসে জানালেন 'আজ আমার দুপুরের অন্যত্রাদির পর জামনগর স্টেশন দিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে করে পর দিন

সকলে আলোচনা করে। ঐরা হবে ফ্রেন্ডশিপ আর্মেই ওনেছিল। কারণ ফিলিপদের ঐ সময়ের মধ্যে তার অনেকটাই শোনান হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ঘন্টা তিনেক পর আমার ছুটি হবে। দুপুরের খাওয়া শেষ হবেই লাঞ্চের নিয়ে ফ্রেন্ডশিপে চলে যাব। কিন্তুক্ষণের মধ্যে আমরাও সকলের আলাপ পরিচয় সেরে নিয়েছি পরি। বাসে ওঠবার আগে 'বিদায় ভারত, ফিরে আসব-আসব' বলে গানও জানাই।

সেই বার, সেই একইরকম সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, সুতরাং চেনার সার্চিকে খুঁজে পেতে কারও অসুবিধা হয় না। বিভাসের চেহারে যেমন কেন লাল আভা দেখলাম। সমস্ত স্নাত হয়ত ও অনিদ্রায় ভুগছিলেন। আলী মহাজন মৃদু চক্রবর্তী মশায় তাঁর মৃদু স্ত্রীকে নিয়ে ক্রমে বেরিয়েছেন। সেই ওভারা স্টেশনের প্লাটফরমে ওদের লাঠি ঠুকে ঠুকে চলতে দেখেছিলাম। সেই চলা ওদের অভ্যাস হয়েছে। আমাদের পরিচিতে ওরা বয়সে সবার বড়। তাই আসর প্রথম মুর্তি সীট ওদের জন্য সংরক্ষিত। চক্রবর্তী মশায় যে যৌবনে দারুণ হ্যান্ডসাম ছিলেন সে চিহ্ন এখনও তার চেহারায় ধরা পড়ে। ঈশ্বরভীরু, স্ত্রৈণ, সুবক্তার অধিকারী চক্রবর্তী মশায় মনের দিক থেকে এখনও তরুণতুল্য। মিসেস চক্রবর্তীও কম যান না, স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছেন। সাপ্তাহিক বাইবেল একজন পরম অভিজ্ঞের হিসাবে জীবনে অনেক জায়গা ঘুরেছেন বৈকি চক্রবর্তী। হেসে খেলে কোন জায়গার নানা অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি আশপাশের শ্রোতাদের শুনিয়ে চলেছেন। মিসেস চক্রবর্তীর আজ ট্রাডিশনাল পার্টির সবাই যেন লালনভূল। সবার খোঁজখবর নেওয়া, কারও কোনও সমস্যা থাকলে তার সমাধানের উপায়ও তিনি বের করে দিচ্ছেন। শিপ চলার ফলে ঘড়ি ধরে খাওয়া চলতে থাকে। কখনো দুপুরে ডাকলে খেতে যাব সারা সকালটা ফাঁকা ঘুড়ে কি বিরাট কি বিরাট কর্মকাণ্ড চলেছে। নতুন নতুন কনফারেন্স, প্রতিযোগিতার ঘোষণা, কিভাবে কিভাবে ফাইনাল কনফেস, চোখ ধাঁধানো সব ইমারত, প্রকৃতির বিলাস বর্ণবিচিত্রতা দেখে আমার নিজ রাজ্যের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এখানে নতুন তো দূরের কথা পুরনোগুলি রাখাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯৪

দুপুরে ফলফলা-খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি করে ঘরে উঠে বসেছি ; পড় ছাড়ে কাজে যেতে ঘুমাই হবানি। কখন চোখ দুটি বুজে আসে তাও জানি না। হঠাৎ একঘোরে সবার লুটোপুটি এবং নীতার ছোট্ট এক ধাক্কায় চোখ মেলে দেখি সবাই স্টেটের দিকে এগোচ্ছে। কে যেন বলল, 'আমরা জামনগর এসে গেছি'। হাতের ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখি বাঁটায় বাঁটায় ৪ টা। সবাই সার বেঁধে প্লাটফর্মে এসে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের দিকে এগোচ্ছি। ট্রেন আসবে রাত দশটা নাগাদ। বেশ খানিকটা সময় একাকে কাটাতে হবে। ওয়েটিং রুমে বসতেই বিজেলের টিফিন চলে আসে। একই পাথর পথিত একই ভাষার ভাষিত এতগুলি লোক পথের মাঝে কোন এক জায়গায় বসে জলযোগ করার মধ্যে কেন বৈচিত্র আছে বলে মনে হয়। জামনগর স্টেশনের প্লাটফর্মটি বেশ বড়। ওয়েটিং রুম ও রেস্ট রুম ছাড়াও প্লাটফর্মের উপর কাপড়ের ভাল ছাউনীও আছে। আমরা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে প্লাটফর্মের বেঞ্চগুলিতে বসে জমাটি গল্পের আসর বসাই। নীতা, আমি, দত্তবাবু ও বিভাস এই চারজন সবার থেকে একটু দূরে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসি। দত্তবাবুকে এক পলক দেখে নিয়ে আমি বলি, 'আজ আপনার সেই একান্ত কাহিনী যা সেই জীবন রহস্য শোনাতে হবে না। এমন একটা পরিবেশে যা শুনলে আমাদের মনে স্থায়ী আঁচড় পড়ত। আমার কথার সায় দিয়ে বিভাস বলল, 'দত্তা ঠাকুরকাকাবাবু ঠিকই বলেছেন, 'সুদূর বিদেশে অজানা-অচেনা এই জায়গায় সন্ধ্যা লগ্নে আপনার সেই আবেগ মধুর কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা আপনার অতীত জীবনের সেই ছবি দেখতে পাব। নীতাও চুপ করে থাকে না। সে বলে, 'দত্তা তাহলে আর দেরি কেন'। এবার শুরু করুন'। সবার মুখে একই কথা শুনে দত্তবাবু শূন্য দৃষ্টি অনেকের জন্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমরা দারুণ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। সামনে তাকিয়ে দেখি এক চা-ওয়ালা ওজন দিয়ে যাচ্ছে। তাকে ডেকে চায়ের কাপ নিয়ে দত্তবাবুর হাতে এক কাপ তুলে দিই। চায়ের কাপে মুখ রেখে দুই চুমুক দিয়ে দত্তবাবু মুখ তুলে বলেন, 'আমার কাহিনী শেষ করতে তো অনেক সময় লাগবে, সে সময় কি এখানে পাওয়া যাবে'। আমরা সবাই একসঙ্গে বলি, 'অবিশ্যি পাওয়া যাবে অন্যায় শুনব'। দত্তবাবু শুরু করেন দত্ত তার সুদীর্ঘময় জীবন কাহিনী এইভাবে শুরু করেন।

ছেলেবেলা থেকে আমরা খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছি। কিন্তু এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। ওনেছি আমরা অনেক বনী পরিবারের সন্তান। আমার ঠাকুর্দা পর্যন্ত আমাদের পরিবারের উর্ধ্বতন পুরুষরা যেমন দুহাতে ভোগপুর করেছেন উড়িয়েছেন তারও বেশি। বিলেতি পানীর সঙ্গে নিয়মিত মেয়ে মানুষের খরচ যোগাতে অকাতর, সঞ্চিত অর্থ ঠাকুর্দার সময়ে এসে ফলাইতে ঠেকে। একে একে সবই হাতছাড়া হতে ঠাকুর্দাও একদিন সবাইকে ছেড়ে চলে যান। তিনি চলে যেতে দেখা গেল মেনার সময়ে তার সবই বিক্রি হয়ে গেছে। বাড়িখানা দাতব্যে ভাগ হয়ে বাবার ভাগে মাত্র দুখানা ঘর জেগে। বাবাকে দেখেই আমাদের চার-পাঁচজনের সংসার চালাতে কি কষ্ট না হতেন। ঠাকুর্দার আদুরে ছেলেকে দেখেই আপনার ছোট কাঁধে ভার ফেলি করে বেড়াতে। বাড়িতে অভাবেই সব কাজ করতে হত। এই দারুণ অভাবের মধ্যে আমাদের পড়াশুনার কথা কারোর মাথায় আসেনি। মনে আছে ঠাকুর্দা ও তার ঔর্ধ্বতন পুরুষদের বিলাস বৈভব ও উচ্ছৃঙ্খলতার কিনারে সম্পত্তি ও অর্থ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য অতিসম্পদ করতাম আর সঙ্গে সঙ্গে এই সর্বনাশ নিয়েছিলাম যে অর্থের অভাবে আমাদের এই দুর্ভোগ তাকে একদিন কলকাতা করে বনী করে কারবার বেচবার সময় ছাড়াই বয়ে দেব। কোনরকমে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আমি চাকুরির সন্ধান করতে থাকি। অভাবে অভাবে পড়াশুনার ইচ্ছা আমার উবে যায়। টাকা পেছনে ঘোড়ানোই আমার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। দৈনিক খবরে একদিন বুঝে ঠাকুরির সন্ধানে বেঙ্গির ভাসাদ্রোণি জেলাবের সহ বিভিন্ন জায়গায় সরকারী, কোরকারী অফিস, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানোর মেঘিন গ্রাইন্ডার্স বিল্ডিংয়ের পেছন দিকে কয়েকটি ব্যাঙ্ক ও কোম্পানির অফিস থাকিলাম। কিন্তু একটা বিল্ডিং-এর সামনে বহু লোককে টে স্ট্রেচার ও চিৎকার করতে দেখে কেমন কেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পরি। যারা ঐ সব কর্মরত তাদের প্রা সবাই অ-বাঙালী। এদিকে ওদিকে করতে করতে অদূরে একজন বাঙালীবাবুকে দে ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছা করে। তাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতেই তিনিই আমাকে জিজ্ঞে করেন, 'কিছু বলবে'। আমার কৌতূহলের কথা তাকে জানাতে তিনি বলেন, 'এখা লোকের হাতে টাকা যেমন উড়ে আসে তেমনি সুদূর করে উড়েও যায়, খালি হা করে ওঠে, তারা হাত খালি হয়'। আমি মনে মনে ভাবি জায়গাটা তাহলে মন্দ নয় আমার হাত তো খালিই আছে। কী করে তবে ওরে দেখতে হবে তো'। আমি ভদ্রলোকবাবুকে জিজ্ঞেস করি, 'আমি হাত কী করলে তবে ওরে আমাকে ধরা কা করবেন একটু'। ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু আমার সরলতা মধ্যে কোন ভেজাল দেখতে না পেয়ে তার ধারণা হয় তার কথার উপর দারুণ আ রেখেই আমি কথাগুলি বলেছি। তার পরেই তিনি পকেট থেকে বিশপকেটের প্যাকে বের করে তার থেকে একটি নিয়ে ধরিয়ে মুখভরি ধুয়ো টান মেরে আমাকে তার ঠেকে নিয়ে যেয়ার আজাবের খালাসির লাইনটা বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, 'ধৈর্যবাবু লাইনে অল্পেতে ধৈর্যহারা হলে কিসসু হবে না। তবে ধৈর্য ধরতে পারলে অনে কিছুই হবে'। ভদ্রলোকের মুখের উপর আমার গোকোরা মুখখানা তুলে ধরে বলি, 'কি এখন আমি কীভাবে শুরু করব বুঝে পাচ্ছি না। ভদ্রলোক এবার আমাকে ভাল ক নিরীক্ষণ করে বলেন, 'কেন এক কাজ করু, এখন থেকে তুমি আমার হয়ে কাজ কা যা রোজগার হবে তার থেকে তোমাকে কিছু দেব। পরে কাজ শিখে নিয়ে তুমি তোম মত চলবে'। সেই থেকে আমি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে খেয়ার মাজাবের খালাসির কাজে লে পড়ি। দৈনিক দশ-বিশ টাকা আয় করতে লাগল। আমাকে পেয়ে নিশিন্দ্রবা কাজে উৎসাহ যেমন বাড়ে রোজগার যেতে যায় তারও বেশি। ছ'মাস আমি নিশিন্দ্রবা সঙ্গে থেকে খেয়ার মাজাবের ঘাট ঘোট কেশ ভাল করে বশ করে নিয়ে একটি তাকে ছেড়ে চলে এলাম। আমাকে নিশিন্দ্রবাবুর কেশ ভালই লেগেছিল মনে হয়। আমার সময় তিনি বলেন, 'কিন্তু তোমার মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা ও উদার আমি লক্ষ্য করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন তুমি এই ব্যবসায়ে দারুণ সাফল্য পাবে'। নিশিন্দ্রবাবুর কথা আমার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। তারপর আর আমি থামিনি। হাতে হাত দিত গেছেই মেলা বলত। শেজর মাজাবের টাকায় আমি মজিদ কলকারখানার উপর প্রলোভ ঘড়ি তৈরি করলাম, এয়ারগোট ইমপোর্টের ব্যবসা ফুলালাম, জাহাজ খালাসের কন্ট্রাক্ট নিলাম। মাত্রিক থেকে টাকা এসে আমার হাত এ্যাকাউন্টেন্টদিতে ক্ষুদ্রিকৃত হতে লাগ শুধু টাকা আসাতে আমরা বলসে ফুল হয়ে তার আনুষঙ্গিক নানা প্রলোভনও আমা

থাকে। কিন্তু মুশকিল হল আমি যে পরিবারে জন্মেছিলাম এবং সেই পরিবারের লোকদের যে ভরাডুবি পরিণাম আমি দেখেছি বা ভনেছি তা যেন সব সময়ে বাঁশিয়ারী দিত। আমার তারুণ্যের সুপ্ত শিখরে ঝড়ঝাপ্টার কারণে আমি অরুণিমা, মঞ্জুশিকা, ছালবিকার মত সুন্দরী একী কন্যাদের সংস্পর্শে এসেছি। তারা হয়ত আমাকে সত্যি সত্যিই ভালবেসেছিল। অরুণিমা তো একদিন তার ড্রয়িংরুমের দেওয়ালের সঙ্গে জাপটে ধরে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার জন্য কত অনুনয়ই না করেছিল। কিন্তু আমার সেই মন কি এক আতঙ্কে পালিয়ে এসেছিল। মঞ্জুশিকা, মালবিকা তো চোখ মুছতে মুছতে আমাকে অভিশাপ দিয়ে চলে গিয়েছিল। এখন আমি বুঝি ওদের অনেক কারও মনে হয়ত সত্যিই সত্যিই ভালবাসার উদ্রেক হয়েছিল ; কিন্তু আমাদের পরিবারে আমি হয়ত ঘরপোড়া গরু বলে গিয়েছিলাম। তাই সে সব ভালবাসা মুহূর্তে শিহরিয়ে আমি পালাবার রাস্তা করে নিয়েছিলাম। কথা বলতে বলতে বিজন ঘরের পর্দা সরি হয়ে আসে। চোখ দুটি ছল ছল করতে থাকে।

একটু থেমে বিজন পুনঃ আরম্ভ করেন। আমি দেরাদুন জংশনে ট্রেনটার কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন মাত্র যাব, সন্দেহের স্বামীটার মা-বাবার মধ্যের উপরই গিয়ে পড়েছিল। আমি রোজগারের টাকাটা তাদেরই হাতে তুলে দিতাম। আমার রোজগার করতে তাদের একটি পাখা দেখে জোরের দিয়ে দিলাম। তাইত তাড়াতাড়ি পাখা করে সরিয়ে যেতে যা আমাকে ঘিরে করবার জন্য চাল দিতে থাকেন। মায়ের ইচ্ছায় কিন্তুতে আমি কোন বাধা দেবতায় না। ফলে তারই পছন্দ করা এক পাত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। যথারীতি বিয়ের পরে স্বল্প স্বল্পায়ী স্ত্রীরা বেশবিন আমার মনের কিছুতেই রইলেন। আমার চাহিদা মেটাতেই সে সব সময় ব্যস্ত থাকত ; অন্তত তার কোন চাহিদা থাকলেও মুখ ফুটে কোনদিন জানায়নি। ফলে আমি তার দিকে কোনদিনই তেমন নজর দিইনি। বিয়ের পর দশ বছরে আমাদের সংসারে দুটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তানের আগমন ঘটে। তাদের ঠিকমত মানুষ করতে এবং আমার ফাইফরমাস খুশিতেই তার সময় কেটে যেত। মাঝে মাঝে ছুটি দিবে দেখতাম, স্ত্রীরার মুখখানা ভারি হয়ে আছে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে করতে স্ত্রী আর হবে। আমি বুঝতাম সংসারের একঘেয়েমি ও দায়-দায়িত্বের পাশনে এসে হাঁফিয়ে উঠেছে। কিন্তু ওকে নিয়ে ঘাইত্রে কোথাও ঘুরে আসবার মত সময়ের যেমন অভাব ছিল তেমনি ওসবে অর্থের অপব্যয়ে আমার অনীহাও কম ছিল না। একবার সে খুব জুটে পুরী বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু সেই একই কারণে তার কথা রাখতে পারিনি। স্বাস্থ্যগত কারণে আমাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হত। ফলে ঘাইত্রের নেশা আমার ভালবাসাকে মিষ্টি খেত। কিন্তু যাদের ছেড়ে যে দিনের পর দিন একই পরিবেশে কাটাতে তার মানসিক ধৈর্য যে কী ভাবে ভঙ্গ হত সে খবর নেওয়ার কথা আমি কোনদিন ভাবিনি। মেয়েটিকে সংসারে সন্তান করার পর থেকেই স্ত্রীরার হার্টের রোগ দেখা যায়। ভাল ডাক্তার এনে দেখাতেই তিনি দেটা কয়েক ওষুধ দিয়ে গিয়ে তিনি স্ত্রীরাকে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে গিয়ে ঘন্ত পরিবর্তন করিয়ে আনতে বলেন। ডাক্তারবাবুর কথা আমার মনে ধরে। আমি সত্যি সত্যিই একবার স্ত্রীরাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য ঘন্ত পরিবর্তনে যেতে মনস্থ করি। ঘরবাগানা সবই ঠিক করে ফেলেছিলাম। ডাক্তারের পরামর্শ ওনে স্ত্রীরা তৃষিত চাতকের মত অপেক্ষা করছিল। সেদিন অফিসের শেষে স্ত্রীরার জন্য সুগন্ধোপী নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হই। বাড়িতে ঢুকবার সময় দেখি পাড়াপড়শিদের দু'একজন আমার বাড়ি থেকে পাঁচীর মুখে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা আমার ভাল মনে না হতে আমি কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা স্ত্রীরার ঘরের দিকে এগোই। কিন্তু ঢুকেই এক ধাক্কা চোখে পড়ে আমার সমস্ত প্রান, প্রেরণা হারিয়ে যায়। স্ত্রীরাকে ওদের প্রান প্রেরণার যোগাযোগে আটকান গেল না।

নয়

কথাগুলি বলতে বিজনবাবুর গলা ধরে আসে। অনেকের জন্য মনটিকে স্থির করে নিয়ে সে আবার শুরু করে। বলে, 'জানেন অনিলবাবু যে মন সম্পর্কে অঢেলভাবে আগলাতে গিয়ে আমি আমন সতী লক্ষ্মী স্ত্রীকে কতভাবে বঞ্চনা করেছি সেই আজ আমার কাল হয়ে দাঁড়াল। ছেলেমেয়ে মানুষ করলাম, লেখাপড়া শিখিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে বা কিছু করণীয় করে সময় মত বিয়ে দিয়ে দায়ের পরে দিলাম। জীবনের এবার হয়ত আমি সংসারের বন্ধন হতে মুক্তি পাব। কিন্তু হল বিপরীত। ওরা আমার অর্থের সন্ধান রাখত। নিজেদের তাল রোজগার থাকতে ছোটদের পড়াশুনা থেকে সংসারের খরচের টাকা আমাকে দিতে দিতে কাবু করত। শুধু তাই নয়, এক সন্ধ্যায় আমি অফি ফিরতে খুই ছোট আমার ঘরে এসে বলে, 'বাবা, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে'। ছোটবেলা হতে ওরকম বাইরে ছিল। ওদের ফিস-ফিসানি আমার ভালে আসছিল। আমি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী এমন কথা যে আমি ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে তোমরা ছুটে এসেছ'। ওরা বলে, 'হ্যাঁ বাবা, জরুরী বলেই আমরা অপেক্ষা করতে পারিনি'। আমি বলি, ' বেশ তাহলে বলেই ফেল'। প্রথমে বড় ছেলে অমিত বলে, 'বাবা মায়ের মৃত্যুর পর দেখছি আমের দিক থেকে তুমি খুবই ভেঙে পড়েছ, কাজকর্ম ঠিকমত করতে পারছ না'। ছোট ছেলে সমিত দাদার কথার সূত্র ধরে বলে, 'হ্যাঁ বাবা, ব্যবসাপত্রের কুট ঝামেলা সামাল দেওয়া এখন তোমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না'। আমি ওদের কথা ওনে জিজ্ঞেস করি, 'তাহলে আমার কি করতে হবে'? আমার মুখের কথা লুফে নিয়ে ওরা বলে, 'কিছু মনে করো না বাবা, মানুষের জীবনের কোন স্থিরতা নেই। যার তোমার শারীরিক বা মানসিক অবস্থা যা চলছে, তাই আমাদের ব্যবসাপত্রের খুঁটি ঝামেলা বয়ে আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি এখন থেকে বিশ্রাম নাও, ইচ্ছে মত ঘুরে ফিরে বেড়াও'। ওদের মনের কথা বুঝতে আমার সময় লাগে না। অবলম্বন চাইছে যখন নিজেই দেখি না আমার সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ওরা কিভাবে চালায়। মুখে বলি, 'এই জরুরী কথাগুলি কি আধঘন্টা পরে বললে খুব ক্ষতি হত'? আমার খুশি খুশিভাব প্রতিষ্ঠান ওদের দু'ভাইয়ের নামে লিখে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে অমি বলি, 'ঐ খুশির আর থেকে তোমরা সংসারের জরুরীর খরচ সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে চালাবে। আমি এর পরসাও এখন থেকে সংসারে দিতে পারব না। আমার রোজগারের উৎসে এখন তোমাদের হাতে চলে গেল'। ছেলেরা বেশ খুশি মনেই চলে গেল।

বিজন ঘড় তার কাহিনীর এই পর্যায়ে আসতেই দেখি ভ্রাম্যমাণ্যবাবুর দোকের আমাদের খেঁজে সেখানে হাজির। রাতের খানা দেওয়া হচ্ছে ওনে আমার ওখান থেকে উঠে পড়ি। খানা শেষ হওয়ার আধঘন্টার মধ্যেই আমেদাবাদের ট্রেন প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। রিজার্ভেশন অনুযায়ী আমরা নির্দিষ্ট আসনে চলে আসি। সবের মধ্যেই ঘুমঘুম হয়ে পড়েন। অবশ্য ঘড় রাতে আমার ঘুম গাঢ় সময় ঘড় কখনও ঘুম অবস্থা ছিল না। নীচে ও আমি দুটি সিপার বার্থে ওয়ে পড়তেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। পরদিন ভোরেই আমেদাবাদ নামতে হবে। চলন্ত ট্রেনের দোলানীতে অনেকের নাকি ঘুম ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে উল্টোটাই হয়। আমেদাবাদ আসবার আধঘন্টা আগে ভোর রাতে ম্যানেজারবাবুর লোকেরা এসে আমাদের লাগেজগুলি নিয়ে গেটের কাছে রেখে যেত। আমরাও উঠে তৈরি হয়ে থাকি। ট্রেন দু'টায় আমেদাবাদ স্টেশনে ট্রেন থামতেই আমরা নেমে পড়ি। প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসেই রেলের চা-টা সারতে সারতেই সিটী ট্রেন চলে আসে, ওতেই উঠে আমরা ঘন্ত্র স্টেশনে নামব। লাগেজ উঠান-নামানোর দায়িত্ব কোম্পানীর লোকের; সুতরাং আমরা নিজের সীটে গিয়ে বসি। এখানে আমাদের আসন দুটি ছিল জানালার পাশে। রেলকের দিকে অনেকটা দূরে ওজরাটী পরিবার বসে ছিলেন। আমাদের সঙ্গেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দুই কন্যাসী তরুণ-তরুণী ওই কামরায় ওঠে। ওরা বসবার কিছু পরেই ফোলাপ ফুলের মত ফুটফুটে বছর তিনেকের ওই ওজরাটী পরিবারটির একটি বাচ্চা ওটি ওটি পায়ে ঐ কন্যাসী তরুণীর কাছে গিয়ে তার হাতের আংটি, চুড়ি, কবুতি টেনে নিয়ে দেখতে থাকে। তরুণী খুব মজা পায়। সে তার ভাষায় কথা বলে, বাচ্চাটিও তার মত উত্তর দিতে থাকে। পাশে বসা সেই তরুণও বেশ মজা পাচ্ছিল। এক সময় সেই বিদেশিনী বাচ্চাটিকে কোলে বসিয়ে আদর করতে থাকে। বেশ এক অসতর্ক মুহূর্তে বাচ্চাটির মুখখানা তরুণীর বুকের উপর পড়তে সে তার বড় বড় মুখখানা দেখানে ঘসতে থাকে। তরুণীটি লজ্জায় লাল হয়ে বাচ্চাটিকে বুকের থেকে সরিয়ে নিতে সে কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার মা এসে বাচ্চাটিকে নিয়ে নিয়ে আড়ালে ওকে খুব দিয়ে সে শান্ত হয়।

ট্রেন চলতে থাকে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়তে থাকে। জানলার পাশে বসে নানা ধরনের প্রানুষজন, বাড়িঘর, শহর, গ্রাম দেখতে দেখতে এগোই। মনে হয় যত বৈচিত্র্যই থাক না কেন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ সর্বত্রই একই অবস্থায় আছে।

বেলা দেটনে একটা নাগাদ গাড়ি আধু থেমে যায়। গাড়ি আসতেই আমরা নেমে পড়ি। ওর হল আমাদের মধ্যাহ্নভোজন সফর। এখানেও আমরা রেস্টরুমের দিকে

এসেছি। জোশজীর লোকেরা আগেই এসে রসাবাসা করে রেখেছিল। জানে, মানুষের মাথা দিয়ে তরকারী প্রভৃতি বানা তালিমের মেয়ে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা যোরাঘুরির পরে মিস্টার যেন বেশি মজার চাপিয়ে ওঠে। হাসি, ঠাট্টা ও গল্পের মধ্যে রোজগার দেয় হতে আমাদের জানান হয় যে স্টেশনে চড়বে আমাদের লাগারী ভোর সিটিং আরেঞ্জমেন্ট চার্ট সাথ রাখা আছে। এখন সেই পরিচিতে দিয়ে তৈরি হতে হবে। আমরা দিয়ে কমপ্লেই ঘর ছেড়ে যেন। আমার মাইন্ড আবুর পথে চলেছি। আরাবল্লী পর্বত শিখরে মাইন্ড আবু দেখবার সাধ অনেক দিন থেকে মনেতে পুষে রেখেছিলাম। আজ তা পূর্ণ হতে চলেছে। পাহাড়ী রাস্তার মেয়ে মেয়ে কর্কশ মৃত্তিকাশ্রী, মানুষের সমারোহ দেখে মনে হচ্ছিল প্রকৃতির কপার সৌন্দর্যের ডালি উজাড় করে যেন এই পার্বত্যভূমিকে সাজিয়েছেন। এখনকার প্রতিটি জন্তু বাড়িঘর যেন তকতক করছে। দার্জিলিঙের মত মাইন্ড আবুও গ্রীষ্মকালের গরমকের স্বীকারের সমাদেহুদের মনে এক দারুণ কৌতূহলের বিষয়। সমস্ত পাহাড়টিকে মনোজ্ঞ পাক মেরে আমাদের বাস যখন তার চূড়ায় দিয়ে পৌঁছায় তখন সন্ধ্যা হয় হয়। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে যখন সব জায়গায় আমরা যখন ঘুরেছি, বাঙালিদের মধ্যে কথাবার্তা হাসি ঠাট্টা চলেছে কিন্তু মাইন্ড আবুর সৌন্দর্য সম্বন্ধে নির্বাক হয়ে রয়েছিল।

রাস্তার মেয়ে একটি কিশান হোটেলের সামনে আমাদের গাড়ী এসে থামে। ম্যানেজারবন্ধু তন্মধ্যে থেকে এসে হোটেলটির দিকে তাকাতে নজরে পড়ল কেন বড় বড় হরফে লেখা 'হোটেল সানসেট ভিউ'। ম্যানেজার থেকে আমাদের ঘরের চাবি দেওয়া হয়। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে মেয়ে গেলেও তার শেষ ছটা তখনও হোটেলের চূড়ায়, গম্বুজের গায়ের লেগে আছে। চাবি নিয়ে ঘরের দরজা খুলে ভেতরে এসে আমি অবাক। সত্যিই মাইন্ড আবুর সৌন্দর্যের সঙ্গে মানানসই এই ঘরখানি। এ পর্যন্ত যত ঘর আমার কপালে জুটেছে তাদের মধ্যে এটিই সেরা মনে হল। সন্ধেবেলা ঘরেতে ঢুকতেই অনেকে সূর্যাস্ত দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়েন। পাহাড়ের এই পরেই থেকে সূর্যাস্ত দেখা যায় বলে 'হোটেলটির নামও এরকম রাখা হয়েছে। আমরা অবশ্য বেরিয়ে এসে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হোটেল কম্পাউন্ডের মধ্যে সেজেগুজে লোকজন, ঘুরছে ফিরছে, হাসছে গল্প করছে। মার্চ মাস শেষ হতে চলেছে, কিন্তু কেন শীত শীত করছিল। ঘরে ফিরবার কিছুক্ষণের মধ্যে বিকেলের জলখাবার চলে আসে। পরক্ষণের মুখ থেকে একটানা জার্নি করে শরীর ও মনে কেমন ক্লান্ত ভাব এসে গিয়েছিল। বাথরুমে গিয়ে গরম জল মিশিয়ে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম।

রাত দশটায় ডাইনিং টেবিলে এসে দেখলাম কতের খাবার এসেছে। চিকেন, মাছের ভাজিয়া, স্যালাড আর দুই এক পদ। খেতে শুরু করেছি এমন সময় ম্যানেজারবন্ধু মিঃ ভানার্জী জানালেন, কাল ব্রেকফাস্ট সেরে সকালে মাউন্ট আবুর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে যাব।

পরদিনের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা উঠতেই বাস ছেড়ে দেয়। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি বাঁচার বাঁচায় মাত্তো আছে। বিভাস ডিমে মেখে পান খেয়ে করছে দেখে একটা চায়। আমার দেখাদেখি বিজন বরণ একটা চায়। বিভাস বলল, 'মেশোমশাই তো অনরকবন্ধু' বরকবন্ধু কেমন হক করে ডাকেন'। আমি বলি, 'পানের জন্য আপনার নাম ডাক লোকের মুখে মুখে ফিরছে ভেবে দেখেছেন কি'। আমার কথার আলঙ্কারের সবাই হাসতে থাকে, বিভাস চুপ করে পান সাজতে থাকেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দুটো পান মেজে আমাদের হাতে দিয়ে বলেন, 'পানের যে মাহাত্ম্যের কথা শোনালেন আমি যেন ভুল ভুলে চাইতে হবে না'।

পাহাড়ী রাস্তায় মুহূর্তিনট মোড় ঘুরেই কিশান এক কম্পাউন্ডের সামনে এসে বাস দাঁড়ায়। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যুত্তরীর বিকশাতি নিম্নে এসে পড়ি। আমরা জানতে হলে এসে সামনে পৃথিবীবিখ্যাত ঐ মিশনের কর্মকারী সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে মুনি। এরপর আরও কিছুদূরে অবস্থিত 'অচলগড়' আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে শিবের মন্দির আছে। শোনা যায় এখানে প্রতিদিনকালে জল ঘন ভূমিকম্প হত। এক সময়ে মহাদেব পায়ের আঙুলে চেপে দিয়ে ভূমিকম্প থেকে ঐ স্থানটিকে রক্ষা করেন। সেই থেকে ঐ স্থানটির নাম হয় 'অচলগড়'। এরপর কিয়দ্দূর পথে আমরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সমন্বয়ে শিল্পের অপরূপ বিশ্ববিখ্যাত সেই দিলওয়ারা মন্দির দেখতে যাই। সূর্য তখন মাথার উপর অগ্নিবৃষ্টি করে চলেছেন। ঘড়িতে গেল দুপিয়ে রেখি আরটা বাজতে পাঁচ মিনিট। আমরা সেই বিখ্যাত মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। সবাইকে নিয়ে ঢোকে ঢোকে কাউন্টার বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য কিন্তু টিকিটেই আমরা সেই মন্দিরগুলি ঘুরে দেখবার অনুমতি পাই। বোদ, গরম উপেক্ষা করে আমরা সমস্ত শিল্প মন্দিরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মানুষের হাতে নির্মিত ঐ স্বর্গরাজ্য চক্ষে দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দেশজীর ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়াও আমার মত অনাড়ীর পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে এও ভেবে আশ্চর্য পাই যেমন সৌন্দর্যবোধ থেকে কলাশিল্প সৃষ্টি পড়ে ওঠে তেমনি তাকে লাভে করার জন্য বিকৃত মনস্ক মানুষেরও আবির্ভাব ঘটে, যারা মানব জাতির অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। বিলওয়ারা মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখবার জন্য আমরা ঘণ্টা সময় পেয়েছিলাম তার বদ ওপ সময়ও মন্দিরটি ভালভাবে দেখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

বেলা প্রায় দুটোর সময় আমরা হোটেলে ফিরি। ফিরতে সারি রাজা রাজা হয়েছিল। তেমনকমে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং হলে আসি। ফ্রেনুচ ছিল ডাল। ফল ভাতাব পরিমাণও খানিকটা ক্রমে হ্রাসায়। তবে এসে বিশ্রামের পিঠে লাগাতেই ঘুমের ঘুম চলে আসে। পরজাব রাজার পথে খুব জামতে যেমি ঘরিয়ে পাতটা ভাজে। পরজাতলে দেখি ছবিদের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে।

বিকেলে যেন প্রোগ্রাম ছিল না। আমরা নিজেরাই দলবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বিভাস, বরকবন্ধু আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পাহাড়ের উপর মনোরম দৃশ্য। ছোট ছোট শিশুর ছোট কম্পোর-কম্পোটি, মেয়ে-মেয়েদেরও ফটোর চকমক টাকার মত ঝক ঝক করে দেখে পরিচ্ছন্নতার ছোতে উঠেছে দেখলাম। চারিদিকে পার্কের থেকে ফলে দেখা, গল্প করার সুন্দর ব্যবস্থা আছে দেখলাম। আমরা একটু ঘুরে রিসিবিদিতে দুখানা ফুচকাফুচি খেয়ে বিভাস ও বরকবন্ধুকে বিদায় দিই। টাকেশ্বর বরকবন্ধুর সেই আমায়ার কাহিনীর সম্পূর্ণ রূপ পাওয়া। এমন সুন্দর পরিবেশে এবং হাতে এতটা সময় কখনও পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। বরকবন্ধুকে অনুরোধ জানাতে তিনি আপত্তি করলেন না। তার মনেও হয়ত শেষ টুকু বলবার একটা উদ্দীপনা এসেছিল। বরকবন্ধুকে ওছিয়ে নেওয়ার জন্য একটু সময় দিয়ে আমরা কম্পোর-কম্পোটিতে বসেছিলাম। এমন সময় বিজন দত্ত গলা ঝাড়া দিয়ে এইভাবে শুরু করেন :

সেদিনকার পর আমি ভেবেছিলাম সত্যি সত্যিই ভেতরে মুক্তি আমাকে সংসারের জাল-জটিল থেকে মুক্তি দিল। আমি সংসারের কোন কিছুতেই থাকতে চাইতাম না, নিজের মত চলতে শুরু করলাম। কোথাও বাঁধা মনে পড়া। কোথাও যা মনিবের তৈরি করা, তখন সমস্তার্থপরা ব্যক্তিদের সঙ্গে খুব অল্প প্রবৃত্তিতে আমার সময় বেশ কাটছিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভাইবোনদের যে ওছিয়ে নিত মুখ ফুটে তাই তেই নিতাম। কিন্তু আমার কপালে সেই আনন্দটুকুও বেশিদিন সইল না। কিছুদিন যেতে না যেতেই বৌমারা মুখ ফুটতে শুরু করল। তাদের অভিযোগ আমি কখনও বাড়িতে থাকি কখনও থাকি না। কখন আসি, কখন যাই তারও কোন ঠিক পাতে না। আমার জন্য রান্না হাত, তরকারী ওছিয়ে নিয়ে থাকতে, নিজা, বিশ্রাম ত্যাগ করে দিনের পর দিন বসে থাকতে হয় বা নষ্ট হয়ে গেলে ফেলে দিতে হয়। বৌমারা এসব ছাপা আর পোষাতে চায় না। কেন কিছুদিন যাইবে ঘুরে সেদিন বাড়ি ফিরেছি। দুপুর বেলার খাবার ওছিয়ে বড় বৌমা আমার ঘরে দিতে এসে বলেন, 'বাবা এভাবে তো চলতে পারে না আপনি কখন খাবেন, কখন যান, কখন থাকেন, তার কোন হিসেব নেই, অন্তত আপনার জন্য নিয়মিত রান্নাবান্না করে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়, নয় তো ফেলে দিতে হয়। এত ছাপা কতদিন পোষানো যায় বলুন তো'। কেন কিছুদিন পর ঘরে ফিরে দীয়ার ফটো দেখে আমার ভেতরটা ভীষণভাবে উতলা হয়ে উঠেছিল। ঠিক সে সময়ে বড় বৌমার মুখে ঐ কথাগুলি শুনে আমার মনে দারুণ অভিমানের সঞ্চার হয়। আমি তাকে বলি, 'তুমি তাদেরও জন্য নিয়ে যাও, আমি ভেবে এসেছি। যা শোন আজ থেকে আমার জন্য রান্নাবান্না তো দূরের কথা কোন কিছুই করবে না' আমার কথা শুনে বড় বৌমা গীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, 'মনে থাকে যেন আবার বন্ধুমাসে আমাদের মনে সাত কাহন বলে বেড়াবেন না'। তার কথার আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে আমি বলি, 'এই মুহূর্তে তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও তোমাকে যেন রোজকে এই ঘরে না দেখি। ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে যেতেই আমি নিজেকে ঘরে রাখতে পারি না। চাবির সেই ছবিখানা নিয়ে আমি বিছানায় কাত হয়ে পড়ি।

রাত্রের থেকে আমি ঘড়িতে খুব ভোরেই অলার্ম দিয়ে রাখতাম। সকালে উঠে তৈরি হয়ে বেরিয়ে যেতাম। বিভিন্ন সংস্থার সাজানিক ঘুরে হোটেলে ফেরার-ফেরা সেই বেলি হতে বাড়ি ফিরতাম। অনিয়মে আমার শরীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় আমা

এক বন্ধু একদিন জোর করে তার বাড়িতে নিয়ে যান। তার স্ত্রী বিশেষ করে মেয়ের দাবী মেনে নিয়ে তখন থেকে ওখানেই খেতে শুরু করি, তবে ওদেরকেও আমার পর্ব মেনে নিতে হয়। ভাপাপিঠা পেয়ীর পেটেরই পর্যায়ে পড়ে। এর কয়েকদিন পর এক সকালে আমি তৈরি হয়ে বেরোব এমন সময় দুই ছেলে আমার ঘরে ঢোকে। হঠাৎ ওদের ঘরে আসতে দেখে আমি অবাক হয়ে তাকাতে বড় ছেলে বলে, 'আব্বা, তুমি কখন কি করছ না করছ একজন আমাদের জানানও প্রয়োজন বোধ কর না। তুমি যা ভাল মনে কর করবে। আমাদের কিছুই বলার নেই। তবে বাড়িঘরলোভের তো একটা ব্যবস্থা করে যাবে'। ওর কথা শুনে আমি বলি, 'ব্যবস্থা মানে? কি ব্যবস্থার কথা তুমি বলতে চাইছ'? আমার কথায় সে বলে, 'তোমার বয়স হয়েছে, যেকোন দিন বিনাই খেয়ানী হয়ে উঠতে। কোথায় কি বিপদ ঘটাও বলা যায় না। তাই বলছিলাম, এ বাড়ি কলকাতাবেচলন, মেখাপেনা করবার জন্য বাড়িটা আমাদের নামে করে দেওয়াই তোমার উচিত কাজ হবে'। ওদের কথা শুনে আমার ভেতর দারুণ উত্তাপ সৃষ্টি হয়। আমি গম্ভীর অথচ স্পষ্ট ভাষায় বলি, 'বাড়ি আমি কারও নামে লিখে দেব না। তবে তোমাদের তোমাদের একটা টেলিগ্রাম সমিহারে অবশ্যই অনুমতি দিচ্ছি। নীচের তলাটা আমার থাকবে। এটাই আমার শেষ কথা'। ছেলেরা রেগে গন গন করতে করতে চলে যায়। আমি কি বলি, তোমার বাড়ি একবার রিজেন করবারও প্রয়োজন বোধ করে না'। এর কয়েকদিন পর আমি স্নানে গিয়ে দেখি বাড়ির গেটে অলা দেওয়া। তাকাতাকি হাঁকাহাঁকির পর বড় ছেলে এসে বলে, 'কিন্তুদিন খারাপ, তোমার জন্য এত রাত পর্যন্ত বাইরের দরজা খোলা রাখা সম্ভব নয়'। ওরা জানে রাতে কিরতে আমার দৈনিকই দেরী হবে, তাই কারণ করে আমাকে বাড়ি ঢুকতে দেয়। ওদের ওই কথা শুনে আমি বাড়ি না ঢুকে চলে আসি। আমি একদিন ছাড়া কিনেছিলাম। সে খবর ওরা রাখত না। সারাদিন সেই ফ্লাটে আমি চলে আসি। রাত রাতে আমি কোথায় যাচ্ছি একবার মুখ ফুটে ওরা জিজ্ঞেস করে না। কথা বলতে বলতে কিছুদিন পরের চোখ দিয়ে ঘর ঘর করে জল পড়তে থাকে। এক সময় আমার হাতখানা ধরে তিনি বলেন, আমার এ দুঃখ কাকে জানাব বলুন। তাই আজ আমি রাস্তাকে ঘর করে নিয়েছি। কলকাতায় কিরেই আমি পূর্ণ বৃত্তে যোগ দিতে ছুটিয়ার যাচ্ছি। এই কৃতু পেশাতেই যাব। টাকা জমা হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই।

কিছুদিন পরের কাহিনী শেষ হতে হতে সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসে। তার যাইত্রে থাকা ঠিক নয় মনে করে আমরা উঠে পড়ি।

আগামীকাল সকালে সাড়ে ছ'টায় আমাদের জয়পালগীর রওনা হওয়ার কথা। রাতে ডাইনিং হলে ম্যানেজারবাবু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন, যদিও এসব বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য হয় না।

এগার

নির্দিষ্ট সময়ের আগে উঠে দেখি বিভাস, ধরণীবাবু ও নন্দী দম্পতি তৈরি হয়ে বসে আছেন। বাস ছাড়বার মুহূর্তে বিভাস একটা গান আমার মুখের সামনে ধরেন। নীতা টীকনির প্রতিবাদ করে বলে, 'বিভাসদা এটা কী করছেন, এরপর কেন্দ্র ছাড়ে খেলে ছড়িতে আমাদের একটা কাজ বেড়ে যাবে'। বিভাস মৃদু হেসে বলে, 'যিনি ছড়িতে আপনার জন্যই যা কি আছে, তবে বুড়ো বয়সে তরুণোদ্ধরে সেবাধরে চান্সা করে তুলসে লাভের ভাগটা তো আপনিই বেশি পাবেন'। বিভাসের কথা শুনে পিত্তের সবাই উপভোগ করেন।

এবার পাহাড়ের পাক খুলতে খুলতে বাস নামতে থাকে। আবার সেই পাহাড়ী সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে নীচে নামা। বেলা প্রায় আটটা নাগাদ আমরা সমতলে নেমে এসে মরুভূমির রাস্তায় পড়ি। এখানেই এক জায়গায় আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করা হয়। পরেই শুরু হয় মরুভূমি অতিযান। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমির আবহাওয়া গরম হতে থাকে। দীর্ঘ রাস্তা, মরুভূমি দেখবার কৌতূহল নিয়ে চোখ দুটি অনাসক্ত বাইরে রাখি যাতে মনের ক্যামেরায় সব ধরে রাখা যায়। দেয়ে খালির সুতুরের মত দিয়ে সুখর পিত চালা রাস্তা ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে ঝাউর টিবির উপর কাঁটা ঝাড়ের ঝোপঝাড় দেখে কুলোনো পড়া সেই বর্ণনার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়ে পুলকিত হই। কোথাও কোথাও মধুর মরুমীয়ার আপনার হয়ে নেচে বেড়ান, কোথাও বা দুরন্তে দুই একটা উটের আনমনেনা নীতার মনে খুশির আমেজ আনে।

বেলা একটার সময় রাস্তার পাশে একটা ছাউনির নীচে আমাদের দুপুরের খাবার ব্যবস্থা ঠিক হয়। সাদামাটার মতো আয়োজন খারাপ দিল না—ডাল, ভাজা, তরকারী ও মাংসের কারিয়া। কিদের আগুনে সব কিছুই আমাদের মুখে অমৃতের স্বাদ এনেছিল। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ আমরা জয়পালগীর পৌঁছাই। সারে পাঁচশ কিলোমিটারের উপর রাস্তা দশ ঘণ্টার (প্রাতরাশ, লাঞ্চসহ) আমরা পাড়ি দিই। দূর থেকে সেই বিখ্যাত সোনার কেল্লার সোনালী আলোয় ঝলমলানি দেখে আমরা বুঝতে পারি গন্তব্যস্থলে এসে গেছি। স্নান এসে একটা হোটেলের সামনে দাঁড়াতেই আমরা নেমে পড়ি। লাউঞ্জে এসে চাবি নিয়ে আমাদের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে এসে সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র করে বেলি। একটানা ট্রেনে ক্লান্তি আমাদের বেশ কাহিল করে ফেলেছিল। ঘরের পেছন দিকের দরজা খুলে ব্যালকেনিতে এসে অবাক হয়ে দেখি সোনার কেল্লা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ঠিক সামনে। রাস্তার ওপাশে। খুশিতে উপচে পড়ে মনটা।

রাতে খাওয়ার সময় আমরা জানতে পারি পরদিন ব্রেকফাস্টের পর আমরা 'সোনার কেল্লা' ও তার কাছাকাছি জায়গাগুলি দেখব এবং বিকেলে যাব মরুভূমির পটভূমিতে সূর্যাস্ত দেখতে।

আমরা সোনার কেল্লা দেখতে চলেছি। সোজাসুজি আমাদের হোটেলের সামনে দেখলেও ওখানে যাওয়ার রাস্তাটা অত সাধিধ্য ছিল না। যা হোক ওখানে গিয়ে জানা গেল রাজস্থানের মহান ঐতিহ্য সেই কেল্লার ভেতর ঘুরে ঘুরে মন্দির, মিউজিয়াম ও নিজের চক্ষু উৎকর্ষ দেখে দুই চক্ষু সার্থক করলাম। এককথায় সোনালী পাথরে তৈরি সমস্ত বাড়িঘর সোনালী রঙ নিয়েছে দেখলাম। কিরবার সময় আমি কয়েকখণ্ড পাথর কুড়িয়ে এনেছিলাম। জয়পালগীর পাথরটা খুব জমজমাট না হলেও রঙদার্ঘ, দোকানদাররা ভালই আছে। পাথরটাও শক্ত, ঝিক্কি নুড়।

বিকেলে চা-টা সেরে আমরা চলেছি স্যার স্যান্ড ডিউনে সূর্যাস্ত দেখতে। বাড়িতে পরে চারটে আসতেই বাস ছেড়ে দেয়। বিভাস বলতে থাকেন, 'সুমুদ্রে নয়, পাহাড়ে নয় এবার শেষ মরুভূমিতে চলেছি সূর্যাস্ত দেখতে। তাহতে পারেন ধরুবন্ধু, আমাদের থাকাকালে এখন কোথায় গিয়ে ঠেকেছে'। বিভাসের কথায় ওস্তিক থেকে প্রসেনজিৎ বলেন, 'আপনি বলছেন কি বিভাসবাবু, এই সামান্য চাহিদা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকব? এরপর তো আমরা চাঁদে বা মঙ্গল গ্রহে গিয়ে সূর্যাস্ত দেখতে চাই'। বিভাস উত্তরে বলে, 'তাহলে তো আমাকে দুই এক চিবে বন কয়েক ওয়াশন গান সঙ্গে নিতে হবে'। বিভাসের কথায় সবাই হাসতে থাকে। গতকাল মরুভূমির মধ্য দিয়ে আসবার সময় তবু মাঝে মাঝে দুই একজন ঝুঁকেছিল। কিন্তু এখন দেখছি সে সব কিছুই নেই, তবে রাস্তাটা খুব জমজমাট।

আর পঞ্চাশ কিলোমিটার ভেতরে গিয়ে জল পাওয়া যাবে, এরপর যাওয়ার অনুমতি নেই। এখান থেকে পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে সেই জিনের ছবনে যেতে হবে। সামনেই দেখি এক সার উট তা প্রায় দু'জনের মত হবে হাঁটুমুড়ে আপশোয়া অবস্থায় অপেক্ষা করছে। প্রতি উঠে দু'জন করে সওয়ারি, মাথা পিছু পঞ্চাশ টাকা চার্জ। উটের পিঠে উঠতে কেন কয়েকজন ভয় পায়, তাদের মধ্যে নীতাও আছে। ফলে পঞ্চবাহীর সংখ্যাও কম হয় না। সেনবাবু সহ কয়েকজন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ওখানে একটা চায়ের ডেরার সামনে খান কয়েক চেয়ে বসে নানা রকমারি গল্পের সঙ্গে মরু প্রকৃতি দেখতে থাকেন। আপাত দৃষ্টিতে বিভিন্নতার সন্ধী না খুঁজতে অবশ্য এগিয়ে যায়, কেউ সবাই অল্প কয়েছিল। দু'জনের মুখেই হাসি লেগে। রবীন্দ্রনাথের সেই ছত্রটি 'পথ বেঁধেছিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থি'—মনে পড়ে।

আমরা কয়েকজন মিলে হাঁটা পথে এগিয়ে চলি। অনেকখানি এগিয়ে যেতেই দেখি কিছুদূর এক ঝাঁপোলক ক্লান্ত কলেবরে যেন মরুভূমিতে শুয়ে পড়েছে। তার লাল আভার প্রতিবিম্বিত হয়ে বালুরাশি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লাল সিল্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই মুগ্ধে আমরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। পাশ্বনাথই যে যেন বলে, 'চলুন, চলুন, এখনই অস্তরাল নেমে আসবে'। হাঁটা পথে আমাদের ফিরতে হবে। আর দেরী করি না। আমাদের পাশ দিয়ে একে একে উট-আরোহী-আরোহীনীরা ফিরতে থাকেন। এক সময় দেখি বিভিন্ন অন্তরাল কাঁধে মাথা রেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে গল্প করতে করতে ফিরছে।

সবাই স্নানে উঠতে আঁধার ঘনিয়ে আসে, চাঁদের আলো আসতে আরও কিছু সময় লাগবে। সন্ধ্যার আঁধারে মরুভূমির উপর দিয়ে স্নানে করে ফেরে এক অভিনব অনুভূতির আবেশ আনে। সবাই বিভিন্ন ও মৃদুলয়ের গান শোনবার জন্য বসে। বাসের

ঘরে ফলাফলটি ফেরে ফেরে গল্প শুনবার জন্য দারুণ আগ্রহ জেগে ওঠে। এমন সময় বিভিশার গলার ভেসে আসে 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে...'। সত্যি সত্যিই কিছুক্ষণের মধ্যে উদয়ের বাঁধ ভাঙা আলোর মরুভূমি ছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে রই। বিভিশার গলা থেমে যেতে সবাই মুখলার গল্প আরম্ভ করে। আশা পূরণ হতে সময়ও লাগে না। তার গলায় ভেসে আসে, 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশিনীরে...' তারই সুদূর মন মাতানো পরিবেশের সৃষ্টি হয় আমাদের মধ্যে। সবাই উপলব্ধি করি, মুখে কারও কথা সরে না।

সন্ধ্যা ৯'টা নাগাদ আমরা হোটেলে ফিরে আসি। কাল সকাল ৬'টায় আমাদের যোধপুর রওনা হবার কথা।

যশ

ভোর বেলায় তৈরি হয়ে আমরা বাসে গিয়ে বসি। রাতে ঘুমটা ভাল হওয়ায় মেজাজটাও বেশ ফুরফুরে ছিল। বাস ছেড়ে দিতে বিভাস মীতাকে বলল, 'দিদি, নইলে আপনার অনুমতি নিয়েই অলকবাবুকে একটা গান লিখি, নতুবা লাভার বেড়ানর অ্যাসেনটাই নষ্ট হয়ে যাবে'। বিভাসের কথা শুনে অন্য সবাই বলল, 'তবু অলকবাবুর অনুমোদনটাই আপনার বিল্কো) বিষয়, আমরা কৃষি কেউ নই'। ওদের কথায় বিভাস মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'অলকবাবুর সঙ্গে আপনাদের এক আসনে বসাই বা কবে, আমি যে তার অনু কুটুম হয়ে গেছি'। ওর কথায় সবাই হাসতে থাকে। মরুভূমির উপর দিয়ে বাস চলেছে যোধপুরের রাস্তা ধরে। বেলা আটটা নাগাদ ম্যানেজার মিঃ ঘোষাল বলেন, 'এখন আমরা আধুনিক ভারতের একটা ঐতিহাসিক জায়গায় আসছি। জায়গাটির নাম পোখরান, এখানে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ১৯৭৪ সালে ভারতবর্ষ পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘোষালবাবুর কথা শেষ না হতেই আমরা সেই ঐতিহাসিক জায়গায় এসে পড়ি। ওখানেই বাস থামিয়ে একটা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রচারমাধ্যমের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনাটি ঐ সময় খুব ছিল। আমরা কনফেন্সিয়ের জোর-আলতে নিয়ে হলকা হয়েনি। সেই বিশেষ মুহূর্তটিতে দাওয়া নিয়েছি আমরা মুখ থেকে আমরা দেখি। আমার মনে হয় মরুভূমির সেই এই দৃশ্য দেখতে দেখতে। বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা যোধপুর পৌঁছাই। হোটেল গ্যাদ্যাসির সামনের এসে বাস দাঁড়াতেই আমরা নেমে পড়ি। ঘরে এসে চানটান সেরে নিতেই লাঞ্চ সময়ে ম্যানেজারবাবু আসেন। তিনি জানান, বেলা তিনটে নাগাদ বাস ছাড়বে। বেলা উমেশ সিং-এর প্রাসাদ, যোধপুর দোর্গ প্রভৃতি দেখতে

প্রাকৃতিক ক্লান্তি সত্ত্বেও ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখবার উৎসাহ আমাদের কম ছিল না। ঠিক সময়ে বাসে উঠে বসলাম। যোধপুর শহরে আধুনিক ডিজাইনের বড় বড় অট্টালিকা, প্রশস্ত রাস্তা এবং যানবাহনের প্রচুর লক্ষ্য করলাম। শহরটি বেশ বর্ধিষ্ণু বলা যায়। বেলা উমেশ সিং-এর প্রাসাদে বেশ টাকার টিকিট চুকতে হয়। মহারাজার ব্যবহার সম্ভার। নানা ঐতিহ্য নিদর্শন ও তিন শৈলপুরের সমাবেশে সেখান লক্ষ্য করা যায়। যোধপুর দোর্গেও সেই একই মুগ্ধ ভাব থাকে সারাক্ষণ আসে, তবে এখানে দর্শনীর মূল্য একটু টাকার মত। সন্ধ্যে নাগাদ আমরা হোটেলে ফিরে আসি।

রাতে খেতে বসে আমরা জানলাম আগামীকাল ভোর ৬'টায় আমরা উদয়পুর রওনা হচ্ছি। পথে নাথদ্বারা এবং একলিঙ্গজীর মন্দির দেখা যাবে। নির্দিষ্ট সময়ে বাসে উঠে বসি। প্রশস্ত রাস্তা ধরে বাস ছুটেছে। মুখলার মার্কেল পাথরের আকর নাথদ্বারায় পৌঁছায় কিছু মন্দির ঘুরতে ঘুরতে প্রায় তিনটে বাজে। ওখানেই এখানে মৈথিক মুখোশ বি পুড়িয়ে খাওয়া করা হয়। মন্দিরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। বেলনরমে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করে ফিরে আসি।

প্রায় পাঁচটার সময় আমরা একলিঙ্গজীর মন্দিরের সামনে আমাদের বাস এসে দাঁড়ায়। এখানে বিগ্রহ দর্শন ও পূজো দিয়ে সন্ধ্যে ৬'টা নাগাদ আমরা উদয়পুরের চলে আসি। হোটেল অলকার সামনে বাস এসে আমরেই আমরা নেমে পড়ি। এখানকার ব্যবস্থাদিয়ে আগের হোওয়া ভালই ছেলে আমরা সব কিছু নিয়ে বেশ সাজানো গোছানো।

পরদিন সকালে আমরা উদয়পুরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে যাই। বেলা এগারোটা নাগাদ সেভেন্টিজিয়ান, জগদীশ মন্দির, সুখলী সরোবর, সহেলী গার্ডেন, উদয়পুর প্যালেস ঐ স্থানগুলির মধ্যে প্রধান। বিকেলে হোটেলের ঘরে কয়েকজন আত্মীয়স্বজনদিকে আমরা ফোনে ফিরে আসি।

রাতে খেতে বসে আমরা জানতে পারি আগামীকাল সকাল সন্ধ্যা নাগাদ সকাল সকাল দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা আজমীরের উদ্দেশ্যে রওনা হব। পথে আমরা চিতোরগড় দেখব।

সকাল সকাল উঠে আমরা তিনটে বাগ—চা, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ পর্ব করে ঠিক সময়ে লাগেজ বাসে গিয়ে বসি। বেলা দুটো নাগাদ আমরা আরাবল্লী পর্বতের ধারে একটা পার্কের কাছে এসে বাস থেকে নেমে পড়ি। পার্কের আলপাশের জোপজঙ্গল সে নিজেদের খানিকটা হাল্কা করে যাবার বেরবেরের জন্য প্রস্তুত হই। তবে এখান থেকে আটো করে আমাদের চিতোরগড়ে যেতে হয়। বাস পার্কের কাছেই থেকে যায়। সরু পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ঘাসে ঘাসে অনেকগুলি খেট পার হয়ে আমরা আরাবল্লী পর্বত শিখরে চিতোরগড়ে পৌঁছাই। এখানে ঐরা ঘাস-এর মন্দির, রানা হাম্বিরের বিট্টি জেওয়ার, রানী পদ্মিনী, চিতোরের সেই ঐতিহাসিক সুন্দরী রানী পদ্মিনীর আসল স্থান, সেই আয়না যার মধ্যমে সুলতান আলাউদ্দিন তাকে দেখেছিলেন, সঙ্গীদের সঙ্গে পদ্মিনীর আগুনে আত্মাহুতির স্থানগুলি ঘেরে বেলা পাঁচটা নাগাদ আমরা সেই পার্কে ফিরে আসি। চিতোরগড় ঘুরে আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে যে আমন সুরক্ষিত পাহাড়ী দুর্গে রাজপুতদের মত দুর্ধর্ষ যোদ্ধার বিদেশী হানা ঠেকতে পারল না কেন।

পার্কেই আমাদের নিকেসনের জলখাবার পরিবেশন করা হয়। সুন্দর ঘুরে ওওয়ায় বসে খেতে ভালই লাগছিল। আর ঘণ্টার মধ্যে আবার চলা শুরু হয়। আমরা আজমীরের পথে চলেছি। চার ঘণ্টার রাস্তা সামনে। সারাদিন রোদে গরমে তাতা তাতা হয়ে সন্ধ্যেবেলায় চলাফেরায় চাঙা হওয়ার পরম মনোরঞ্জন কেন জুড়িয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার ঘন হতে সবার অজান্তে পনের ঝিমুনি জেগে ওঠে। তিনজনই আমাদের পাঠিয়ে পাইটে জানে—বিমান, মুকুল ও বিভিশা। রমাদেবী প্রস্তাব দিতে ওরা আমত করে না কল নীরবতার মধ্য দিয়ে বিভিশার গলায় ভেসে আসে, 'হে ক্ষণিকের অতিথি...'। বিভিশা মাকেনী গলায় সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। বিভিশার পর বিমানের গলা শোনে যায় সে প্রেমের গলার 'চাঁদনি দূরের সেই বিস্তার গানখানা 'যাক দূরবনায় দৃষ্টি পথ. পেয়ে আমার যেন মাত করে দেয়। মনে হয় আমাদের এই যাত্রা যেন অনন্তকাল ধরে চলেছে। আমরা যাত্রাবাসি হব না। বিমানের গলা আমাদের যেন কিছুক্ষণ পর্যন্ত সবাই নির্বাক হয়ে রয়। তারপরই ভেসে আসে মুকুলার গলায় সেই রবীন্দ্রসংগীতটি 'তরণ ধরিতে নিজেদের আমারে, '। মুকুলার গলা মিলিয়ে যেতেই দেখা যায় আমরা পরবর্তী স্থানের কাছাকাছি এসে পেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস এসে একটা হোটেলের সামনে দাঁড়ায়। বেরে দেখি বড় বড় হরফে লেখা 'হোটেল আরাবল্লী'। রাত তখন তা সাড়ে ৯'টা। লাউঞ্জে এসে চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকি। ঘরগুলা সবই ভাল মনে হল। যে ঘরে বেশ হতে হতে রাত দশটা বাজে। পরে কর্তাদের অর্ডারিনি হলে আমি পরে খেতে খেতে জানতে পারি বাস সকালে আমরা কিছু না খেয়ে তোর ৬'টায় আজমীর পৌঁছে হোটেলে ফিরব। তারপর চা ও ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরবের সাবিত্রী পাহাড়, ব্রহ্মমন্দির ও পুষ্কর হ্রদ দেখতে। সেখান থেকে ফিরে দুপুরে লাঞ্চ করে বিকেল তিনটে নাগাদ জয়পুরের পথে বেরিয়ে পড়ব।

জয়

পর দিনের প্রোগ্রাম অনুযায়ী খুব ভোরে আমরা তৈরি হয়ে বাসে গিয়ে উঠি সামান্য রাস্তা, পনের মিনিটের মধ্যে আমরা আজমীর পৌঁছে গেলে আসি। সেই বিশ্রী ধকির সহযোগের ভয়ে বালি পরে মাথা থেকে ভারি সাবিত্রী নিয়ে যেতে হয় আমরা সবাই কিছু মেনে সেখানে গিয়ে ধকির সাহায্যের দোরা প্রার্থনা করে চড়ে বসি।

হোটেলে ফিরে চা, ব্রেকফাস্ট সেরে আবার আমরা বেরিয়ে পড়ি। এবার সাবিত্রী পাহাড়, ব্রহ্মমন্দির, পুষ্কর হ্রদ দর্শন। সাবিত্রী পাহাড়ে উঠতে ৯'শর উপর সিড়ি ভাঙতে হয়। দু'একজন ছাড়া কেউ এপোয় না। ব্রহ্মমন্দিরে অনেকেই যান। আর পুষ্কর হ্রদ। সবশেষে এসে পূজা ওপরিধি সারেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের জয়পুর রওনা হওয়ার কথা। বীরা জন্যে শোয়াতে শুরু হয়, ঘেরে উঠে বাসের লাগে না, ওরা সবাই ঘিরে চার না। ঘেরেছিলাম, ঘেরে উঠতে না উঠতে মোস্তাফীর চোখেরা ঘরে ঘরে এসে লাগে দিতে থাকে। ঘেরেছেরার সময় হয়ে আমরাও উঠে পড়ি। দীর্ঘ যাত্রার সাজানির পর

আসছে চলেছি। জয়পুর হয়ে আমরা ফিরব পথে ঠিক হয়।

আমরা উত্তরার বিশ্বজয়ের মধ্যেই আছি ছেড়ে দেব। বিমান একদিন যা করেছে তার অন্যথা করেন না। একটা সাদা পাল আমার মুখের কাছে ধরেন। সত্যি কথা বলতে কি ওঁদের জন্য মনটির ভূক ভূক করছিলাম। দূপুরে খেয়েই আমরা মনে উঠেছি, প্রতি স্টেশনে গাড়ির সামে অনেকেরই চোখ ঢুলু ঢুলু করতে থাকে, মুখে কারও কথা সরে না। কোনা প্রায় পাঁচটার সময় যখন জয়পুর পৌঁছে দেবে এবং বিশ্বু পরেই একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াব। নেমে দেখি হোটেলের গায়ে লেখা 'হোটেল রবি'। লাউঞ্জে এসে চাবি নিয়ে ঘরের দরজা খুলে মন তেমন ভরে না। আগেকার ঘরগুলি এর চেয়ে ভাল ছিল মনে হয়। যা হোক অসুবিধা কিছু ছিল না।

বিশ্বজয়ের মতো আমাদের বৈজ্ঞানিক চিঠিপত্র চলে আসে। চিঠিপত্রের পর হোটেলের আলমারীটা একটু দেখে নিতে গেছিলাম। হোটেল কর্তৃপক্ষের কোনও কোনও কৃপণের জন্যে ও অন্যান্য পত্রের জন্যে চিঠিপত্রের সঙ্গে পত্র ফরমার জন্য লিফাফের ছোট ছোট কেক পাওয়া যাচ্ছে। এমনি একটা কোণের আড়াল থেকে কোন পরিচিত গলার সাড়া পাওয়া যায়। একটু উঁকি মেরে দেখি জয়ন্ত ও বিশিখা সেখানে বসে গল্প করছে। ওদের কথাবার্তার দুই এক টুকরো এইরকম।

বিশিখ। তালই তো আমাদের বেড়ানোর শেষ দিন।

জয়ন্ত : কালই কি করে হবে। ট্রেনে তো যাওয়া দুদিন আছতে হবে।

বি। সেখানে কার কোথায় সীট পড়বে ঠিক আছে।

জ। তবুও তো দেখা হবে।

বি। না জয়ন্ত, ফলিস্তরতার উপর যেন ভরসা রাখা ভাল নয়। আমার মন কেমন কেন করছে।

জ : এটুকু তো মেনে নিতেই হবে বিশিখ। আমরা কথাটা একবার চিন্তা করে দেখবো। শুধু নিজে নয়, সবাইকে তোমাকে না দেখলে আমি অস্থির হয়ে উঠি।

জয়ন্তের কথায় বিশিখা যেন লজ্জা পায়। মুখে বলে—

বি : পাগলামী করো না জয়ন্ত। একদিই সবার তোমার কাছে যে আসছে। তাই ভাবছিলাম তুমি সত্যি সত্যিই একটা বিন্দু হব। এরপর কি করে সবার মাঝে আমি মেশে পারি না।

জ : তুমি বিশ্বাস করবে না বিশিখা আমি রোজ রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখি। নিজের জন্য অনেকদিন ধরেই মায়া জাগছেন। তার যেন বড়কে তার মেয়ের জন্য নাকি জন্মও নিয়েছেন। ওনেছি তার জন্মস্থানের কোথাও থাকেন। কিন্তু আমি ছুটি হয়নি। এবার আমি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করব।

বি। সেই মেয়েটি যে ঘরে এনে?

জ : তোমার মাথা বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে বিশিখা। মাকে কোনদিন দেখিনি, তার কথা আসে কি করে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশিখা জয়ন্তের কাঁধে মাথাটি রাখে। এক সময় জয়ন্ত মুছাতে বিশিখার মুখখানা তুলে নিজের মুখের কাছে নিয়ে আসে।

কিন্তু পরে আরও দুই একজন সেই বাথানের দিকে যেতে ওরা উঠে পড়ে।

সন্ধ্যে পড়ে হতে আমি ঘরে এসে টিকিটটা খুলে নিয়ে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিই। মীরাও আমার কাছে এসে তার সারাদিনের সংগ্রহ রিপোর্ট করতে থাকে। কিন্তু আমার রিপোর্ট ওনে সে একেবারে অবাক বনে যায়। ওরা যে এতখানি এগিয়েছে সে ভাবতেও পারে না।

ছুত আরও গভীর হতে চাইনি। হলে ছুত পড়ে। আমরা ফেরবারের পর আমাদের জয়পুরের বন্ধুদের স্থানগুলি দেখবার এবং পরিচয়-এর কথা আসে। সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে বিছানায় পড়তেই ঘুমের দুই চোখে নেমে আসে।

ছোদ্দ

আজ পয়লা এপ্রিল। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা লাউঞ্জে এসে বসেছি। একটু বাদেই বাস ছাড়বে। এমন সময় দেখি এক অভিজাত চেহারার ভদ্রলোক সঙ্গে তরুণীকে নিয়ে লাউঞ্জে ঢুকলেন। তরুণীকে দেখলে গ্রীক দেবীদের কথা মনে পড়ে। দেহ পাথরে খোদাই করা নিটোল শরীর, মাথা থেকে কোঁকড়ান চুলের রাশ নেমে পড়েছে, টানা টানা চোখ, লাবণ্যশ্রীতে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভদ্রলোক কাউন্টারে এসে পৌঁছলে মেয়েরা ঘরে থাকতে সবাই তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। মেয়েরা পেছনে বসেছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে 'হ্যালো নরেন, আমার কেবিনের খবরটা তুমি পেয়েছিলে'। পেয়েছিলাম মানে, 'খোকী তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িও পিছিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে জয়া মাও এসেছে। তুমি আজ এড়িয়ে যেতে না পার'। জয়া মেয়েজনের কাছে গিয়ে 'হ্যালো জোঠু, কেমন আছেন'। বলেই তাঁকে ওপাশ করে। মেয়েজনু, আজ না, আজ না, বলে আজে টেনে তোলেন। জয়ন্ত মেয়েজনুর আড়ালেই ছিল। তিনি নরেন ওহোর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে সেও হাসায় হাসায়। নরেন ওহু জয়ন্তকে বলেন, 'তোমার কথা অনেক ওনেছি আজ, এবার দেখে খুব আনন্দ পেলাম'। চন্দ্রেন ওহু এবার মেয়েজনুকে বলেন, 'আর দেরী কেন গৌরেন। গাড়ী আইবে দাঁড়িয়ে আছে'। এরই মধ্যে জয়া ও জয়ন্তের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়। মনে হয় দুজনেই যেন কোন খুব নক্ষত্রের আলোর সাংকেত পেয়েছে। বিশিখা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল, মনে হল হাসনের আলোয় উঠে কোন কাঁপন লেগেছে। মেয়েজনু জয়ন্তকে বলেন, 'তোকে এই জয়া মায়ের কথাই বলেছিলাম'। নরেন ওহোর দিকে ফিরে তিনি বলেন, 'তুমি যখন জয়াকাকে নিয়ে এসেই পড়েছ যেতে তো হবেই'। তোমার ওখান থেকেই জয়পুর দেখব'। জয়ন্ত কি বলতে যাচ্ছিল, মেয়েজনু তাকে বাধা দিয়ে বলেন, 'না, না, আর কথা নয়। তুমি ঘরে গিয়ে লাগেজগুলি নিয়ে এস'।

মুহূর্তের মধ্যে বিশিখা যে কোথায় হারিয়ে গেল খুঁজে পেলাম না। জয়ন্ত এদিকে ওদিকে তাকায় তাকে খুঁজতে কিন্তু সেও নিরাশ হয়। মেয়েজনু আর অপেক্ষা করতে চান না, অগত্যা জয়ন্ত ঘরে গিয়ে লাগেজগুলি নিয়ে আসতে ওরা বিশিখা ফিরে আসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওহু সাহেবের গাড়ির দিকে এগোন। জয়া বিজয়িনীর মত ওদের আগে আগে চলতে থাকে।

আমাদের আর ছাড়বার সময় হয়। বিশিখা 'বোম্বাই খেল' বলে দু-একবার ব্যর্থ চিষ্টা অস্ফুটে বলেন। এরই মধ্যে কে যেন টেনিয়ে বলে 'অবীরায় বিশিখা আসে বসে আছে'। আমরা আর দেরী করি না।

আসে বসে বসে মনে হল ঘোরের বিনটি ভাল খেলেই পুরো প্যাকেটটাই আনা দরকার হয়ে। আমার কিন্তু প্রথম বিনটি ওড় ঘোর আসে না। গাড়ির মধ্যে নিজের দোষে প্রায় পাঁচ টাকার টাকা হারিয়ে যায়। অবশ্য তার জন্য আমি নিজেকে কিছু ছাড়িয়ে দোষী করিনি। কিন্তু বিশিখার কথা মনে হতে আমার সে অর্থি মুহ্যমান হয়ে পড়ে। কারা সারো আর আজ সকাল, মাঝখানে প্রায় কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান। তারই মধ্যেই তার জীবনের সব কিছু যেন ওলটপালট হয়ে যায়। পিছনে ফিরে দেখি বিমান প্রতিমার মত সে কানাডার পাশে বাইরে মুখ বাড়িয়ে বসে আছে। পরাজয়ের গ্লানিমাখা মুখখানা সে সবার সামনে তুলে ধরতে সংকোচ বোধ করে।

আজ রাজস্থানে খোপালজীর ভূমিকায়, জয়পুরের রাজবাড়ী মহলে, জয়গড় আজায়, মাণোরেশ্বরী চলিয়ে ও অন্যত্র ফোটো আছে। জয়গড় আজায়ে আমরা নেমে কিছু কেনাকাটা সেরে নিই। পরদিন আজে কেন অনেকটা বোধ চলিছিল। ফিরবার সময় বাসে উঠবার আগে দুটো ডাব কিনে আমি ও মীরা দুজনে নিজেরাই ধরি।

দুপুরে দেখি আওয়া-দাওয়ার এলাহী ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আমার আজ শেষ খাওয়া। মাছের ভালিয়া, পোলাও, আমে, দই, মিষ্টি এমন কি কোল ড্রিঙ্কস ও দেওয়া পান। কাজের বাড়িও যেন হার মানে। চা তোফানের পর দুপুরের ঘুমটাও ভাল হয়। পর পর দুদিন দু'রাত্রি ট্রেনে জাগরণ আছে। তাই ঘরটা পুরিয়ে নেওয়া যায় অতি দিন।

আটটা নাগাদ রতের খাওয়া শেষ করে আমরা রাত ন'টায় জয়পুর স্টেশনে পৌঁছে যাই। ট্রেন আসবার কথা রাত দশটায়। তবে আসবার সময় সবার অনুরোধে বৃদ্ধদের একজন গান ধরে 'তাকদির মিলন মেরা ভাওয়া...'। সবাই যেন গাড়ীর অনুভূতির মধ্যে একাত্ম হয়ে যায়।

ট্রেন আসতে আসতে ছাত প্রায় একঘণ্টা আছে। নির্দিষ্ট কোচে গিয়ে যে যার আসন খুঁজে নেয়। রায়চৌধুরী, রায়বাবু, বিশিখাকে আমাদের কোচে দেখতে পাই না। ওরা হয়ত অন্য কোচে জায়গা পেয়েছে।

ট্রেনে নানা অভিজ্ঞতায় ভরা বেশ কয়েক পর্যন্ত ছাওয়া স্টেশনে পৌঁছাই। মেজপাটীর চেয়ারম্যানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসি থেকে আমরা গেটের দিকে এগোতে থাকি। জানলার দিকে চোখ পড়তে দেখি বিশিখা মা, বাবার সঙ্গে এসেছে। মনে হল বিশ্বজয়ের জন্য বিশাল কোন আয়োজনই যেন সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে।

নওসাদ ও তার বৃত্তান্ত

রবীন্দ্রনাথ দাস

ঘেঁষে ঘেঁষে যতক্ষণই তুলল সোমনাথ—ততক্ষণই চোখাচোখি হল সোজাসুজির সঙ্গে। সে যেখানে লোকটি অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছে তাকে। ভ্রূ কুঁচকে কী যেন মনে আনার চেষ্টা করছে। সোমনাথ এতক্ষণ ভালো করে লক্ষ্য করেনি—এখন দেখল মুখটা যেন চেনা চেনা। : কোথায় যেন দেখেছে। কোথায়? কোথায়? মনের যতদূর সম্ভব চেষ্টা করে সোমনাথ। স্মৃতির একদম শেষ থেকে ঠিক ছবিটা : খুঁজে : আর করার চেষ্টা। একটা : হোস্টেল।

সোমনাথের ভাবান্তর দেখে—লোকটি এবার ক্যারেক্টারি চলে আসে। তার টেবিলের পাশে পাশে। ইতস্তত করে কুণ্ঠিত জিজ্ঞাসা করে। "আমার মনে হয় না।"

সোমনাথ মাথা নাড়ে। অস্ফুট স্বরে। "হাঁ। তুমি কেবলরে।" : তখনো স্মৃতির : পর্দায় : অস্পষ্টতা কেটেনি। এবার : হাসলে। বলল। "তোরে চিনতেই না।" : মুই নওসাদ—নওসাদ সিকদার(ওরফে)।"

এতক্ষণে চিনলে সোমনাথ। "তুমি নওসাদ! তাই খুব চেনা চেনা লাগছিল। তা তুমি এই-এত দূরে।"

: "মুই ওই হোটেলে সদা করি।" বলল নওসাদ। "আপনি ইদিকে?"

। "অফিসে নিয়ে এসেছি।" সোমনাথ বলে। "মাস্টার অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। এখন ব্যাঙ্কে : ব্যাঙ্ক করি। কালি হ'ল : এখানে : এসেছি। কিন্তু তুমি এতদূরে আসতেই : পারিনি।"

। "কি : করবো বলুন : আপনি। মোকে : সুখে শান্তিতে থাকতে দিলুনি:চৌধুরীবাবুরা। ফতুরমুকরে :মোর : সর্বস্বি নুটে পুটে নিলে। : তা : মুই পরিবার: করনু। : আরম্ভি হল। : ট্যাকার : জোরে মোকে মেলে পারালে: বাবুরা। পুলশও মোর : কথার কান : দিলে না। ট্যাকা খেয়ে উল্টা কেস : দিকে মোকে চালান দিলে। মুই নাবি চৌধুরীদের ছোটবাবুর মাথায় : লাটি মেরেছি। খুন করতে চেয়েছিনু। : জ্ঞান হল মোর। পাঁচ বছরের জেল। সবই সাত্যেনে। জেলে বেপরে কেলবে-জেলের বিচিত্তার সর্বোনাশ করবে বলি—মোর : ঠিকে ছাড়ি চাটি:বকেকে ওই বাবুরা। মুই নির্দোষ। কিন্তু কে আর কতা শোনে মাস্টারবাবু।

বাবুদের উকিল-মুহুরি সবকিছু দিয়ে:কাতিচি-তবু ফেরতার মতো: বাবুরা পরীলে: কলঙ্ক: লেপতি—এইসব বলি মোকে:খুবী আন্তরক:করলে। জেল:জেলে ছাড়ি গেল। মোর:বিবি কেঁদে:কেটা।। তাকে:মুই খেরচোর দিয়ে বনদু-কাঁধিস নি। পাঁচটা বছর:দেখতে দেখতে:কাটি যাবে। মুই ঘর যা। সাবধানে থাকবি। মাতায় কাজ:কাটাকিনে:কবি। কুসো 'জানবর' হোর:পরিন খুঁ: এমি লিখি:পাসার থেকে মানের বাড়ি পেয়ে:বন্ধোস পুরানের পরিচিতে ফেলে চলি এনু জেলজজবাবু:। সেলদন পেরথের বিবিক মুসা মনতা করনে:খুব। তখন কুকের মতো:আগুন জ্বলতে:মনে মনে সিদ্ধান্ত। করবুম—জেল:থেকে বাহার পরলে পর ওই চৌধুরি বাবুরে সদা যমের বাড়ি পাঠালো মুই।'এই তাদের এক একদিন: মনে পেল নওসাদ। তারপর আজো:কিছু বদলে চৌধুরিরা—সোমনাথ ভাবে:তবে দেশের:কিন্তু নওসাদ, এখন:তো সময়:নেই:এখুনি অফিস বেরুতে:হবে আমাকে। পরে একসময় তোমার সব বৃত্তান্ত শুনলে, কেমন?

। "আচ্ছা:যাদু।' মুহূর্তে:জোড় করে নওসাদ। "মুই হোটেলেই থাকি। এমি মোকে:খবর দেবেন।"

। "আচ্ছা-আচ্ছা।" সোমনাথ:উঠে পড়ে।অফিসের সময়:হয়েছে তার:হোটেল ছেড়ে পথে নামে। মোড়ের পান সিগারেটের দোকান থেকে পান আর সিগারেট নেয়। পানটা:মুখে পুরে:মনে মনে ভাবতে:থাকে:তারপর অফিসযাত্রী হয়ে জনস্রোতে:গা ভাসে।

আজ শনিবার।:কাজে বাজকর্মকম। বেলা:অব্দেলা পর্যন্ত অফিস আওয়ার্স। তারপর:টাকা পয়সা:দেওয়া নেওয়া:বন্ধ। সোমনাথ অফিসে:আসে। নির্দিষ্ট:চেয়ারে:বসার আগে পাখার স্পীড বাড়িয়ে:দেয়। আজ খুব গরম। বাইরে:তপ্ত মধ্যের:রোদুর জাঁকা করছে। দীর্ঘদিন বৃষ্টি নেই। কতালে আগুনের হাল্কা।

টেবিলে:ব্যাঙ্ক:কলের:দোপাটা ঢাকা:খুলে মুখ:হোসে সোমনাথ:এক ঢোক জল খেয়ে নামিয়ে রেখে। ঢাকা:ঢাকনির সঙ্গে। পরিবর্তে ছড়িয়ে:যায় তার:মনে এক ঝলক:মন খোয়াকে ফেরে দিতে:ভালো:সোমনাথ।

টেবিলের ওপর স্তূপ করা ফাইলপত্র:দেখার।একটা ফাইল:টেনে:নেয়।খুলে আগের পত্রের:চোখ:রাখে:সোমনাথ।

মন-ফসল না:ঘুরে ফিরে সোমনাথের:নওসাদের কথাই মনে:পড়ছে আজ।ওর:সঙ্গে:দেখা না:হলেই ভালো হতো।আজকের দায়দিনই:ওর:ডাকনাম যবে। আসলে দেখা:হবার:পরই সোমনাথের মনটা নওসাদের দিকে ঝুঁকে আছে

আগের চেয়ে:করে:সোমনাথ—নওসাদের মতো নিখাদ ভালো:মানুষের সঙ্গেও মানুষ পাজিতা করে: তার ছোটমাঝে সুখ দুঃখের জীবন আজও:রয়েছে তেমনই।

চৌধুরিদের:সঙ্গেই সোমনাথের মামাদিনের উকিলবাড়ি মনের মাঝখান থেকে মুছে দিয়ে সেখানে একটা:ধূসর সব নিজস্ব। মনিকা চৌধুরি বয়সের তুলনায় ম চালেও খুব ছোটবেলা নয়।একথায় পরিণত:ভদ্রিমার মানসিক ছিল। মনিকার:সঙ্গে উজ্জ্বলের একেবারে লাগিয়েছিলেন ছোটো নওসাদ। বাপ-মাটিমেলে ছিল:সেই সুবাদে:কলপিটার সঙ্গে। সাদোল্লা:বিকেলে, মনিকা মাস্টার নওসাদ:সে বিকেল চালাত।এখন চালায় না। তখন ছিলবিস্কাওয়ালা খেল:জর্দুটি। তখন সওদাগরী বইয়ে খেল:জ্ঞান পাকায়। মানুষের:জীবনে কত পরিবর্তন।

নওসাদ যখন কিসমত চালাতো তখন তার সঙ্গে যোগ রাখতে:ইচ্ছে করেছিল:বাপসুলভ স্নিগ্ধি। ওরকমের ইচ্ছে নেই। কিসমত চালিয়েরা মোকাবেলা করতে তাদের জিনতরফা হয়। ছোট ছোট বুথ ছোট ছোট বুথ-ছোট ছোট স্কলার যে ক্রিকেটার বিবিধ জন্য পাব-মাঠকাছে ভবপুর ছিল।

নওসাদ যে শুধু কিসমত চালাতো তা নয়। সে ঠিক ছেলে যাকে বলে—বাঁশি বাজাতো—মাঝে মধ্যে শখের বাজারে পার্টি করতো। তাছাড়াও জানত ফিট, পরিচ্ছন্নতা মানুষের শরীর ঘেরে। অনেক কিছু জানতো নওসাদ। তাই সব কিসমাওয়ালাদের কাছে নওসাদ উজ্জ্বল।

নওসাদের মতো সৎ, সত্যবাদী এবং লাটি বজায়ানসম্পন্ন বোক: সোমনাথ:তাই মেখেছে: নিজের:সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাচ্ছিল্য করে পরোপকারের জন্য ঝড়-বৃষ্টি, রো ঝড় উপেক্ষা করে—অনেকদিন অপেক্ষা করতে দেখেছে সোমনাথ। সকলে:ঘেরে অনিবার্য:করেও নওসাদ নিজে বিপদের ঝুঁকি নয়ন করে সোমনাথের পরোপকারে পৌঁছে দিয়েছে।

নওসাদ বলত : মাস্টারবাবু, সজ্জনটাই বড়ো। মুই হমি কতার মানুষ না হই পারি-তো মানুষ তো হোয়ছি। আপনার কতা মিটিয়ে-সে কতা মোকে দে রাখতেই হবে। মইসি বলার ধান হোয়ছে।

কল্পনা বলত : 'তুমিতো বড়ো ভালোক হবি যাচ্ছ মাস্টারবাবু। সবাই নুটে পুটে নিতি চায়। 'নোকের ভালো টেস টেস ভরি ভরি পরে। এক হাতে কিন্তু কে

[illegible] ছাড়া চাঁদের চাঁদনি মাটি সব। পরিবেশ যত ভাল হোক, মনের ভেতর টান থাকে। তখন মোক্ষ যে এমন 'জানোয়ার' তাও বোঝা যায়—নইলে।'

সোমনাথ তখন ভাবছিল—নওসাদ কি বলতে চায়। তার হৃদয়ের ভেতর কিসের তোলপাড়। সে না বুঝেই বলেছে। 'নওসাদ, তুমি দেখছি আজকাল বড় বড় ভাবনা-চিন্তা কর। রাজনীতি টাজনীতি করছো নাকি?

: 'কি যে বলেন আপনি!' নওসাদ হাসত। 'রাজনীতি মানে তো রাজার নীতি। তা রাজা বলি-কিন্তু পেলেন কবি নিতি চায়। নীতি বলি কিন্তু দেবতে পারেন আপনি? তবু খাই খাই। বিজির তোলি তোল টানা। ওই যে কথায় আছেনে-যে যায় লঙ্কায়-সেই হয় রাবণ। মোক্ষের হাতেও সেই কথা।'

নওসাদের কথার অর্থও হত সোমনাথ। তাকে সে ঠিক বুঝতে পারত না। তুমি বড় বক বক কর। তোমার মাথাটা ঠিক দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখছি। তোমার বিবি-মেয়েকে ঘরে আটি করছে না বুঝি আজকাল।

। 'আপনি যে কি বলেন।' নওসাদ হেসে ফেলতো। 'মোর বিবি মোকে খুব পসন্দ করে। মুই না খেলি-খায়না। মোকে খওয়ায় নিজি না খেয়ি।' তারপর একপাশ হেসে সোমনাথের দিকে কিরে বলত। 'খালী কথনে-তখন বুঝবেন আপনি-বিবি কি জিনুস।'

। 'তোমার যেমন কথা! সোমনাথ ধমক দিয়ে উঠত। 'এসব ছাড়ো আলোচনা ছেড়ে-আমার অফারটায় পৌঁছও দেখি।' সেই সময় সোমনাথের ভিতর তার শিক্ষাদীক্ষার অহঙ্কারের মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। একজন প্রশিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত রিক্সাওয়ালা তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে—এটা সোমনাথের পৌরুষে লাগত। আসলে সোমনাথ সেদিন নওসাদের সঙ্গে জাত-গোত্রের প্রশ্নটাও জড়াতে চাইত। এটা তার মতো মানুষের পক্ষে উচিত নয়—জেনেও। আসলে তার মনের ভেতর পুরোনো চিন্তাধারার কোন পরিবর্তন হয়নি তখন। তার বাইরের থেকে ভিতরে অন্ধকার বেশি ছিল সেদিন।

সেই নওসাদ-আর আজ সন্ধ্যের মেঘ নওসাদ অনেক পার্থক্য। দুয়ের মাঝে কি পার্থক্য হয়েছে। সোমনাথ ও আর সেই সোমনাথ নেই। তার মধ্যেও ঘর ভাঙচুর।

নওসাদের সব কথা শোনার জন্য সোমনাথের মন ব্যাকুল হয়। অখিল দুটির পর সে তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে। গা, হাত-পা ধোয়। মাথার চুল পরিপাটি আঁচড়ায়। পরে একটু সুগন্ধী পাউডার মিটোয়। পা-জামা-পাঞ্জাবী পরে নেয়। তারপর চাবিটা পকেটে পুরিয়ে নিয়ে পথে নামে।

হোটেলে পৌঁছে নওসাদের ঘরে থেকে পাঠায় সোমনাথ। জানালার ধারে একটা খালি টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসে। তারপর একটা সিগারেট ধরায়। ধোয়াগুলো চোখের আর্থায় মেয়ে।

নওসাদ আসে। কদরা পরা। পরনে চেক লুঙ্গি। মাথায় তালিমারা ঝাঁধা। কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। মাথার ঝাঁকড়াচুল একাকার। মুখে মৃদুহাসির রেখা। সোমনাথকে দেখে সাদা দাঁত বের করে হাসল।

টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসতেই সোমনাথ বলে। 'এবার তোমার বাড়ির কথা শোনও নওসাদ। বড় শুনতে ইচ্ছা করছে।'

নওসাদ হাসে। 'পরিবের কথা শোনবেন আপনি? বড়লোক মেহরী নিশ্চয় হচ্ছে না। এই গরীব-গর্বোর কথা শুনি কি হবে আবু।

নওসাদের এই কথার সোমনাথ একটু ক্ষুণ্ণ হয়। বলে। 'তোমার ইচ্ছে না হলে জোরাজুরি নওসাদ। আমি জোর করতে চাই না। এবারকার তুমি আমার কাছে অনেক কথাই পাইবে, তাই—।'

। 'ছি! ছি! বাবু, আপনি রাগ করলেন। নওসাদ জিভ কাটে, নাকে কানে হাত ছোঁয়ায়। 'অপরাধ নেবেন না বাবু—। মুই মুখু সুখু মানুষ—কি বলতে কি বলিচি। মাপ করেন।' একটু থামে সে। তারপর বলে—'শুনুন আবু'।

এরপর নওসাদ সোমনাথের না দেখা-না শোনা ছেলে আসাদিনের যে কাহিনী শোনায় তা শুধু বেদনাদায়কই নয়—মর্মান্তিক।

নওসাদের স্ত্রী মনিরুল চৌধুরীর বিবির মতন বড় পুকুরপাড়ের বাসিন্দা। পুকুরের ওপারে-একটু দূরে চৌধুরীদের বিরাট দালানবাড়ী। এপারে খাপরা চালিয়ে ছাওয়া নওসাদের মাটির ঘর। তবুওদের নিজেদের পৈতৃকানো। সামনে খানিকটা ভাঙা জমি। তাতে সবজির ফলন। চোখ জুড়ানো সবুজ। নওসাদ আর তার বিবি জাহিদা-এসব তৈরিয়েছে।

এই জমিটি আর মাত্র পৌজমার ঠাকুরুক চৌধুরী জবুরাই বিক্রেছিলেন নওসাদের বাপ রওশনকে। রওশনকে দেওঁেন ভেবেছিলেন চৌধুরী জবুর। জমি-জায়গা বন্ধকের ব্যাপারে কোন ওজুহাত খাবলে সামান দিত সে। পরীবের রক্তও বরতে নিজেকে মূল্য দিতে।

সেই রাগ কুড়ো হয়ে মরে গেলে—নওসাদ উত্তরাধিকার সূত্রেই বাড়ি, জমিটুকু পায়। যদিন চৌধুরীদের খুড়ো কর্তা বেঁচেছিল-নওসাদরা সুখেই ছিল। যেদিন কুড়ো কর্তা চোখ বুজল-বদলে গেল সেদিন থেকেই নওসাদের কপাল ভাঙার শুরু। কুড়ো কর্তার ভয়ে এতদিন কেউ নওসাদের পক্ষে খাঁচড় টানতে সাহস পায়নি।

ওরটা নওসাদের বিবি জাহিদাকে নিয়ে। জাহিদা রূপসী-তার খাঁটোসাঁটো যৌবনের যুবতী। সাধারণত গরীব ঘরের বউ, চামড়াগুলো, কৃশসির চেহারা মেয়ে-বউদের মতো নয়। জাহিদা একটু ভিন্ন, স্বতন্ত্রিক। টেকসই নজরে পড়ার মত শরীর তার। আর এটাই তার কাল।

চৌধুরী বাড়ির উচ্ছৃঙ্খল ছেলে কর্তা-সরফরাজের নজরে পড়ে গেল সে। ঘরে যাওয়া-বন্ধাটে ছেলে। মদ আর নারীর শরীর নিয়ে তার কারবার। নজরের দেখবাগে পৌঁছে দেওয়ার মত অনেক ইয়ার বন্ধু তার। জমিদারি ভাব থেকেও—যা মিটে মৌজ আছে—তেমনই তাজানো পাকার আবুনিকি তার স্পর্শে।

সেই ছোটবাবুর নজরে পড়ে গেল জাহিদা। ওকে দেখার পর ছোটবাবুকে দেখা গেল নওসাদের ভিটের আশপাশে ঘুরঘুর করতে। কখনো বা দিপ্রহরে পুকুরের ঝাঁধানে ঘাটের সিঁড়িতে বসে থাকবে। জাহিদা বাড়ির ভাইরে এলে বা পুকুরে এলে টুকি বুঁকি মারে। নানান ছিটিক ইশারা করে। নানা কথায় পঞ্চতন্ত্র-যা জাহিদার বুকে আগুন ধরায়। ভয়ে শরীর রি রি করে।

মধ্যবাগরে পড়ে জাহিদা। একটী অবলা হল তার। অবুঝের এত কু-জনর। এই গোরা পরীরাটাই যত নষ্টের গোড়া। সে নিজেকে যত লুকিয়ে চুরিয়ে রাখে—তত টুকি বুঁকি মারে ছোটবাবুর। জাহিদা অতিষ্ঠ হয়। শেষে নওসাদকে একদিন শোনায় সব। চমকে ওঠে নওসাদ। তার ঘুমন্ত রাগে ফুসে ওঠে। 'আজেলস ছেলে আগুন মরে। নির্বিরোধী নওসাদ সে-সামান হয়ে পড়ে। সে ছুটে নালিশ জানাতে যায় মনিরুল চৌধুরীর কাছে। যতিযোগ করে ছোটবাবুর বিরুদ্ধে।

সব শুনে বড় আবু হেসে যান নওসাদের ওপর। বলেন। 'তোর সাহসতো কম নয়! ছোটবাবুর নামে অপবাদ দিতে এসেছিস! তোর বিবি কি এমন ডানাপরী—যে এমন কাণ্ড করবে ছোটবাবু! যা ভাগ, ভাগ—'

। 'আপনি বিশ্বেস করেন হুজোরবাবু'—নওসাদ হাত জোড় করে। 'মুই মিছে বলতিছিনি। মোর বাপ আপনাদের নেমক খেয়েছে-মুই এমন নেমক হারামি করবো।'

: 'যা-যা। পাগলের মতো আবোল তাবোল কি বকছিস! যা, ঘরে যা।' বড়বাবু হাত নাড়েন।

কি আর করবে নওসাদ? মুখ ঘুরি ফিরে আসে। বিষণ্ণ, চুপচাপ বসে থাকে দাওয়ায়। ভিন্না মাথার ভেতর ছটপটানির। জাহিদা পাশে এসে দাঁড়ায়। শুধোয়। 'কি হলো গো? কি বলল বড়কাবু?'

। 'কলম, বিশ্বেস করতি চাহনে। উল্টে ধমকাল মোকে। মুই নাকি মিচিমিচি ছোটোবাবুর দোষ দিতিচি।' নওসাদ বলে, 'ঠিক আছে। মুই কলা আর কিসসা চানতে আসিনি। ঘরেই পাববেখ। দেখি-কুন সুপুরুষ তোকে চাঁদ মারে। পালায় পুলিস ভাল তাহারো। শালা-মেয়েছেলের ইজ্জতে হাত বাড়ানো—'

কথামতো পরের দিন নওসাদ ঘাপটি মেরে রইল। ঘাটের পাশে ঝাঁকড়া আমগাছটার ঘন পত্রপল্লবের অন্তরালে। একটু বসেই মেঘ গেল—এদিক-ওদিক তাকাতে ছিপ ছড়ে ঘাটের দিকে ছোটবাবু আসছে।

কথামতো জাহিদাও বেরুল বাড়ি থেকে। কলসি নিয়ে নামল ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জল ভরতে। জলভরে ওপরে উঠতেই—ছোটবাবু হাসতে হাসতে জাহিদার সামনে এসে দাঁড়াল : 'কি গো বেহেস্তের হুরী, মেরী জান। আর কতদিন তোমার পিছন পিছন ঘুরবো। একেশ্বরে নবেজান করে ছাড়লে মাইরি। বিশ্বাস যে' আর সয়না।'

জাহিদা ঘুঁ চোখ ঘুরায় আগুন ছুটিয়ে বলে : 'ছি! ছি! ছোটবাবু। আপনি মানী ঘরের লোক। আপনের মুখে এসব কথা মানায়? মোরা গরীব, একবারে পরে আছি-এদিকে কু-দৃষ্টি! লজ্জা ছাড়েন—'

ছোটবাবুর দাঁতবের করে কুৎসিত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে ছোটবাবু। 'আহারে মোর মরনা-তোকে ধরিয়ে খেতে পরনা। কেন সুখ কপালিসে তো! আহা, পরান একেবারে ঝুরিয়ে যায়। আন-চুকে যায়। তোকে একটু সোহাগ-আদর করি। পরানটা মোর জুরি।' ঘুঁয়ত তলায়িত ছোটবাবু জাহিদার দিকে এগোয়।

আর আর কোথা। আমগাছ থেকে হঠাৎ তরে লাফ দিয়ে নামে নওসাদ। তারপর হুকারে ছাড়ে : 'তবে রে শালা, মানী ভদ্দরলোক। শালা ঘুঘু মেরেছো-

মুখের ভাব দেখেনি। মোর ঝিমিয়ে যে-ইজ্জত। আজ তোকে খুন করেই ফেলবে। দেখি-খুন করার জোরে কতদূর।' আগাই নওসাদ সাপ নিয়ে হোটেলবাবুর গলায় পাকানো চাদর চেপে ধরে।

যে-পরিচয় দেখে হোটেলবাবু টিৎকার করে ওঠে। 'বাঁচাও-বাঁচাও। মেরে ফেলছে-খুন করে ফেলবে।' হোটেলবাবু চেঁচামেচিতে-তার আরও চোখজ্বল বের হয়। ছুটে আসে। ততক্ষণে নওসাদ হোটেলবাবুকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বুকের ওপর আসছে। দু'হাতে গলা চেপে ধরেছে। ছিপ ঘাব হয়ে পড়েছে হোটেলবাবুর। নাভায় খুন চেপেছে তখন নওসাদের।

সোকজন না পড়ে পেলে-সেদিন হোটেলবাবুর প্রাণটা না হয়ে যেতো না। খুব বাঁচা বেঁচে গেল হোটেলবাবু। লোকজনেরা টেনে হিঁচড়ে হোটেলবাবুর বুকের থেকে নামায় নওসাদকে। তবুও সেই অবস্থায় নওসাদ মাটিতে পড়ে থাকা হোটেলবাবুর পায়ায় দু'একটা লাথি কষায়। থু থু করে তার মুখে থুথু ফেলায়।

অবুঝ লোকজনেরা তাকে ধরে নিয়ে গেল বড়বাবুর কাছে। তখন বড়বাবু বি একটা ব্যাপার দেখছিলেন। টেবিলেটি ওপর ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছিলেন। টেনেটুনে নওসাদকে আনতে দেখে ওধোলেন। 'কি হয়েছে রে।'

সব শুনে বড়বাবু হেসে পায়ের জুতো খুলে মেরে মারলেন নওসাদকে। তারপর হুকুম দিলেন। 'আটকে পিছমোড়া করে বাঁধো। থানায় খবর দে।'

বড়বাবুর জুতোর মার খেয়ে নওসাদ তখন ঝিমুনি ঘোরে ঢুলছে। বড়বাবুর দিকে চেয়ে হিসহিসিয়ে বলল। 'ছিল দোষে আপনি মেরে মারলেন। আপনের চাকরের দোষ দেখলেন না। ছি। আপনি অবুঝ মানুষ নোক।' থু থু করে তাকে একহাত থুথু ছিটালো নওসাদ। বড়বাবু আরো ক্ষেপে গিয়ে মারতে উদ্যত হলেন।

নওসাদের পিছন পিছন জাহিদাও এসে ঢুকেছিল কাছারিবাড়ির সামনে। নওসাদের প্রতি অত্যাচার দেখে জাহিদা চিৎকার করে ওঠে। 'অকে, অমুন মারবেন না বড়বাবু। ওর কুনো দোষ নি। আপনের ভাই, ওই হোটেলবাবু, মেয়ে ইজ্জতে হাত দিতে গেছলো। তাই ওর মাথায় খুন চড়া গেলো।'

'আয়া, কি আমার সতী লক্ষ্মীরে। একটা নেংরা কিস্তাওলার ঝিকির দায়ে আপনাই করতে গিয়েছিল। হোটেলবাবুর আর খেয়ে মেয়ে কাজ নি।' ভেংচিয়ে ওঠেন বড়বাবু। 'এই, বের করে দেতো এটাকে।'

'আপনি বিশ্বেস করেন বড়বাবু।' জাহিদা কাঁদো কাঁদো হয়। বোঝ হয় সে বুঝেছিল-অবুঝের কুলাঙ্গার ছেলের পক্ষে কথা বলা। অবুঝের অর্থবল,-লোকবল আছে। তাদের কি আছে। তাই সে বলে: 'মুই মিছি কতা কয়তেছিনি। আপনের পা ছুঁয়ে কলিচি। কত্তা অবুঝ পায়ে ধরিয়াসিছি তার দিতে যায় জাহিদা। বড়বাবু প-সাঁচকে পা সরিয়ে নেন।

'তার গায়ে হাত দিলিস তুই—এঁ।' জাহিদাকে বলেন বড়বাবু। 'এ শালা তখন মেয়ের ছিনে আছে—যে তোর কতা শুনবে। পরনার মেয়ে শালার মুখকে সরা জান করতেছে। আর পালা দুনিয়াকে ছারখার—বড় লোকের পা চাটতিছে। তার নাকি শালা অমুন তখন মেয়ের মুকে।' নওসাদ ছাপে অধিকারী।

নওসাদের ঝাকড়চুল দেখে বড়বাবু নাক কুঁচকে ছেলে-নওসাদ নাকি মেয়ে মানুষবাড়ি করে-তবে তার ঝাকড় চুলগুলো-ছিটিয়ে দেবার কথা বলে। ও ছাড়া আরও ছড়ালেন। দেখলেন যে তাকে চাঁদার।

খানা থেকে দারোগা পুলিশ এল তারপর। অবুঝবাবুর সঙ্গে কথা বলে বসে গিয়ে কি ফুসুর-ফাসুর হল—তারপর খাপ্পাভাব হল। নওসাদ মুক্তন—তার বিরুদ্ধে মিথ্যে কেস সাজানো হবে। তাই সে চিৎকার করে। 'খোদা, ওগু বড়বাবুর কতা ওনলি তো চলবে না। মোর কতাটও শোনেন, বিচার করেন, তবে তো বুঝতেন দোষ তার কতি পারে। নইলে মানুষ খেপি একতলা কেস সিদি দি ছাড়ে। তবিও জানি পরিবর্তনের কতায় আপনের ক্ষমতাকুকেন না। নেকের তো টাকা পয়সা নি—দু'চারশো খাঁয়ে মুখে হাতে। অতত আপনেরা পুলুস বিচার আপনে গে হাতে।'

নওসাদের কথায় দারোগার চোখ লাল হয়। এত লোকের সামনে টাকার কথায় প্রভু অপমান বোধ করে। ধীরে ধীরে চেপে তিনি নওসাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ান। তারপর সজোরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেন তার মুখে। তারপর কনস্টেবলদের হুকুম দেন। 'থানাতে আনো তোল।'

পুলিশরা নওসাদকে কোমরে দড়ি বেঁধে টানের সঙ্গে নিয়ে আসে। তারপর সজোরে তার পায়ে একটা লাথি মারায়। 'ওঠ শালা। জাহান্নম ওঠ।'—

নওসাদের ঠিকের ওপর দাঁত পড়ে যায়। ঠিক ঠোঁট রক্ত পড়ে। সে থুথু করে রক্তমিশ্রিত থুথু ফেলে। মুছায় তা মিশে যায়। পুলিশের প্রতি একটা ঘৃণায় ভাব শরীর জ্বলে ওঠে।

নওসাদকে নিয়ে পুলিশ জীপ চলে গেল। সজল চোখ জাহিদা দাঁড়িয়ে রেখে। নওসাদের জন্য তার বুকের মধ্যে হু হু করে।

জামিন কেস হল। উকিল-মুহুরি খুব করছে তারপরও অপরাধ। দরিদ্র, নিরক্ষর বিক্সাওয়ালার কথা কেউবা শোনে, কেউবা বিচার করে। এক তরফা বিচার হয়ে গেল নওসাদের। দীর্ঘ সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

জেলে ঢোকার আগেই নওসাদ প্রতিজ্ঞা করেছিল—জেল থেকে বেরিয়ে সে এই মিথ্যা অপমানের প্রতিশোধ নেবে। নিজের হাতে খুন করবে হোটেলবাবুকে। তারপর ফাঁসি যাবে। ফাঁসার পরে, গলে যাওয়া দুনিয়াটার মুখে লাথি মেরে সে বেরিয়ে যেতে নিখোঁজ হয়ে যাবে। এই দুনিয়াটা শুধু বড়বাবু-হোটেলবাবুর না—তারও। মনে ভাবছে—তারও একদিন ওইসব মানুষের মাথায় উঠে নাচতে পারে।

কিন্তু মূর্খরাও নওসাদের। তার সে আশা পূরণ হয়নি। বরং তার বুক আগে ভেঙেছিল-জাহিদার জন্য। তার ছেলে হওয়ার পর—একদিন রাতে তার ঘরে আগুন লাগে। সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জাহিদার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। একদল ডাকাত নাকি টানে নিয়েছিল তার ঝাড়িতে। লোকের ধারণা-তারাই জাহিদাকে লুট করে নিয়ে গেছে। কেননা ডাকাতেরা লুটপাট করে চলে যাওয়ার পর জাহিদাকে কেউ দেখেনি।

নওসাদ জানে—এই ডাকাত কারা। কারা তার সর্বস্ব লুট করেছে। কিন্তু আজো তাদের চিহ্নিত করতে পারেনি নওসাদ। চিহ্নিত পেলে সে জাহিদাকে আবার সন্ধানে ঘরে ফেরে নেবে।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে নওসাদ গিয়েছিল হোটেলবাবুকে খুন করা উদ্দেশ্যে। তার নিখিল উপলব্ধের মূলত আঘাত করতে কিন্তু ছাত পরিচিত টপাস পরাবর্তন জনসাগরে থক হোটেলবাবুর অস্তিত্বই চান—তখন সে রীতিমত চমকায় পড়ায়ছিল হোটেলবাবুর। চকোস পরিচয়ের দিকে তাকিয়ে নিজেই ভাবল। ওর পায়ের পদে-হোটেলবাবু চোখে—নওসাদকে দেখে ভয়ে, আতঙ্কে-তার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। হোটেলবাবুর অবশ্য সাত পাঁচ দু'পুরী হাত একটিতে ধরে ঘাড় চাইবার ভঙ্গিতে ঘুরাতে-নওসাদ যেন কোন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট পড়ে। যে প্রতিজ্ঞা আর আক্রোশ বুকে নিয়ে জেলে ঢুকেছিল সে মুহূর্তে কোথায় হারিয়ে গেল। সে ভাবল—এই ধরে মুহূর্তে ঘুরি মারিয়ে কি লাভ। এতো সবেই গেয়ে মানুষকে মারার পৈরুষ নেই। বরং কলজে কাঁপি ভয়ে পড়িয়ে।

অতঃপর যে পথে এসেছিল-সেই পথে আবার অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছিল-সেই নিজ ঘরে ফেরা আগেই। মনটা তার খুব অস্থির হয়েছিল। সেদিন হোটেলবাবুকে শাস্তি দিতে পারেনি বলে নয়—জাহিদার জন্য।

তারপর থেকে জাহিদাকে নওসাদ অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে—কিন্তু সন্ধান পায়নি তার। এ গ্রাম-সে গ্রাম এখানে-ওখানে, কোথাও না। অবশেষে সে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে এই বেলটেসে চরবি নেয়-শহরে উপকণ্ঠে। তার বিশ্বাস-জাহিদাকে একদিন সে ফিরে পাবে। একদিন সে ঘরে ফিরবেই। নতুন করে সাজে পাতবে। নতুন দিন-নতুন জীবন।

তার কাহিনী শেষ করে কিছুক্ষণ আগে সোমনাথের জন্য অপেক্ষা আনতে গেছে নওসাদ হোটেলে লোকজন তেমন নেই। দু'একজন ছড়ি ছিটিয়ে এ টেবিলে ও টেবিলে। ফুরোসেন্ট লাইটের আলোয় উজ্জ্বলিত চতুর্দিক। হোটেলের বাইরে, গাছ পালাগুলিতে সেই আলো গিয়ে পড়েছে। চকচক করছে পাতার সবুজ পাতাগুলো। বৈশাখের খরার জন্যই নয়—মালিক ঘরের হাতে সবুজ, সৃজিকল পর পল্লব ছাইয়ে আজ একদম চাঁদ ওঠেনি। হয়তো এর পরে উঠবে। আলোর ধন্যায় ভাসবে চতুর্দিক মুহূর্তের হাওয়া দিচ্ছে। ঝিমঝিম।

এই চৈত্রের আলো, এই পরিবেশ নওসাদের জীবনে আসবে। নওসাদের বাপনে—জাহিদার হাতে তোয়ায়—শরীর নিশ্বাসে ঘুরে যাওয়া পর পর ঘরের সাক্ষীবিহি হয়ে উঠবে। গড় সবুজ, সৃজিকল নবজীবনের প্রতিজ্ঞাবি। ব্যথাটা মনে হতে মুহূর্তে ভুল ভেঙে গেল নেওসাদের। সজাগে কখন যে নওসাদ সবার নিজের জীবনকে মিশিয়ে ফেলেছে বুঝে পারেনি সেনওসাদ। এখন তার মনে হল—নওস ঠিকই বলেছে—দিন আসছে—নতুন দিন।

নীলাচলের আঙ্গিনায়

রতন চট্টোপাধ্যায়

"কেন্ পাখীর ডাকে ঘুম ভাইঙ্গাছে ক্যামনে আমি ক'বো
মন হইয়াছে উদাস আকুল আমি ক্যামনে ঘরে রবো।।"

স্টাকচুটধারী বৈরিক বসনে ভূষিত আধ-চন্দ্রধারী ভাউল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। উদ্ভ্রান্ত চোখে-মুখে বেহদ্দ বসন্তদিনের বাস্তবতার। তার হাতে উঁচু করে ধরা একতারা। বাঁ হাতে খঞ্জনী। তার পায়ের পেঁয়াজি ঘুঙুরের মালায় শোভিত। তার কাঁধের ঝোলায় চলার সম্বল। বড় বড় চোখের তারায় উদাস বিহ্বলতা। কথায় ভরা, চোখে ধরলে মন ভরে। আবার মনে ধরলে ঝুলে। সাধুর চোখে মনে ধরেছে বাঁ মন নয়নের ভরা অধরায় ধরে। যদি বলো কেন? তবে এখির ভাষায় বলি, সে কথার সবিস্তার উত্তর। বাঁ উত্তর দেবো বাঁ নিয়ে কেজাকো আমার কারবার। যদি বলি, ওর চোখ মুখ ওই উদাস ভিক্ষুর চোখের তারার মারমের চাউনি, ওর বলিষ্ঠ দেহের মনোহরণ চলার ছন্দ অথবা সুরের নির্বিদ্বিতা ওই সুললিত কণ্ঠস্বর। বলবো না, সে সব কিছু নয়। তাহলে? ওই যে বললাম, সে কথার সবিস্তার উত্তর। অন্ততঃ আজের ভোরে যে মনোরম তার কাছে নেই, এটুকু আর জানি। বইলে, এই যে আমি পুরে কলকাতার, সহকর্মী আর দুই বন্ধু এবং তাদের ছেলেমেয়েদের চলেছি পুরীধামে জগন্নাথদর্শনে, এই বা কেমনে সম্ভবিতো। এই ট্রেনের কামরার সবার বরাবর সামনে সিটিতে পাদদর্শন শরীর নিয়ে বাইরের শিশুবিদ্যুত্ দিকে অন্তরাত্মার আবরণে ঢেকে স্মৃতির মুখপানে চেয়ে ছিলাম। ছুটে চলা ট্রাকগুলোর প্রচণ্ডের জলকণি, ঘরে-বাইরের বস্তু কোলাহল চেতনের তারায় ভেসে ওঠে সেই স্টাকচুটধারী বৈরিক বসনে ভূষিত ভাউল। যাকে একটু আগে ট্রাকগুলোর বাইরে টালির স্টেশনের পাশে খোলা দোকানের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখেছি। ওনেছি।

"কেন্ পাখীর ডাকে ঘুম ভাইঙ্গাছে ক্যামনে আমি ক'বো
মন হইয়াছে উদাস আকুল আমি ক্যামনে ঘরে রবো।"

গুন গুনিয়ে সেই উদাস বিহ্বল দৃষ্টিতে বিশ্বে চিকিয়ে, ঠোঁটের কোণের হাসি ফুটিয়ে কাছাকাছি কাউকে, বোধহয় আগুনা বন্ধু আমাদেরই বন্ধু ভেবে চকিত বিস্ময়ে জানিয়েছিলাম, আমি পুরীধাম, জগন্নাথদর্শনে। তখনও হাতে সময় ছিল। সুরত আর অঙ্গেশ অনেক পুস্তকালয় থেকে দেশান্তরে জন্য বেছে বেছে সাটকেশ ইত্যাদি বুনিয়ে মাথার চাপিয়ে, কিছু বিক্রেতার চারে নিয়ে ট্রাকগুলো নুকে পড়েছিল। আর আমি ওদের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। বাউল দাঁড়িয়ে ছিল আমার সামনে। তাঁর চোখে দেখেছিলাম বিস্ময়। সে চোখ দুটো একটু সরিয়ে, আমাদের সবাইকে ঘিরে চেয়ে নেয় ফিরে ফিরে করে (বলেছিল, জগন্নাথদর্শনে না, আমাদেরকে আগুনা বন্ধু সমুদ্রদর্শনে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা করে দিতে। আমি বিস্ময় সুরতের মন্তব্যবিলাসিতা শুনে নিয়ে চেয়ে হাসি বলেছিলাম, না ভাউল তোমাদের, আমরা জোক সুজন।

বাউলের কথাগুলো যেন সুরের মূর্ছনায় ভরে পড়েছিল। তারপর মিষ্টি (বলেছিল, তবি...আমরা ওর বিরে ঐ ট্রাকগুলোর ভিড়ে বাউলের দুঃখুরের শব্দ মিলি মিলিয়েছিল। কিন্তু তার বেশ কুছি এখনও বেজে চলেছে আমার কানে আমরা যাওয়া হচ্ছে জগন্নাথদর্শনে না, সমুদ্রদর্শনে। আহা! ভাউল পাগল কী তবু মেজ বিলাস বাসিত ওই দেবদেহীর অনুরণ অনুরণে বিশ্বে এসে মিশিছে। বিংশ শত তোলকাতার একটা সুরমন্ত্র স্টেশনের পাদদুলে ট্রাকগুলোর উইংসের অন্তরালে অনিন্দ্য দেবকান্তির কী অদ্ভুত আবির্ভাব।

সত্যিই তো চলেছি সমুদ্রদর্শনে, জগন্নাথদর্শনে, মনে মনে স্বাদু। ভাবে সেই পুরীধামে, ঈশ্বিত সেই সমুদ্রে অথবা সমুদ্রের বাছেই যখন, তখন অন্য (বলবোকো ও আর বলবে কে। এসব তো আমাদের জানার কথা। উচ্চকণ্ঠ সমুদ্র ও এ কথা জানি, সুরত, পরেশ আর আমি। আর সবার সুরতের সেই আবলিতা পরেশের দুই সন্তানের জন্মই দেখা। আর মনে আমার ঘণ্টাই অনেক। বাস্ত মুখে একবারও ওনিনি জগন্নাথদর্শনের কথা। বুঝি তারাও জানতে আছে, সমুদ্রদর্শনে। তাছাড়া, কবে- পর্যন্ত যাওয়া যে কথা, সে কথা অপরিচিত এই সাই মুখের হাসিতে চোখের তারায় মিলিয়ে এবং মুখের ভাষায় সবকিছুময় বাতাসে (করে। আগুনাদের যাওয়া হচ্ছে জগন্নাথদর্শনে না, সমুদ্রদর্শনে। আর বোধকরি য হলে সেই গান শুনে :

'কেন্ পাখীর ডাকে ঘুম ভাইঙ্গাছে ক্যামনে আমি ক'বো
মন হইয়াছে উদাস আকুল আমি ক্যামনে ঘরে রবো।'

কখন শুনেছি জানি না। অন্ততঃ ঘুমে কিংবা জাগরণে স্বপ্নে বা স্বপ্নে জানিনা। তবে শুনেছি, জগন্নাথ না টানলে তার দর্শন ঘটে না জীবনে। অন্তত যে জগন্নাথের কথা বেশেছি, মনে পড়ে না। মনে পড়ে, ভেবেছি সমুদ্রদর্শনে একবার না, অনেকবার। তবে কি সে পুরীধামবিলাসীই সমুদ্র যার নাম সমুদ্র। সমুদ্র বিরাজ আছে, আর আছে যারে কাছে তারাও ব্যবধানে--তবে অন্তরতম আগুনা (পরের কড়িই যা আসবে কোন্ছে থেকে? একজনে যে জানিনি তা না। তবে জগন্নাথ

[illegible] দেখেছি...তবে এটুকু জানি, পুরুলিয়ার এ মাধ্যমিকপরীক্ষার সেন্টারে আমাদিগকে যাঁরা বাঁচালেন পেখা মেয়েদের সঙ্গেই কেমন জড়িয়ে, একসঙ্গে, অভাবে তাকানোর ভিতর যে কারণে নিজেরই মনে হয়েছে, আর নয় মন, এবার চল ফিরে পড়ি। তবে সেই ফেরিয়ে পড়াটাই কী টান, যে টানে তলেই এখন পুরীধামে। সুব্রত ঠিককরে বলেছিল, জয় মা বলে বেরিয়ে পড়ি। হয় এসপার, না হয় ওসপার। আরে সমুদ্র তো দেখিল নি। খাল-বিল দেখেছিস কিন্তু জানিনা। আমি দীঘার সমুদ্র দেখেছি। কিন্তু ওনেছি, পুরীর সমুদ্রটা জাতই আলাদা। একটি বার দেখে এলে জীবন সার্থক। ভূভারত ব্যাক-এর পৃথিবী শ্রেষ্ঠ মৃত্তিকা।

হেসে বলেছিলাম, তুমি তো ভালো ভেতরে কেমী, কিন্তু চরিত্রিকটিটি যে তার হাতে। তবে পরেশ সুব্রত হেসে ফেলে পাল্টেছিল। মাইরি, একখানা ফেকেছিস। কিন্তু সত্যিই জগন্নাথ দেবের কথা একটিবারও মনে হয় নি। শুধু সমুদ্র, সমুদ্র আর সমুদ্র। আহা! সমুদ্র দেখার জন্য মনে তলে যে আকোকুনিই না তুলেছে। সলোকে সলোকে ওই একটা কথাই ধ্বনিত হয়েছে, যার সমুদ্রদর্শনে—জগন্নাথদর্শনে না। সেই মনের আসল কথাটাই বিদেশী ভাষায় কেন তাঁকে জেনে নিয়েছে। আশ্চর্য! বাঙালীদের ঘাংড়া হচ্ছে সমুদ্র দর্শনে, জগন্নাথদর্শনে না।

সহসা পুরী এক্সপ্রেস ফুসে উঠলো, আর অমনি যাত্রী-যাত্রিনীদের কলরব চিৎকার তুমুল উঠলো। সবকিছু মিলিয়ে একটা দারুণ ব্যস্ততার ঘেরা পাড়ার কামরা সরগরম। এই ফেপলা, মেডিটো কোথায় ফেকেছিস, ঠিক জায়গায় ফেকেছিস কিনা দেখ। বাপ সরল তো একটু— ওহ রিজার্ভেশান কামরার এই অবস্থা। ওহ্যুন—। এই মিলি, মিলি তখনও কামরার ওপাশের দরজায় দাঁড়িয়ে সহযাত্রীর কাছ থেকে কিছু নিচ্ছিল। উফ্! চলে আয়, এসে বোস। এ অকূলোক, হামকো সিঙ্গিয়া ফেকিয়ে ফেল একজনের একজন সামনে টিনিটোনা ফেলে ধরলো। ইত্যাদি জনের কলকলে গমগম করছে কামরা। এমন সময় প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এক যুবতী (যুবতীর দূরের দিকে না তাকালে কেউই বোঝ না) আর এক যুবক (যুবকেরই ফোলানো আর মাথার চুল কাঁধের ওপর ঝুলছে) কোনোমতে ছুটে এসে হাতেল ধরে পা-দানির ওপর পা দিয়েছে কি ফেলনি একনিমেষে আমার পাশ ফেঁসে ঢুকে পড়লো কামরায়। কামরার ভিতরে যাত্রীদের ওদের পরিচিত মুখের দিকে চেয়ে আমি হতভম্বের দিকে ভরে দাঁড়ালাম। ফপস্। যুবতীর কণ্ঠে কপট রোষ ধ্বনিত হলো। তুই না হয়ে—যদি হ্যাণ্ডেলটা ফসকাতো। যুবক হাঁপাতে হাঁপাতে ধমিকতা করলো, তাহলে, তোর নামে একটা পর্বত কেনী মন্দির ফেলতাম। নয়তো—। ভয়ার দিয়ে উঠলো যুবতী, নয়তো কি। ফলে মু দাঁড়িয়ে ঠোঁট ফেলালো। যুবক হাসতে হাসতে বললো, আসলে মেপ্লনে কী মেইয়ার অভাব। ইডিয়েট, মেয়েটি মুখ ফেলকা করে দরজার দিকে একটু সরে দাঁড়ালো। মেয়ে দেখলেই নোলায় জল কছতে থাকে। তারপর মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে হয়ে ঠোঁট ফেঁকিয়ে বললো, কী আয়ে ফেলার মধ্যে বলতে পারিস। মেয়েটি হেসে সহজ করে বললো, তোর মধ্যে ফোঁ ফোঁ নেই, ফেলার মধ্যে তা আছে। মেয়েটি তেমনি মাথা ঝাঁকিয়ে, চোখ দুটো ভারী করে বললো, হুঁ। ফোঁ আছে। তাহলে ওকে নিয়েই এলি পালাতিস। যুবক তখন হেসে টোকিয়ে, বললো, ওইটেই তো কথা পরে, পেয়ের কী ফেলার হাতের মোয়া—। মেয়েটি কামরার দেওয়ালে ওতক্ষণে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং দু ভেঙে ঠোঁট ফেঁকিয়ে প্রেমেটির কথাটাই ফিরিয়ে দিল, ওইটেই তো কথা পরে। পেয়ের কী ফেলার হাতে মোয়া। ফাজিল একটা—বলে চকিতে ঝটাক ফেলে আবার ঠোঁট ফেলালো, পেয়ের ভীষণ একটা ছুরে ঘিনিস—তাই না সরল, বলে একটু কুঁজো হয়ে তার যুবকের উপর খুতনি ফেঁকিয়ে খিল খিল করে ফেসে উঠলো। আমি যে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছি ওদের পাশে, তা যেন ওদের খেয়ালই নেই। প্রেমেটি মু-পা এগিয়ে মেয়েটির খুতনিতে হাত দিয়ে সহসা মুখে আমার দিকে চেয়ে কিক্ করে হাসলো। জানেন দাদা, মেয়েদের বড্ড সেন্টিমেন্টালি, একটুতেই মন ভোমরা কিনারে যায়। মেয়েটি জিভ বার করে বললো, ধ্যাঁ বিশ্রী যায়—ফলে আমার দিকে চেয়ে গলায় কত মিষ্টি চুক করে বললো, একদিন ও খী বিশ্রী খাওয়াবে। আমি একটা ছেলের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলি, ছাড়ি, তখন দেখলে যেমন তোমার ফেটাল পিস বজায় থাকে। আমি মৃদু হেসে সমর্থন জানাই। সহসা আমার দিকে চেয়ে বললো, কোথায় যাবেন, পুরী? আমি ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলাম, হাঁ। মেয়েটি হেসে বললো, আমরাও পুরী যাবি—বলে প্রেমেটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ও আমাকে সমুদ্র দেখাবে। আমি মেয়েটির ওর কথা শুনে। ঠাট্টা ঠাট্টিয়ে হেসে সায় দিলাম, তাতোই তো। কিন্তু জগন্নাথদর্শন। মেয়েটি কথোর দিয়ে উঠলো, মাত্র একবার আসবি, কিন্তু আসবি, পুরীর পড়ন্তর মাটি ছোঁয়া ছাড়ে—মেয়েটি আর ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে বললো, হাঁ-হাঁ-আমরাও ফোনকাতার ঝাঁকড়াচুলীর পাল্লা ধরলার হলে ঠাট্টা করতে এক মিনিট ভাইয়ে সাপবে না। তা কী একাই যাচ্ছেন নাকি। বললাম, না, আমরা আমিদি মিলে যাচ্ছি তিন বন্ধুতে, আরেকও আছে সঙ্গে। মেয়েটি হো হো করে হেসে উঠলো, তাহলে কবিতাদের সেই 'গতির পুত্রে সঙ্গীর শূন্য মহিলে ঘরে' আর হলো না। মেয়েটি হেসে বললো, সময় ভোর মনে নেই, এটা আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ চলছে—মহিলাদের সব ব্যাপারেই অগ্রাধিকার মূলনীতি, তো। তা বলা, আপনারা কোথায় আছেন? আমি স্বাদ না দিয়ে আসলের জায়গাটা বেঁচিয়ে দিলাম। ও, তাহলে তো ভালো হলো। আমাদের পাশে। বলে মেয়েটি হেসে দুলতে দুলতে সীটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। সময় একটু ভোরে বললো, মাথের উপর মালপত্তরগুলো ঠিক আছে কি না, দেখ। সহসা আমার দিকে চেয়ে কুঁচকির উপর পাল্টোর পকেটে হাত গলিয়ে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই বার করে আমার দিকে চেয়ে বললো, চলে-নাকি দাদা? আমি হেসে ব্যস্ততা জানিয়ে বললাম, চলো, তবে এখন আর নয়। তাহলে আমি ডাকিয়ে যাচ্ছি। সময় সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়লো, কী বিশ্রী গরম পড়েছে দেখেছেন। পরক্ষণে ঝরে হেসেটিকে ডাকলো, এই সময়, সিট্ অকোপায়েড। সিনসীয়র আর, এ সীট তো আপনারপক্ষো নেহি হ্যায়—মেয়েটির গলা। ওদের সীট্ খুজনে অন্যজাতীয় মহিলার মনে ভাব ভাব করে তাকিয়ে আছে। তারপর, এ মনুয়া, কৌন আয়রূ হে ছাত্রসোলাপকো খুশা কে ফর কাম্য পর যাইতেলছ রে। ফলে ঘুমন্ত আত্মাবাসিনীর কাঁচঘর। তখন ওপাশ থেকে মনুয়া নামক পুরুষটির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো; ইধার চলা আও জ্ঞানী, হামলোগুলুক্কু, সীট ইধার পড়া হুয়া হ্যায়। পাশ সহসা খিল খিল করে হেসে উঠলো। তারপর মেয়েটি (ঠিক বলে ট্রেন ছাওয়ার তলিয়ের মু-হাতে মাথাটা জড়িয়ে) আনে জনে কী সব বেন বললো। সময় মাথাটা নেড়ে ঠিক হ্যাং বলে হাসে, চোখ রাঙিয়ে, ব্যাপারটা মিটে কেটে কেটে না পড়ে। জনতে বলতে সীটের উপর পাশের পাশে বসে পড়লো।

সহসা সুব্রতকে চোখে পড়লো। সে ব্যাগের উপর উঠে বসে গরম মনের সঙ্গে জানালা জানালা ফাঁক দিয়ে পলিয়ে পাখার গায়ে খোঁচা মারছে। তা দেখে হেসে বললাম, কীরে চলছে না—? সুব্রত পাঞ্জীর মুখে এবং ফটাক হেসে বললো, তুমি যেমন চালাচ্ছো চালিয়ে যাও, আমি পাখা চালানোর চেষ্টা করি। ইডিয়েট। সেই এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে—আর এদিকে কে কারে সামলায়। আমি হেসে বললাম, কেন, তুই যাচ্ছিস, পরেশ যাচ্ছে। পরেশ অর মেড় বছরের ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে ফিনিয়ে ঠিক করে একটু হেসে অসহায় দিয়ে চেয়ে বললো, চোখে চোখে রাখ। পরিচয় বিশেষ ভাল না। বলে পরেশের হেসে টুকিয়ে আর আমার পুরুষদের জানালার সামনে দাঁড়ানো নিয়ে একবার বয়কালো। বালক, অবিবিদিতা আর সেখা আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে। অবিবিদিতা বললো, ওরা আমাদের পাশের কুপেতে বসেছে, তাই না। বলে হাসলো।

সুব্রত পাখা চালানো না পেয়ে মুটো বিস্তি নিয়ে নেড়ে এসে আমার কানে কানে বললো, ওরা চক্রবর্তিদুটো জোকা থেকে এসেছে। আমি বললাম, বলো তো ঝঁপ্রোলী।

সুব্রত বললো, ওরু, ওদের বাপের মাসের মোতল আছে। আমি ইনভেস্ট করেছি।

আমি তখন কুঁচকে বললাম, ছাড়্। ওই তো ওদের বয়স। মেয়েটার বয়স কুড়িও হয়নি। সুব্রত একবার আলকা, অবিবিদিতা, সেখা আর পরেশের দিকে চেয়ে হাসলো, তারপর আমার দিকে চেয়ে বললো, মাল খেয়ে বয়স কুড়ির ওপরে হতে হয়, তোকে কে বলেছে।

আমি বললাম, তুই কি করে বুঝলি।

সুব্রত হেসে বললো, তখায় মনে না—শাস্ত্রে লিখেছে গোপাল ঠাকুর! মালের ব্যাপারটা নিয়ে তুই আমার ওপর ওরপিরি করিস না। মেয়েটি যখন ওস্তিতভা ঠিক আছে কি না দেখছিল, তখন ভোতল ভোতলো চুনচান আজনা—আমি খুব ভাল করে শুনেছি। আমি আমার সীটে বসে পড়েছি ততক্ষণে। সুব্রত আমার পাশে। ইডিয়েট ও পাশের জানালাটা খুলে ব্যাগের ওপর ফেলে দিয়ে সুপতো পেণ্ড গায়ে বসে পড়েছে। কামরার ভিতরে আলো। সব কয়টি পয়েন্টে আলো জ্বলছে না বলে একটু আলো-আঁধারি ভাব। আলকা ধমকে উঠলো তার নন্দনকে। এই, কাইরে হাত বাড়িও না। চুপ করে এদিকে এসে বোস। বসে, চোখ পাকালো। তা শুনে নন্দনও চোখ পাকিয়ে আলকার দিকে চেয়ে আরো আরো জোরে জলছে, অত রা দেখিও না। নন্দনের কথাটি শোনে কামরার যাত্রির রোল তুলে দিল। অতটুকু একটা পুঁচকে ছেলে, তার মুখে এরকম কঠিন বয়স্কের সুর। সবাই হাসতে হাসতে নন্দনের দিকে তাকালো। পাকা চুলে এক বৃদ্ধ আমাদের কুপের সামনে জানলার ধারে বসে প্রকৃতির শোভা দেখছিল, ঘাড় ঘুরিয়ে

নন্দনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো তারপর আমাদের উদ্দেশে বললো, আজকালকার ছেলে তো...সুব্রত নন্দনের খুতনি ধরে আদর করলো। বেড়ে বাচ্চা উচিত জবাব দিয়েছিস। পরেশ চুপচাপ। কোলে মেয়েকে নিয়ে বসে আছে। সেখা খুলত মেয়ের দিকে চেয়ে জামা তুলে পেটটা পরিষ্কার করলো। পরেশ বললো, কিছে পারলি! এই সময় তো ছেলে খার বলে বাড়ি খুরিয়ে ঘড়ি দেখতে চেষ্টা করলেন। অনিন্দিতা বললো, বিধি আমার বড্ড জলের তেষ্টা পেয়েছে। ওরাদির ঘড়িটা কোথায় রেখেছ! সুব্রত তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো, এই মাত্তে পিপাসা পেয়ে গেল! সবে তো ৩৪-—। অলকা বললো, যাদের মেয়েটার জল পিপাসা পেয়েছে তারা উঠি কিনা বলছেন। অমলকা পরেশ চিৎকার করে বললো, ওরাদির ঘড়ে একটা চোখ টিপে সুব্রতকে কী যেন ইঙ্গিত করলো। সুব্রত, ঐদিকে বসে ঐদিকে, ঘড়ে আবার ওপর থেকে ওরাদির ঘড়ে পেড়ে টিপি খুলে অনিন্দিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, খেলী করে না। ঘড়াটা মুখ ডিজিয়ে নেবে।

পরেশ খার সুব্রত হিসাব নিতে বসেছে। সুব্রতর হাতে মোটা একটা পকেট-ডায়রী। আর কলম। তিন সপ্তাহের এক্সকার্শনের ওক হয়েছে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠার আগেই। বলা যায়, ট্রেনের টিকিট, রিজার্ভেশান, এ ছাড়া ট্রাভেলার্স চেকের টিসিনপত্র কেনার ওক থেকে। পরেশ চোখ দুটো কাকের ওপর আরম্ভ করে মেয়ে, এক একটা আইটেমে মনে করছে আর সুব্রত লিখে রাখছে। আবার সুব্রত বলাটা মাঝে মাঝে গাঁতে জমছে মনে করার চেষ্টা করছে, আর কিছু বাদ গেল কিনা। আমাদের বেঞ্চিতে আমি, সুব্রত আর পরেশ বসেছি। পরেশের কোলে এখন তার মেয়ে নেই, সেখার কোলে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সেখা বসেছে জানালার ধারে, অন্যমনস্ক ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে মাতে হাওয়া লাগে। আলমারি এ ব্যবস্থাটা পাকা করেছে। কারণ সারারাত ঘুমন্ত মেয়েকে বকল কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে তাকে পরেশ আর সেখার জানালার ধারটা পাওয়া উচিত। তারপর অনিন্দিতা। অলকা নিজেই বসেছে মানুষের যাতায়াতের পথের ধারে। অর্থাৎ বেরুবার সিট বন্টিত হয়েছে তাদের যে আর চোখের সামনে বৌকে পেয়ে যাবে। আবার বৌয়া তাদের সামনেই পরিচারকদের নিষ্টিকণ করে, একেবারে মুখের অন্দর মহলে চোখ রাখতে পারবে।

নন্দন আর টুকাই নেই যে পরেশ আর সেখার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুটো পূর্ণ এক্সপোজের খোলা জানালার চোখ রেখে বিস্ময় পুলকিত চোখে মাঝে মাঝে মুখকে পেয়ে উঠছে, 'যদি হই মোর কাঁচা ওই পাখির জাঁচায়'—কিংবা 'বিশিনবাবুর ভারল সুধা, মোদের স্বালা মেটায় সুধা' ইত্যাদি, তা আর থামছে না। মাঝে মাঝে অলকা ঠোঁট বেঁকিয়ে অভিযোগ করছে। যেমন ঝগ তেমনি তাদের ছেলে। অলে সেখার দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে পরেশের দিকে তাকাচ্ছে, সেখাও মুখ ফোরড়া করে আছে পাঁচ বছরের বুটো বাচ্চার পানের ঘর ওলে। পরেশের দিকে তাকাতে চোখে চেয়ে ঠোঁট ওল্টালো সেখা। পরেশ একবার সেখার দিকে তাকায়। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে আরার তাব, লক্ষন ও প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য করে বলল, ওক একটা ঘড়ো। মেয়েরা নিশ্চয়ই ঘিলে মারা মত মেয়ে আছে, আর খুবি মুখে কৃপণ এঁটে বসে আছে। এটা তো একটা আশ্চর্য ব্যাপার সুব্রত চোখ ঘুরিয়ে অলকার দিকে তাকায়। তারপর কনুইয়ের গুঁতো মেরে পরেশকে সচেতন করে দেয়। মুখতে পারছিস না—-আকর্ষন। সেখা, অনিন্দিতা, অলকা অবাক হয়ে মুখ বোঁচকায়। সুব্রত চোখের ইশারায় বলে, চশমাচশি ঠিক আমাদের পেছনে মনে ব্যাঙ্কের পার্টিশানের ওধারে বসেছে। আর ঠিক ওর (মানে আমাকে) পিতের সঙ্গে চশমি পিঠ লেগে আছে। চশমি কনুই চুঁমুই এরা পছন্দ করছে না ওক। ফলে সুব্রত আমাকে গুঁতো মেরে অলকার দিকে তাকায়।

পরেশ সোজাসুজি বলে, ওকদম, পার্টিসেনটাকে ভুলে যাও—। আমি ওদের সামনে গিয়ে বসি, কী হচ্ছে, কী। ওরা ওনতে পাবে। কী ভাবে ভাববে, ভাববে? অলকা হেসে বলে, কী আবার ভাববে। অনিন্দিতা তার জলের চোখদুটো নচিয়ে বললো, কিছু মিছু চোখ ঘোরাচ্ছে দাদা—। সহসা সুব্রত ধমকে উঠলো। এবার সবাই চুপ করে। বলে পরেশকে বলালো, চশমাটা ভোকবারি ভাল ছেলে। ওটা তো দেখাই সেখা হয় নি। পরেশ ঘাড় ঘুরিয়ে ভারতীর পাশের চোখ রাখলো। না, ওটা নেই বলে, চশমাচুরের হিসেবটা মনে করে বললো। চশমাচুর শব্দটাই নন্দন আর টুকাইয়ের মুখে শুনে অনিন্দিতা তুললো, ওরা খুজনে ঠাট্টা করে খুতে ঘাঁড়িয়ে থাকে, চশমাচুর খাব—চশমাচুর খাব—। অলকা, সেখা খুজনে চোখ পাকিয়ে ধমকে উঠলো। না, ভোমরা চশমাচুর খাবে না। ঠোঁট খারাপ করবে।

—মজার সঙ্গে নন্দন খুব ভোগে ভিতে আর করছে। তারপর টুকাইকে বললো, অনিন্দি, মা একটা ভাতার। সব সময় বলবে, খাবে না, খাবে না অনিন্দিতা হেসে উঠলো, ঠিক দিদি, আপনার ছেলেটি মা একেবারে জিনিস হবে না। সুব্রত বললো, যোগ্য বাপ যোগ্য ছেলে, বলে নন্দনকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো, আপনার দারুণ একজন জিনিস গুরুর তো তাই—। নন্দন সুব্রতর চাঁট, ওপর মুখ সরিয়ে বললো, চাটা না খুব খারাপ। কিছু ছেড়ে দেবে না। সুব্রত নন্দনকে আদর করে বললো, নিশ্চয়ই খাবে, চশমাচুর খাবে ভাল লাগে, তবে না ক্ষ্যাপাবে। টুকাই খুবে দাঁড়িয়ে বললো, আমি কী করবু? এবার পরেশ ছেলেকে ধমকে উঠলো। সেখা মুখ ভার করে সুব্রতর দিকে তাকালো। অলকা হেসে বললো, কী খাই পাঁচ পেয়েছেন বলো! সুব্রত হাতের কলমটা পেন্সিলের মতো আঁকতে আঁকতে বললো, আমাকে আর পেখতে হবে না। ওরাদির না, খুই মজুতে বিশিনবাবুর কারণ সুধা কী অবস্থা দিয়ে গাইয়ে--কারে তার নি, তবে পরেশের দিকে তাকাল। পরেশ শুধু হাসলো।

টুকাই বললো, আমি মাল খাব। আমি হেসে বললাম, খাবেই তো অবশ্যই, খাবে। নন্দন বোধকরি আমার কথার উদ্দেশ্য পেয়ে গেল বলল, তাহলে দাও, কিছু না তো। শুধু শুধু বলছো, তবে টুকাইয়ের কাঁধে হাত রেখে আবার জানালার ধারে গিয়ে চিৎকার করে উঠল খুজনে, তবে সমস্বর—ভাত খাবো—ভেল মাখি—। টুকাই বলল, আলোর ঝলা। ওরা আরও কী বলতে যাচ্ছিল—এমন সময় ওড় ওড় শব্দে পুরি এক্সপ্রেস কাঁপ করে ভেঙে দাঁড়ালো।

আর যখনি এ চা, চা গরম—এই মৃদুমুই—এই মিষ্টি সম্বোধন ইতোমধ্যে রসনের নিস্তব্ধতা চরিতে নরনারম হয়ে উঠল। অনিন্দিতা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমি চা খাব, অলকা বলল, আমি চা খাব, সেখা বলল, আমি চা খাব। টুকাই আর নন্দন চিৎকার করে উঠল, এই লেমেন! আমরা লেমেন খাব। হাততালি দিয়ে উঠল ওরা। সুব্রত বলল, সবাই খাবে, আমরা বুঝি কী চুষবো—এই চা,—বলে পরেশকে বলল, দু'টা চা দিতে বলা আর ওদের জন্য লেমেন। পরেশ বলল, ও লেমেন হাল হবে না। বেঁচেনের লেমেন আরার লেমেন। সেখা বলল খুমি তো লেমেন এনেছ—ওদের হাতে দাও। নন্দন বলে উঠল, উঁহু, পরেশ জাঠু কী ভাল, এ টুকাই দেখছিস। বলে নন্দন পরেশের খুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ লুকে দিয়ে দাঁড়ালো।

অলকা আমার দিকে চেয়ে বলল, ছেলে কী ভাল হয়েছে দেখেছ! ঘড়িতে এতক্ষণ খুমিয়ে পড়তো। তোকপড়াব কথা বলাতেই, হয় পেট কথা করবে, নয়তো কান খাড়া করবে—। সেখা বলল, একটা না একটা অঘটন ঘটেই যাবে। কিছুতেই পড়বে না। এতক্ষণে খুমিয়ে কাদা। অলকা সেখার কথার হেসে উঠল। ততক্ষণে পরেশ এক এক করে চারের খুরি পরিবেশন করছে, আমার হাতে একটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, খাও ঠুকুর বাদশা, এ পর্যন্ত একটা কুটো ভেঙে তো খু-খাও করতে দেখলাম না। সুব্রত খুশায় তার আকৃষ্ট হলো—ওকে পথ চলতি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে যাও—দেখবে চুটিয়ে মেতে আছে। একটা কাজ করছে। বলে অলকার দিকে চেয়ে খুটি অর্থের করলো। অনিন্দিতার হাতের চা সহসা চলকে উঠল হাসি সামলাতে গিয়ে। অনিচ্ছা চা নিজের কোলের আপরের ওপর পড়ল। সুব্রত 'আকা' বলে ঠোঁট কাঁকালে, তারপর পকেট থেকে পয়লা বার করে পরেশের হাতে দিল। নন্দন, টুকাই সমেত পাশে খুরে ছাটফর্মের ওপ র চলতি মিষ্টির দোকান দেখতে লাগল। এমন সময় সেই তা কলবর্ধনিয়ে উঠল গাড়ি। ঠিক আমাদের সামনে বাঙ্কের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, কি বিভিটি চা খেয়েছেন, খুমি করে এলায় কাপকানে। আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে খুটো নন্দন আর অলকে পরার হাতে দিলাম। এ খুটো খুলে খুলে দিন—ভাল লাগবে। অমনি হাত বাড়িয়ে পরেশ নন্দন খুটো নিয়ে একটা মুখে খুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, সমর। দেখ, বাবা নন্দন দিয়েছে, খুবি একটা বলে হাত বাড়িয়ে আমি নন্দনকে দিয়ে দিল। তারপর আমাদের সকলের দিকে একবার চোখ খুলিয়ে বলল, বাবা কিন্তু ভোকতর সংসারী। পরেশের নন্দন নিয়ে খুবজনে

অলকা ঠোঁট টিপে হাসি হাসি মুখে বললো, অমন সংসারীকে নিয়ে ঘর তার ঘর না, খুবজনের। পাশ চোখ খুটো কপালে তুলে আমার দিকে তাকাল। আমি সবলের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলাম। কেলকাতে আমার হলদে জমির ওপর জমলো ভোর কাটা পেন্সিলের মতো পাকার উপাত ঠোঁকা ছেন কল তুলে কিকমিক করছে। সেদিকে চেয়ে আছে অলকা, অনিন্দিতা, সেখা, পরেশ, সুব্রত আর নন্দন, টুকাই। পাশ জানালার আপন সৌন্দর্যের মহিমায়। অমলকা একটু ঝুঁকে সীটে-কলা সবলকে টেনে তুলে এক সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পাশ কলল, মাসীর, মাসী ছেলে—কিন্তু অলকের ওর চোখের খুটোর একটও মিষ্টা মেয়ে আছি আছে, আমাকে ও পরেরায় তবে না। চমকিতে আমি হেসে বললাম, সেকি! পাশ চাপুজেন'র সেকলস তো পাকে ছাড় আর আইটেম নিজের ছলে ভালর না। পাশ নাকের পাটা খুলিয়ে বলল, এ খুজে

দেখলাম কি আর সে ফুলের মেলবাসের মত! সুব্রত আর পরেশ চুপচাপ চেয়ে আছে ওদের দিকে। সত্যীর মৌনতাভি। মাঝার কাঁকড়া আতাগতনের চুল। মুখে মৃদু হাসি। বয়স বোধ করি বয়ব পঁচিশ। কিন্তু চোখমুটোতে খেয়ালী ভাবনা। মিষ্টিতে চুলচুলু। পরিচয়ব তবে ঘটতি জানালো। একটু আগে যেবকম দেখেছিলাম, সেরকম না। মিষ্টিতে গভীর। তার তুলনায় পাক যেন সেই রকমই আছে। সত্যীর নমস্কার জবে তার সীটের উপর স্থিরে বসল। অনকা একটু সরে গিয়ে পাককে বসতে দিল। পাক কাঁকড়া চুল তুলিয়ে দুই হাঁটুর উপর হাতের ভর রেখে নমস্কারে কাছে তাকালো। নমস্কার জাবে এগিয়ে এসে বলল, তুমি ফুটবল খেলতে পার! ক্রিকেট খেলতে পার? নমস্কার প্রশ্নে পাক চোখ দুটো কপালে তুলে দিয়ে বলল, ভয়, পারি—তুমি খেলবে আমার সঙ্গে! টুকাই চট করে উত্তর দিল, বল কোথায় যে খেলবো। পাক তখন হাত বাড়িয়ে টুকাইকে আছে টেনে নিয়ে এসে ওদের পাশ দিয়ে আসব করে বলল, উফ! কথায় যেন ফুলঝুরির ভাওয়। কী চমৎ ছেলেটা এই বয়সে, বলে অনকা আর লেখার দিকে চেয়ে বলল, ওদের বয়স কত বিবি? অনকা, লেখা দুজনেই একসঙ্গে উত্তর দিল, পাঁচ পেরিয়ে ছ'য়ে পড়েছে দুজনেই—। পাক তার ডান্ডা গালে টোল তুলে বলল, আপনার আদেশে এক ইসাবে কিয়ে করেছেন। বলে আমার আর লেখার দিকে তাকাল, তারপর অনিন্দিতা আর সুব্রতর দিকে চেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মিষ্টি হাসলো। সুব্রত আর অনিন্দিতা একসঙ্গে হাসলো।

লেখা বলল, এ ঘরটা তাহলে আপনার, হ্যাপি নু ইয়ার ঘরে ঢোকেন না। পাক হেসে পড়িয়ে পতালো লেখার কথা শুনে, তারপর অকমকা ঘনকে বলল, আগে দেখি সমবের হালচাল। সুব্রত বলল, কেন ওর উপরে আপনার বিশ্বাস নেই? অনকা হেসে কটাক্ষ করল, বিশ্বাস নেই আবার! বিয়ের আগেই তখন হানিমুন হয়ে যাচ্ছে—। সহসা পরেশ বলল, এক্সিউজ মী, আমরা এবার সিগারেট বলবো, বলে, পাকের দিকে তাকালো। পাক কাঁধ বেঁকিয়ে সম্মতি জানাল, বলল, আমাকেও একটা দিতে পারেন, অবশ্য যদি, আপনাদের আপত্তি না থাকে—। সুব্রত তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট প্যাকেট থেকে বের করে বলালো। পাক—দমর সিগারেট বলাদি, বলে। দমরের পারমিশান নিয়ে হাসলো, পারমিশনটা নিক করা দরকার, বলে অনিন্দিতা, অনকা আর লেখার দিকে চেয়ে বললো, কিন্তু মনে করবেন না—ভ্যাম্পি-এই গ্রীন ঘরা, না আমাকে সিগারেট ফেতে দেখলেও যেন দেখেন নি এরম ভাবে সরে যান। অনিন্দিতা, অনকা, লেখা সবাই চমকে উঠল। তখন সুব্রত হেসে বলল, চমৎকারের কিছু নেই, জানাম। প্রোগ্রাম সেট আপ করার সময় কিছু কথা হয়েছে—ঘড়ী থেকে ট্রেনে ওঠার পর সবেতভাবে যতটুকু এনজয় করা যায় তা আমরা করব। এবং সিগারেট টিফারেট এগুলো সবার মুখেই ধোঁয়া ওড়াবে। মাইন্ড ঘাচ। পাক পকেটের লাইটার থেকে সিগারেটটা ধরিয়ে তিন বিবাহিতা তরুণীর দিকে চেয়ে বলল, আপনাদের স্টুডেন্ট লাইফে মেয়েদের সিগারেট খাওয়া কিন্তু বেশ চালু ছিল। তা আপনারা জানেন? অনিন্দিতা আর লেখা বলল, মোটেই না। কিন্তু অনকা চুপ করে বড় বড় চোখ দুটো সকলের মুখের উপর বুলিয়ে গেল। সুব্রত বলল, ধরে নেওয়াই নিয়ম আমাদের—আপনাকেও একটা ধরাতে হবে—তারপর ওয়ান ওয়ারে বলে অনিন্দিতা আর লেখার দিকে চেয়ে ভ্রুকুটি করল। সঙ্গেবে মাথা নেড়ে লেখা আর অনিন্দিতা অসম্মতি জানালো। অনকা বলল, প্রিজ সুব্রতদা, আমার ছেলেটি যা পাজী, বাড়ীতে নিজেই পাড়ামর বেড়াবে। আমাদের পাড়াটি তো জানেন? সুব্রত আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, ওর, আমার বোতলের কথাটা মিলিয়ে নিস। পাক তার আঁকা ভুরু-কুপাল বাঁকিয়ে কিছুর প্রবণ করল, কী বললেন অনকাদি, সিগারেট খাওয়ার কথা পাড়ার লোক জানলে কী জাবে! অনকা মুখ তার করে বলল, যা-তা বলাবে। প্লেজ—বলে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে যা পায়ের উপর জল পা-টা তুলে পাক বলল, আমাদের মু আদিপুরে এসব কেউ কিছাও করে না। তবে শুনেছি, সমবের ঝাঁপগোলিটা নাকি ওইরকম। তাহলে আমার পেঁচু, ক্লাবিজাগিটিতেও এসব ছাপারে কেউ রাশ মানায় না—আমি তো কতি হাসিতে বলে কথির সঙ্গে সিগারেট না খেলে হাঁপিয়ে উঠি।

সুব্রত সোজাসুজি আমাকে দেখিয়ে বলল, এ মুখচনাকে ওখানে কখনও দেখেছেন। পাক অকক হতে আমার মুখের দিকে বেশ নিমুকণ তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করল, তারপর বলল, কী জানি ঠিক মনে করতে পারছি না। হয়ত দেখে থাকতে পারি। আমার দিকে আবার চোখ ফেরালেন। সুব্রত বলল, উনি আজে মাঝে ওখানে আন আসছেন। পাক হেসে বলল, ওখানে তো সবার আসবার অধিকার আছে। তবে সাধারণতা করি, সাহিত্যিক আর মাত-মাতীরাই খেলী যাতায়াত করেন। আই মীন, লেখক ও আর ইনটারেসেডপুরুষরা। পাককে শেষ করতে না দিয়ে সুব্রত পকেট থেকে ক্রিকেট খেলার ছবি

কৃতজ্ঞ পাখনো মেয়ের হাতঃপ্রের বিভিন্ন চলচ্চলের ঝাঁকে ঝাঁকে সেই চিরন্তন দাড়ালকে যেন দেখতে পাচ্ছি। সে একটু হেসে, ঠোঁটের উপর কিছুৎ বিঁধিয়ে যেন বলছে, অবজ্ঞীনের মাওয়া হচ্ছে পুরীধামে জগন্নাথ দর্শন না, যাওয়া হচ্ছে সমুদ্র দর্শনে—। তাহলে কী জগন্নাথের টানে যাচ্ছি না, যাচ্ছি সমুদ্রের টানে? কী জানি, কার চেয়ে কেমনি আকর্ষণ। তবু আমরা কেন? ওই যে পাক আর সময়? সেই অনুভূত আর তার মাতালী, স্বপ্নেলা—এরা সবাই কী চলেছে সমুদ্র দর্শনে। জগন্নাথের দর্শন, প্রভুর অনুভূতি চেয়ে তাঁর পাদপদ্মে পুজো দেবার ভাবনা নেই কারও অন্তরে। অথবা এই কামরার শুদ্ধ পরিচিত অপরিচিত যাত্রীর মনেকেই এখন ঘুমে অচেতন, কেউ ঢুলছে, ওই যে বৃদ্ধ নিমল সিটের উপর বসে মাথা হেলিয়ে হাঁ করে মাঝ রাতে? মেয়েদের ঘুমের উপর কোন পুরুষের হাত, আবার মেয়েদের পায়ের আপত্ত হাঁটুর উপর উঠে জানালার হাওয়ায় পট পট করে নড়ছে। নিমল সিটের ওপাশে বসা অপরিচিত বৃদ্ধের গলায় পেঁচিয়ে,—অন্ত আরও দেখিবে যেতেন নেই,—কেউ আমাকে কিছু দেখেও কোন মন্তব্য না করে আবার চোখ বুজে ঢুলছে—অন্ত কোন দেশ নেই, নেই কোন মন্তব্যের কটুকি দেশানো বাক্যালাপ—অন্ত কোন সাত্তার বন্ধ জানালার ফাঁক গলে সূর্যমুখীর মুখ দেখানো ভোর—কোন জানি হেসে ফেললাম—আপন মনেই, এ হাসির কারণ আমার জানা। সুব্রত বলেছিল, দেখ তাই, মরিশিটি ছাড়ে যেমন একবার বেরিয়ে, তখন ওখানে গিয়ে কিছু কোন ব্যবস্থিতার চলবে না। পারেশ বুদ্ধুটি করে বলেছিল—বিদেশ ব্যবস্থিতার। সুব্রত আমার দিকে চেয়ে মিচ করে হেসে বলেছিল কে কার বৌ নিয়ে ঘুরছে, কার বৌ কার সঙ্গে এক বিছানায় শুচ্ছে, এসব ভাবলে চলবে না। বৌথ সংসার যখন, আমরা মিলেমিশে থাকবো। বিশেষ করে উঠেছিল পরেশ, তাবে ওকাল, উত্তম প্রস্তাব! আমার বৌটা দুই সন্তানের জননী, তারপর আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, ওর বৌটা তো এক ছেলের মা। আমি হেসে বলেছিলাম, সেকেলার কিন্তু তোর চেয়ে সুব্রত। অনিশ্চিতার সংসার যৌবনের কথা ভেবেছিল। সুব্রত হেসে বলেছিল, সে কী আর না ভেবে বলেছি। পরেশ বলেছিল একবেরেমিটা কাটবে তাহলে, কী বলিস। সে আশ্বাসে অবশ্য অনিশ্চিতা, সেক্ষ, অলকা কেউ ছিল না। ছিলাম আমরা তিনজনে।

পরেশ ঝুঁকে করে বলেছিল, ওকাল, নতুন জিনিস ছেড়ে পুরনো জিনিসের দিকে হাত বাড়ানো পড়াবে সুব্রত। তখন একটা খেঁজো ছড়া কলকে হেসেছিল। পরেশ আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেছিল, ওকাল, কখনও—তারপরই খেয়ে গিয়েছিল। আমি হেসে ফেলেছিলাম, প্রথম প্রথম আমাদের ওরকম হয়েছিল। সহসা আকাশ দিকে দৃষ্টি ফেলেছিলাম। আমার চোখের সামনে বাকের জিনিস সঞ্চিত অনিশ্চিতা আর সুব্রত পুজনে জড়াজড়ি করে শুয়েছে। আমার মাথার উপর পরেশ আর টুকাই। দেখে তার মেয়েকে নিয়ে শুয়েছে সামনের বেঞ্চিটায়। অলকার মাথার শিয়রে আমি বসে সবাইকে পাহারা দিচ্ছি, কখন অলকার পাশে মাঝে মাঝে মোচড় খাচ্ছে পরশে। গেটা কামরা ঘুমের আবেশে ঢুলছে। চকিতে পাক আর সময়ের কথা মনে হলো। ওদের কোন সাড়াশব্দ নেই। সেই যে অলকার কাছ থেকে বিদায় ওরে পড়েছে আর টুশব্দটি পাচ্ছি না। সুব্রত বলেছে ওদের কাছে মনের খোরাক আছে। খোরাকের টুনটুন শব্দ শুনেছে সুব্রত। আবার বলেছে, মনে টেনেছে। আমার কিন্তু সেরকম সন্দেহ হয় নি। পাক বলেছিল, চা খেয়ে খুশি করে এলাম। সত্যি কী চা-টা এনেই খাওয়াল? কই আমরা তো সবকেই খেয়েছি। স্টেশনের চা ওর চেয়ে আর কী ভাল হবে। তাহলে, অনিশ্চিতার অন্তরে বর্মি হওয়া উচিত ছিল। ওর ভেতরে সেই তো কী বলে, উবু উবু, খুলু-খুলু ভাব এখনও বর্তমান। পরে যাই মন্ত্রে যাই করে হলে, নরে যাই মন্ত্রে যাই মন্ত্রে ফলা বলে। ঠিক যেমন পাকের মধ্যে আছে। কিন্তু পাক বর্মি করেছে। অনিশ্চিতা বর্মি করে নি। তাহলে কী পাকের মত ঠিক যত বড় বর্মী লোকের মেয়ে নয় বলে অনিশ্চিতার বর্মি হয় নি, কী জানি। কিন্তু পাক নামক ছেলেটা আর সময় নামক ছেলেটির ঠিক এভাবে এই রকম নিশ্চিন্তে একটা বেলের কামরায় এতখানি বন্ধুত্বোগ করে শুয়ে কেন। আর সত্যিই কী ট্রেনে সর্বেজ ঘুমোনো কামরায় ওর দিদি জামাইবাবু—যে কামরে সময় আর ওকে এক্সনে এসে উঠতে হয়েছে? আশ্চর্য ব্যাপার। দেখা যাক, কালকে তো, পুরীর ট্রেনে আমার সঙ্গে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেবে। সত্য-মিথ্যার বিচার তখনই হবে। আর তো মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকী। আপন মনেই জানলা ছেড়ে চট করে উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকারের কোল পেয়েছে। যদিও অনুভব করেছি অনেক আগে, কিন্তু উঠি উঠি করে আর বসি হয় নি। যাত্রাকে ওরা ঘুমিয়ে রেখে যে যার জায়গায় ফিরে ওরে পড়েছে। অন্ধকার আমি একবার অন্ধকারের শরীরে ঢেলেনের লাইনের মত লাইন। ফিরে এসে সেই যে বসেছিলাম, আর উঠিনি। একটা জামরার দুই দরজার মুখে দুটো অন্ধকার। দুটো অন্ধকারেই ঠকা সমান ভিড়। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে ট্রেনের পরিচয় অকস্মাৎ মন্থর হয়ে এসে। কামরার দরজা ও বাথরুমগুলোর অন্ধকারের ভার আর জন তিনেক লোক সহযাত্রী পেয়ে যাত্রাতে ঘুমুচ্ছে। দরজাটা বন্ধ। মাথার উপরে ফিরির আলোয় কোনমতে পা ফেলে ফেলে দরজার হাতলে হাত রাখলাম। দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই এক ঝলক হাওয়া এসে গায়ে লাগলো। সু-সিটিং কিন্তান মানুষের জোড়াগোরা মিটি যাত্রাতে চিক চিক করছে। মাঝে মাঝে জনদের ফোল পজিতে ওঠা জানুচন্দ্রের বুক ছিন্ন অন্ধকার অপরূপ। মেঘকরি একটি নীর্ঘ রসবিহীন বুকে টাদের আলো চলতে ঘুমাচ্ছে—আকাশে পুর পুর মেঘ চলেছে ঘরেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—একটু আগের সেই কালো মেয়ের টিপি আর বিদ্যুৎ-এর ঝলকানি নেই।

কলা আকাশে চলেছে তারাদের অভিসারে। নাম শুনেছি মহানদী। আকাশকা মনে পড়লে তাহলে এই কী সেই মহানদী। আর বুকে অল্প শুকনো বালুচর আর ছোপ জলে অর্ধীর্ণ অন্ধ মার মহিমার মহিমায় বুকের পাঁজরে ঝলকে লাগছে। কিন্তান এই নদীর বুকের ট্রেজের উপর চলন্ত ট্রেনের পরপর, ওক ওক বিভিন্ন তরাস মাওয়াজ মেঘকরি মহানদীরই বুক চেরা কান্না, ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। অদূরে নির্জনে পাহাড়ছাড়ির বুকে নিয়ে সে কান্না আছড়ে পড়ছে। আর অনকে আছে প্রকৃতির বিরাট-প্রস্থ মুখের প্রতি।

এমন সময় স্মৃতির একটা ফল ফল শব্দ মনে এসে বাজলো। চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি, সময় আর পাক। পাকের দেহভঙ্গীর লতিয়ে আছে সময়ের নৈসর্গনায়মান দেহে। সময়ের ঠোঁটে ফুলন্ত সিগরেট ঝুলছে। পাকের বা হাতের বুড়ো আঙুল জলন্ত সিগরেট দিয়ে খোঁয়া উড়ছে। তার ওক্ত ওক্ত শুকনো চুলে মুখ ঢাকা। ডান হাতটা সময়ের কাঁধে। আর সময়ের বা হাতের বেষ্টন করে আছে পাকের পীন ঘটিদেশ। সময়ের চোখ ঝুটোয়ে অবাচাবিত নেশা পানের জড়তা। পাক একবার মুখ তুলে কিছু বলতে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে না পেরে আবার সময়ের মুখে ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। সিগিতে আলোর তার রক্তরাঙা ঠোঁটের পাপড়ী দুটো নড়তে দেখলাম। সময় বলল, বলা—। কথাটা কানে যেতেই পাক চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে বিরত হলো। তার তখন ওর হাতের সিগরেট ওর অজান্তেই খসে পড়ল মেঝেতে। সময় বলল পাক একটুতেই ইমোশনালেটিস হয়ে পড়েছে। তাই ওকে নিয়ে কাজকরে এসেছি। রূপা অলকের দিয়ে জানাল, নিশ্চয়—একটুতেই। অন্ধকার এনসিডেই বিশ্বেন্ট ওঠি, তার উপর জোর করে আমাকে পেলাস পেলাস পিলিয়েছে, আমার মুখটা জ্বলে যাচ্ছে—উফা বলে ও হাতটা ওর উফত বাহির বুকে চালিয়ে দিল। আমি একটু পাশ কেটে সরে দাঁড়ালাম। সময় বলল, এক্সকিউজ মী দাদা, অন্ধকারের দরজাটা যদি দয়া করে একটু খুলে দেন—। আমি তাড়াতাড়ি হাতেল ঘুরিয়ে অন্ধকারের দরজা খুলে দিতেই সময় পাক যা, আপনার কষ্ট হলে থাকবে দাদা এর মধ্যে দু-দুজনে ওকিকেজার অন্ধকারে এ্যাটেমপ্ট করেছি। দরজা খুঁজে পাইনি। প্রতি মুহূর্তেও আমার হাসি এলো। তবুও অন্ধকারের সামনে কালসাম, ঢুকে পড়ুন খুব তরে জল নিয়ে ওর মুখ মুখ সব ধুইয়ে দিন। থাক যা, দাদা বলে সময় আর রূপা—রূপা কেন? ওর নাম তো পরিচয়ের পর থেকেই জানি পাক। যতদূর মনে পড়ছে, সময় ওর ঘুমন্তিতে হাত ট্রেনারে দিয়ে পাক সম্বোধন করেছে—এখন বলছে আবার রূপা—স্ত্রী যা হলাদি মাঝ বয়ে বলা চলে অপরূপা। মোকরি নামটাই ওর অপরূপ—তা থেকে রূপ কিনা পাক কেন? ধাঁধায় পড়ে বিভিন্ন মোখ করলাম। যতবারই ওদের নাম করা হচ্ছে, ততবারই চমকে শিউরে উঠছি। এমন সময় সময়ের সেই জড়ানো কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, দাদা জাইতলি দরজাটা একটু বন্ধ করে দিন। তাই তো! ওরা ঢুকে পড়েছে অন্ধকারে কিন্তু দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছে।

আমি দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে আবার খোলা আকাশের দিকে চোখ ফেরালাম। রাত্রির নিস্তব্ধতায় জমাট আকাশের বুক দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। লোহার তারাক্রান্ত আকাশের বুকে ঔজস্ত হারিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভোরের তারাটি এখনও যেন বড় বড় করে জ্বলছে—।

অন্ধকারে বেসিনে জলপড়া আর চোখে মুখে জল ছাপ্টা। ঘেওয়ার শব্দ কানে এসে বাজছে না। যদ্ধ ওরা সেই যে অন্ধকারে দিয়ে ঢুকেছে আর বেরুনোর নাম নেই। ওদিকে ঘুম ভাঙা পরিচ্ছে গাড়ি এগিয়ে চলেছে পুরীধামের দিকে। বিশাল মহানদীর বুকের ওপর দিয়ে চলেছি আমরা। সহসা দরজা ঝাঁকুনি আওয়াজ কানে এসে বাজলো। রূপা আর সময়—অসে রূপা তারপর মুখানে ফিরিয়ে এসে দাঁড়লো। দুজনেই অন্ধকারের কারের পাটিশনে হেলান দেওয়া। এখন রূপার মোকরি অর্থাৎ

একটু অন্যমনস্ক। সময় পকেটে হাত দিল সিগরেটের খোঁজে। কিন্তু সিগরেট না পেয়ে চুপ করে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, কলুষ দাদা রাগ হয় না। তারপরে বেরিয়েছি, ছতের কাছে অন্তত সেশার বাক্সটি না পেলে খারাপ লাগে। আমি হেসে বললাম, লক্ষণ খুব ভাল। বলে আমার পকেট থেকে ক্যাপস্টানের প্যাকেটটা আর কয়ের বিলাম। সঙ্গে দেশলাই। সময় প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলল, ক্যাপস্টান ওতেই চলবে। আমার নিজের পকেট—কাজ যে, বলে প্যাকেটটা খুলেই চমকে ছেলে বলল এবি দাদা, গোটা প্যাকেটটাই তো ধরে আছে। এতক্ষণে হাত একটা দেখেছেন! রূপা বলল, তোর মত সবাইকে ভাবিস তাই না সময়? বলে সুললিত কণ্ঠস্বরে আর কিছু বেরাজে সময়ের দিকে তাকালো।

আমি বললাম, আমি সিগরেট খেয়ে অভ্যাস নেই তেমন। তবে আরপনে বেরিয়েছি তো তাই, বন্ধুরা আমার পাওনাটা পকেটে পুরে দিয়েছে। অবাক চোখে রূপা তাকালো আমার মুখের দিকে। পাওনাটা মানে? আমি হেসে বললাম, আমাদের তিন বন্ধুর যৌথ সম্পত্তি—হারমন-এর ছাপাতে যা যা ফোনাক্কাটা হবে তার শেষার সবাইকে দিতে হবে—এই আর কী। সময় কপাল কুঁচকে বলল, আপনি যদি মদ না খান তো সে খরচও আপনাকে বিয়ার করতে হবে। বলে সিগরেট বাড়িয়ে যৌথা ছেড়ে সিগরেটের প্যাকেটটা রূপার দিকে এগিয়ে দিল। রূপা মাথা নেড়ে না বলে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি হেসে বললাম, এই নাকি সত্যি আমি ঠিক জানি না। সময় সিগরেটে একটা টান দিয়ে বলল, কিন্তু যদি মনে না করেন তো বলি, ওই সুব্রতবাবু কিন্তু দারুণ অড়েল লোক—আমি ভদ্রলোকের মুখ দেখে বুঝেছি—এ্যাস্ট্রোলজি জানি দাদা, শেঁপ দেখেই বুঝতে পারি—। রূপা মৃদু প্রতিবাদ করলো। একটা মেয়েকে সঙ্গে তোর পরিচয় হলো না আর অমনি মন্তব্য ছুঁড়লি। আপনি কিন্তু মনে করবেন না দাদা। সময় বলল, এতে আর মনে করার কী আছে। তবে দাদা মিলিয়ে নেবেন—বলে রূপার দিকে চেয়ে বলল, রূপা কোয়াকে রেখে আমি কী বলেছিলাম—বলে হো হো করে হেসে উঠলো। সেই কোয়া—মনে আছে দাদা। আমার জন্মের অনেক টাকা ব্রীজহোলীতে নিজেদের বাড়ি। আর আমি জন্মের একমাত্র সন্তান। কোয়া সুকোপাটে নিতে চাইছে—। রূপা সেটা জানে। আমি কৌতূহলিত চোখে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ওকে এখন রূপা বলছেন, তখন কিনতু পাল বলে ডেকেছিলেন। আমার প্রশ্ন সময় হেসে উঠল, আসলে ওর নাম তাসাই। সুনিতিসিমিটিতেও অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে ও ক্ষেপে যেত। রূপা অভিমানে কণ্ঠি কঠোর দৃষ্টি হেনে সময়ের বুকে একটা ঘুসি লাগিয়ে দিল। সময় হেসে বলল, দেখেছেন—। রূপা মুখ লাকিয়ে বলল, হাঁ দেখেছে—মুখ, ফোনকারা বলে ঠোঁট কুলিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে যেন চমকে উঠল—এই রে, সকাল হয়ে গেছে।

সেই জাঁতাকুট-ভারী বেহপাটে যাঁরা মুলকলি বিহারী বাউল মৃদু হেসে বলেছিল এক্ষুণীনের যাওয়া হচ্ছে পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে না, যাওয়া হচ্ছে সমুদ্র দর্শনে। সেই হলদ মহিষ, উত্তেলিত পুরীধাম। গাড়ির দরজার সামনে গাঁড়িয়ে চাটার্জদের গাত্র ঘোতের মাত্রায় বোঝে বড় বড় হয়েছে সেজা পুরীধাম। কামরার জন্যে জমিত হচ্ছে আর বড় জগন্নাথ—আসে কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। সবাই ভক্ত হয়ে উঠেছে। স্যুটকেশ, ব্যাগ, বেডিং নিয়ে ছোটাছুটি লেগেছে যাত্রী বাহিনীদের মধ্যে। ঠিক গাড়িতে ওঠার সময় যে ভক্তরা দেখেছিলাম হাওড়া ষ্টেশনে। তার চেয়ে এখন বিভিন্ন। কে আগে তাদের বেডিংগুলি সহ রিক্সা কি টাক্সা ধরবে, যাবে নির্দিষ্ট বাসস্থানে, যাবে জগন্নাথ দর্শনে। আমাদের বেডিংগুলি ছোকরাদের সামলাচ্ছে সুব্রত, পরেশ অবাক। দেখা তার ছেড়েছে কেলে তুলে নিয়েছে। অনিন্দিতা হাতের শান্তিনিকেতনী ব্যাগটা সামলাতেই ব্যস্ত—। নন্দন আর টুকাই ছুট ছুট পজিশন দিকে এগুচ্ছে দেখে সুব্রত ধমকে উঠলো, আনবে। কী যে তোমরা কী করবে তাও তোমাকে বলে দিতে হবে। তাহলে একটা কুলী ডাক। আমি ভক্তকে দিয়ে সুব্রতর দিকে তাকালাম। সুব্রত বলল, দেখছিস না, ওরা দুটো ছুটোছুটি করছে। আমি হাত জোড় চোখেমুখে হাসি ফোটালাম, আমার লাগছে ভালো—তুমি তোমার কাজ কর। সুব্রত বলল, আমার একার দায় কী সব। পরেশ ধমকে সুব্রতকে থামতে বলল, চুপ করতো, ভদ্রলিস ধমক ওটা একটা ছাত্র আসলে—আসার আগে মেজোমা বাইতে শুরু করেছিল, আমি যেতে পারি কিন্তু কাজকর্ম কিছু করতে পারব না। সুব্রত বলল, ছেলে দুটোকে দেখা একটা লাইনে থাক—এটাও যদি না পারে তো কী পারবে? আর ছেলে দুটো কী আমি তৈরী করেছি বলে আক্ষালন জানালো।

পরেশ আমার দিকে চেয়ে বলল, ওস্তাদ ছেলে পেয়েছ। আর আমরা যখন ওরেই দলপতি করেছি তখন সাইট কাজকর্মগুলো ও বলে একটু দেখ। নইলে দেখবে তখনে বলবে, পুরীতে এসেছে কলকা করতে। পরেশের কথা শুনে সুব্রতর ভিতরটা মুচড়ে উঠল পুরীতে এসেছি কলকা করতে—জগন্নাথ দর্শনে না, সমুদ্র দর্শনেও না, এসেছি কলকা করতে। এমন সময় দাদা বলে রূপা আর সময় এসে দাঁড়ালো। সময়ের কাঁধে ঝুলন্ত লাল নীল ছাপের সেই 'ব্রোতল আছে' ব্যাগ আর ডান হাতে ঠিক কেস। চোখ বন্ধ আকাশের শো-শো পদলুল। রূপা সেজেগুজে রিডিকট। চোখে টাইস গোগোর জন্যে মুখখানাই স্পষ্ট মালুম হচ্ছে না। হাতে ছোট্ট একটা ভেনে ঝুলন্ত ব্যাগ। ডান হাতের কব্জিতে ঘড়ি। রূপা বলল, দাদা আমরা মেয়ে আছি—বিধি ওরা সবজনের দিকে আসছে—খুঁজে বার করি। আপনি কিন্তু চলে যাবেন না। বলে অনিন্দিতা, লেখা আর অলকার দিকে চেয়ে টুকাই আর নন্দনের গাল টিপে দিয়ে মন্দিরের দিকে পা বাড়াল।

আমি ওদের চলার পথের দিকে চেয়ে আছি। সুব্রত সহসা আমার পিঠে খোঁচা মেরে বলল, ৩৮ 'ওটা কুক করা' ওদিকে তাকিয়ে লাভ নেই ওরা অলকার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। পরেশ মন্তব্য জুড়ে দিল, ওটা পাগল হয়ে গেছে, ওই ফোনটস আর ফোনফল কুক দেখে। বলে পাওনার ছড়িদারের দিকে কিন্ত বেটে বাঁত বার করল। পাওনার ছড়িদার ইতিমধ্যে বগলে আর দু-হাতে দুটো স্যুটকেশ তুলে নিয়েছে। জাঁতি বেডিং আর পরেশের ঝলতি ব্যাগ, সুব্রত আর পরেশের হাতে। অলকা সুব্রতর কাঁধের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়েছে। লেখার কোলের মেয়েটা কিসব বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে এই ভয়োন্তুরি জাপটা-জাপটি দেখছে। আমার দৃষ্টান্তে নন্দন আর টুকাই। অনিন্দিতা শান্তিনিকেতনী ব্যাগটা হাতে পড়ে যাই, মরে যাই ভাবে পা ফেলছে। ষ্টাইলটে নেমে সুব্রত মন্তব্য করল আর সেরি তরে লাভ নেই। চল আমরা এগোই চান-টান ওগুরা-দাওয়া না করে পেরেম জমবে না। বলে কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে অগ্রসর হওয়ার ইংগিত দিলাম।

রূপা সময়কে দেখার জন্য পেছনের দিকে তাকাতেই সুব্রত খোঁচা মেরে বলল, তাকিয়ে লাভ নেই—ওরা বড্ড অড়েল জন। গাড়ির ষ্যাচ কসে মুরলির কোঁচ দিয়ে মাল টেনেছে লাস্তরাত করে। তোমাকে একটা ছুঁড়ে দিয়েছে!—চল তো—। পরেশ বলল, যাদ্বি বলল সমুদ্রের ঈচ্ছে, তখন দেখা হয়ে যাবেই—। আগে থেকেই পাওনার ছড়িদার টাকা ঠিক করে রেখে ছিল। ষ্টেশনের রোদ মাতিয়ে আমরা গিয়ে টাক্সায় চড়ে বসলাম।

বড় চওড়া রাস্তা ছেড়ে একটা বাঁক নিয়ে আমরা জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনের রাস্তার পাশে একটা সিনেমা হলের কাছাকাছি মর্মরের পাশ ঘেঁষে টাক্সা নিয়ে দাঁড়ালো। ছড়িদার এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে ছুটে মর্মরের উপর একটা সিমেন্টের পাতা প্রাবের উপর দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে মুটো বয়স পনের বছরী ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে দাঁড়াল। ছড়িদারের কাঁধেরটো মালপত্র পাঞ্জাবির উপর থেকে ওজনটা চেনে নিয়ে একটা ছেলে মাথার ঝিড়ে আমিয়ে ফেলল। ততক্ষণে আমরা সকলে নেমে দাঁড়িয়েছি। নন্দন বলল—মাপি, জল খাব, টুকাই বলল বাপি, জল খাব। পরেশ আর সুব্রত তখনও টাক্সার ওপর বসে ছেলে দুটির হাতে, মাথায় স্যাটকেশ বেডিং তুলে দিচ্ছে। ছড়িদার ফিরপ্রতিতে সেওলের ঠিকঠাক মালপত্র বসানো হয়েছে কি না পরীক্ষা করে বলল, পাঁচ নম্বর ঘরে নিয়ে যাও, চাবি খুলে রসমতি পরিষ্কার করে রেখেছে। কণ্ডাক্টর ওড়িয়া ভাষায় ওদের বলে, আমাদের দিকে চেয়ে বলল, আসুন বাবু, মা'র আসুন আমার সঙ্গে। একটু জিরিয়ে চা'টা খাবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। কোন কষ্ট হবে না বলে চিৎকার করে, পাঁচ নম্বর ঘর—বলে আগল। তারপর নন্দন আর টুকাইকে মুটোতে ধরে সাবধান হয়ে আসবেন। পাটাতনটা নড়বড়ে—বলে পথ দেখিয়ে একটা আধাঘরলা সিমেন্ট চটা সিঁড়ির ভাঙ্গে এনে উপরের দিকে চেয়ে বলল, দোতলায় উঠে আসুন। অনিন্দিতার চোখ দুটো কুঁচকে উঠল দেখলাম। লেখাও চুপ ভাবলো। ছড়িদার হেসে বলল খুব ভাল ঘর দিয়েছি আপনাদের। রাতে গাড়ি ঘরে ফোনআরা থেকে অন্তত সাতজন। তাদের তিন নম্বর ঘর, তলে সুব্রত আর পরেশকে বলল চলুন, মালপত্র ঘরে তুলে কাজের ভারগুলো আপনাদের বুঝিয়ে দিই। নন্দন আর টুকাই ততক্ষণে দোতলায় চড়ে ভরান্দাজ রেলিং এ ভর দিয়ে, মাপি টু—কি—কি করছে। আমরা যার সেখা দোতলায় উঠে গেছে। অনিন্দিতা বলেছে বাপ উঠেই সিঁড়ি থেকে নেমে এসেছে। সেও ঝকঝক দেখবে। ঘাড়িটা দেখানে শেষ হয়েছে তার পরেই লাদেরা আর একটা মাটির ঘর, টালির চাল। মুটো ছাড়ির মাঝখানে ঘর পরিসর রাস্তাটা দেখেই গাড়ী ফিরছে ফিন ফিন করে উঠল। সাত জনেও ওপরে সূর্যের আলো পড়ে না। ছড়িদার বলল, এই দেখুন সাত ঝকঝক। পাতকুয়োর। এই ঘড়ি আর ঝালাই। মনে মনে ভাবলাম ঘড়ি কলসি হলে ভাল হতো। পাতকুয়োর

মাথার কাঁটাল গাছের ভরা পাতার সূর্যের আলো গিয়ে ছেয়েছে। তার সামনে ছোট একটা ভগ্নাবশিষ্ট ইটের পাঁজনির দেওয়াল। বুটা ওপেনিং। বুলিকের দেওয়ালের একটিতে একজন পুরুষ মল হাতে ঢুকেছে ভানে পৈতে। আর ডান দিকের দেওয়ালে একজন লজ্জাকরত বধূ মাথার ঘোমটা হাতে মল। খুব অল্প হাতে হাত কয়েকার কালি দিয়ে আঁকা। সেটা দেখিয়ে ছড়িদার বলল, সুব্রত বাবাজী বাবু। সারা পুরী শহরেও তোমাকে এমন সুন্দির পাবেন না। কোলকাতার বড় বড় বাবু-বিবিরিরা এসে আমাদের পাণ্ডার আঙ্গরে ওঠেন। ভূতের বেলায় সেই বাবুর আমার কথা আছে। বড় বেজেজের। চেয়জন আসবেন। চলুন বাবু বসি বাবাবাবে যেতে চলে চলে যান। তারপর বিশ্রাম করুন আমি আসছি—হা রসমতি-রসমতি হো বলে চিৎকার করে বাড়িটা মাথায় করে ধনিষ্ঠিতার দিকে চেয়ে বলল রাতের বেলার তরকারি পরমান এনে দেব। রাতে আর রান্না করতে হবে না। দুপুরে যদি হোটেলে খেতে চান বাল হোটেল আছে। পুরী শহরের সবচেয়ে ভাল হোটেলে নিয়ে যাব আপনাদের—যান যান ওপরে যান দেরি করবেন না বাবু বলে বকিতে আবার এ রসমতি রসমতি হো করতে করতে প্রস্থান করল।

অনিন্দিতা পায়ের পাতার উপর লুটোন শাড়ি দেখে করে মুঠোর ছেপে সুব্রতর দিকে তাকালো। পরেশ আমার দিকে চেয়ে শিক করে হাসলো। সুব্রত ঠোঁট উল্টে বলল, এক্সকার মত একটু দেখি, এখনে জন্মে পোষাবে না বলে আমরা দোতলা নাম বিল্ডিংয় উপরে নিয়েছি ওটা ছেলের পা দিয়ে আড়াইশো জানালা খোলা খুলা দশবাই দশ স্কোয়ারফিটে এক, দুই, তিন, চার করে পাঁচ নম্বর ঘরে দিয়ে যাবেন। দেখি, অনন্দা লয়ের সাজ্জাম নিয়ে বসে ঔরেই আতন দিয়ে ফেলেছে। লেখা একটা সতরঞ্জির ওপর কাঁথার মেয়েকে শুইয়ে দিয়ে পাড়িতে বিট দিতে দিতে আমাদের দেখেই ঘুরে দাঁড়াল। আমি হেসে বললাম, লক্ষণের কিছু নেই, ওরকম পরিস্থিতে যখনই আমাদের বাড়িকে সামনে দেখবেন, মনে করবেন সেই মানুষটিই আপনার মনের মানুষ। সুব্রত যেন অতি ঘুমেও হেসে ফেলল, এক সঙ্গে যদি এই রকম আমাদের তিনজনকেই দেখে এক ভ্রমণী ভাহলে! আমি বললাম তাহলে তিনজনকেই একজন হিসাবেই দেখবেন। পরেশ আবার ওভাল, ভক্ত প্রভুর এতক্ষণে একটা বিবেচনা। অনিন্দিতা সতরঞ্জির একপাশে এগিয়ে বসে অনন্দাকে উদ্দেশ্য করে বলল, বিধি আপনার একবার মুক্তনে দিয়ে রেখে যাবেন। লেখা বলল, আমি এখন এত কাপ চা না খেয়ে এক পা'ও নড়তে পারছে না, বলে বসে পড়ল মেঝের ওপর। অচমকা স্তব্ধ করে একটা শব্দ হলো। অনিন্দিতা একেবারে চিৎকার করে হেসে উঠল। লেখার মেয়ে এতক্ষণে প্রতিকৃত্য করে ফেলেছে—তা দেখে হেসে পরেশ সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে বলল, ভোর পাঁচটায় ওর পাহারা করার কথা—আজ এত বেলায় করলো. সারারাত আর খেয়েছে কোথায় বলে লেখার দিকে তাকাল। লেখা বলল, আমি পারব না বলে, চোখমুখ ভারি করে পরেশের দিকে তাকাল। পরেশ তাড়াতাড়ি মেয়েকে টেনে সরিয়ে নিয়ে কাঁথাটা ওটিয়ে নিয়ে নেমে গেল পরমুহূর্তে পরমুহূর্তে। লেখাও মুখ ভার করে ঠিক হয়েছে তখনো ঘাড় নেড়ে ওদিকে। সবাইকে সব কিছু করতে হবে। মেয়ে তো আর আমি বাপের বাড়ি থেকে কোলে করে আনিনি। সুব্রত হেসে বলল, তা তো ঠিক, বলে অনিন্দিতার দিকে চেয়ে বলল, কাপড় ছেড়ে নাও। মুখ হাত ধুয়ে এসো। অনিন্দিতা বলল, কোথায় কাপড় ছাড়বে? সুব্রত বলল, আমার বুকের উপর ছাড়ো। কেন ওরা যেখানে ছেড়েছে সেখানে ছাড়বে। আমি সুব্রতকে ধরব দিয়ে বললাম দুই কিন্তু সব সময় মেয়েটাকে বকছিস কেন বলত। কী হয়েছে তোর—এমন ঝগড়াটে তোকে এর আগে তো দেখিনি? সুব্রত বলল, লক্ষ্য করছিস তো, সেই প্রথম থেকে কী রকম ছেলেমানুষী করছে, আমি দেখে বললাম ও ছেলেমানুষ ছেলেমানুষী করবে, তুমি পাকা পঁয়ত্রিশ বছরের দামড়া ধিয়ে ঘরের দিন বছরের একটা মেয়েকে ও ছেলেমানুষী করবে না তো কে করবে। মা বাবা জান দিলনে, ফলে অনন্দার পাশে বসে পড়ল সুব্রত। কাই চা হচ্ছে আমাকে দিন অনন্দা। অনন্দা তাড়াতাড়ি চা এঁকে সুব্রতর হাতে একটা গরম চায়ের কাপ তুলে দিতেই সুব্রত বলল, কেন ও ঘরে এসে এতক্ষণ কাপড় ছেড়ে চা'টা বানাতে পারতো না। সারারাত তো ঘুমিয়েছে অবেলায়—। অনন্দা বলল, আমিও ঘুমিয়েছি তো—। হলোই বা, ও তো ছেলেমানুষ ভয়ের চোখে চুমুক দিতেই লেখা বলল, আসলে কী-এর হাতের চা না খেলে আপনার মেজাজ ঠিক হবে না। সুতরাং ভয়ের আপনি ঠোঁটের কাছে ধরে বলল, যা চা বানিয়েছ বিধি বলে লেখার দিকে একটা চোখ টিপে কী যেন ইশারা করলো। লেখা অনিন্দিতার দিকে চেয়ে বলল, আর চোখের জল ফেলতে হবে না—দুটি চা খেয়ে কাপড় ছেড়ে নাও। অনিন্দিতা উঠিল করে উঠল জিজ্ঞাসা করল তো আমি ওর কী ক্ষতি করেছি। সেই অবধি ছেড়ে বসেছে তখু তখু। এমন সময় ছড়িদার আর পরেশ এসে ঢুকল। পরেশ বলল, ছড়িদার কলছে কিছু আনতে-টানতে হবে কি না, বলে পরেশ আমার দিকে চেয়ে বলল, লক্ষণ আর টুকাই কোথায়? তাই তো, আমরা, লেখা আর আমি একসঙ্গে চমকে উঠে দাঁড়ালাম। পরেশ হেসে বলল ভয় নেই, ওরা ছড়িদার—আজ্ঞা কী নাম যেন ভাই তোমার বলে ছড়িদারের দিকে তাকালো।

ছড়িদার হেসে বলল আমার নাম অবিনাশ বাবু বিদ্বিপদ। আমার নাম বিদ্বিপদ ছড়িদার বলতে পুরীর কাকটাও বেরিয়ে যেতে। বিদ্বিপদর কথা শুনে অনিন্দিতার মেয়েটা মুখে হাসি ফুটল। অনন্দা বলল, ওরা কোথায়। বিদ্বিপদ বলল, ওরা আছে মা, নিচের আমার শালার সঙ্গে ভাল রান্নার মানুষ দেখছে। আমি বললাম, ওরা জল খেতে চেয়েছিল। অনন্দা বলল, তোমাকে না জানালেও চলবে। ছেলের কাকা বেচে ছেলে তো আর রাখছে না। তা শুনে লেখা মুখ টিপে হেসে চায়ের কাপে চুমুক দিল। পরেশ হেসে বলল ওরাপ ওধু শিল্পিকেই দিয়ে যাচ্ছ—আর আমরা ছৌয়ের ধারানি ওনেই বাচ্ছি আমি হেসে বললাম, ওস্তাদেরও এইসব দিন দেরি আছেরা। সুব্রত চোখ পাকিয়ে হেসে বলল, তোদের মত ট্রেন নই তো আমি। মুখ কালটা দিয়ে সেদিন ফুকতে পারবে লেখা হেসে বলল, দেখবো দেখবো। বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ছেড়েই যাই, আর বাচ্চা হওয়ার পর—। আমি হেসে বললাম, সত্যি সুব্রত বাচ্চা হওয়ার আগে পর্যন্ত ওরা দুর্বল থাকে। আর বাচ্চা হওয়ার পর—দুই দেখে নিস—এই যে অনিন্দিতা কথা বলার চেয়ের কল ফেলছে তখন দেখবি, ওই তোর চোখের জলকে যান করে ছেড়ে দেবে। আসলে বাচ্চা হওয়া মানেই মেয়েদের পুনর্জন্ম।

সহসা নিত কণ্ঠে সমস্বরে গান গাইতে গাইতে ঘুটে এল লক্ষণ আর টুকাই "পাখনা ঝাপটা মেঘের আছে নেইরো তোমার জানা" লেজ নেড়ে গাইতে গাইতে এসে আমাদের মতো হাসির হলো। তা শুনে বিদ্বিপদ হাসতে লাগলো বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অনিন্দিতা, লেখা আর অনন্দা সবাই ওদের দিকে চেয়ে আছে। গান থামিয়ে লক্ষণ বলল, জান মা ভাইরে কোহেরা কোহেরা, কী রকম করে বেন বলছে। টুকাই বলল, এখনে সিলেমাপ তোলেরা হচ্ছে। বলতে বলতে আমার ঘর থেকে অনন্দ দিয়ে গাইলো "আমি হই তোর কাটা ওই পাড়ি তাঁরে" টুকাই মত পাল্টে দিল বলা না—না ওটা নয়, "বিশ্বিনন্দনের অরুণ মুখা" । সুব্রত বলল, উফঃ কিন্তু একেবারে-পরেশ তোরটা মারণ কিন্তু—। লেখা বলল, হবে না—প্রাণই তো উনতে টানতে হয় ক্যারেক্টার লক্ষণ বলবে কেন—পরেশ বলল, হ্যাঁ আমার চিকার পায় আছে কিনা-রে কাঁকাবাবাই, আমনি টানা।

বিদ্বিপদ হঠাৎ চমকে উঠে বলল, বাবু আমি ভাহলে নিচের যাই, দরকার হা ডাকবেন। তারপর কিছোদে পাণ্ডার সঙ্গে আপনাদের লেখা তরিয়ে দেব। আমরা সকা যায় নেবে আজ্ঞা বলালাম। বিদ্বিপদ চলে গেল। অনিন্দিতা চায়ের কাপে চুমুক দিতে পরেশ বলল, ওই যে ওস্তাদ, তোমার দেবীর নাম ভেজেছে তা শুনে অনিন্দিতা হাসতে ঘরের এক কোণে নর্দমার মুখের থেকোর ঘেরা জায়গার কলমটি জলটি করে ব চুলে ভেজে ছিল। তা থেকে অনিন্দিতা জল নিয়ে আমরা চায়ের ঝোঁটলি ধুয়ে পরিষ করে রাখল। লেখা ঠোঁটে দুধের বাটি চালিয়ে দিয়ে মেয়েকে শোয়ার দিকে তাকি পরেশের দিকে তাকালো। পরেশ বলল, শেষটা পড়ে দেখে একেবারে, তখন ছুটে ছুটতে টুকাই আর লক্ষণ হঠাৎ এসে হাজির হল। দুজনের মুখেই এক কথা বা বলি, খোল কোকিল ডাকছে, বেরিয়ে এসে দেখ, বলে আমার আর পরেশের হা ধরে দুজনে টানলো। আমি আর পরেশ দুজনেই ফুল বারান্দার এসে দাঁড়ালাম। বে সামনের আম গাছটার পাতার ফোরের আলো ছড়িয়ে আর ডালে বসে একটা কোকি ডেকে উঠল, কুউ—কুউ। সুব্রত ঘরে বসেই বলল, ওরেই কোকিল ডাকু এখানে থাকা চলবে না। কিছুতেই না।

পরেশ আর আমার দিকে চেয়ে সুব্রত বলল, তোদের কী মত, এখানে থকা আমার ও পরেশের মতামত দেবার আগেই লেখা বলল, আমার ভীষণ খারাপ লাগ মনেই হচ্ছে না যে পুরীর সমুদ্র দেখতে এসেছি। আমি লেখার কথা সমর্থন ব পরেশের দিকে চেয়ে বললাম, তোর কী মত, তোর ভাল লাগছে? পরেশ এ উত্তেজিত ভাবে বলল, না ভাল লাগছে না। তবে টাকা পয়সা লাগছে না, বিদ্বিপদ আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ও বলেছিল এটা একটা ধর্মশালা, এখানে থাকার ভ কিছু লাগে না। সুব্রত বলল, কিন্তু এর তো একটা মেনটেনেন্স আছে—ও সব চা কী করে আমরা ওই যে ছড়িদার, সেই গাড়ির ভেতর থেকে আমাদের কনভিনস এখানে নিয়ে এসেছি। তাও জিজ্ঞেস করেছি, ওতে ও বলল, মন্দিরের পুজো দে

আর পাওনা কিছু হওয়া একটাই ওদের আশা। সুব্রত ঠোঁট বেঁকিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, আমার মনে হচ্ছে কেন উদ্বেগ আছে ওদের। হয়ত এখান থেকে যাবার সময় একটা হেস্তী নেস্তী করে যাবে। আমি হেসে বললাম, তোর ধারণাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু মানুষকে আগেই কী করে অবিশ্বাসের কথা যায়। আর তাছাড়া, জগন্নাথের পাতা জলে কথা—ধর্মস্থানের ব্যাপার। সুব্রত ড্রেন টিনিয়ে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বলল, তোর হয়ে এসেছে। যতদিন না মানুষকে অবিশ্বাস করতে শিখবি, ততদিন আর মানুষ হতে পারবি না। এরা ছেলে সহজে ঘুমে ভাব করছে। সে আই হোক, তোমরা তোমাদের পরনো আর বিশ্বাস নিয়ে এখানে থাক—সমুদ্র দেখতে এসেছি, আমি বীচে গিয়েই উঠবো এবং তা আজই, বলে উঠে দাঁড়াল সুব্রত, তারপর অলকা আর লেখার দিকে ফিরে বলল, আপনাদের কী মতলব? লেখা আর অলকা আমার আর পরেশের মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। সুব্রত বলল ঠিক আছে, বলে অনিন্দিতার দিকে ফিরে বলল, তোদের নিশ্চিন্তা তোফায়। ছাদের ওপরে ছাদতে বলেছিলাম, ছাদতে ছাদতে নিজেই ঢেন টেনে ছাদটা খুলে তোদের নিশ্চিন্তা ব্যয় করল। পরেশ বলল, এসেই যখন পড়েছি, এখানে স্নান না লাগলে উঠেই নিয়ে উঠব। কিন্তু তার এত তাড়া কি—চল চান-টান করে আসি। বলে জামা প্যান্ট ছাড়ার জন্যে গামছা খুঁজতে বেডিং ব্যাগটার ভাগলো পরেশ। অলকা বলল অমলকে, তুমিও চান করে এসো। আমি বললাম, আগে মেয়েরা যাক—তাদের পর ঘন্টাখানেক লাগবে চুল বাঁধতে। অনিন্দিতা তুমি ওঠ, চান করে এস—বলে আমি আর পরেশ বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। পরেশ বলল, নিচের পকেট থেকে মেলি বল টাকা ভাড়া পড়বে বিদ্বিপদ বলছিল। আমি বললাম, একসঙ্গে এসে কামরার ভাড়ার ভাল লাগে না। সুব্রত কেন যে ইনভিজিবেন্ট হয়ে পড়ল বুঝতে পারছি না। আমাদের যখন রেজার্ভ করা হয় তখন কিছু কথা ছিল হয় কমই হোক, কম পক্ষে কৌদিন আমরা এখানে থেকে যাব। অবশ্য যে কদিন ছুটি আছে। পরেশ উদলা মেয়েটাকে ডমাস্ক রেলিং-এর ওপর তার বিছে শিপমেন্ট চান মেলে বলল, ওস্তাদের মনে কী হয়েছে কী জানি। বাড়ি থেকে রওনা হবার আগে থেকেই ঝামেলা যাচ্ছে। আমি কুক কুঁচকিয়ে বললাম, কেন বলতো? কী জানি, বলে পরেশ টোকা মেরে সিগারেটটা ছাই ছেড়ে বলল, আগে চান-টান করি, খেয়ে নি, তারপর ঠান্ডা করে তখন বলব। তারপর লেখা আর অলকাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আগে আপনারা চান করিয়ে যাও। লেখা অলকার দিকে তাকাল, চোখের তারা কাঁপিয়ে, তবু অর্থার মেয়েই বলল। কেন তুমি কী এখন সিগারেট টানবে নৌকা করে। সুব্রত হেসে মেয়ে, কেমনে গামছা পেঁচিয়ে ঠোঁটে ঝুলন্ত সিগারেট দুপ-দাপ পা ফেলে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি অবাক চোখে ওর ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করে বললাম, বুঝলি, অনিন্দিতার সঙ্গে ওর ঠিক এ্যাডজাষ্ট হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, মেজাজিন না সবাই ডেপুরিয়াস।

লেখা কখন এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে আমাদের পাশে খেয়াল করি নি। সেই আমার কথার উত্তর দিল বিনবিনিয়ে, আসলে তা না। দেখেন নি কাল সমস্ত ওইটুকু মাথে ঝুমুনে কী রকম জড়িয়ে ধরে শুয়ে ছিল। বলে ঘরের দিকে চেয়ে অনিন্দিতাকে লক্ষ্য করে কাঁদ কিছু করে বলল, দেখীও রেডি, একসঙ্গে চান হবে—কী গো। তোমরা ওদ চান করে এস বলে অনিন্দিতার দিকে চেয়ে মিক করে হাসল। অনিন্দিতা মুকের উপর টাওয়েল ফেলে মুখ নিচু করে চলে গেল নিজের। তখন লেখা বলল, আজকে আমেলা না করে চল, একসঙ্গে যখন এসেই টানার কথা ভাবলে আর আনন্দ করা যায় না। পরেশ ফিসফিস করে বলল, ওর আর কী। আপনি আর কুপনি। আর আমাদের কথাটা একবার ভেবেছ, তখন অর্নব বললাম, সত্যিই তো—আমরা একটু সামলে না চললে এই বিদেশ বিভূঁইএ-এ মারা পড়ে যাব। একটা ওর ভেবে উচিত। পরেশ ঘাড়ে নিল, ঠেলায় পড়লে তখন বুঝবে। আমাদেরও এক দিন অমন দিন গেছে। অলকা একজন ঢুকাই আর লখনকে তেল মাখাচ্ছিল, বলল, আর তেরি তোর না মোমরা, ওদের তেল মাখিয়ে দিয়েছি—নিয়ে চান করিয়ে যাও। পরেশ ঢুকাই আর লখনকে নিয়ে চান করতে গেল। লেখা আর অলকা মাথার চুলে কিসমি চাপিয়ে তেল নিল, তারপর ব্যাগ গোঁছিয়ে নেবে গেল সিড়ি বেয়ে। আর আমার তখন সেই ছাত্রাবস্থাটাই ফিরে এল কেন কেন মনে হলো, বাসস্টীয়ের যাওয়া হচ্ছে জগন্নাথ দর্শনে না—সমুদ্র দর্শনে—সত্যি কী সমুদ্র দর্শনে এসেছিল আমরা—জানি না। তবেই সমুদ্রে সবাই ঢেউ আছে, ঢেউ গড়ে আবার ভাঙ্গে, আবার গড়ে, এই ভাবে গড়ার খেলায় সে মেতে আছে নিত্য নিরবধি।

সহসা মুখ তুলে অলকাকেই দেখি, বারান্দার বুটা টোকাঠে দু-হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে, হাসিমুখ বিদ্বিপদ। মুখে লিখেন পানের সব কল মেয়ে ফেলছে, গলে মালা, কাঁধ ঢেকে গামছি, পরনে আই হাতি কোরা মরলা ধুতি, খালি আবডা আবড়া পা, বয়স ছেচল্লিশ পঞ্চান্ন পড়িনি, ছোট করে ছাঁটা খাড়া খাড়া তবলো চুল, তাদের চোখ আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসার চেষ্টা করে বলল, আবু চানে করবে নিন, আওয়া-দাওয়া করে আমার আবার বড়দল করতে হবে। আজার পূজোর পরেশাম থাকেন অভিবে, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। পাণ্ডাকে আপনাদের কথা বলেছি। যেমন কষ্ট হবে না, আমার আছি, পাণ্ডা কিরেলে আসবে। পরিচয় করিয়ে দেব। পড় পড় করে কথাগুলো এক নিশ্বাসে শেষ করল বিদ্বিপদ। আমি বললাম, আজ্ঞা বিদ্বিপদ, ট্রেনে সব বন্ধুলোক এলো তা বই, তোমরে এখানে এক আমরা ছাড়া আর কেউ তো এলো না। বিদ্বিপদ উত্তরে জানালো, আবু যখন নিজন হবে সে টাইমে ঘর একেবারে ভরে যাবে। জায়গা দিয়ে উঠতে পারব না। এখন তো নিজন না, তবে জোনাকরতা থেকে চারজন যাবু আসবে। আমি হেসে বললাম সে তো শুনেছি। বলে বিদ্বিপদর মুখের দিকে তাকালাম। বিদ্বিপদ কেন কেমন করে হাসল, তারপর কেন লজ্জা পেয়েছে এমন করে ঈষৎ ঈষৎ মাথা নিচু করল।

সুব্রত আমাদের সমুদ্রের কাছেই যার নাম ফর্ণবার, সেখান থেকে এক মেয়ে মিনিস্টার মুক্তার মালার পাশে একটা একতলা বাড়ির ছাদীর মেয়ে ঘরের বারান্দার ভিতর দিয়ে ছয় চৌদ্দ ষাই ঘর ঘরের লম্বা রঙের লিনোলিয়ের মেঝের ওপর পাতা তক্তপোষের ওপর এসে ফেলেছে। ঘরের সমস্ত দরজার সামনের ছোট রেলিং দেওয়া বারান্দার দাঁড়িয়ে ঢুকাই আর লখন, রেলিং-এ ভর দিয়ে উঁচু হয়ে নীল সমুদ্রের ঢেউ দেখছে, আর মধ্যে মধ্যে কেন, জানি চাই মেয়াজে ঝগড়া করছে—ঝগি ঝগি চল না—ঝগি। ঢুকাই বলছে, এখানে কুৎ ভাল লাগছে না। কেন? বলে ওদের দিকে অবাক হবার ভান করে তাকালাম। না চল, আমরা যেখানে এসে উঠেছিলাম, ওখানে থাকবো। তবে লখন ভ্যাব ভ্যাব করে তাকালো। ঢুকাই বলল, ওখানে খুব ভাল, কত বড় বারান্দা যোতলা আর 'কোয়ো' আছে। ঢুকাইয়ের কথায় আমি হেসে ফেললাম। কেন হলে কেন কোহেব চলছে শুনেছিলাম, চলছ রিয়ার সাইকে যোগ্যতা করে যাচ্ছিল। গতকাল দুপুরে, অতর সকালে, আর তা ছাড়া ওই বারান্দার দাঁড়িয়ে ওরা পূর্বদিক মন্দিরের সামনে বারান্দা, রিয়া, টাঙ্গা, মোকনপাটি, মোকজন দেখতে পাচ্ছিল। তাই ওই জায়গাটা ওদের খুব পছন্দ হয়ে গেছে। আমি হেসে বললাম একটা তো খুব ভাল, তোমরা বারান্দার দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ। বেশ কী বিরাট ঢেউ। ঢুকাই লখনকে উৎসাহিত করলো। চল সমুদ্রের ঢেউ দেখব। ওরা সেই ঢেউ দেখছে। সমুদ্রের ঢেউ। লেখা আর অনিন্দিতা তাদের নিজস্ব বীচ ব্যাগ খুলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে রাখছে। সবচেয়ে উঁচু যে তাক সেই তাকটা অনিন্দিতা বেছে নিয়েছে। টুথব্রিসটের, ক্রামের, সিগরেটের প্যাকেট, তেলের শিশি চুলের ব্রিফে, বাঁটে, রক লিপস্টিক, নেলপালিশ ইত্যাদি। তাকের তাকে লেখার ঢুকিঢাকি আর অলকার। সবচেয়ে নিচের তাক খুঁজে পাওয়া। আলাদা এখনও কিছুই রাখেনি। সে যেন যার চোখের সন্তুষ্টম ইত্যাদি ব্যাগ করে স্টোভ ধরিয়ে লেখার জন্যে খুব গরম করতে ব্যস্ত। লেখার মেয়ের ব্রিফে পেয়েছে। সেই সার সকালে ঘুম থেকে উঠেই একটু কিছু খাইয়ে বেরিয়েছিলাম সকলে। ঘরের খোঁজে। ঘুমভাঙ্গা চোখে বিদ্বিপদ এসে আমাদের আগাবতনের উদ্যোগ কথা শুনে এতটুকু অসন্তুষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হবার নি। বরং হেসে বলেছিল, আগেই তো সমুদ্র দর্শন করতে এসেছেন যখন সমুদ্রেই থাকা ভাল। চলুন আমার সঙ্গে আমি সব কিছু ঠিক করে দেব। ওখানকার অফিসারদলের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—বিদ্বিপদ বলতে সবাই অজ্ঞান একেবারে। চলুন, চলুন, খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল বিদ্বিপদ। জায়া ঠিক করে আবার যেতে হবে সেখানে। যাওয়াযাওয়া করতে দেরী হয়ে যাবে। নতুন জায়গা নিয়ে মেয়েমেয়ে আবার করে আবার ঘরদল করতে হবে।

চলুন চলুন বলে একতলার দিকে চেয়ে কত কেল হলো, আসলে করল বিদ্বিপদ। বিদ্বিপদই এখানে এনে অনেকগুলো অফিস দেখিয়ে অবশেষে বলেছিল এই বারান্দাই ভাল হবে বাবু। ডিউকলা আছে : স্যানিটারি পায়খানা আছে; আলো সবই আছে। অফিসারদের একটা আলাদা। তিনি ও তাঁর স্ত্রী থাকেন ওপিকটায়। গেটা অফিসের দু'টা পরিবার একসঙ্গে অনেক দিন কাটিয়ে যেতে পারে অবশ্যিলায় এই রকম ব্যবস্থা। ঘরের দৈনিক ভাড়া সিজন টাইম নয় অবে, সমুদ্রের সাইরে নয়। বারান্দা দেখিয়ে অফিসারদের আলো আপনারদের যখন ডিনটি আমাদের, আজও আছে সঙ্গে তখন আর একজন ঘর কাঁকা আছে, তেতরে নিয়ে নিতে পারেন। একটা ঘরে এত লোক ঘনিষ্ঠ হোপিলেলের আগে বলে মাথা চুলকে অসছিল, জানেন, প্রথিপদ ঘন্টা চলে মনে হয় যে আমাদের কোনকালের চেনা আত্মীয়। এরকম আবার অন্য অনেক ভাড়াটে অফিসারে পাবেন না। এই দেখুন দেওয়ালে একজন ও অন্যজন একজনের ছবি আঁকি।

ভিতর বাড়ির দরজার সামনেই লম্বা ঘোমটা আর আবার পর উনোন। উনোনের একপাশে উনোন। ঝড়িওয়ালা উনোনটা দেখিয়ে বলেছিল এই দেখুন উনোন, সুন্দর জল। এখানে স্নান, খাসন মাজা, সবই চলবে, কাপড় কাচা, মুখ ধোয়াও যাবে—আপনার ইচ্ছা হলে সুখও দুতে পারেন বলতে বলতে রান্নাঘরের মতে একজনা ঘরে গিয়ে জানালাটা খুলে দিয়েছিল।

বেশ ঝিরিঝিরি। দুপুরে একটু গড়িয়ে নিন, রাতে ঘুমোন, সুন্দর হাওয়া খেলবে বলে জানালাটা বড় করেছি—আর এই তক্তপোষ আছে একটা। আর অসুবিধে যেটা অবশ্যই—তা ওটা তো আপনাদের ওই বড় বাক্সগুলার সঙ্গেই আছে। ছাত ছিল্লিতে ঘরকার হলে তাকবেন যে—যে—যে এই বলি। তক্তপোষের একধারে চেয়ার খুব সুন্দর ছিল। এখন বয়সের তারে ঝরিঝরিটা অনুজ্জ্বল কিন্তু বৃদ্ধ বলা যেমনটি হয় না। ঘরখানা দেখেই সুব্রতর পছন্দ হয়ে গেল। সে অনিন্দিতার দিকে চেয়ে পরেশকে বলল, এটাও নিয়ে নিই কী বলিস, ঐ একলে ঘরে ঠিক সুবিধে হবে না। পরেশ বলল, ওস্তাদের ইচ্ছাই যখন আমাদের ইচ্ছা বলে আমার দিকে চেয়ে হেসে চোখ টিপল। দেখা সকলের অলক্ষ্যে অনিন্দিতার কনুইয়ে টোকা মারল। অলকা হাসল। তা এটাও নিয়ে নিন। কিন্তু সত্যসন্ধি সমুদ্র দেখতে পাবেন না। ঝড়িওয়ালা হেসে বলল, না-না দেখতে পাবেন বসে শুয়ে তক্তপোষের উপরে উঠে জানালার পাশে বসে পড়ল। এ-ই এইভাবে বসলে ঠিক দেখতে পাবেন। তবে আগে খুব ভাল দেখা যেত রাস্তার ওপাশের বাড়িটা তখন ছিল না। নতুন হয়েছে। আমি হেসে বললাম, আচ্ছা—আচ্ছা আমাদের পছন্দ হয়েছে—আসল সুব্রতর দিকে চেয়ে বললাম, নিয়ে নাও। সুব্রত হাসলো ; কাল ঠিক আছে, এটাও নিয়ে নিলাম।

ঝড়িওয়ালা যে—যে—যে করে হেসে বলল, তাহলে আসুন, আপনি কিছু দিয়ে যুক্ত করুন। আপনারা যুক্ত করে রেখে গেলে, অন্য লোককে না করতে পারবো। তা আপনারা কখন আসছেন?

বিশ্বপতি পাশেই দাঁড়িয়েছিল বললো, এখুনি, মন্দিরের কাজ থেকে ফিরুমে করে যাসতে আর কত সময় লাগবে। আচ্ছা, আচ্ছা, বসে হেসে, তাহলে আসুন, বলে চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। দাইটার সুইচটা দেখে নিন। ঘরে চল্লিশ পাওয়ারের বাল্ব লাগানো আছে যদি কখন তো পঞ্চাশটা বাড়িয়ে নিতে পারি তাহলে, ওই আর একটু বেশি চার্জ দিতে হবে—যে যে যে বুঝতেই পারছেন ইলেকট্রিকের ব্যাপার, বাড়িটা তৈরি করার পর ইলেকট্রিক আসতেই অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে। আপনাদের মত পাঁচজন লোক আসবেন, উইলাউট ইলেকট্রিক কী করে থাকবেন। আমি তো কখনই হ্যারিকেনের আলোয় কিছুই দেখতে পাইনে। যে, যে, যে—বলে দাঁতকপাটি বাড়িওয়ালা প্রতি কথায় কথায় কতুরে করতে বেরিয়ে গেলেন। আসুন তাহলে আমি তবেই আসি, ওইটা আমার ঘর, আপনারা পাশের ঘরে যাবার এক আত্মীয় যাচ্ছেন। ওরা সব পুজো দিতে গেছেন। উঠোনের উপর থেকে দাঁড়িয়ে তাহলেও ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সুব্রত পরেশের দিকে চেয়ে বললো, ছোটা বলেও টাকা হবে। পরেশ বললো, না বেশ হবে। অত সকালে বেরিয়ে পড়েছি—টাকা আনিনি তো সঙ্গে। ফুলে বেশ কমি কটা হবে। পকেটে হাত দেখলাম পরেশ। আমি অলকার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলাম টাকা আছে? অলকা বললো, ওই না তো—আমার রুমালে বেশ কমি এক টাকা হবে। সুব্রত অনিন্দিতার দিকে তাকালো কিন্তু অনিন্দিতা তখন ঘরের জানালাটা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায় কিনা তাই পরীক্ষা করে দেখছিল। সুব্রত বলতে উঠলো, টাকা আছে। অনিন্দিতা হি হি করে হেসে উঠতেই আবার সুব্রত মুখে দোমড়া হয়ে গেল। তাহলে টাকা—। অনিন্দিতা অলকার দিকে তাকালো। পরেশ দেখার দিকে তাকালো। সুব্রত অনিন্দিতার দিকে তাকালো। টাকা। অনিন্দিতা, দেখ, অলকা সবাই চোখ চাওয়াচায়ী করলো পাখাওলার সবাই তো ওখানে রয়েছে। সেই সিকল দেওয়া ল্যাগবেগের তালার ভয়সার ব্যাপার, মহেন্দ্র ভয়ঙ্কর। হিসেব মিটিয়ে। সুব্রত ঘাঁড় হেলে উঠোনে দাঁড়ালো, বিশ্বপতির দিকে তাকালো। আমি তাকালাম, পরেশ তাকালো, অনিন্দিতা, দেখ, অলকা সকলে। বিশ্বপতি হেসে বললো, চলুন বাবু, দেরী হয়ে যাবে। বেড়িয়ে ফিরতে হবে, এখানে এসে খেয়ে দেয়ে দেরী হবে বেরিয়ে বেলুড় দেবতা দেখতে হবে—চলুন। বিশ্বপতি বেরিয়ে গেল রিক্সা ডাকতে, সুব্রত কাঁধটা ঝাঁকিয়ে অনিন্দিতা, দেখ, অলকা, পরেশ ও আমার দিকে চেয়ে নিজের হিপ পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে ঝড়িওয়ালার ঘরের দিকে পাঁচটা করে এগিয়ে গেল। অলকা দেখার দিকে তাকালো, দেখ, অনিন্দিতার দিকে তাকালো। পরেশ আমাদের বললো, সর্বনাশ! যদি ফিরু হয়ে যায়—আমার চোখে মুখেও তার ছাপ ফুটলো, যদি ফিরু হয়ে যায়—যাদের উৎকণ্ঠার বিশ্বপতি মুখখানা হেসে উঠলো চোখের সামনে। আমন সামাদিয়ে, সারা প্রকৃতির লোক পরিশ্রমের আজার পরমসুখে জীবন কাটায়। ঠিক তখনই হাজরামোনিতার ঝড়িয়ে যে যেন ঈশ্বরের তখন পাইয়ে করুন এলো। কলিকালো নয় তবু সুখ—অপূর্ব কাঠস্বর—। সবলো সুব্রতর কথার চমক ভাঙলো, চল, বিশ্বপতি রিক্সা এনেছে—

রিক্সা আসতেই সুব্রত লাফিয়ে পড়লো, পরেশ লাফিয়ে পড়লো, আমিও লাফিয়ে পড়লাম। আমাদের আগে বিশ্বপতি এগিয়ে গেল, এ-রাসমণি, কালমণি হো তল তিতরে ঢুকে গেল। এই রিক্সাতেই আবার আমরা নিয়ে যাব অর্ধকারের নতুন বাসায়। সুব্রত লেকচারার উঠেই, চাবি দিয়ে তালা খুললো—আমরা একরকম ছুটতে ছুটতে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। এবার অলকা, অনিন্দিতা আর দেখা তাদের পরনা মজাদান থেকে আর কথে, ঢিলে ঢিলে রেখে টাকাটা আর কেউ আগের ঠিকমত ঢুকিয়ে দিয়ে হাসলো। সুব্রতর মুখে হাসি-পরেশের মুখ হাসি ফুটলো, আবার মুখে হাসি ফুটলো। আমি পেছন ফিরে বারান্দার বিশ্বপতির দিকে চেয়ে বললাম। বিশ্বপতি বললো, বাবু, গুছিয়ে নিন। গুছিয়ে নিন। ওখানে ফিরে সমুদ্র স্নান করবেন, জলখাবার, আহার করবেন, আমি আপনাদের পৌঁছে দেব, আবার ফিরে আসবে মন্দিরে, আবার ফিরবেন দিয়ে আপনাদের নিয়ে আসতে এখানে, আজ জগন্নাথকে দেখবেন, আর সব ঠাকুর দেবতা আছি দেখবেন তারপর কালকের মত আবার ভোগ রাতের বেলায় আমি পৌঁছে দেব। বিশ্বপতির দিকে তাকিয়ে কেন জানি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। ইচ্ছে হচ্ছিল, এখুনি বিশ্বপতির হাতে কিছু তুলে দিই। কিন্তু সাহস হলো না। বিশ্বপতি ঢুকে পড়লো ঘরে এবার সে পরেশ ও সুব্রতকে বেডিং বাঁধতে, জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে সাহায্য করতে লেগে গেল। এবং যথকের ফেডিং বাধ একটা স্যুটকেশে নিমেষে কাঁধে এবং হাতে নিয়ে রিকশার করে বললো, চলে আসুন বাবু, খালি জিপ পড়িতে নিচের নেমে গেল আমরা জিনিসপত্তর নিয়ে রিক্সায় এসে বসলাম। তখন সেই অপূর্বশোভা রাসমণি এবং হাত জড়ালো, বর্ধমণি। সুব্রত পকেটে হাত দিয়ে কিছু অর হাতে দিতেই চোখ কপালে উঠলো, কালমণি। বিশ্বপতি বললো, ওই নিয়ে যা—। সুব্রত বললো, এ কী করেছো যে আরও চাইছে—। দেখা বললো, এটা চারের ছাপগুলো পর্যন্ত আলকাকে মাজা হয়েছে। ও শুধু একবার ঘরখানা মুছে দিয়েছিল। বিশ্বপতি, চলুন, চলুন স্যার রিক্সাওয়ালাদের বললো, চলাও, চলুন বাবু আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। আবার সে এখানে আসার সময়ে যেমন করে রিক্সার পেছন পেছন ছুটছিল তেমনি ছুটতে লাগলো সে। মন্দিরের সামনে আসতেই বললো, কালকে দেখা হয় নি, আজ দেখেদেরে, আবার করে এসে দেখবেন। আসে পাশের ঘিরে যান মুহূর্তে লাগলো বিশ্বপতি! আমি অলকার বললাম, আমরা একটা খুব অন্যায় করছি। অলকা বললো কী? আমি বিশ্বপতিকে বললাম, দেখছো তো কীরকম করছে লোকটা। ওকেও একটা রিক্সার ভাড়া দিলে হতো। অলকা বললো, তোমার আগ ঝড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না, সুব্রতর পরেশরা ওরাও তো দেবে, আমি চেপে গেলাম।

নন্দন গুহার চুকাই সেই যে সবুজ দরজার কাঠের গেটটা খুলে, দেখলো, ঝরি ঘুরতে শুরু করেছে—সত্যি চমক ভাঙলো আমার। ঝড়িওয়ালা এখুনি খাই খাই করে এসে হাজির হবে। ওদের কাছে আসা বুড়োর ভরসা নেই। আমি নন্দন আর চুকাইয়ে তাকতে যাব এমন সময় চোখে পড়লো, সুব্রত, পরেশ, ছড়িয়ার বিশ্বপতি। তাদের হাতে আজার, কড়াই, খুন্তি, হাতা ইত্যাদি সংসারের সরঞ্জাম। তাদের পেছনে বা সাধারণ-অসাধারণ বয়সের একটি পাঞ্জাবী পা-জামা পরা লম্বা ছিপছিপে ছেলে আর পেছু জীম বিশ্বাসের চশমাপরে যৌবনাবতী একটি মেয়ে কেশ উঁচু দাবা। তা আমাদের অলক অনিন্দিতা, দেখার চেয়ে লাখার উঁচু। পরনে পাকা সবুজ রঙের শাড়ি, কাঁধে ঝোলা লাল কালো ডোরা কাটা ব্যাগ, মুখে মর্মী হাসির ঝড়। সুব্রত তাদ হাতটা উঁচু ক বললো, ওই যে, অরুন্ধার দাঁড়িয়ে সমুদ্র দর্শন চলছে—সুব্রতকে দেখে মনে হয় কেন জানি ওর প্রোগ্রামটা একটু ফিকে হয়েছে। চুকাই, নন্দন ভতঃকিত বিস্ময়ে আপন অপরিচিত যুবকদের দেখে উল্লাস ভুলিয়ে তাকিয়ে আছে। ছড়িয়ার বিশ্বপতির পাশে পাঞ্জাবীর কাঁধ আরও একটু বেশি ছিঁড়েছে। যায় করছে ধরনের করে। ওরা এ উঠলো আরম্ভার। বিশ্বপতি হাতের জিনিস নামিয়ে বললো, আমি চলি বাবু, আমি আসবো বিকালে আপনার ফেরেদেরে আমার ভরসা। অলক মন্দির দরজনে যার সুব্রত তাড় নেড়ে বললো, আচ্ছা, আচ্ছা। বেশ করি তার ভাড়ায় একটু উঁচু রেজা বিশ্বপতি আলখা থেকে নেমে বেরিয়েই সুব্রত আবার বললো, লোকটাকে তোরা ব বেশি আস্কারা দিচ্ছিস। পরে পরে এত কষ্ট করছে শুধু কী অকুমের আগে বেরে বলে। আসে মুটো আঙুল তুলি মেয়ে চোখের তারা ঘুরিয়ে পরমায় কথাটা বুঝি দিল। পরেশ সুব্রতর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে ওপটালো। তারপর আপনমনে তাদের

তরুণীটি বলছে না, সেরকম বলতে কেন জানি আটকাচ্ছে। দুজনের দিকে চেয়ে সুব্রতকে বললো, ওভাল, পরিচয় করিয়ে দাও। ওরে তিড় করে দাঁড়িয়ে আছে অলকা, অনিন্দিতা আর লেখা। অলকা বললো, আবে, ওদের বলতে দাও, তবে বৌটিকে বললো আপনি বলুন। তরুণীদের ওপরে রাখা বোতিটা সরিয়ে দিল পরেশ। সুব্রত বললো, আমাকে দেখিয়ে, ইনিই হচ্ছেন সেই তিনি, উচ্চতে আঁতে, মানে লেখাটেখা, মেয়েদের নয়ে—বলে মুহূর্তে ভবে অনিন্দিতাকে দেখিয়ে বললো, এটি আমার, অলকাকে দেখিয়ে বললো, এটি আঁতের আর একটি পরেশের কাঁধে হাত রেখে বললো, দুই সন্তানের জননী, ওরা সরকারী চাকরোয়ার বাইরে ভাবে না—তারপর নন্দন দেখিয়ে বললো, কিন্তু সি প্রেট—বলের নাম করার পতায় রাখবে। সুব্রতর কথা শেষ হতেই বৌটি বললো, কেন কবিতা ছড়া লিখছ নাকি। সুব্রত বললো, না-না। ও, আ, ক, খ জানে কিনা সন্দেহ তবে মুখে ফুলঝুরি ছোটে—সিনেমার গল্পগুলো সব মুখস্থ। ঝপি সেনা, একবার, "যদি হয় চোর ছাড়া ওই শাড়ির ঠকবে" শুনিয়ে দাও তো। নন্দন লজ্জায় আইরে ভাজবার দুটো পেল। সঙ্গে টুকাই। আমি আগন্তুককে বললাম, বসুন, বসুন—তারপর অলকার দিকে চেয়ে বললাম, চা—। সুব্রত বাঙ্গের সুরে টাট্টা করলো, চা আছে কিনা সে খোঁজ আছিস। মেয়েদিদি আছে কিনা তোর মাথাব আছে। কুড়ের বাদশা—। আমিও সুব্রতকে ধমকে বললাম, বোকা রামসে আছিস কী মনে। অলে আগন্তুকের দিকে চেয়ে বললাম, আপনার পরিচয়টা কিন্তু পাইনি। আগন্তুক হাসলো, কোতুকে দেখেছেন কলে মনে পড়ছে না আপনার। কপাল কুঁচকে বললাম, ঠিক মনে করতে পারছি না। আগন্তুক এবার গলা ঝাঁকারি দিয়ে গৌজ করে বললো।

আমাদের আপনি পাড়ির মধ্যে দু-একজন দেখেছেন। বলে পরেশ আর সুব্রতর দিকে চেয়ে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, আমার নাম প্রশান্ত ভট্টাচার্য, আমার স্ত্রী শ্রদ্ধা ভট্টাচার্য, আগে যারি ছিল টালাইল এখন চাকরি সূত্রে থাকি চেলাইল, বিয়ে করেছি গাঁকরাইল অবশ্য পাত্রার স্বশ্ব পাটনার অধিবাসী। ওখানেই জন্ম, ওখানেই বড় হয়েছে এখন বিয়ের পর আমার কাছেই আছে, কবিতা লেখা হবি। কথাটা শেষ করে তরতি গলায় ঝাঁসি ঝাঁসি অংভাস তুলে হাসলো প্রশান্ত। আমি শ্রদ্ধার মুখের দিকে তাকালাম। কেন শ্রদ্ধ আর সলাজিতে ছোট মুখে যালসা জীউপচে পড়ছে। আমি মুচকি হেসে বললাম, আপনি বুঝি কবিতা লেখেন। শ্রদ্ধা শাস্ত গলায় সক মিহিস্বরে উত্তর দিল। লিখি বলছেন কেন? লেখা আমার হবি। লিখতে ভালবাসি তাই। কোন পত্রিকায় আপনার লেখা বেরিয়েছে। শ্রদ্ধার মুখমণ্ডল লজ্জায় অরুণ হলো। বললো, পাঁচমন্দ থাকতে আমরা কয়েকজন বন্ধুনী মেয়ে একটা পত্রিকা মিল করেক বার করেছি—তাতে আমার লেখা থাকতো। তারপর সকলের বিয়ে হা হয়ে গেল। পত্রিকাও উঠে গেল। বলে, প্রশান্তর পাঞ্জাবীর কুকের বুটো মেতাম দেলা, সেই ফাঁক জায়গাটায় হাত দিয়ে হাসলে যাকত হয়ে, ফরে আমার যৌ কবিতা লেখে, আপনারাই বলুন বলে অলকা অনিন্দিতার দিকে চেয়ে বললো, আমার একটা গর্ব হয় না। অলিও কবিতার ক' অক্ষি বুঝি না—এই যে অলকা দেবী, তার স্বামী সেক্সেন্টেন্স তা ওঁর বুকফাটার গর্ব নেই কলতে গুণ। পরেশ আবুবে বলে চিৎকার করে অলের জানিয়ে দিল। শ্রদ্ধা বললো, আপনি নাকি দারুণ গল্প লেখেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক। কে বললো, আপনাকে। শ্রদ্ধা সুব্রত আর পরেশকে দেখিয়ে বললো ওরা। আমি হেসে বললাম, আপনার কথার ঝাঁজ, ঝড়িয়ে বলেছে—তবে হাঁ, একটা বুটো লেখা আমার ছাপা অক্ষরে বেরিয়েছে—তাই বলা এই না, যে আমি একজন লেখক। প্রশান্ত হেসে ঝুড়ে দিল, এটা বিনয়ের কথা হলো। জানবে, আপনার লেখা কেন কিনু আছে সঙ্গে। আমার শ্রদ্ধাদেবীকে একটু চালা করা দরকার। বই না হলে ওর ঘুম আসে না। আমি হেসে বললাম, সেকি আমার তো জানি অনাব্যয়ের পরশ্রাই ভবে বই নিয়ে ঘুমোবে, বিয়ের পর বই টুয়ে ফেলে দেবে—কথাটা আর শেষ না করে আমি শ্রদ্ধার দিকে তাকালাম। পরেশ আর সুব্রত তৎক্ষণে নিশ্চয়তে ঝড়িয়ে লাইব্রেরার ছেলে প্রশান্তর নিশ্চয়তেটা ঝড়িতে দিতে দিতে চিৎকার করে উঠলো, আবুবে ওর একবার ছাড়াছে, বলে লেখার দিকে চেয়ে বললে, মেয়েকে ঝাইবেছো? লেখা চোখ ঝাকে বললাম, সে ভাবনা মেয়েকে ভাবতে হবে না। সুব্রত বললো, কেন ভাববে না, ভাবে না। অলকা তার মনের খোঁজটা পরিষ্কার করে দিল আমাকে দেখিয়ে। ওই যে ভদ্রমহিলা বসে আছে, ওর কোন দায়িত্ব নেই। সুব্রত বললো, ওটাকে আমরা সব আগন্তুকে ঝাইনাস করে ঝড়ি কিন্তু মজা এই ওটা কোন ছাপার সঙ্গে না থাকলে জমে না।

শ্রদ্ধা নিজের চোখের তারা স্থির করে হাসলো, লেখক মানুষ যে—ঝমিয়ে রাখতে পারেন। সুব্রত হেসে বললো, কিন্তু বিড়ম্বনাও কম না। কুটোটা ছেটে দু-ভাগ করলে ৪ লাগে। এমন কি নিজের ছেলেমেয়েকে যে আদরাবে তাও ওর দ্বারা হবে না। প্রশান্ত বললো, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে আর সংসারে নজর পড়বে কেমন করে। প্রশান্ত শ্রদ্ধার দিকে তাকালো। শ্রদ্ধা মুখটা নিচু করে রইলো। আমি বললাম, আপনার স্ত্রী কবিতা ভাল লাগে। শ্রদ্ধা জানালো, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দকে বাদ দিয়ে আজকের সুনীল, শক্তি এ ছাড়া সাধনা মুখোপাধ্যায়-এর কবিতা বেশ ভাল লাগে। আমি হেসে বললাম, শক্তির কবিতায় একটা বলিষ্ঠ ভাব মিশি হয়ে আছে যা সতিা পাঠককে মাতিয়ে দেয় তাই না? শ্রদ্ধা মিশিত করে হাসলো। আমি বললাম, কিন্তু ঘড়ি মনে না করেন তো একটা অনুরোধ করি। শ্রদ্ধা বললো, কবিতা আবৃত্তি করতে বলবেন তো! আমি বললাম, হাঁ। শ্রদ্ধা হেসে অনিন্দিতা, অলকা, লেখার দিকে চেয়ে বললো, এখন ভয়বে না—তাছাড়া আপনাদের গল্পাবজা আছে। এখন থাক—আমরা এসে আপনাদের দেরী করিয়ে দিলাম। সুব্রত কিছুমাত্র না কলে সজোরে কাঁধ ঝাঁকালো। তারপর অলকা, অনিন্দিতা, আর লেখার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললো, কবিতা আবৃত্তি শেষ হলেই ভোমরা কম্বে দেখে যাও, সমুদ্রের কোল মাছ টাইলের একরকম জায় মাছ পেয়েছি, খুব লজা।—তারপর শ্রদ্ধা আর প্রশান্তর দিক চেয়ে বললো, এখনে অন্ত একসঙ্গে হয়ে যাক। প্রশান্ত বললো না-না, হোটেলে আমাদের বলা আছে। লজ্জা করে টাকা গচ্চা যাবে। ওও ভাবাওয়ার জন্যে কী আছে। অলকা তো একা আছি কতদিন ভোর দেখা হবে। আমি বললাম, আপনারা বেড়াবার উত্তেজনে। প্রশান্ত হেসে বললো, ঘড়িবেরে কাছে, ভাগেরিয়া হোটেলে। আগে থেকেই ঠিক করে এসেছিলাম। তাছাড়ি, আপনাদের সঙ্গে যখন আলাপ হয়ে গেল তখন এখানে ঘর্ণাবারে কোন হোটেলে এসে উঠবে। শ্রদ্ধা মিহিস্বরে বললো, এসেই সমুদ্র দেখতে। ওখানে আমার একটুও ভাল লাগছে না—সুব্রত জুড়ে দিল, আমাদেরও তো তাই, আমরা আপনাদের কাছেই কিনারাবার পাত্রমনের একটা ঝড়িয়ে ওঠাতে নাকি আমরা বলে, উঠেছিলাম। ও বলুন তো মেজাজ ঠিক আছে। এই ঘরে বসেই সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। অলি ওকে পাচ্ছি এটাই তো ঠেরেছিলাম। পরেশ বললো, ওস্তাদ একার মনাটা ফুলফুরে হয়েছে তো—অলিন্দিতা, লেখা, অলকা সকলেই সমস্বরে বললো, উচ ওখানে কেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। যাঁ গরম আর নির্জন। মনে হচ্ছে, যেন গ্রহের ঝড়িতে বেড়াতে গেছি।

প্রশান্ত বললো, অলকাও তাথাই আজ বিকেলেই চলে আসছে। দেখি এখানে হোটেলে সিট পাওয়া যায় কি না।

অলকা ইতিমধ্যে চা খেতি করে ফেলেছে। লেখা কৌটো খুলে দুটা করে বিস্কিট প্লেটের ওপর দিয়েছে। টুকাই আর নন্দনকে এক একখানা করে বিস্কিট টুকাই নন্দন দুজনেই ছেপে বিস্কিট দুটো দুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে চৌচী ফোলালো। নন্দন বললো, নিজের চা আর বিস্কিট খাচ্ছে আর আমাদেরটা ছরে দিচ্ছে। ওদের অভিযোগ শুনে সবাই তো তো করে হেসে উঠলো। সুব্রত প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললো, ব্রনাশ পেলেন। প্রশান্ত তাড়াতাড়ি প্লেট থেকে একটা বিস্কিট তুলে নন্দনকে দিতে গেল। শ্রদ্ধা টুকাই বে। টুকাই বললো, তোমরাটাতো আমরা খাব কেন? পরেশ বললো, আরে খাও-খাও। লেখা বললো, বখনই দিতে হবে—দুটো করে দিতে হবে—শ্রদ্ধা বলে? দুটো করে বিস্কিট হাতে পেয়ে, টুকাই মেঝে উঠলো "গল্প শুনে তাকে আমি অত অত ভালবেসেছি।" আমি হেসে বললাম, মুক্তন, আজবলকার ছেলে—। অলকা প্লেট বৌঁছিয়ে বললো, তোমরা কী কম ছিলে নাকি। অনিন্দিতা এতক্ষণে মুখ খুঁ করলো নিজেদের ঘোর কেউ কী আর দেখতে পায়! লেখা বললো, এরা সব সমবয়সী—আমাদের ঘিরে করেছে কুফেছ অলকা। কত ঘাটে জল খেয়ে এসেছে তা ঠিক নেই। শ্রদ্ধা হেসে বললো, জানেন, একটুও ভয় থাকবে না। অফিসে থেকে এসেই, বলবে, দারুণ একটা ভয়ানী ছাপার আছে। আমাকে এখুনি বেরুতে হবে। প্রশান্ত টিপ্পনী কাটলো, মেয়েরা একেবারে বান হুজুর খুলে খুশি পেতে বসে থাকে কিনা। আচ্ছা, এই যে এতক্ষণ গল্প করছি। কোন মেয়ের কথা আসছি—বলিনি তো—কিন্তু ওদের মেনুন। সন্দেহ ঝড়িকে আর ভয় না। নিজেরা সব জলে মেলে উড়ে বেড়িয়েছে।—তাই সব সময় সন্দেহ, বসে মুখ গোমড়া করে হেসে উঠলো প্রশান্ত। এই যে লেখক মানুষটা দেখিন ছাতে ওই যে, বলে সুব্রতর দিকে চেয়ে বললো, কী যেন বললেন তখন—ওহো, ইয়েস চন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে কত কথা বললেন, তা কই ; ওর মনে দাগ কেটেছে—কাটেনি—যে ছাড়া আর কোন মেয়ের কথাই আমাদের মনে দাগ কাটে না—এই সহজ কথাটা শাস্ত্রাকে আমি বোঝাতেই পারি না। শ্রদ্ধা হেসে বললো, শক্ত হয়েছে: অনেক সমু আমি দেখেছি—আমাকে আর—বলে থেমে গেল শ্রদ্ধা—। হঠাৎ সরগরম আসর নিয়ে গেল ঝড়িবারার অধিবর্তাবে আরি একটি বিষয় বোমাঞ্চে, এক মিনিট আগে যাহাদের ঝড়িয়ে আনন্দিকে একটু মন হয়ে চোখ দুটো এপ্রত তুলে বিশ্লিত

বসলো, আপনাদের সঙ্গের লগেজও হলে আমাকে বলবেন। ফিরে এই বেলা টাকা দুটো জমা, হিসাবে মিলে ও সব কাজকর্মটি, মেকে পৌঁছা সব আমাই করে দেবে। আচ্ছা চলি, বলে আমার মুখে দাঁড়িয়ে বললো, যে যে আপনাদের বাচ্চা দুটো ওই সেটের বলটা খুলে ওতে দাঁড়িয়ে আছি আমি ফেলছে, ছেলেমানুষ তো, আপনি তো ভাল মন্দর জ্ঞান এখনও হয় নি। জানেন, ওকিন আগে সাতে সাত টাকা দিয়ে নাড়িয়েছি। এখানে একটা কার্পেটের মিস্ত্রির দাম—আকাশ ছোঁয়া। কলাত দিয়ে বসেছে ও কত টাকা দিতে হবে। তা আমি এখানে একটু ইনফরমেসিয়াল লোক তো, আমার আছে একটু ছাড় দেব এই আর কি। পরেশ আড়াআড়ি উঠে—এই, এই টুকাই, লক্ষন বলে চোখ পাকিয়ে ধমকে আবার ফিরে দাঁড়ালো। ঘড়িওয়ালা হেসে বললো, যে যে সে ছেলেমানুষ তো—ওদের কোন দোষ নেই। সুব্রত আপন মনে, গর্বে উঠে বললো সেও সব জানবেন, ব্যবসাদার। বলে হাত করে নিজেই উঠে গিয়ে দুজনের হাত ধরে নিয়ে এলো আই চলুন দাও দেখি—এখান থেকে। নুনুটা কেটে দিই—লক্ষন বললো, নুনুটা কেটে দিলে রক্ত পড়বে—লক্ষনের আপত্তি দিলে দিল সুব্রত। পরেশ হাসতে লাগলো, উহু, কোন কথাটি মুখে আটকায় না। মনে হবে আমরা কোন সিনেমা দিয়েছি। চলন্ত সন্ধ্যার দিকে চেয়ে হেসে বললো, সবাই যদি সমুদ্রটি চেনে তো আমি একটা মন্তব্য করবো। মেয়েরাই বিশেষ করে আলো আর সেরা বললো, কলুন, কলুন—। চলন্ত পরাণ দিকে চেয়ে মিষ্ট করে একটু হাসলো যেখানে তার টিকিয়ে, অবশ্যই বললো, আসলে পুরুষের নুনুটাই সব। হলে আমার দিকে ফিরে বললো, ওই যে চশমাটি ওর দুজনে ঠিক আপনাদের অপজিট সিটে বসেছিল, মেয়েটা ঠিক আমার মুখোমুখি, আপনি হয়ত আমাকেও দেখেছেন।—তবে পরাণকে আর ছেড়ে থাকতে পারছেন। কারণ ও তেতরের দিকে বসেছিল। উহু ভাতের কোনও চশমাটি দুজনে তো উঠলো আছে—আপনাদের সঙ্গে কথাটিও বলে। আমরাও আমার ওপর উঠেছি। একটু পরে ছিপি খোলার আওয়াজ,—মেয়েটা, মেয়েটাকে জোর করে প্রায় খেতলে অনেক হবে ভাল খেলাচ্ছে। নুকুটার রোট করে এসেছিল, দেল, ছেলেটা খেতলে আছে, আর মেয়েটার পাশে চুমো আছে—উহু মেয়েটা মেতিয়ে পড়লো ছেলেটার বুকে। একেবারে চুপ চুপ—আর ছেলেটা সেই ফাঁকে মেয়েটার—বলে সকলের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললো, মাল করবে পেছিটা আমার ওপর তুলে দিয়ে উঠ আসবে, পাচ্চা পাবে, আমিও পরব,—সে পরব সহ্য করতে না পেরে সমস্তক্ষণ পুতুলের মত চোখ বুজে পড়েছিলাম—আপনাদের নিশ্চয় সোজা আমার কাছে। আচ্ছা, আমরা কী সুন্দরই একসঙ্গে ঢুকে পড়েছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো চন্দ্রত। আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ ইনটেলিজেন্টের অবশ্যই চোখে ঘুমে জল নিয়ে ঢুকেছিল—। —আমার ওটুকু জায়গায় অসুবিধা হচ্ছিল—বাথরুমে থেকে কত পরে ঘুমবে বেরিয়েছে তাও আমি জানি, আমি সবই জানি। সুব্রত, পরেশ, অনিন্দিতা, লোপা, অলকা সবাই আমাকে ঠেলে বললো। কই এ কথা তো আমাদের বলে এলো না। বন্ধিম ঘণ্টা পার হয়ে গেল। সুব্রত বললো, মিলিয়ে পরাণের পর খাবার হয়। কী রে, চাপ পেয়েছিলি কিনু? আমি চন্দ্রত উত্তরটাকে দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, দান হয়ের ফুল বসেছিল বিলু। অনিন্দিতা, পরাণকে ঠেলে আমার পাঁজর কষ্ট হচ্ছিল। চন্দ্রত হেসে বললো, কষ্ট কেন? পরেশ আমার মুখে হাত দিয়ে বললো, ফোকর তাড়। আমাদের একটু দেখিয়ে যাও। একটা চুমো খাই। লোপা বয়কে উঠলো আতঙ্কজনক হয়ে গেছে। টুকাই আর লক্ষন ওই অন্ধকার—হেসে তো নয় টেপ রেকর্ডার। যা তখনে আই মুখে বলবে। সত্যি তো বলে, পরেশ কিন্তু বেটে টুকাই আর লক্ষনকে ডেকে বললো, এদিকে আয় সমুদ্রে চান করতে যাব। চন্দ্রত বললো, আমরাও যাব। ছাগের মতো আমাদের পাতলাগুলোরা সব আছে।

অনিন্দিতা বললো, যাবা, ফোকর কষ্ট আপনার সেটা কিন্তু দেখা হলো না। আমি বললাম, ফোকর আবার, কষ্টটা যেখানে সবার হয় সেইখানে, বলে অলকার দিকে তাকালাম। তখন অলকাও মুখরতার করে বললো, আমি যাব কুটিই—। আমি হেসে বললাম, কোটো আমি নেই, তবে সব তনে আমাকে কুটো না বাঁচিয়ে। তা তনে, পাচ্চা হাসলো। আমি বললাম, আপনার কবিতা শোনা হলো না। পাচ্চা বললো, যা পড়িছেন, তাতে আর এখন কবিতা মানবে না। আমি হেসে বললাম, কবিতা তখনে—সমুদ্রের উঠে বসে সন্ধ্যার সময়। চন্দ্রত বললো, সেই ভাল, তাহলে আমরা এখন উঠেছি। আপনারা আসুন। আমরা উঠে আসি। সেরী করবেন না যেন। বলে, চন্দ্রত আর পাচ্চা গেট খুলে বেরিয়ে গেল। আমি বললাম, ফোকর পরে আপনাদের? চাচার উঠিয়ে চন্দ্রত উত্তর দিল, বাথরুমের সোজাসুজি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবেন। একেবারে সমুদ্রের কাছে। ওখানে থাকবে।

সুব্রত পরেশের সঙ্গে স্পোর্টস প্যান্ট। সুব্রতের পেন্টুলের ওপর পরা সাদা হাফের বড় টাওয়েল। কাঁধে ঝুলছে। তার হাতের অনুসরণ করে আমরা দেখতে পেলাম। পরেশের পরনে পা-জামা আর গেঞ্জি। ফোকর আমরা পাঠালো। ফোনে মেয়ে কর্মী। অনিন্দিতা পরীর চোখ দিয়ে সুব্রতকে দেখছে আর পরা সবুজ ছাতার নতুন টাওয়েলটা গলে পেঁচিয়ে নিচ্ছে। অলকা, দেখা দুজনেই প্রায় চেনে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে। মেধাবিনি সুব্রতকে কেন সুন্দর দেখাচ্ছে তাই মেয়েদের মন চেনেছে, টানুক। আমি বাথরুমের ওপর পরনাচা পৌঁছিয়ে অলকাকে সেই রং চটা টাওয়েলটা ছোঁয়ার লক্ষন আবার পেছিয়ে ফোকর জড়িয়ে নিতে বললাম। লক্ষন আর টুকাই আমার হাতে ধরা। লোপা নিজের নতুন পরনাচা দিকে টুকাইয়ের মাথায় পৌঁছিয়ে দিতে গেল। আমি হেসে বললাম, দরকার নেই। ফোন লাগবে না। কি ঘাবড়া দেখেছেন। সুব্রত হাত, কলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। গেট দিয়ে বেরনোর সময় চোখে পড়লো ঘড়িওয়ালা ঘরজনার ইজিচেয়ারে পা এলিয়ে বসে। বললো, চান করতে আসেন খুব ভাল—তবে বড্ড ঘেরী হয়ে গেল। অন্যদের নুলিয়াদের চান করিয়ে দিতে বলবেন। আমরা আর দেরি করি না। ঘড়িওয়ালা আর নুলিয়াকে হেসে বললাম, গেটে বড় করে দিয়ে যাবেন কাইওলি। এখানে গরু ছাগলের উৎপাত আছে। অলকা গেট বন্ধ করলো। লোপা বললো উহু উহুতে করতে উপদেশ। আমরা যেন জঙ্গলে আছি। লিফটের সুবাদে ইন্ডি পরিমল আলির আসেন। ফোকর তাপে পরের তলা পুরুষ। গেট চলেই আমরা। ডানদি সমুদ্র চোখে। সমুদ্র দর্শনে এসে সমুদ্র স্নান। যা দিকে লোকজন একলো পুরনো আমলের অট্টালিকা পরে ঘর না করা যেতাম। ঘরের চালওয়ালার হাতি কলাচীর দোকান। এই দোকানের সামনে দিয়ে নিচুর দিকে নেমেই শ্মশান। সকালে যেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে দেখেছিলাম। এখন ধোঁয়া উঠছে না। তানদিকে একটু এগুলেই একটা হোটেল। পরেশ বললো, মাদ্রাজ হোটেল। আজকে আর রজাবাড়ার কাছেমাদার না দিয়ে এখানে খেয়ে নিলেই হয়ে। সুব্রত বললো, আমার যেন আপত্তি নেই। তবে তোরা তো ওসু খাচ্ছিস দেখছিলি। ফোকর কথা আবার আর যেরকম উচিত নয়। মাদ্রাজ হোটেল পেরিয়ে ডানদিকে চলে গেছে বিচ্ছি স্টাল আর লম্বর ছাতা, আর একটা টেনিয়ে চান দিকে বেরিয়েছে আমরা সেই গলির মধ্যে ঢুকলাম। গলির দু-পাশে বেড়ুরেন্ট আর হোটেল। তারপর একটা সেপারাটী দোকান। সেই দোকানের গা ঘেঁষে ফর্ণবাদের সিঁড়ি নেমেছে নিচে সোজা প্রশস্ত পীচের রাস্তা সমুদ্র ধার ঘেঁষে চলে গিয়েছে। রাস্তার ডানদিকে বিরাট উঁচুতে আর লাইট পোষ্ট। ঐদিকে সব বড় বড় হোটেল। সী রিসর্ট, সাগরিকা, কত কী। সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে। আর সমুদ্রের সৈকতে বাহার-এ পোশাক পরা মুবতীগুলোর যেন প্রজাপতি হয়ে উড়ছে।

বিশাল সমুদ্রের গর্জন এসে কানে আছড়ে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একসময় সেই আদি আকর্ণ সমতলভূমিতে এসে দাঁড়ালাম। সমুদ্রের এই বিশালতা মুহিয়ে দিল আমাদের। অলকা, আর অনিন্দিতা দুজনেই লাফাতে লাফাতে এগোতে লাগলো। ঢেউগুলোর ফেনাগুলি ছুটে পেছন পেছন। অলকা সহসা থমকে, কত বিন্দু জলে উহু হয়ে আদির ওপরকার পড়লো। চন্দ্রত দু-হাত তুলে চিৎকার করে উঠলো আয়ে যৌবি এদিকে আসুন। এদিকে ভেজুর বিন্দুক। বত খুশি কুড়োবেন। চন্দ্রত ফিরে পা-জামা, পাঞ্জাবি। পাচ্চা ফিরে জলপাই দাঁড়িয়ে আছে। অলকা আর অনিন্দিতা খিল খিল করে হেসে বললো, নুলিয়া নিয়েছেন? ফলতে ফলতে নুলিয়া এসে হাজির সুব্রত বললো, দাঁড়ান আগে সব ঠিকঠাক করে নিই। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে যেখানে আছড়ে ফেনিল হয়ে পড়ছে ঠিক সেইজায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়ে। তর্জনে গর্জনে তখন বিশাল সমুদ্র ফুঁসছে, ফুলছে, নাচছে উঁচু করে আছড়ে এসে পড়ছে। ফুটি ফুটি হয়ে যাচ্ছে।

ফেনার ফেনায় ফেনাময় সমুদ্রফুলের কাছে এসে পরে পরে পড়ছে শিশ মত আওয়াজ। ছাত্রজীবনে ঐতিহ্যে বৃষ্টিত ছাত্রীদের কথাটা মনে পড়লো, অন্তর্জীবনে যাওয়া হয়ে, জলজাত বর্ণনে না, সমুদ্র বর্ণনে। তবে কী এই সেই সমুদ্র। সুব্রত বলেছিল কুয়াশার আবছা সমুদ্র দেখার মত। বিশাল বিরাট সমুদ্রের উত্তেজনায় ফেনায়িত, ঘতদূর দৃষ্টি যায় নীল-নীল-আর-নীল—সমুদ্র নীল, আকাশ নীল, আকাশ নীল, ওপরটির নীলার বরণ সহসা মনে হলো, নীল সমুদ্রে ঢেউ তোলে আর পথচিহ্নের তারা। এইরকম একর কথা সহসা যেন মনে হলো জানি না। আমি ফিরে আপনার উদাস দৃষ্টির চমক তাদি রে দিলাম। পাচ্চাকে বললাম, আপনার কবি মনে কিনু আসছে না। পাচ্চা নীরব আমার মুখোমুখিকে চেয়ে মৃদু হাসলো, বললো, আমি তাকতে পারছি না, সমুদ্র এত বিরাট, এত মহান এত বৈচিত্র্যে ভরা, পাগল করা—আমি হেসে বললাম, এ তো, এই আপনার মিষ্টি মুখে কবিতা এসে যাচ্ছে—যেমন সমুদ্র মন্থনে—আমাদের

শেষ করতে না দিয়ে সমুদ্রের নীল জলে চিকিয়ে পড়া সূর্যের আলোর দিকে চোখ ইসারা বিদুল দৃষ্টিতে পলকা যেন চেয়ে উঠলো,

"এত কথা আমার এত গান আছে এত প্রেম আছে মোর
এত সুখ আছে এই সাথ আছে প্রেম হয়ে আছে তোর।"

আমা পলকার কণ্ঠস্বর কবির তখন মুগ্ধ নয়নে কী অপূর্ব দেখালো। পলকা একটু থেমে আবার চেয়ে উঠলো,

কী জানি কী হ'লো আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
মৃদু হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

সহসা পরেশ চিৎকার করে জলে উঠলো, এক্সাম, লেখক জমিয়ে ফেলেছে। জলধরবাবু সাবধান। পলকা পাশেই দাঁড়িয়েছিল, বললো, তুমিও একটা কবিতা আবৃত্তি করো না। সুব্রত ধমকে উঠলো, এখন না। সন্ধের সময় জলে পাড়াতে বসবেন, আজ সন্ধ্যায় আপনারা সুজনে কবিতা আবৃত্তি করবেন। এখন অসুন, নৃসিংদা ঠিক হাসছে। পলকা হেসে বললো, ওরে বাবারে আমি আর চান করবো না। আমি হেসে বললাম, হুঁ, ওসবি না—আপনাকেও চান করতে হবে আমাদের সঙ্গে। পলকা জলধরের দিকে তাকালো বলল, পরের জল আমাদের গায়ে এসে লাগলে, আমরাও আছিলা-টাছিলা ছুড়তে পারবো।

সুজন নৃসিংদা চুকলই আর নবনকে চান করিয়ে নিল। ঢেউয়ের আঘাতে ওরা দুজনেই কেঁদে উঠলো। আর না আর না বলে চান না করার বায়না ধরলো। সুব্রত বললো, মেয়েরা আগে চান করে নিক। তারপর আমরা একসঙ্গে নামবো। চুকটই আর নবন ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো কী ঢেউ ইংকে সাগরে। জলে পেছন ফিরে সমুদ্র দেখলো, ঢেউ দেখলো, আর সমুদ্রের বুকে ভাসমান মৌকো দেখে অবাক বিস্ময়ে অপলক হয়ে গেল। ঘন্টার পর ঘন্টা, ওধু জল জল আর জল ঢেউ ঢেউ আর ঢেউ। ভাবছে, আর ভাবছে—আকাশ পাতাল। পলকা বললো, কি অপূর্ব ভাই না। বলে আকাশ দিকে তাকাল। সুব্রত বললো, এর এখন না—তখন তখনকে চোখ টিপে ইশারা করলো। চক্রবর্তিদার কথা মনে, আছে তো। লেখক কবি নাম শুনলে মেয়েরা জলখাবারটা হয়ে যায়। রোমাঞ্চিত দেহ মনে পলকা অনিন্দিতা আর লেখা দীঘি পর্যন্ত নিজেই মনে পড়লো, তারপর নাকে-নাকে করে তারপর না-না-না, একরকম জলকণ্ঠি করে উপরে উঠে এলো। অন্তর আমাদের পালা। পরেশ সুব্রত আর আমাকে নিয়ে নামলো নৃসিংদা। একা ঢেউ এসে চক্রবর্তির হবার আগেই মাঝারি নিচু করে দীঘি দেখে মনে পড়তে বলল নৃসিংদা আমাদের হাত ধরে থাকলো। সুব্রত বললো, কারুরটা দিয়ে বে, কারুরটা জানলে আমরা নিজেরাই চান করতে পারবো। চান করার জন্যে আলাদা পয়সা ওনতে হবে না। সমুদ্রের জল মুখে ঢোকেই নোনা স্বাদে জিব বিস্বাদে ভেল। প্রথমে আমি পরে আমি আসলাম। চক্রবর্তি এরাই জলে নেমে অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো।

সুব্রত ও জল ছেড়ে উঠে এলো। অনিন্দিতা তিজে কাপড়ে আমার নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার কাছে গিয়ে সুব্রত বললো, কাপড়টা দাও—তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললো, তোরা সব দাঁড়িয়ে যা। সমুদ্রের ঢেউ তুলবে, তোরা ঠিক হয়ে দাঁড়া। জলধরবাবু আপনিও দাঁড়িয়ে যান। জলধর বললো, আপনি ফিরে দাঁড়ান। দুষ্টিটা আমি তুলে নিচ্ছি। বলে মেয়েদের উপর চোখ রাখলো। সুব্রত, অনিন্দিতা, পরেশ, লেখা, পলকা আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। লেখার কোলে মেয়ে, পরেশ ছেলেকে কাঁচিতে মেলে তুলে নিল। আমি নবনকে। পলকা এসে আমার পাশে দাঁড়াল। জলধর হাত উঁচু করে পলকাকে বললো কবি তুমি লেখকের পা ঘেঁষে দাঁড়াও। কিন্তু বুঝতে পারছেন। আপনারা হেসে সারা দিল। পলকা কেন কবির হাত দাঁড়ালেই জলধর হাত উঁচু করে বললো, ঘাদু—থাম্ব। ফোটোতে যা উঠবে না, মনে হচ্ছে একজন তত্ত্বাবধায়ক। আমি হেসে বললাম, আপনার মনে কিন্তু কবির ছেলেরা দেখেছে। সহসা, জলধর কেন একটু মজার মিয়ে তাকিয়ে বললো, ওই দেখুন, সুইসিদ জাহাজ পরে আমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে মুক্তো মেয়ে আর প্যান্ট পরা মুক্তো ছেলে—মনে হচ্ছে, ওর মধ্যে এক পেয়ার নির্ঘাৎ সেই চক্রবর্তি। আমিও বলতে যাচ্ছিলাম—হতে পারে। কিন্তু দুপুরের ছেলের জলকণ্ঠিতে আমির পরি কাঁদছে। কথাটা বলতে দৃষ্টির পরীক্ষার। আর ঢেউয়েতেও বিনা কথাতে পারলাম না। সুব্রত অনিন্দিতা অনেকক্ষণ দূর এগিয়ে গিয়েছে। পেছনে পরেশ আর লেখা। একা আমি ও পলকা। জলধর ও পলা। নবনকে আমার কোলে। আমিকে জড়িয়ে ধরেছে তার পা, ভেজে পুড়ে যাচ্ছে, তাই আমার কোলে উঠে বলছে ; আমি এত কাঁদি কেন? বললাম আমি সমুদ্রের ঢেউ এসে তুলে দিচ্ছে—নবনক বললে, কেন, এসে তুলে দিচ্ছে কেন? ঢেউয়ে এসে তুলে দিচ্ছে। সহসা পরেশ আমাদের কাঁধে এক হাত রেখে বললো, লেখ, একটা জিনিস আমার তো মেলি, তোমার তোর কথাটা বুঝতে পারছে। একটু দেখি—হাতটা তুলিয়ে দিই। তা ওনে পলা, পলকা হাসলো। লেখা বললো, উঁহু এখন ফিরে আমার ভাত রীধতে বসতে হবে। বলে পাড়ার দিকে চেয়ে বললো, আপনাদের তো টেবিলেই বসতে হবে।

ফেরার মুখে বিদুপদকে দেখেই কবির দৃষ্টিতে কবি দেখলাম। সাদে চেহারা বাড়ে। বিদুপদ গেটটা বন্ধ করে সরাসরি উঠে এলো। আমে পাঁচ পাঁচ গাছের পাঞ্জাবী, কাঁধের ঝোঁড়া জায়গাটা আরও বিঁধেছে। মাথার ওকনো চুল লালচে। আমি হেসে বললাম, বিদুপদ, তুমি চান করো না। বিদুপদ মেঝের ওপর আমার পায়ের কাছে বসে পড়লো। আমি ওকে কাঁধের তোয়ালে দিয়ে মুছতে বললাম, তুমি চেয়ারে বোস। বিদুপদ উঠে চেয়ারে বসলো, বললো, ঐ চান করেছি বাবু। বাজার মন্দিরের সামনে, জলধর ঘুরো, আমি, ওরে তো—চান করলে কী হবে। দিন আপনারা,—সবাই ঘুমোচ্ছে, বলে খোলা পরজা দিয়ে উঁকি মারলো। আমি বললাম, তুমি বেশীই খুব ঘেমে গেছ। বিদুপদ বললো, এদিকটা খুব গরম, কিন্তু সমুদ্রের পাড়ে সব সময় হাওয়া তো তাই এখানে গরম নেই। শীতকালেও এখানে বেশি শীত পড়ে না বলে বিদুপদ ব্যস্ত হয়ে পড়লো সবাইকে তাড়াতে, আজার মন্দিরে যেতে হবে। আজকে আবার মন্দির দর্শন করুন। আমাকে লোকনাথ, সোনার গৌরাঙ্গ, পঞ্চপাণ্ডব, টেকনারায়ণ, লালন ফকির, মাসীর বাড়ি, সব রিস্কো করে খুরে দেখালেন, রিস্কো সব ঘুরিয়ে দেখাবে—পাঁচ টাকা করে নেবে—, এ মা—বলে ঘরের ভিতরে তাকালো। বিদুপদর চড়া গলায়, পরেশ তক্তপোষের ওপর থেকে নেমে আসতেই ঝাঁড়পট চেয়ার থেকে নেমে মেঝের ওপর বসে পড়লো বিদুপদ। কাতর বাবু, কাতর—টেরেন থেকে নেমে আপনাদের মুখটাই ভাল হয়নি। কিন্তু আবার মন্দির বন্ধন তো হলো না—আসুন তাড়ান, ও মা। লেখা অবাক ধরমমিয়ে উঠে পড়লো। ওরা মেঝের উপর ওয়েছিল। বিদুপদ অবাক চোখে খোকাকে "ও মাদু" মনে সুব্রত আর অনিন্দিতার কথা বললো। বাইরে বেলা সাড়ে চারটার রোদ সমুদ্রের ঢেউ ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে, মনে, গেস্টের আধার—সঙ্গে মিষ্টি হাওয়া। সেই হাওয়ার ঝাঁকিয়ে ঘুমোতে চেয়েছিল সকলে। কিন্তু বিদুপদ'র অতক্ষণ তাকে মনে মনে সবাই অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কেউ কিছু বললো না। মন্দিরে যেতে হবে, জগন্নাথ দর্শনে—অতএব লেখা, পলকা কলতলায় চলে গেল। পরেশ ঘরে ঢুকে দেখলাই আর সিগারেট প্যাকেট নিয়ে এলো। বিদুপদকে জানালে, সিগারেট খাবে? বিদুপদ না বলে কাঁধের তেল চিটে গামছাটা নিয়ে মুখটা মুছলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ফিরতে তোমার কে কে আছে? বিদুপদ খুব উৎসাহের সঙ্গে বললো, মুটো মেয়ে মুটো ছেলে আর তাদের মা, আর আমার ভাই ওরে পুরুলিয়া—সেও বিয়ে করেছে, পাঁচটা ছেলেমেয়ে, ওদেরকে নিয়েছে। পরেশ বললো, তোমার কী জমি জায়গা কিছু আছে? বিদুপদ হেসে বললো না। ঘর আছে, ঘরের মন্দির আছে, আর আপনাদের মত মহাত্মার আছেন, নিজ আর কি। দিন বাবু, তাড়াতাড়ি করুন, বেলা বাড়ছে। আমি হেসে বললাম, হাঁ ওরা ঘুমোচ্ছে আপনা বিদুপদ, তোমার সেই তোপসকালের বাবুরা আসেন নি? সেই যে আমার কথা ছিল। বিদুপদর মুখটা ওকিয়ে গেল। না বাবু এখনও আসেন নি, তবে আসবেন। খুব তেজিয়েছেন, আসাই আসতে পারে। আমি হেসে বললাম, আসবে তো আসার সময় চলে গেছে। বিদুপদ বললো, পরি করে আসবে। পরদিনেই পরি আছে বাবুদের। চারজন আসার কথা আছে। বাবু, মা, আর বিনিমণি, দাদাবাবু। আপনারাও আজকের আসতে পারলে ভেটা হয়ে যেত। বলে আবার দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে তাকালো। ওই যে বাবু আর মা এসে গেছেন। অকূলে কূল পাওয়া মনি মুখে উঠলো বিদুপদর চোখে-মুখে।

কাঁধে ঘুমঘামা মুটো কুলো ছেলেমুখ নিয়ে তাদের উপর দেখলাই আর সিগারেট খুঁজছে সুব্রত। আর অনিন্দিতার মাথায় একরাশ চুল পিঠের ওপর ছড়ানো তার সোনা মুটো মেয়ের নিয়ে কর্তা জিনিসের জল ভারী। হাসলে ঈষৎ টোল চলকে ওঠে। সেই মুখের দিকে সেখা আর তাকাতে যেন অতিপাতি করে কীসব খুঁজছে। দেখাদেখি এক ঘরে ছিল তো—ঘিটি ঘিটি হাসি অলকা আর লেখার চোখে মুখে। অনিন্দিতা তাড়াতাড়ি টাওয়ালটা কুকের ওপর ফেলে বাথরুমে চলে গেল। সুব্রত ধমকের সুরে কথা উঠলো, যাবে তো তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও আজ একটু ঘোরা ফেরা দেখেছিলাম—একটু পরে, সন্ধ্যার সময় মন্দিরে গেলে কি হবে—বলে আপন মনে একরকম গজগজ করতে করতে আমার এসে বিদুপদর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আমাকে বললো, সব একটু কমাতে যে। একটা চোরাচোখি করে বললাম আমি

আর সুব্রত। পরেশ সুব্রত'র দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে সুব্রত'র থুতনিতে একটা আঙুল লাগিয়ে বলল, বিশ্বাস নাই—সুব্রত চট করে উঠে দাঁড়াল—ঢাই কিন্তু হয় নি। বলে, ঘরের ভিতরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। দেখা হেসে বলল, আয়নাটা দিন বলে টেনিয়ে অনিন্দিতাকে বলল, সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে কপালটা ঘুষে ফেল, দেখো কপালটা সিঁদুরে সিঁদুর। পরেশ, আবছে, ওভাবে ঘষে চিৎকার করে ঘরের ভিতর ঢুকলো। এবং ঢুকাই আর বলতে নারা দিয়ে ঘুম থেকে জাগালো।

ঘাইবের হরজার বিল, ঘিটিবিটি তুলে ভিতরের দরজায় তালা মেরে সুব্রত বলল, চল, আমাদে ঘাইবে দরজার না মেরে ভিতরের দরজায় মেরেছি সবা শেষ খুলে ঘাইবে আসতেই দেখি তিনজনা রিকসায় চেপে আমাদের পাশের ঘরে ভাড়িওয়ালার আত্মীয়রা এসে নামলো। ভাড়িওয়ালী, ভাড়িওয়ালা দুজনে যেন চকচকে লাল মেরেদের বাজনদার দাঁড়িয়ে হে-হে করে হেসে আমাদের বললো, অপনরা দুষ্টি মিষিরে যাচ্ছেন আজ্ঞা, বলে ঘাড় কাৎ করলো, তার আত্মীয়দের দিকে চেয়ে বললো, পূজো দেবেরা হলেন ; লোকনাথে পেছিলে দুষ্টি। ভাড়িওয়ালী খুব মোটা আর খলখলে, গলায় তওড়া কিয়ে হাস-মাখার চুল আবপাকা, কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ, চওড়া লাল পাঁড়ের সাদা শাড়িপুরি পরি, আমাদের সকলের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবীকে বলালো, ভাবী শুধু মাথা নেড়ে সায় দিল। আমি, অলকা, অনিন্দিতা আর দেখার দিকে তাকালাম। ওরা খুব দেয়েছে আজ। পরিপাটি সাজ। সুব্রত বলালো, এই ভদ্রলোকরা সকাল বেলায় মীরব ভজন গাইছিল। গায়ক গলা বিজ্ঞ। আমি অবাক হয়ে যাই একবার মহিলার দিকে চেয়ে মনে মনে বললাম, দাঁতা এর বয়স কম ওনে তো মনেই হয় না। আমে আগে অনিন্দিতা আর সুব্রত, তারপর পরেশ আর আমি। দেখা আর অলকা আমাদের পাশপাশি। পরেশের কোলে মেয়ে। ঠিক হয়েছে আমরা হেটে যাব। অনবরত রিকসার সারির বন লিপড়েছে আছে। মর্ণবাবের মুখে এসে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। সূর্য ডুবে পড়েছে, পশ্চিমে—তার আলোয় বিস্তীর্ণ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত। নীল সমুদ্রের ফেনায় যেন টুকরো হীরে ছড়িয়ে পড়েছে। বালির পরি আঁকা সমুদ্রের বিচ্ছ হিরে হীরে মানুষ নাচছে, পসার সাজিয়ে বসেছে। দোকানী। এখন থেকেই ভিড় জমতে সুরু করছে। বিশ্বপদ বললো বাবু, সমুদ্রের ধার ধরাবর যেসব হেটে উ-ই ওবার থেকে ডানদিকে গেলে সোনার গৌরাঙ্গ ওদিকে আমার বাড়ি। সোনার গৌরাঙ্গ দেখবেন প্রণনাথের। এখন চলুন, আগর মন্দিরে, সন্ধ্যা দেরে গলে সমুদ্রের ধারে বসবেন। আমি ঘরের ফেলার জন্যে পরসাদ নিয়ে নিয়ে যাব। আমরা মন্দিরের পথ ধরলাম। রিকসাওয়ালারা আমাদের দেখে হর্ন বাজালো—দু একজন রিকসায় করলো রিকসা আবাদের দরকার আছে কিনা। বিশ্বপদ বললো, মা একবার সবাই হেটে দেখতে দেখতে যাব। বাঁ দিকে তারত সেবাশ্রম ডান দিকে হোগলের পত্রনিবাস ছেড়ে এগুতেই সেই আসী আসিনীদের বিরামের ঘর, খাদ্য, কুটিরোপজাতের সব সুবিধের সারবন্দি অবস্থান রাস্তার দু-পাশে। দেখলে সমুদ্র দর্শনের মৌসুমে কেন লাখি অতিথের জন্যে ঠিক হয়ে আছে—সেই সুদূরপ্রসারী আয়োজনের পৃথিবীতে একি খেলা। ওদের হাতের পানির, আসী ফুরিয়ে পরসাদ আবারে দিন দিন বুদ্ধ বাড়ছে। ওদের মাথার আছের ছায়া, পায়ের বিশ্রামের পাকীর বিছা। সুব্রত চেঁচিয়ে বললো, আরে আর তাড়াতাড়ি—অনিন্দিতা পেছনে ফিরে তাকিয়ে দিক দিক করে হাসলো। চকিতে আমাদের পশ্চিমদের দিকে প্রাকিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম, বিশ্বপদকে জিজ্ঞাসা করলাম মন্দিরের পথ কী একটাই—বিশ্বপদ হেসে বলল, না বাবু, আগর মন্দিরে যাওয়ার অনেক পথ, তবে আমাদের বিশে এই পথটাই সোজা। এমন সময় রাস্তার আর পাওয়ার চিৎকার কানে এলো ওরা রিকসা করে যাচ্ছে পরসাদ নিয়ে ঈশের যেন ছেটেলে এসে উঠবে। আমি হেসে বললাম, পীঠ পাওয়া পেয়ে তাদের। তখন চিৎকার করে হেসে বললো, সন্ধ্যায় কী মিঠে দেখা হবে। আমরা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। পরেশ চোখ টেরিয়ে তাকালো সুব্রত'র দিকে। ওস্তাদ ঘটাই স্পোর্টস প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে—(মেয়েকে দেখিয়ে) এদের আগাগোটাই আলাদা। ওর আজার একটা মানুষ কত রকমারী আছে, তার সবে তো ছোট একটু হয় নি। বলে অলকার দিকে তাকাল।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতেই বিশ্বপদ খুব খুশি হয়ে উঠলো। আমাদের বললো, আসুন, বাবু, এ-মা, আসুন এই দোকানে জুতোগুলো আর একটা জায়গা দেখিয়ে খুলে রাখতে বললো। আমরা একে একে জুতো খুলে এসে দাঁড়ালাম। বিশ্বপদ দোকানের পাশ থেকে একটু একটু জল নিয়ে আমাদের হাত ধুয়ে ফেলতে বললো, তারপর উঁচুতে তাকাতে বলে উঁচু মন্দির দেখিয়ে বললো, বাবু, এ হোলো মন্দিরের আদি সূর্য মন্দির। আমরা চুপ করলাম, তখন মন্দিরের ইতিহাস এখানে এসে ছাপন করা হলে—পরেশ বলল' আগে আগে বিশ্বপদ দোকান আগলে রাখল মন্দিরের নিলয়ে মাথা ঠেকিয়ে, মনে মনে যত সব অপরাধ ভয়ে ঢুকে পড়লাম। বিশ্বপদ চিৎকার করে সুর করে বলালো, মা পরমান করুন, বোধবুদ্ধি, বিদ্যা অর্থের তিন আধার ওন, পৃথিবী ধারণ করেছেন। আমরা সকলে মাথা নিচু করে হাত জোড় করলাম, ভিতরে ঢুকে সূর্য বিগ্রহের সিঁড়ির উপর অস্তগামী সূর্যের লাল আভায় কালো পাথরে চোখ ধাঁধানো। অজস্র পুণ্যার্থিত শিলাখে ঢেয়ে আছি আমরা। বিশ্বপদর গলা ভেসে এলো মা জননী, পাথর কেটে আনানো হয়েছে মা এই মন্দির, দেখুন মা, কী কারকার্য রেখে মা বলে, একটু খেয়াল করলো মা গো, এই পথে আসুন' মন্দিরের পরান দরজার বাঁদিকে হেটে বললো। আমরা ওর নির্দেশিত পথ ধরে এগুলাম। বিশ্বপদ একটা অন্ধকার পথের কাছে নিয়ে গেল। বললো, সিঙ্ক অন্ধকার এ পথের মানে মনোজগতের জানিয়ে তিন তেঁ তিন মা—হে মা মানব জন্মে তিন ঈশ্বরে তার উদ্দেশ্য সাধন হয় মা—। অন্ধকার পথটা পেরোবার বেলি ভয়ে ঝাঁঝালো ছেলে। ছোট সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে প্রণাম করলাম আমরা—অলকা, অনিন্দিতা, দেখা সবাই একটা ভয়ে তিন ঝাঁঝলো—আমার মনের ভাষিনী মাঝী ভক্তিনত শিরশ্চিত মনে তিন ঝাঁঝছে—বিশ্বপদর গলায় ঘর আমার চলতে উঠলো, মা গো, তেত্রিশ কোটি দেবতা সবাই এখানে অবস্থান করছেন মা—সব অপরাধের ক্ষেমাকো। অলকা, অনিন্দিতা, দেখা আর অলক, ঢুকাই সবাই ঘুরে ঘুরে দেবতা দর্শন করছে আমার ভয়ছি। সবশে বিশ্বপদ সুব্রত, পরেশ আর আমাকে মন্দিরে পরসাদ সমবয়ে মূর্তি রেখিয়ে বললো, তোমাদের এ গেল এসব দেখতে পাবেন না বলে, আছে আছে কথাটা বলে তাকালো, মানে—আসুন এদিকে বলে নাট মন্দিরে মধ্যে ঢেকে বললো। দক্ষিণে আবছা অন্ধকারে গুরুভক্তি নিবিষ্ট ধূপ, ধূনো, চন্দনের গন্ধ ম ম করছে নাট মন্দির। দেখলে একটি বড় শিলাখের পাশ পীঠে ঘিরে প্রদী জ্বলছে ; সেই প্রদীপের সন্ধানে যত যাত্রিনী যাত্রী প্রদীপের আলোর তাপ মাথায় নিচ্ছে করছে। শিলাখের পাশে মাথা ঠেকিয়ে, মাথে, কপে পেয়ের মন্দির পরসে একে জায়গায় আসুন দিয়ে সাজানোর দেখালো বিশ্বপদ; দেখুন মা, কত চৈতন্য ঠাকুরের হাতের ছাপ, ঠাকুর এখানে এসে রেখে গেছেন। ওখানে মূল আর একটি বিগ্রি নিখাদ বিগ্রহের প্রতিপ হলে।

অন্ধকার নিবিষ্ট মন মন্দির এক অপূর্ব শিহরণে ঝেঁপে ঝেঁপে সুকুং, ঘোরা ঘো চলছে। ওখানে দাঁড়িয়ে সবাই চিৎকার করে উঠলো বিশ্বপদ, দেখুন মা, দেখুন বাবা বারণ করুন—জয় জয় জগন্নাথ। ওখানে আছেন, জয় জগন্নাথ সুভদ্রা আর বলরা নিংহাসনে বসে আছেন তিন মূর্তি। ছায়া ছায়া অন্ধকারে প্রতিপের আলোয় তাদের অপূর্ব ভাবাবেগ প্রতিত দেখতা। প্রধান পাণ্ডাদের অবাতর পূজারীরা দল, দেবতা চেতনানুত পরিবেশন করছেন ব্যাকুল হৃদয় যাত্রী যাত্রিনীদের।—আম দাও, জল দাও, চিনা দাও, পুষ্প দাও, প্রদি দাও—অসহায়না নিজ ভক্ত জয়। আকুলিতে প্রণামে ব্যাকুল প্রার্থনায় এক অনির্বচনীয় ভাবাবেগ প্রতিত হলয়। অপূর্ব ভাবকর্ম প্রতিত দুর্গ ধূ ঘরে গাঁথিয়ে এই মন্দির। কেউ আছে তার পূজারী ভক্ত মর্ণার্থী। এই তো আর সেখানে এসেছি। সুব্রত পরেশ, আমি, অনিন্দিতা, দেখা, অলকা, দেখার ছেলে ঢুকাই আর বন্ধন—আমাদের মনেও যা নেই চাম দাও, ধন, জল, সুখ দাও, শা দাও—কিন্তু আজকে কী একলাবও অনেই, যে আমাদের মন থেকে পাপ বিদায় ক কলুষ মুক্ত হৃদয় নিয়ে বাঁচতে দাও, দয়া ক্ষমা করার মন দাও—কী জানি। চারিদিকে ধূপ, দীপ, ফুলের গন্ধ, দূর চন্দনে মন করছে মন্দিরের আকাশ বাতাস। মহসা বিশ্বপদ চিৎকার—হরসুন বাবু, আসুন মা, চলুন—আমে এবার ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে ন মন্দিরের বাইরে বরাবার এসে দাঁড়াতেই একজন আবরণধারী, মানুষ আরে নিবে পাঞ্জাবী, পরনে ধুতি, মাথার চুল কাঁধাপাকা আমাদের সামনে এগিয়ে এসে বিনম্রভা মুখ। বিশ্বপদ তাকে দেখিয়ে বললো, জয় এই আগন্তুকের পাণ্ডা বাবা—এই জয় আ মা জননীরা। আমরা হাত তুলে নমস্কার করলাম। পাণ্ডাজন, সুদর্শিত শুভ্র আ ভাবনা খুব ছোট ছোট তার খাঁটার মধ্যে বললো, আমি আপনাদের খবর জানি, যে জান। মন্দির দেখলেন, দেবতাদের দেখলেন। ভালোম দেখেছি, সব কী আর এ কম সময় দেখা যায়। তবে ঘুরে ঘুরে মোটামুটি দেখেছি। পাণ্ডাজন বললো, ভোগ হত দেখতে দেরে অনেক সময় লাগে। আচ্ছা, বলে হাসলো, আমরাও হেসে বিশ্বপদ অনুসরণ করলাম। কিন্তু মৌসুমলির হলার মুক্তে উঠলো, সুব্রতকে বললাম, প্রো পাণ্ডাদের সম্পর্কে ধারণা তো পাল্টে যাচ্ছে—কী ব্যাপার বলতো। সুব্রত বললো, জানি, আমারও তো অবাক লাগছে। পরেশ মেয়েকে কোলের উপর মন্দিরে বলাদে আলুচার অন্ন দেখাপড়া জানা তো। আমি বললাম, কিন্তু কই কত পাণ্ডাদের দেখেছি কাউকে তো মনোযোগকলা উঁচুদের মনে হয়নি। সুব্রত বললো, বিশ্বপদ আমাদে মনে আছে তাই—নইলে পরীর মধ্যে ছড়িয়ালের যা ওক ছড়েছিল। বিরক্ত হ

পেয়ে, আড়ি ভাঙা সাদরে না ওনে ওদেরই সঙ্গী করেছিলাম।

ততক্ষণে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। বিজলীর আলোয় সবে ঐশ্বর্যের মন্দির। ছাতে গিয়ে বিদ্যুৎপ আমাদের মন্দির থেকে জলপথে নিয়ে এলো। অল্প, আজ সান্ধ্যে একটু দেখা হলো, সব দেখা হলো না, বাসকে একদিন সকালে আসবেন। ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। সুব্রত বললো আপ—আচ্ছা যেখানে ঘুড়ো রাখা হয়েছিল সেই জন্মাষ্টমীর দিনে, মিষ্টি, চন্দনের দেবতাদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বিদ্যুৎপ বললে, আপনারা তাহলে একবার যান। এই আটে থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে। আমরা ঘাবড়ালাম কিন্তু বিদ্যুৎপ টুকাই আর নন্দনকে পাশ টিপে আদর করে চলে গেল।

সুব্রত বললে, কী ব্যাপার বলতো। কিছু চালটাল না—পরে আবার আমাদের ফেলবে না তো। পরেশ বললো, না—না—কেন ভাল মানুষ। আমি হেসে বললাম, ওকে দেখলে খুব কষ্ট হয়। অনিন্দিতা খিল খিল করে হেসে উঠলো, আচ্ছা দাদা, আপনার মুখের মতো কষ্টের জায়গা কটা? আমি হেসে বললাম কেন? সুব্রত বললো, জানেন, সে তুমি বুঝবে না। পরেশ তাড়াতাড়ি মেয়েকে এড়াতে বধে আমার হাতটা নিয়ে আমার মুখ স্পর্শ করলো—আবুবে—ঠাণ্ডায় জায়গাটায় কষ্ট হচ্ছে না তো একন। লেখা মুখটি করে বললো, পাত্তার জন্যেও একটা জায়গা রেখে দেবেন। ওর জন্যেও তো কষ্ট হতে পারে। —মৃদু, কষ্ট, ছাড়া, আর লাজলজ্জা ভয়—আমার ওসব নেই বলে লেখ দুটো কটোর করে তাকালো সুব্রত। পরেশ বললো তাহলে এখন কী করা হবে ওস্তাদ। লেখা অনিন্দিতা আর অনন্দা বললো, ওদিকে চল না পুঁথির মাদ্রাজটা একটু দেখছে। কেনার মত টুকিটাকি যদি কিছু পাই নিয়ে যেতে হবে তো। পরেশ বললো, ও সব কোলবাজের পরে। সুব্রত বললো, কলকাতা থেকেই ওসব এনে চড়া দামে বিক্রি করে এখানে। লেখা, অনন্দা একসঙ্গে বললো, তা হোক। তবুও একটু দেখবে। পরেশ বললো, তাহলে কর্মকর একটু ধর, আমি সেই বালা থেকে কোলে নিয়ে হাঁটবি। পরেশের কথা ওনে লেখার উৎসাহ হঠাৎ দমে গেল। সে কর্মকর চোখে পরেশের দিকে তাকালো। অনন্দা হাত ছড়িয়ে বললো—দিন আমার কাছে। লেখা অনিন্দিতার দিকে ঠেলিয়ে তাকালো, তারপর হাত ছড়িয়ে মেয়েকে কোলে নিতে বললো, থাক আর কষ্ট নেই দিয়ে। তোমরা যাবে যাও, আমাকে একটা রিক্সা ঠিক করে দাও আমি আমার যাই, বলে পরেশের দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে তাকালো লেখা।

মন্দিরের সামনে রাস্তার তখন পূজারী যাত্রী মন্দিরিনীদের বেশ ভিড়। রিক্সার পাক পাঁচার, ছড়িদারদের জিজ্ঞাসুদেরকে, পাতা লাগবে বাবু? বাজার দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে। অনিন্দিতা একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে। সুব্রতের মুখে বিরক্তির রেখা। অনিন্দিতা গম্ভীর। টুকাই আর নন্দন মন্দিরের মধ্যে ঢিল কেন কোন ঠাকুর দেখে এসেছে তা নিয়ে তর্ক করছে। পরেশ ঘড়িমাফিক চেয়ে আছে কোলে অন্দা, লেখার দিকে। আবার একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে অনন্দা আমার দিকে তাকালো। আমি অনন্দাকে কী যেন বলতে গেলাম। তখন পরেশ হেসে চেঁচিয়ে একটা রিক্সা থাম করলো। অনন্দা বললো, আমি লেখাদির সঙ্গে বসার যাই, তোমরা বরং ঘুরে এসো। আমি বললাম, ছাও, ওর একটা অভ্যাস ভাল লাগবে না। সুব্রত হঠাৎ একটা পানের দোকানে সিগারেট কেনার জন্যে গিয়ে দাঁড়ালো পেছনে অনিন্দিতা। লেখা আর অনন্দাকে নিয়ে রিক্সা ততক্ষণে আমার দিকে রওনা হলো। আমি পরেশকে বললাম, কী ব্যাপার। আমার যাবি, না—। এমন সময় সুব্রত সিগারেটে টানতে টানতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো পাঁচার মুখে বললে, চল সমুদ্রের দিক দিয়ে ঘুরি। অনিন্দিতা তার হাতের পরিচ্ছন্নিতেনী স্বাক্ষী কাঁধের উপর ফেলে মুচকি হাসলো। মেয়েরি উঠলে কথা ওনে। নন্দন আর টুকাই পরেশ আর আমার হাতে।

মন্দিরের সিঁড়ির মুখে অনেক ভিড়। নিয়ন আলো ঝলমল পথি থাঁচা রাস্তায় লোকে উঠেছে। আমার তিনজন আর টুকাই এবং নন্দন ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে এগুতে লাগলাম। নন্দন আবদার ধরলো জলমুড়ি খাবে, টুকাই আলো ধরলো, আলমুড়ি খাবে। আমি অত্যন্তাড়ি পকেট হাতড়ে পরেশ আর করে দুটোকে আনা কিনে দিলাম আর এক ঠোঙা অনিন্দিতার হাতে দিয়ে বললাম, খাও। তুমি টুকাই আর নন্দন একটাকে। অনিন্দিতা অল্প হেসে সুব্রতের দিকে তাকালো। সুব্রত অন্যমনস্ক গম্ভীর। পরেশও গম্ভীর হয়ে আছে। ঐদিকে ধরে সারি সারি জোড়ায় জোড়ায় মানুষ। তাদের মুখে যেন ফেটে উঠেছে সমুদ্র। গাঢ় নীলের আবছায়া মুখে মুখে যেন মাখানো হয়ে আছে পড়ন্ত। একটা শো শো হাড় কাঁপানো পর্দার গোটা ঐদিকে মানুষকে হতবাক করে দিচ্ছে। দুপুরে স্নান করবে এসে দেখেছিলাম বেলাভূমি এখন যেন তার চেয়েও বড়ো হয়েছে। আর-নীল আকাশ মুখে সমস্ত চেউগুলো ফেনা, ফেনগুলি অস্তিত্বের আলো প্রতিফলে বিলমলে রূপ ধরেছে। একটা আনন্দ বেদনা নিয়ে আমরা সবে পড়লাম। আমরা মুখে কেন কথা নেই। আমার ডিঙেছে ডিঙেছে টুকাই আর নন্দন হেসেকে হয়ে সমুদ্রগৌরবে উপভোগ করছে আর উঠে সাদাস-উঠে সাদাস—চীৎকার করছে। বিদ্যুতের পর্দার বিদ্যুতের কলকাকলি, বিদ্যুতের পরশপাথর বিদ্যুতের পরমকুল হতে কেরিওয়ালার ঘুরছে। কেউ কেউ মেয়েদেরকে বিরিয়ে বিয়ে মেরিপ্রেমালয় হাতে। অনিন্দিতা একটা জোড়া মরনা খুব উৎসাহের সঙ্গে দেখতে দেখতে সুব্রতের দিকে তাকালো। সুব্রত চোখ মুখ পাকিয়ে অনিন্দিতার দিকে তাকাতেই অনিন্দিতার যার বিশিষ্ট তাকে কাটিয়ে বিরিয়ে নিল। পরেশ বললো, পছন্দ হলে নাও না। সুব্রত বললো না, থাক। ও বিয়ে কী হবে। বলে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি বাসায় যাব। বাবি তো চল। পরেশও উঠে দাঁড়ালো—টুকাই চল, তারপর আমার দিকে চেয়ে বললো, বাবি নাকি তুই। আমি ইতস্তত করে বললাম, আমি একটু ঘুরি এখানে। পরেশ বললো, বেশ তাহলে। আমার পেটের ভুনভুন করছে কাল থেকে। পরিষ্কার হয় নি—। সুব্রত বললো আমারও তাই। এরকম কখনও হয় না আমার। আমি মনে মনে বললাম, যা তোরা খোলসা করে নে। অনিন্দিতা উঠে দাঁড়ালো। নন্দন ওর টুকাই ঘুরি নিয়ে ঘর জমাচ্ছিল। সুব্রতর আচমকা পরের আওতে সে ঘর গুড়িয়ে ফেল। টুকাই কাদের ভেসে দিলে? নন্দন বললো, চোখে দেখতে পাও না! সুব্রত যেন লজ্জা পাওয়া হাসি হাসলো, তারপর অনিন্দিতার দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, চল—অনিন্দিতা অনিচ্ছায় ঘুমঘুমা ভাবি ও বিরক্ত করে আমার আলো আঁধারি মুখের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে পা বাড়ালো। নন্দন বললো, তোমরা যাও আমি যাব না। বাবির সঙ্গে থাকবো। ওরা চলে গেল। আমি পেছন ফিরে একলাম ওদের দেখলাম। সুব্রত আর পরেশ অনিন্দিতা আর টুকাই চলে যাচ্ছে—। ঐদের আমি আঁধা পথির ওপর খুব চিন্তিত আর বিশ্রী পদক্ষেপ। হাওয়ে সমুদ্র গর্জন। কখন এসে নন্দন আমার কোলের ওপর বসেছে জানি না। আর হঠাৎ কথার শব্দে চমকে উঠলাম, বাবি, বাবুদের রাগ হয়েছে। আমি হেসে ফেলাম না। নন্দন আমার মুখে মাথা রেখে চোখ উঁচিয়ে তাকালো, তবে যে ওরা হাসছে না? তুমি কিছু জানো না। ওদের রাগ হয়েছে। টুকাইয়ের মা কেনকে নিয়ে রিক্সা করে চলে গেছে আমার মা-ও গেল কেন বাবি। মার শরীর খারাপ তাই। নন্দন বললো তাহলে তার গেল কেন। শরীর খারাপ হলে তার যায় নাকি। তুমি কিছু জানো না। এমন সময়, এই তো, এই তো, সুবেলা কাঁচরার ঝড়ুর হলো। আর থমনি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি পান্না আর প্রশান্ত। সঙ্গে ছিপিছ মুটো উজ্জ্বল, সরল যৌবন। পান্না বললো, আপনি একলে, আমি ঠিকই দেখেছি, বলেও প্রশান্তর দিকে তাকালো। প্রশান্ত হেসে বললো, সেই কখন থেকে আপনাদের খুঁজছি আমরা। পান্না বললো, তাবলাম আপনারা বোধহয় মন্দির থেকে বেরোন নি। মন্দিরের মুখে আলোর নিচের দাঁড়িয়েছিলাম। তখন দেখি, পরেশ আর সুব্রতবাবু ঠিক থেকে উঠে আসছেন পাশে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা খুব গম্ভীর বলে মনে হলো, তা আপনার কথা জিজ্ঞাসা করলাম, বললেন আপনি একলে নন্দনকে নিয়ে বসে আছেন। প্রশান্ত বলে পড়লো, পান্না অনেই মনে পড়েছিল আলির পথি আঁচা সোনার। পান্না হেসে বললো, আমরাদের সঙ্গে থাকলে ভাল হতো, তা উনিও নেই, পরেশদা বললেন, শরীর খারাপ। আমি হেসে মান স্বরে বললাম, তা সত্যি, আপনাদের আমাদের ঠিক হলে যেতাম! প্রশান্ত পেছন ফিরে আঙুল দিয়ে ঐদের গায়ে সবর আলোর ওপর একটা সুরম্য দোতলা বাড়ির ঐদিক আলোয় শোভিত বারান্দা দেখিয়ে বললো, ওই বাড়িটার একতলায় বিবি আমাদের ইন্ডিচেয়ারে বসে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। ঐ, ঐ। কটি কয়েলো নেই, পরসা ফেলতে হবে, কারও কিছু ভাড়া নেই। প্রশান্ত আল ওসব ব্যবস্থা করে আওয়া আমাদের পেয়াবে না ঠিক করেই বেরিয়েছি। আমি বললাম, তাতে খরচ বেশি পড়ে। প্রশান্ত বললো, তা একটু পড়ে। তবে আমেলা এড়িয়ে থাকা যায়। আমি মনমনি জানালাম, তা বটে। প্রশান্ত হেসে বললো, এর আগেও আমি এসেছি অবশ্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে। খুব টু টে করে কাটিয়েছি। এখানে আসবে আমার খুব ভাল লাগে। পান্না বললো, আমার অবশ্য লাগবে জানেন, এই ঢেউ, এই আকাশ ; এই বাতাস, এই গর্জন—অপূর্ব। আমি প্রশান্তর দিকে চেয়ে হেসে বললাম, আর নির্জন ঘরে প্রশান্তকে কেমন লাগে! লজ্জায় রাঙা মুখ আরও করে পান্না বললো, ইস দাদা—। প্রশান্ত হো হো করে হেসে উঠলো, নন্দন আমার মুখের দিকে ফিরে চট করে উঠে দাঁড়ালো। একজন ফেরিওয়ালার পাশের আলো তার ঘর আসরে নিয়ে আসছে আর বেলফাইয়ের মালি নিয়ে ঘুরাতে চেষ্টা করছে সেটা কৌতূহলির হয়ে দেখছে নন্দন। পাশের মালি থেকে ঐদের ঘরে ঘরে জোনাকির মত জ্বলছে নিবছে কতকগুলি পথ হচ্ছে। তারি সুন্দর এই পরিবেশে। পান্না তার বিরল কালো চোখের তারায় সমুদ্রের ঢেউ ভরছে। পান্না

বলল, আপনার কবিতা আছে এখানে?

আমি বললাম, নিন পড়ুন তো আমি। শুনব বলছে, আপনার টিকানাটা আজকাল দেখে নিন। বললাম নিচ্ছি। পাখা হেসে বলল, তোমার টিকানাটাও দিও। আমার আজকে টিকানা, তোমার টিকানাটা দিয়ে দিও। আমি আজও ভেবে মুচকি হাসলাম, আর মনে। শুনছ ওপর তারি পলায় বলছে। ইনিভূমের পর আমি কিছুই পড়লাম ওর আজকে আছে ভেবে ছাড়ে। এত তাড়াতাড়ি, আমার মু দুটো কুঁচকে উঠলো। পাখা বলছে, আজ্ঞা, আপনি কতুন লাল, আজ মা'র ধরো ভল কেমন করে না। আমি সমর্থন জানিয়ে বললাম, আলবাৎ ঘরে কিন্তু আজকাল তো আর সে মেয়েলিকে ঘাসলাটা নেই, মনকে, শুনত ধরার আনেক সময় পর মেয়েরা। হেসে, বলে আজকাল উচ্চারণের আজার ঠাঁটুর উপর মেয়ে একটা চড় মেরে শুনছ ধ্রুব উঠে দাঁড়ালো, এই আমার, এদিকে এসো, ঠাঁ-এদিকে বলে বসে পড়লো শুনছ। অতপর পাখার দিকে চেয়ে বললো কেমন হলো তো? মাকে আজে কেন যে পান পান করে বুঝি না। আমাকে যদি পছন্দ না হয়ে আজে তো আসা, আমিতে দিয়ে ডিভোর্স সুট করে দেব। তখন আমার আনন্দনে মেয়ে আমার ঘরে ঢুকিয়ে উঠবে,—আনন্দ! পাখা কপট অভিমানে ঠোঁট ফোলালো। বুঝি আজন করে আমাকে বকবে না আমি, তাহলে আমি কেঁদে ফেলবে—এই-এই বলে টিকার করে উঠলো শুনছ ওই আমার এসে পেছে এই আমার, ফৌজিদির হাতে দাও তো এক ঢেলা, বলে লক্ষনকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, ওকে দাও—আমি আজ দিলাম, না আজ। ও ফেরেছে। শুনছ বললো, ফেরেছে তো কী হয়েছে। আমাদের সম্পর্কে একটা করে ফেলা দিয়ে দাও—।

মনের মধ্যে আমার আজকে, ঠোঁট আজকে, ঠোঁট ওঠো হয়ে আজে। পাঁচের পাঁকে ভিড় ভাড়িয়ে বাসনের পর আমির হাওয়ার দিয়ে সমুদ্রের ওরাদাবাদে চুপ হয়ে যাচ্ছে। পাখার উদান দৃষ্টি সমুদ্রের ঢেউ খেলিল উচ্ছ্বাসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। লক্ষন আমির ঘর ঘুঁয়ে—খুব একান্ত মনে। আমি হেসে পাখাকে বললাম, কবিতা কিন্তু শেনা হয় নি। পাখা চমকে হেসে বললো, এই পরিবেশে আমার কবিতা মানবে না, আজকে কবিতা, ছোট আজে—। শুনছ বললো, কেন ছোট আজে কেন? এই উদার আকাশের নিচের ছবে আজ, আজকে আজ না লক্ষনেও লক্ষন বাদ লাগবে। আমি বললাম, নিশ্চাই—শুরু করুন। পাখা বিজেইদের মত বললো, দাদা আপনি একটা কবিতা আজে শুরু করুন। অতপর—। ঘান হাসি চলকে উঠলো আমার মুখে। উঠেই নিবে খেল। যজ্ঞা শুরুর আগে থেকে সুব্রত আসছিল, বুঝি কিন্তু সন্দিগ্ধতা নিয়ে বুঝিল না। ওখানে ঠিক মনে, একটার পর একটা আবৃত্তি করবি আর আবার আমির ওপর ওরা ওরা ওপরে। লেখা হেসে বলেছিল, কেন জানবে, তাই না? পরেশ চোখ টিপে আকাশের দিকে তাকিয়ে সুব্রতকে বলেছিল, জানিস, আমার বিয়ী রবীন্দ্রসঙ্গীতে জানে। কেন বলা। আমি সুব্রত লাজিয়ে উঠেছিলাম। বলিস কী! আজ্ঞা, তাহলে তো মোকা জমবে। আ ইতিমধ্যে। এতদিন বলিস নি কেন? মাঝে মাঝে ওকে কী আনে কিন্তু একটু আসর জমানোর মেয়ো। পরেশ বলেছিল, কী আর বলবে, উনার গলায় হারমনি ভরে পড়েছিল। সবার আর হোসেনের সারলাতেই প্রশান্ত। আমি হেসে বলেছিলাম, যে গাঁয়ে সে আর চুল বাঁধে না। অতপর লেখার দিকে চেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলাম, রবীন্দ্রসঙ্গীত সবুজের ঢেউ এসে যায় নিয়ে যাবে। লেখা মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, আমার হারমোনিয়ম দেখবেন। আজার কিনে দেওয়া। বিয়ের পর এখানে এনেছিলাম। জং ধরে গেছে। সুব্রত বলেছিল, আজ্ঞা। লেখা বলেছিল, ফরেকটা রীড খারাপ হয়ে গেছে তা আর এই লাভে যাবে লাজানো আজে না। পরেশ হেসে আনিয়ে, মেয়ে আজ ছেলে, পাজর জোগাড় করার আগে বয়সার হয়ে তখন সরিয়ে দেব। লেখা বলেছিল, মুক্তোর ছোবা পেয়ে। তবে লেখার সেই তিরকরতি আমাদের চোখের ওপর এসে পড়েছিল। শুনছর ফরমা চমকে উঠেছিল, ঘাঁড়াও বাবা এখন মনে মনে মকলো করছেন। অতপর চোখ টিপে, পাখাকে আর একবার অনুরোধ করার ফলে বলেছে, পাখা আমার দিকে তার সেই পাত্র চিত্র চোখ মুলিয়ে মুখে বললো, ধরি আমার করুন।

> হে আমি জননী সিন্ধু, কতুকার সন্তান তোমার,
> একবার কন্যা তব ফেলেছে।...

আমার কথার মাঝ ওনে চমকে উঠেছে পাখা। চুলি চুলি শুনছর কানে চুলে দিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সমুদ্রের প্রতি"। আমি পুরীর সমুদ্র দেখে এই কবিতাটি মনে পড়েছে। শুনছ ওনে, ফল চুল মুখে মন দেখে উঠেছে।

> হে জননি, বুঝিবে কী তুমি
> আমার মানব আত্মা।...

...পাখা বলছে "ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা।

আবেশ তখন মনে পাখাও পর মেয়েলো। শুনছ বললো, অপূর্ব। সত্যি অপূর্ব—পাখা হাসলো আমি হাসলাম। লক্ষন বললো, আমি সেই কবিতাটি আবৃত্তি করবো। শুনছ লক্ষনের গাল টিপে দিয়ে বললো, তত। পাখা হেসে লক্ষনকে কোলে বসিয়ে বললো, যা তুমি আবৃত্তি করতে পারো। লক্ষন চা বলে তাঁর গাঁকিয়ে শুরু করলো রবীন্দ্রনাথের 'নদী' শুনছন। আবৃত্তি শেষ হতেই পাখা লক্ষনকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো। লক্ষন বললো, বলি কিন্তু খেয়েছে বাড়ি যাব।

সেই কাঠের খেয়ার সামনে এসেই দাঁড়াতেই ভবন এলো ঘাড়িওয়ালী মহিলা ভাইবর। ভাইবরে গীতার ভজন—কয়েকজন মহিলা এবং পুরুষ আবহাওয়া জমানো নিয়ে চেয়ে বসিয়ে বসিয়ে শুনছে। না, লেখা, আমরা কিন্তু অনিন্দিতা আমরা পথে দূরত্ব এসে কেউ নয়। কোনদিন, আমাদের পাশের ভবের সেই আমরাদের। এমন সময় দেখি আমরা নেমে এলো আমরা থেকে। চোখে মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠানে আমরা চমক দেখা চোখদুখ ভড়। লক্ষন ছুটে আমরাকে গিয়ে টুকাই টুকাই বলে আমরে লাগলো। আমরা মুখের দিকে চেয়ে আমি আমরে পেলাম। কী হলো? আমরা বললো, তুমি টাকা পয়া কিছু দাও নি। আমি লজ্জে মুখে বললাম, বিলায় মেখাবে, ওমা, বলে তুল হয়ে পেছে আর টাকা তো করেছে তোমার পাজার মতিন করে। আমরা বললো, সুব্রতদা বলছিল সে আর চালাতে পারবে না। অনেক টাকা পুঁটি থেকে খরচ করেছে—সেদি তোমাকে নিজের পছন্দের পুঁটি দেখাতে নিয়ে এসেছে, এই সব বলছিল পরেশদাকে। সব শুনছী আবাক হয়ে পেল। তারপর হেসে বললাম, যাঃ এসব কথা সুব্রত বলতেই পা না। তুমি নিজের কানে শুনেছ। ঠাঁ মশাই নিজের কানেই শুনেছি বলে আমরা আমাদের দিকে তাকালো। বললাম, তা তুমি তো টাকাটা দিয়ে দিতে পারতে? তুমি তো আমি কী করে দেব? বলে, আমরা তাকালো আমার দিকে। আমার পজার চিন্তি ছায় জাবিত হলো, সত্যি তো তুল হয়ে পেছে। চল দেখি, বলে আমি চলতে উদ্ধ হতেই আমরা আবার বললো, জানো আরও বলেছে, তোমাকে কোন বিশ্বাস নে টাকা দেবে কী দেবে না—তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসাই তুল হয়েছে। মু কুঞ্চিত হ উঠলো আমার। বললাম পরেশ কী বলেছে? পরেশদা কী বলেছে ওনিনি—ত ওরা তুমনে হিসাব করছে, হিসাবের খাতা নিয়ে বসেছে আর ভকড়া করছে, ব কাটাকাটি করছে বুজলে. ভলো আসাধার সময় গাড়িতে ওই যে পাঁচ টাকা আমি তা আর কিছুই বেশ হলে. ও টাকাটা দিয়েছিলাম আমি। সেদিন যতগুলো ভ্রব কিনে সবাই খেল, তারপরও সবার বাড়ের জোরে ফেরেছিল, তা খুচি এনেছিলাম এ বলছ বোধ থেকে হলে তা কেউই তুলছে না, তবু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ম থাকলে, তুমি আমার-ও! ও! বলে-আমাদের সঙ্গে ভল ব্যবহার করে লাভ নেই। দ্ দিয়ে মেয়ে টাকাটা দিয়ে দাও—সত্যি বলে বলো, ওই টাকার ভন্য তুলছে না। আ অবাক হয়ে আমরার দিকে চেয়ে বললাম, প্রয়োজন না হলে নিশ্চয়ই তুলবে না তবে প্রয়োজন হলে তুলতে পারি। কিন্তু আমরা আমি তো ফেরে পাচ্ছি না, সু পরেশ আমাকে চেনে, জানে, ওদের মুখ থেকে এসব কথা বেরোল কেমন করে ? ফেরে আশ্চর্য হয়ে বাচ্ছি। না না বুঝি ঠিক ওনেছ তো, তুল শোনোনি তো? আ তুমি ছাড়া আর কেউ বলেনি, আমি বিশ্বাস করছিনে না। আমরা চলো, বলে আ আগে পেছনে আমরা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বাইরে আবছা অন্ধকার।

লেখা আর ছেলেকে কোলে ওইয়ে বিনুক বাড়িয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে। অনিন্দিতা নেই। পরেশ আর সুব্রত খুব মনিন মোখমুখ আর মাথার আজোর তুলিয়া নিয়ে ডিজে চেয়ারিটা খুলে বসেছে। ওদের লক্ষন কয়েকটা টুকরো কাগজে. ফোয়ার উপ্টো পি সাদা আবরণার খুচরো অঙ্ক লেখা। কলমের নিচের চাপা দেওয়া। আমের ডিজের এ আমরে বীরবরা, আমি একটু হেসে লেখার দিকে তাকালাম। লেখা আমার দিকে চ মাথাকে তাকালো। অনিন্দিতা নয়, অনিন্দিতাকে দেখার মা বলে লেখাকে ভাল আলমকে ভালবাসায়। শেষ, বলে হেসে লেখার দিকে চেয়ে বললাম, বৌদ আপ তাদের টাকাটা দিতে আমার তুল হয়ে পেছে, টাকাটা আর কবে হো বলে ভাজনেরা ওপর বলে পরেশ আর সুব্রতকে বললাম, ওনেছিস, ঘাড়িওয়ালী মহিলার পাকাটা নি পরেশ। পরেশ আর সুব্রত মাথা ঝাকাল। আমরী থেকে সুব্রত মুখ তুলছে না। পা আমার দিকে চেয়ে বলো, সেই এসে অবধি তনছি। সত্যি খুব আপ পাখা বললো, ঘরসমারে মাথা দেখতে দিলেন বলে খুব নিশে হাসছেন। সুব্রত পরেশ বললো, এ পর্যন্ত মোট মুখের পজার টাকা খরচ হয়েছে। আর ওটা বলে পরেশ দিতে মুচকি করে বললো মোট পঁয়তিশ টাকা। তাহলে টোনেল মুখে নব্বই টা

এই তিনশো টাকা। ঘরে একটা নিশ্বাস ভারী হয়ে অলকার হাতে ধরা নোটগুলো চেয়ারের একটা টাকার নোটের দিকে যেন উন্নসিত হয়ে দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। আমি টাকাটা অলকার হাত থেকে নিয়ে সুব্রতর দিকে বাড়িয়ে বললাম, এই নে ধর। টাকাটা ধরে করে নেওয়ার কোনোই পরিচয় দিলো না। সুব্রত পরেশের দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসলো। ভাবখানা এইরকম যে অলকাকে ওনিয়ে ওই ধরনের নাটক না করলে টাকাটা আমি ফিরায় না। ওদের ঘাড়ে অনেই লজ্জা লক্ষ্মন হয়ে যেত। পরেশ খুব আদর করে লিপাকে ধরলো। মেয়ে নিশ্চয়তের আশ্বাসে সুব্রতও লিপাকে ঠোঁট কেঁচে মুখ ঘষিয়ে দিল। লক্ষ্মন পেটে চেপে ধরে ভয়ংকরভাবে ওপর ওয়ে অলকাকে বললো, মা কিরে পেয়েছে। লেখা বললো, টুকাইও কিছু খায় নি। মা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুব্রত ওনে বললো, তোরা হাতমুখ ধুয়ে চেয়ে বসে থাক তখন চা নিয়ে আসবে। আমা করলে এতক্ষণ ওরা খেয়ে ঘুমোতে পারতো। লেখা বললো পরেশের দিকে চেয়ে, ঘুরিটুরি কিছু তো এনে দিতে পারতে, তা খেলেও তো ওদের পেটে কিছু পড়তো। তা না; সেই এসে অবধি হিসেব নিয়ে বসেছো। আমি অলকার দিকে তাকালাম। অলকা বললো, আমি যেমন ছেলে নিয়ে আসছি বলে ঘর ছেড়ে বেরুতে যাবে তখন হাতিমার বিস্তৃপদ কিনটি ছোট টাকিয়ে বলা চাপা সেই হাত কিছু তরকারি আর আল একটা মুরগির মাংসের ছড়ে এনে সদর দরজার সামনে দাঁড়ালো। লক্ষ্মন চট করে তরকারিগুলোর ওপর থেকে নেমে এলো। পরেশ বললো, ওই তো যখন এসে গেছে তখন আর আপনাকে যেতে হবে না—ওদের খেতে দিন। অলকা প্রচন্দ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অনেক এক কোণে ওছিয়ে রাখলো। ঝোলাওয়ালা ঝোলা তুলে নিয়ে বিদায় হলো। বিস্তৃপদ পরেশকে ডাকলো ভেতরে বসে কী যেন ফিস ফিস করে বললো, তারপর চলে গেল। সুব্রত গিয়ে বারান্দার চেয়ারের উপর বসে সদুত্তরের ঢেউ ওনতে লাগলো। লেখা আমার দিকে চেয়ে বললো, আপনি জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে আসুন।

মুখ হাত পুছে গা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে দেখি লক্ষ্মন আর টুকাই খেতে বসেছে। ঘুমঘুমা চোখে টুকাই বড়মা বড়মা করছে। লেখা ওদের আদর করে টুকাইকে খাওয়াচ্ছে। অলকা বসে আছে পাশে। লেখা বললো, কেন তো তোমার ছেলে নিজের হাতে খায়। ছলে অলকার দিকে তাকালো। আমি হেসে বললাম, ও কেন জানবে ছেলেবেলা থেকেই। তাই তো দেখি, টুকাইয়ের মুখে ভাত পুরে দিয়ে লেখা বলতে লাগলো। ওইয়ে না দিলে ওর পেটই ভরে না। খাওয়াতেই দু-ঘন্টা আমার চলে যায়। এমন সময় অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজলো। সুব্রত একটা চেয়ারে বসে। আমি একজন পরিচিত কেশ ফুলকর ভদ্রলোক পান খেতে খেতে পুরে, কথা বলছে : বীণা সমুদ্রের দীঘে বীণাবাসর ঘাস, মনোরম পরি ঘটা সুন্দর আয়োজনেই। সাংসদেপাধ্যায়, কোনারক ইউনিভার্সিটি, মুক্তকচ্ছ নিমন্ত্রিত হয়ে লক্ষ্মন যাবেন, সেখান থেকে উৎকলিপি ধর্মগিরি ভারপর কুমলেশের নতুন চাউল দেখতে দেখতে ফিরে আসবেন সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। জানি করে আর দর্শনীয় সব দেখে যা আনন্দ পাবেন। আরে পুরী এসে যদি এসব দেখা না হলো তো পুরী—। সুব্রত হেসে বললো, তা তো ঘটাই তাহলে, ঘাস আসার আর পরেশের মুখের দিকে চেয়ে বললো, বালাই ঘুক করলাম, সকাল ছটার মধ্যে বেরি হয়ে নিতে হবে। তাহলে ভদ্রলোকের সামনে চলে আসবেন দেরী করবেন না আর ভদ্রলোক নরম্বার করে বিদায় হলো। ভদ্রলোক ফটকের গেট পর্যন্ত যেতে না যেতেই অভিওয়ালা ভদ্রলোক ভদ্রলোকের ওপর উঠে এসে বললো, আচ্ছা স্যারকলা বলটাই ঠিক করলেন? ওটার সিটগুলো ঠিক ভাল নয়, যখন নতুন ছিল তখন বেশ ভাল ছিল, এখন একটা নতুন ভাল এসেছে কী যেন নামটা। পলকমার ভেবে বললো, ওই আমাদের দেশে খুব আরামে যেতে পারবেন। বাবাগে, যখন সব ঠিকই করে ফেলেছেন তখন আর কি—বলতে বলতে অলকার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো। সুব্রত সেদিকে একবার চেয়ে আমাদের দিকে তাকালো। পরেশ বললো, ওদের ঘরে থাক আজ, কাল চলবার দিন কালই—সুব্রত চট করে উঠে দাঁড়ালো, তাই তো বলে করে চলে গেল। আমি পরেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিস্তৃপদ ছেলে কী বলছিল। পরেশ বললো, বউ টাকা চেয়ে নিয়ে গেল তাই বলে। বললো, টাকাটা আজ শেষ করে দেবে। আমি খোলা দরজার দিকে চেয়ে দেখলাম, সুব্রত বাথ থেকে একটা জীপির ছেলে, ছেলের খোলার চাবি, আর দুটো ছেলের খোলার ছেলের ঘর করছে—আর ওধার থেকে অনিন্দিতা সোনা ফেলা চোখ নিয়ে ঘরে এসে ঢুকেছে।

ঘরের ঘাট পাওয়ারের আলো অনিন্দিতা চলকে এসে পড়েছে—খোলা জানালা আর দরজার ফাঁক দিয়ে। আমি ওদের পরেশের দিকে তাকালাম। পরেশ আমার দিকে ঘন ঘন চেয়ে ইঙ্গিতে বললো, ওদ্যানের মুখ বন্ধ কথা। আমি খানিকটা সময় ঘরে কাটালাম, কেন আমার কাছ থেকে টাকাটা পাবে কিনা জা. দিল। পরেশ যেন ভরসা আমার দিকে তাকাল। আবে না না; এই যে কোনারক, উৎকলিপি, ধর্মগিরি—ওসব হাসলো। আমি বললাম, এ বস্তু কেনা হলো কবে। পরেশ বললো, আমি জানি না। তবে বেতিয়া পেছনেই দিয়ে রেখেছিলাম। আর জার্নিটার্নিতে এসব জিনিস না হলে কী রকম নিরামিষ নিরামিষ লাগে ভাই—আমি হেসে বললাম, তা ঠিক হবে বাজারের খাওয়াদাওয়া জিনিসগুলোর স্বাস্থ্যটাও তো রাখতে হবে। পরেশ আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে আমাকে ভদ্রতা বলতে ইঙ্গিত করলো। আমি পরেশকে বললাম, তুই ওকে খুব ভয় করিস। পরেশ বললো, ধুৎ আর বলে যাই—আমি বললাম, আমার ঠিক ইচ্ছে করছে না। পরেশের চোখে মুখে কী আর করা যাবে ভাবটা ফুটে উঠলো। শুধু শুধু কামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই এখুনি কথা কাটাকাটি হয়ে যাবে। কালকের ভ্রেনজার্নিটা মাটি। সুব্রত চায়ের জল গ্যাস ইত্যাদি মিলিয়ে দু'টা ঘাইজ পারে ভোজনোজনা মিলিয়ে, প্রদত্তা, লেখা, অনিন্দিতাকে ডাকলো। আমাদের কলসো চলে যায়। উপজেলে টেবি খেলার মত ধরনা বন্ধ করে দিয়ে বললাম। সুব্রত মুঠো কাপের ঘাইজি থেকে অনিন্দিতা করে অল্প ঝালে গ্লাসে ঢেলে দিয়ে বলল, আজকেরও একটু একটু করে খে। ওরাও খাক। সুব্রতর কথা ওনে লক্ষ্মন, টুকাই, দুজনেই মুখ এনে একা খী এ্যা খী। সুব্রত বললো অধুধ বাসি খেয়ে নাও—লক্ষ্মন টুকাই দুজনেই খেয়ে চোখ মুখ বিকৃত করলো আবপর ইস কোকাকোলার পর পাচ্ছি আরেক যায় একটু খালো। আমি ও পরেশ দুজনে ওদের কোকাকোলায়, বেশি খেতে নেই। অধুধ কম খেতে হয়। লেখা কঠোর দৃষ্টিতে পরেশ আর আমার দিকে তাকিয়ে। টুকাই সাদলা চিৎকার করে লক্ষ্মনকে বললো, লক্ষ্মন, বিপিনবাবুর কাকা সুধা সিলেমায় দেখেছিস তো। লক্ষ্মন বললো, হ্যাঁ, বিপিনবাবুর কাকার মুখা ঢোকার ছাদা ঢোকার অধুধ খেয়ে উঠলো। অলকা হেসে উঠলো, অনিন্দিতা এমন কি লেখা আর সুব্রত সবাই। অলকা বললো, এবার অফিস থেকে ফেরার পথে লক্ষ্মন কিনুই না এনে একটা করে ফোতস এনে ছেলেদের দিও। লেখা অলকাকে সমর্থন করে বললো, ঠিকই বলেছে, অলকা এ বয়সে ছেলে আর কেমন হবে। আমি অনিন্দিতা সহজেও হাসলাম। সুব্রত সকলের দিকে একটা করে কাপ এগিয়ে বললো, ধরুন, তারপর কাপে কাপে ঠোকাঠুকি করেই চুমুক মারলো। মেয়েরা চট করে কাপগুলো মেয়েদের রেখে দিল, না মানু, পছন্দে যদি আসে আমি আর আর নয়, তবে লেখা, অলকা বিপদে দেন! সুব্রত বললো, এরকম কিনু কথা ছিল না, সকালে তখন রাতি ছিলেন। অলকা বললো তা জানবে কী করে আপনি ফরমা পাঠান করে ফেলেছেন। লেখাও মার নাড়লো। পরেশ বললো, আজে যে আর কাঁচ ভাল গেলে ফোন ভালে হয় না। আমি হেসে বললাম, ভালে আমরা আছেন। এটুকু খেলে কিনুই হবে না। মাত্র টিপে মেয়েরা চুমুক করে সবটা খেয়ে নিল একসঙ্গে। সুব্রত সেদিকে চেয়ে বললো, আজ ছেলেটা। ভালে আমার দিকে চেয়ে কাঁচ কাঁচিয়ে বললো, সেই রূপা মেয়েটাকে দেখেছেন তো। ওরা আপনজনের নামে বড়ি দিয়ে যোজনে পাঠে। পরেশ বললো, লম্বা কথার একটা কথা বলেছ। পরেশ লেখার দিকে চুল চুল করে তাকালো। লেখা ঠোঁট উল্টে কপট ঘৃণা উপরে দিল, এইসব করতে আসা হয়েছে। পরেশ একটু ঝুঁকে ইয়ার্কি করতেই টুকাই লাফিয়ে উঠলো আলিসে কী তামাশা দেখ। আমরা পরেশ লাবত হয়ে কাপের অভিটুকু গিলে ফেলাম। ওয়াক, এ্যাক্ থু বলি। অনিন্দিতা হেসে বললো, দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ছলে হেসে গড়িয়ে পড়লো। অলকা হেসে বললো বোতলটা কাঁকা করে দিন। ছলে সুব্রতর দিকে তাকাল। সুব্রত হেসে চোখে ঝিলিক হানলো অলকার দিকে চেয়ে বললো লিপাটো খাওয়ার যখন অভ্যাস ছিল, তখন এটাও ছিল খেয়েছ, চলবে নাকি—অলকা তেমনি হেসে বললো, আপনার চালনা অভ্যাস দেখি। ছলে লেখার দিকে চোখ ফেরালো। লেখা বললো, না, না ঘাড়াঘাড়ি করতে হবে না, ওদিকে লক্ষ্মন ঘুরিয়ে ঘুমন্ত হয়ে গেল। অলকা আর লেখা দুজনে মিলে ধরাধরি করে শোওয়ে দিয়ে গেল। অনিন্দিতা গ্লাসগুলো নিয়ে কলঘরের চলে গেল। লক্ষ্মন আর টুকাই ঘুমিয়ে অঘোরে ভক্তপোষের ওপর কক করে 'মীনকমল' বাংলোর গা এলিয়ে দিয়েছে মীটে।

তিনজন মানুষ কেন ঘেঁসাঘেঁসি করতে পারে এই ভয়ন্ত দুটো সিঙ্গি-এর একটার জানালার ধার ঘেঁসে বসেছে অনিন্দিতা, সুব্রত তারপর অলকা। লক্ষ্মন অনিন্দিতার শাড়ি ধরে জানালার ধারে আসার সাধনা করছে। অলকা ওকে নিজের কোলে বসার জোর চেষ্টা করছে, অনিন্দিতা লক্ষ্মনকে ছোঁয়াতে চেষ্টা করছি। যে জানালার ধারে বসলে চোখের মধ্যে ঘুলা যাবে। কিন্তু লক্ষ্মন না-ছোড়বান্দা সে অনিন্দিতাকে ঠেলে সরিয়ে নিজে বসবার চেষ্টা করছে। অনিন্দিতা শরীর এবং মুখসহ বিব্রত হয়ে সুব্রতর মুখের দিকে চেয়ে আছে। লক্ষ্মনের জন্য আলকার ভয় নেই, তার মুখ চোখ তার। ছেলেকে সামলাচ্ছে

না পেয়ে আমার দিকে তাকালো দৃষ্টি হেনে অবশেষে হাত বাড়িয়ে কম্বলের গলাটা টিপে দিয়ে ধমক লাগালো। কম্বল কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে আসার চেষ্টা করলো। সুব্রত চোখ মুখ গম্ভীর করে কম্বলকে কোলের ওপর বসিয়ে আদর করলো। অর্ঘি অর্নিন্দিতার দিকে তাকালাম। অর্নিন্দিতা জানালার ওইপাশে হাঁটুমুড়ালিত দৃষ্টি মেলে সমুদ্রের গর্জন শুনছে, ঢেউ দেখছে। দেখা তার মেয়েকে কোলে নিয়ে বসেছে জানালার ধারে। টুকাই তার পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জানালার ওইপাশে চোখ চড়িয়ে অবাক। পরেশ টুকাইকে মাঝে মাঝে আমাকে দেখার ধাক্কিটা নষ্ট না হয় সাবধান করছে। আর আমি পরেশের পাশে বসে খাঁদিকে বুঝতে পারছি এইরকম পর পর দুটো সিটের দিকে চেয়ে পরেশের পরনার কথা ভাবছি। এরমধ্যেই পরনা যথেষ্ট দূর সমীপ মানুষ পুরীতে এসেছি সান্ধীগোপাল, কোনারক মুক্তেশ্বর, ধৌলগিরি, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি এসব বাদ দেখা হয় তাহলে কোলকাতা থেকে পুরী আসার কোন মানে হয় না এইরকম ধোবধরির একটা কথা গতকাল রাতে মাস্তানায় বসে সেই পেটেনেটা খুলনার ধোবধরি ধোবধরি বলেছিল, মানে পাঁচ ছাত্রের অঙ্কা-না-না ওদের কোন চিকিৎ লাগবে না। ওরা যে মানে কোলে বসে। ওরা তো আর আলাদা সিটে যেতে পারবে না। আর ঘুটিয়ে বাচ্চা সবার এমন কি আমি মাইনে শিশুরা। আপনারাই হয়ত কোলাহল হয়ে পড়বেন। আর ওরা তো বাচ্চা—। তাহলে ওই কথাই রইলো, সবাই দু'টার মধ্যে নীলকমল আপনাদের দিকে মাত্রা করবে। সন্ধ্যা মত ফর্সোবাজারের ওখানে চলে আসবেন। বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পরা অন্ধকারে চলি ফটাং ফটাং করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল মানুষটা। দেখা উঠে বসে চকিতে টুকাইয়ের সিটের ওপর একটা চড় বসিয়ে দিল। জুতো নিয়ে এমন করে মারলো। টুকাই ভাক করে কেঁদে পরেশের কোলে এসে বসলো। বাসওদ্ধ লোক আমাদের হাতজোড়া দেখে চোখ টিপে হাসছে। আমি পরেশের মুখের দিকে তাকালাম। পরেশের মুখ গম্ভীর। তোবের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অর্নিন্দিতা আর সুব্রত বেরিয়ে হয়ে গিয়েছিল। দেখা আর পরেশ মেয়ের ঘুম পরান, টুকাইয়ের বাঁচে মাজা, পাটিজনা, এসব নিয়ে ব্যস্তিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কম্বলকে অবশ্য যাদবা আক্রাতাড়ি সাজিয়ে জুতোটার ভিতে ঢুকতে ঢুকতে নিজের সাজপোষাকটাও দেখে ফেলেছিল। আর ওদিকে তখন সকালের আলোয় সমুদ্রের বালুকণা ঝলমল করছে। অনেকক্ষণের আলোর ধর্ম একসঙ্গে মনে এসে আছড়ালো। সুব্রত ব্যস্ত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলো। ছ'টা ছেড়ে গেছে। গায়ত্রী-গায়ত্রীর, চোখে গগলস, কাঁধে ব্যাগের সঙ্গে ছাটের দলকের ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গায়ত্রী করছে ঘরে আসার অর্নিন্দিতা হুটপট করছে। তবে ঘরে সুব্রতরা নিচে তাকাচ্ছে। সহসা সুব্রত বললো, তোদের সঙ্গে প্রোগ্রাম করা সত্যি ভুল হয়েছে। আচ্ছার মনে আছে। এ তোমাদের নিজের ঘরের ব্যাপার নয়, যে ইচ্ছামত কাটাবে। টাইম হয়ে গেলেই বাস ছেড়ে দেবে, তখন চেকাটাই পাচ্চা। পরেশ ফুঁসে উঠলো, যাস্কপে পাচ্চা, জানিসতো আমাদের মেয়ে মেয়ে পুরুষ। তাদের অওরা-দাওরা আছড়া ওইসব দুধের বাচ্চা ওকে না খাইয়ে নিয়ে যাওয়া ভার। আমি পরেশ একটু থামতেই তারপর যেন ধমক ছেড়ে বললো, দেখ সুব্রত, আমি সেই তখন থেকে লক্ষ্য করে আসছি, প্রোগ্রাম করার সময় হলে হয়ে দড় বড় করেছিস, খালে পড়েছিস, যেন তাইয়েরও বাড়া, আমার পরে পা দিয়ে সব সময় ঝগড়া করছিস স্যাড করছিস—এসব কিন্তু ভাল নয়। দুধের বাচ্চাকে না খাইয়ে যেন পাপ, মা বেড়াতে যেতে পারে না। সুব্রত সহসা গম হয়ে ঘর থেকে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বারান্দায় এলো। অর্নিন্দিতা সুব্রতর একেবারে মুখের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। ভেজা আমরা চলে যাই। সুব্রত ধমকে উঠলো, ন্যাকামি করবে না, আও-ওদিকে । সহসা সহসা অর্নিন্দিতার চোখে যদি পরিবর্তিত হলো। সুব্রত তাকে ধমকেছে। আহা। আমি অন্যদিকে তাকালাম। যাদবা অবুঝ মুখের দিকে চেয়ে দিল। টুকাইও তখনকে রেলিং ধরা দিয়ে দাঁড়ালো। আমি পরেশকে বললাম, সে সে ওদিকে সে। তারপর দেখার দিকে তাকালাম, দেখা আমার চোখে চোখ স্থাপিত করে বললো, এমন জানলে আসতাম না—জন্ম, জন্ম। আমি হেসে বললাম, ওদের যেন শেষ নেই, ওদের মেয়েমেয়ে হলে তখন বুঝবে, আর অর্নিন্দিতা—ওরও যা বৃদ্ধি, সবচে টুকাইয়েরও সেই বুদ্ধি। দেখা চোখের ইশারায় জেনেছে, আমি থেকে গল বয়ে আগে দিয়ে দিলে পাঁচটা ঝামেলার যা হয়ে—আমাদের আর ঝামেলা না।

তখনকে অনেকটা বৈলি। পরেশও বৈলি। শুধু দেখা আপত্তির কালে নিলেই আমরা ভরসা হতে পারি। আমরা ঘরের এসে সুব্রতকে বললাম, তুই অর্নিন্দিতা আমরা আর আমরা বেরিয়ে পড়। আমরা আসছি । সুব্রত আমার মুখের দিকে তাকালো। আমাদের চুপে রে ঘরে। আমি হেসে বললাম, সে তোর আসতে হবে না। পরেশ আছে, আমি আছি। সুব্রত ঘর বলে চেয়ার ছেড়ে উঠলো, তুই আসার দিয়ে আয়, আমি আসছি। আমার ভেজা আর মাস্তানায় সমুদ্রের ধারের ঢেউয়া পায়ে সরে, সকালের নানা রোদের তাপ লাগিয়ে—এসে বসেছি নীলকমল আসার পরি যাচ্ছা নিতে।

আমাদের সামনে আরও অনেকেই এসেছে। পাঁচ-ছ' খানা বাস দাঁড়িয়ে। সেন্ট এসেছে, পঞ্জাব, কোলকাতা কত কী—বহু বেরঙ এর পোষাক পরে। কাঁধে ভারের বোঝা, ছোটখাট বাগ। আজ কাজা—পাঁচ-ছ'খানা বাসে কোথাও একটা সিট খালি নেই, ঘর তীর্থ দর্শনে না, কলিকালের দেব দেউল, তার কারুকার্যই তা অনাদি অনন্ত কাল ধরে ছ-মহিনার বিস্ময় করছে। আর্টের চোখের বিস্ময়। কত ইতিহাস, কত মাথিঁ, কত অলৌকিক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ঠিক মুহূর্তে এই ভারতের মত তার আকর্ষণ সমুদ্র উঁচের হাওয়া সূর্যের আলোয় আছার, পাহাড়ের মহিমায়, আর বিস্তৃতির ভালবাসার দাসায় মুটি মুটি মাসি—আহা' পরেশ আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি হেসে বললাম, উপরে ঘর নাম পেয়েছি, ছেলে-গো পেয়—মাথায় ওরকম চুলের মনমাতানো বিন্যাস। কাঁধে ক্যামেরা, হাত হাতের ঘড়িতে ৪৩টা লাল ফাতের ঘড়ি যেন আতঙ্কের একটা কালো আর তার সঙ্গে আর এক যুবতী। জামরঙ শাড়ী, ছোট ব্লাউজ। ডান হাতে ঘড়ি, চোখে গো-গো চশমা। ওরকম মাথার চুল পিঠের ওপর ছড়ানো।

ঠিক আমার পাশের সিটের কাছে আসতেই এক ভদ্রলোক বললেন, এখানে বসে পড়ুন—ওরা আপনাদের পেছনের সিটে বসবেন। ইস্ বড্ড দেরি হয়ে গেল বসে, ধারণার বাইরে ভাবিয়ে বললো, বই আসুন। তখন উপরে উঠে এলো আর দু-জন পুরুষ তার একজন সবয়, যাদবজন অচেনা। আমাকে দেখেই রূপা হেসে, ছুটো মাথা—আরে আমা মেয়েটির দিকে চেয়ে বললো, দিদি—এই যে আর কথা তোকে বলেছি, সমুদ্র আছে—বলে ভিতীয় ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললো, অজয় দা—এরো পরিচয় করিয়ে দিই। বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। যাদবজন্মবু আর সবয় রূপাদের পেছনের সিটে গিয়ে বসলো। ঠিক আমার পাশে রূপা আর রূপার দিদি সমুক্ত। সমুক্তা হেসে বললো, আপনার লিখেন। আমি পেছন দিকে বসা আমাকে দেখিয়ে দিলাম। তখন রূপা পরেশ, দেখা, সুব্রত আর অর্নিন্দিতার সঙ্গে ওর দিদি জামাইবাবুর সকলের পরিচয় করিয়ে দিল। রূপা, দু-চারটে মন্তব্যোগের সূত্রে বললো, আপনার ওপর আমি রেখে আছি। আমি হেসে বললাম, কেন। রূপা বললো, বা:—আপনাকে লেখিন প্রাইজটা ওরকে করতে বলেছেন আর আপনি দিদি কেটে গেলেন। আমি দিদি আর জামাইবাবু কাছে কত ছোট হয়ে গেলাম। আমাকে ক্ষমা করুন, ঘরে দু-মুক্ত ফোড় করে ওদের দিকে চেয়ে বললাম, তখন ওই দারুন ভাঁড়—যাদের ভাঁড়ের জন্যেই আমাদের ঘরে আসতে হবে।

রূপা পাখীর মত জলা কাপড়, কম্বলের দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকলো, কম্বল এদিকে এসো। কম্বল খরচে রূপার দিকে তাকালো। রূপা আর দিদির দিকে চেয়ে কিছু করে হাসলো, জানিস দিদি ভারী দুষ্টু। যা কথা বলে না। সমুক্তা মাথাটা ঝুঁকিয়ে কম্বলকে দেখলো। অর্নিন্দিতা ভান চোখটা চোখ বুটে ছোলা জানালার স্থাপিত করেছে দেখা, মাঝে মাঝে চোখ বেঁধিয়ে রূপা আর সমুক্তাকে দেখছে। সুব্রত আরও গম্ভীর পরেশ আমাকে কনুইয়ের খোঁচা মেরে মজা পাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চোখ মারছে। ছেলেকরি ওর মেজাজটা একটু ফর্সা হয়েছে। টুকাই দাঁড়িয়ে আছে জানালায়।

নীল আকাশের নীচের নীল সমুদ্রের ঢেউ সূর্যের নরম আলোয় ঝলমলছে। ঘাঁচে জলির পাঁসলের পা ফেলে ফেলে অসমতল ঝুরুক-ঝুরুরি মাহোল। শিত, বৃদ্ধ চকিত ছেলে ছুটছুক। সমুদ্রের নবমহিমা পাহাড় ঢেউয়ের পাথার পাথার ঝরে পাসছ! যতদূর দৃষ্টি যায়, কবির ভাষায় তার শুধু জল—মেঘে মেঘে চিত্ত ঘোর হয়েছে বিকল। এক সময় বাঁশির সুর ওঠে নীলকমল একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুমে উঠলো।

চোখের পলকে সমুদ্রের উধাও হলাম, গর্জনি সেই মনোরম ঘটাস, কত মুহূর্ত ঘর ঘড়ি, কত প্রস্তর শেষিয়ে ঘুরয় ফেলে ছুটে চললো নীলকমল। বড়িওয়ালা বলেছিল, শেষে নীলকমলে যাওয়া ঠিক করলেন, সিটাটে ওলের পুরনো, আসটা পুরোন কিনা—মোদ্দুন একটা লাক্সারি বাস বেরিয়েছে—ওটাতে গেলে আরামে যেতে পারতেন। কিন্তু আরামের ব্যাপারটা কোথায় হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কেন কম্বলকে তুকতে না হলেও মোটামুটি পরিচয় এবং আত্মিকতা সম্পন্ন তো বটই, আর কম্বল চেহারা অবস্থা।

এমন সময় দেখিক এত ছোটোসমেন আরামদায়ক এবং আরামদিন্দি, তাইতে আওয়া বাঁচিয়ে—আমি নীলকমল আসার আইন অর্নিবর্চন আনন্দায়ী বলছি, পাইলটের পাশে বসা অনির্বান আনন্দায়ীর বলা আইনে অনুভব হলে—এই আরামদায়ক ছোটে

দুটির আসার জন্যে ভক্তরা কখনো আসরের থেকে পালাননি সেটা মর্মান্তিক ভাবে শেষ হয়ে গেল, নীলকমল আপনারকে নিয়ে চলেছে সাক্ষী গোপালের মন্দিরে। কৃষ্ণনগরের নদী তীর গোপাল এখানে কী ভাবে সাক্ষী গোপাল নামে পরীক্ষাতালী মানুষদের পূজা গ্রহণ করছেন, তার একটা সুন্দর মেয়ের জাহিনী সুললিত ভাষায় বর্ণনা শুরু করলো।

"একজন নিয়ন্ত্রেণীর মুবক উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের বিরাট গ্রন্থ করে শুরুপুরে বসবাস করে, জাই কৃষ্ণদাস ঘটে। অতিথিতে ব্রাহ্মণের একমাত্র সুন্দরী কন্যা। একদিন বিয়াতে নিয়ে শুর হাজির হলেন শ্রীকৃষ্ণাবন। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। মন্দিরের ডাক্তারদের গিয়ে দিয়োষ দেখার পর হির হিসেন, তার একমাত্র কন্যার দাদে ওর বিবাহ দেবেন। আনন্দে আত্মহারা পিতা। কিন্তু দেখে ফিরে শুরুর প্রতিক্রিয়ার কথা তিনিই তো একমাত্র জানেন। তাছাড়া কনে দিয়োর পেছন পেছন চলতে শুরু করলেন গোপাল। সর্ত হইল, পিতা জানেন আগে আগে। পেছনে গোপাল কিন্তু পিতা যেন কৃষ্ণকণ্ঠে পেছন ফিরে গোপালকে না দেখেন। তাহলেই—। চলতেলেন গোপাল, চলেছেন পিতা। হঠাৎ কেন জানি পিতারও মনে হলো, তাইতো নূপুরের ধ্বনি তো শুনতে পাচ্ছি না। তাহলে কী গোপাল, কনে পেছনে ফিরে তাকানোই অবশ্য হয়ে গেলেন পিতা, সফলো হলো বৈষ্ণবাণী। তুমি সর্ত ভঙ্গ করেছ, ব্যস্। গোপাল আর কথনও চলার আগল হয়ে বসে পড়লেন।" সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই গোপালের মূর্তি আর মন্দির-নাম হয়েছে সাক্ষী গোপাল। যুগযুগান্ত ধরে সাক্ষী গোপাল ভক্তদের দ্বারা পূজিত হয়ে আসছেন। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসছে তার দেখার পিপাসা মেটাতে। আমরাও চলেছি সাক্ষী গোপাল দর্শনে।

মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালো নীলকমল। বেশ তখন বেশ হেসে উঠেছে। মন্দিরের সামনে বিরাট খোলা জায়গা, সবুজ ঘাস। নারকেল গাছের সারি। সেকেলে পাট। মন্দিরের সদর গেট দিয়ে ঢুকে পাশ বাঁধানো প্রাঙ্গন। ঘাসে ঘাসে বর্ণমালী মানুষ ঘুরে পড়েছে—ঘর দিকে ছোট একটা অবের অবস্থানের কয়েকজন পাণ্ডা। সাক্ষী গোপাল দর্শন করতে হলে, টিকেট কাটতে হয়। হাতে মাত্র দশ মিনিট সময়। মন্দিরাদান পেরিয়ে আমরা মন্দিরের ঘোর গোপার প্রাঙ্গন করলাম আমারা। মন্দিরের দেব দেউলের মধ্যে ভক্তাগ্রহণের মন্দির আছে এই আমাদের প্রথম আর একটি মন্দিরে প্রবেশ। দেবতা দর্শন। সাক্ষী গোপাল বসে আছেন সিংহাসনে। শ্বেত পাথরের মূর্তি। পলায় কাঠমালা, হাতে বাঁশি নিয়ে শিল্পীশাখ উপরে লালকালর-মন্দিরের গায়ে স্থাপত্য শিল্পের কিছু টেরাকোটার কাজ। সাম্প্রদের অভাব। তবুও মুখমণ্ডল ধরে দাঁড়িয়ে আছে মন্দির। আমরা দেবতা আর আজ নিস্তব্ধকরণ ভক্তের দল। আর আমাদের সেক্ষত্রেও। মাঝের সময়ের অল পরস্পরার চলে আসছে দেবতার কুল দোপাতা আর চন্দনামৃতের আহারে। মন্দির প্রথম পেরিয়ে বাইরের খোলা জায়গায় এসে দেখি রূপা বাম্রেরার চোখ মেলেছে। তার সংযুক্তা, সমর এবং অতনু একটা নারকেল গাছের সামনে পরিপাশন নিয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সুব্রত'র গলা পেলাম, ক্লীক। সুব্রত অনিন্দিতার একটা ছবি তুললো। পরেশ, লেখা, অলকা আমার পেছনে। টুকাই আর নন্দন হাত ধরাধরি করে আগে আগে। সুব্রত আর অনিন্দিতাকে ছবি তুলতে দেখে টুকাই আর নন্দন সেদিকে ছুটে গেল। কিন্তু তার আগেই অনিন্দিতা আর সুব্রত হাঁটতে শুরু করেছে দেখানে নীলকমল দাঁড়িয়ে। লেখা রূপাকে বলছে, সত্যি একদম দব তোমাদের বন্ধু-বান্ধব। জানলে কে আসতো বেড়াতে। অলকা বললো, কোন কিছু ছাট পাকিয়ে আছে কুকুলে লেখাদি? পরেশ বললো, ভাই না হলে। আমাদের বাচ্চা অলকা আছে—। এমন সময় নীলকমল পাকা ভাঁত বোঝা ছাড়লো। বাকী মাত্রিনি ছুটতে ছুটতে গিয়ে আগের হাতেতল ধরলো। আর মিনিট পাঁচ হয়েছে। আর বেশি কথা বলা যায় না। বাসের মধ্যে গিয়ে দেখি, অনিন্দিতা তার জায়গায় গিয়ে বসেছে। সুব্রত অনিন্দিতার পাশে। নন্দন আমার মুখের দিকে তেরে কলন দৃষ্টি মেলে চাইলো কণি, আমি জানালার কাছে বসবো। আমি তাকে তুলিয়ে বসালাম, জানালার পাশে বসতে নেই খুকি, ঘুমের চোখে যাবে। নন্দন বললো ঘুমো চোখে যাবে না। রূপা পাশ থেকে বললো, নন্দন এলো, আমার কাছে—আমি ছেলে ভালবাসি, না না থাক। অনেক বন্ধু আছে। বলে সুব্রত'র দিকে তেরে দেখি ওর নোতুন বাঁধ ভাঙা কথা ইস্ত্রী করা পাঞ্জাবী পা-জামা খুলতে খুলতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। নন্দনকে ও অনেকক্ষণ কোলে নিয়ে বসেছিল। হঠাৎ অমার অনির্বাণ ব্যানার্জীর কথা মাইকে ধ্বনিত হলো, এবার নীলকমল আপনারের নিয়ে চলেছে, সেই ঐতিহ্যবাহী ঠিক বিরাট শিল্পকলা-ও ভাস্কর্যে অতুলনীয় সূর্য মন্দিরে নাম যার কোনারক্ষ। আনেকেরে বলেন কোনারক। সূর্য মন্দির এমন ভাবে তৈরি, ভার কোন ছায়া পড়ে না—সে কথার পরে আসছি কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই আপনারা তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষেত্রবারি ক্ষুধার্ত। নীলকমল আপনারের কৃষ্ণা নিবারণের জন্যে অন্তত দশ মিনিট পরে দিলো কারে একটা ছোট ব্রেকের বাজার হাতে দাঁড়িয়ে—এখানে আপনারা সকলেরা জলযোগ সেরে নেবেন, সেটা জানাতে পারলে সময়নিষ্ঠতার বৃদ্ধত—জান দানে না, অতএব জনে রাখবেন নীলকমল দিলিপ নামে গ্রামের টো-রাস্তার ছেলে দশ মিনিটের জন্যে দাঁড়াবে, দয়াজন। নীলকমল ছুটে চলেছে অভিমুখে। একটা খা-খা শব্দ শুধু, আর পলাশ পলাশে বিস্তারের সবুজ পাতা, ছোট ছোট ফুল ফুটের পেছিয়ে ছুটে চলেছে। রূপার মত মেয়ে সমস্ত ব্রত ছেলে মশায় বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে, সবুজ দৌন্দর্য মাঠ, ঘাট, পথ প্রান্তরের অনাবিল অপরিমিত প্রাকৃতিক শোভার দিকে। পরেশ চুপচাপ। মাঝে মাঝে মেয়ের দিকে হেসে টুকাইয়ের দিকে তাকাচ্ছে। অলোকা নিশব্দে চেয়ে আছে। সবকিছু চোখ মুখ এক বিস্ময়কর প্রাকৃতিক শোভার মায়াজাল যেন বিস্তার। পাখী ঝাকের ঘরেই দিশিল। ঝিঙি, খড় আর টালি ছাওয়া মাঝারি ঘরের বেড়ার কয়েকখানা হাতে খোনা মাল দোকান। চা, বিড়ি, পান বিড়ি। যাত্রীদের হঠাৎ চাহিদা মেটার। নীলকমল থেকে সবাই দোকানে ঘিরে ভিড় জমালো। কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের কেতা দিলিপের চালির ছাদের নিচে মিষ্টির দোকানের ঠোঙা থেকে পরম আনন্দে ভাজ-ভোগ রসগোল্লার স্বাদে কিনে খেলে খুবে বললো, আহা শুধু জানা, একেবারে গাঁটি জানা দিয়ে তৈরি। জলযোগ সেরে আবার যে জার উঠে পড়লো নীলকমল। কারো দশ মিনিট সময় অতিক্রান্ত। আবার ঘোষণা হলো মাইকে অনির্বাণ ব্যানার্জি'র গলা—এবার নীলকমল ছুঁয়ে ঘন্টার সফর শেষে আমি মাইল। আপনারের নীলকমলের হয়ে আমি অনুরোধ করছি, যে আপনারা স্থির হয়ে বসুন, বিশেষ নজরদারী বিশেষ জানালার বাইরে অসাবধান মুহূর্তে হাত বাড়াবেন না, ফেলনা ওনেই অনিন্দিতা চক্ষিতে একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলো। লেখাও কিকিং ঝিমুনির মত ভাবলো পরেশের দিকে। নীলকমল ছুটছে ওর অভ্যেসে—সূর্যের রূপোলী আলোর সবুজ পরিধি ভাঙা, সবুজ গমে গমে ঝলমল করছে। বাইরে প্রান্তরে চাষী কর চলেছে, খেলা মাঠে, পাহাড়ের ঢালায় ঘন পরিধি ডাকছে—ডাকছে কোকিল, চক্ষিতে তাদের ঝলা মিলিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ওই দেখুন, সেই ঘন প্রজ্বালিত, সূর্য মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। অনির্বাণ ব্যানার্জী, ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে ফিরে দেখেছিল কিনা জানি না, শুধু হাতটা উঁচিয়ে আমাদের মুখোমুখি করে বললো, ওই দেখুন, কোনারকের সেই সূর্যমন্দির মু-পাশে অবস্থিত মাঠ। মতের দৃষ্টি যার ধোঁয়া ধোঁয়া পাথারের চূড়োর রূপোলী রেখার খুঁটিমি। কে এক ভক্তীর মন্তব্য শুনে এলো, ধবল গিরি দেখা যাচ্ছে, কেউ মন্তব্য করলো, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি—আমি মুখ জানালার বাইরে চোখ স্থাপিত করলাম—অনির্বাণ ব্যানার্জীর সুললিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সঙ্গে অনির্বাণদার বাচনভঙ্গি, রাজা নরসিংহে দেও বাহাদুর এই অভিনবস্থান কীর্তি তাহাতের বুকে রেখে গেছেন যে আজ হাজার হাজার বছরের কথা ইত্যাদি সংক্ষেপে বলে তাঁকাবে আমরা মন্দিরের কাছে আর, সেখানে গিয়ে কী কী দেখবো তা যেন জলের মত হয়ে গেল। বতদূর সম্ভব আমি মুখ পড়েছি, পরেশের কাঁধে ভর দিয়ে। কিন্তু এতদূর থেকে আর এরকম দেখবো জায়গায় বসে কিছুই নজরে এলো না। নীলকমল এসে দাঁড়ালো, সেই ঘন আবাসিকিত কোনারক মন্দিরের পাদদেশে। ডানদিকে সারি সারি শিবের মন্দির। সবুজ গাছের পাতায় ঝির ঝির হাওয়া। ডান দিকে বেঁকে একটু এগিয়ে গিয়ে। এবা আরপরেই সেই সবুজ প্রান্তর। ঠিক সামনেই কোনারক-এর সূর্য মন্দির। মনের চেয়ার ভাবনা। মন্দির গায়ে সেই বরণীয় শিল্পী, ভাস্করের রমণীয় কারুকার্য। দুপাশের পাইড আমারের দিকে চেয়ে একদম চুপচাপ। আসুন আর, বেলা অরোটার রোদ মন্দিরের গায়ে ছড়িয়ে। পাইড বুঝিয়ে বুঝিয়ে সেই সব ভাস্কর্য সম্পর্কে বুঝিয়ে বলছিল—বুবক যুবতী স্ত্রী স্ত্রী, উপস্থিত উপগাড়ী যুগে আমাদের সমাজরত নারীপুরুষ—অযোজনের নারীর দেহ সৌষ্ঠব। একেবারে নিখুঁত ভাস্কর্য আমাও দর্শনার্থীর হৃদয় সন্ধান পুলকিত। সুব্রত অনিন্দিতা, পরেশ লেখা, আমি অলকা সকলেই বোধ করি চমৎকৃত। অন্তরের হনুমানের শ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কিন্তু পর্যন্ত আমান, পাকড়ের প্রার্থনা, শ্বেতী ব্রহ্মারাক্ষ-মহাভারতের কী অপূর্ব প্রকাশশৈলী তাহিজার খোদাই করা সমুদ্র মন্থন, চোখ যেন জুড়িয়ে যায়, পলক ফেলতে ভুল হয়ে যায়—সুব্রত বাঁধের কাধের ঝুলে গভীর মুখে সবাইকে পরিশ্রম নিতে বললো, দাঁড়া সব এই চক্রার সামনে—অনেক সেই একটি মায় মনের চক্রার সামনে আমরা সার বেঁধে দাঁড়ালাম। পাইড ছুটে এসে সুব্রতকে বললো, আপনিও দাঁড়িয়ে যান স্যর, ছবিটা ভুল নিচ্ছি।—সুব্রত কামেরার ঠিক ফোকাস পাইডের মুখের দিকে চেয়ে আলো ছায়ে দিয়ে অনিন্দিতার পাশে এসে দাঁড়ালো। ক্লীক, এমন সময় কিংবদন্তী বলে এলো, এই-এই পড়ে যাব—আমাদের উঁচু করে তোলা মন্দিরের প্রায় শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে সমস্ত আর রূপা—ভয়ংকর নির্জন। আর আমাদের দেখতে পাচ্ছি না। সমর রূপার হাত ধরে দাঁড়িয়ে হাসছে, আর রূপা ভীতগ্রস্ত ধর ধর। তার মুখে ভয় আর বেদনা ছড়িয়ে পড়েছে।

জেগে জানকীনিতে রূপার মুখ লাল হয়ে উঠেছে—আশ্চর্য মেয়ে, সেদিন ট্রেনে অমনভাবে গায়ে পড়ে আলাপ করলো, হাসলো, আমার ভালোয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো, আর তার সঙ্গে মাত্র কয়েকটা কথা ছাড়া আর যেন কথাই তেমন বললো না—এমন কি সবুজের বা অন্যান্যদের সঙ্গে তেমন পরিচয়ও হলো না—রূপা ওপর থেকে চিৎকার করে সবুজকে ডাকলো, দিদি, এই অন্ধকার, এসে নাও সবুজ বললো, তোরা নেমে যা—আমি নেমে আর এই সময়—সন্ধ্যা হেসে বললে, তার নেই দিদি—।

মন্দিরের চারপাশ ঘিরে একটু ঘুরে ঘুরে ঢালু লাইট পাদদেশের গায়ে বাঁধা। নন্দন টিকাইকে বললো, ওই দেখ ঢালু লাইট। জবাবের কোনও ছলে। টিকাই অবাক হয়ে দেখলো। এমন সময় কেন জানি আমার শঙ্করার কথা মনে হলো—শান্তা যার প্রথম এসে খুব সুন্দর জমতো—না থাক; সহসা মনটা ভরে গেল। তা পরিবেশ আর পরিস্থিতির মধ্যে চলেছি, আমরা।—নীলকমল তাকাচ্ছে ওপ্ত তাকাচ্ছে, ঘাঁপলাদে সমৃদ্ধ ঘাস মাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই ডান দিকে সুবৃহৎ কলমন্দিরমালার কাঁকে নতুন নতুন ঘড়ি চোখে পড়লো। ছোট ছোট মন্দির ছাদীর গাইড বললো, হাত উঁচিয়ে ওটা টুরিস্ট গুইস। নীলকমলের কাছে আসতে দেখি আর দু-তিনটি বাস এসে দাঁড়িয়েছে—যাত্রীরা নেমে ছুটছে মন্দির দর্শনে। হাতে সময় নেই, মাত্র সাত মিনিট—ওজনেই হেডোন তার কটি যে খাবে স্বাস্থ্য আছে। অনির্বাণের সঙ্গে দেখা হলো, বললাম, আপনি দু তারাতার আপনাকে বলবান। অনির্বাণ বললো, তাড়াতাড়ি যান খেয়ে আসুন হোটেল—থেকে, হতে মাত্র সাত মিনিট টাইম—এখনুনি নীলকমল হারবে।

চলতে নীলকমলের পাইলটের পাশে বসা অনির্বাণের মুখের প্রাইভ এবার চলাচল ভাবনা থেকে উঠলো, নন্দন্যার, এবার আমরা চলেছি, বৌদ্ধগিরির উদ্দেশে—যেকে সাধারণতঃ বলে থাকেন ধবলগিরি। আসলে ওর নাম বৌদ্ধগিরি। এই পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে অগণিত জন্মের পর সম্রাট চতাশোকের বুকে বেজে ওঠে, আর মানুষের চিৎকার, পুত্রহারা পিতা, স্বামী হারা স্ত্রী, বন্ধু হারা বন্ধুর সে পথন বিদারী চিৎকার, চতাশোক হলেন ধর্মাশোক—কিন্তু সে কথা পরে আসছি, এবার আমার অনুরোধ, আপনাদের ক্লান্তিক্লান্তি অপসারণ নিবৃত্তি হয়েছে, এখন কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন—কিন্তু ছুটছ এই নীলকমলের সিটে বসে তা কেমন হচ্ছে আমি জানি না, তবে এ সময় আমরা একটু জলসার আয়োজন করি তো কেমন হয়! একটু গান, একটু কবিতা আবৃত্তি—সকলেই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, হোক-হোক—। তবে আসুন, চলে আসুন, তবে অনির্বাণ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাসে বসা যুবক, যুবতী, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু, বান্ধবী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধার দিকে। সহসা একটি মেয়ে উঠে দাঁড়ালো—অনির্বাণ সাদর আহ্বান জানালো তাকে। মেয়েটি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে চলে এলো। এবার সবুজকা পা নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, সেদিন দিয়ে তাকালো ড্রাইভার আর সমবেত দিকে। তারপর দিয়ে বললো, মাইকের সামনে—স্বেচ্ছারচিত—একটি কবিতা বলে থেকে উঠলো ঘরে—তখন পেছন থেকে আমার কাঁধে খোঁচা মেরে বললো, যাও না, তুমি একটা কবিতা—। সুব্রত সমর্থন করলো অন্যদের তা না—। আমি সুব্রতর মুখের দিকে তাকালাম। সুব্রতর মুখ গম্ভীর। চোখ দুটো বিরক্তিপূর্ণ। জানি না ও কি ভাবছে—রূপা বোধহয় কান পেতে ছিল। বললো, জান একটা কবিতা ওনি আপনার। অতএব আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওদিকে সবুজেরা উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি ঝিয়ে মাইক মুখে তুলে নিলাম, কেন জানি হঠাৎ আমার ঠোঁটের ডগায় "ক্লান্তি" কবিতা কথাটা এসে গেল, আমি পাহাড়ের সামনে যেদিন আজিকে নবীন মেঘ নিশীথকালো।...

অনির্বাণ সহসা আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন কোথায়। আরে বসুন, বসুন—জন ওড় লোক রিকোয়েষ্ট করছে। সত্যি তাই রূপা সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—আমি অনির্বাণকে বললাম, ওই মহিলা উঠে দাঁড়িয়েছে। রূপা কম বললো, আর একটা চেক—আমি সন্তর্পণে অনুরোধ এড়িয়ে চলে এলাম আমার সিটে। পরেশ আমাকে আমার উরু মেপে হাত রেখে বললো, ওহ, এবার পাটনে, বলে অন্ধকারে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো। অন্ধকার মৃদু হাসলো। অনির্বাণের গলায় উচ্চারিত হলো, এবার আবার আমার ধর্মাশোকের কথায় ফিরে আসি—সুব্রতর সেই বিচিত্রবিচারের মুখাকৃতি এক সময় চতাশোকের হাতের পতন নামিয়ে দিল। অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে হলেন ধর্মাশোক এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কখনও অস্ত্র ধারণ করবেন না,—সেই পাহাড় যার নাম বৌদ্ধগিরি ওই যে, সমবেত দিকে তাকিয়ে সম্রাট ওপর দিয়ে আস ন দিয়ে বৌদ্ধগিরি দেখালো অনির্বাণ। আমার আমার্ত্ত কণ্ঠের জানকলার কুঁকে পড়লাম। বিস্তৃত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিশ অশোকের সৌন্দর্য ভোলা বিস্তৃতির অতলের কলরব করছে অকৃত্রিম পরিবেশন। ভোরবেলা একটু ঠান্ডা। সবুজ ছায়া থেকে ঝাঁক ঝাঁক বৌদ্ধগিরির সর্পিল পথ ধরে একেবেঁকে চড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো নীলকমল। জল থেকে সকলেই তড়মুড় করে নেমে পড়লো, লাল নুড়ি পাথরে আকীর্ণ পথ। অনির্বাণের কথামতে যাদের জন্যে জুতো রেখে এসে মন্দিরের প্রাঙ্গণে পা দিয়েই যেন পায়ে তলা যেন পুড়ে উঠলো। পেছন ফিরে আমি মন্দিরের সামনে অশোকের খো পাথরের সমাহিতে মূর্তি—আহা অপরূপ। অনিন্দিতা যার সুব্রত ভেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। আমি দু-পা উঠেই নেমে এলাম নন্দনকে কোলে নিয়ে প্রথমের পাদদেশ ছোট্ট একটা সুবৃহৎ ঘরে জলপানী ভোজের চলাবৃত পরিবেশন করছে মহিলারা। পরেশ আর সোফাকে দেখতে না পেয়ে আমি নীলকমলের দিকে এগোলাম নন্দন ভোরের আলো তাকে কুঁকড়ে আমার বুকের সঙ্গে মিশে গেছে—আওয়ার সব আবার আমি মন্দিরের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম অনিন্দিতা আর সুব্রত নেই। প্র ম থেকে শুরু কিছু ফুট ওপরে মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রূপা, সবুজ, অজয় আ সবুজেরা। চোখে গো-গো-এঁটে সেতার বাদে করছে। নীলকমল আমার কাছেই সো এক ভোজালী কথা নিয়ে ব্যস্ত আছে। দেখে যেন জল পিপাসা পেয়ে গেল। নন্দ অবনত ধরলো কথা যাব। কথা দিয়ে আমার মধ্যে ঘুরেই দেখি পরেশ, দেখা আ অলকা নিজেদের সিটে বসে যেন হাঁপাচ্ছে। টিকাই নন্দনকে বললো, তোর পা খু পেছে। নন্দন বললো, হাঁ—তোর? টিকাই বললো, হাঁ—বলে জানালার খড়ি নন্দনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বললো, দেখ দেখ—কত উঁচু তাই না—নন্দন অনির্বাণ সিটের ওপর উঠে জানালায় চোখ পরিয়ে নিয়ে অবাক হলো। এবার সবুজ গাড়ি উঠতে শুরু করেছে। নন্দন অনির্বাণের আসনে দেখে চোখমুখ বিস্ময় করে আমার দি চেয়ে বললো, বাপি আমি তোমার কোলে বসবো, বলে চলে এলো আমার কাছে টিকাই বসিয়ে রইল।

সোফার পাশ ঘেঁসে রূপা নন্দনের দিকে চেয়ে হেসে বললো, তুমি কবিতা আবৃ করতে পারো। নন্দন হেসে বললো, পারি। ও হো, বলে নন্দনের গাল টিপে দি খিল খিল করে হেসে উঠলো রূপা। নন্দন হাতের কাটা পলার ফাসিটা পাশে পু দিয়ে অকপট করে জানতে লাগলো। রূপা গো, গো-র ভেতর দিয়ে আমার দু চোখ ছাপিত করে হাসলো। সবুজেরা বললো, আপনার গলাটা কিন্তু ধারণ, উ চেয়ারের কুশন গুছালাম। আমি হেসে বললাম আপনারটা কী স্বরচিত। সবুজেরা হে বললো, হাঁ, বলে আড়চোখে দিকে তাকালো। সবুজ বললো, দিদি, আপনার কবিতাটে দারুণ, ওটা কী ছাপা হচ্ছে? সবুজেরা হেসে বললো, না, কাল রাতে হোটেলে ব লিখেছি। আমি হেসে বললাম, ওই সবুজের কথা তো কিছু নেই—ঠিক তখন নীলকম গর্জে উঠে বৌদ্ধগিরির ঢালু পথ ধরে মোড় ঘুরে ঘুরে উঠতে শুরু করেছে। অবহীন বিচিত্র কোলাহলময় এলাকার মধ্যে দাঁড়িয়ে চতাশোকের ধ ক

কলিঙ্গের সেই যুদ্ধের বিভীষিকাময় অন্ধকার করে চলেছেন। জানিনা, আম সমবেদনভূমিতে নেমে এলাম। অনির্বাণের গলায়, এবার চলুন যাই, কোনারকে নিজেশ্বর, মুক্তেশ্বর, হিরণ্যকুণ্ডের পথে...নীলকমল এসে দাঁড়ালো কোনারকের মন্দিরে সামনে। সিমেন্ট বাঁধানো বটবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা একসঙ্গে পা ফেলে কে এগিয়ে চলেছি মন্দিরের দিকে। নগ্ন পা, জেদ পোড়া ক্লান্ত পরিবেশ। মন্দিরের চি ঘিরে পরিপথ ধরে প্রবেশ করলাম মাতৃমন্দির।

অন্ধ অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঘিরের প্রদীপ জ্বলছে। বিরাট গোলকর্ধে। কোণার ও ফুল ফোলপাতা তুলসী চন্দনে আর্ঘ্য—ত্রিধারায় জল এক জায়গায় এসে মিশে সেখানেই পাতা জোবা থেকে চরণামৃত তুলে নিলো আমাদের হাতে। মাতৃমন্দির ক শেষে বেরিয়ে এসে পোটা মন্দিরের চক্করে ঘুরিয়ে পড়লাম আমরা। মন্দির গা ভাস্কর্য শিল্পের নির্বাচন। দেখতে দেখতে সহসা এক হয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখি, সো অলকা, অনিন্দিতা, পরেশ, সুব্রত, টিকাই, নন্দন কেউ আমার সঙ্গে নেই, আমি এব দূপুরের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। আসলের গাছে পাতারা। বড় মোটা আ দুপুরীর মধ্যে পাতারা—সহসা কার পরশক্ষ চোখ ফিরিয়ে চমকে উঠলাম, একি! আ আপনি একা। রূপার রূপ মাধুর্য মন্দিরের গায়ে, ছায়ায় জলঝাড়ে, তার নরম না হাতের পেশী, ছলছলায়া শ্রেণীর অন্তরালে বাঙ্কিম দৃষ্টি, চোখে, গো-গো, কাঁধের ও ওকনো চুল। রূপা আমাকে এভাবে পেয়ে, চোখের গো গো খুলে হাতে নিল, ঠ ঠোঁট কাঁপলো, চোখের তারায় ঝিলা কাঁপি উঠলো ওমনে, বাঙ্ক, আপনি আমার অপেক্ষা করলেন কেন? আমি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে রূপার দিকে তাকালাম, আমি আপনা অপমান করেছি। এইরকম একটা অনুযোগ অবশ্য ঘর্ণাঘরে নীলকমলে উঠে করেছি

রূপা। রূপা বললো, আর একটা কবিতা কেন আপনি আবৃত্তি করলেন না তখন? ওহো, হাসি আমার মুখ চাহিয়ে উঠলো। তারপর অনেক বছরেই এইরকম ভাবে বলেছি, আমি লজ্জিত রূপা, আমি ভুলেই গিয়েছি আপনি অন্যরকম হবেন। কিন্তু সময়বন্ধু সময়বন্ধু কোথায়? রূপা হেসে বললো, আপনার সঙ্গেও যে কেউই নেই, মন্দিরের মধ্যে ততগুলো পলিশপ্ত মানুষ, হঠাৎ আমার চোখে পড়লেন, আপনি একা একা ঘুরছেন তাই আমিও হারিয়ে গেলাম। তবে রূপা হেসে আমার দিকে বিস্ময়ে হেসে তাকালো। আমি আস্তে হাসলাম, আপনি কিন্তু সময়বন্ধুর কথা কিছুই বললেন না। রূপার চোখমুখ চোরাল, সহসা দৃঢ় হয়ে গেল, ওটা হিপনোটিজম—তবে নামের পাশে ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো রূপা। আমি চমকে উঠলাম, বললাম এসব আপনি কী বলছেন? রূপা গভীর দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকালো। ট্রেনের কামরায় কথা বলবার অভ্যাস নয়—বলতে বলতে মাঝটা কিচু করে বললো, ওর ইচ্ছা চরিতার্থ হবে না বলে একসাথে ওই-ই টিকিট কাটে নি। আপনাকে তখন মিথ্যে বলেছিলাম। বলে আমার মুখের দিকে তাকালো রূপা। আমাকে ও দেখে নিয়েছে—রূপার ঠোঁট কাঁপলো, চোখ দুটো উঠলো ভুবি জলে ভরে—আমি রূপার মুখের দিকে তাকালাম। একটা অব্যক্ত কষ্ট ওর মুখের ভিতর যেন উথালপাথাল করে চলেছিলো।

রূপা সহসা হেসে বললো। আচ্ছা বলুন, এইসব মন্দিরের সেবায়তের কাছে নালিশ জানালে সমস্যের শান্তি দেবে তো। রূপা, এ কি অপরূপা হয়ে উঠেছে! তার চোখ জলছাড়ে, নাকের পাটা ফুঁসছে একটা মেয়ে—আমার মত মেয়ে। কত মন ভেঙে পারে জানে পারেন? অনুযোগের অন্ত নেই। আমার গলাটা একটু কাঁপলো, উত্তর খুঁজতে এলো মনে, বললাম ওকে এড়িয়ে কী চলা যায় না। তীব্র সন্তুষ্ট কণ্ঠে রূপা বললো, বললাম না ওটা একটা বিপত্তি। আমার মন তিন তিনটে মেয়েকে—। রূপার গলায় ঔদ্ধত্যে মুখ মেঘলো কঠিনত্ব বাড়ত হলো। ওর অন্তর অনেক টাকা, অনেক ইনফ্লুয়েন্স, তাই পর পর তিনটি মেয়ে নার্সিং হোম থেকে আমার বিনে এসে আর ফেরেনি। হতাশা আর বিস্ময়ে আচ্ছন্নিত রূপা। বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। আমার বিস্মিত কণ্ঠস্বর হঠাৎ আতঙ্কের ফুলকি ঘৃণায় মিশে বেরিয়ে এলো, তাহলে এসব জেনে শুনেও—রূপা আমার কথার মাঝখানে বললো, পাগল হয়েছেন জেনেশুনে কোন মেয়ে পা বাড়ায়! তাহলে। বিস্মিত প্রশ্ন করলাম আমি। আপনার বিবি জানাইবেন এসব কথা জানেন? রূপা মান হেসে বললো, কেউ জানে না। আমার তবে কণ্টকিত করলার রূপাকে। সবাইকে বলে দিন এসব কথা—। রূপার গলায় আবার তপ্ত দানা বাঁধলো, ওরে কাপুরুষ ও যে মেয়ে। আমি রূপাকে অভয় দিলাম। আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন, বলে ব্যাপারটা তরল করার জন্যে বললাম, আপনি ওকে সত্যি যদি সহ্য করতে না পারেন তাহলে মেলা বন্ধ করে দিন, ওকে বিদেয় দিন। ওকে দেখে আমি যতটুকু বুঝেছি, একটা পাগলকে ওরে দুর্বল করে তোলেছে। ওকে আঘাত করলেই পালাবে। আমার কষ্টস্বর দৃঢ় হয়ে উঠেছে দেখে রূপা যেন খানিকটা বিশ্বাসস্থ হয়ে আমার দিকে তাকালো। সহসা সে চোখ নামালো। আমি হেসে বললাম, এ আর এমন শক্ত কাজ কী। রূপা সলজ্জ নরম সুরে বললো, ভালোবাসার মহাপাপ ক্ষমা। বলে তার দীঘল চোখ দুটো আমার মুখের ওপর রাখলো। আমি মুখ নামিয়ে নিলাম। এ যে তাল কেটে যাচ্ছে, তখার সঙ্গে চালচলন মেলে না।...

এমন সময় নীলকমলের ডাক শুনে চমকে উঠলাম। তাই তো, ঘড়ি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখেই ত্রস্ত পদে পা চালিয়ে চলে এলাম যানের পরাজয়। গেছনে রূপা। দেখা, অনিন্দিতা, অলকা, সুব্রত বসে আছে যে যার সিটে। রূপা গিয়ে বসে পড়লো তার নির্দিষ্ট সিটে। সময় আর অন্তর তখনও ফেরেনি। সবুজল ড্রাইভকে ডেকে বললো, কোথায় গিয়ি? ওরা তোকে খুঁজতে গেছে। নবন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, অদ্রি, তুমি ঘুরিয়ে গেছলে? আমি হেসে বললাম, না অদ্রি। পরেশ সুব্রতর দিকে চেয়ে এতক্ষণ পর হাসলো তারপর অলকার দিকে তাকালো। দেখা আর অনিন্দিতার চোখ চাওয়াচায়ি হলো। পরেশ আমার অনেক কাছে মুখ নিয়ে বললো, চেটো কোথায় হলো ওর? আমি হেসে পরেশের দিকে তাকালাম।

নীলকমল গর্জে উঠতেই সময় আর অন্তর ছুটতে ছুটতে এসে বাস ধরলো এবং সিটের কাছে এসেই সময় ঘড়ির সচিন্ত দৃষ্টি মেলে রূপাকে দেখলো। তারপর আমার দিকে চোখ ফেরালো। তার সেই নরম করুণ চোখ দুটো কঠোর আর নির্মম। মুখে যেন কথা নেই। অনির্বাণ ব্যানার্জীর গলায় আবার 'নবন কানন' নামের একটা ভাষণ কথা ভেসে এলো। কলিংবেল টেপা সেটার ছেড়ে পুকুরে পড়ে, ছেড়ে নির্মীয়মান তৃতীয়বেষ্টনের বুক চিরে ছুটে চললো নীলকমল। ঝিলাল এলাকার বুকে নির্মীয়মান অট্টালিকা, মোকলপল্লী ইত্যাদি পেছনে ফেলে ; সময় না কাল জানল, কেউ কারো কথা বলছে না। পরিচয়ের করার তাল এগিয়ে চলেছে—ঝিরে ঝিরে পাকের রাস্তা ছেড়ে লালকে মাটির সড়ক ধরে ছুটে চললো নীলকমল। এবার একটা অদ্ভুত প্রেমের কাহিনী শোনাবে অপনাদের—প্রবীণ আর নিশ্চয়। নিশ্চয় প্রেম। কাঁপা কাঁপা গলায় অনির্বাণ ব্যানার্জীর চোখে মুখে গভীর বিস্ময়। আমি চকিতে রূপার দিকে চোখ ফেরালাম। রূপার চোখেমুখে সংশয়। মো-চেয়ার আকাশে অদ্ভুত আকৃতি। নিশ্চয় কেন উচ্চ নির্দিষ্টত নিশ্চয় মেয়েরাই দানবী নয়, অমলের মিত্রে—অদ্রিনী, আর প্রবীণ, সে এই নবন কাননের শ্রেষ্ঠা অর্থনকারি তথ্য মিত্র আর। উত্তরোই মুক্তক এবং মুখটী। নিশ্চয় হঠাৎ একদিন কোন গভীর জঙ্গল থেকে হিংস্রক বেরিয়ে এসে ঢুকে পড়লো, এই নবন কাননের এলাকার মধ্যে। তারপর ধীরে ধীরে নবন কাননের নির্মীয়মান বিরাট সত্রোতের পাশাপাশি, পাশি, পশুর পাশাপাশি সন্ধ্যারহস্য দেখতে দেখতে চকিত চমকে প্রবীণের খাঁচার পাশে এসে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ প্রবীণের বেরুদণ্ড সুন্দর সুগঠিত চেহারা দেখে অভিভূত নিশ্চয় ; প্রবীণের খাঁচার নিম্নেষের পাঠিত ভেসে আসিয়ে পড়লো একেবারে প্রবীণের সামনে—যেন নিজেকে করলো কিন্তু প্রবীণ সে পুরুষ—বাইরে তার করার ধর্ম। যেকেবারি তাই, প্রবীণ এই অনন্তে যেমনকে উপেক্ষা করে তাড়িয়ে দিতে চাইলো তার এই প্রবৃত্তিকে। তাছাড়া সে বিস্মিতে এবং একটী সন্তানের জনক। নবন কাননের কর্তাব্যক্তিরা প্রমাদ গুণলেন। রূপ কথার কাহিনীর মত ছোট্ট কাপারটা তাদের কৌতূহলিত করে তুলেছিল সেদিন। কিন্তু সব দেখেশুনে নিশ্চয়কে আলাদা খাঁচায় স্থান করে দেওয়া হলো—এবং অন্য একটী রয়াল বেঙ্গলের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো নিশ্চয়কে। কিন্তু নিশ্চয় নারাজ। তার প্রেম, তার ভালবাসা, তার দেহ সে উৎসর্গ করেছে প্রবীণকে অতএব—নিশ্চয়র কাছ থেকে সরিয়ে আনা হলো সেই বাঘকে—নিশ্চয় এখনও খাঁচায় বন্দিনী—সে খেতে চায় না কোথাও—প্রবীণের প্রেম উপেক্ষিত প্রবল খাঁচার মধ্যে থেকেই নিজেকে নিজেকে দান করে চলেছে—অদ্ভুত প্রেম ; চমৎকৃত নবন কানন। নিশ্চয়কে দেখে নতুনমন কৃত্য করুন। ঘোষাজিত হৃদয়ে অনুভূতি মিশিয়ে রাখতে চেষ্টা করুন নিশ্চয় নারী জীবনের, তার প্রেমের, কর্তব্যের তার সন্তানের কথা। প্রবীণ বেঁচে নেই, বেঁচে নেই প্রবীণের স্ত্রী কিন্তু বেঁচে আছে নিশ্চয়—বেঁচে আছে প্রবীণের সন্তান। প্রবীণের মৃত্যুর পর প্রবীণের সন্তানকে একদিন নিশ্চয় খাঁচায় পুরে দেওয়া হয়েছিল। ও যে প্রবীণেরই ঔরসজাত সন্তান,—এই ছোট্ট অঙ্গ প্রেমাঙ্কিত প্রেমোপাখ্যান—নীলকমলের প্রতিটি যাত্রী অনিন্দিতার মুখের ভাষা নেই, চোখের পলক ফেলে নিল বেন। এমন সময় নীলকমল এসে দাঁড়ালো নব নির্মিত নবন কাননের প্রধান ফটকের সামনে। বাস থেকে নেমে, টিকিট কেটে সবাই একসঙ্গে ঢুকে পড়লাম আমরা। আমার পাশে দাঁড়িয়ে রূপা। তার চোখ মুখ গভীর, সাপের ফার বিষাক্তিত কণ্ঠে স্বাভাবিকতা। বাস—আপনার সত্যি বলে মনে হয় প্রবীণ-নিশ্চয় এই প্রেমের কথা। জানি না, তবে বিশ্বাস না করে উপায় কী—মনে পড়লো সখী, তো অনিন্দিতা বলে মনে হয় কিন্তু দেখার পর—। নবন ছুটে এসে আমার হাত ধরলো, রূপা, সাদুক্তা, সময় আর অন্তর এগিয়ে গেল মুচকি হেসে "আসুন"। আমি "আচ্ছা নেচ্ছে সায় বিলাম। অনিন্দিতা হেসে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। কেন জানিয়ে হেসেছেন। আমি অনিন্দিতার মুখের দিকে তাকালাম। এতক্ষণ পরে তাহলে কথা ফুটলো। অনিন্দিতা চোখ তার করে দাঁড়ালো। এই আমার বন্ধু-অন্তর। অদ্রিতে একসঙ্গে যেখানে হৈচৈ, হট্টা আর আড্ডার মাঝে মেতে উঠি, আজ বিশেষ বিস্ময়ে দৃষ্টিনের আনন্দ করতে এসে—।

সুব্রত চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। নবন বিরক্ত করছে চলে না আপি। পরেশ আর সেবা নীলকমল থেকে নেমে তার মেয়েকেকে ট্রাম থেকে দূর ঠেলে ওওয়াচ্ছে। মাথার ওপরের সূর্য তখন পশ্চিমে হেলেছে। রোদ আছে তবে তীব্র নেই। ছোটর দুধে আরও কয়েকজনের দর্শনার্থীদের ভিড় দাঁড়িয়ে। সকাল বেলার দর্শনার্থী থেকে বেরিয়ে—এর একটিজন এক এক জায়গায় কখনও মিলিত হয়েছে আবার ছাড়াছাড়ি। নবন কাননে, হরেক রকম নওলক্ষিকোরী যুবতী, যুবক ঘর বেরও-এর দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

হাতি তাঁর তুলিয়ে খাবার খাচ্ছে। বন্যজন্তুদের ঘর চলেছি আমরা। কারও মুখে কথা নেই, হাসি নেই বিস্ময়ের ঘোর আছে মন। যাহ, আমরা কাউকে চিনি না, জানি না, কোনদিন পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। দীর্ঘ অরোহরে পথি, নানারকম জাতের হরিণ, কুমারের গাণ্ডারি সাতাশরা, ভালুক, হনুমান। সব ঘুরে ঘুরে দেখে এলাম সিংহের খাঁচার সামনে। একটী খাঁচায় একাধিক সিংহ—চিত্র আছে, কিন্তু কোলকাতার চিড়িয়াখানার মত আমন ওরোল প্রত্যেকটাতে না—ভিড় করে দাঁড়িয়ে অনেকে। বলে সুন্দর খাঁচায়

অন্যান্যের স্বর্গ বিজয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেউই জানতে পারল না আমাদের সাড়ম্বরে উপস্থিতি। অনির্বাণ সবার সঙ্গে আমাকে আবাহনে—। পঙ্কিলতলের পঞ্চায়েতের সামনে এসে দাঁড়ালাম। একটা অসুস্থ মানুষকে নকল জানলের তরীরা একটা জায়গায় রেখে মানুষের মুখটা মুটো করিয়ে সাহায্যে ঐ অবিকল মুখ মানুষের পালকতক মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে যন্ত্র একজনের ছোট লাঠির সাহায্যে। কী ব্যাপার, না—মানুষের নিজের খাওয়ার ক্ষমতা নেই;—সে অসুস্থ। অবজেক্টিভ পরিস্থিতি! অবশ্যেষে আমরা ঘড়ির হোমার নকল জানলের বিস্তারে স্বর্গ নরিমা শিখর পাঁচায় সামনে। শিখও অসুস্থ। অনির্বাণ বলছে, ওকে ইঁট মেরে ফাঁক যেন মাথের উপর একটা গর্ত বানিয়ে দিয়েছে—সে যা ওকোচ্ছে না, ভিতরে ভিতরে ও দুর্বল হয়ে পড়ছে। ওরা আছে শিখ—স্বর্গমিয়ার অভিযাত্রী, পর্বতারোহণের মিত্র ঘুচিনি আজও জমায়িতে শিখ যখনকার বিমানস্তরে সৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। যার প্রেম, যার ভালবাসা; যার ভালো এই অন্ধিতের জন্যেই শুধু নির্বাসনেই রেখে গেল পঙ্কিলতলীর পঞ্চায়। আমি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে, তাদের প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য করলাম—সকলের মুখেই বুঝি চক্ষুনিমাদল ফাটতে আছে। অনির্বাণ ঘাবাবাদী বলছে, এই দেখুন, এখান থেকে শিখা কাঁপিয়ে পড়েছিল এই পঞ্চায়—গাঁচিল অনিবার্যটা ভেঙে যাচ্ছে। একেবারে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা হয়েছে। শিখ যেদিন জাগবে না, সেদিন ভাসা সিমেন্টের এই পত্রের ছাপটা আর কীর্তি বহন করবে। মহিমাময় হয়ে আছে শিখ। নকল জানলের পক্ষ থেকে সেই দেওয়ালের পাশেই খোদাই করে দেওয়া হয়েছে শিখর এই নকল জানলে এসে পঙ্কিলতল পঞ্চায় লাফিয়ে পড়ার দিনক্ষণ। অনির্বাণ বলছে, শিখ নাম এখন ছেলেই দেওয়া। এমন সময় তাকিয়ে দেখি রূপা, সময়, অজয় আর সবুজরা দাঁড়িয়ে। রূপাও তাকে ছিল : হেডফিট। দিনের দেখ তাদের সূর্যের নয়ন সোনালী কিরণে রূপার দেহের লাবণ্য...রূপা চেয়ে আছে উপ্ত হয়ে ফল, মানুষের ওপর ফট, চোখের মুখমান দৃষ্টি, ভোরাকাটা শরীরের অবলম্বনের অবশ ক্লান্তির দিকে...।

রূপা বলেছিল, ভালোবাসা মহাপাপ বাবা...প্রবণহিতে নীলকমলের বিয়ে যাওয়া প্রতিটি মহীর মুখে বিমানের ছায়া, স্বপ্নের বিষণ্ণ নিঃশ্বাস। কারও মুখে কোনও ভাষা নেই, দৃষ্টি উদাস। ছেলেরাই শিখর স্বপ্ন কোন ফাঁকে আমাদের অজিযাত্রার টানাটানি ওপ হয়েছে। নকল জানলের হিয়া ঘোরানোটা স্বপ্ন, শিখ—। নীলকমলের চাকার মূর্তির শপথ। অনির্বাণের মুখে উষরগিরি, খণ্ডগিরি পর্বতের শেষ অভিযান। চলুন উষরগিরি, খণ্ডগিরি। মসৃণ পিচের রাস্তায় দু-ধারে সু-বিন্যস্ত ছোপ ছোপ মাঠ। অদূরে ভুবনেশ্বরের সর্বত্র সারি নতুন বাড়ি সূর্যের নিমেষিত রশ্মির আলোয় মনোরম...ঘুমের আবাসে নীল বরফের ছটার লাগছে আরো, ঘুমের নীলকমলের জানালা পাশে আসছে ঘরতল। রূপা আমার পাশে। শিখর স্বপ্ন তার চোখে মুখে ক্লান্তির প্রহরের স্পর্শ করেছে। সবুজরা চেয়ে আছে জানালার বাইরে। সময় আর অজয় নিজেদের মধ্যে কথায় ব্যস্ত। লোক ছেলেরা ছেলেদের প্রথম শাড়ির বর্ষণে চোখ দিয়ে বুকের সঙ্গে ছেপে রয়েছে। পরেশ অন্যমনস্কে চোখে যেন পুলকিত। সুব্রত আর অনিমিত্রা কানে কানে কী সব বলছে। অনিমিত্রা চোখ মুটো ঢুলে পড়ে যাই, মরে যাই আমার জানালায় চোখ দিয়ে শিখ শিখ যাচ্ছে। অনেকের চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। নকল আলোর আলো ফলে। টুকাই সানালার মুখ বাড়িয়ে।

অজমকা নীলকমল এসে পাঁচায়ের উঁচু উঁচু নাম না জানা গাছের ছায়ায় আর ঘুই পাহাড়ের মাঝখানে। ছেলে তখন পাহাড়শ্রেণি, আর ঘুই পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে আরও কয়েকখানা বাস পাঁড়িয়ে। বাস ভর্তি ছেলেরা নেমে গিয়ে উঠেছে পাহাড় ছেয়ে। কেউ কেউ রাস্তার ধারের দোকানে ঢুকে চা, সিগ্রি ছেলেরাকোলা খাচ্ছে। আমি ঘর্ণার পরে ওপরে। আমরা ও নীলকমল ছেলে নেমে এলাম পাঁচের রাস্তায়। আমাদের পুরিয়ে পাঁড়িয়ে অভিজ্ঞ উষরগিরি, খণ্ডগিরি। উষরগিরি পাহাড়ই। চূড়ায় ভৈরবদেবের মন্দির। খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমরা উঠে এলাম মন্দিরের চাতালায়। মন্দিরের দরজা খোলা। ভিতর কালো পাথরের খোদাই করা ভৈরবদেবতা—ত্রিনয়ন। মন্দিরের পেছনে চাঁই চাঁই কালো পাথর সুবিন্যস্ত করে সাজানো। সবুজ আর আর নাম না জানা পাহাড়ের পাতার ফিরি ফিরি হাওয়ায় কিছুক্ষণ আগেই আমরা খুব সাবধানে নেমে এলাম আমরা। খণ্ডগিরির বুকের উপর দিয়ে চওড়া রাস্তা একেবেঁকে সমতল বৃমি ছুঁয়ে উঠে গেছে চূড়ায়। চূড়ায় নয় যেন বিরাট একটা স্থান—তার মাঝখানে বিরাট কাঁচান—ছেলেরাই এই বিরাট কাঁচানের জন্যেই এর নাম হয়েছে খণ্ডগিরি। পাহাড়ের ওপর আমাদের মন্দির ফিরে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—আমি, রূপা, অনিমিত্রা আর সুব্রত, পরেশ এবং লোক ছাড়া উপরে কেউ নেই। ওদিকে নকল আর টুকাই আমাদের ফেলু পথ ছাড়া নামতে শুরু করেছে। তা ছেলে লোক আর অজয় ফিরবার তরে উঠেছেই আমি আর পরেশ ঘুটি ছেলে এলাম ওদের সাথবাদে নিজের নিজে ছেতে। নীলকমলের ছায়ে এসে দেখি রূপা সবার সাবধানে আর অজয় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কোন ফাঁকে সেই লোহার জালের ছেটিত ফাঁকার বন্দিনী শিখর বিমানস্তর স্বর্গ ছেলের হাতাকার যেন আর্তনাদ করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো কাছে। আমি তখনি নিচে ছেখ ছেবাদাম...।

ট্রেন যখন আমরা ছেখা হবে। চেঁচিয়ে চলছে উচ্চস্বরে। আরো। এ যে সেই বর্ণনার। সমুদ্রের উত্তাল গর্জন ঢেউ আর টানাটানি জলে ছেত বলাবার ডাঙা। আমরা কর্ণধারে পৌঁছে গেছি। আশ্চর্য। নকল ইঁটতে চাইছে না। ঘুমে ঢুলছে। টুকাই পরেশের কোলে। আমরার ছেরে পরেশের ঘাসটি স্থান। সুব্রত আর অনিমিত্রা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। অজয় নীল আকাশের নেলায় মানুষের বন্যা ছায়া উল্লাস। লোক বলছে একটুও ছেলে নিল না ছেলেটাকে। অজ্ঞ আমার আগল ঠেলিয়ে ঠেলিয়ে বন্ধ। বিদি আপনি তাকাচ্ছেন কেন? ওইটুকু পুঁচকে ছেলেকে আমরা টিকিনে সামলাতে পারবে না। অসংখ্যির ছেলে তো অজ্ঞা নেই। পরেশ ধমকে উঠলো, এক কথা অবজ্ঞার—ভাল লাগে না। চুপ করে যেতে। লোকও গর্জে উঠলো, এমন জানলে লটো আনতাম না। আমি তো আসতে চাই নি। সুব্রতরা, অজয় আমাকে দেখিয়ে বললে ওঁরা সাথে নিয়ে রাজি অজিযাত্রে। পরেশ বললো, তুমি আজবে। আমরা তাড়াতাড়ি লোকার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, নিন ওকে আমার কাছে নিন। ছাপটা কর: আপনি নিন। অমনিই লোক কোল থেকে ছেলেকে আমাদের কোলে তুলে দিল। উফ: হা মুটো একেবারে অবশ হয়ে গেছে। আমি মুটো হাত ঝাঁকিয়ে ঠিক করে নিতে চেষ্টা করলাম লোকা। বাসার ফিরে আসে একটু যা আছে। আমরা বললো, তাও তো নিজেকে করে নিতে হবে। অনিমিত্রা সৌজন্য বজায়ে না। একটু পা চালিয়ে চলুন। সামনের পার্কিং জন্যে রিক্সার কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে রিক্সার প্রয়োজ ছিল। লোক বললো, আমি আমি রূপ ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারবে না—গিয়ে যে ওকে পড়বেন। আমি ছেলে বললাম, যা খুশি করবেন, আগে চলুন গিয়ে ব্যাঙির ে হই। এমন সময় আবে এই যে আপনারা, কী ব্যাপার ছেলে নিয়ে এলেন? যা ওপরে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। পোহনে পরেরা। আগে বলবেন তো আমাদের বলে পরা আমাদের আমার দিকে। পরার পরনে টেনিসে লাল সিল্কের শাড়ি, সিথে ছাটিয়া, তান হাতে ঘড়ি, সিঁথিতে সরু করে সিঁদুরের টিপ, কাঁধে ব্যাগ। রূপার পরনে পাঞ্জাবি। আমি ছেলে বললাম, কাল ঠিক থেকে বাসার ফিরে ব্যাঙির হতেই যে নীলকমলের এমেন্সী হাঙির এবং পাকা কথা পাকা ছাত্র হাসিল। পরার দিকে কি তাকালাম, আপনাদের কথা আমার আমার মনে হবেছে। রূপার ছেলে বললো, আ মশাই একটা বারণ খবর দেবে মনে আমি আর পরা আপনাদের খুঁজে হয়রান। যে কাকার নিয়ে ওনি আড়িংতলা বলছে, আপনারা নীলকমলে পাড়ি জমিয়েছেন। ছেলে ছেখানে কাকুন, আমার ওনারই ছেখা—একবার গিরীকে দেখতে পারলেই যা পরা আর রূপার চোখ মুটো স্থির হয়ে বললো, আপনাদের সঙ্গে একসময়ে খে খুব ভাল হয়েছে। অজয়া বললো সে তো ঘটেই, তা কোথায় ছিলেন মন্দিরে? রূ ছেসে বললো, হাঁ। তারপর নিজের পোষাকের দিকে তাকালো। অজয়া ছেসে বলে বারণ বারণ কথাগুলি সেই বারণ কথাটা নিজের ঠোঁটে লুকে নিল—আমিও বারণ খ একটা বিদ্যি—আমি যে হোটেলে এসে উঠেছি সেই ছেলেটলোর এপর তলায় আছে সেই চক্কচক্কি—এর পরের খবর যেমন ঘটবে জানবেন, আমে পরেশের দিকে তাকাল চলবার। আরলার ছিত কেটে বললো, ইস আপনারা ছাত্র, আমার দিয়ে বিদ্রূপ করু কিন্তু সুব্রতবাবু পরেশ বললো, ওরা এতক্ষণে বাসায় পৌঁছে গেছে। আমি পরে মুখের দিকে ছেয়ে বললাম, আমার তাছেও বারণ খবর আছে। ছেব।

ছেলের সকলের হাওয়ার মুখ পরা এবং পরিবেশ অন্যান্যে আশে চটপট ভরা পারে বিছে আরো জমিয়ে আছে। ছেলেদের পরনের চটির ফটাং ফটাং শব্দের স বাদল ঝিমকে ছোমরে পারার একাকার। আমি আর অজয়া হেঁটে চলেছি সেই ভি বালির পরির ওপর ওপর পা ফেলে। সমুদ্রের ফুকে ঢেউ, পরনে আর ফুয়াশার ধোঁয়া-ধুকের পরল ঢেকা মাছের নৌকা ঘুলছে। আকাশের বুকে মেঘেরা আন্তরল। জারণ জলপরার ঝলিতে পা ডুবে আছে...আমার ঢেনে তুলে হেঁটে চলেছি দু-জনে। স সৈকতে আমাকে ছেড়ে বারণ ভিড়। লোক যার পরেশ সঙ্গে টুকাই আর নকল একল হাঁটছে। অনিমিত্রা আর সুব্রত ঘেঁষিয়েছে। আরা ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেছে। সমুদ্র ছেই, সৈকতে এসে আমার কয়েই শা শা ছেখে আমার নেমে যাচ্ছে ঢালুতে, আর ফুলে ফুলে ফুট এসে আমার কাছে—আমার ছেখের পরনে জড়িয়ে ছেলে; ছে ছেন রূপি রূপি ঘুই ফুল হয়ে যাচ্ছে, ঘুই ফুলের মালা হয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে ছ পথ ছেয়ে যাচ্ছে—আহা কী মনোরম। এক এক সময় এক এক রূপ মনুষ্যের। আমার

দিকে মুচকি হেসে তাকালাম, অলকা, শেষ, আছে এসো। কী গভীর আকুতি মেশানো আমার কণ্ঠস্বর। অলকা কেন কিনাস করলো না, ভাবলো ভাজলামি করছি। অলকা ঠোঁট উল্টে আমার দিকে তাকালো। আমি হেসে বললাম, তোমার সঙ্গে যদি প্রেম করতে আসতাম, এখানে, তাহলে কিন্তু তোমার তাকানোর প্যাটার্নটাই অন্যরকম হতো। অলকা অভিমানে মুখ ভারলো, ঠোঁট, তোমার মাথার কী চাপলো! আমি এগিয়ে গেলাম অলকার কাছে, এখনও যখন তোমার সাতাশ হয় নি, এ বয়সে অনেক মেয়ে চোখ চোখ করে বেড়াচ্ছে। আর তুমি যাই বলবে মুরির মত কথা বলছো। আচ্ছা, তুমি কিছু অনুভব করছো না? অলকা এবার তাকালো আমার দিকে, চোখ পলকশূন্য চোখে ছাকুল তৃষ্ণা। আমি হাতজোড়ি দিয়ে ওর মুখ ধরলাম। জানো, অলকা সারাজীবন অপেক্ষার শেষে আমরা এমন হাতে গোনা যে আমরা মানুষ এ কথা বুঝেই নেই। সব সময় সংসার, স্বামী, বড়-বান্ধব কথা—কিন্তু জীবন তো তা না। চোখের পাতা ভারি করে অলকা আমাকে দেখলো, বললাম, সত্যি কিনা বলো? অলকা বললো, সত্যি তুমি ঠিক বলছো, জানো, আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আজ—মনে হচ্ছে, নজরুল আর টুকাইয়ের মত দুটোচুটি করিওই জমির বিছানায়—তবু তুমি আর আমি—। আমার গলার স্বর ঠেলে ওঠে—অলকা, বিশ্বাস করো তোমার মনে হচ্ছে না, অলকা ভাল বিছে বললো, হচ্ছে, কী অদ্ভুত তাই না! হ্যাঁ, সত্যিই অদ্ভুত—বলে হেসে উঠলাম।

হঠাৎ প্রশান্ত আর শান্তাকে চোখে পড়লো। অলকা চমকে উঠলো। যেন বিরাট একটা অন্যায় করে লজ্জা পেয়েছে। শান্তা হাসলো, সেই মিষ্টি মধু মধু হাসি, কী হচ্ছিল? আমি হেসে বললাম, যেন কল্পছিলাম। হি হি হি ঘরে হাসলো শান্তা। অলকা আমার দিকে চেয়ে চোখ পাকালো। আমি আড়চোখে অলকার দিকে চেয়ে প্রশান্তকে বললাম, একটু প্রেম করছিলাম...ঝড়িতে কিছু হেলে, তারপর অফিস, নুন, তেল, আটা, পটল। এখানে এলাম তাও এক ঘরে দু'জন—কিন্তু এই সমুদ্রের পাড় যদিও নির্জন নয় তবুও উপযুক্ত জায়গা বলুন। প্রশান্ত হো হো করে হেসে উঠলো, তারপর শান্তার দিকে ফিরে বললো, কী বুঝলে। শান্তা চোখের তারা ঘুরিয়ে প্রশান্তর দিকে তাকালো।

হাঁটতে হাঁটতে প্রশান্ত বললো, এই আকাশ, এই আকাশ তারপর একটু থেমে বললো, খুব খারাপ। আকাশে মেঘ করেছে, সূর্যোদয় দেখা যাওয়া হবে না। বলে ঘড়ির ঘড়িতে ঘড়ি দেখলো, প্রশান্ত। এই যা সূর্যোদয় পল মটে। আজ আর হলো না দেখা, তোমাকে সূর্যোদয় দেখাবো বলেছিলাম। খুব আবেগ দিয়ে কথাটা বললো, প্রশান্ত। শান্ত আহা—রে মনে পাড় মুখে মিষ্টি রসের রেখা ফুটলো। আমি অলকার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, তুমি মুখের ভাবখানা ওরকম করতে পারো না। অলকা চোখ পাকিয়ে তাকালো। এমন সময় আমির চরে দুটো পাঁচ নরা উঁচি দিয়ে যেন আমাদের দেখে হাসলো। তাড়াতাড়ি পাঁচ নরা দুটো কুড়িয়ে নিলাম, ওগিকে প্রশান্ত কিংবা হয়তো প্রশান্তর পকেট থেকে পড়ে থাকবে। শান্তা হেসে বললো, আপনার দাদা টাকার একটা চেন ফসকে গেল। আমি হেসে বললাম ফসকাতে দিচ্ছি না—এই নিন ধরুন, আপনি একটা দিন সমুদ্রের কূলে ঘুঁড়ে, অলকা একটা দিক—। শান্তা পয়সাটা নিয়ে খানিকটা চলপুতে মেলে ছুঁড়ে চলে এলো ওপরে—আর অলকা আবেগে আপ্লুতা হয়ে কেন খানিকটা নিচে নেমে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ঢেউ তাদা দেখছিল—এমন সময় কোথে একটা ঢেউ এসে লাগলো আর হাঁটুতে। ভয়ে চিৎকার করে অলিয়ে ওপর ভয়ে পড়লো অলকা। ঢেউ তখন ওর মাথার উপর ফণা তুলে ছুঁসছে—।—অলকা আতঙ্কিতে ভাকুল চিৎকার ধ্বনিত হলো আমার গলায়! লাফিয়ে ওর একটা হাত চেপে ধরে তুলে নিয়ে এলাম উপরে। ঢেউয়ের ফেনায় দুই শরীর মাখা তখনকে ধড়াচে পড়াচে মেলে এসে চলুচে...চালুচে। প্রশান্ত হেসে বললো, এটা নোট করে রাখবেন। স্ত্রীকে ভালবাসেন কিনা—তবিষ্যতে কাজে লাগবে। শান্তা বললো, তোমাকে জেনাতে হবে না—উনি তোমার চেয়ে বেশি জানেন। অলকা বললো, কত ভালবাসেন আপনার বন্ধু। আমি হেসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বললাম, আমার ভালবাসা এই সমুদ্রের মত উত্তাল, সমুদ্রের মত গভীর—আর সমুদ্রের মত সীমাহীন—বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গেলাম। আমি বলি হলে নজরুল ছুটে আসছে এদিকে। পেছনে টুকাই, সেখা আর পরেশ। সেখার কোলে মেয়ে। নজরুল আর টুকাই একরকম টানাটে টানতে এসে হেলিয়ে হলো। তাদের সারা গায়ে মাখামাখি জমি। পরেশ বললো, মুজনে মিলে জমির ঘর বানাচ্ছিল, আর তারপরে। সেখার গলায় অনুযোগের ঘর জমিয়ে হলো, এমন যজ্ঞ হচ্ছে মুটিতে কথা শুনতে চায় না—সত্যি এমনটি দেখিনি। প্রশান্ত হেসে বললো, একেবারে চাকুল—বলে পরেশের দিকে চেয়ে বললো, মুরুতবাবু আর বলিনিয়ম দেখিকে তো দেখছি না। পরেশ শুকনো গলায় বললো, ওদের এখন আপনাদের মত হয়, উড়ে বেড়াচ্ছে আর শান্তার দিকে তাকালো। শান্তা আর পাড় চোখ মুটিতে সবমের আভাসের মত নরম হাসি ফুটিয়ে বললো, আপনারা যেমন কথা। প্রশান্ত বললো, ওনেছেন তো। অলকা পারবে না। বলে একটু ঝেড়ে মেয়েদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে বললো, তোমার কেন যে ভালো ভরতে পারছে না। আমি উচ্চ শব্দ ভরে বললাম, ধীরে ধীরে পরম হয়ে যাচ্ছে। সেখা অলকার বেন এইরকম ভয়ে দেখতে পেল। তাই তো, তুমি কী ভেন করলে অলকা? অলকা কোন উত্তর না দিয়ে লজ্জিত দৃষ্টির মোহার চোখের পাতা ভারি করলো। প্রশান্ত চিৎকার করে উঠলো, চান নয়, সমুদ্রের ঢেউয়ে উনি আটকে পড়েছিলেন, উনি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছেন তার স্বামীর চেষ্টায়। কিন্তু বলে পরেশের দিকে চেয়ে বললো, নায় নেই। নজরুল ভাব ভাব করে তার মানের দিকে তাকালো। কিন্তু শান্তাটা কিছুই বুঝতে না পেরে অলকার দিকে কাপড়ের দিকে চেয়ে বললো, মা, তুমি চান করেছ? অলকা হেসে বললো, হ্যাঁ আছি। নজরুল বললো, আমি সমুদ্রে চান করবো না। টুকাই চিৎকার করে উঠলো উরে বাস—কী ঢেউ—সত্যি একটা লাজুক উত্তাল ঢেউ এসে আমাদের পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিল। শান্তা আর অলকা চমকে উঠে কলাতে সরে যেতেই বলে পড়লো, ইস কী সুন্দর ঝিনুক দেখছ বলে লালচে ধরনের কয়েকটা ঝিনুক মু-জনে কুড়িয়ে নিল। প্রশান্ত হেসে বললো, নিয়ে যেতে যাও। পিয়ে কয়েকটা খানাডি হয়েছে, দুপুরে খেলে দেবে। শান্তা কপট রাগে ঠোঁট উলালো, আমার কয়ে গেছে। আমি হেসে প্রশান্তর দিকে তাকালাম। প্রশান্ত হেসে বললো, একটা সামান্য কাজ আমাকে বলা, তাতেই যদি আপনি ভেবে নেবেন মেয়েদের ভালবাসা উচিত ভিন্ন। পরেশ হেসে বললো, যা বলেছেন। এমন সময়, "তোমার আমি চোখে বেখিনি, তোমার অনেক গল্প শুনেছি"। গান ভেসে শান্তা আর প্রশান্ত হেসে উঠলো। সেখা আর অলকা চোখ টিপে হাসলো, পরেশ বললো, চল, আজকের হো বিউপস আনবে, দেরি হয়ে যাবে না হলে আমার দিকে তাকালো। সেখা অলকা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। প্রশান্ত বললো, মন্দিরে যাবেন পূজা দিতে? কেন, তাহলে আর দেরি করবেন না—আমরাও ছেতে পারি—। হলে শান্তার দিকে তাকালো। জানেন, আপামীকাল সবাই আমরা কর্মীর, কোনারক—আমি গভীর চোখে শান্তার দিকে তাকিয়ে বললাম, নজরুল কবলে নিজাকে দেখে আসবেন। শান্তা পলকে চোখে তাকালো, নিশ্চয়, নিশ্চয় কে?

অলকা বললো, বাঙালীর প্রেম। দেখে আসুন, আগে বলে দিলে চার্ম থাকবে না। শান্তা প্রশান্তর দিকে তাকালো।

পরেশ বললো, তাহলে আমরা একা চলি। বলে সেখার দিকে চেয়ে বললো, রমাবন্ধ্যা করে রেখেই তো যাবে। অলকা বললো, তাই ভাল, অত দুপুরে এসে আর রান্না করা যাবে না। দুটো স্টোভে চাপিয়ে দেব, হতে আর কতক্ষণ! শান্তা বললো, রান্না করার ঝামেলা অনেক।

সেখা বললো, ঐ ঝামেলার ভয়িয়ে ছেড়েই তো আরও গোলমাল। তা শুনে প্রশান্ত হাসলো। তারপর আকাশের দিকে তাকালো, না সূর্যোদয় আর দেখা হলো না—বলে ঠাঁদে মোলালো আদেরের হাত ধরে শান্তার দিকে চেয়ে, চল—বলে আত্রমের দিকে চেয়ে হাসলো।

সেখার কোলে মেয়ে। সে আগে আগে। তার পাশে একটু পেছনে অলকা। নজরুল, টুকাই দুজনেই ছুতন্ত্র। আমার গলাটা চকিতে ভারি হয়ে এলো, জমিয়ে পরেশ, ও বলায় মেতে আমার আর মোটেই ভাল লাগছে না। পরেশের গলায়ও ভারি। সে আমার মুখের দিকে তাকালো, ঠিক এরটা হবে আমিও ভাবিনি। সত্যি আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। আমি পরেশকে বললাম, সুব্রত কী যে বলো, কেন যে এরটা রাগ হয়ে উঠলো কে জানে। পরেশ কোন উত্তর দিল না। জানবিয়ের শ্রাপনের পরে চোখ পড়লো। ছেলেটার চরে একটা গভীর গীরবতা। শ্রাপনের চুপ্রিত আগুন। লক লক করছে আগুনের শিখা। শিখার মাথার কাচের ধোঁয়া। পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে বাতাসে মিলে যাচ্ছে। ঠাঁদ ভাজা চুকরে চুকরে উড়ছে। অদূরে প্রশান্তর সাথা পাড়াবি যার পরনামা ঠাঁরে কাদেরের। পাশাপাশি চলেছে দিকে জামাটী চেতের পরি পরিহিতে প্রভা—দীর্ঘ পদক্ষেপে অপরূপ ছন্দ, যেন সমুদ্রে ঢেউয়ে ভাসছে। আমাদের পায়ে ভিজে জমি জড়িয়ে যাচ্ছে। যাচে যাচে আমরা শ্রাপনের কাছাকাছি জমির সমুদ্রে ঢোক জড়িটার পাশ দিয়ে সবর রাস্তায় এসে উঠলাম। আস্তানার দিকে তাকিয়ে দেখি সবর বারান্দায় তাদা ঝুলছে—। পরেশ বললো, সুব্রতরা এখনও ফেরেনি। আমি বললাম, দেখি আছে হো হোর কাছে? পরেশ বললো, আছে। আমার মুটো চাবি, একটা আমার কাছে আর একটা আছে সুব্রতর কাছে। মনে মনে আমি হাসলাম, তোরা তাদা ভাবি

আর হিসেব নিয়ে থাক। আমাকে ওর মধ্যে টানিস নে। অলকা, দেখ, নখন, টুকাই পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। ঝড়িওয়ালার তাড়ায়, আমি হয়ে যাবে অন্ধকার—। পরেশ সেটা বন্ধ করে দিল। ঝড়ির ভিতরে মিষ্টিওয়ালের অন্ধকার সৃষ্টি পড়লো। ঝাঁঝরে উঠলাম, এক নিমেষেরে পঞ্চাশ বছরের এইসোসাইটো মহিলা, এই দিনের অন্ধকার মিষ্টিওয়ালের নিজের ঘরে আপন মনে গান করছে। ছেলেবেলার আমাদের পরপক্ষে চকিতা হরিণীর মত ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরেশ আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি হেসে বললাম, উদার প্রকৃতির প্রভাব পড়েছে—

টুকাই দেখার কাছে আবদার করছে। মা খেতে দাও। নখন অলকার কাছে আবদার করে এখন নিরাশ হয়ে তক্তপোষের ওপর শুয়ে পড়েছে। আর ভাব ভাব করে অলকার দিকে তাকিয়ে আছে। অলকা নখনকে জেগাচ্ছে। এই তো, আমরা একটু পরেই মন্দিরে যাব। সেখানে কত ঠাকুর, সোনার গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেবের মন্দির, জগন্নাথ কত কি—দেখবে মা কালী জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখ আমি হেসে অলকার দিকে তাকালো। ওরা ছেলেমানুষ। তাই হয়ে ঘুটো আইরে নিয়ে যাব। কেন দেখ হবে না। আমি অলকাকে ধমকের সুরে বললাম, কেন, সেই মিষ্টিওয়ালার কাছ থেকে আরও কিছু আদায় নিয়ে নিতে পারনি? অলকা বললো, তিন টাকার মিষ্টি নখন আর টুকাই মুজনের হাতে দিয়েছি, তাই পেয়ে তক্তপোষের মত মুজনে খুব খুশি। খাওয়ার নিয়ে গল্প করছে। ছড়া মুখস্থ বলছে। আবার নিয়ে পেয়ে গেছে। আমার এখন ভাবনা করছে। পরেশ আর সুব্রত বাজারে গেছে। অনিন্দিতা সোফাতে টুকিটাকি কাজে হাত লাগিয়েছে। চলা থেকে কাঁসরের লালা আসছে। অলকা ঘর মুছছে।— দারুণ একটা সমঝোতা এসে গেছে। তবু খিদের জ্বালায় বাচ্চা দুটো ছটফট করছে। এমন সময় সুব্রত আর পরেশ বাজার করে ফিরলো। ওদের পা দিয়ে ঘাম ঝরছে। পরেশ মাথার ঝাপটা উল্টে দিল। বড় বড় পাহাড়ের সারা চোখেতে পেছে। অলকা স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। অনিন্দিতা এতগুলো বলে চমকে উঠলো। দেখ কত করে নিল জিজ্ঞাস করলো। সুব্রত পরেশকে ধমকালো। আজার গিয়ে নেউ নেউ করবি নে তো। তোর জন্যেই চার আনা বেশি লাগলো। পরেশ বললো, লাগাসও হেলেবলতার আট টাকার দুই বেড় কেজি পারলে পাবি। আট টাকায় বেড় কেজি! তা আজার এত বড়, আন্দাজ তাকাই যায় না। শুনে আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম। সুব্রত বললো, গোটা কয়েক কড়া করে ভেজে রাখবেন। জলের গেলাস বসে টকাস করে জিতে শব্দ করলো। পরেশ আমার মুখের দিকে তাকালো জুলুটি তার চোখে। নখন আর টুকাই নাচতে ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কোনটা বড় কোনটা ছোট, কোনটা কে খাবে তাই নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করেছে। দেখ বললো, এই তোরা নাচ আছিস নে। পরেশ আর একটা ব্যাগ থেকে এক রোল মুড়ি বার করলো। আরেকটা ব্যাগে ঠোঙা নিয়ে বললো, আলুগুলো ভাজো। মুড়ির সঙ্গে জমবে ভাল। দেখ তাড়াতাড়ি দু-মুঠো মুড়ি নখন আর টুকাইয়ের হাতে দিয়ে বললো, খেয়ে নে। উফ দারুণ খিদে পেয়েছিল ওদের। নখন আর টুকাই মুড়ির মুঠো নিয়ে বসে গেল। সুব্রত তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ডায়েরী আর কলম বার করে সিগারেট ধরিয়ে বললো। পরেশ খালি পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো হিসাবের ডায়েরীর ওপর। এল, তীক্ষ্ণ চোখে সমস্ত কিগারগুলো যেন চেটে নিল। সুব্রত আমার দিকে কঠোর দৃষ্টি নিয়ে তাকালো, তোর আরও কিছু দিতে হবে। সুব্রতর কথাটা শুনে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। তবুও সাহস হয়ে বললাম, কত। সুব্রত মুখ গুটিয়ে বললো, আপাতত। আরও ছোটা পঞ্চাশ নিলে চলবে। পরে যদি লাগে তো দেখা যাবে।

আমি অলকার দিকে তাকালাম। অলকা মাত্র মুটিয়েছিল বটি পেতে দেখা দেওয়ের উপর উঠিয়ে চাল ছাড়তে ব্যস্ত। অনিন্দিতা এক জায়গায় বসে চাঁচ উঠিয়ে চাঁচুর উপর দু-কনুই রেখে মিঠের ভিতে চুল নিয়ে অযথা নাড়াচাড়া করছে। অলকা টাকার অঙ্কটা শুনে থাকতে গেল। বলছে, আর টাকা জোগাড় আমার কাছে। কেননা, দেখে এসে কতো টাকা ছিল। কালকে মন্দিরের পুজো দিতে দিয়ে যাব করেছিলাম সুব্রতদার কাছে, সেই টাকাটা দিতে হবে, তাড়াতাড়ি তক্তপোষের নাচ সব মিটিয়ে—আর। আমি বললাম, ওকে দিয়ে যাও, সুব্রতর টাকাটা এখনও পাওনি। হাত ধুয়ে এসে ওর কাছের টাকাটা শোধ করে দাও বলে আমি পরেশের দিকে তাকালাম উঁচু দৃষ্টিতে। ওরা মুজনে মিলে আমাকে ঠকাচ্ছে না তো। অবশ্যই নিজের পকেট চড় করতে ইচ্ছে হচ্ছে। এত ছোটলোক হয়ে গেছি আমি। চকিতে মনে পড়লো, প্রয়োজনে মাঝে মাঝে ওদের কাছ থেকে দু-চার টাকা ধার করেছি, তা কি শোধটোধ করিনি। না, মনে পড়ছে না তো। আমার মনে না থাকলে অলকাই তো মনে করে ছাইপে হবার সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা শোধ দিয়ে দেয়। তাছাড়া ওরাও তো কখনও চায় নি। তাহলে সেটা কী ওদের লজ্জা করেছে বলে। অলকা উদ্ধারের দেখিয়েছে জানি না, পরেশের সকালে চানটান করে যখন মন্দিরে যাই, অলকা সঙ্গে টাকা নিয়ে আর নি। অলকাই বোধ। পরতা আমাদের জগন্নাথ দর্শন করিয়েছে। সেই আধ্যাত্মিক ভিড়ের মধ্যে বিশ্বপতি আমাদের সকলকে হারিয়েছে, যা গো লাইন ভাঙবেন না, শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকুন আমি আসি পেছনে। পাণ্ডা সামনে। সেই মূর্তির ওপর সিন্দুরের পাঞ্জাবি নরম উষ্ণ চাউনি, ছোট ছেলে মিষ্টি কথা। আমাদের পাণ্ডা যখন এলো পাণ্ডা ছয় বছর বসেছিল, পা ছুঁয়ে প্রণাম করুন। বিশ্বপতির চিৎকার পা ছুঁয়ে সবাই মানতে করুন না কামনা-বাসনা সিদ্ধ হবে। সেই অন্ধকার ঘরে কাঠের সিংহাসনের সামনে বিয়ের তাঁদের শিখা চন্দনামৃত মূলের সঙ্গে মিশে একটা সাত্ত্বিক গোয়ার নিয়েছিল। সিংহাসন ঘুরে প্রণাম করে বেরিয়ে এসেছিলাম। একটা ঘোর লাগা চমক সারা শরীরে শিহরেখে বসিয়ে দিয়েছিল। পুরীর জগন্নাথ সবচেয়ে বড়। আর নাম করা দেবতা। ছোট বেলার এই নখনের বয়সে ঠাকুমার কোলে বসে, সমুদ্রের বর্ণনা শুনেছিলাম, শুনেছিলাম মন্দিরে জগন্নাথদেবের কথা। জগন্নাথ, সুবদ্রা, বলরাম। তিনটি মূর্তি আছে সিংহাসনে আর সেই স্বপ্নপুরীর রেলস্টেশনে আমরা সশরীরে উপস্থিত। এবং মন্দির ও বাকা বর্ণন করে ধন্য, মুগ্ধ। পাণ্ডার মিষ্টি মুখ ভেসে এসেছিল আমুন এদিকে। তারপর, আমি মন্দির থেকে নেমে সিংহদ্বার বাঁধানো উত্তোল পেরিয়ে অফিস পাড়ার দরজাদারের এক নির্জন কোনে মনে পাণ্ডার কথা আত্মজনের নাম, ঠিকানা, আবা, ঠাকুরদার নাম তার নেটা চিৎড়া খাতায় তুলে নিয়ে সই করেছিলাম। অমুক পক্ষের অমুক তারিখে আমি আমার পরবর্তী কোন অন্দরে এসে ফেরে করলে পেয়ে যাবে আমার নাম—পেতে চকিত ফিরবে হয়ত তাদের আমাদের পূর্বপুরুষ অমুক এসেছিল পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে কিন্তু ভাববে না—সেই ঝটাকুট নাড়ী বিজড়ি জটিলের কথা, যাযাবরীদের তাগিদে হচ্ছে—জগন্নাথ দর্শনে না, সমুদ্র দর্শনে।

অলকা স্যুটকেশ খুলে দশ টাকার দুজনা নোট আমার হাতে দিয়ে বললো এই যথেষ্ট আমার কাছে—আর নেই। অলকার চোখে মুখে অর্থহীনার অর্থহীন দৃষ্টি আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, সুব্রতর টাকা বাদ দিলে তো পঞ্চাশ টাকা হবে না। দেখ না, খুঁজে পেতে যদি থাকে তো দাও। অলকা বলল, আমার কোন খুঁটিবালাদা, আর দুটি ছেলের জন্যে বলতে গেলে টাকা দিয়েছিল। সেই টাকাটা আছে। অলকা কেন চড় ফাঁকিতে দিল আমার তোয়াজে। বললাম, ওর কাছ থেকে টাকা এনেছ বুঝি অলকা নিরবে দাঁড়িয়ে রইলো। বললাম, ঠিক আছে। সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ছুরি মেরে আমাকে দেখল, অলকার দিকে তাকালো তারপর তিনের মত শ্রী মেরে টাকাটা হাতে নিয়ে পরেশকে বললো, ওর মনে জমা করে নে। পরেশ সিগারেটে একটা টান মেরে টাকাটা গুনা করলো। সুব্রত তা থেকে আমার টাকা গুনে অনিন্দিতার হাতে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ হেসে বললো, দু-পঁচ টাকা ধরচের হয়ে আমার কাছ থেকে ধার করে নিল। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে বলেই জানি। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল আমার চোখে মুখে। পরেশ সুব্রতকে এখন ঠিক কসাইয়ের মত মনে হচ্ছে—অথচ ওর বিয়েতে পাঁচটার টাকা খরচ করে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। অলকা বলেছিল যাবে যাও আছেলে মাস চালাবে কী করে। আরও টাকা ধার করতে হবে। আমি ভেবে বলেছিলাম, ও বলে, বন্ধুর বিয়েতে যাব না। সুব্রত আমার বন্ধু! অলকা বলেছিল আমি কী তোমাকে ছেড়ে না করছি, যাও তবে কম করে টাকা খরচ করবে। ছন্দা বেরুলে তো আর মাথা ঠিক থাকে না। সহিত অলকা আমাকে তিরস্কার করেছিল। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিষ্টির দোকানে আড্ডা অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম, মিষ্টি জল খেয়ে পরেশ চিৎকার করে উঠেছিল, যারে জমিদারের বাচ্চা না হলে এত উদার হল। তা ওর পান হবে না একটা করে। অবশ্য এ সবই তুচ্ছ ঘটনা নিজেকে বড় ছোট মনে হলো। বলেছিলাম হবে, কেন হবে না। তা সেই পরে এখানে আসার আগে আমাকে টিকিটের টাকাটা ধার দিয়েছিল। পঞ্চাশ টাকা বলেছিলাম, পরেশ তুই এখন কানের কাছে যে আমি পরে তোকে শোধ করে দেব পরেশ রাজি হয়ে গেছিল, তবুও তোর ছেড়ে হবে ওর। আমি বিব্রতাড়িত গলা বলেছিলাম, ধার তো ধারে পেটা টাকাটাই আমাকে ধার করতে হচ্ছে। সুব্রত বলেছিল তাতে কী হয়েছে। ঘাটাঘাটির না—বেঁচে থাকলে ও শোধ করতে কতক্ষণ। তবু একটা আশ্বাস দেখে আসবি। গিন্নীকে তো ঘরে চৌকাঠের বাইরে নিয়ে বেরোস নি বলেছিলাম, কোথাকে বেরুব বল। সুব্রত চোখে ভুরুটি হেনে বলেছিল, তা কত আমি পরেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, পরেশ, তোর দেওয়া ওই টিকিটের টাকাটা আমা মনে জমা হয়েছে তো? পরেশ বড় কথায় হাসলো। তারপর সুব্রত মুখের দি চেয়ে বললো, না, ওটা আমার মনে জমা হয়েছে। আমি বললাম কেন? কথা তা ছিল না। পরেশ তিন দিন ধরে বললো, অবিশ্যি তো টাকা ধার করে এসেছি—

তা যার কাছে পয় তেবেছিলাম, সে পঞ্চাশ টাকা ধার দিয়েছে ভাই। আমি বললাম, তা তুই তো আমাকে ছ'শো হবার আগে বলতে পারতিস। পঞ্চাশ বললো, জানিনি, তেবেছিলাম তোর কাছে কী আর টাকা নেই,—আর জানলে হয়ত তোর আসাই হতো না। আমি ভান হেসে বললাম, এখন আমাকে পঞ্চাশ কেজি দিলি তো। সুব্রত হেসে উঠলো, আরে পঞ্চাশ কী বলছিস, আমার কী নেই। দু-পাঁচ টাকা দরকার হলে চাইবি দিয়ে দেব। আমি বললাম, তোদের আছে হাত পাততে হবে তো। সুব্রত বললো, হাত কী পাতিস নি কোনদিন আমার মুখের ভেতর তখন জ্বলে উঠলো আগুন, চোখের সামনে অসহায় জননী, ঠিক সেই সময় কলেজের বন্ধুর বন্ধু আছের ঘর ভিতরে ভিতরে জলে যেতে দেখে তক্তপোষের ওপর থেকে উঠে দরজার এসে দাঁড়ালাম। সামনে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, দূরপুত্রের রোদকে ঘিরে ঘিরে মাতামাতি—। বিশেষ বিড়ম্বিত নিয়ে আমি, নন্দন আর অলকা। পুরীধাম, জগন্নাথ, সমুদ্র টলমলচল করছে আমার মুকের মধ্যে—অপূর্ব নন্দন ছেতে চাইছে, অলকা কিন্তু ফিরতে চাইলে আমি তাদের হতে—সহসা কেন চোখের পাতা দুটো উঠলো ফিজে। এমন সময় স্টেটের সামনে ছড়িদার বিশ্বপদকে দেখে ওর ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকালাম—সরল, নিষ্পাপ, চাহিদাহীন একটি নিরক্ষ মানুষ কিন্তু কী অবর্ণিত ভার মন, কিন্তু তাকিয়ছিল তার চাহনি, মোহে পেয়েছে না, জ্ঞানে ভেজে না, শুধু কিনারে একটু ভাঙ খেয়ে ফিরোর হয়ে পড়ে আছে · এসে বললো, বাবু, আজ কোনদে সোনার গৌরাঙ্গ, লোকনাথ, লালন ফকির, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, পঞ্চপাণ্ডব, মাসির বাড়ি হয়ে ফিরে আসবে—পাণ্ডারা ফিরলো দেখে পাঁচ টাকা বাবু। আমি বললাম, সোনার গৌরাঙ্গ কত দূর। বিশ্বপদ আঙুলের গাঁড়িয়ে দক্ষিণাকের দিকে আঙুল তুলে বললো, বেশি দূর নয় দু'ক্রোশ। বললাম, লোকনাথ। তা একটু দূর হবে বাবু, এদিকে বলে আঙুল তুললো আকাশ—হিসেবেতে বেশি সময় লাগবে না,

দরজার মতো সব মেপে আসতে পারবে বলে চিৎকার করে উঠে দিত যেমন মাকে ডাকে, সেইরকম ডেকে উঠলো, বিশ্বপদ, নাস্তে—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন মা, খেয়েদেয়ে একটু ঘুম করুন আমি টিনটের সময় আবার আসবো মা। বলে ভীর গতিতে চলে যাচ্ছিল, আমি ডেকে বললাম, বিশ্বপদ, তোমার সেই মোদকবাবার অসুখ এসেছেন? বিশ্বপদ চক্ষিতে দম নিয়ে সরল হাসলো, আসবে ; বাবু কত যখন তেজিয়েছেন, আসবেন। দেখা মেলিয়ে এলো ঘর থেকে। বিশ্বপদ হেসে বললো, মা, খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু ঘুম করুন, আমি টিনটের মধ্যে এসে পড়বে, ভাই মা, বলে বিশ্বপদ কাঠের গেটের মুখে অদৃশ্য হলো। কেবল টিনটে আজতে না আজতেই বিশ্বপদর গলা শোনা গেল। আমি ঝরণার চেয়ারে বসে। তাকিয়ে আছি সীমাহীন কূল বিনারাহীন সমুদ্রের দিকে চেয়ে। কেন জানি জলে হাসুচুসু খেলিলাম, বিশ্বপদ এসে টেনে তুললো, বাবু ঝটুল তৈরি হল। ঘুম ভাঙা অলস চোখে জল মিটিয়ে চান । হলে সকলে। ওদিয়ে নিতে নিতে বেরী। বিশ্বপদর অপেক্ষায় পথ তাকা। বেরী হলে গেল বাবু, রিকশো ডেকে আনি। সুব্রত বাধীর গলায় বললো, রিকশার দরকার নেই, পায়ে হেঁটে মন্দির দেখা যাবে। বিশ্বপদ একটু অবাক হলো, তারপর হাত ঘড়িতে বললো, সব মন্দিরই কাছে বাবু, হুদ শুধু ঐ বাম সোকনাথ, আর সোনার গৌরাঙ্গ। পরেশ বললো, তাহলে এ-দুটো আমাকে দেখা যাবে। সোকনাথ আর সোনার গৌরাঙ্গ। বিশ্বপদ হেসে সায় দিল। সুব্রত কপালে চোখমুখ কুঁচকিয়ে বললো, এলোমেলি একটা, কার পরম না অসুখের গন্ধ। বলে, ভক্তের ভিতরে ঢুকে আমার সামনে দাঁড়ালো। পরেশ টুকরিকে চুল আঁচড়ে দিল। নন্দনের কী রকম মনমরা। চোখ মুখ। সেই তখনকার কথাবার্তার পর নন্দন যেমন বিমিয়ে গেছে। অলকা তার পায়ের জুতোর ফেতা বেঁধে দিচ্ছে। নন্দন, তার ছোট দুটো হাত অলকার মাথায় রেখে চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে বললো, মা, আমরাও যাবো তো। অলকা হেসে বললো, যাবে তো।

আমি অলকার মুখের দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেললাম। দু-এক গাছা সোনার চুরি আছে—। অলকা আমার দিকে চেয়ে বললো, তুমি খুতি পাঞ্জাবীটা পরবে তো? আমি ভান মুখে অলকার দিকে তাকালাম। খুতো চুরি নিয়ে এলেও আজ—কিন্তু টেনে চুরি-তাকাতি হিনতাইয়ের ভয়ে সেসব আনেনি অলকা। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অলকা আবার বললো, খুতি পাঞ্জাবীটা বার করে দেব? আমি না বলে পরেশের দিকে তাকালাম। পরেশ, সুব্রত বললো খুতি আর পাঞ্জাবী পরে চলুক। আমি বললাম, না থাক। আমি প্যান্টই পরবে।

অন্ধকারিদের মত চলেছি ওদের সঙ্গে। ওরা যাবে অনিবিড়ো আর সুব্রত। পেছনে পরেশ। ছেলে মার ছেয়ে। দেখার হাত ধরে চলেছি। আমি অলকা আর নন্দন। বিশ্বপদ কখনও সঙ্গে আছে, কখনও আমাদের সঙ্গে এসে মিলছে। অনিবিড়ো, দেখার পরীক্ষের সেন্টা এসেসের গন্ধ ভাসতে ভাসে এসে আমাদের ঘিরে সুরভিত দিচ্ছে। মাঝির আস্তরণে ঢাকা পথে মাঝে মাঝে শিত খুলি মাটি ওড়াচ্ছে—। রোদ কত কত করছে আকাশ। অলকা বললো, কী ভাবে সুব্রতদা তোমার হাত থেকে টাকাটা নিলে দেখলে তো। কেন জানি, আমি হাসি পেল, বললাম, দেখেছি। এই তো তোমার বন্ধুরা—। অলকার কথাটা আমার বুকের ভেতে কুন্ঠিতের ঝাপটা মারলো। আমি বললাম, ছেড়ে দাও—অলকা বললো, হাতুরো মানে, বড় বড় কষ্ট করে তো যাচ্ছি হয়ে যাও। আমি বললাম, ওসব কথা আর তুলো না অলকা। আমার খুব খারাপ লাগছে—অলকা চুপ করে গেল। বিশ্বপদ বললো, আসুন বাবু, বাকি মন্দিরের, মন্দিরোবের মন্দির দুটোতো খুলুন। মাধবীলতার ছাওয়া মন্দিরের সেউড়ির পেট দিয়ে ঢুকে আমরা মন্দিরের দর্শন করে আবার রাস্তায় এসে পড়লাম, আমাদের মিষ্টি কিনে দিলাম, অরুণার পুরীতে এসে হেটেলে আবার পর সবাই মিলে ভাব খেলাম সে সব পরনা তো, আমি বিয়েছি, তারপর ভাতের বেলার যে বেরোনিন এলো, মুক্তি, চন্দনচূর এনেছিলাম, সে পরনাও তো আমি দিয়েছি—সেটা কিন্তু পরেশদা, সুব্রতদা বললো না। ঘ বলার না একবার। আর ওরা কোথার হাওড়া স্টেশনে একটি ফোরকোলা দিনে আমাকে একটু তলামি দিয়েছিল। হাত আমু খেতে পারেনি। পড়ে গিয়েলো তার বাসটা পর্যন্ত বয়ে নিয়েছে। আমি একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললাম, ওইটাই নিয়ম অলকা। ওরা নিয়মের বাইরে পা বাড়ায় না—আমিও তো পিপুলস বাস থেকে নেমে যে মিষ্টি কিনে তোমাদের খেতে দিলাম সেটা কি তুমি এক খেলেছিলে? অলকা বললো না—সবাইকে দিয়েছিলাম, পরে তো সুব্রতদা, পরেশদা আলাদা করে কিনলো। আমি বললাম, ওটাও তো তোমাকে আমি বলিনি। যাকগে, ছেড়ে দাও, ওসব কথা। অলকা বললো, কী জন্যে আর আর—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আমি বলছে। আমি আলকাকে ধমকে উঠলাম, কলবে প্রনে? অলকা ফুঁসে উঠলো। প্রয়োজনে বলতে হয়, এটা শিকার ব্যাপার। দরকার না হলে বলতাম না। আমি হেসে ফেললাম, তুমি কী ভেবেছ ওদের জানে জল যাবে। জল না থাক তবুও বলবে পয়সের জ্বালা মিটবে। আমি অলকার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, নন্দন ঘুমাচ্ছে না, তুমি যেন। ওসব কথাটা ওনিয়ে দিলে, ওরা কী তোমাকে টাকা ফিরিয়ে দেবে, না তোমার খাঁচলে পয়সা এসে যাবে। এমন সময় বিশ্বপদর গলা শোনা গেল। শঙ্করাচার্যের মন্দির যা,—আসুন বকলম করে বলা ছেন যা—। বিরাট পাঁচিল ঘেরা সদা রঙ করা দেওয়াল। বিরাট গেট দিয়ে ঢুকিলাম পথ। পথের ডান দিকে বিরাট লম্বা বারান্দা দেওয়া আছি। মাটির মিহির আস্তরের প্লাস্টার মন্দির। বাপ তেজে তেজে নামলাম। মন্দিরে স্বয়ং শঙ্করাচার্যের ছেতে পাথরের শান্ত সৌম্য মূর্তি। সমাহিত ভাব। পূজারী সেবাইত বললেন, বর্তমান শঙ্করাচার্য এই তো সেদিন এসেছিলেন এখানে। বিশ্বপদ বললো, আসুন বাবু—অন্যে-যা। শঙ্করাচার্যের মন্দিরের সেউড়ি পেরিয়ে আমরা আরেক রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। রাস্তার দু'পাশে পুরনো বাড়ির আবেদনমে নতুন বাড়ি গড়ে উঠেছে। সামনে বাঁদিকে মানিকটা ফাঁকা জায়গা। এখান থেকে পরীর জগন্নাথের মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। বিশ্বপদ বললো, মা গো—ওই দেখুন আমার মন্দির। একদিন পাথরের ছিল মা তাকে হিলাব করে ছেড়ে ছেড়ে মন্দির বানানো হয়েছে। হেজিল ছেড়ি সেবকা আছেন মা—। কথাটা কতখানি যে অসত্য বিশ্বপদ। তবুও নতুন করে ভালো লাগছে। মাটির রঙের ওপর পাথরের নানার সোনালী আভার ছড়াচ্ছে। সেবকার পীঠস্থান কলিঙ্গের শেষ সৌন্দর্য—কী অবর্ণিত সৌন্দর্য, শ্রীমাহীন পবিত্রতা আর সহজবন্ধন। এর মাটির প্রতিটি কণায় শুদ্ধ আবাস। স্বর্গকের বুক ভরিয়ে দেয়। সেই মাটির মনে পবিত্র করে স্বর্গকের প্রাণ। পরেশ সিগরেটো ধরানোর জন্যে দাঁড়ালো। আমি অলকাকে বললাম, তুমি মেয়েটাকে একটু কোলে নাও—না। পরেশের হাত থেকে অলকা মেয়েটাকে কোলে নিল। পরেশ সিগরেটে ধরালো। দেবদাসীদের কাটিটি ছুঁয়ে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। সুব্রত আর অনিবিড়ো অনেকটা দূরে। আমি পরেশের দিকে চেয়ে হাসলাম। পরেশ বললো, এ পর্যন্ত কত খরচ হয়েছে জানিস? আমি হেসে বললাম, আমার প্রয়োজন নেই পরেশ, হিসাবটা তোরই রেখ। আমি তাবছি, তাদের তাদের এখন কোনরকমে ফিরতে পারলে বাঁচি। পরেশ বললো, অলকারও ভাল লাগছে না। টিকিটটা যদি আর দু-দিন আগে পাওয়া যে ভাল হতো। আমার কাছেও আর টাকাকড়ি কিছু নেই। আমি পরেশের চোখের দিকে তাকালাম। কেন ওর চোখের আয়ার একখানা ঘুরি চলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বললাম, না—এই দুটো দিন তোরা আমাদের ছেড়ে দিবি তো। ওতেই চলে যাবে। আর টাকা পয়সা নিয়ে কী হবে। কেন অনুরোধ করি খেল, বললো, এ তুই কী বলছিস, আমার ছেড়ে যেন যাবে। বললাম, চটে যাচ্ছিস কেন, আমি এখন

পুরোপুরি নিশ্চয়ই, আমার যে জানিল, আমাদের পরস্পর যেন সাজান অভিনিবেশ হয়ে সুব্রত আসছে। ও মানি দেখিল সাজান পুঁজিল, তা অভিনিবেশ ভাগ থেকে বার করে দিল। আমি দেখে হাসেছিলাম, ছাইয়ে সাজান ইন্দ্রজিৎদের নিয়ে যেতে পারে,সে তো ভালই করেছে। পরেশ আবার আমার দিকে তাকালো, পরে শিশুরোই পুঁজে বলল, সুব্রতটা যে এই জন্যে তা আগে বুঝতে পারি নি। আমার চৌকুলিত চোখ মুখে পরেশের মুখের উপর ফেললাম, ও হেসে ফেলল তো ফেলছিল কেন? তুই বলবি সুব্রত খারাপ, আমি জন্যে তুই খারাপ—এসব আমার ভালো লাগে না। পরেশ একটু থেমে বলল,—সুব্রত বলছিল ওর মানি নিজের টাকাই খরচ হচ্ছে। আমি জানতাম, কিন্তু আমি ভিলাম হাজার অতগুলো টাকা নিজের—আমার পরেশ, খুব ফেকা লাগিল আমাকে তাই না।

পরেশ এবার হাসলো, সুব্রত বলছিল তুই নাকি খুব ভরেশ মানা। টাকা পয়সা শোর দিবি না। আমি বাইকে উঠলাম পরেশকে—আবলে, তুই হিসাবটা ঠিক করবে যা—ঘরে আরও যদি কিছু কিনে নিতে পরিস দু-এনে নিলে সেই ভেবে কর। বিধুপদ কালের যা চলন এবার লালন অভিনয়ের পীঠস্থান বর্ণনা করে আসি। সব পথ ধরে হেঁটে লালন অভিনয়ের সমাধিস্থান ছোট বড়ের সমাবেশ বেশী। বেদীর ওপর একটি অনুলম্বাদ। ছোড়া কাঁধানো। কিন্তু পরা হেলে বেদীর ওপর শুয়ে পড়েছে। বিধুপদ বলছে, এখানে কবির আধার সমাধি হয়েছিল মা—এখানে ওপরানের বর্ণন হয়েছিল। পরমাণী। এখন নতুন নতুন কয়েকটা ঢিলে দেওয়া বাড়ি হয়েছে আশেপাশে। বেদীর ওপর উঠতে এক জায়গায় লেখা থাকে পাতা জল জমবেন না। এই সেই বিশ্ব বরুণ—কত কীর্তি কত কাহিনী লেখা আছে। ঘিরে ঘিরে করে আসল ঘরে বিধুপদ আমাদের নিয়ে এলো। চৈতন্যদেবের মন্দিরে। বিরাট প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মন্দির। অনেকজন বৈষ্ণব ভাবে আসন নেওয়ানে। ধ্যানমগ্ন। একজন আমাদের জানালেন, এই ঠাকুরের পানুকার। পানুকার পাশে লাল ঢেলি। শ্রীচৈতন্য পৃথিবীতে শেষ কতদিন, এখানেই তিনি শেষ রাখেন।

ব্যাস, এবার মন্দির বাড়ি। বলে বিধুপদ হেসেন। আবার উথম আলো ঘরে উঠেছে। আমরা জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। লেখা আছে, অমি অন্য ধর্মের মানুষের ঢুকতে পারবে না। তাই বলে, অভিনিবেশ বললো, তুমি কিনবে, আমি কিনবে। সুব্রত বলতে উঠলো, না ও সব কিনতে হবে না। বিধুপদ বললো, চলুন মা—মন্দির বাড়ি আর জগন্নাথদেবের যুগল মূর্তি দেখা হলো না—একটা আফসোস। সুব্রত তাড়াতাড়ি ঠিনতে কিনা ডাকতে বললো, হিন্দী কিনা এসে দাঁড়ালো। ঠিক হলো আমাদের আর মন্দির বাড়ি বেরিয়ে আমাদের আমার পৌঁছে দেবে। আমি আমাদের দিকে তাকালাম। নমন আমাদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। টুকাই দেখা দিয়ে রিক্সায় বসেছে। অভিনিবেশ আর সুব্রত আগে রিক্সায়। আমি পরেশকে বললাম, আমরা যাব না—আমাদের কাছে তো পয়সা নেই। পরেশ বললো, এটা জরুরী করতে হবে। চল, মন খারাপ করিস না। আমি পরেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুই কত টাকা নিয়ে এসেছিলি। পরেশ বললো, এই দুশো টাকা, আর তোর পকেটের টাকা ধরতে পারিস। আর সুব্রত? বলে পরেশের মুখের দিকে তাকালাম। বিধুপদ বললো, বাবু উঠুন—ও আবার রিক্সা চলতে শুরু করেছে। আমি বিধুপদর দিকে চেয়ে রিক্সায় উঠলাম। সতেজ সবুজ পরের ছায়ায় বিরাট এলাকা জুড়ে কাশুন। গেট দিয়ে ঢুকলাম জগন্নাথদেবের মন্দিরে। পবিত্র একটা প্রেম প্রেম ভাব—জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ওখান থেকে বেরিয়ে আবার রিক্সায় মাসির বাড়ি। গেটের দু-ধারে। কলাবের আমবাগান পেরিয়ে বিরাট নাটমন্দির। এই মন্দিরের উপর ছাদে একবার এসে অবস্থান করেন জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা। পাতা আর সেখানেই ঘরে আছে এখানে ওখানে। গাঁজা গাঁজা ঘর এরা এরা নির্জন মাসির বাড়ি। বিধুপদর ভাষায় বর্ণন করে ঘিরে ঘিরে বেরিয়ে রিক্সায় উঠলাম।

মন্দিরের সামনে সুব্রত আর পরেশ দুজনে দুই রিক্সা থেকে নেমে সিংহদ্বারের জেরুজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আমি রিক্সাওয়ালাকে বললাম, চলাও—এখুনি নমন হাতরো কিছু কিনতে জানবে। পরেশের পেছনে পেছনে গিয়ে চুকলাই দাঁড়িয়েছে। অভিনিবেশ সুব্রতর পাশে। পরের জেরুজনের দু-দিকে একটা রিক্সার জেরুজনে, আর একটা স্টেশনারী। আমাদের রিক্সাটা চলতে লাগলো, আমি পেছন ফিরে পরেশকে বললাম, আমরা যাই—কেন মিছে ঝামেলা। গাঁক গাঁক করে চলেছে রিক্সা।

আড়ালময় চুকেই আলো ঝলমলে অভিনিবেশ। তারপর জগন্নাথ ঘরতে ও ঘরে ঘোরে ঘোরে। সুব্রতও পেল সঙ্গে সঙ্গে। পরেশ ছাইয়ে আড়ালময় নমন পেট চেপে ঘরে ভক্তদেরদের উপর ভর পড়েছে। আমি ছাইয়ে আড়ালময় এসে দাঁড়ালাম। পরেশ হাসি পেয়েছে টুকাইয়ের। পরেশের মুখে শিশুরোইয়ের আড়াল। এমন সময় কনে এলো, টুকাইয়ের পাশ, আমি বিরাম হয়ে সবেশ আর হল—ঠিক তখন যে কেন ওর মুখটা চেপে ধরলো। মনে হয় আমরা ওকে মাফার জল দিতে। আমারও মাফার জল ঘেওয়া দরকার। আমাদের ওপর ভীষণ রাগ হলো—মা কী দরকার ছিল ফালতু ঝেঁকিবাজী করার আমার। আমার নিজের ওপরও রাগ হলো, আমি তো ফালতু বন্ধুরের—। আর দুশো পরার ঘরে উঠছে। মুখ উঠেছে, চেঁচে যেন ফেলে দুমড়ে মাচড়ে দুক। একটা কান্না ঠেলে উঠেছে কুকের মাঝে—সুব্রত পাঁচশো টাকা সঙ্গে এনেছে ওর কোন অভাব নেই, পরেশ মাত্র দুশো টাকা সঙ্গে এনেছে ওর কোন অভাব নেই আর আমি সব মিলিয়ে সর্বসুদ্ধ পাঁচশো পরার টাকা এনেও নিঃস্ব, নিঃসম্বল—আমার হেসে পাঁচ বছরের নমন না ছেড়ে দেয়ে ভক্তদেরের ওপর পেট চেপে ধরে শুয়ে আছে। সহসা সেই সমস্যক প্রোকটা মনে পড়লো, অন্ধকারে স্বপ্নানে ৫ ম স্থিতিটি সাধারণ। কী অপূর্ব প্রেম—। টাকা আটমন্ত্র নক্ষত্রের মন্ত্রে ঘিরে ফেলাম, আমি। বন্ধু বলছে, বন্ধু এতগুলো মোহর। এতগুলোকে বলে সুদরমনি মোহর। আর এই যে টাকাগুলো দেখছো এ টাকা এগুলোরার টাকা—তা ধর আলমারীতে কত, লাখ খানেক টাকা হবে বোধ হয়, ঠিক জানা নেই। আর আমি সেই পরেশের মুখ বাদুর উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে আছি—ও ধরা, এত টাকা ; এ টাকা দিয়ে কী কী হবে! লাখ টাকা কী বাদু—বাদু ঠাঁ ঠাঁ করে হাসছে, এ টাকা, তুমি বড় হবে। অনুর হবে—তবে ঠাঁ, ধারা পরিশ্রম নিয়ম, তাহার খুব ভরে খেটে ভরে খাওয়াবে, ভরসা যা ছেড়ে তের ভাই খাওয়াবে ভরের আশীর্বাদে তোমার আরও টাকা হবে।তবে আরও টাকা হবে না, টাকার ওপর লোভ করবে না—টাকা দেখবে, আসলে তোমার কাছে চলে আসবে। টিকোর করে বলতে ইচ্ছা হলো, নিখে রাখা বাদু—মানুষকে না ঠকালে, মানুষের উপর অন্যায় জুলুম না করলে টাকা আসে না। বাদু—এই দেখ না তুমিও তো এসেছিস এই পৃথিবীতে—তুমি এত কষ্ট পেয়েছিলে। পাও নি—আমা সেই পুরির বুকে তোমা বলবার না থেকে ভক্তদেরের ওপর পেটে হাত চেপে, দেখো ওরে আছে—আমরা দাঁত দাঁত চাপলাম আমি, ভবে সেই সব হিংসাটিয়ের দল, যারা পাঁচ বিঘে ধরো জমি দেখিয়ে বলে ভাগিয়ে, বড়ুর হাসি হেসে আসে বন্ধু তারা কত মুখে আমা পৃথিবীতে আছে এখানে। এমন সময় অনন্তা এসে বললো, শোন, নক্ষত্রের সাঁঝা দিয়ে পেয়েছে—বলছে, আমি কী করছে তোমার ছেলের ঘিরে পারা যেন। সুব্রত হিসেবের ভাবনা নিয়ে বসেছে। পরেশও তার পাশে। সুব্রতর মুখ ভয় সব ছেলে এলো, এটা খুব অন্যায় হচ্ছে, যার ছেলে তার খেয়াল রাখবে না, ছেলে কী করবে। তার জন্যে আবার কৈফিয়ৎ তলবে হবে আমাদের। আমি চিৎকার করে বললাম, যাই হোক লাইফ ইজ বিউটিফুল—আমার ছেলের সম্পর্কে আমিই ভাবছি। সুব্রত বললো, তাহলে আমাদের না দেয়ে কষ্ট পেত না। আমি বললাম, পাচ্ছে তো তোমের জন্যে। তুই তো ফুল ভরে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করেছিস। বলছিস তোর কাছে টাকা নেই, পরে বলছে তার কাছে টাকা নেই, অথচ তোর রিক্সা নেবে আসার অভিনয় করেছিস। বেস্টিকের ঘনিছিস। সব বিশ্বেছিস—আর আমাকে না দেয়ে ছটফট করছে—। সুব্রত তেরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালো, তাহলে কী তুই বলে যে তোর ছেলেকে আওয়ারনের ঘটিত আমাদের। আমাদের আগের টাকায় ছেলের আওতা হবে এটা তো ভুল আমাদের কথা। আমি ছেলে উঠে বললাম, কত বিশ্বেছিস তুই। সুব্রত আমেরিকা ছুঁতে ফেলে দিল আমার সামনে—দেখ যে। কত টাকা এর মধ্যে খরচ হয়ে গেছে। ও দেখে আমার কাছে পেছে—তবে আমি জানি, আমি আর আমরা যে সব টাকা খরচ করেছি সবই আর তার পেয়েছে—সে হিসাবটা ও তারকীতে নেই। হঠাৎ আবার আমি খুব দাঁড়ালাম। পরেশই আমাকে বলেছে, সে ঘিরেছে দুশো টাকা, সঙ্গেও এনেছে দুশো টাকা—আর আমি কত ঘিরেছি সেসব হিসেব করা, আর আমরা কী খরচ করেছে তোর ছেলেছিস, কই সেটা তো হিসেবের মধ্যে নেই, তোমার পেছনে খরচ যা ওর নিজের টাকার জন্য ছেড়ে যাও—। সুব্রত চিৎকার করে বললো, সাবধান হয়ে কথা বলিস। আমার হাসি পেল সহসা, বললাম সুব্রত আমাকে তুই চিনিস না, মনের খুব তিন আছে খুব ভরে খেয়েছি তাই যেমন সত্য করার শক্তি আছে আবার প্রতিহত করারও শক্তি রাখি। আমরা অভিনিবেশ হা-হা করে এসে পড়লো, আমরা চুপ করে না থাকি বললাম, কী চুপ করবে। এখানে আমার আগেই আপনাদের সামনে কী করা হয়েছিল বলা হয়নি যে, একজনের আচরণের যদি কোন এ্যাকসিডেন্ট হয় তাহলেই তার জন্যে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। অন্যথা ওদের পক্ষে একই সঙ্গে হবে। বাদু আপনার—।

আমরা, অভিনিবেশ, দেখা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার পরে আমা

ছেড়ে উঠলো, কথা হয় নি যে টিকিটের দাম ছাড়া পায় ফার্মিলি—অল্প ঘৃণায় তবিৎ এ ব্যাপারটা থেকে নিজেকে সেরা তার অন্ধকার জায়গায় নেমে পড়লাম। সহসা সুদেষ্ণুর মুখখানা ভেসে উঠলো চোখের সামনে, কী যে ভোরা নাকি পূরী যাচ্ছিস? বলেছিলাম হ্যাঁ—ঠিক হয়ে গেল। তা সুব্রত জানে তো। সুদেষ্ণুর চোখে মুখে বিদ্রূপের চমক—এবার তোমার বন্ধুকে ফাটল ধরলো। আমি বলেছিলাম, কেন বলতো? মানের এমনি—তো জানিস। জেকেছিলাম, আমিই বোধ হয় খারাপ তাই আমার মনে হাতজোড় হয়নি—তোরা যে এতদিন কী করে এ্যাডজাস্ট করে বন্ধুত্বটা বজায় রেখেছিস ভেবে পাই না। আমি বলেছিলাম, দেখ সুদেষ্ণু, পাকলোনাল ব্যারেকটাকে, তার কী অত সব বৌছ জাতিনি—তবে যানি এতদিন মিলে মা জেনেছি আকটার আর ওর সঙ্গে মেশা যায়। অন্তত: মাইডটা খব ছাও না। সুদেষ্ণু মিচ করে হেসে চোখের তারা নাচিয়ে আঙুল তুড়ি মেরে বলেছিল, এবার এর সঙ্গে তো ওঠা-বসা করতে হবে তখন শালুক চিনবে দোপদল ঠাকুর। আমি বিশ্বাস করিনি, তাই বসে উঠে এসেছিলাম। সুদেষ্ণু বলেছিল, কাজটা খুব ভাল করছিস না। পূরী যাবি একা একা যা—একা ঘাওয়ার খুব আরাম—আর তোর তখন সেক্স-টেক্সের অভ্যাস আছে। বলে খেমে বলেছিল, যার কে যাচ্ছে, পরেশ—তা ওটা খারাপ না। মেয়েমানুষ ভাল চল। তবে খাকে হিন্দু মেয়েগুলির মত যেন তাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না—। সংশয়ে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। তাই মনের মাঝে পূরী যাব এই কথাটা বলার সময় ভেবেছিলাম, মন যদি পরীক্ষাভাবে একবার না বলে যেন তো কেঁচে যাই। কিন্তু পরিবর্তে আমাদের চমকে, আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, আমার তো মনে হয়, এ পর্যন্ত আপনি তোমাও যেয়েন নি—তা যান, ওবার স্টে করবেন না—। ভাবতে ভাবতে তখন এসে সমুদ্রের জল যেখানে লবাল ছেলের ঘত আছড়ে পড়ছে সেখানে এসে দাঁড়ালাম।

ঢেউ ভাঙছে, ঢেউ পড়ছে, উত্তাল হয়ে হাওয়ার সঙ্গে যেন যুদ্ধ করছে। লোকজন খুব বেশি নেই। কাঁকা কাঁকা জায়গায় দু-একজন বসে কেউ কেউ দল বেঁধে হাঁটছে। ভাবলাম, পাঙা আর প্রসাদ হাতে থাকতে পারে এজন—এমন সময় পেছনেও "ওয়াক" একটা শব্দ কানে যেতেই চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। আবছা অন্ধকারে চারজন মানুষ। দু'জন পুরুষ। আর দু'জন মহিলা। একজন বসে পড়েছে ঝাঁপির পলি ঘাঁটা বিছানায়। পরনে বলবটম পান্ট—মাথাটা ঝুঁকিয়ে বোধ করি বমি করার কষ্ট সহ্য করছে। অন্য মহিলা ঝুঁকে ধরে আছে তার মাথা। পুরুষ দু'জন কী হয়েছে বলে চেচিয়ে। সহসা শাড়ি পরিহিতা চমকে তাকাল, সমর—নামটা শুনেই চমকে উঠলাম। রূপার সর্বনাশ করেছে তুমি—আমার বুকটা ফাঁকি মেই। আমার মেয়ে মানুষ—অকস্মাৎ যেন প্রিকারের করে জাগলো সাবুকা তারপর রূপাকে ধরতে বলবে, চল ওকে নিয়ে হোটেলে—। বলতে বলতে অন্ধকার আর সাবুকা রূপার মুটো হাত ধরে ধীরে ধীরে তুললো তারপর বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে আলোর দিকে চলতে শুরু করলো—যন্ত্রণা অন্ধকার আর আমি সমুদ্র সৈকতে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম...।

সুব্রত আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। পরেশ আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। দেখ, অনিমিষে এবা এমন কি অনেক আমার মুখের দিকে তাকাতে ভোকরি তর পাচ্ছে অথবা—। সুব্রত আর পরেশ বাড়িওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে এসে তারপীতে লিখে ছেবে ফেডিং কাঁধতে শুরু করলো। তিন ফার্মিলির বেডিটো একটা ছোপ্ত অলে এসেছিল। একম টিনটা হলো। আমার কিছু জিনিস ওর ব্যাগে ওর কিছু জিনিস আমার ব্যাগে—সেওলো এখন যার যার ব্যাগে ফিরে চুকলো, অনেক কললো, আমাদের ফেডিটা বাঁধতে। চুকাই আর নক্সন ছাইছে উঠোনে বালির মধ্যে ছোরাছুরি করছে, অনেক নক্সনকে সামাতে বললো—এবার আমরা রওনা হবো। ভাবটা যেন কখন থেকে ওনেছি—এবার ছেলের পালা—কে যেন ডেকে বলে গেছে কানে কানে। জানি না, তবে পরশানি শুনেছিলাম মনে পড়ছে, একবার কোথায় পালা—। এমন সময় ট্রেচিয়ার কেশ পরিষ্কার ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে এসেছে। এই জামা-কাপড়েই তাকে চিনি তবে আজ কেন কেন নিউকাটা। কাঁধে তেল টিনে পানসার আলপাতার ঠোঙা, আর কক্ষার মধ্যতলায় মোড়া কয়েকটি মোড়ক। কেশ পরিষ্কার। ওকে পুরুত পুরুত লাগছে। বিদ্যুৎপ জলে পড়লো ছেলেতে আলজকে তার সন্ধানে মনিতে বিদ্যুৎকি করে মন পড়লো, তারপর সেকজে, অনিমিষে, সুব্রতকে, পরেশকে, আমাকে। এবং একটি কাজে তালপাতার কক্ষকো আর মধ্যতলায়ের মোড়ক হাতে তুলে দিয়ে কললো মা গো—মধ্যতলা—আজ থেকে তোমরা মা আমার নিজ হলে। নিজে চিটি লেখে মা—আমি আজকে টৌদনে—বলে নক্সন আর চুকাইকেও আলীর্বাদ করলো বিদ্যুৎপ। পরেশকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ওকে কি কিছু দেওয়া হয়েছে—পরেশ বলেছিল, একদিন ছেলেকারি কিছু দেওয়া হয়েছিল, তা সুব্রত জানে-চিকিতে আমাদেরকে হয়েছিল দিনভাং চল্লিশ ঘন্টা যে হিসাবের জায়গীরা ছেলের ওপর নিয়ে পড়ে আছে তার মনে নেই—। একবার মনে হলো বিদ্যুৎপকে জিজ্ঞাসা করি তার সেই ছোলকাতার বাবুরা এসেছে কিনা কিন্তু বিদ্যুৎপর মুখের দিকে চেয়ে কী ভেবে বললাম, বিদ্যুৎপ, তোমার অবস্থানে জমজা পুনি—কিন্তু কী দেব তোমাকে? বিদ্যুৎপ হেসে বললো, কী দেবে বন্ধু—তোমাদের ভালবাসা দেবে। আজকে আসবে আমার কাছে—জরুর পূজো দেবে। আমি দেখাওনো করবো বলে হাসলো। নক্সন কললো, আমরা তো চলে যাচ্ছি—আবার আসবো কেন? বিদ্যুৎপ হেসে জড়িয়ে ধরলো—আবার আসবে—তুমি বড় হয়ে আসবে—আমি তখন বুড়ো হয়ে যাব হা, বৌমাকে চুকাইকে বৌমাকে নিয়ে আসবে—আমি তোমাদের বুকিয়ে বুঝিয়ে আবার দর্শন করবো। জোগ এলে দেখ যাবে। নক্সন বিদ্যুৎপর গলায় সেপটি পাঁড়ালো—তুমি তখন বুড়ো হয়ে যাবে! বিদ্যুৎপ হো হো করে হেসে উঠলো। আমরা বললো বিদ্যুৎপকে কী দেবে? কিছু দেব না? চকিতে আমি অন্ধকার দিকে তাকালাম—কী দেবে বিদ্যুৎপকে? টাকা? টাকা কোথায়, বললাম, ঠিক আছে আমার পাঞ্জাবী আর বুটিটো দাও। কাজটা আমার মনে বিদ্যুৎপর দিকে তাকালাম। বিদ্যুৎপ ভালবাসা ছাড়াও তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে আমার। একটা আমার অন্ধকার ভরা অবশ্য বেশিদিন আমি পরিনি বুটি পাঞ্জাবী আমরা নেবে! বিদ্যুৎপ মাড় নেড়িয়ে পান ওওয়া দাঁত মেলে বললো, দেব বাবু, হাতে কাজে যা দেবে তাই নেবো। অন্ধকার থেকে বুটি পাঞ্জাবীটা দু-হাতে নিয়ে যেন অন্যমনে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বিদ্যুৎপ। সহসা আমার মনে এল "বন্ধু অড়াআড়ি।" আমি চকিতে নিজে দাঁড়ালাম। পরেশ আর সুব্রত পুজনে একসঙ্গে পরামর্শ করে আবার ঘরে ঢুকলো। আমি অন্ধকার দিয়ে দাঁড়ালাম। বিদ্যুৎপ ফেরিয়ে এলো আবার। জিনিসপত্র সব রেডি। পরেশ বিদ্যুৎপকে রিক্সার কথা বলতেই বিদ্যুৎপ ফেরিয়ে গেল। রোদের আলকানি করেছে ঘরা পড়েছে বাড়িওয়ালার সালকে উঠোনে। উঠোনের এক কোণে একমা কী যেন ফুলের গাছ। গাছে কিছে লালের ছোপ। সবেজ মুলের আবার নক্সন ব্যাকরার। পরেশ বললো, রিক্সা এসে গেছে একবার বলে যে আর বেডিং হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম কাঠের গেটের সামনে। সুব্রত বেডিং তুলে দিল সামনের রিক্সায়, পরেশ বেডিং তুলে দিল অন্যজনে দাঁড়ালো রিক্সায়। আমি পেছনের রিক্সায় বেডিং তুলে নক্সনকে বসিয়ে দিলাম। বিদ্যুৎপ তখনও দাঁড়িয়ে—বললাম চলি বিদ্যুৎপ। বিদ্যুৎপ বললো, চলুন বাবু, আমিও যাচ্ছি কিছুদূর।

ধর্মবার পেছনে ফেলে রিক্সা ছুটে চললো সমুদ্রের পা ঘেঁষে। নারী-বারী হোটেলের সামনে দিয়ে। তাকিয়ে দেখলাম, রূপা, শান্তা, তপতোষের দেখা আর কিনা। অন্ধকার কথা ভেসে এলো ওর অনেক কিসিমপত্তর কিনেছে। অন্ধকার কথা কানে এলো বটে কিন্তু চোখ আর মন তখনকে অতিক্রম পেছে যে সীমাহীন অপার জলধির বুকে। বেখানে রাশি রাশি ঢেউ ভাঙছে, ঢেউ পড়ছে আবার ভাঙছে আবার পড়ছে, সৈকতে এসে ঘুঁই ফুল হয়ে আবার ঘন নীল ঢেউ হয়ে যাচ্ছে। কী অপূর্ব! আহা—

রিক্সা থেকে নেমেই অবাক। দেখি শান্তা আর তপতোষ দাঁড়িয়ে। শান্তার মুখে নিটোল হাসি। আমরাও আজ আছি দাদা। ভাবলাম যদি, তোমরা তো সমুদ্র দেখতে এসেছিলে, জগন্নাথ দর্শনে এসেছিলে আমরাও এসেছিলাম তাই দেখতে কিন্তু দেখতে হলো সাগর সমুদ্রের অন্তর নিষ্ঠুর চেহারায়। জানি না, সেই ঝউল সাগর সমুদ্র দর্শনের ইচ্ছিতই দিয়েছিল কিনা। সহসা তপতোষ ছোঁচা মেরে আমাকে কী যেন ইশারা করলো। তাকিয়ে দেখি অদূরে দাঁড়িয়ে রূপা। কেন জানি আমার মনে হলো, এই পড়ন্ত বেলার নিস্তেজ আলোয় ও যেন রূপা না সেই নক্সন জননের নিজ। সেমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ভিজন বিবা কোনরূপ স্থির এক বিজন প্রতিমা। রূপার পরনে আজ সেই, সেই বেলকটম যার রঙিন ওড়নার টসক এবং রূপের অন্ধকার। বসন বিরে সবুজ রঙের জরেটি শুকিয়ে, আনত মুখে বিষাদতা ছড়িয়ে পড়েছে। ইচ্ছে হলো পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই ওর কাছে। ফিরে যদি, রূপা তুমি যদি হয়েই বিশ্বাস হত্যার হাতে। নক্সন জননের অভিনী নিজও বলি হয়েছে—আর অমনি বলি হয়েছি পনের ঘাই আর একখানা সিমেন্টের লাল মেঝের ঘরে। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের প্রেম সব, সবই—

হঠাৎ শান্তা কথা বলে উঠলো। ঘড়ি ছড়ার ঘন্টা দিয়েছে। কামরার পিটোর ওপর বসে ঘোলা জানালা দিয়ে জগন্নাথের মন্দিরের দিকে তাকালাম। পড়ন্ত সূর্যের রাঙা আলোয় কলমল করছে চূড়ার মাথায় ত্রিশূল। আর মনে হলো, সেই ত্রিশূলের মাথার মুক্তি লুটোপুটি খাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ। ঢেউ ভাঙছে, ঢেউ পড়ছে, ঢেউ বুদবুদ হয়ে—ঘুঁই ফুল হয়ে যাচ্ছে। সেই ফুল আবার সমুদ্রে গিয়ে নীল ঢেউ হয়ে ফিরে আসছে।

প্রতিনিধি

অজিত কুমার বসু

কথাগুলি কানে যেতেই পরম নিশ্চে চলার প্রতিক্রিয়ার মত কী-কী যেন উঠেছিলো আনচান। রক্তে শিরশিরে উত্তেজনা। মনের সেই অকৃত্রিম ক্রিকেটার নামাঙ্কিত প্রতিক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করার না ছিলো সময় বা পরিস্থিতি। নেহাৎ-ই দক্ষিণ হলে হবু না হয় কথা ছিলো। এরে আছে অনেক কিছু। সে-সব কিছুর হাত থেকে উদ্ধার এক যদিও চাচ্ছিলে, আপাত পলায়ন চাই তখন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

পলায়নের একলহমা আগে মাথাটা কেমন যেন ঘুরিয়ে এনেছিলো প্রতীতির। ওকতার মাথাটার মধ্যে কে যেন বারুদ ঠাসল ভুলে কলেছিলো। কথাগুলো মনে না এলেই মুক্তি ছাড়ানো যেতো। পরমুহূর্তেই নিজেদের অসহায়তার বদলে দেখা দিলো ঘৃণার এক ঝলসানো উল্লাস। আসলে আসলিকে চিনে যে গ্লানি। পারদর্শিতার সীমানা বিস্তারের সাথে সাথে সে গ্লানির পরিসর যে নিজেকে অতিক্রম করবে—এ আর বিচিত্র কি।

কলেজ-লাইব্রেরী-তে একখানা ক্রসওয়ার্ড-রোমান্থের বইয়ের খোঁজ করছিলো রনি। কিন্তু মেলেনি। প্রতীতি বোমাঞ্চকর কিছু আবিষ্কার করে বইটা খুঁজে পেতেই ছুটেছিলো কবিদের বাড়িতে। বই-টা পৌঁছে দিয়ে রোমাঞ্চিত চত্বরের বায়ুকোণে আসতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। অকস্মাৎ ঐ প্রবল বর্ষণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে, তরাসে উঠে দাঁড়িয়েছিলো সামনের কাঁঠাল গাছটার উপর।

চিনারে না পারার কথাতো নয়। এটিতে বারকয়েক নতুন পারলোনেল-অফিসার উত্তেজনা। কিন্তু!

তিনি যে এমন ভাবেন এবং ভাবিনার মানুষ এই কথাটা মনে হতেই কেমন এক বিশ্বয় ছড়ায় মেয়েটির মনে। আপনজনেই বলে ওঠে প্রতীতি : না হলেই বা কি।

নোটেই নিজেকে মন ভাবলো। কেমন যেন! — আপন মনেই বিড়বিড়িয়ে ওঠে প্রতীতি। মুহূর্তেই কেন যেন চমকলাগে প্রতীতির। একবার সেই বিশ্বয়কর পড়িলো মন। এ যেন অন্যবাড়ি। থেকে থেকে পরপরিবার উঁকি দিচ্ছে। আওয়াজ আসছে বিচিত্র সব কণ্ঠের

আনমনা সন্ধ্যা হয়ে ওঠে বুঝি প্রতীতির। আপন মনেই প্রশ্নাকুল হয়ে বোধ হয় কোন মিটিং চলছে চিনারে।

কিন্তু এ কেমনধারা মিটিং। আলোচনার মেজাজ ধারা কেমন যেন। আপ আদমির এমনধারা পরিবেশে সঙ্গে।

বিশ্ব ও ধর্মের ধারণাকে ঘিরে প্রতীতির কাছে সমান পৌঁছে দেয়ে অন্য রহস্যে। প্রতীতির কাছে

যাবে। একটা ভাবছেন আর। ফেলবেন তো, একদিনের মাহাত্মেই কেমন সব চুপসে গেছে!

পাশ থেকে কে কেন বেঁড়ে কলায় জবাব দিয়ে ওঠে : আরে এ তার সেজ আদরের ভূতে মুখোপাধ্যায়, হিটলার, তোজো বলে ডাকে। খেপ নামগুলোই অবে ভূতে পেয়ে বসেছে।

প্রতীতের গলা-টা বুঝি ওদিকে আসতে আসতে এসব কথা শুনে। অসহায়ের মতো তাকাতে থাকে সে এদিক-ওদিক।

কথার কথাগুলো তেমন উচ্চকিত নয়। ঘটটা কানে এলো, তার মধ্যে বারুদকে "ওয়ার্কস্ ম্যানেজার," একবার সম্ভবত : "শ্রমিক" ও "শ্রমিক ইউনিয়ন" শব্দ প্রয়োগে কিছু সতর্কীকরণমূলক উপদেশ দিলেন বুঝি তিনি তাঁর অনুশাসনের।

গলার উত্তরায় কাঁচ ফেলে কেউ একজন তড়পে ওঠে : শা-, লোহাকাটা, তোদের ঘুনিয়নের বাজারে মারোটা। সবে তো টাকটিস ছেড়েছি একশীফ্। অফিস রাখা নিয়েগ তো ওয়ার্কস্ ম্যানেজার কেন তি.....

হিস্-স্-স্—!

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শিসের অওয়াজ উঠতেই থেমে গেল সব আলোচনা। তড়িঘড়ি উঠির মধ্যে কে যেন টেনিয়ে উঠলো ওক, কে একজন ম-হিলা মাইরী মাজমান পাঁড়িয়ে.....

হোয়াট!

ওদের মেরেছলে সবাই! স্বপন্!

ওলো যার কুইক্।

তৎক্ষণাৎ একলাফে পথে নেমে ছুট লাগিয়েছে প্রতীতি। মেলিস ইলেকট্রনের ইন্ডাস্ট্রি-কলেজ-ক্যাম্পিয়ান সে। কুক্কুরের ছুটে চলেছে, কুক্কিক ডাকা ছেড়ে.....।

কিলাল এলাকা নিয়ে পড়ে উঠেছে নিত্যকলের এই অন্ধকার সাঁঝটি, চারধার টা বার উঁচু পাঁচিল ঘেরা। অন্দরের প্রায় এক তৃতীয়াংশে ছাটি ওয়ার্কস্-শেড্, অনেকটা প্রায় ইংরাজী 'এল'-অক্ষরের কিনারে পাঁচিল ঘেঁষে সেড্গুলি। সামনের বরাবর বড়দালের একটি দরজা জলাপথের সিঁড়ি পাঁথানো চওড়ায় বুঝি ফাট। আড়াআড়ি ক্যান্টিন ও জিম্নেসিয়াম। এদ্যুকা আছে, মস্ত খোলা ও বিশাল উঁচু খাড়ী আয়না ওয়ালা একাও বিতল অফিসবাড়ি। অফিস বিল্ডিং-এর সদরে সদরে গড়ে তোলা ত্রিভুজাকৃতি বড় একটি কুসুমের বাগিচা। অফিসের বিপরীতে লাইব্রেরী এবং তার লাগোন বরাবর সমুখ চেনিস্-লন্। বাকী অংশে অফিসার্স্-কোয়ার্টারস্।

কারেজন-কোয়ার্ক-মালিও সুইপারদের আবাসন অবশ্য কারখানার সীমানার, প্রাচ্য ও পরিবেশ বজায় রেখে তৈরি হয়েছে।

অফিসার্স্-কোয়ার্টারস্ অঞ্চলটি ভেতরের আলাদা উঁচু পাঁচিলের নিরাপত্তায় বিচ্ছিন্ন এক পৃথক জগৎ। ভিতরে বাইরে যাওয়ার জন্য দুটি মিয় "প্রবেশ-বাহির দরজা।"

ভেতরের বাসিন্দা মূলত : অফিসারদের স্বাচ্ছন্দ্যে করেন কারখানার বিভিন্নটিতে আসা-যাওয়ার প্রয়োজনে। অফিসারদের পরিবার সদস্য জন্য তেমনি বাইরের ফটকটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। বাইরের বৃহত্তর দুনিয়ার সাথে যোগসূত্র গড়ে রাখার একমাত্র ও নিজস্ব অবলম্বন।

সেই পাঁচ-কি-ছয়টি ভূতের চরিত্র কখন মনে পড়ে গেছিলো। মেলে ওঠে সে আকাশ মনে। ঝরি মৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে নিয়ার ছুরিটা এনে ফলাবিল। ইস্, আগেলেন যা অবস্থা। এটা সঙ্গে নে। পথে কাজ লাগতে পারে।

ভাবছে প্রতীতি বলাবিলো : 'একজন নয়, কারখানার পাঁচিরে ঘেরা কলটিই বুঝি লড়া করছে ভূতে।

ফেরে ঘুরতেই যেমন এক আজগুবী চিত্রে ধরে প্রতীতিকে। পা-দুটি বুঝি চলতেই চাইছেনা আর। এতক্ষণে তাৎক্ষণিক চিন্তা-কে ছাপিয়ে কারখানাটির সাথে তার গভীর অন্তরঙ্গতার অনুভূতি প্রকাশ পেতে থাকে ধীরে ধীরে।

আরও ছোট ছিলো যখন সে, তখন কারখানাটিকে তার মনে হতো: যেন এক রূপকথার রাজ্য। দু'পাশে সারি সারি পাত্র আকারে ছড়ানো লাল-সুরকি রঙানো বুরুজের কয়া ওড়া পথ, মাঝ পাশ-চত্বরের এপিরে মেয়ে হাজিরা অফিস থেকে মূল অফিস, ওখান, কারখানার এক সেড থেকে অন্য সেড হয়ে, ক্যান্টিন, লাইব্রেরী, জিম্নেসিয়ামী, ফুল-অফিস, কখনো আবার ঘাট পর্যন্ত। বিচিত্র বর্ণ-পত্রের মানুষ ফুলের কেয়ারি ; কর্মরত-মোলাদের-মুখর লোকজন। প্রতীতির বাবা তখন কাজ করতেন এই কারখানায়। দুপারভাইজর ছিলেন তিনি। শ্রমিকদের নিয়ে কাজ, তাই তাদের সাথেই তাঁর মত ঘনিষ্ঠতা। তখন কি-সবের বিশ্বকর্মা পূজার দিনে কারখানার এসেছে সে বাবার সাথে। সুপারভাইজরদের জন্য তখন কোন কোয়ার্টারস্ ছিলো না ; এখনো নেই। উঁচুতো কত তোরে। তৈরি হতো অফিসারদের জন্য। শুধু তো যার পূজা দেখা নয় ; নিজের হাতে অজান্তে ফুলের বেকারি, পূজোর নৈবেদ্য। কারুর হাতেতো না, খেতে হতো ঠাকুরের সামনে। এই উপলক্ষে তখন থেকেই তো মানবকলের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা হয়ে আসছে। একবার কারুকুরা তাকে "ঘাড়ি ভাঙা" খেলায় নামিয়েছিলো। জীবনে প্রথম স্পোর্টস্। সেদিনের সেই অনেকটাই তাকে মন্ত্রের মতো হেলনা ঘুনিয়েছে, আজকের এই অবস্থানে ওঠার ক্ষেত্রে।

কারখানা ক্রমেই বড় হয়েছে, বেড়েছে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা। মেশিনপত্র-যৈচিত্র এসেছে উৎপাদনের উপকরণ ও পদ্ধতি-তে।

শ্রমিকরাই নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুলেছে লাইব্রেরী। ফলাফলে, সেই থেকেই শুরু আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার এবং বছরে একবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। প্রথমদিকে, কলকাতার নামকরা সব নাট্যগোষ্ঠী ও শিল্পী-কলাকুশলীদের সহায়তা অনিবার্য সাথে থাকতো নিজেদের দু'একটা আবৃত্তি ও গান। এখন পেশা অনুষ্ঠান সৃষ্টিতেই শ্রমিক-কর্মচারীর মিলেমিশে অংশ নিয়ে সৌন্দর্যের পরিবেশে উৎকর্ষতার নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে আসছেন।

প্রতীতির ঘোর বুঝি হঠাৎ অন্ধকার হয়ে ওঠে। মনে-পড়ে ঠাকুমা তখন বিছানায়, ইতিহাসিয়ে পড়ছে। একজন শ্রমিক-কে মৃত্যুদিন থেকে বাঁচাতে নিজে বাবা নিজেই হলেন সেই মৃত্যুবাণের নিশানা। এক আকস্মিক দুর্ঘটনা নেমে এসে সবকিছু। তখনো কারখানায় যোগ শ্রমিক-ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি। ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধি ছাড়া-কে খুব একটা দেখতেন। তারাই উদ্যোগী হয়ে, কর্তৃপক্ষকে দিয়ে অভিপ্রায়ের আবেদন জানালেন। কর্তৃপক্ষ অবশ্য সততা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করে জানালেন। এক্ষেত্রে ওটাতো মন রাখার মতো দেখাবে। ওরা কি তা নিতে চাইবেন।

মনা-কে বিলেত পাঠানোর জন্য কিছু যেন করেছিলেন। সে মেনার প্রোট অংশ-টাই কোম্পানীর কাছে। ওদের টাকায় বিলেত যাওয়ার প্রস্তাবে পাত্তার মত ছিলো না।

বাবা বলেছিলেন : সমস্যের জন্য অভিযোগ করার মত অকৃতজ্ঞ মুমিও নিশ্চয়ই।

একথার গভীরতা সেদিন বুঝেনি প্রতীতি। সেই কেবলই বুঝি আজ আমার চারপাশে নতুন করে আলোকন তুলে, অন্তরতর্পণে প্রত্যয়নি জানাতে চায় তার বর্ণাঢ় পিতার উদ্দেশ্যে।

নিজেদের কোয়ার্টারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখন প্রতীতি। অন্ধকারের নিস্তব্ধবিস্তারী ঘনঘোর-কে কাঁপিয়ে তেবে মেয়ে গলায় উঠলো কিছু। পরক্ষণেই বা এক দুর্বোধ্য আক্রোশে তেবে পড়তে চাইলো বুঝি গোটা আকাশ। আতাসে বাতাসে ছড়িয়ে এক তরঙ্গের পর্যন্ত। ওহু-ওহু-ওহু-ওহুহুহু—.....।

প্রতীতির মনে হতে থাকে। বাইরের এই দুর্যোগ বুঝি এই কারখানাটির অন্তরতলের কোন নতুন দুর্যোগের পটভূমিকে ঘোরণা করে চলেছে।

মায়ের নজর এড়িয়ে দ্রুতপায়ে বাগানের ঢুকলো যখন প্রতীতি, বাইরে তখন ঝীতিমতো ঝড় উঠেছে।

একসময় ঘইখুলে পড়তে বসতো বটে প্রতীতি, কিন্তু মন বসতো না কিছুমাত্র। অন্ধকার ঘরে আগুনে একটি বল-ই বুঝি তখন তার দু'কানের পর্দায় এসে আঘাত হানছে। "ওহু আমা!" কান্না। কি ওদের উদ্দেশ্য!

কারখানার বঞ্চিত-পীড়িত শ্রমিকের, নিজেদের জন্মের বিনিময়ে যাঁরা চান সুখময়তায় বাঁচতে, সবার জন্য পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তুলতে, যেন তাঁরা বারবার নতুন নতুন হিংস্র চক্রান্তের শিকার হবে।'

এইসব তৃষ্ণ-পীড়িত শ্রমিকদের ধ্বংস করতে একদল 'তাড়াটে বহিরাগতদের আবলাবী বন্দুকের মালিক, তার কাছেনী বার্থ, দেশেদের বজায় রাখার তাগিদে। কৌশলে এটা নিয়েছে তারের পরে শ্রমিকের দেখেন।

কী করবে এখন প্রতীতি? কিছুতেই সে ঘুমে উঠতে পারে না। মা-কে জানাতে হবে। কিন্তু সে জানানোর প্রতিকার কতটুকু। জানলে, হয়তো এত কিছু সতর্ক হবার সুযোগ পাবেন।

মনা সেদিন মা-কে বলেছিলো.....ফেরিয়ারাগ প্রাইভেট কোম্পানীতে দু'বছরের আর্থীকারীর সন্ধানে বেরুচ্ছে। একদল প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষজ্ঞ, কিন্তু তাদের ক্ষমতার প্রয়োগ নেই ; যন্ত্রাদলে থাকেন ফাইন্যান্স সাহেব। তাঁদের হাতেই থাকে ক্ষমতার একমাত্র প্রয়োগ। এই দুটিদলের মধ্যে ফারাক এতটাই উঠেছে, যে যেকোন নিয়ন্ত্রণের ভরসা অপূরণই থেকে যায়।

এই কথাগুলির মধ্যে প্রতীতি যেন তার ভবিষ্যত

এক মুক্তিপ্রার্থী আসলো দেখতে পায়। দেশ নয়, এর জাতীয় সার্বভৌম বিভেদও ; শুধু চাই স্বাতি-মুনালা ; এদের সমাজ-পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কায়েমী সার্থের নীতিহীন আক্রমণের অবসান স্বকার।

সন্দেহের ছায়াটা এবার প্রকট হয়ে ওঠে তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে। ওয়ার্কস্-ম্যানেজারের বিরুদ্ধে এই তাড়াটে পেশীর কেন এই আস্ফালন। অপছন্দ হলে সরিয়ে দিতে কতক্ষণ! পাবলোনাল অথিলারঞ্জন ওয়ার্কস্-ম্যানেজমেন্টের অন্যতম কর্তাব্যক্তি। কারা মদতে তিনি এই পর্যন্ত কাজ নামাতে সাহস পান! এসব রীতিমতো বিস্ময়কর। শৃঙ্খলার নাম চরম উচ্ছৃঙ্খলতা। সমস্যার অন্ধকার পরিবেশের পথে ধাবমান।

আপন মনেই মন মন মাথা নাড়তে থাকে প্রতীতি। না-না, এসব ভালোর লক্ষণ নয় ; এদের অগ্রসরে দেওয়া ঠিক না। কিন্তু—

প্রতিকারের উপায়ের চিন্তায় ঘর-বাইরে অস্বাভাবিকের করতে থাকে প্রতীতি।

বাবার মুখের এক তীব্র ভিন্ন প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় প্রতীতি তার মনের পর্দায়। মাসী, অমিতেশ, এখন এই কারখানার চেয়ারম্যান ওয়ার্কস্-ম্যানেজার। আজ ফোন যা বলে গেল, ওয়ার্কস্-ম্যানেজার হবে বলা তখন এই উচ্ছল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের উকা লয় থেকেই তার বিরুদ্ধে, বর্তমান ঘটনার প্রবাহে হয়তো আরও বহু কোন চক্রান্ত জমেই ঘনঘোর হয়ে বিষিয়ে তুলবে তাঁর জীবনময় শেষী পরিবেশ-কে।

খেলা-দির কথা মনে পড়ে প্রতীতির। মাসীর কলেজ জীবনের বন্ধু, সাথী ; স্বাতি জীবনের উর্ধ্বে শুভ্র জীবনের মৃদুতর পরিমিতে মৃদুস্বরে ওঁদের ঘরের কথা কতটুকুই বা নিজের উপলব্ধিতে আনতে পারে সে। প্রতীতির সাথে তাঁর প্রথম আলাপ আজার মৃত্যুর পর। ওদের সংসারের সেই অন্ধকারময় দুর্যোগের দিনে খেলা-দি এসে দাঁড়িয়েছিলেন ওদের পাশে।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো প্রতীতি। মনুষ্যের দীপ্তি, না 'শ্রী'-র ছটায়ায়, না কি এ দুয়ের মেলবন্ধনে অবর্ণিনীয় সন্ধান মিলেছিলো প্রতীতির দু'চোখের প্রতিচ্ছবিতে? আর কৈশোরের ছাড়ি ছাড়ি অবস্থা তখন তার। প্রতীতি আজ বুঝেছে। মেয়ের কর্মহীন দুর্যোগলোকে একদণ্ড জীবন ইশারায়ের সাক্ষাৎ ঘটেছিলো তার জীবনে।...

সেদিন খেলাদি এসে না দাঁড়ালে কী অপরিসীম ক্ষতি-ই না হতো এই সংসারটির।

ছন্দ ফিরাব ফিরে যেতে রাজী নয় ; যেমন যেমন একটা চাকরী তাঁকে যে নিতেই হবে। না হলে, সংসার যে অচল।

অফার প্রতিষ্ঠেন্ট অতের সকল তুলে এক গ্রহের গল্প বলতে যা কিছু ছিলো, বিচি ফরে সেদিন কোম্পানীর মেনা ফিরিয়ে মা-কে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে দেখেছে প্রতীতি।

সবই যার অভাবিক হয়ে এলো শুধু একটি মানুষের আকস্মিক সমাবর্তে, তিনি খেলাদি।

খেলা-দিকে এতকাছে পেয়েও কতটুকুই বা আহ্ সে জেনেছে, বুঝেছে ওঁকে। ওঁর মতে, অমিতেশ রায়চৌধুরির জীবন সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর ও প্রশ্ন উত্তেককারী তথ্য সে জেনেছিলো আজকে, যেদিন এক বিদেশ মৈত্রিকে তাঁর ছবি সমতে জীবনী প্রকাশের পর। সে-সবগুলোতে পড়তে সেদিন কতবার যে কান্নায় ভেঙে এসেছিল তার কণ্ঠ। অমার্জিত চোখের পাতার মৃদু উঠেছিল প্রতীতির অন্তরেরই ক্ষমা। চোখকে পরিত্রাণ করার সাধ্য আজও ছিল না খেলাদি। পরিমের অবহেলার চাইতে মানুষ যে কত বড়, তাই তুমি দেখালে আমায়। তুমি বেঁচে রইলে আমার মধ্যে। কিন্তু পারলি প্রতীতি। আমারই সে ভোগ পড়েছে, আজার।

রাতের আবার টেবিলে বাবাকে আশা করেছিলো প্রতীতি। মা-কে চলে করতে তিনি বলালেন। ভোজে তো বলালাম ; ঘনি-র ফিরতে ফিরতে রাত হবে। হেড-অফিসে জরুরী মিটিং-এ পেছে। ওখানেই রাত্রি খাবার ব্যবস্থা আছে।

প্রতীতি কিছু একটা বলতে চেয়েছিলো। কিন্তু, আকস্মিক এক ঔদাসীন্যে আসনের তীব্র ঝাঁকা এসে নিজেকেই ফেলে নিয়েছিলো তার মুখের কথা। শুধু চোখ—তাও তো-ই নয় ; পরমুহূর্তে কানের পর্দা ফাটিয়ে এক ভয়ঙ্কর "ফড়-ফড়ানি"। মনে হয়েছিল ; খোটা আসমান-চাঁদ বুঝি তখন-ই খন্ডখন্ড হয়ে অন্ধকারে ঘরে পড়বে নিশাবৃষ্টির মতো।

শুধু কি আর প্রতীতি নিজেকেই ফেলে হয়ে গিয়েছিলো বুঝি গোটা বিশ্বসংসার।

রাতের মুখের দিকে তাকায় প্রতীতি। কেমন হতচকিত পাথুর ছায়া নেমেছে সে মুখে। চোখ দুটি মরা মাছের মতো ঘোলা পুরা, স্থির।

নিশ্বাস ভারী হয়ে আসে প্রতীতির।

একটানা চকিত সোডিয়াম উজ্জ্বলের কোমলতা। সে চোখেরে ধারণাটিকে বেঁধে ওঠে প্রতীতি। চোখ মুখে পরীর উৎকণ্ঠার ছায়া।

টেলিফোন বেজে ওঠে এমন সময়। বজ্রাহতের মতো ছুটে যায় প্রতীতি। রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে অমিতেশের ভেসে আসে ; মা কোথায় যে চিঠি? ভেকে দে।

মা, ভেসে আসেনি পড়াশি। ফিরতে দেরি হবে। চিন্তা কোরনা।

রিসিভার নামিয়ে রেখে মা বলেন। অমিত আসতে দেরী হবে। তুই ওরে পড় চিঠি।

একটানা দীর্ঘ উত্তেজনার পর এতক্ষণে প্রতীতির চান-টান ছায়ুগুলি ঢিলিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু ঘুম আসে না তবু। অন্ধকারে মনের পর্দায় ভাসতে থাকে নানান ঘটনার ছবি। সে-সব ছবি জীবনের বিস্মৃতি পরিসরে অন্তরঙ্গতার বিচিত্র উপলব্ধিতে ভরা। প্রতীতির জীবন অভিজ্ঞতা তো শুধু তার পরিবার-পরিজনকে কেন্দ্র করে নয় ; স্কুল-কলেজ ও কারখানার পরিবেশও এই মুহূর্তে নানান আলো-ছায়া, সুর ও আবহের মূর্ছনা তুলে জমেই, বৃদ্ধি একটি মাটি-জল-আকাশ-অরণ্যের পরিবারে তাকে আপন করে তুলেছে। এতদিনে নিজেই তার জীবন-সংগীতের ঐকতান। ফলে, এ-সব কিছুই পরম্পর অবিচ্ছেদ্য। এতদিন যেন একটিকে বাদ দিলেই বুঝি ছন্দ-তাল ও সুরের পতন ঘটবে। জীবন হয়ে উঠবে অর্থহীন।

প্রতীতির মনে হয় আজ ; এরা যেন ঠিকবিক্রেতা নয়, ধরা ছোঁয়ার ভিতরিনি।

হঠাৎ বুঝি চমকলাগে প্রতীতির। ঘনঘোতি করে ওঠে সে। এতসব ভাবার জন্যে তখন থেকে বুঝি দিনের ভবিষ্যতের ছবি-ই যেন ভাবনার ঘুরেফিরে দেখা দিচ্ছে। এ দুটির একজন পুরুষ, অন্যজন নারী। নারীটি তাঁর সকল ভয়ের ঘনিষ্ঠ আকর্ষণ সত্ত্বেও নিজের পরিচয় দিতে চাইছেন না। মেঘে ঢেকে চাইছেন রহস্যময়ী হয়ে।

"কেন-কেন? কে তুমি?—বিস্ময় স্বাকুল কণ্ঠে ধ্বনি করে প্রতীতি।"

কোন জবাব না দিয়ে নারীটি ধীরে পায়ে এগিয়ে এলেন প্রতীতির কাছে। সন্তর্পণে প্রতীতির ডান হাতখানি নিজের বুকের কাছে টেনে নিলেন।

প্রতীতি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে পুরুষ মূর্তিটিও ততক্ষণে তাঁর সমস্ত দূরত্ব ঠেলে আমার একান্ত সান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন।

একী· এ কী কথাগুলো অন্তর্যামী। বহুসময়ীর মূর্তিতে ধরা নিজের ডান হাতটিকে সে সরিয়ে নিতে চায় একান্ত সংকোচে।

বাঁদের জন্য তোমার সাজোন, তাদের সাথে ঐক্য না হলে কী সে সাজোনে জয়লাভ করা যায়।

ক্রোধক্রমের দোল লাগে প্রতীতির বুকে। এবার চিনতে ভুল হয় না প্রতীতির এই তো সেই পুরুষ, যাঁকে সে সর্বদা দেখে এসেছে যৌবন দীপ্তিতে ভাস্বর অন্তরময় জীবন-ব্যক্তার বিচিত্র রূপে তখন তুলতে— সেই আকৃতিময়, কখনো যা রূপকল্প, কখনো আবার নানাবিধ ভঙ্গিমা ও সম্ভবিত দেহ সৌষ্ঠবে নৈপুণ্যে ভাস্কর্যিত।

এমন একটি ঔপন্যাসিক নেতৃত্বকে-ইতো প্রতীতি খুঁজে ফিরছে এতদিন। শুধু কি আর খুঁজে ফেরা? চেয়েছে নিজেকেও সে-সব লড়াইয়ের প্রথমসারিতে সামিল করতে।

প্রতক্ষণে সব অন্তরের যন্ত্রণার অবসান্তে সাথে ফিরে, দেখা দিলো চেতনার নতুন সূর্যোদয়। স্বাস্থ্যকণ্ঠে ডাক করে প্রতীতি খেলা-দি তুমি! তুমি বেঁচে আছো!

যাঁরে, কে আসলে আমি মরেছি। মারতে ওরা চেয়েছিলো, কিন্তু পারেনি। কোনদিন-ই পারবে না ওরা। আমি যে তোদের সকলের বুকের সাথে বিশ্বাসের সাথে মিশে যাই। "এক-আমি" এখন শত-সহস্র "আমি"-র অধিষ্ঠেয় রক্তপদ্মের দলে মেলে রয়েছি। জাগতে যে তোমাকে হবে-ই। একলা তো শেষ হবনি আমার কাজ। শেষ হতে অনেক বাকী... ।

ওরে আমে তোমার। কারবার কোন দিনের তথকের মিনকে ফিরিয়ে আনা যায় না। অভিজ্ঞতার সব সময়ে ঝঞ্ঝার লড়াইকে নতুন করে শুরু দেয়। সেদিন ওরা আমাকে গ্রহরে দিয়ে এখন নিজেরাই ভয়ে মরছে। মত ও আদর্শের নামে ওদের জীবন ধূলিতলোয় মুখোশ খুলে দেছে। অন্যায়ের ঐক্য ভাঙতে গিয়ে ওরা ভেঙেছে খান খান হয়ে। তবু ঘনি, তার আরও মূল্য হয় নি ধূলিমা ভেঙে। তাই, চাই সকল স্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নতুন করে জাগরণ। এছাড়া আর কোন পথ নেই জীবনের।

হঠাৎ কেন খেলা-দির মুখোমুখি প্রতীতির মুখের আদল পায়। বৃদ্ধা প্রতীতি, চেয়ে আছে মুখোমুখি। চিনে নিয়ে চায় একে অন্যকে।

ঘুমে ভেঙে আর প্রতীতির। নক্ষত্রলোকের ভোরের আলো তখন ছড়িয়ে পড়েছে দারুবনে।

নতুন আকাশ

গৌতম দে

... আসের ঘাস বড় মিষ্টি। ঘাস বলতে যতদূর তখন। পায়ের তলদেশের ভেতরে থাকা নার্ভির স্নায়ু শিত উপ্ত। বড় মিষ্টি। আবেগে অবাধ্য নাথাটা ক-হাতের মাসুতে তার চেয়ে আন ছড়ে ঘাসের ওপর ছিঁড়ে সামনের পাটির ওপরের ও নিচের পাঁত দিয়ে আলতো করে ঘাসের ডগা ছেড়ে ফল নিড়ে নিতে নিতে শেতন ভাবছিল এখনও কেন কেউ যুনিভার্সিটিতে আসছে না। আজ সে একটু আগেই এসেছে বিকেল বিকেল চলে এসেছে। সন্ধ্যের যুনিভার্সিটি। সন্ধ্যের পর থেকেই ভিড় জমতে শুরু করে। দুপুরের ছেলেমেয়েরা সব চলে ছায় একে একে। তারপরে সন্ধ্যের ক্লাশ বসে। দস্তোর শুরু হয়। আপিসের। সামনের এই লনে। এই লনই শেতনদের খুব প্রিয়। ঘাসের গালিচা পাতা। মাঝে মাঝে বড় বড় অশ্বত্থের ছায়াতল। ছাতিম, খিরিশ, ইউক্যালিপটাস, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ইত্যাদি। আশের গোড়াগুলো ইঁট দিয়ে বাঁধানো বেদি করে। ওপরটা বসবার জন্য সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। শেতনের ভারি ভাল লাগে এই পরিবেশ। বিকেলে যাবে মধ্যের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উত্তরে পড়ন-পাঠনে এবং অন্যান্য। লাইব্রেরি ছুটে ছুটতে পটাপট করে। আর এ বড় বড় গাছগুলোর তলায় একটু ছায়া খুঁজে নিয়ে মৃদু অন্ধকার খুঁজে নিয়ে বসে পড়বে এক একটি দল। ওরে বসে কখনো এ ওর কোলে মাথা রেখে আড্ডা জমিয়ে তুলবে ওরা। রবীন্দ্রসঙ্গীত, পপসঙ্গীত এমনকি আধুনিক গানের সুরও শোনা যাবে কান পাতলে। ঐসব আড্ডার হলের থেকে। এটা সপ্তমেতনদের 'আড্ডার হলের' কথাটি ব্যবহার করে শেতনরা। সত্যি কথা বলতে কি এই হলের খুঁজে বেড়াতেই তার যেন অনেকটা যুনিভার্সিটিতে আসা। নইলে সারাদিন অফিসের দশটা-পাঁচটা সেরে তারপর যুনিভার্সিটিতে এসে আবার ক্লাশ করা, বেতনার সৃষ্টিশীল হিসেবে এমএ কথা এসব ছাড়া না তার জীবনে। এমএ-র পড়ন-পাঠনেটা যৌন নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এসে শিক্ষার সুযোগটা কম কিছু নয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আড্ডাটাই যেন আকর্ষণ। অফিস আবাস। সারাদিনের সব ক্লান্তি দূর করে দেয়।

ঐ তো ছোটকাকী তেয়ারজন বলা আসছে। তারা যায়। সেই আর অশোকের থেকে আসে ও। আর একটেকটে থেকে আর ক্লাশ করে নিয়ে যেতে যেতে। স্বপ্ন বলতে গেলেই বলে, আসিস কেন মরে এই এ্যাদ্দুর। পরে আর ফিরব মত দূর ওরি। তবা হাসে। তারপর অনিমেষ কৌতুক করেই বলে, কী তবব বলা দিয়ে ? না, তাই সময় নষ্ট না করে এই একটা পড়ছি। একটা সমস্ত লেগে গেলে দেবি পড়া আসবে! তবে স্বপন তেমনে তবা খুব কষ্ট হবে জানিস। বড় মায়া যে এই যুনিভার্সি এই বন্ধুতলা। তুই শেতন, তব, দেবু, অদিতি, তমিজা, কৃষ্ণা, মিতালি—এদের ছা ফি করে?

—ভুলে যাবি ভুলে যাবি। কবের মোহগ পেলে সব ভুলে যাবি।

—আমা! ও মেন ভাব জন্মে বিবেক মজা। লনের পাঁচটা কিবে বুঝি তুই ক এসেছিল। ও সবি তোদের যো আমার 'মিতা' বলে।

একেবার স্বপন গম্ভীর হয়ে যায়। স্বপনের আসল নাম যে কাজী ফনিমুর রহম যা যুনিভার্সিটির বন্ধু-অন্ধবের খুব কমই জানে। স্বপনই বলে ও যায়। আমা দিতেন। অতি ভীরু মানবিক। সাম্প্রদায়িক দুরন্ত-মুক্ত। ঠিক এ কারণেই শেতন ও ভালবাসে। স্বপন শেতনের প্রিয় বন্ধুও বটে। স্বপন নিজেও ওর আসল নামটা প্রায়ই ভুলে যায়। কেননা, শহরে স্বপনে জাগরণে ও ওর অন্যেও স্বপন। ঘটনাচ্ছ জন্মসূত্রে হিন্দু—এমন বন্ধু-অন্ধবের কৃতের মতোই ও নিশ্বাস নেয়, ছেড়ে ওঠে। যা কেউ যদি ওর এই অস্তিত্ব ছেড়ে ওঠার জায়গাটায় সাম্প্রদের পরিচয় মতো এব পতি টেনে দেয়, ও তাতে আহত হয়। অভিমানে স্তব্ধতবন ওক হয়ে যায় তার। এ এসব পরীক্ষা পরিবেশকে তরল করে দিতে পারে। এমন আন-স্বাভি জরুরে, স্ত্রাং ছা অন্তরে যে সবকের না হেসে উপায় থাকবে না। কাজীকে ও বলে থাকি। কোন সাম্প্রদায়িক ভাষায় করার নয়। মেহতেই ফনিমুর সাম্প্রদা যায়ে বলে ও স্বপনকে 'স্ব স্বপন' বলে। আর স্বপন সাম্প্রদায়িকতার ছায়া মাড়ায় না বলেই, মেয়ের কথায় যে

ওঠে। আবার আজ্ঞা তার ফল দিয়ে পায়।

যেখানে যেখানে স্বপন যেতু মিত্রালি সুপেরফন্ড, সেখানে সবাই এসে পড়ল। আজ্ঞাটা আরও জমে উঠল। শোভন আবদেরা অবস্থা থেকে একটু উঠে বসল। এবং সিগারেট ধরাল।

এই জায়গাটা বেশ আলো-আঁধারি ভাব। ঘুনিভার্সিটির অভিচাতে পেছনে ফেলে শোভনরা আজ্ঞা দিতে বসেছে। কেউ কেউ অবশ্য মুখোমুখি বসে একটা অপাঠ্য বই জোরা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিচার ঠিক সামনে কেন গলিটাকে ঘুরে একটা অন্ধকার করা আছে। সেখানে কিছু ফুলগাছ রয়েছে। রাস্তাদের এ-পাশটা উঁচুদের চাঁদর চৌকুরি ফুলের বেড়া দেওয়া। শোভনরা এই বেড়ার ওপরেই বসেছে। বি কি ফেলে থেকে ব্যাপারের ঢাকা দিয়ে অনেকটা হেঁটে এসে ঘুনিভার্সিটিতে ঢুকতে হয়। অন্যান্য সোজা নয়। অনেকটা ব-এর মতো। আজ্ঞার দু'জায়গায় খোল ফেলে মেডিয়ামে ফেলার ল্যাম্প লাগানো। ব-এর ঠিক উপরে পেছিয়ে বিতীয় বাঁকে এসেই হেঁটে আসা মানুষজনকে দেখা যায় এই অন্ধকারটা বুক খেকেই। ছাত্র-ছাত্রীরা আসছে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ক্লাসের যাচ্ছেন। সবাই চলতিপথের ফাঁকে ফাঁকে এই আজ্ঞার ফাঁকে। অবশ্য আজ্ঞার অবজার্ভিন হলে আলাদা কথা। এই আজ্ঞার ধারা আসে তারা বেশিরভাগই আজ্ঞার ছবিতে ঢুকে পড়ে। আবার কেউ কেউ কখনও কখনও অপরাপর পরিবেশের বিরোধ নজর রাখে। বিশেষত সাহেবের পদচারণা। মিতালি হঠাৎ বলে উঠল, আই এম্‌বি আলাদের। ইমপর্টেন্ট ক্লাস। আমি আজ ক্লাসে যাই।—এম.বি মানে অবশ্যই বজ্রবি ব্যাস। উনি ভারতত্ত্ব পড়ান। চর্যাপদের ক্লাসটাতে নেন। বঁধু ক্লাস সত্যিই ইমপর্টান্ট। মিতালি উঠে দৌড়ে ক্লাসে চলে যায়। ওর পায়ের কাপোর নূপুরটায় সুন্দ সুন্দর শব্দ হয়। পেছন পেছন ছবত যেতু উঠে যায়। আর দু'একজন উঠে যায়। আজ্ঞার কেউ কেউ থাকত না। থেকেও যায়। যেমন শোভন, স্বপন, কল্প, মুকুল...। ক্লাস ক্লাসে ঘন ঘনের উপেলে ওরা ফিকের করে ছুঁড়ে দেয় 'পার্সেন্টেজটা দিয়ে দিস আমাদের'। ওরা পেছন থেকে অন্তরের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে চলে যায়। এই পার্সেন্টেজটা একটা ব্যাপার। পরেরদিন পঁয়তাল্লিশটা ক্লাস করতে হবে। নইলে নন-কলেজিয়েট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরীক্ষার সময় এ নিয়ে ঝামেলা হয়। নন-কলেজিয়েট কি দিয়ে তবে পরীক্ষায় বসতে হবে। পার্সেন্টেজটা একেবারে কম হলে পরীক্ষার বসার অনুমতির জন্য টাইমার্স পর্যন্ত ঘুরতে হয়। এমনকি অনুমতি নাও মিলতে পারে। এটা জানে বলেই শোভন স্বপন কল্প ওর মুকুল এরা কিছিৎ ভাবিত থাকে এ-নিয়ে। আবার তেমন ভাবেও না। জানে, ক্লাসের বন্ধু-বান্ধবেরা ব্যাপারে করে নেবে।

এই আজ্ঞা বড় চঞ্চল। নির্বিষ্টি বিষয় বলে এসের না। বড় এলোমেলো। অসংখ্য। কেউ হয়ত রবীন্দ্রসদীত গেয়ে উঠল, 'জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে'। কেউ কেউ তাতে গলা মেলাল। কেউ কেউ টাঁকিকে মৃদঙ্গ বা তবলার মতো ছন্দায় ছবে তাল ঠুকল। আবার কেউ কেউ নিবিষ্ট মনে নিছক শ্রোতা হয়ে উঠল। কখনও পদাবলীতে ভরে উঠল আজ্ঞা। 'পদ্মেই এবার নবনো সখি' 'বিতা বিতল ফোলা'... চর্যাগীতি। কেউ ঘুরি দিয়ে কেউ ভুতভালি ঝরিয়ে আজ্ঞা গরম করে তুলল। আবার কখনও নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে কবিতা শুনতে শুনতে আকাশ দেখতে থাকা...। আবার কখনও ঘুনিভার্সিটির পথে চলে যাওয়া কোনও মেয়ের পরীক্ষা বিতর দেখে একটু ঠাট্টার ঝড়। অবশ্য কোনও ছাত্রসভায় ছাত্র দেওয়া মেয়েদের তা প্রকাশ হয়ে উঠে যাওয়া আজ্ঞার বিষয়ের চাকে পড়ে। কোন স্যার কীভাবে পড়ান। পড়াবার সময়ে তাদের পলার স্বরের ওঠানামা কার কেমন। ইউনিয়ন ছাত্রদের জন্য এবার কী কী করল, কী কী করল না...ইত্যাদি বিষয়ও আজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

স্বপন একটা কবিতা আবৃত্তি করছিল। "সুজন এটি ঘুনিয়ে থাকে পরা/এমন সবল প্রাণের ঝড়া মরা, অবশী ছড়ি থাকে।..." শোভনরা সবাইই স্বপনের আবৃত্তির ভক্ত। তারা সুযোগ পেলেই স্বপনের গলা স্বপনের। আবৃত্তিতে ওর গলায় খেলে ছলে। আজ্ঞায় আবহাওয়া আসে। কবিতাটাও শোভনরাই ভালই লেখে। সুতরাং স্বপন আবৃত্তি করতে থাকলে শোভনরা মন দিয়ে শোনে। কবিতা স্বপন আবৃত্তিটা বেশি করে মেয়েদের ওর প্রতি আকর্ষণ করার জন্য। এমনও হয়েছে স্বপন আবৃত্তি ওর করলে আশেপাশের অন্য আজ্ঞার অন্য ক্লাসের মেয়েরা অনেকেই এসে শোভনদের আজ্ঞায় ভীড় করেছে। একা ওর একার যদু। এমনিতেই বিশেষভাবে মেয়েদের মধ্যে সুনন্দা এসে এই আজ্ঞায় স্বপনের কবিতা আবৃত্তি শুনে যেত। তারপর একদিন সুনন্দা এই আজ্ঞারই একজন সদস্য হয়ে উঠেছিল। স্বপনের আকর্ষণ শক্তি ও টেলিপাথি কি না জানি না তবে সুনন্দা হঠাৎ করে আজ্ঞায় এসে উদয় হল। সাধারণত ও এই সময় ক্লাস করে। ক্লাসে বিশেষ ফাঁকি দেয় না। একটু মতের দিকে দেখে ক্লাসটা কখনও না করে ও এসে এই আজ্ঞায় যোগ দিত। তাই সুনন্দাকে দেখে শোভনরা একটু অবাক হয়ে যায়। কিন্তু, স্বপন চমকে উঠল। শোভন কথায় সুনন্দা আসে এলেই স্বপন কেমন দুর্বল হয়ে ওঠে। পরীক্ষের কেতকী বিশিষ্ট হয়ে ওঠে এক অদ্ভুত শিহরণের মূর্ছনায়। অথচ, এখন নিজেকে অনেক নিয়ন্ত্রণে রাখল স্বপন। ও আবৃত্তির তাল তেড়ে গরমগরম।

কবিতাটা শেষলাইনে পৌঁছবার ওদেই ও আবৃত্তি করে যেতে লাগল।

সুনন্দা এসে চুপ করে আবৃত্তি শোনে। স্বপনে উজাড় করে দেয় নিজে। তারপর আগে আগে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ে চুপিসারে। শোভ কুঁকে মাথাটা নিচু করে ও আবৃত্তি শোনে। অবশ্য তখনও শোভ ঘুরে সুনন্দাকে আড়চোখে আকাশের দিকে উদাসীন করে রেখে। ও জানে আকাশের দূর বিস্তৃপটায় মনেই কবিতাকে খুঁজে নিতে হয়। ধনির সুরের মোহিমায় ভেসার স্বাদটার টেনেই আসোটা ওর মুখে এসে পড়ে। অপরূপ ভাব সুন্দরার। মানতেই হয়। মুখ ফেন ঘুনিতে ভরা। তারপর ওর ঐ কবিতার কাছে আত্মনিবেদনের ভঙ্গি—যা কবি এবং আবৃত্তিকারের পক্ষে প্রার্থিত। স্বপন আবৃত্তি করতে করতে সুনন্দার মুখের ওপর ওর চোখ মজিয়ে দেয়। ঘুনিতে আসিটা বদে যেন সুনন্দার আজ্ঞাবী মুখের সাদে।

স্বপনের আবৃত্তি শেষ হলে পর সুনন্দা উঠে চলে যায়। তখন, ক্লাস হয়ত্তো হয়েছে বাকি।—সুনন্দা ঠিকুবাবে মেয়ে। ক্লাসকামাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়তে এসেছে। ঘুনিভার্সিটির নেতিম হলেন 'আয়া মহাবী'-তে এখন আছে। ওর ফলাফ ঠিকুমার আভলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এতে শোভনরা মজা পায়। ওর 'ভালোবা' নিয়েও সবলে একটু মজা করল। সুনন্দা এতে কখনও ভেবে যায় না। একবার ভেবে দেখা না। মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে রেখে চলে গেল।

আজ্ঞার ঘর ভাঙা হাটে তত এসে জোটে। তার আসার পর স্বপন ওকে মেহ মেশান ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে বলল, কী ব্যাপার্ক কালীদিন এলেন!—তত ঘুনিভার্সিটির ফুডোকেশন ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি। সংক্ষেপে জি.এস। তাই ওর অনেক দায়িত্ব। মিটিং। মিছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের নানা অভাব-অভিযোগ শোনা। সময় কম ওর। ক্লাস করা প্রায় হয়ে না। অবিশ্য ও নিয়ে ভাবিত নয় তত। কেননা, লেখাপড়ায় ও অমনোযোগ নয়। বন্ধু-অনুরাগের ফেলে ক্লাস নোটস নিয়ে এম.এ পরীক্ষাটা ও অনায়াসেই উতরে দিতে পারবে আগে ওর বিশ্বাস। তাছাড়া ঘুনিভার্সিটির স্টুডেন্টস ইউনিয়নের জি.এস-দের নন-কলিজিয়েট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। আর পরীক্ষায় ব্যাপারেও শিক্ষকদের কাছ থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। ছাত্রদের পক্ষে যে জি.এস-রা বিশু কাজ করে এটা সবাই মেনে নেয়। এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অলিখিতভাবে এই জি.এস-দের ওপর একটা সহানুভূতি বর্ষণ করেই থাকে। ক্লাস মোটস জোগাড় করতেও অসুবিধা হয় না। বিশেষত মেয়েরা ছাদে মেয়ে ক্লাসমোটসের ওরে ক্লাস নোটস দেওয়ার জন্য ঘুনিয়ে থাকে, "আই ওর", "আই ওর" করে ওকে অনুরোধের অত্যাচারে অতিষ্ট করে তোলে। অন্যান্য ক্লাসের মেয়েরাও বিশেষত ঘুনিয়র মেয়েরা এবং ছেলেরা ওর পেছনে "তরদা" "তরদা" করে ঘুর ঘুর করে। ওর সবই জেনে। তার এই জনপ্রিয়তার পেছনে যে একটা প্রক্রিয়ার ব্যাপার থাকে ঘুর ঘুর করা জানবেরা—এটা সে জানে। জানাকে হলেরের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কেউ ফ্রক-ফি, মূলফি-র প্রার্থী, কেউ আবার কাজ বা ট্রেন কনফেশন চায়। জানাকে নিয়ে ভর্তি হতে চায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইত্যাদি নানা সুবিধাজনিতের ঘুরে কবি ধরতে হয় ওদের। মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদের সুবিধাপুষ্ট হয়ে উঠেছে এই অলোক-ঘুনিভার্সিটিগুলো। তার ওপর আছে এক শ্রেণীর 'রাজনৈতিক দাদারা'। দাদা এই জি.এস-দের সঙ্গেই রয়ে নিজের রাজনীতি করে চলেছে। ঘুনিভার্সিটিতে কলকাতার কসমোপলিটান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে যে, জি.এস হওয়া মানেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়া। মুখ্যমন্ত্রী যেমন রাজ্যের কাজ পরিচালনা করবার জন্য নির্বাচিত প্রধান, তেমনই এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দাদারের স্বার্থের কলকাতে পরিচালনা করবার জন্যই যেন জি.এস হওয়া। আর ওদের মতে কলকাতার মাইনে থেকে পড়াতে আসা বিশেষত গ্রামের ছেলেদের মধ্যে থেকেই এই 'মুখ্যমি' খোঁজা নেওয়া হয়। তত ঠিক প্রধানের ছেলে না হলেও কলকাতার মাইনের ছেলে। ঘুনিভার্সিটির কলেজপুরে ওর জন্মি। একটা ন্যায় নিষ্ঠা নীতিবোধ সততা নিয়ে এরা একদম ছাত্র-জনসাধারণ করে। সমাজসেবা করে। এদের তাড়িয়ে কাজ হাসিল করা তাই সহজ কলকাতার এক শ্রেণীর পক্ষে কলকেরের!

তত ছেলে এটা। আর ছেলে বলেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধু মেয়ে শোভন স্বপন যেতু সুনন্দাদের কথায় থাকেন করে একদমে পক্ষের ক্লাসনীতির ফেরাজালে জড়িয়ে পড়ার ভয়। অবশ্য এই জাল ছড়িয়ে আসার উপায় নেই ওর। বাইরে থাকে। পালন করতেই হয়। তাই ইউনিয়নের কাজ ঘুরিয়ে ও যখন এই আজ্ঞাতে এসে বসে, তত-

শব্দ ছড়িয়ে গেল, কখনও মনের খুশিতে ও কখনও উৎসাহে হয়ে ওরা পড়ে তখন মনে হয় সত্যিই মুক্ত পুরুষ মনে হয়। ঘণ্টাদুয়েক খেলে তখন হঠাৎ একটা বিড়ি ধরে নেয়। বিড়িটাকে সুখটান দিয়ে ধরার পরিচয়ের মাধ্যম মতো করে খানিকটা টানা অভ্যাস থেকে নিয়ে আজাদের হাতে প্রথম করে। পিন্টু মনে একটা ছোট্ট ঈর্ষা হয়ে থাকে ওদের জন্য। মোনও মোনও দিন বিকেল থেকে। একেক দিন তারও সাথে থেকে। ঈর্ষা মনে থাকে। আজাদ অবশ্যই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ছিনেমার গল্পদের সঙ্গে পিন্টু গল্প-আলাপ করে। ওদের দেখে আর পার না। ছিনেমা হবে হয় মোটামুটি। অভিনয়ও মোটাই। কুমোর দেখা মোল না। কৃষ্ণ "মাস্টারমশাই" করছে। ইউনিভার্সিটি নিয়ে ব্যস্ত। মোনও মোনও দিন ভাল ভাল খাবার মনে নিয়ে আসে পিন্টি। আলুর পরোটা, মুড়ি, ডালচিনি, পাইনাটির স্যান্ডউইচ ইত্যাদি। মূলত ওদের জন্য আনে। ছেলেটার সারাদিন খাওয়া হয় না। খবর পেয় হলেটেল ফিরে ছিনেমার টিকিটের খাওয়া-দাওয়া করে না। দিনকেটে-ছিটে আর না খেয়ে থাকে সারাদিন। জীবনের জীবনে পরীক্ষা! এত প্রতিভা ছেলেটার। জীবন মুগ্ধ চোখে। ভাল ছবি আঁকে। কবিতা লেখে। রাজনীতি করে ছুটিয়ে...এ তো ছেলেটি ছেলেরা। অমূল্য, রত্নও। তবু কী মনের জোর! কত ভাবা হয় পিন্টির ওদের এই পরীক্ষা দেখে। এই নিয়ে জীবন ছিনিয়ন থাকে। ঘণ্টাদুয়ে এই মর্মে ওর আলাপ করছে পিন্টি। ওদের জীবনী-শক্তির আমূল সম্পর্কে।—খেলন পিন্টিকে হয় দেখে ওকেই অবাক হয়। একেকবার প্রথম দিকে ভাবত হয়ত ওদের কোনও দিশি হবে। ছিনেম-বিনুইয়ে পড়তে এসেছে, কাই ছেলে ঝকঝকে তারিয়ে জানতে চায় এই উৎসব দেশগুলোর প্রতিফলন ভাইটিকে। ক্রমশ পরে যখন বুঝেছে পিন্টি নিচে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ সিনিয়র ইয়ারের ছাত্রী। অয়েলপুরোরই মেয়ে। এখানে হলেটেলে থাকে। এবং আজাদ আছে কয়েকের বড় হওয়া সত্ত্বেও ওদের প্রেমিক। এবং তার পরিচয়টি—তখন খেলনের কিনুরার আর্থি দিল না। প্রেমিকের জন্য আজকাল এত কেউ ভাবে। এত পরীক্ষা সাধারণ। সত্যিই দেখা যায় না। পিন্টির অনুপস্থিতিতে ওদের খেলন মেনু খবরের কাগজ—তার কলকাতা মনের মেয়ের জন্য। আর এমনে পিন্টিকে ওত পাত্তাই দিত না। মনে মনে কামনা করত মিঠুকে। মিঠু সার্ট মেরে। ছুনিভার্সিটির মাঠে সে সাইকেল চালায়। আর প্রেমিক এমবিবিএস করে। ভবিষ্যতের ডাক্তার। পানপাত্রনি অনেক সার্টিফেটের ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করতে আর ভাবি ভালো লেগে গেছে। তখন মিঠু 'ওতলা' 'ওতলা' করে। মিঠুও বহুমপুরের ছেলে। তারও মাতামহী হলেটে পাওয়ার পেছনে ওতর এক সক্রিয় ভূমিকা আছে। ছুনিভার্সিটির বি.এস-কে সে চালাতে চায় না। তবে বাস করে ভূমিকের সঙ্গে বিবাহ করার মতো দুর্ঘটনা আর নেই। ওতলার সঙ্গে সে যথেষ্ট মধুর সম্পর্কই বজায় রেখে চলে। আর ওত মিঠু এই মধুর অবস্থানপরেই 'হাতে নিকেনে' ধরে নিয়ে মিঠুর প্রেমে ফিরোয় হয়ে আসে। পিন্টি এর সবটাই জানে। তার পরিণত বুদ্ধিতে সে নিশ্চিত জানে মিঠুর আসে প্রত্যাবার হবে তার ওর তার কাছে একদিন ফিরে আসবে। নিশ্চিত আসবে। সেই আসবে পিন্টি এই ছুনিভার্সিটিতে আছে। একটু ফাঁকা পেলে, নিরালা পেলে ওতরে ছাত্র পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইবে বাদ্ধবে। কিন্তু ছাত্র ফাঁক। ছাত্র নিরালা! পিন্টি-এর এবা ওত এক মিনিটও সময় খরচ করতে চায় না।

আজও ওত আজাদ এলেই অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। পিন্টি যে ঈর্ষাকল ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে, খাবার এনেছে—সেদিকে ওতর ভ্রুক্ষেপ মাত্র রইল না। পিন্টি টিফিন ক্যারিয়ার থেকে খাবার-দাবারগুলো বার করে রাখছে ওতর জন্য এবং পাশে উপস্থিত বন্ধু-বান্ধবদের জন্য বাড়তে লাগল। পিন্টি কেন অনেকটা পরিমাণই টিফিন নিয়ে আসত। জানে সবদের সামনে ওতরকে একা একা খাবার দেওয়া যাবে না। এবা ওতও নিজে এবা একা চুপি চুপি খাওয়ার পার নয়। আজাদের খাবার আছে। ও আর বলবেই। ওতর পক্ষেই পিন্টির ওপর অধিকার ছিল খাবারের। খেলন মেনু মুখের কথা ওদের একটা অধিকার না থাকলেও পিন্টি ওদেরও বঞ্চিত করত না। আজও করল না। এ-সময় সবদেরই খিদে পায়। সবদেরই ঘুম ঘুম ভাব আসে। খেলন আসে অফিস করে। সবদেরই পিন্টির আনা খাবার ভাগ করে মুখে পুরতে লাগল। এবং কেউ কেউ মেয়ে কৃতজ্ঞতাবশত পিন্টির হাতে ছোট খাবারের তখনও করতে লাগল। কথা বলল, আজ পিন্টি তুমি এত খাবার করে নিয়ে আসা আমাদের সবদের জন্য তোমার খুব কষ্ট হয়, না।

—না না কষ্ট কী! এই যে সবাই তোমরা একসাথে বসে এই সময়টা খাবারও খাবার করে খাব—এই প্রাপ্তি কি কম।—পিন্টি মুখে মৃদু হাসি এনে জবাব দেয়। সবদের ওপরের পরিচয়ে পিন্টি-র একটা গল্প গাঁথ আছে। হাসলে বড় সুন্দর দেখায় ওকে। মজা করে একটা টিপ পরে। ওর যা কিনু লাজিমা ঐ মুখে। মেয়েটা নিজেকেই আবিষ্কারে। ছেলেটা পড়ুন। লোহা, মাথা ছাড়া ম্যাজনারের কপণ পথে। নিজেকেই আবিষ্কারে পাচ্ছি। ফলে ওর চলা দেখার যৌবনের সাজ-সজ্জাগত চলক নেই। নেই কোনও যৌন আবেদন। হয়ত ওতর নিরাসক্তির কারণ এখানেই। তাব পিন্টি ভাল খান করে। পলাটা টানা ভাল। খলন, খেলন, মেনু, কণা ওরা সবদেরই পিন্টি-র রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত। কতদিন যে ছুনিভার্সিটির এই বহুলো আঁকাবাঁকা মাঠে ঘাসে পিন্টি-র গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত ওনতে ওনতে খেলনরা তাদের ছুনিভার্সিটির জীবনের একটা মধুময় দিন শেষ করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

সবাই আসের বন্ধুদের খাবার আগে তবে খেল। ওতর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র নেই। ও ওরে ওরে "সাই যা খুলসে ছিন্ন, বরাবই একলও বাকী, রঙীন নিভিন্ন মাত্র " গানটি নিজের মনে মেয়ে মেতে থাকল। এই গানটা ওতর খুব ছিন্ন। প্রায়ই করে। নিজের গান হিসেবেই করে। সৃষ্টিতে মনোযোগ হয়ে থাকে কারাই করে। এই গানের সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত প্রেম-পর্যায়ের কোনও সম্পর্ক নেই।—এসব ছেলেদের পিন্টি আগও বিস্তর কাজে হয়। বাস, বিদেশ, খান কখনোই হবে, তবে না। মেয়ে নাও। তোমার চিন আমু-পরোটা এনেছি। সঙ্গে সৃষ্টি আছে, মেয়ে নাও...। খলন এসে আজলালি করে। ফলে, খেলন, মেনু, তখন ছেলে সব ওদিকে ঝেকে। এদিকে একা 'বাংলোর ঘর' চলছে।—পিন্টি তাতে লজ্জা পায়। খলনের ঠাট্টাতে একটা বৃদ্ধ অপর মেয়ে বলে, ছাড়ো। ছেলে না ছেলেটা কিনু খাচ্ছে না। হলেটেলে ফিরেও তো দিন তাক করবে।বাস তো তোমার এ-ভাবে বেরিনিন চলে। সত্যি! মেয়ে যে এভাবে আপত্তাহে কাজ করে তা খেলনদের বেশ জানা ছিল না। খেলন ওতরে বলবার, আই ওত একটু মেয়ে দে তো মাগো।—এই মাঝে সৃষ্টির বুঝের একটি ঘটনা থেকে ওতরকে ফিরে। ওত একটু সৃষ্টি বুঝে পুরে ফেঁড়ে বেরিয়ে চলে যায়।

খেলন জানে ঐ বুঝের ভাতারার কারা আছে। চরিত্রগুলো জেনা বলেই ঐ বুঝের ভাতারার গল্প-পরিচয়ের ঠিক নিতে খুব বেরেও খেলনের অসুবিধা হয় না। সৃষ্টি, ঈলা, তপতী, সোমা, মুনমুন, পাত্রা, ইমন ,এরা সব আছে। শেষ ক্লাস জেবরয় হয়ে খেল। এবার ওরা ঘর বেঁধে ফিরবে। সবাই ভালবাসাময়ী। হেঁটেই যাবে সব। হাসি হাসি মুখগুলো কল্পনা করতে করতে। খেলন ঐ সময় মনে মনে হাসে। আর তপতীর টানে। হেরত মনীচিকা। মরীচিকার শিশু মানুষ যেরকমে ছোট তপতীর শিশু শিশু যেন সেরকমেই ছোটে খেলন 'শিশু যেরকমে লাজিয়া হয় ওতর করে, ঠিক সেরকমেই লাজিয়ত হয় খেলন তপতীর কাছে। খেলন থাকে উত্তর কলকাতায়। একটু সময় পাওয়ার জন্য তপতীর খেলন খেলন খেতে ছুটিয়ে বলমুখপর লাগে যায়। কিন্তু তপতীর মেরিকে মুখেল মাত্র নেই। ও সৃষ্টি, মুনমুন, সোমা, ভিত্তাসিয়ের সঙ্গে গল্প ছুখতল সঙ্গে যে খেলন আছে, সে যে তার গল্প তার মেরিকে মেরেরেই নেই তপতীর। সৃষ্টি তো একদিন বলেই ফেলেছে, খেলন তোর কপালে কি আর মেয়ে জুটবে না কত দুই তারাদুদ। দুই চাকরি বরিস। কেন বিবি-ভাই-এর পেছনে পেছনে ভালিস। তোকে বিবি-ভাই-এর কাছে একবারে লাজিয়ত হতে দেখলে আমার ভাল লাগে না।—অথচ খেলন একলই জীনা, একলই ভবিষ্যত যে, সে জানেই পিন্টু পিন্টু। সে বেচে যেতে লাজুনা পঞ্জনা সইতে যাবে। যদিও ছাপাগুলো নোটই মুখকর নয় খেলনের কাছে। তপতীর জন্য তেকে পাওয়া ছল-লাজুনার তার মনিতে ঝলকরণ হয়। নিজেকে ঘর করে যে, যেন যার বাবরার এরকমে অপমানিত হতে। তপতীর জীবনের ওপ মোহিনে নেই।—খেলন জানে অতি সাধারণ মানসিকতা নিয়ে ওরা বাঁচে। ঐ দলে গ্রাম-অঞ্চলে কেউ নেই। নেই বলকাতার বাইরের কোনও ছায়-ছাত্রী। এটা নিয়ে ওদের যে একটা গর্ব আছে তা খেলন জানে। তপতী বলে, আমাদের দলে সব স্ট্যান্ডার্ড। কেউ 'ছাতারে' না। সকলেই একটা আলাদা মাত্রে।—ওদের মধ্যবিত্ত পরানুগতিক কাঠামো নিয়ে খেলন মনে মনে হাসে। বন্ধুদের মধ্যে কিনু ছিন্নী পুরুষ ক্যাম্পে বিনিময় কিনু সাক্ষাত্য রক্ত পশ্চ মিউজিয়মের, একসঙ্গে যাওয়ার চলতি সিনেমা দেখা, চাউমিন এগুলোর আওতা, বাড়ির আভিজাত্যের (যদিও সেটা প্রকৃত অর্থে আভিজাত্যও নয় তবু পোস্টকে-স্বাধীনে ওপরতর্তীয় ঘনাও করে ছাত্র কথা ইত্যাদিকেই ওরা আলাদা বলে। ওদের কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে 'পয়সা'। অর্থাৎ বিত্ত। বিত্তকে ঘিরে আবর্তিত হয় তাদের সমাজ আচরণ, ঈশ্বরভক্তি। এত ঈমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিদেশ নেপথ খেলন ছাত্র প্রতিনিধি ছুটে যায় ঐ দলে। ছলা তপতী যে এমন কিনু অপরাধী না তা খেলন বিলক্ষণ জানে। 'তল' কাটে উচ্ছাসতা। প্রাণপ্রাচুর্য। ছোটা পিউনের নেই। পিউ-র নেই। তবু যে অজন্ত নিচুর পেছনে ছোটে। খেলন হয়ত সেই কারণেই তপতীর পেছনে ছোটে। পিউ-র মতো, এই খেলনের মতো ওরা সব মৃদু শিল ভঙ্গিতে বিশ্বাস করে, চর্চা করে তারা কি কখনও প্রিয়জন হয়ে পড়ছে। কখনই অনুজ্জ্বল

ছাত্র হেমন্তকি হতোদ্যমকর? তবে কি সপ্তপ্রকৃতির, উল্লাসতার ইজারা নিয়ে কেবল হিন্দী ছবির গল্প, গল্প, কর এবং বিল নির্মলের ভালোবাসার জাগরণকারীরা? কী জানি। হবেও বা।—হঠাৎ পড়ে যাওয়া দেওয়াল। সুদিনের কথাটা কারুরই ঘুরে ফিরে মনে পড়ে।

সুদিন-এর মধ্যে তপতীর যেটি আকর্ষণীয় ব্যাপার মোটেই পছন্দ করতে না দেখেন। যদিও সুদিন তপতীকে 'খিচিকাই' বলত। তবু সুদিনের বাড়িতে যাওয়া। ওর টিয়েকোচান মধ্যে নিয়ে তপতীর হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি মশকরা করা ইত্যাদিকে শেষের মোটেই পছন্দ করত না। তিন যেদিন তপতীর কথাই ওলছে যে, সুদিন ছেলেটা মনমরা। সুতরাং ছেলেটার প্রতি ওর কোনও দৌন আকর্ষণ নেই। তাপস নামে ছেলেটি ছেলেকে ও বাড়িয়ে আছে বিশ্বাসিল। ছেলে দখল তাপস জানতে পারে সুদিন একটি আস্ত মহাবানী জীব, তখন সাধনা এর কাছ থেকে অনেক পালিয়ে বেঁচেছে। এখন কলে ছেলে পরিচিতদের তাপস যেখানে থাকে সেই বাড়িতেও সুদিন যাওয়া করছে। তাপস সম্পর্কে নানা স্বাস্থ্যকর হয়েছে ও সে এখন পিছপা হচ্ছে না। আর এই ঘোটা ঝাপারটা মামলাতে হয় মুকুল এর দিদিমাকে। নানে তপতীকে। সুদিন বাড়িতে খুব অ্যাপ্রেসিভ ভুগে থাকে। ফলত তপতীর বাড়ির লোকেরা নাকি ওকে কন্ডা করতে পারে না। এ-ব্যাপারে তপতীকে ওর বাড়ির লোকেরা ভরসাও করে। বিশেষত সুদিনের মা। সাইকোথেরেপিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে সবরকমের ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া পর্যন্ত নানা ব্যাপারে তপতী ওকে সঙ্গ দেয়।—এসবই তপতীর বাড়ীই শোনা। তাপস ছেলেটির সঙ্গেও শোভনের এ-সব ব্যাপারে কথা হয়েছে। কেননা তাপস ইনভিসিটিতে না পড়লেও সুদিনের সূত্রেই ইনভিসিটিতে আসে। এখনও তার অবশ্য শোভনের সুদিন সম্পর্কে কোনও আগ্রহ বা আপত্তি থাকে না। বরং ইদানীং মায়া হয় ছেলেটার জন্য। একটা অদ্ভুত চরিত্রের ছেলে ও। মেয়েদি বলবে। মেয়েদের দলেই ও বেশি মিশতে করে। কিন্তু কখনোই প্রেমিক হিসেবে নয়। যেন একজন মেয়ে হিসেবেই ও মেয়েদের দলে থাকে। শোভন দেখেছে যে, মেয়েদের আলোচনায় এরেবারে ছড়ায়ে ঢুকে যেতে পারে ও। মেয়েরা মেয়েদি আলোচনাও ওর সামনে অকপটেই করে। এবং ও তাতে যোগও দেয়। মায়া একটা মন্তব্যেই পুরুষদের ওর শ্রেণিকা বানাতে ওর সমস্যা আছে। ওর যা কিছু লজ্জা শোপনীয়তা, মান-অভিমান যেন তাকেই জন্য সঞ্চিত রাখে ও। অবশ্য, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত একটি ছেলে। হা-হা করে উদার হাসি হাসতে পারে। ওর হাসি বন্ধুদের ছড়িয়ে যায়। ইনভিসিটির প্রতিটি কোণিকে তো আছেই, শোভনের মনে হয় সুদিনের দাদার হাসির জোরে দূর আকাশের তারারাও যেন সঞ্চারিত হয়। বসে পড়ে।

গুরুর ফেলে দেওয়া আবহে কেউই হাত দিল না। পিউ ঝাঁ-চকচকে শিল্পনিজস্বটি হাঁটুর ওপর ফেলে, হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে আবহাওয়ার অবশিষ্টাংশে সদ্য চিকিন আবিষ্কারগুলো গোছগাছ করছিল। বিষণ্ণ তার মুখ। বিকল দেহ। কিন্তু যন্ত্রণার ফুলের ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে তার। চোখের কোণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা জল সূত্রের অন্যের প্রতিফলনে চিকচিক করে উঠল। শোভন বলল সবই চুপ করে ছিল। আশ্চর্য। পিউই এই নিরবতা ভেঙে সকলের সবিৎ ফিরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু আছে, কিন্তু হোমরা কেউ কথা বলছ না কেন বলল।—বলল ওর চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে জলার খুঁট দিয়ে তা মুছতে মুছতে বলল, না এমনি।

নিস্তব্ধতা কিন্তু জমিই রইল। একা যেন কোনও কথা বলাতেই কারও ভাল লাগছে না। পিউ হাঁটু থেকে মুখ তুলে গান ধরল।

এই কেছে ভালো, মিঠুর হে
এই কেছে ভালো—
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালা।...

* * * * *

স্বপন, শোভন, শুভ, বেণু, মুকুলদের দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল 'মায়া মন্ত্রাঁ'। ইনভিসিটির এই ছাত্রী নিবাসে স্বপন শুভরা প্রায় ছেলেই যেত। শোভন যেত মাঝে মাঝে। পসায় পড়ে। বেশ্যে একদমে যাবেন মেয়ের ভিড় তাই স্বাভাবিক কারণেই শোভনের সেখানে যাওয়াটা তপতী একেবারেই পছন্দ করত না। মেয়েদিদের পরস্পরী মধ্যে আপত্তির একটা কারণ সম্ভবত কাজ করতেই পারে। শোভন ছেলের মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় এটা ছেলে মেয়ে মনে মনে। এতে তার একটু পুলকিতে হওয়ারও কারণ আছে। কেননা, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে তপতীর তার প্রতি মূর্খামতাটা সে টের পায়। তবুও সে মনে মনে ভাবে করে। খানিকটা ভেদ করেই। এতে যদি তপতীর ভুলটা ভাঙে তো ভাঙে। তার যদি অবচেতনায় একটা প্রতিহিংসা হিসেবে এটাকে সে দেখে। অবশ্যই যেন মনের কালা মুছোয়। আমলে সে আজ মন্ত্রাঁর পথেই বসেছে। কল পিউ ওদের বাসে তুলে নিয়ে হয়েছে। কলস বাড়ি সমুদ্রে। যাবার আগেকার পিকনিক আলাদা হয়েই, পিউ-ও আসবাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়ে নিবাসে থাকে। হস্টেলের নিয়মানুযায়ী ছাত্রদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়। আর সেদিন ফেরার নিয়ম নেই, অনিদ্যটাই এখন যাবার নিয়ম নেই, ছেলেদিবাস বেশবোধা পর্ব অবশ্য মুকুল বেণু আর সাজে শেভন মায়া মন্ত্রাঁর পথটা ঘরি ঠাট্টা ইয়ার্কি করেই কাটিয়ে দিয়েছে। সুদিনের কল থেকে শুভ ফিরে আসার পর কেউই আর পিউ-র গলায় সুরে ভালোবাসা হয়ে চাইল না।

মায়া মন্ত্রাঁতে তখন অনেক মায়া। অনেক মন্ত্রাঁ। স্বপন মুকুলদের কথে বিভোর। শুভ মিঠুর। মুকুল বাংলাদেশ থেকে পড়তে আসা একটি মেয়ে সাবিনার টানে এখানে আসে। আর বেণু শোভনের যেমন কোনও নির্দিষ্ট কিছু নেই। মেয়েও নাড়া বাঁধা নেই। এমনিই আসে এখানে। তবে তনিমা নামে অনুকূল একটি মেয়ে এই হস্টেলেই থাকে। স্বপন বেণু শুভ মুকুল প্রত্যেকের সঙ্গেই তার আলাপ আছে। শোভনের কিন্তু তাকে ভালো লাগে। চেহারা এবং পোশাক পরিচ্ছদে তার কোনও চাকচিক্য নেই। কিন্তু মুটো বুদ্ধিদীপ্ত চোখ শোভনকে যেন আকর্ষণ করে। মেকআপহীন ভাল। সাদাসিধে ছেলে। ধীর স্থির নম্র স্বভাবের। তবে জুজুবুড়ি। সবার, কিন্তু তবুও নয়। তনিমা এই হস্টেলে অনেকের কাছেই বিধি। বিধি হওয়ার মতো পার্থীর্যও ওর আছে। কোনও চটুল ইয়ার্কি ঠাট্টা করে না। কেউ সামনে করলেও চুপ ও তাকে এড়িয়ে যায়, নয়ত মৃদু অন্তত অনুকূলাহীন হাসি হেসে। অন্তত ঢলাঢলির যে ওর নেই তাও নয়।

মায়া মন্ত্রাঁতে একজন সিকিউরিটি গার্ড আছে। শুভ যে ঘুনিভার্সিটির ছি,এস সে তা জানে। শুভ সঙ্গে থাকলে তাই মায়া মন্ত্রাঁতে ঢোকা কোনও সমস্যা হোত না। তাছাড়া ইদানীং সে স্বপন বেণু মুকুল এমনকি শোভনকেও চিনে গেছে। তাই গেটে ঢুকতে কোনও ঝক্কাঝামেলা হল না। অন্য অনেক ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে বিশেষত পুরুষ ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে এই ছাত্রী নিবাসে ঢোকার ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি আছে। ঢুকেই একটা হল ঘর আছে। এখানে বসার অনেকগুলো বেঞ্চ আছে। টি.ভি আছে...তবে সেখানে সবাইকেই অপেক্ষা করতে হয়। ভেতরে ঢোকার অনুমতিপত্রের কারোরই নেই। ভেতরে বলতে অন্দরমহলে। ছাত্রীদের থাকবার জন্য কমিটিরি। ডিপার্টমেন্ট ফলে ফলে সদের খবরটি দেওয়া যায় এক ফলক। যখন ঐ ঘরের ভেতর দিয়ে কোনও ছাত্রী হয় ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে দেখা করতে আসে, তখন।—ছোট ছোট নিয়ম আছে। ঘাটের ছবিটিতে ঐ ফুলছে আরও। ছাউনি ও সাদা মেলে দিয়েছে কেউ কেউ। ঘরের জানলার চাওয়ায় সেটা ওকেছে। একটা আটপৌরে শাড়ি ও ম্যাক্সি পরা ঘরের ঐ সব ছাত্রীদের ঘুনিভার্সিটিতে ঘতটা উজ্জ্বল লাগে তার শিক্ষিতাংশও একদম লাগে না। মুখে প্রসাধন নেই। সাজ-সজ্জার সেই ঘহারি চমক নেই। তখন সেইসব মেয়েদের মধ্যে অনুকূলকে লাগে। তারা এটা বিলক্ষণ বোঝে। মেয়েদি পত্রিকেশনেকে শোপন করার তারিদেও ঘরজাটা তাড়াতাড়ি ভেজিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে খবর হয়ে গেছে ডিপার্টমেন্টে স্বপন শুভ বেণু মুকুল এবং শোভন এসেছে। এরা যাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে খবরটি তাদের কানেও পৌঁছে গেছে খবরটা। অধিকা ছাত্রাদির ছাপার প্রায়। আরা জানেও ঘুনিভার্সিটি ছেলে ঐ ছেলেগুলোর একদিন একবার ছাড়া আসেই।—একদিন আসে সাবিনা। ডাকা হয়ে। বি.এ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কিন্তু বেশ বড়সড় চিপার। সাদোয়ার কামিজ পরে ছেলেগুলোই ও ডিপার্টমেন্ট ঢুকে আসে। দেখে মনে হয় বাংলাদেশের কোনও এক ধনবানি মুসলমান পরিবারের মেয়ে ও। মুকুলের আসত নাম আখতারুজ্জামান। ঘুনিভার্সিটিতে 'স্বপন'-এর মতো ও 'মুকুল' হয়েই থাত। যদিও সাবিনা সেটা জানে। সাবিনা সকলের সঙ্গে ই কুশল বিনিময় করে মুকুলে একটা ঠেলিতে এক নির্জন কোণে মুকুলকে নিয়ে উঠে গেল।—একটি পাথরের মতো উজ্জ্বল নিয়ে মুকুলা এল। স্বপন একটু নড়েচড়ে বসল। একটু যেন অস্বস্তিবোধ হয়ে উঠল। মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকে মুকুলার। মুকুলা কোনও বিরুত ভোগ থেকে সেয় না। স্বপনের এটা মনঃপুত না হলেও মেনে নেয়। মিঠুও চলে আসে। শুভ যার জন্য অনাদরের ছেড়ে এক পাত্রে 'অপেক্ষারত' হয়ে থাকতেও রাজি। এবা সব শেষে নেমে আসে শাড় ঈর অনুকূলা একাই ছেড়ে। তনিমা। তনিমা কিন্তু ডিপার্টমেন্টের ভাছে অন্যতে শোপন করে না কখনও।

সেই আটপৌড়ে চাঁদের পড়ি। ওর বোলচাল পরিবেশ জড়ালে। জৌন অবর্ণনীয়। কিন্তু গভীর চোখ দুটো। ঝোটকলে হলেও গভীর। দীঘল। মুখের হাসিটা কিন্তুতে চওড়া। জোনাকির ভালবাসার মতো। স্বভাবতই ওতিনি নূরের অভিনয়-অঙ্গের উপলাভও চলে আসে। তনিমা মারফির পূর্বপুরুষও ওড়িয়া ছিল। দীর্ঘদিন আগে অনেক পুরুষ ধরে মেসিসিপুরের আসিয়াই-তে ছিল। ক্রমিক চাষাবাদেই কাজু অনেকের চাষ। কাজুকনের আভাস কিন্তু ওকে পুরি দেয় নি। হাতে একটা ফোর্কাহিতে কেশ খানিকটা কাজু নিয়ে তনিমা তিরিটির ভরে এল। শেখন বলল, জীবনানন্দের পরিচিতির কেশ এবা সে দেশের মেয়েদের মেজিনি হয়ে কাজুর দেশের মেয়েকে দেখা হল।—তনিমা লাজুক হাসি হেসে বলল, দেশে গিয়েছিলাম, তাই একটু তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি। হাসিটা ঠিক সেই-ই কেলদর্পের আভাসের মতো। আধুনিকার হাসি নয়। উত্তর আধুনিকতার চাঁদন কিনালও আসে নেই। ঠিক পাখিদের ডেনা নিজের মতো। আকাশনীলের হাসি। পালটিন।

—তাই কতদিন তোমাকে ঘুনিভার্সিটিতে দেখিনি। শোভন বলে।

তনিমা ওকতে ছেটিবাইয়ের মতো দেখে। মধিও ল্লাশমেট। ওর নিতুর সাথে পরে মনতল দেখে তনিমা বলে, আই ওত, মিঠু পালিয়ে যাচ্ছে না বাবা, যাওয়ারও একটু সাধ। স্বপন একটা কবিতা বলছে।—তনিমা স্বপনকে অনুরোধ করল।

স্বপনের এটা প্রায় পরেটে। ও কবিতাটা জোর আবৃত্তি করে। তনিমা সুলভা এমনকি শোভনেরাও স্বপনের আবৃত্তির ভক্ত। শোভন বলে, স্বপন তোর ঐ 'অকটী বাড়ি যাচ্ছো।' চলবে না। ও ফক এবেবারে হয়ে গেছে।

স্বপন নিজেও জানে ও কবিতা ভালো তারার পরিবেশকে নিজের অনুকূলে নিতে পারে। মেয়েরা সুলভাতে খুশি স্বপন সুলভাকেও খুশি হওয়ার অবকাশ দিতে চায়। সবাইকে চমকে দিয়ে স্বপন জোনাকিকে আবৃত্তি করতে শুরু করল—

রূপ সাগি আঁখি তুমে ওগে মন মোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।—

সম্পূর্ণ পঙ্ক্তিটা ও বলে যেতে পারল। কেউ 'অসভ্যতার' বলে ছাড়া দিল না। শোভন শুধু মেবু এই জন্য মুচকি মুচকি হাসতে লাগল যে, কবিতাটি পুরোপুরি সুলভাকে উদ্দিষ্ট করেই ও আবৃত্তি করছে। এমন কোন মুখে কোন মানুষে স্বপন তালাই জানে। সুলভা অবশ্য সাহিত্যের মেয়ে নয়, তবু জোনাকির এই বৈকব পদটি ওকে আবিষ্ট করে রাখল। চোখ বুজে মাথাটা ঈষৎ নিচুতে ঝুঁকে মুখের ওপর দুই হাতের করতাল সংস্থাপিত করে ও শুনছিল। আবৃত্তি থেমে যাওয়ার পর সুলভা চোখ খুলল। মুখ তুলল। তবে স্বপনের জন্য ওর প্রতি অঙ্গ কাঁদছিল কি না কেউ দেখে নি। তীক্ষ্ণ আপা মেয়ে সুলভা। মুখে একটু লাজুক হাসি ফুটিয়ে ও নিজেকে রহস্যাবৃত রাখতে চাইছিল। অবশ্য এটাই ওর স্বভাব। কেন ওজনে যাঁকা জল অন্যের হবি। অন্যরকম আবেগ করে পড়ে ওঠে।

শোভন জানে তনিমার প্রতি ওর ঈষৎ দুর্বলতা অনেকটা তার তপতীকে না পাওয়ার যন্ত্রণাকে। তার একের সময় মনে হয় তপতীর মতো চঞ্চল মতি মেয়েই বুঝি তার জীবনে পরম আকাঙ্ক্ষিত। তপতী তড়িৎ গতিতে কথা বলে। বেশি ঘুরিয়ে বোঝে চলে যায়। ঘুনিভার্সিটির মনে আড্ডাদিতেন মেলে। সার্টিফেস বেশি।...অপর পক্ষে তনিমার চোখ দুটো দীঘল। গভীরে তার মুখ। ঈষৎ স্থির নম্র স্বভাবের। সেখাপড়ায় ভালো। সাহিত্যের বোঝটা ভীষণ।...এসব দিক থেকে বিচার করলে শোভনের সঙ্গে মেলে তনিমার সাযুজ্যটাই বরা বেশি। তবু শোভন এখন একটা গতির পেছনে ছুটতে চাইছে। তাই তনিমাকেও তার পুরোপুরি মন নেই।

ডিসিপ্লিনারি রুমে পুলক এল অনেক পরে। হাতে ওর একটা সিগারের টিকিনকারি সাদা। এনেই বলল, আ স্বপন, তোমার না তটিকি আছ খাইতে চাইছিলা। আছিতে কয়ছিলো মা-ব। তোমাদের সেইগ্যা পাঠাইয়া দিলে।—পুলক ত্রিপুরার মেয়ে। বাংলাদেশে ওদের আড়ি ছিল। কলকাতাতেও বাংলাদেশীর টানকে ও বিসর্জন জানাতে চায় নি। এই তার খাস কলকাতাতেও ও এই ভাষা বলে কেন গর্বের সঙ্গে। বাপারটা শোভনের খুব ভালো লাগে। যদিও পুলক যা বলেছি তাই—কোনওদিনই সে ভক্ত নয়। তবু মনে হয় এই মেয়েগুলো এখানে পড়তে এসেও কতটা আপন করে নিতে পারে পরিবেশকে। পরিবেশের মানুষগুলোকে। এটাই পাওনা।

স্বপনের আড়ি বসিয়াছাট। কলকাতায় একটা মেসে থেকে ও ঘুনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে। ওর বয়সীদের ঘুনিভার্সিটির ছাত্রদের হাসেলে থাকে। প্রায়ই স্বপন পশ্চিম কলকাতায় ওর নিজের মেসে যেতে না। এখান থেকে ঘর। পুলক কাছ থেকে গুটিকি মাত্রের কৌটোটা নিয়ে স্বপন ওর সেই ছাত্রাবাসের পথে পা বাড়ায়। নুরুল ওর মেসবাড়ির মেসে ফিরে যায়। শোভন এবং মেবু আর অল বাড়ির দিকে যাত্রা করে।

* * * * *

স্বপন চটোই যখোরকলাপুর কলার আড়ি চলে যেত। কখনও শুভ্রার সঙ্গে নিত কখনও একাই চলে যেত। স্বপনের সঙ্গে কলার সম্পর্কটা ছিল খুনসুটির। স্বপন কলা পেছনে লাগত। কলা কেপে যেত। যদিও অবশ্যই কলার খুশি একটা আবর্তন ছিল স্বপনের। নাহলে অমন ছুটে ছুটে কলার আড়িতে যাওয়া কেন। কলায় নিজস্ব মা ও আদুরে স্বপনকে পছন্দ করত। স্বপন কলার তাই যত্নেরকের কাছে কাছে ওই পড়ত। মেসে ফিরত না। তবে কলার মা কিন্তু জানত স্বপন কলাসূত্রে মুসলমান। ও নাম কাজী আনিসুর রহমান। সে-কলাকে কলা তার নামের কোনও দুঃ-আর্থ ছিল না। কলার মায়ের মতো গ্রাম্য ও পরিবর্তনীর বিবরণ পরিচালন থেকে এতটা আশা করত না। স্বপন কিন্তু এতটাই আশা করত। ও যেমন নিজে ইসলাম ধর্মের গঁড়ি ডিঙা পড়ে থাকতে চাইত না। তেমনই চাইত না ওর বন্ধু-বান্ধবেরা এবা তাদের আত্মীয় স্বজনেরা হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন থাকুক। তাই স্বপন অবলীলায় শোভনের আড়িতে এসে শোভনের মায়ের ঠাকুরের আসন থেকে নিজে ফুল তুলতে দিয়ে মুখে পুরে দিতে পারত। শোভনও ওকে বাঁধা দেয় নি। কেননা, সেও ধর্মীয় দৃষ্টিতে ভাত খাওয়া-আসা নিয়ে কোনও মাথা ঘামায় না। অথচ তখন শোভনের মা বাড়িতে ছি না। কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিল। বাড়িতে উপস্থিত কারও সামনেই স্বাপারটা ঘটে নি। মনুনা তখন পর হয়েছে। শোভন এক লহমায় ছেনে নিয়েছিল যে, এরে ভাবার সামনে স্বাপারটা ঘটলে তাদের বাড়িতে একটা 'ভাত খেল' 'ভাত খেল' র উচ্চ অনিবার্যভাবে। বিশেষত ঠাকুমা কেউ থাকলে এবা কাপাকাটা জানাত এবং ছে চৈ ভাত বাঁধিয়ে দিত। কেননা, শোভন তার ঠাকুমার কাছে শুনেছে তাদে বিজয়মুদ্রের অওবিয়া ঢুকের আড়ির অন্দরমহলের ত্রিসীমার নাকি কোনও মুসলম ঢুকতে পারত না। যদ্যবহার যে ছেলেবের আড়ির বাইরে ছিল 'আইর আড়ি' অর্থ 'আড়ির আড়ি'। সেই আড়ির আড়ি পর্যন্তই ছিল মুসলমানদের দৌড়। সেখানে ছেলেবে আড়ির নিভৃত কোণে ঠাকুরের আসনের ছায়া-মুরুতেও কোনও মুসলমানের ছায়ও কোনও প্রবাই ছিল না। সেখের বাড়িতে একথা কেউ ভাবতে পারত না। এটা কেবে আড়ি না, খেল উত্তর কলকাতার বাড়ি। সেখের আড়ি, তারে পরিবেশ ইত্যাদি পাকি চুর্কি ঠাকুমা কেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই কলকাতোর ভাড়া আড়িতে কবাস শুরু করেছি কিন্তু, শোভন একটু বড় হয়েছে তখনই অনুভব করতে পেরেছে যে, গ্রে মানুষকে শহরে তুলে আনলেও তার মন থেকে গ্রাম তুলে ফেলা যায় না। ত শহরে থেকেও ঠাকুমার যে গ্রাম-সংস্কার (কুসংস্কার বলা যায়) ছিল শোভনের ম অবিশ্যির মধ্যে অবশ্যই তা অনুপস্থিতভাবে কম ছিল। তাই স্বপনের আড়িতে খা নিয়ে শোভনের মায়ের কোনও আপত্তিই ছিল না। ছেলের প্রিয় বন্ধু হিসেবে স্বপন (মুসলমান জেনেও) মা কেশ মেনেই নিয়েছিল। এমন্ত খাসা মাছিতে খেতে দিয়ে মায়ের কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু শোভন নিশ্চিত জানে ঠাকুরের আসনে হ দিলে মা অবশ্যই আপত্তি করত। ধর্মীয় পবিত্রতা খুব হওয়ার জন্য তুলত। ছেলেবেলা কলার সঙ্গে স্বপনের তাদের বাড়ি আসা নিয়ে এবং তার মেয়েব সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে কোনও ভয় তুলত না বটে, কিন্তু স্বপনের সঙ্গে তার মেয়েব মেলামেশার পরি প্রবৃত্তি নিয়ে বিলক্ষণ নজর রাখত। এই মেলামেশা কেন প্রেম-প্রণয় এবং বিয়েতে গি না হয় সেদিকে কিন্তু কলার মায়ের প্রখর দৃষ্টি ছিল। একজন মুসলমান ছেলে বড়জোর মেয়ের বন্ধু হিসেবে মেনে নেওয়া যায়। কলার মায়ের আগ্রহও এটাই ছি প্রতিবেশীসুলভ মেবতম স্তর। বরং কলার মা মনে মনে পছন্দ করত শোভনকে। শো হিন্দু বলেই । আন্তরিক, চালচি করে। আত্মবিশ্বাসী। ভাব ছয় ছোট্ট মে পক্ষে আদর্শ পাত্র হিসেবে মনে করত শোভনকে। শোভনের সমনে তার মা এই মনোগত ইচ্ছার প্রকাশ নিয়ে কথা অন্তরিতে পড়ে যেত। কেননা, কথা তপা সঙ্গে শোভনের সম্পর্কটা জানত।

স্বপন যে কলা সম্পর্কে খুব দুর্বল একথা কখনও মনে হয় নি। বরং সুলভ ওপর স্বপনের দুর্বলতার চরমটাই তীব্র ছিল। তবে যখন স্বপন সুলভাকে তার ভী পাওয়া সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ত তখন যেন এই কথাতেই তাঁকড়ে ধরতে চা স্বপন। কথা একের সময়ে স্বপনকে তিনদিন পরপর তনিয়ে দিত, যেন আমি জানেনিকে যে তোর উদ্দিষ্টই ভালবাসা আমার কাছে ছলনি।

স্বপন কলার যেহেন মুখ যেখে ফিরের মতো ফাস, ভালবাসা কখনও উদ্দি হয় না যে।

কণা স্বপনের মাথাটা তার কোল থেকে বালিশের ওপর ফেলে দিয়ে জানত, যা সুবন্দার কাছে মামা মন্ত্রীটিকে না পা'। তামার তাহে কেন?

স্বপন একেবারে ফাজিলের মতো হাসত। কণার গালটা টিপে দিত।

কবিন য়ুনিভার্সিটিতে যদ্দুর ঠিক হল সন্ধ্যেই মিলে দল বেঁধে কণার বাড়িতে যাবে। এবং যাবেও। মুক্ত আকাশ হল জগীপুরের লোক-উৎসব। উৎসব উপলক্ষ্যে এই সময়ে জগীপুরে মেলা বসে। একটা গ্রামীণ মেলার সঙ্গে পরিচয়ও ঘটবে এবং কণার বাড়িতেও যাওয়া যাবে। শোভনও খুশির ছুটি নিয়ে স্বপনদের সঙ্গী হল। এছাড়া শুভ, দেবু, মুকুল, পিউ এবং তনিমা সঙ্গে গেল। ট্রেনের সারাটা রাস্তা হৈ হৈ করে কাটল। অন্ধকারময় ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা দীর্ঘ মোরাম বিছানো পথ। তা পেরিয়ে একটি বড় নদীবন্দরে। কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হয়ে তাইনে বাঁয়ে পাথ-পাথালি খেয়া পথ ছাড়িয়ে অথৈ কলাদের বাড়ি। মোরাম বিছানো পথটার একবছরের জন্যও শুভ পিউর পাশে হাঁটা নি। স্বপন পিউকে সব দিখিয়ে। বন্ধু তনিমার পাশাপাশি হাঁটছিল শুভ। সঙ্গে মুকুল, দেবু এবং শোভন। মাঝে মাঝে কেন জানিনা শোভন আর তনিমা এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হয়ত ফ্রন্ত হাঁটার জন্য। হয়ত বা এতে স্বপনের সান্নিধ্য চাইবার জন্য। তনিমা শুভ শ্রম ঝরিয়াই-এর কথা বলছিল। শুভ ছেলেবেলা। স্কুল। বড় হয়ে ওঠা। মহিলা সমিতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার কথা। পার্টির নানা সেবামূলক কাজে জড়িয়ে পড়া। ইত্যাদি। পেছন থেকে মুকুল ইয়ারজনদের মতো আওয়াজ দিতে থাকল।—হ্যাঁহ, হ্যাঁহ তনিমা আর শোভন লাইন করছে। এটাই জগীপুর ট্রেনের মোস্টেস্ট ইনসিডেন্ট।

কণার মা কিন্তু বেশ অবাক হয়েই এতগুলো লোক দেখে হকচকিয়ে যান নি। কণার য়ুনিভার্সিটির বন্ধুদের দেখে বরং খুশিই হয়েছে। তবে তাঁর বড় এবং একমাত্র মেয়ে। অপেক্ষে এক ছেলে। স্বামী মারা যাওয়ার পর বহু কষ্টে ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন এই ভদ্রমহিলা। তার মেয়ে এম.এ পড়ে। বাড়িতে বাঁক বাঁক পুরুষ বন্ধুর আগমন। তার মধ্যে যে আবার দু'একজন মুসলমানও আছে—সেখবরও চাপা থাকে নি। হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তাদের পাড়ায়। কিন্তেতে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সকর সম্ভবতে তথ্যবর্ধিতে আপনজন কণার জ্যাঠামশায়ের পরিবার। এইসব সমাচারোদ্ধারকে বিশেষ আমল দেন না ভদ্রমহিলা। বলেন, কণাটা এত.এ পাশ করুক। ওকে একটা ভাল বিয়ে দি, তারপর ঐসব নিন্দুকদের মুখে ছাই ঘষে দেব।

কণার জ্যাঠামশায়ের পরিবারের সঙ্গে যে ওদের সম্পর্ক ভাল নয় তা কণার মুখেই শুনেছিল শোভন। পরিষ্কার বিষয় জানছিল। মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। কণার মা তাই চোখের জল ফেলে বললেন, কণার বাবা নেই। আত্মীয়রাও আছে পক্ষ। তোমাদেরই আজ আমার বড় আপনজন বলে মনে হয়।—বিষন্ন মনের এই নির্ভরতায়, এই ঘরোয়া এক তাদের ওপর এই ভরসা শোভনদের যেন হঠাৎ আরও দায়িত্বশীল করে তুলল।

সন্ধ্যার পর জগীপুরের মেলার মাঠে শোভনরা সবলে ঘুরতে বেরুল। কণা এবং তার ভাই অপেক্ষে ওদের সঙ্গ নিল। মেলা বেশ জমজমাট। মেলার লোক-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা গ্রামীণ মেলার আভাস। দোকান-পসরা। নাগরদোলা, ছোটখাট সার্কাস খেলার তাঁবু। ইত্যাদি। ওরা সবাই এই মেলার বিরোধিল, নিরেধিল, নিরোধিল এবং নিরিরেধিল।

সেদিন রাতে আড্ডা এসে স্বপনের একতলা বাড়ির ছাদে য়ুনিভার্সিটির নির্দিষ্ট আড্ডা বসেছিল। পিউ এবং শুভর গান। স্বপনের কবিতা আবৃত্তি। আর নিখাদ আড্ডা। খুব আকাশের তারারা সব দেখছিল। আর শোভন দেখল রাতোয়াটি তনিমা যেন খুব স্বপন-ভক্ত হয়ে পড়েছে। স্বপনের কাছে কাছে থাকতে চাইছে। ছাদে মানুষের ওপর টিং ছত্র ওরে থাকা স্বপনের চেয়ের আছেকাছি বসতে যেন তৎপর হয়ে উঠছে।...

দেবু একটা প্লান করল। ছেলেদের সকলকে কণার জ্যাঠামশায়ের ছাদে নামিয়ে নিয়ে শোভনকে ফিরে আসতে হবে। কেন কণাকে এবং কণার মাকে ওরা এত কষ্ট দেবে। লজ্জিত করবে।—এটাই ওদের যুগলরব। তাই একটু ভদ্র করা। আশ্চর্য! শুভ কেন যুক্তি দিয়ে দিয়ে শোভন, মুকুল, শুভ এদের রাজি করে ফেলল। স্বপনকে এই প্লান জানানো হয়েছিল। কিন্তু স্বপন রাজি হয় নি। কেননা, স্বপন তখন তনিমার সঙ্গীত নিয়ে মশগুল। শুভ একদিকে আড্ডার আকর্ষণের নিচে বসে পরাভবও করতে লাগল আর একদিকে দেবুর নেতৃত্বে কণাদের ছাদে সমান ডিঙ্গু একতলার মুকুলে আবহিত জ্যাঠামশায়ের বাড়ির ছাদে শোভন, মুকুল, শুভ এবং দেবু একে একে লাফ দিয়ে পার হয়ে শোভনকে করে করে নিয়ে আসতে লাগল।—কথাটা কণা, পিউ, তনিমা সবলের কানেই গেল। কণা ছিল ছোট্ট কাল, আহি মেয়ে কলেজিয়ান বী। স্বপন রাজরাজিণ করতে লাগল, এটা উচিত হচ্ছে না। তোরা য়ুনিভার্সিটির ছেলে না? এম. এ পড়িস না?...ইত্যাদি ভাবে দেবুদের ওপর্সিত করতে লাগল।—বেয়াল তপস্বী। কত ধার্মিক। স্বপনটা একটা আস্ত ন্যাকা। এবং জ্ঞ। এমন নিখুঁত মেয়ে নিয়ে মঙ্গলগল বলে ন্যাকামি করছে। দেবু চাপা স্বরে স্বপনকে খিস্তি করে যেতে লাগল। কিন্তু শোভন আশ্চর্য হয়ে দেখল তনিমা বিস্ফোরিত পিউকে। পিউ ফলাফল স্বপনকে, ছেড়ে দাও স্বপন। ছেলেরা ছেড়াতে এসে এমন একটু আধটু দুষ্টুমি করেই থাকে। ওটা এমন কিছু দোষের নয়।—তনিমা তার কিশোরতা থেকে এসব ব্যাপারে কোনও মন্তব্য না করাটাই সঙ্গত মনে করেছিল।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ওরা সবাই ছাদে এসে গল্প-গুজবে মেতে উঠেছিল। অন্ধকার রাত। একফালি চাঁদ। এক আকাশ তারা। আর গল্প-গাছগাছিতে ভরা কাঁচা অন্ধকারে অনাঘ্রাত জোনাকির আনাগোনা পরিবেশটাকে কেমন মায়াবি করে তুলেছিল। সেই পরিবেশে তখন প্রায় সবাই নিস্তব্ধ। কোনও ঘর থেকেই আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখা যাচ্ছে না। নীরব। নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ এক রাত। এরকমের কি-কি গোকাব শব্দ। এই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-ছাত্রী গল্প-গুজবে মশগুল। কণার ভাই অপেক্ষও এসে যোগ দিয়েছিল আড্ডায়। বহুসঞ্চালিত দূরত্বের কারণে ঘরোয়াভির যাপনের এক সময় তাল মেলাতে না পেরে নিচে গিয়ে ওরে পড়েছে। আশ্চর্য! ক্রমে আড্ডাও গভীর রাত্রির সঙ্গে মানানসই হয়ে অন্তরঙ্গতাপী হয়ে উঠতে শুরু করে। এক সময় ছোট্ট ছোট্ট কথার মধ্যে ইচ্ছুক অনুভবকেই প্রেম মনে করতে থাকে। যেমন, তনিমা স্বপন। স্বপন কখন যেন তনিমার কোলে মাথা রেখে ওরে পড়েছে হাতে। আর তনিমা স্বপনের ঘন চুলে বিলি কেটে চলেছে। স্বপনের চোখ দুটো বোজা। আবিষ্ট। পিউর কোলেও মাথা দিয়ে ওরে পড়েছে শুভ। পিউর চোখে মুখে যে প্রশ্রয়ের উজ্জ্বলতা ছিল তা এই অন্ধকারেও টের পাওয়া যাচ্ছিল। শোভন দেবু মুকুল ওদের এই চাওয়া-পাওয়ার অনুভবে জলদানি না ঘটিয়ে ছাদের এক কোণে কণার সঙ্গে বসে নিচু স্বরে আড্ডা দিচ্ছিল।

ঐদিন ছাদে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল একই ঘরে। মেঝেয় সব খাটের ওপর আড়াআড়িভাবে শুয়া। আর মেঝেয় আড়াআড়িভাবেই মেঝেতে বিছানা করে শুয়েছিল। আর শোওয়ার ক্রমটা ছিল বড় অদ্ভুত। তনিমার মাথার নিচে স্বপন। পিউর মাথার ঠিক নিচে শুভ। তারপর দেবু মুকুল নাকে। আর এদিকে একেবারে ধারে কণার মাথার ঠিক নিচে শোভনের জায়গা হয়েছিল। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, কণার মা এবং ভাই পাশের ঘরে গভীর ঘুমে যখন আচ্ছন্ন ছিল তখন পাশের ঘরে যে যার পার্টনারের সঙ্গে পাশাপাশি ওরে পড়ারও যথেষ্ট অবকাশ ছিল। বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। কিন্তু অদ্ভুত, একটা মধ্যবিত্ত জীবনযাপন এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতার কারণে সেই যৌনাচারের পথে কেউই হাঁটল না। মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও নয়। ইচ্ছে যে ছিল, খুব বেশি না হলেও খানিকটা নৈকট্যের, যা কম ভাল শয্যাসঙ্গীন নৈকট্যের—তার প্রমাণ শোভন মাঝ রাতেই পেয়ে গেল। নতুন জায়গা। তার ঘুম আসতে চাইছিল না। অন্ধকারে দৃষ্টিকে অভ্যস্ত করে সিলিং ফ্যানের একটানা ঘুরে চলার যান্ত্রিক শব্দের ভিতর দিয়ে শোভন দেখল, স্বপনের হাতটা উঠে গেছে তনিমার কাছে। পিউ-ও কি অপেক্ষ করছে তেমন কোনও বিদ্যুৎ প্রেম-মাখা একটা হাত ওর মুখমণ্ডল ছুঁয়ে ঘুরে ফিরবে? এমন আশাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুভ সারা দিনের ক্লান্তিতে ঘুমে পড়েছে। ফলে কণা একটা হাত নমিতে দিয়েছে শোভনের দিকে। শোভন অন্ধকারে সেই হাতের সাড়া দিয়ে কণার হাতটা ধরে আছে। কিন্তু তার সেই মুহূর্তেই ওপাশের মুখটা মনে পড়ায় কণার হাতটিকে আর সে প্রশ্রয় দেয় নি। স্বপন তনিমাকে ছেড়ে সেই মুহূর্তে খুব না আসন দেহমন নিয়ে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে করতে থাকে শোভন। পিউ-র ঘুমন্ত হাতে হাতে নিজেকে ফিরে টেনে নেয়।

পরদিন সকালে কী জানি কী মনে করে কণার মা স্বপন মুকুলের উদ্দেশেই বলতে লাগল, তোমরা আমার জাত মেরেছ, ধর্ম নেই। আমার মুকুলের জাত মেরেছ মা। কথাটা হাসতে হাসতে হালকা ভাবেই বলেছিল কণার মা। তারপর সেদিন সকালেই তার মুকুলের আসন একতলার ঘর থেকে দোতলার ছাদের ঘরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। লক্ষ্মীর পট, কৃষ্ণের মূর্তি, আইবাবুর দোপাল—প্রকৃতি বিগ্রহ হাতেহাতে করে সকলে মিলে ওপরের ঘরে তুলে দিয়ে কণার মা-কে সাহায্য করেছিল। স্বপনের হাতে পড়েছিল গোপালের বাটুর বিগ্রহটি। স্বপন সেটিকে পরম যত্নে মাথায় তুলে ছাদের ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। কণার মা কিন্তু বিষয়টিতে কোনও আপত্তি করে নি। দেবু বলা কণাকে ইয়ার্কি করে বলেছে, কণা তোদের গোপালের জাত গেছে। ঐ পরিষ্কার গোপালকে আবার করে ওপরের ঘরে তুলে দিয়েছে।—কণা চট্ জলদি উত্তর দিয়েছে, আমাদের গোপালের জাত অত চট্ করে যায় না। পিউ মনে মনে ভেবে ওঠে—

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন বলে, জাতের কী রূপ—
দেখলাম না এই নজরে...

শোভন মুকুল তার বলল সবকিছুই লিউ-র ঐ গান হাতে তাগি দিয়ে একেবারে সমস্ত এম সমর্পণ দিয়েছিল।

* * * * *

যদি জাতের কথা ওঠে তবে শোভন অনেকদিন আগেই জাত মেরে বেসেছে। জীবনচক্রে বাঁচতে তক্কাকথিত জাত ছাড়তে তার কিন্তুমাত্র আপেক্ষ হয় না। তখন সে অনেক ছোট। স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়ে। ছুটিতে জেলার বাঁকড়ায় একবার সে রফিকুলের সঙ্গে রফিকুলদের বাড়ি ইদের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। বাড়িতে না জানিয়েই। শোভনের মনে হয়েছিল কত কাছে থাকে ওরা। মানে মুসলমানেরা। অথচ, ওদের বাড়ি-ঘর আচার-আচরণ, পরিবেশ-সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের কোনও পার্থক্য নেই। তাদের বাড়ির কোনও পুজো-পার্বণে ঘিরে-চুরোয় কোনও মুসলমান অতিথিকে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হতে সে কখনও দেখেনি। একবার তার মাসির বিয়েতে মাসিরই একদা ঘিয় বন্ধু সুজনদা মাসিমনিকে ঘিয়ে ফেরে হয়েছিল। তার অপরাধ ছিল, সে একজন মুসলমানকে ঘিয়ে করেছে। ঘটিও সে সেই কারণেই নিমন্ত্রিতও ছিল না। মুসলমানকে ঘিয়ে করবার পরেই শোভনের মাসি তাদের বন্ধুত্বের অধ্যায়টাকে শেষ করে দিয়েছিল। কী করে যেন সংবাদ পেয়েছিল সুজনদা মাসিমনি যে, তার একদা ঘিয় বন্ধু ঘিতত্বার একটু বেশি ঘনসৌ ঘিয়ে হতে চলেছে। দীর্ঘদিনের মন-মতিমালিন্যকে ঘুয়ে ঠেলে রেখে হাতে এক পোছ রজনীগন্ধা নিয়ে সুজনদা মাসিমনি এসে উপস্থিত হয়েছিল ঘিতার মাসির হাওড়ার বাড়িতে। ঘিয়ে বাড়িতে এসেও ঘিবর্মী জীবকে কেউ সেদিন আপন জানায়নি। ফলে বিবাহের অমসলের আশঙ্কা করার তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছে। দুই চোখে জল নিয়ে সেদিন সুজনদা মাসিমনিকে ঘিয়ে ফেরে দেখেছিল শোভন। আর দেখেছিল শোভনের একতলা বসতবাড়ির বর্গীয় ঘিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। অথচ, সেই মাসিরই অনুষ্ঠানে বিদেশিনী খ্রী সাহেবের সঙ্গেই ফোক চলেছিল একসময়। কারণ সূত্রে। হয়ত সাম্প্রদায়িকতার এই বিষয়টার মূলসূত্রকে ধরে রাখতে চাইছিল ঐ সাপেই-এর সূত্র। তাই এত কারণ। এত বিচার।

রফিকুলের বন্ধু রফিকুলের সঙ্গে শোভনও আসা ঘিয় ভাতের মেসমনে। মাঠে খেলত একসময়। অথচ, তার বাড়ি, তার পরিবেশ ছিল কত অচেনা। কত অচেনা। এই অচেনাকে জানতেই শোভন ইদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল রফিকুলের বাড়ি।—ঘরের দেওয়ালে আরবি ভাষার লেখা মোজনের আয়ত বাঁধ ঘিয়ে বাঁধানো ফ্রেমে ঝুলছে। মসজিদের চুড়ো এবং চাঁদ-তারা আঁকা ক্যালেন্ডার ইত্যাদি-ই জানিয়ে দেয় যে আসা একজন মুসলমানের ঘরে এসেছে। বিছানার ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে ঘিয়ে মসলিন-ফুল আঁকা এবাবেলের কাঁদ উঁচু রেকাবিতে সিমুইয়ের পায়েস। ঘিয়ে আসা মোটা পাটা এবং মাসে ঘিয়ে গেল রফিকুলের মা। বিছানার ওপর মাসে মুকুল ওওয়াজী শোভন কোনও ঘিন আসেই পারে না আসের বর্ষিরে। শোভন সেই সবই ভাবছিল। রফিকুল শোভনের সবকিছু ঘিতিয়ে দেয়, মাসেটা ঘাসির। ফোক ভেব না কেন। আমরা না জানিয়ে রফিকুলের খোক খাওয়াই না। এটা আমাদের শাস্ত্র বলা আছে।

রফিকুল বলল, খোক ভেব না রফিকুল।

রফিকুল ঘিত মেয়েছিল। তারপর রফিকুল এবং শোভনের পীড়াপীড়িতে দুটি কাঁচের বাটিতে খোক এনে দিয়েছিল। এত ভেল-ঝাল-মশলা ঘিয়ে রান্না ঐ খোক যে, শোভন আদৌতত্তার জন্য তা ঘিশেষ খেতে পারে নি। তারপর ঘাসির মায়ের খোঁজাতলে যেমন চিকন থাকে, খোকে তেমন থাকে না। শোভনের মোঁয়াওচে অনেক বড় এবং মোটা।—যেমি খেতে না পারুক। যদি আর ঘিয়ে করে তো এক আসাতেই খেয়ে। রিফুলের পুরস্কার স্বরূপ হিসেবে আদায় করে শোভন মোটেই কোনও অপরাধ বোধ ভোগে নি। এই নিয়ে আলাদা কোনও অনুভূতিও তার ছিল না। তবে পোয়াজ-রসুন-মশলা ঘিয়ে এত গুরুপাক রান্না তাদের ঘেন সয় না। এসে অম্বলের ছাপায়। যন্ত্রনায় ছাপায়। পায়খানার সঙ্গে ঢকনার আলার যেমন ঘিল নেই। অথবা ঢকনার সঙ্গে আপের যা কালক্রমে, তেমনই এটা।

মুকুল ইদের নেমন্তন্ন করল ওর ফ্রান্সিসদের বাড়িতে। কবেই ইদ। ঠিক মোরগনি হবে। মুকুল উটের মাসে খাওয়ার নেমন্তন্নই শোভনের মুর্শিদাবাদ পাড়ি ঘিল। আজিমগঞ্জ রেল স্টেশনে নেমে আসে যেতে হয় ফ্রান্সিসদের। শোভন আর মেকু ইদের আগের দিনই ঘিকেলে পৌঁছে গেল ফ্রান্সিসদের মুকুলদের গ্রামে। কথা আছে পরের দিন সকালে ফ্রান্সিরা যখন বহরমপুর থেকে গাড়িতে নিয়ে এখানে আসবে। ফ্রান্সিসদের মুসলিম অধ্যুষিত একটি গ্রাম। মুকুলের আসা নিজামুদ্দিন সরকার এখানে খুব সম্মানের লোক। দু'-দু'বার পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন। বর্ষিষ্ণু মুসলমান। সম্পন্ন মানুষ। ঘরের ঘর সম্পন্ন এবং অতিজাত মুসলমান পরিবারে ঘিয়েই একটা উট ভেবে। কেননা আঘর ছেলে আসা এবং একটা উটের দাবও পড়ে আসেন। নিম্ন আঘের মুসলমানদের পক্ষে তাই উট কেনা সম্ভব হয় না। তবে ঘাদের ক্ষমতা নেই তাদেরও উট কোরবানি হবার পর মাসে বিতরণ করা হয় এই গ্রামে। ঘৃণির উপে যেন কারও কোনও দুখ ভোগ না থাকে।—এসব মুকুলের মুখেই শোনা।

নিজামুদ্দিন সরকারের অর্থি খুঁজে পেতে খুব বেশি বেগ পেতে হল না শোভনদের। মুকুল বাড়িতেই ছিল। সে এবং তার আব্বা অভ্যর্থনা জানাল কলকাতা থেকে আসা ইদের অতিথিদের।

ফ্রান্সিসদের খুব একটা উঁচুতে গ্রাম নয়। তবে ঘল স্টাতের বসন্তে মোকান-বাজার আছে। সেখানে পাকা বাড়ি, পাকা দোকান আছে। মুকুলদের বাড়িটা ঘাস স্টাত থেকে অনেকটা ভেতরে। একদমকার বেশিরভাগ বাড়িতেই কাঁচা। দমবাস ঘর, টালি বা ছনের এক চালা ঘাস। মানুষগুলোর অবস্থাই বলে দিচ্ছে তারা খুব গরিব। অন্তরটাঁচ মানুষ। পথের দু'পাশে তাদের ভীড়িয়েছিল। কলকাতা থেকে অচেনা বন্ধুরা এসেছে এটা একটা ঔরব মর্যাদার বস্তু। যেন সিনেমার স্যুটিং হচ্ছে। শোভন আগেছিল এসো সঙ্গে তাদের ভার অসঙ্গতির। কত দূরত্ব। তাদের শহরে এবং এসেছি প্রগতিশীলতার দিয়ে সেই দূরত্ব মোটেই ঘাচা যাচ্ছিল না। এরে তারা গ্রাম, তার মুসলমান। হয়ে বিপরীত দিক থেকেও এটা সত্য যে, তারাও এইসব শহরে মানুষগুলোর সঙ্গে দূরত্ব অনুভব করে। এতে তাদের শহরে, তাই হিন্দু। হয়ত এ কারণেই এই দূরত্বের দেওয়ালটা আরও মজবুত।

মুকুলের বাড়িতে কিন্তু পুজোপুরি একটা মুসলিম আবহাওয়া করেছে। মুকুল যে এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘুনিভার্সিটিতে পড়ছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বন্ধু-অন্তরঙ্গের সঙ্গে মেলামেশা করছে। মানাই পড়ে না। জোক করে না।—এমন একটা ছেলে তৈরি হয়েছে—তা মুকুলের এই পরিবেশ দেখলে অবাক লাগে। বাড়ির সামনের দালান। হয়ত এটাই ওদের বৈঠক বাড়ি। একদিকে শোভনদের ওঠার জন্য ফরাশ পাতা হয়েছে। অন্যে বিছানা পাতা। পাশের কাঠের চেয়ার টেবিল—আসবাব জাতীয় এই ঘরোয়াতে এই-ই ঘরের দেওয়ালে মনমনা কাপড়ে আঁকা আরশলীয়-এ ঘাঁচ বাঁধানো ফটো। মসজিদের চুড়োয় ছবি দেওয়া একটা ইংরেজি ক্যালেন্ডার যার পৃষ্ঠপ্রদর্শনের হিসেব ছোট করে দেওয়া আছে। ওয়াড়ো ঘরের উলর দিকে ছোট চারপাশ জানলার ঠিক ওপরে কালো রঙ ফ্রেমের কাঁচ বাঁধানো মোবনের উর্ধ্বিত বাণীটি ঝুলছে। বাড়ির ভেতরে মাটির উনোন। উঠোনের এপার পাশে টালির চালের নি ঘর। বাঁকা। ঘরের দাওয়া মাটির। মাটির সিঁড়ি দিয়ে সেখানে উঠতে হয়। ঐ ঘরগুলোতে মুকুলের মা বিবিরা থাকে। ওটাই যমঘর মহল। হয়ত বাইরের লোকেদের প্রবেশনিষেধ সেখানে নেই। তবে এরা কেউই ভেরকম পড়া মুসলমান নয়। রঙ ঢাপা হলেও সকলে মুখই খুব উজ্জ্বল। হয়ত আজ ঘিশেষ জন্য পরনের একটা ঘৃণির হাওয়া ওদে মুখগুলোতে খেলে যাচ্ছে। উঠোনে খেলে বেড়াচ্ছে ভেল কয়েকটি মুর্ছপি। দুটো ন্যাংটা ভাকা বাটিতে করে মুড়ি নিয়ে উঠোনে ঘুরছে আর মুড়ি ছড়াচ্ছে। মুর্ছপিগুলো সে মুড়ি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। মুকুলের বিবির মুখটি বড় মিষ্টি। নাকে নথ। কানে জোম দুল। সর্বাঙ্গে ভলোর। কিন্তুটা ভেল ঔৎসুক হারানো। তবে তার মুখের মাসির ঔৎসুকে আছে আর ঐসব আয়োজন অনাবশ্যক হয়ে পড়ছিল।

ইতিমধ্যেই মুকুলের একটি সাক্ষাৎ শোভনদের আসা শুরু ঘটিয়েছে। মুকু জানিয়েছে, সারি শোভন, সারি মেকু, একজ ভেদের উট ওওয়াতে পারলাম না। এবং উট কেনা হল নি।

ঘবরটা বিসদৃশভাবে দুঃখের। কেননা উটের মাসে ওওয়ার আকর্ষে শোভনদের সে-বি-ই কলকাতা থেকে এখানে ছুটে আসা। গোস্ত, শিক ঘাব কলকাতাতেই কত পাওয়া যায়। খেয়েছেও। শোভন মেকু মনে মনে মুকুলের ওপ একটু ভেগে গেল। মুকুল একটা আগে করতে পারত কলকাতায়—'উট' ইজ ন আরেঞ্জড ইনসেন্সে! শোভন মেকু আরেকটি সে মুহূর্তে 'উটের মাসে'-র ইংরেজিটা মাথ এল না। হয়ত জানাই ছিল না। কেননা উটের মাসের সঙ্গে তাদের প্রত্যহিকের কোনও যোগাযোগই নেই। তাই, উটের মাসে না খেলে তাদের প্রত্যহিকতার কী অ এমন ঘাঘাত ঘটবে। নতুন পরিবেশে মুকুলদের পরবে তার এখানে বেড়াতে এসে এর আনন্দই ঘ কম কী!—এমন একটা সন্তুনা শোভন এবং মেকু দুজনেই মনে মনে পেয়ে গেল মুকুলদের। এবং মুকুলকে বলেছিল, না না তাতে কী হয়েছে। উট না পাও

গেলে আর কী ক্ষয় যাবে।

মুকুলের পরে আরও চার চারটি ভাই আছে। বিবি ছাড়া কেনও আছে দু'জন। মুকুলের পরের ভাইটি জমি বিষয়ের দেখাশোনা করে। এছাড়া ভাই-বোনের সব মাতব্বরি পড়ে। মুকুলের আব্বা নিজামুদ্দিন সরকার এখনও মাতব্বরি দিচ্ছেন। ভাইরা সকলেই বাইরে ঘরিয়ে ঘরে এসে ওজনের কলেজের (ইনিভার্সিটিকেও ওরা কলেজ বলে) বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে এল। সেরা সকল নিস্পৃহ সব মুখ। পরবে কার ঘটা জানা হয়েছে ওরা তার হিসেব-নিকেশ নিয়ে আলাপটা জমিয়ে তুলল। ছেলে যেন দুটো লজ্জায় ঠোক সাক্ষাতে হেরে আসলে করতে আসে নি। আর বিবি অন্দর মহলের দাওয়া থেকে দূর থেকেই এক মুখ হাসি নিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। বিবির নিন্দা হোক্তিল। এখন তালাক পেয়ে বাপের বাড়িতেই আছে। এমন জোড়াজুড়ি মহিলাদের তালাক দিল কে। কেন পালত?—শোভনের ইচ্ছে করছিল মুকুলের বিবির মনে একটা প্রেমের সম্পর্ক পাতিয়ে তুলতে। চোখের তারার তার এখনও টানা যেম। নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর দুটি চুলুচুলু চোখ।

শোভন এক গেলাস জল চাইতেই মুকুলের তিন ভাইয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। মুকুলের পরের ভাইটি আলাপ করে অনেকই ফিরে গিয়েছিল কাজে। তার ছোট ভাইটি মুকুলের মতো এক গেলাস জল হাতে হাজির হল। তৃষ্ণার্ত শোভন নিঃশেষে গেলাসের জলটুকু পান করবার পর আস্তানা হলে, দাদা আর পানি দেব।

এই 'পানি' শব্দটা তাদের মাতৃ কেমন যেন বেমানান। জলের এক নাম জীবন। কিন্তু পানিকে কি জীবন ভাবতে পারবে তারা। বাঙালি হলেও মুসলমানদের কথা পড়নের ঈতি অবশ্যই কিছু আলাদা। যদিও এক্ষেত্রে তৎসম শব্দ 'পানীয়' থেকে তদ্ভব হয়ে 'পানি' শব্দটি এসেছে। তথাপি ওদের কথা পড়নে আরবি, ফারসি এবং উর্দু শব্দের ওপর নির্ভরতা বেশি। সেই কারণেই কেবলমাত্র বাঙলা ভাষাভাষি মানুষ হয়েও জন্মাদি মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি অ-মুসলমানদের প্রত্যহিক কথোপকথনের মধ্যেও একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে। শোভন মনে মনে এমন একটা ব্যাখ্যা দাঁড়িয়ে নেয়। শোভনের খুব ছোটবেলার একটা শ্লোক মনে পড়ে যায়। কোনও দিন ঝাপারটা নিয়ে সে ভেবে দেখে নি। আজ গেলাসটা তাকে বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে। ছোটবেলায় শিক্ষার একেবারে প্রথমিক পর্বে ছোট শ্লোকের জন্য তারা জল-আকড়া স্বাক্ষর করত। খুব দিয়ে ছোট শ্লোকের মতো অবাধ্যকের অভ্যাস যাতে গড়ে না ওঠে সেই কারণে মা এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে দিত। যা ছিল ছোট শ্লোকের। খড়ি মাটি দিয়ে ঘুঁটে দিয়েই লেখা হতে গেলে পর পরবর্তী বয়সে লেখার প্রয়োজনে ছোট শ্লোকের প্রয়োজন হত। ছোট শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ছোট লেখা যেত না। তাই ওখিয়ে নিতে হত। ছেলেকে তুলে নিয়ে হাত-পাখার মতো সামনে পেছনে করার সময় ঐ শ্লোকটা স্বাক্ষর করা হত—

জলতে পানি জলকে যা
আমার পানি শুকিয়ে যা।।

যতক্ষণ না ছোট সম্পূর্ণ শুকিয়ে যেত ততক্ষণ এই দু'লাইন অনর্গল জপ যেতে হত। আসলে জলাধার হাত-পাখার মতো নাড়ানোর ফলে হাওয়ার হাওয়ায় ছোটটি শুকিয়ে যেত। কিন্তু ছোটবেলার শোভনদের বক্তব্যে ধারণা ছিল—ঐ 'মন্ত্র'-টির জন্যই ছোট শুকিয়ে যায়। এই শ্লোকটিতে লক্ষণীয় যে, 'জল' এবং 'পানি' দুটি সমার্থক শব্দকেই পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও 'জলতে' শব্দের অর্থ 'জল' নয়, জলাধার, পুকুর, খাল, বিল, নদী যেমন শব্দ। এক্ষেত্রে 'পানি' অবশ্যই জল অর্থে ব্যবহৃত। 'আমার পানি' বলতে আমার শ্লোকের জল অর্থাৎ জল-আকড়া বাহিত জল। এই শ্লোক কোথেকে এসেছে—তা ছোটই বলতে পারে না। মা-মাসিদের বলত, এটাই শেখিয়ে যা চলে আসছে। তারাও নাকি ছোট শ্লোকের সময় এই 'মন্ত্রটা' স্বাক্ষর করত। আসল ব্যাপারটা হিসেবে তো কখনও জলকে পানি বলা হয় না। তবে শ্লোকের জন্যে 'পানি' শব্দটি এল কেন? এমন হতে পারে শ্লোকটি হিন্দু মুসলমানদের কোনও এক সম্মিলিতির অধ্যায়ে মুসলমানদের খোরাই হিন্দু মুখে পড়ুয়াদের মধ্যে এসে পড়েছিল। তাহলে আরু আব্বাদের কথা 'পানি'-র মধ্যে অন্তরঙ্গতা কিন্তু ঘরিয়ে থাকতে পারে। ঐ শ্লোকের মাধ্যমে ছোটবেলায় জলকে তো সে কতবার পানি বলেছে। যদিও মুকুলের মুখ দিয়ে সে কোনও দিন পানি শব্দটি শোনে নি। মুকুল বুনিভার্সিটির কথা খুলে 'জল' খায়। এবং বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি গিয়েও 'জল' চেয়ে খায়। অর্থাৎ পান করে।—তবিও অন্তরঙ্গতা হিন্দুদের মধ্যে 'পানি' শব্দটির প্রচলন আছে। উত্তর ভারতের হিন্দি ভাষায় এবং বাঙালি ভাষাভাষি 'পানি' শব্দের প্রচলন আছে। কেন, বুনিভার্সিটির উচ্চশিক্ষিতের ভাষায় হিন্দুস্থানি ভাষার মোকাবিলে 'এক গ্লাস পানি দিবেন'—এরকম তো তারা হামেশাই শুনে। শোভন এখনও নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে একাত্ম ভাবতে আরোজনে শুনে, আর একটু পানি চাই।—যেবুও 'পানি' চেয়ে নেয়। তাতে তৃষ্ণা মেটে। তৃপ্তিও হয়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই যখন তনিমা এবং শিউ অমরনগর থেকে মুকুলদের বাড়ি চলে এল। এসেই যখন টৈ টৈ জুড়ে দিল। শর্মিলা, যখন ছাড়া একলার ঘরে না। যেবু যখনের মাঝার একটা চটা মেরে বলল, এই যে পাজি আনিসুর এসে গেছে ইদের শপিং খেতে। সঙ্গে তনিমা যেমন সাহেবও আছে দেখছি। আসাব। আসাব।—এইভাবেই শুরু হয়ে যায় মজলিস। আড্ডা। যেন স্বাধীনতার এই প্রত্যন্ত গ্রামেই ওরা পড়ে নিচ্ছে ওদের বুনিভার্সিটির সাথের পরিবেশ।

যখন আসার পর মুকুলের আব্বা আরও একবার এই ঘরে এলেন। এবং বললেন, কি যখন পথে আসতে কোনও অসুবিধে হয় নি তো?

—না মেসোমশাই। একেবারে না।

যেবু পেছন থেকে কিছু ঘরে চিমটি কাটে, মেসোমশাই কী যে, চাচাজান বল!

যেবু এভাবেই, বুনিভার্সিটিতে যখনকে মুসলিম আদব কায়দাগুলো একটু ঘেপানোর তাগিদেই স্বাধন ঘরিয়ে দেয়। জানে মুসলিম ঘরে জন্ম হলেও যখন এগুলো কোনওদিন পালন করে না। নামাজ পড়ে না। রোজা করে না। যখনের বাড়িতেও স্রষ্টি এলবের কিছের চাল নেই। যেমন আজ ইদের পরদের পূর্ব মুহূর্তে যখন মিলের বাড়ি ছেড়ে এই এতদূর চলে আসতে পারে। ওদের বাড়িতেও নাকি সেভাবে ইদের অনুষ্ঠান হয় না। ওর জন্য একবার স্থানীয় মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে আসেন—এই যা। যখন কখনোই তার পরিবেশ থেকে আলাদা, চাচাজান, শব্দগুলো বেরোয়নি। শোভন যেমন তার আব্বাকে 'আব্বু' বলে। যখনও তেমনি ওর আব্বাকে আদর করে 'আব্বু' বলে। কদাচ আব্বা বলে না। এহেন যখনকে মেসোমশাই-এর জন্যে 'চাচাজান' বলতে যাওয়ার মধ্যে যে যখনকে আপনজনের জায়গায় আনে শোভনের তা ভালই জানা। তাই যেমুন মৃদু স্বরের কথার সবাই আমোদ পেল। কথাটা পৌঁছে গিয়েছিল ঘরং মুকুলের আব্বার কানে। তিনি বাড়িতে হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, তাতে কী হয়েছে, 'মেসোমশাই' 'চাচাজান'...ও একটা বললেই হল। ঘরুদের সম্মান দেখানোটাই বড় কথা। মুকুলকেও আমি সব সময় একথা বলি।

তনিমা এবং শিউ মুকুলদের বাড়ির অন্দরে গিয়ে মুকুলের মা এবং বিবির সঙ্গে দেখা করে এল। এতক্ষণ কিচিং নাচা করে ওরা ফেরিয়ে পড়ল জল খেতে। শুরু গান যেমন—

পথেই একার নামে সাথী
পথেই হবে এ-পথ চেনা...

সঙ্গে গলা মেলানো শিউ শোভন যেবু এবং তনিমা। যখন গানের তালে তালি ঘরিয়ে পথ চলতে লাগল। মুকুলদের বাড়ির এলিকটায় লাইট আছে। কিন্তু দূরে মিলের ওদিকটায় বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি এখনও। ওপাশের ঘনীন অন্ধকার ওদের মুখরতা যেন উপভোগ করতে লাগল। গাছ-গাছালিতে ঘেরা কাঁচা-পাকা দুঁড়ে ঘরের সাক্ষাই বেশি। দু'-পাঁচটা একতলা ইঁটের পাকা বাড়িও রয়েছে। কিছুটা এগিয়ে গেলেই মোরাম বেছানো পথ। সোজা গিয়ে উঠেছে মজারের দিকে। একটালা বিলি ছেড়ে চলেছে। বাড়ির সামনে আলো দিয়ে সেজেছে কয়েকটি পাকা বাড়ি। জমা ঈদ। ছেলে কাটা ত্রিকোণা পতাকাও টাঙিয়েছে কেউ কেউ বাড়ির সামনে। একদল ছেলে ছাদের লাইট ছেলে বড়ি ঝিরিয়ে রঙিন কাগজের পতাকার চেন জনাচ্ছে। ছোট ছোট বর্ষির আয়োজন সব। এই পথেই মসজিদ পড়ল। পূর্বপুরুষি মসজিদ। পথেই একটি মাজার। মুকুল বলল, শ্যারে শিরের মাজার এটা। খুব নাকি জাগ্রত স্থান। ওরা সকলে মসজিদের সামনে একটা আঁধারো চাতালে বসে পড়ল। যদিও ইদের আগের দিন একদল কাকেরের এখনে বসে আড্ডা দেওয়াটা ধর্মীয় আচরণের পর্যায়ে পড়বে কিনা, সে বিষয়ে যেবুর মনে একটু সংশয় ছিল। মুকুল অভয় দিয়ে বলল, নিজামুদ্দিন সরকারের বাড়ির গেস্ট তোরা। কারোর সাহস হবে না তোদের কিছু বলার। আরেকটা জানিস তো এই পাড়ার ছাট পেয়ে কলকাতা থেকে বড়দার মনে আসার বন্ধু-বান্ধবরা সব এখনে পরবে এসেছে।

মুকুলের কথায় শোভনরা সকলেই আশ্বস্ত হল। শোভন মসজিদের স্থাপত্যে চোখ চালাল। খুব বড় মসজিদ নয়। তবে স্থাপত্যরীতি প্রায় একই। সেই মুঘলীয় স্থাপত্যরীতি। মাঝখানে গম্বুজের মতো। তার দোদো চারটে মিনার। মসজিদের প্রবেশ দ্বার বিলান সমৃদ্ধ। তেতরে আলো-বাতাস চলাচলের জন্য অজস্র জানালা সহযোগে দেওয়াল গাঁথা হয়েছে। পৌঁছ পদ্ধতায় যেমন সে দেখেছে যা হিন্দু মন্দিরকে মুসলিম

জন্যে মসজিদে পরিণত করা হয়েছে—এটা যেমন ছাপোয়ার-মসজিদ নয়। মুসলিম মানুষের সাময়িক প্রয়োজনে রচিত এই ধরনের অস্থায়ীই এটি পড়ে উঠেছে। তাই এই মসজিদটিতে শোভনের যখনই ওঠি-ওঠি মনে হল। বেবুকে সঙ্গে নিয়ে শোভন মসজিদের ভেতর প্রবেশ করল। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অনুভূতি হল শোভনের। হয়ত বেবুরও। মসজিদের ভেতরটা আসলে আদপেই যেমন ঔঁই আসের নয়। সবই দেখা যাচ্ছে, অথচ অস্পষ্টতায় পরিবেশ। অন্যান্য চোখে দেখা হিন্দু-মন্দিরের মতো ভেতরে কোনও বিগ্রহ নেই বলে কেমন যেন খালি খালি মনে হল। একটা লাল সিমেন্টের বাঁধানো উঁচু বেদী। তার গায়ে কালো সিমেন্ট দিয়ে উৎকীর্ণ করা রয়েছে কোরানের কোনও পবিত্র আয়াত। আরবি ভাষার লেখা আক্ষর বা ভোতনের বোধগম্য হয় নি। বেদির ওপর সযত্নে মখমলের একখানি আসন পাতা। যার তার কালাতে হবে যাওয়া এবং ওটিয়ে রাখার ভারির ঘটার ভেতরে। ওর ওপরেই মৌলবি সাহেব বসেন। এবং নামাজ পড়া হয়েন।

শোভনের মনে হল মসজিদ যতই অস্থায়ী উপাসনার স্থান। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা এখানে আল্লার শরণ নেয়। এবং যেহেতু আল্লার কোনও শরীরী রূপ নেই তাই তাদের বন্ধনাকে এবং চেতনাকে এমন এক স্তরে নিয়ে যেতে হয় যেখানে এক অসীম শক্তির কাছে নিজেদের নিবেদন পৌঁছে দেওয়া যায়। অনেকটা ব্রহ্ম ধর্মের নিরাকারে ধ্যানের মতো। পৌত্তলিকতা নয়। এক সর্বশক্তিমান অদৃশ্যের সাধনা। হিন্দুদের মূর্তিপূজা যেন-তেন অবস্থাই ভক্তদের কল্পনা শক্তিকে খর্ব করে। পৌত্তলিকতার সুবিধা পেয়ে আছে বলে তার পথ অনিশ্চিত এবং দীর্ঘ-স্থিতি সম্ভবত অনিশ্চয়তেরও নয়। খানিকটা আমাদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভোটের প্রতিটের ব্যবহারের মতো। রাজনীতি সচেতন নয় এমন নিরক্ষর মানুষেরা ছবি ও প্রতীকের ওপরেই তাদের ছাপ দেন। প্রার্থীর নাম পড়ে এবং চিনে নেন বলে লোক তা জেনে ভোট দিতে গেলে যেমন ভোটারকে অবশ্যই সাক্ষর এবং রাজনীতি সচেতন হতে হত—তেমনি। তবে নিশ্চিত ভাবে সচেতন মানুষের ক্ষেত্রেও এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের বিচক্ষণতা থাকা সত্ত্বেও। উদাহরণ ক্ষেত্রেই।

শোভন আর বেবুর কৌতূহল দেখে মসজিদের মৌলবি সাহেব এগিয়ে এসে বলেছিলেন, 'কিছু জানবা কি কিছু কবেন?

মৌলবি সাহেবের পরনে লোকা ছিল না। লুঙ্গির ওপর একটা সাদা চলা কুর্তা ছিল তার পরনে। মেয়াদটা খুব এক ঘুঘু ধরনের দাড়ি। মাথায় একটা কুরুশে বোনা সাদা মেটের টুপি। একমুখ হাসি নিয়ে সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি শোভনকে প্রশ্ন করেছিলেন। মুকুল এতক্ষণে মসজিদের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। উত্তরটা মুকুলই দিল মৌলবি সাহেবকে।—আসলে ওরা আমার লোক। কলকাতা থেকে এসেছে। মসজিদটা একটু ঘুরে দেখছে।

—কে? হাসটারের খোকা?

—হ্যাঁ। আমি আবব্বার। আসসালামুআলাইকুম।

—ওঃ। তাই বল। পরদেশ এসেছে বুঝি।

—জানেন মৌলবিসাহেব ওর নাম শোভন। শোভনসুন্দর কবু। খুব ভাল আজান দিতে পারে।

খোকা আর মৌলবি সাহেব চমকে উঠলেন।—বটে!—এরপর তাঁরে মুখটা সস্নেহ চাপড় মেরে বললেন, আজান্ হোনার মমন করুন।

শোভন লজ্জা পেয়ে যায়। মুকুল যে হঠাৎই এভাবে তার আজান দেওয়ার ক্ষমতাটা দ্বারা একজন মৌলবি সাহেবকেই বলে বসবে তা সে ঘুণাক্ষরে ভাবে নি। মুসলিমদিগের মাঠে নিছক 'ভালো লাগে' বলে আজান বলে কিছু করে আজান দেওয়া আর ঠেকে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে মৌলবি সাহেবের সামনে তার স্বীকৃতি পাওয়া এক কথা নয়। বিশেষত ভোরের আজানের সুর তার সত্যিই ভাল লাগে—

আল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর।
আশহাদু-আল্লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ।
আশহাদু-আন্না-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ।
আশহাদু-আন্না-মোহাম্মদার রসুলুল্লাহ।
হাইয়া আলাসসালাহ!
হাইয়া আলাল ফালাহ।
লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ।
আসসালামু আলাইকুম ফিসসালাইন।

আজান-এর এই আরবি ভোরা মুসলিমদিগের সঙ্গে সঙ্গে মুকুলের মুখ থেকেই এক সময় শিখে নেওয়া। শোভনও তাকে আরবি উচ্চারণ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এবং এর যথার্থতা তাকে দিয়েছে—আল্লা মহান (৩)। আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আল্লা ছাড়া আর কেহ উপাস্য নেই (২)। আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে মোহাম্মদ আল্লার দূত। উপাসনার জন্যে এসো (২)। মঙ্গলের জন্য এসো (২)। আল্লা মহান। আল্লা ছাড়া কেহ উপাস্য নেই। ঘুমের চেয়ে উপাসনা শ্রেষ্ঠ।

এই শব্দার্থ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় আজান হল উপাসনার জন্য ভক্তদের উদ্দেশে আহ্বান জানানো। ঘুম ছেড়ে, শয়ন ছেড়ে আল্লার উপাসনায় এসো। উপাসনাই শ্রেষ্ঠ।—ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের জাগরণ পর্যায়ের গানের পংক্তিগুলি—

জাগো নির্মল নেত্রে তন্দ্রির পরপারে।
জাগো অন্তরলক্ষ্মী মুক্তির অধিকারে
জাগো ভক্তির গৌরবে পূজা পুণ্যের দ্বারে—

জাগো চক্ষের আলো, জাগো কল্যাণ আলো,

এমন আরও যেন কিছু পদ ভক্তির আছে যেখানে ঈশ্বর কৃপা বা শুভ্র উপাসনার জন্য 'আলসেপনা' ছেড়ে আসার জন্য ভক্তদের আহ্বান জানানো হয়েছে।—এই প্রসঙ্গে একটি ভজনের পদও মনে পড়ে যায় শোভনের—

জাগো মোহন প্রীতম জাগো
রজনী গোহায়ে গেল...

আসলে ঈশ্বরভক্তির তাগিদ থেকে নয়, আজান বা এই সব পূজা পর্যায়ের গান গেয়েই ভক্তরাই সুখী তাদের কাছে উঠে যেন। আজানের সুরটা ভোরের আকাশে সঙ্গে কেন মানানসই। তার উদ্দিষ্ট যাই-ই হোক ভোরের উষাও নির্মল আকাশে তা ছড়িয়ে পড়ার তাগিদাতে বড় চমৎকার ছড়ানো থাকে।—একথা শোভনের বারে বারে মনে হয়। কিন্তু মৌলবি সাহেব হঠাৎ একজন হিন্দুর আজানপ্রীতিতে আপ্লাবমুলক আসীম করুণা রূপে দেখে তার ভোরেরতের রক্তা খুঁজে পেলেন। ব্যাপারটা যে ন নয় মুকুল এবং শোভন সেটা ভালই জানে। তবু মৌলবির সামনে অস্বস্তিটা কেটে যাবার জন্য,—আসলে শোভনের আজানের সুরটা ভালভাবে।

মৌলবি তখনও বলছেন, সবাই ভেলাভাবায় খেলা খেলে। আল্লাতালার করুণা

মসজিদ থেকে বেরিয়ে এরা লম্বা রাস্তিকতার দিয়েছে চাইছে। তবু এ-ব্যাপা সব সময় আগে পর দেখত। তবু ভক্তরে বলল, জানিস ওর কাল আমাদের ভাগে উঠের মাসে আওয়াজ হচ্ছে না!

—কেন? মুকুলের আমজনপত্রে তো লেখাতে এটা ছিল!—প্রশ্ন চোখ দিয়ে বেবুকে সঙ্গে নিয়ে মুকুলকে একটু বাগাতে চাইল।

পিছ বলে উঠল, যাঃ তোমরা আর এসব খোল না মুকুলকে। কেসের এমনিতে ঝাপারটা নিয়ে বিব্রত।

ওত বলকে উঠল পিউকে। তোমাকে আর মুকুলের পক্ষে সাফাই করতে হ না। বী রে শোভন কিছু বল তোর বন্ধুকে।

শোভন চুপ। নিরব। তবিনাই এটা অন্যে খেয়াল করল। মুকুল তাদের বন্ধুত্ব ইসারাকিকে মোটেই গায়ে মাখেনি। শুধু মিটিমিটি হাসছিল। শোভন হঠাৎ মুকুলকে আক্রম করে বলল, তুই কেন মৌলবি সাহেবের সামনে শোভনের আজানের ঝাপারটা বলা গেলি?

মুকুল আমতা আমতা হয়ে পড়ে। শোভনের উদ্ধত আচরণে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে সে যে এমনি!

—না এমনি নয়। ভাবল ছিল।—শোভন গুরুভাবে বলে।

মুকুল থা-টা প্রশ্ন করে, কী কারণ!

—তুই মৌলবির সামনে প্রমাণ করতে চাইলি যে তুই খুব ধর্মপ্রাণ মানুষ সঙ্গে বিশেষত ইসলাম ধর্মের প্রতি আসক্ত মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করিস।

মুকুল আমতা আমতা করতে থাকে। সহসা যেন মুখে কথা হারিয়ে যায় তা একটু বিরক্তি নিয়ে নিতেন বলা সত্ত্বেও একটু যেন উত্তেজিত হয়েই মুকুল জবাব দে এটা কলকাতায় নয় শোভন। এটুকু তান এখানে রাখতেই হয়। মৌলবি সাহেবকে খু প্রসন্ন হয়। কেননা, আমার আব্বার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল। এছাড়া, ধর্মীয় গোঁড়া আমার নেই। কিন্তু, ইসলাম ধর্মকে তো আমি পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারি ন আমার রক্ত-মজ্জায় এই ধর্ম মিশে আছে।

মুকুলের এই স্পষ্ট উক্তিপ্রতিক্রিতে শোভনের আর কিছুই বলার ছিল না। ক

বুঝল যে, এই গ্রাম্য পরিবেশে মুকুলকে অনেক অ্যাডজাস্ট করে চলতে হয়। যদিও সে কিন্তু তার পরিবেশে মৌলবিদের এবং পরিবেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের এমন বিলকুল করা কথা বলে না। বলতে পারে না। আসে না। আজান সম্পর্কে শেতনের মূল মনোভঙ্গিটা যে মৌলবি সাহেবের সামনে মেঘু ভাষায় স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছে—তা ফজলকে যথেষ্ট খুশি করেছে। খুশি করেছে শেতন এবং ওস্তাদকেও।

আজান পরিবেশ অনুকূল হয়ে ওঠায় ওরা অতঃপর ফিরে যেতে। খাওয়া-দাওয়া করে নেয়। শেতন মেঘু সকাল থেকে যে ঘরে ছিল সেই ঘরেই তত এবং ফজলেরও শোয়ার ব্যবস্থা হয়। মুকুলের আব্বার ঘরটিও ওদের জন্য খালি করে দেন মুকুলের আব্বা। সেই ঘরে তনিমা এবং শিউ-র শয্যিবাপনের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে ফজলের অন্তর্মুটে মেহ-মন ছটফটিয়ে ওঠে। হয়ত তনিমারও। শিউ ওস্তাদকে 'ওত রাত্রি' জানায়।

পরদিন ভোরে আজানের ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে যায় শেতনের। মসজিদ খুব দূরে নয়। ইব-টাক-জোহ্য-র ভোরে সঙ্গীতময় ঐ পবিত্র ঐশী ধ্বনিপুঞ্জ প্রাচীনত্বের আকাশে বাতাসে মায় প্রতিটি গৃহ কোণে যেন মিশে যাচ্ছিল। মিশে যাচ্ছিল শেতনের অন্তরের অন্তঃস্থলেও। যেন সেই, "আমের ভিতর বিদ্যা মরমে পশিল গো/আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

শেতন দরজা খুলে বাইরে এল। বরং এসে দেখল মুকুল নতুন লুঙ্গি পরে পরে জামা এবং মাথায় ঐতিহ্যিক টুপি পরে নামাজ পড়তে চলেছে। শেতনকে দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লে সে। যেন কোনও অপরাধ করে ফেলেছে। এমনই তার কচুমাচু মুখভাব। যদিও জপন ধর্মের প্রতি তার আনুগত্যের কথা গতকাল দৃঢ়ভাবে বলায় মুকুলকে অনেক সৎ মনে হয়েছে। নিজের ধর্ম পালন করা তো কোনও অন্যায় নয়। যদি সে ধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিকৃতিকে বর্জন করতে পারে—একথা মনে হল শেতনের। কারণ তার মনে হল ধর্মবিরোধী তার নিজেদের ঘোষণা করায় জপন এবং তত্তর মতো মানুষেরা এদেশের মানুষের মন থেকে অনেকটা আলোকনকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুকুল যতত এই জায়গাটাতে প্রগতির মানুষের সঙ্গে পাশে পা মিলিয়ে চলতে পারছে।—হয়ত এরকম একটা ধাক্কা মুকুলের অনেক ভুল ভিরমিল। তাই নিজেকে অনেকটা সম্প্রতিত করে তুলে সে বলল, একটু নামাজ পড়ে আসছি। মুকুলের আব্বাজান এবং তিনটে ভাইও মসজিদের পথে পা বাড়াল।

সকলবেলাতেই মুকুলের আব্বাজানের ঘরে একটা বৈঠকী মজলিশ বসল। সে-ই-ই ভূমিব্যবস্থিতির আব্বার চিত্রায়িত ঢঙে। হুসি। ট্র্যা। ইত্যাদি। শেতন গল্পো। মুকুলও নামাজ পড়ে এসে সেই আব্বার যোগ দিল। এই ঘরটা পাশের ঘর থেকে একটু বড়। এ-ঘরেও জানলার ঠিক নিচে একটা তক্তপোশ পাতা। এবং আগেই বিছানা পাতা হয়েছে। ঘরে আসবাব বলতে দুটি চেয়ার এবং একটি টেবিল। টেবিলের ওপর কিছু বইপত্তর। একটি উর্দু তাবার ম্যাগাজিনের কেন কিছু পুরনো সংখ্যা। দেওয়ালে টাঙানো পরিষ্কার হয়ের ছবিতে কাঁচ বাঁধানো ফটো। এবং ফজলুল হকের একটি কাঁচ বাঁধানো ছবি।—শেতন তার দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল। হঠাৎ তাদের সকলকে অবাক করে দিয়ে মুকুলের আব্বা নিজামুদ্দিন সরকার ঘরে সেই ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ফজলবাড়ী লোক। তাই তিনি আসতেই সকলে তাদের চাঁদুল আচারণ বন্ধ করে দিল। সকলের মতো মুকুলও ভেবেছিল আব্বা হয়ত কোনও একটা দরকারে তার ঘরে এসেছে। এবং এক্ষিতেই সেটা নিয়ে ঘর থেকে প্রস্থান করবে। কিন্তু না। আব্বা টেবিলের কোণায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং সকলকে 'ঈদ মুবারক' জানিয়ে বলল, জানি তোমরা নতুন বুঝক। অনেক ব্যাপারেই তোমাদের সঙ্গে আমার মিলবে না, তবু তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

জপন তৎক্ষণাৎ একটা চেয়ার ছেড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবং বলল, মেসোমশাই বসুন বসুন, এখানে বসুন।

শেতন বলল, মেসোমশাই আপনার এই ঘরে ফজলুল হকের ছবি রেখে খুব ভালোই করেছেন। এই লোকটাই তো 'পাকিস্তান প্রস্তাব' করে দেশটাকে তাদের ব্যবস্থা পাকা করেছিল।

এ-কথায় নিজামুদ্দিন সরকার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলল, ভুল। মস্ত ভুল। যদিও ১৯৪০ সনে লাহোরে প্রস্তাব ফজলুল হকের দ্বারাই উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব থেকে পরবর্তীকালে সরে এসে অখণ্ডভারতের বিপক্ষে ছিলেন। জানেন এটা? তারপর একটু থেমে, মন নিয়ে, আব্বার চুপিটা আরও একটু ভালভাবে মাথোপরি করে তিনি বললেন, ফজলুল হক ছিলেন অনেকটা খাঁটি আওয়ামী। এবং উনার স্বপ্নের। পাকিস্তান প্রস্তাব যে অবস্তব এবং অনিষ্টকর তখন তা তাঁরতবর্ষের আওয়ামীলীগ তা তিনি উনিশশো একচল্লিশ সনের শেষ দিকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তখন জিন্নার সঙ্গে তার প্রবল বিরোধ হয়। এবং জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্বেরও বিরোধিতা করেছিলেন তিনি।—একথা বলার পরই নিজামুল-হকের ছবিটার দিকে তাকিয়ে আবেগে। এবং বেশিক্ষে তাকিয়েই থাকিয়ের মতো তিনি বলতে থাকেন, তাকতে পারে জিন্না মুসলমানদের পাকিস্তান গড়ার জন্য খেপিয়ে তোলার সময়েও ফজলুল হক বলেছিলেন, আল রিলিজিয়নস মাস্ট বি, ফ্রম দ্য বেসিক পয়েন্ট অব ভিউ, ওয়ান...দ্য ভিক্টরি অব ইন্ডিয়া উড বি ভিক্টরিজের নট দ্যাট স্লুইক দ্যাট কাই হ্যাজমনি...''। এর চেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আর কী হতে পারে।

ঘরের সকলে মুকুলের আব্বার কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। নিজামুদ্দিন সরকার পেশায় যৌহেতু শিক্ষক তাই কথা বলার মধ্যে একটা মাস্টারির ঢং আছে। যদিও তিনি মাস্টারার শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের নন। তথাপি তার জ্ঞানস্তরি অগাধ। এমন মানিয়ে কইবে না হলে গ্রাম্য রাজনীতিতে টিকে থাকা খুব দুষ্কিল হয়। উনি বুদ্ধুরের পক্ষারেত প্রধান ছিলেন। তাই টিকে থাকার প্রশ্নে উনি অবশ্যই অনেকটা সফল মানুষ। তিনি বলতে থাকেন, আসলে কি জানো সম্প্রতির ফন্ডাটা আল্-কোরানেই জমা আছে। যখন তুমি নিশ্চয়ই জানো কোরান পরিষদের ১০১-তম সূরায় সেই বিস্তার বড় আয়াতটির কথা।

স্বপন ঘাড় নাড়ে। স্বপনকে সুযোগ না দিয়ে তিনি বলতে থাকেন—"তোমাদের ধর্ম তোমাদের। আমার ধর্ম আমার কাছে প্রিয়"। অর্থাৎ যে যার ধর্মমতে অবস্থান করুক। কেন তোমরও তোমরও অবরদস্তি না হয়।

স্বপন বলল, কেন মেসোমশাই এই প্রসঙ্গে আর একটি বিখ্যাত হুসিস-এর কথা বলা যায়, "তোমেরেরা বলল, হে রসুলুল্লাহ্! পৌত্তলিকদের অভিশাপ দিন। তিনি জানেন, আমি কখনো অভিশাপ দেবার জন্য প্রেরিত হইনি। বরং শুধু ধরা প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

—আ। ঠিকই বলেছ। আল্লাহ্ সকল মানুষকে পরিচি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণাভাব আল্লাহ্ কখনোই ভালোবাসেন না।

শুভ আর চুপ থাকতে না পেরে বলে, কিন্তু মেসোমশাই এই 'ধর্ম' থেকেই পৃথিবীতে যত বিদ্বেষ ঘৃত ঘৃণার উৎপত্তি। হয়ত ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যেই এমন কিছু থেকে গেছে, যাঁর থেকে গেছে—আর মৌলভীরা সেই সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে মানুষকে তার নিজ নিজ ধর্মের প্রতি অন্ধ মোহগ্রস্ত এবং কূপমোহাচ্ছন্ন করে তুলছে। সেই কারণেই মার্কস বলেছেন, ধর্ম হল জনগণের আফিম।

মেঘু চিৎকার করে বলে, রাতো কি এস চুতো। মুকুলের কড়িটাকে ভুলিভর্তিটির ইউনিফর্ম কম বানিয়ে ফেলেছে! সত্য সেলুকাস তোমার এদেশ আছে ঘাটে। সব কিছুই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বৈকতে।

—তুই চুপ কর মেঘু। নাটক করিস না। দেখছিস না পৃথিবীর এত বিষয় থাকতে দেশের এত সমস্যা থাকতে এখনও আমাদের আবরি মসজিদ আর রাম জন্মভূমি নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে! কেন জানিস? ঐ ধর্ম। মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কে দেয় ঐ ধর্ম।

শুভ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ওর রোগা শরীরে যা ক্ষতির কারণ হতে পারে। শিউ ক্ষীণ কণ্ঠে শুভকে চুপ করতে চেষ্টা করে, তুমি চুপ করো: এত চিৎকার করলে তো শরীর খারাপ করবে।—তারপর নিজে শুভকে নিরস্ত করতে না পেরে স্বপনকে বলে, স্বপন তোমার বন্ধুকে একটু চুপ করাও না।

স্বপন কিছু করে শিউ-কে বলে, দাঁড়া আগেলা চুপ করাচ্ছি না। তারপর গলা তুলে বলে, আমি শুভকে পুরোপুরি সমর্থন করি। আমি জানি কোরান হাদিসে অনেক ফাঁক-ফোকর আছে, কিন্তু ধর্মের শত্রুরও আছে বিস্তর ফাঁক-ফোকর। সেইখান দিয়েই ঢোকানো ঢুকছে।

শেতন শঙ্কিত হয়ে বলে, কিন্তু উপায় কী! ধর্মকে তো তোমরা বন্ধ দিতে পারছ না। এতদিনকার চর্চা। মানুষের রক্তের মধ্যে মিশে আছে ধর্ম। তাকে বন্ধ দিলে তুমিই একঘরে হয়ে পড়বে। মৌলভরা আরও সুযোগ পেয়ে যাবে।

তনিমা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে বিতর্কে যোগ দেয়। বলে, সেই কারণেই যারা আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী তাদেরকে ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে বাছ বাছ ভাস ভাল কথাগুলো তুলে এনে নিরক্ষর ধর্মভীরু মানুষদের বোঝাতে হবে যে, সকল ধর্মের মূল বক্তব্য এক।

তনিমার কথার সূত্র ধরে নিজামুদ্দিন সরকার তনিমাকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন, জেনেরা ঈশ্বর অনাদি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তাহলেই একথা বলা আসছে যে,

'মংং ব্রহ্মেতি আদিত্যাদ্ এবং' অর্থাৎ ব্রহ্মবাদের মূলে যা একই। এই একেশ্বর চিন্তা উপনিষদে আরও স্থায়ী এবং গভীর। উপনিষদের পরম দুজ্ঞের চিন্তা ব্রহ্মমোহন, দেবেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আরও সুস্পষ্ট আরও প্রখর এবং জীবন-সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল। সুদূরবীন ঐতিহ্যচেতী মহান ভারত ভূমিতে একেশ্বর চিন্তা যারে। যারে নানানভাবে দেখা দিয়েছে। কোরান শরিফ অবতীর্ণ হবার আগেই একেশ্বর চিন্তা ভারত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।—এই একেশ্বরবাদই ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। তাই আল্লাহ্ ঈশ্বর পর...সবই তো একজন। বিজোধটা কোথায়?

তোমার পথ চাহিয়াছে
মসজিদে মন্দিরে
তোমার তরে ওগো সাঁই—
জানতে না পাই,
ঈদিখা গাঁয়ের
ওজুতে রোজখেলে।

এ ভাষা মন বলতো। নিজামুদ্দিন সরকার এতেজন ভারের সকলকেই মানুষ করে তোলেছিল। কোন অন্যোরই সাবিৎ পর্যন্ত ছিল না। হয়ত এই প্রশ্নটাই যেন তাদের সাবিৎ দিল। সকলেই খুব চাওয়া-চাওী করল। এমনকি মুকুলও। কেউই বলতে পারল না—এটা তার গান। তখন মুকুলের আব্বা নিজেই আগে বিলেন।—এটা হল বিখ্যাত সাহিত্যিক বাউল মনের একটি গান। বরিয়ে মুসলমান বাংলে তার জন্ম হয়েছিল। অথচ দেখ কি তীব্র তার একেশ্বর চিন্তা। সম্প্রীতির জোর। না, আর নয় আর নয়। আমি মাস্টার লোক তো। তাই একটু মাস্টারি মারলাম। নাও এবার তোমরা নাচা করে নাও।

—মেসোমশাই আমরা মুর্খ। উঁচুর মানে আওয়াজে গাইতে পারব না বলে মুকুল খুব দুঃখ করছিল। কিন্তু, আপনার এইসব কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের এখনও অনেকটা বিশ্বাস যায় নি।

তবুই সকলের পক্ষে মুকুলের আব্বাকে ধন্যবাদ জানালো। শোভন ভাবতে লাগল এই গভগ্রামে বসে লোকটা কত পড়াশোনা করেছে। আর কলকাতার কত মানুষ দু'পাতা পড়েই নিজেদেরকে পণ্ডিত হিসেবে জাহির করে।

এরপর মুকুলদাই এক ছোট ভাই ঘরের তক্তাপোশের ওপর সাদা চাদরটা চমৎকার বিছিয়ে দিয়ে গেল। আর দু'ভাইয়ের হাতে সকলের জন্য আনা নাস্তা। মিষ্টান্নের পায়েস, পরোটা, সরবত ইত্যাদি। সেইসব আব্বারদাব্বার ঐ সাদা চাদরের ওপর রেখে গ্লাসে পানি ভরে দিয়ে তারা চলে গেল।

ওদের অতিথি পরায়ণতাটা বেশ ভাল লাগল শোভনের। মানুষকে ওরা পরম পরিমা মনে করে। তাই বিছানার ওপর হতে তুলে দেয়। অথচ হিন্দুরা এটা আঁতার ঘরে খাওয়া-দাওয়ার শোবার ঘর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। যদিও প্রত্যেকের কাছেই কোনও না কোনও যৌক্তিক দিক আছে। শোভন শুধু এই আচারটাকে মেনে নিল। মনে মনেও এই নিয়ে কোনও তর্ক তুলল না।

দুপুরের খাওয়াটাও ভাল হল। ভাত, ডাল, তরিতরকারির পর যখন বাসে এল তখন শোভন, মেনু, অনিমার মনে কতক যোগাযোগ শেষ দিয়েছে। মেনু বলল, মুকুল এটা শেষ!

—না রে তোর ভয় নেই। বিশুদ্ধ ঘানির মালে।

—ভয়ে আমার তো গেছেই চাইনি।

—ডিমোক্রেসিমনের মতো নিয়ম জানার জন্যই নিয়ম জানিস না।—মুকুল সকৌতুকে বলল।

—ডিমোক্রেসিমনের বিষ্ণু জাত যাওয়ার ভয় করত না। আমরাও করি না।

শোভন দৃঢ়ভাবে মুকুলের কথার উত্তর দিল।

শেষরও এসে গেল। আর একবার করে আত যাওয়ার কথা হল। তবে কেউই তেমন জোর পেল না। এমনকি শোভনও না। অবশ্যই মুখে জোর যাওয়ার মতো নয়। আসলে মুকুলের কথাটাই যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল—শোভন মনে মনে তা মেনে নিল।

বিকেলবেলা বিদায় জানাতে মুকুলের আব্বা আম্মার এই ঘরে এলেন। এবার ফালেন, নীতের সময় এসে। বিদায় ভাতে জোরাদের নিয়ে গাবি মাতাতে যাব।

* * * * *

দুনিয়াদিটিতে শোভন-মনের মধ্যের কলাটা ছিল একটা পরিবর্তনের মতো। তখন মনে হোত—এই পরিবার কখনোই আপন নয়। মুসলমান ভয়-ভক্তিতেও তা ভাবতে না। তবু শোভনের মনে একটা খুত ছিল। অস্বস্তি ছিল। অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল। পড়ার একটা আড্ডাও ছিল। কিন্তু খাদল, মুকুল, তত, লিটি এবং এমন অনেক বন্ধু-বান্ধবেরই তেমন ভিন্ন যা ছিল না। কেননা, তারা ছিল ঘনিষ্ঠজনত। অন্যান্য জেলা থেকে এমনকি প্রতিবেশী সাকা থেকে এসে ওরা কলকাতার এই দুনিভার্সিটিতে পড়তে এসেছিল। হয়ত সেই কারণেই দুনিভার্সিটিতে আসার ওদের কোনও নির্দিষ্ট সময় ছিল না। ক্লাসের সময়টুকু বাদ দিলেও ওরা দিন এবং ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পরও অনেকটা সময় দুনিভার্সিটির চত্বরে কাটাত। হোস্টেলে ওদের ঘরেলেও তো ছিল দুনিভার্সিটির ঠিকানা। শোভন এটা সময় দিতে পারত না ওদের সঙ্গে। তবে তার অফিস ছুটির পর থেকে রাতে ফিরে যেবার আগে পর্যন্ত সময়টুকু সে যেন বরাদ্দই করে রেখেছিল দুনিভার্সিটির জন্য। এবং ঐ কৃতজ্ঞ বন্ধু-বান্ধবের জন্য। কিন্তু সব কিছুরই তো একটা শেষ আছে। যৌবন আবার কবে একদিন শেষ সীমা ছুঁয়েই হয়। এবং এ পরীক্ষা হয়ে যাবার পর থেকেই দুনিভার্সিটির বন্ধুরা সব বিভিন্ন মাত্রা পড়েছিল। শোভনের জগা থেকে বিভিন্ন হয়ে পড়েছিল খাদল, তনিমাও।

আশ্চর্য! এত মৈত্রী নিয়ে যাদের দিন-রাত কেটেছে তাদের সম্পর্কে এক ঘটিপাত, তাবাই যায় না। হয়ত এটাই স্বাভাবিক ছিল। জীবনের কৃতজ্ঞ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়লে খুব স্বল্পসময় বন্ধু হতে পারে। তখন একজনের নিজস্ব কৃতজ্ঞ সঙ্গে অপরের কৃতজ্ঞের অনেক তারাক হয়ে যায়। হয়ত ব্যক্তিপরিচয়ও আলাদা হয়ে পড়ে। হয়ত তার কোনও দিন আর এইই কিন্তুতে মিলিতেই হবে না। বন্ধু সূত্রে যাক, নিকট কক্ষে সম্পর্কের মানুষের সঙ্গেই তো কৃতজ্ঞের পরিধি আরও বড়ো হওয়া এবং ভিন্ন হওয়ার বাবে মূলত যুক্তিসঙ্গত হয়ে পড়ে। তা সে যত বিচ্ছেদেরই হোক। যত কোনাকাই হোক। 'ত মেনে নিতে হয়'।

বলতে দিধা নেই শোভনের, এম. এ পরীক্ষার পর তার ভিন্ন বন্ধু খাদল সঙ্গে আকস্মিক বিচ্ছেদ তারে এক ধরা কোনাও নিক্ষেপ করেছিল। তা জানি হয়ত খাদল এই ভেব ছিল না। বিচ্ছেদের জ্বালা হয়ত ওকে এভাবে পীড়িত করে নি। অথব এসবই মনগড়িত ভাবনামূত্র। বিচ্ছেদের 'জ্বালা' 'তালা' নিতান্ত নাকারি। বৃহত্তর পৃথিবীতে জীবনের অর্থাৎ জীবিকার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে হক কেরানের জ্বালাটা ঐসব ভাবনাচিন্ত ছাপাতে মোজাসুজি ভূমিকা দেয়। কেরানের শোভনের জীবনেও ছিল। এখন ওর সামনে যমদূতের মতো কেরানে এসে দাঁড়িয়েছে। লিখিত কেরাব। উচ্চ লিখিত কেরানের কণ্টকিত মুখটা আরও একটি কাঁচার সূচীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। এছাড়া আর একটি জ্বালা আছে খাদলের। তনিমার। যদি ওর সঙ্গিটি যার জীবনে ভাব হবে, সে পরও যে ফুল-চন্দনো হবে না তা শোভন বেশ অনুভব করতে পারে।

দুনিভার্সিটিতে যখন খাদল তনিমা কাছাকাছি ছিল তখন এ নিয়ে কোনও চি ভাবনা হয় নি। কলা ভাল, ভাবনার অবকাশ হয় নি। কেননা, খাদলকে আলাদা ক কখনোই 'মুসলমান' মনে হয় নি। যদিও অন্যরাও সেভাবে কখনও 'হিন্দু' ছিল না আদের পরিচয় ছিল, অনুভব ছিল, বন্ধুর আগে ছিল একজন ছাত্র একজন ছাত্রী একজন পুরুষ একজন নারীর, একজন যুবক একজন যুবতীর। তবের পার্থক্য নিয়ে অভ্যেকেরই আদের রক্ত ছিল লাল। মনের রঙ ছিল সবুজ। মাথার ওপর যে ঘোলাটি মেঘাকাশ ছিল, আকাশ, বিষ্ণুটা যেন যৌবনের অভিভাবকের মতো—তার রঙ ছি নীল। গভ্য নীল।

অবশ্য, শোভনের জানতে অন্তরের আকাঙ্ক্ষাটা সীমাহীন নয়। অবশ্য নয়। বিভি দেশের সীমারেখার যেমন কাঁটাতারের বেড়া আছে, তেমনি আকাশেও এক কাঁটাতারের বেড়া আছে। দেশের আকাশে। সমাজের আকাশে। বি-জাতিতত্ত্বের বেড় তো জীবন একটি সেই আকাশের নীচে। আজ শোভন যেন সেই বেষ্টনেরটা ব বেশি করে অনুভব করছে একটা দুশ্চিন্তার ভূমি থেকে। সেই আকাশসীমা লঙ্ঘ করে ঘর বাঁধতে গেলে তা ছাবাঁ হবে তো!

দুনিভার্সিটিতে ছাত্র অকাকাসীন এমন একটি উদাহরণই শোভনের কাছে ছি তাও সেটা খাদলের আকাশেই। জামাদউদ্দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. করেছে। বাংলায়। খাদল শোভনের বছর পাঁচেক আগে। বিয়ে করেছে উত্তর কলকাত কবু পরিবারের মেয়ে সুলক্ষণাকে। সেও আমাদের সহপাঠিনী। এরে বিয়েতেই নি আকাশসীমা লঙ্ঘনের বিয়ে। তার, মেয়ের। হক মেয়ের। সুলক্ষণা 'হিন্দু' আর 'মোসলমান' জামাইকে মেনে নিতে পারেনি। 'মেয়ে' 'পর খেকো'। সুলক্ষণা এক জ্বালা মেয়েকে এসেছিল বাড়ি থেকে। চির বিচ্ছেদ। আব্বা-মা-ভাই-বোন সকলকেই বিদ দিয়ে, পারলৌকিক ভয়ে দিয়ে অতীত স্মৃতি ভয়ে দিয়ে আমাদেরই ভবিষ্যৎ বর্তমান এ ভবিষ্যৎ ফেলে পথে নেমেছিল। আক্ষরিক অর্থেই 'পথে'। হিন্দুপাড়ার ভাড়া খে

ছিলেন মুসলমান বাড়ীর জন্য। আর মুসলমান পাড়ায় একঘরে হয়ে ছিল মুন্না 'বহুন' জাতীয় পদবী ব্যবহার না করে হিন্দুদের 'বসু' পদবী ব্যবহার করার জন্য। একটা অবান্তিকর ব্যবস্থা।

ভয়ে পড়ে শেতনের কাছলের দোকানটির কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালের গায়ে ফুটপাতে ছোট্ট মুক্ত স্টলটির কথা। দোকানের নাম ছিল 'রজনর'। যথার্থ নাম 'রজনর'। আজাদ কেন এক ডাকহরকরা-ই। রাত-দিন শুধু ছুটে চলা। পিঠেতে দরিদ্রতার বোঝা। সাংসারিক সমস্যার বোঝা। এসব নিয়েই তাকে চলতে হত ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে। কেননা, 'রজনর'-এ শুধুমাত্র লিটল ম্যাগাজিন এবং রাজনীতির বইপত্রই বিক্রি হত। যা কখনোই বইপাড়ার 'কেতে সেলার' হত না। যখন শেতন রজনর ওদের তখন একটা আড্ডাই ছিল কায়দের দোকান। বিশেষত বৃদুবে। দুনিয়াদিটি এক অন্যান্য সময়ের ফাঁক-ফোকরে। এমনও দিন গেছে যেদিন কায়দের দোকানে এক পয়সা বিক্রি হয় নি। বন্ধু-বান্ধবেরা এক-আধটা ঘটি পত্র-পত্রিকা কিনে ওকে সাহায্য করেছে তবে ওর ঘরে হাঁড়ি চড়েছে। এই পরিস্থিতি দেখে শেতনের সেই সময় চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, কেন তুমি আকাশগঙ্গার লাঞ্ছনের ফিরতে গেলে। কেন এই প্রস্তরিলীন সাহিত্যের দিকে পসরা সাজিয়ে বসেছ দোকানে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে নতুন আকাশ গড়ার বিলাসিতা কেন তোমাদের—হাসান স্বভাবতই ধীর স্থির শান্ত একমুখ দাড়ি। মলিন মুখ। গভীর দুটি চোখ। ধনুকের মতো দুটি বাঁকা ভ্রু। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাত জুড়ে পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। একটা আশ্চর্য নিস্তব্ধতা ঘিরে ওর মুখে। এমন কখনো, অন্ধকার পশ্চাৎপটে ওর দাঁতগুলো যায়ও সাদা উজ্জ্বল ঝকঝকে দেখায়। যেন আলো পাখরের মুক চিরে এক ফালি অকলঙ্ক জলের ধারা। এটুকু হেসেই যেন ও উত্তরটা দিতে—ছেঁড়া কাঁথার ঘাণ পেয়ে তাতেই তো বিপ্লবের ঘ্রাণটা দেখে শেতন। নতুন আকাশ গড়ার সাধ তাদেরই।

যখন তনিমাও কি এমন স্বপ্ন দেখতে চাইছে। নতুন আকাশ গড়ার সাধ কি তারেরও নাকি নিছকই একটা আবেগের কারবারী হয়ে তারা এই সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে।

দুনিয়াদিটির বিনওতে যখন যে যে করে বেরিয়েছে, যখন তনিমার সন্ধিতে এসেছে তখন এমন আকাশের কথা এমনভাবে মনেও হয় নি। যখন দুনিয়াদিটিতে ঘরওলো মেয়ের সন্ধিতে এসেছে, যেমন—সুলেখা, কলা, ঈশিতা...এরা সকলেই থাকতেন হিন্দুর-র মেয়ে। শেতনের মনে হয়, হয়ত সেই কারণেই যখনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক পরিণতিমুখীন হয়ে ওঠেনি। তাদের মনের আবাদেই হয়ত একটা ধাঁচাতন্ত্রের বেড়া ছিল। তারা সেই আকাশগঙ্গা সন্ধান করতে চায় নি। যখনদের হয়ত পরাজয়ে শিরু হাঁটতে হয়েছে। কিন্তু তনিমাকে বন্ধুর দেখেছে শেতন, ও ছোট্ট ফেলার মেয়ে। বাড়ন্ত করার মেয়ে। ধর্মের আকাশগঙ্গাটা ও ভেঙে ফেলতে চেয়েছে হয়ত। অথবা যৌনতার সামাজিক প্রকার। অনন্তানি। তারপর সম্পর্কে নেমে এসেছে চৌত্রিড় খরা। দুর্ঘিকাটা মাঠের মতো ওদের সম্পর্ক। অনেকেরই তো এমন হয়। কে জানে ওদের ক্ষেত্রে কোনটা বিনাশীল হয়েছে।

এরই মধ্যে শেতনের বিয়ে হয়েছে। যার পায়ে শেতনের প্রেম ফুলপুষ্পিত ছিল তাকেই বিয়ে করেছে সে অবশেষে। দুনিয়াদিটির সেই তপতীকে। অবশ্য বিয়ের সময় দুনিয়াদিটির কাউকেই ডাকা পায়নি সে। কোনও বন্ধু-বান্ধবকেই না। হ্যাঁ, তবে তপতীর ঘরের আত্মীয়-কয়েকজনকে সে তাদের বৈবাহিক অনুষ্ঠানে পেয়েছিল।

বিয়ের পর শেতনের নতুন জগৎ। নতুন ঘুর। জীবনের নৈমিত্তিক প্রবাহে তেমনি নতুন নতুন ঢেউ এসেও তার অস্তিত্বের উত্তরমিকে ভাসিয়ে দিয়েছে। নতুন আবাসনে চিত্রিয়ে দিয়েছে। জীবনে এটাই যেখানে স্বাভাবিক। মোর আভ্যন্তরিক। সত্যি কথা বলতে কি দুনিয়াদিটির সেই রঙিন জীবন যেন তার কাছে বিস্মৃতির অতলেই তলিয়ে ফেতে বসল। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন রবীন্দ্র সদন-নজরুল চত্বরে যখন-তনিমার সঙ্গে দেখা হল শেতনের। তখন ওরা বিবাহিত। কোলে ওদের প্রথম সন্তান। ত্রিভঙ্গমুরে আঁকিবুকি বাঁকে ঘুরে গেলে যেমন যাবক হয়, বুকের মধ্যে উল্লাসটা যেভাবে কেমিল সমুদ্রের মধ্যে উথলে ওঠে—শেতনের তেমনই ঘটেছিল কাল।

যখনকে কিন্তু কেন বিস্তরন দেখাল। তনিমাও তদ্রূপ। ঘির। অচঞ্চল। সংযমী। শুধু ঠোটের কোণে একটা সামুক হাসি। কেটেরগত দিঘল দুটি চোখে তার আকর্ষণীয় ছায়াপাত। যেন বলতে চায়, যখনকেই শেষ পর্যন্ত বিয়েটা করে ফেললাম। তেমের আনাবাদ কিশোর সুরোশ পেলাম না।...যখনের একমুখ দাড়ির মধ্যেও যেন সেই একটি বৈকিয়তের ধরা পড়ছিল। দুজনে মুখবদ্ধির আড়াল থেকে, বিশেষত ওর দুর্ভিদীপ্ত চোখের তারায় যেন তেমনই এক বৈকিয়তের ঘীন আভাস। যখন্ত জল রঙের ছবির মতো।

—একটা চিঠি অন্তত দিতে পারতিস। নিদেন একটা পোস্টকার্ড। শেতনে: বলিয়াটা অভিযোগের ভঙ্গিতে মনের ঘ্রাণটা মিশিয়ে দিতে চায়।

—শেতন রাগ করিস না। তবে আমাদের তো এক দিন না এক দিন আপন আপন ফুলে আকর্ষিত হতেই হবে যে। তোকে বেবুকে ওভাবে মুক্তাকাশে কতদিন পিঁড়িয়ে কি সারা জীবন ধরে রাখতে পারব? তবে রাখা সম্ভব।

—তা হয়ত ঠিকই বলিস।

—সেই জন্যই এই বিচ্ছেদকালকে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে মেনে নিয়েছি আমরা।

—চাকরি পেয়েছিস?

এই প্রশ্নে যখনের ঘাড়টা অদ্ভুত যান্ত্রিকতায় নড়ে উঠল। যেন 'মডার্ন টাইমস'-এর চার্লসির। যান্ত্রিক সভ্যতার দ্বি-প্রকিল্পনিত আচরণ করে না। বয়সের পুতুলের মতো এক নিয়ন্ত্রিত ক্যালিফোরনায় বসে ওঠে। এই প্রশ্নটা হয়ত ওকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। মনের ঘরনের মধ্যেও এক ঘরনের যান্ত্রিকতা রয়েছে। যার যন্ত্রকরে ক্রীপে হয়ে যাওয়া জরুরী। স্টিয়ারিংটাইপ। তাই সংগঠনটা তেমনই চিত্রায়িত পথ-রীতি মতো। একঘেয়ে বিরক্ত যান্ত্রিক এক নঞর্থক শব্দ। যখন্ত অস্বিস্তিতে।

—হবে হয়ে যাবে...

—এই টুকটাক চলছে। টিউশন-ফিউশন করছি।

চোখের আড়ালে ছেলের চশমাটা খুঁ-মুখে একটু ঠেলে, এঁটে, যখন একটু কুণ্ঠিত হেসে সন্ত্রস্তিত হতে চাইল। হয়ত হলও। কিন্তু নিজেকে সেভাবে প্রকাশ না করে মুহূর্তটা উপোর মতো এক আজানা রহস্যে নিজেদের পাশ্চাত্যকে সরিয়ে রাখল। এবং বলল, তখন তোর কথা বল। বিয়ে করেছিস? তপতীকেই?

—হ্যাঁ।

—ভাল। এখন কোথায় আছিস?

—গড়িয়ার কাছে। আর মা একাকিনি।

—মাব।

—তোর কোথায় আছিস?

—আছিতে। বসিরহাটে।

—দুনিয়াদিটির বন্ধু-আত্মকদের সঙ্গে দেখা হয়?

—না। কারোর সঙ্গেই দেখা হয় না।

এমন ছাড়া ছাড়া ছোট ছোট চিত্রনাট্যের মতো সংলাপ, নিতান্তই তথ্যমূলক, হবার পর ওরা যে যার গন্তব্যের দিকে হেঁটেছিল।

যখন তনিমার এতখানি নিশিন্তি শেতন মেনে নিতে পারছিল না। হয়ত ফাঁকা আকাশের তলে পড়ে ওর উদ্ভাসের রঙিন পাখনা দুটো ঝরে পড়েছিল। মেয়েটির প্রায় পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা হয় নি। মনে ছিল, তদ্দণি একটা সন্দেহের ছিল যে, যদি ওরা ভাবে মুসলমান পুরুষের ঔরসে একজন হিন্দু-নারীর গর্ভজাত সন্তান ঘরেই শেতন অতিরিক্ত কৌতূহল প্রকাশ করছে। হয়ত ঘৃণা পাবে। হয়ত ক্ষেপে উঠবে মনে মনে। তাই শেতন 'মেয়ের কী নাম রেখেছিস?' এই প্রশ্ন করতে পারে নি। কিন্তু কৌতূহল থাকাটা কি অন্যায়? যে কোনও পরীক্ষামূলক তত্ত্ব সম্পর্কেই তো মানুষের কৌতূহল থাকে। ওরা তো গাণিতাত্মকে গবেষণাগারে নিয়ে ফেলেছে। এত অভীক্ষার ফল যার কী হবে যে, ওদের উৎপাদিত সন্তান সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমস্যার বড় দায়িত্বী উদাহরণ।

তপতীকে একটু অবাক করে দেবে বলে আড়িতে এসে শেতন একটু উঁচায় নিয়েই ওকে বলল, আমরা আজ যখন-তনিমাকে দেখলাম। ওরা বিয়ে করেছে। ওদের কোলে একটা ফুটফুটে মেয়ে। বড় মিষ্টি।

তপতী এক ঝটকায় শেতনকে আড়িয়ে নিয়ে বলল, ছাড়ো তো, ভিক্টিরিন ফেরে আবার ফুটফুটে। চাকরি করে না চাকরি করেন না, ফিরে কথাবার্তা সব!

একটা বিরাট বাক্স ফেন শেতন। যেন মুখের ওপর 'দড়াম' করে বন্ধ করে দিল তপতী। এবং শুধু সেখানেই থেমে থাকল না সে। বলল, যেমন সব তোমার বন্ধু-বান্ধব—অভাব দারিদ্র চাকরি-না-পাওয়া খেয়ে-না-পাওয়া...ঘুর ঘুর। তাদের পেছনে বরীতলে। আমার সব খারি করে মাকতির ঘরমা খুলল, পাট করে ফেলে, সুটকেস কুটিয়ে ফিরিয়ে তাল ফলে।...

আরও কী সব যেন তপতী বলে যাচ্ছিল। প্রপাত ফোরের মতো। শেতন শোনেনি। সেও ঝড়াম করে মনকরের দরজা বন্ধ করে সাওয়ার খুলে স্নান করতে লাগল। ঐসব কথার চেয়ে সাওয়ার থেকে অবিরাম জল পড়ার শব্দকে তার এ মুহূর্তে

অনেক অস্বস্তি মনে হল। অনেক নীরস। ক্লেদমুক্ত।

সেদিন হাতে শোভন এক অদ্ভুত স্বাদ পেল। স্বপন তনিমা দু'জনেই এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেসের লাইনে দাঁড়িয়ে। বিশ্রিভাবে বেকার। কার্ড কিনিয়ে ভরতে ভেতে। তনিমার কোলে বছর দেড় বছরের মেয়ে। চার্জ ভরে বলা কয়েদের কোনার কাল-মানুষের রেজিস্ট্রেশন কার্ড। আর-মানুষের হয়ে জানউইচের সামনে দাঁড়িয়ে সে-ই চাকরি চাইছে কর্তৃপক্ষের কাছে:—বলাটা শোনার পরই অসহ্য প্রয়োজনের শোভনের ঘুম ভেঙে যায়। বিছানা ছেড়ে নিশব্দে সরজার বিল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে সে। এবং যান্ত্রিকভাবে কয়েকটা পাইচারি করতে থাকে।

* * * * *

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে হয়ত এক সময় মিলিত হতে হয়। সালের হতে হয়। জোড়াতিঁড়িবাজনের বৈজিক আবর্তনের ফেরে তার হয়ত একটা পূর্ব মিলিট হিসেব যায়। সূর্যবর্ষের কথনায় একক জীবনের ফেরে তা হয়ত প্রতিফিকেরের। তথাপি জটীল। কেননা, পূর্ব মিলিট নয়। আজিক নিয়ম তাই জীবনের ফেরে অচল। সেই কারণেই মেয়েদের জীবনের এমন মিলনক্ষণে মানুষের উদ্ভাস মাত্র ছড়িয়ে যায়। যেমনটা শোভনের হয়েছিল। এবং তনিমারও।

সূর্যের আলোয় তখন ছায়ার ঘাসটী মেলি। এক একটা ঘাস তার ছায়ার সীমানা ছড়িয়ে নিয়েছে। বাজারঘাটের স্টেশনে এমন সময়ের সঙ্গে অনেক। এর একটি গন্তব্যে মনমরানি করে ফোন করে নিয়েদের কাঁকনো ভরতাল। ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান দাঁড়ির বেঞ্চে এসে বসবে। মাজার ওপর পাছ আবার জন্যই এখানে ছায়ার চেয়ে বসে। বিকেলের নরম রোদে এমন এক তন্ময় ছায়ার হাটে শোভন একদিন তনিমাকে বসে থাকতে দেখল। সঙ্গে ওর বাচ্চা। দেখে মনে হয় বছর তিনেক হবে। তনিমার পরনে ময়লাটে কাপড়। মলিন মুখ।

অবাক। শোভন অবাক। এবং উদ্ভাস। শোভন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল।—কী রে তুই এখানে?

তনিমাও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল শোভনকে দেখে।—তোর সঙ্গে এখানে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেও ভাবি নি।

—এখানে কোথায়? আমাই তো আমার বাড়ি! স্বপন কেমন আছে।

—এখানেই একা আছি। ভালো। কালই। স্বপন ভাল আছে।

শোভন ঠিকানাটা জেনে নেয়। মনে মনে একটা আনন্দের ঝরা বয়ে যায়। কেননা, উত্তর কলকাতা থেকে এখানে বাড়ি করে আসার পর সে-ও তো ঘুরে যাচ্ছে। নির্বান্ধবে থাকে। যাজন ভাল করা উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি গলির অভিচাকেই তার বড় আপন মনে হয়। অপ্ত, পৈতৃক বাড়ি ছিল না ওটা। ভাড়া বাড়ি। তবেওও ঐ বাড়িটাই ছিল তার আপের বাড়ি। মেয়েরা যেমন বিয়ের পর আপের বাড়ি ছেড়ে, সৈশব স্মৃতিকে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা এক পরিবেশে 'শ্বশুরবাড়ি' নামক এক আচেনা খোলসে এসে পড়ে শোভনেরও এখানে এসে তাই-ই মনে হত। এই কারণে এসে যোগাযোগ নতুন করে আর কছু পাতানো হয় না। তবু 'মন্দির হবি' 'কেমন আছেন' 'ভাল আছি' জাতীয় ভদ্রতার উপচিয়েদের ফুরফুরে মতো একটা আপাত সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় হয়ত। সেই সম্পর্ক যেন কিছুতেই ঘরীয়তা ছুঁতে পারে না। তাই তনিমাকে বাড়ির এত কাছাকাছি দেখে আবার যেন ফুলিয়ারিটির স্মৃতিগুলো মস্তিষ্কের ভূমর থেকে ঠেলে উঠতে থাকে। তনিমা আগেই একা স্বপনও। ওদের সৈকতটা এই বিচ্ছেদেরা (কলকাতার ভিন্ন জায়গায় হলেও আসলে অনুভবের ক্ষুদ্রতায় তা বিচ্ছেদ হয়েই ধরা দিয়েছে) কালবৃষি হয়েকদে ভাসিল হয়ে উঠবে—এমন একটা আশায় শোভনের মনে যে খুশির হিল্লোল হয়ে চলেছিল মুখে-চোখে তার অবশ্যই একটা উজ্জ্বল অভিব্যক্তির ফাটছিল। মনে হচ্ছিল এখুনি বিয়ে স্বপনকে সংবাদটা দেয়।—কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল স্বপন তনিমা হয়ত এখনও বিচ্ছিন্নই আছে। কাছ করে জানাচিব ধরনা খেলে না। সুতরাং মুটের হয়ে গাঁপনী ভরে ফেটে যায় না। অবাক-সন্ধিক্ষ হয়ে দীর্ঘক্ষণ তনার হাত ধরে ওরা চলাফেরা করে।—এমন সম্পর্কের মানুষ যে তার ট্রীর ভাল লাগে না। সুতরাং এ-ধরণ অবশ্যই তার খুশির কারণ হবে না।—যাই, শোভন ঠিক করল বাড়ি গিয়ে নিজেদেরই আর একবার জানাবে—তনিমা-স্বপন ঘুরতে ঘুরতে তারাই কলকাতায় এসে গেছে।

এরই মধ্যে ট্রেন এসে যায়। নিয়মমাফিক ট্রেন। তনিমা তাড়াতাড়ি উঠবে। তাড়াহিড়ো ভাড়ায় বাঁ একটা ধরকারে। শোভন তনিমার মেয়ের গাল টিপে আদর করে। এক সাজানো আগেই জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাম কী?

আধো আধো গলায় ও বলে, বাড়িতে আমি 'মেমো' বলে ডাকে। ভাল নাম চন্দনা।

মোন ওর পরিচয়ের উষ্ণ আদান। হাত ওভাবেই ওকে নাম সম্পর্কে শেখানো হয়েছে। শোভনের এ-আদানে একটা কৌতূহল জাগেই গেল।

* * * * *

স্বপন কিছুদিন হল একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি পেয়েছে। একজন ফোনোটাইপের চার্জে। বিশ্রিং সলিউশনস ফার্ম। সাটাস দাঁড়িয়ে স্বপনকে অর্ডারের চলাফেরা করতে হয়। ফোনে সিমেন্ট বালির হিসেব রাখতে হয়। প্রিন্ট এবং সেলসম্যানের চালিত করতে হয়। এ কাজ যে স্বপন প্রথম থেকেই জানত, তা নয়। এ বি সি ডি থেকেই শিখতে হয়েছে ওকে। এছাড়া উপায়ই বা কী। কবিতা ফেরুয়ারি সাহিত্য এবং এম. এ-র পর পড়ে ফেলা বি.এড এবং বি. লিব ওকে এখনও পর্যন্ত চাকরি দেয় নি। এর মধ্যে ও তিন বছরের একটা গ্যাপ এল. বি কোর্স পড়তে শুরু করে দিয়েছে। অভের কলেজ। পাকাপাকি ভাবে করে না। শিক্ষক বেলা ওকে ষাটটাকা টাকা মাইনের চাকরিতে ঢোকাতেই হয়। সারাদিন সাইটে থেকে সিমেন্টের ওকে কোম্পানীর ভাষা কাজের হিসেবটা রাখতে হয়। এবং মাঝে সপ্তাহে দু'দিন সকালে একটা টিউশন করে। টিউশন তনিমারও করে। সেটা মুক্তেও। এম. এ-র পর বি এডটা করে নিয়েছে বলে নিশ্চয়তার চাকরির আশ্বাস। কিন্তু "কথা আশা কুহকিনী, তোমার মায়ায়..." কিংবা "আশার ছলনে তুমি কী কল লিখিলে হায়..." মাইকেল মধুসূদনের কবিতার এই পংক্তি দুটো ওদের সংসারে একদা ভাতাবিক উচ্চারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু, পিট নিবারণের "ইট শ্যাল গুজরজাম..."ওদের আশাকে জিইয়ে রেখেছে।

ভাড়াবাড়ির পাশে আধা-গ্রাম একটা অঞ্চলের একটি বাড়িতে ওরা ভাড়া এসেছে। একটি ছোট ঘর। পাকা। চালির ছাউনি দেওয়া সামের একটি রান্না ঘর একলোর শিরদাঁড়া যাবে বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক থাকেন। চালির চাল দেওয়া জোড়লার একটা গ্রেস মতো আছে। বাড়িওয়ালার কিছু ছেলে এখানে থেকে পড়াশোনা করে। অবশ্য করে কেউ কেউ। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক এই অঞ্চলে পরিচিত মানুষ। কমিউনিস্ট পার্টি করেন। পার্টির সর্বস্তরের কর্মী। ফলত তার পরিচয় দিয়ে এই অঞ্চলে স্বপনের ঘের ভূমতে শোভনের খুব একটা সময় লাগল না।

বাড়িটা গলি-আন্দাজিতে ভরা। বহির্ভাগে ভ্রাম্যমাণ অর্বাচীনের অর্বাচীন বাড়ি। যদি অভিপৌড়ে। বাড়ির সামনে একফালি জমি পেরিয়ে তবে ঘরে ঢুকতে হয়। ঘরে একটি মাত্র জানালা। সেটা খোলাই ছিল। প্রবিজনের সবাস। ফলত স্বপন বাড়িতে ছিল। বাইরে থেকে ঘরের জানালা দিয়েই দেখা যাচ্ছিল ওর উপস্থিতি। তাতে লখা খানি পরে একটা ভূমি নিয়মে বাড়িয়ে ও যেন ঘরের হাত ভেতে কী একটা পাড়ছিল। শোভনকে দেখতে পেয়েই একমুখ হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে উদ্ভাস আমুন জানাল।—হাত আয় শোভন। কেমন আছিস বল।

একটা নিম্ন বয়সা ঘিরে ক্যাকেজের মধ্য দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। তনিমা উঠনে হয়ে বসে সেঁতেছে রান্না করছিল। শোভনের আগমন টের পেয়ে সোতাটা একটু কমিয়ে দিয়ে পোছন ঘুরে তাকাল। মুকটি হাসল। বলল, আর।

ঘরে আসবার জন্যে একটা তক্তাপোষ। একটা কম দামি আসবাব। এর একটা ছোট পায়ের কাঠের ঘুন লেগেছে। ঘরের এক কোণে একটা মানুষ গুচনো অবস্থায় গাঁজ করানো রয়েছে। দেয়ালে টাঙানো একটা ছোট আয়নার পেছনে একটা বড় চিরুনি গোঁজা রয়েছে। ঘরের দেওয়ালে ভবিত্রবাবের ছবিওয়ালা একটি ক্যালেন্ডার টাঙানো রয়েছে। এছাড়া দেয়ালে টাঙানো যন্ত্রে পেলিল ছেড়ে করা স্বপনের ছেলে 'মোর এর একটি অবক্ষ পেন্সিল। ঘুর দেয়ালের তিনটি তারেই খাড়াভাবে কী সাজানো রয়েছে। জানালার ঠিক ওপরের তাকে পুরনো সব ম্যাগাজিন। অসমতল। সার দিয়ে মনুষ্যুমিকভাবে সাজানো রয়েছে।

তক্তাপোষের ওপর পাতা রয়েছে আড়ম্বরহীন বিছানা। সেই বিছানার ওপরে শোভনকে বসতে দিল ওরা। শোভন উচ্ছ্বসিত হয়ে একটু বেশিরেই বলল, মিত্র বিভিন্ন সংসার যেমন চলছে! একখার স্বপন মুখে আঙুল দিয়ে একটু নিচের মৃদু শব্দ করে বলল, চুপ্। এসব এখানে বলিস না!

শোভন অবাক হয়ে গেল। কী এমন কথা বলেছে সে? যার জন্য তাকে চুপ করে যেতে হবে। এমন সন্ধ্যাকল কি এখানে নিষিদ্ধ? কিন্তু কেন?—শোভন একই বিস্ময়ে এসব প্রশ্ন মনে মনে সাজিয়ে তুলল, কিন্তু তার জিজ্ঞাসাগুলো ফুটতে দিল না তবু একটা বিস্ময়ের পরদা যেন তার চোখে ঘুমে ফুলে উঠল।

স্বপন ফিসফাস স্বরে বলল, ওসব পরে বলব। আগে বল কী খাবি? চলি যে কয় শোভনের জন্য।

তনিমা সহাস্যে বলে, ওধুই স্বেচ্ছনের জন্য তোমার জন্ম নয় তো!

—তুমি আমার ভার্যা, আমি তোমার স্বামী। আমাকে চা না দিয়ে তুমি কি পারবে!

—অয়ি হি প্রিয়, ভার্যা বলো না। ভার্যা শব্দটির অর্থ তো তুমি জানো, তরুণীরা। অর্থাৎ যাকে ভরণ করতে হয়। ভৃত্যা এবং ভার্যা শব্দ দুটোর মূলগোত্রিগত অর্থ একই। আর 'স্বামী'—এটাতেও আমার আপত্তি। স্বামী অর্থে 'প্রভু'। মনিব। তুমি মোটেই আমার প্রভু নও। ভ্রাতার। উই আর দ্য সেম ওল্ড ব্রাদার। আমরা একই সৌকর্যের সহযোদ্ধী। জীবন যৌদ্ধের সাথী।

—আ, অপূর্ব! তুই বড্ডবাই ভালো ডাক্তার হবি। আর ভাষাতত্ত্বের প্রফেসরও চিরকাল করেছিল দেখছি। আমরা তো সব ভাঁকি মেরেছি।—শোভন বলে।

—ব্রাদার, এক কাপ চা হবে? স্বপন হেসে হেসে তনিমাকে বলে।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু, শোভন প্রথম এল। ওকে কিন্তু খাওয়াও। কিন্তু নিয়ে এস।

স্বপন গলে জামাটা গলিয়ে কিন্তু আনার উদ্যোগ করে। শোভন বাধা দেয়।—খাওয়াটাই কি বড় হল। তোমরা তোমের কথা বলো। একটু চা-ই খাব। আর কিন্তু নয়। স্বপন তাকে কোথাও যেতে হবে না। তোমের কাজকে দেখছি না। ও কোথায়?

—মোম কাজেই কোথাও আছে। হয়ত পাশের ঘরে। কবিতাদিদি অন্তরঙ্গিনা মোমকে খুব ভালবাসেন। স্বপন কাজে বেরিয়ে যায়। আমাকেও টিউশন করতে যেতে হয়। মোম ওনার কাছেই তখন থাকে।

তনিমা কথা বলতে বলতেই চা নিয়ে আসে। বলে, লিকার চা চলে তো?

—চলিনই তো। দুনিয়াদারির শেষ কর লিকার চা খেয়েছি। এখনও বিবি চলে। আমার মিসেসের অবশ্য ওটা খুব একটা পছন্দ ছিল না। তবুও, ওটা সর্বজনগ্রাহ্য চা। আমি সর্বজনগ্রাহ্যের দলে নেই।—কিন্তু এখন বিবি আনিয়ে নিয়েছে।

—কেমন আছে তপতী? তনিমা প্রশ্ন করে।

—এক প্রকার।—শোভন নির্লিপ্ত জবাব দেয়। এখন সে মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত।

—তোর মেয়ে! কবে হল? কই বলিসনি তো।

—বলার সময় পেলাম কোথায়। সেদিন টেলিফোনে বলার মতো অবকাশ ছিল না। এই তো বছর খানেক বয়স। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হয়েছে একটি মেয়ে।

—নাম কী রেখেছিস মেয়ের? স্বপন বলে।

—কার্বালী! ডাক নাম 'তুলি'।

—আ, অপূর্ব নাম। তুলি-ই তো রং করবে জীবনে। অনেক রং। নানা রং। উজ্জ্বল সব রঙের সমাহারেই তো জীবনের ক্যানভাস হয়ে উঠবে কার্বালী। তনিমা তোমার মেয়ের 'প্রাবণী' কিন্তু হেরে গেল 'কার্বালী'-র কাছে কাছে।

তনিমা বলে, এতে হার জিৎ-এর কী আছে। দুটোর নামের স্বাদই দু'রকমের। তাছাড়া প্রাবণী নামটা তোমারই পছন্দ। প্রাবণ মাসে মোম হয়েছিল বলে।

—হ্যাঁ। নামটা আমারই দেওয়া। প্রাবণ মাসে জন্ম বলে ওধু নয়। প্রাবণ মানেই বৃষ্টি। আমার খুব ভিজতে ভাল লাগে। আমি ওর আদরে ভিজব বলেই 'প্রাবণী' নাম রেখেছি। তাছাড়া, তুমি তো মেয়ের নাম আরবি ফারসি অনুসারী রাখতে বারণ করেছিলে। বলেছিলে, আমার মেয়ের নাম যেন তৎসম বা তদ্ভব শব্দের হয়। ঐশ্বিনী সাবিনা মেহেরুন্নিসা ইত্যাদি ধারার নাম তোমার পছন্দ নয়। আমারও পছন্দ নয়। তাই তোমার সূত্রে সূত্র মিলিয়েছি আমি।

তনিমা স্বপনকে ঝাঁঝিয়ে দিয়ে বলে, বাবু এসব প্রসঙ্গ থাক। অন্য প্রসঙ্গে কথা বলো।

স্বপন তনিমা আলাপচারিতার অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু, শোভন খেয়াল করতে থাকে যে, ওরা যেন ওদের জীবনের মূল প্রসঙ্গতলোই এড়িয়ে যেতে চাইছে। তনিমা স্বপনের কানে চুমুক দেয়। স্বপন স্বপনের কানে সুরুত চুমুক দেয়। কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে শোভনও চায়ের কাপে চুমুক দেয়। নিরুপায় অসহায়তা কাটিয়ে শোভন তনিমাকে বলে, বিয়ের পর পর অসিয়তটে হিটলিস।

—হ্যাঁ।

—চলে এলি কেন?

এ-প্রশ্নে তনিমা স্বপনের চোখে তাকায়। তারপর চকিতে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, পরে তনিস ওসব।

এরই মধ্যে একটি ছেলে 'স্বপনদা' 'স্বপনদা' করতে করতে ঘরে ঢুকে পড়ল। এবং সে বিনা দুর্বিনয়ে তনিমার জন্যতে লাগল। অচিরেই আমাদের ওপরের ছেলে ছাদে ছিপ্পি হবে। ছিপ্পি আর ইলিশ মাছ ভাজা। তোমাদের আজ আমাদের ওপরে নিমন্ত্রণ।

স্বপন ছেলেটার সঙ্গে শোভনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, শোভন। আমার বন্ধু। ওরে নিবি তো তোদের ওওরাক-দাওয়াত। ও আমার ফ্রেন্ড।

—স্বপনদা তোমার বন্ধু যখন তখন তো উনি আসবেনই। খালি আসবেন কিন্তু ওপরে।

শোভন একটু লজ্জা পেল। জোর করে তাকে নিমন্ত্রণ পাইয়ে দেওয়ার জন্য একটু অস্বস্তিতও হয়ে পড়ল। তবু ঘনিষ্ঠতা সহজিত হতে চেষ্টা করে বলল, না না। আমি কাজে আছি আজ, তবে আর একদিন আমার অন্য কাজ আছে।

ছেলেটি চলে গেল। শোভন বুঝল, ওদের সঙ্গেও স্বপন কেন মানিয়ে নিয়েছে। দু দুই কলকাতা স্বপনের চিরকালের স্বভাব। ওপরের মেয়ের ঐ ছাত্রটির ছেলেওগোর সঙ্গে স্বপন নিজের ব্যবধানটাকে অনেকটা কমিয়ে নিয়েছে। তনিমাও ঐ তরল কেন ভাল নিয়েছে মনে হচ্ছে। আর একটি লম্বা ঢ্যাঙা মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। হাত কোলে একটি বাচ্চা মেয়ে। মেয়েটি বলল, স্বপনদা তোমারে নেওয়ার নিয়ে গেলাম। ভাল করিয়ে দিয়েছি। ভাল করিও না আবার।—বলেই মেয়েটি চলে গেল। স্বপনের মুখে শুনলো, মেয়েটির নাম রাপালী। বাড়িওয়ালা হরিবাবুর মেয়ে। মাধ্যমিক দেবে এবার।

এবার বিশ নানা বর্ণের সমাবেশে স্বপন তনিমার দিন কাটছে। ঘরেতে অভাব রয়েছে। তবু মুখের হাসি স্বপনের মিলিয়ে আসেনি। তনিমা স্বভাবতই চাপা স্বভাবের, তবু এই বাড়িটার ছোট ছোট নিয়ে, নিজের ছোট্ট সংসার নিয়ে, মেয়ে নিয়ে এবং স্বপনকে নিয়ে ওকে কেন সুখীই মনে হয়। আটপৌরে শাড়িতে আটপৌরে ঘর-গেরস্থালিতে ওর তৃপ্তি খুঁজে নেওয়ার শর্তটা লক্ষ্যটা শোভনের কেন ভাল লাগল।

শোভন মোমের গাল টিপে একটু আদর করল। কোলে তুলে নিল। এবার বলল, বাবা মা-কে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়ি এসো, কেমন। ওখানে একটা ছোট্ট যেন আছে। তোমার থেকে ছোটো।

তনিমা মোমকে শেখাতে লাগল, মোম এটা তোমার একটা মামা।

স্বপন তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বলল, মোম এটা তোমার কাকু।

—মামা!

—কাকু!

—মামা!

—কাকু! কাকু! কাকু।

তনিমা হেসে ভেঙে পড়ল। যাক্ স্বপন শোভনকে নিজের ভাই করার ইচ্ছে তো, ঠিক আছে। তাহলে কিন্তু শোভনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আরও মধুর হয়ে গেল। এবার আমরা দুধুর ভাষে বাক্যালাপ করতে পারি। তুমি কিন্তু তাহত ভাল সেজো না।

—আমিও শোভনের বাড়ি গিয়ে তপতীর সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক গাতাবো। তুমিও সেদিকে চোখ দিও না।

এমন একটা অন্ত-মধুর ফুলস্টপে, হাসি-ঠাট্টায় রবিবারের সকালবেলাটা ওরা কাটিয়ে দিল।

* * * * *

স্নানপর্ব নৈবেদ্য থেকেই শুরু হয়ে গেল এতে শোভনের বাড়ি যাতায়াত। তপতীও পড়িয়াতে এসে তেমন 'সোসাইটি' মানুষ খুঁজে না পেয়ে অবকাশ 'ঝিকিরি' স্বপন তনিমাকেই ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করল। স্বপন তনিমা আসে। শোভন তপতী যায়। স্বপন তনিমাই বেশি আসে। তুলিও মোমঝিদিকে পেয়ে খুব খুশি। আসে আসে উভয়ের কাছে উভয়ের সম্পর্কের নানা খুটিনাটি দিক প্রকাশ পেতে থাকে।

শোশাল মাধ্যমের মাধ্যমে-এ স্বপন তনিমার বিয়ে রেজিস্ট্রি হওয়ার পরও যেন বিন্দুবিন্দু তারা নিজেদের বিয়ে গোপন রেখেছিল। শোভনের মতো অনেক বন্ধু-বান্ধবও যেমন তা টের পায়নি, তেমনই টের পায়নি স্বপন তনিমার বাড়ির লোকেরাও। স্বপন টের পেল তখন বিয়েটা ঘটে গেছে। স্বপনের কাছ থেকে তনিমা চিরদিন ওরে এসেছে, তাদের বাড়িতে তেমন পৌঁছা মূল্যবান কারুকার নেই। প্রত্যাহিক জীবনচর্যার যোরান হাসি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। নিয়ম করে নামাজ পড়ে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়লে ছাতের বেলা কাজা করে না। রমজান মাসে যার ইচ্ছে হয় রোজা করে। যার ইচ্ছে হয় করে না। নমাজ ছাড়া বাড়িতে আরবি ফারসির চল কিশের নেই। সবটাই মাতৃভাষার চলে। হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে আছে বলে ওদের পালা-পার্বণও মেনে চলে। স্বপন তনিমাকে নিয়ে বাড়িতে কোনও সমস্যা দেখা দেবে না। ছাদের কেউ পর্যবেক্ষণও নয়, তবে তনিমাকেও মোহনার অন্তরাল থেকে পৃথিবীর অনেক-ষাতাস মানুষ প্রত্যহিক পর্যবেক্ষণ করতে হবে না। যাক্ স্বপন মনে করেছিল তনিমা

ক্রিশ্চিয়ানিটি পার্টির মহিলা সমিতির সদস্যা হওয়ায় পৌত্তলিকতা নিয়ে তথা হিন্দু ধর্ম নিয়ে যে অমার্জনীয় উচ্ছ্বাস সে আসছিল দেখাবে না—তাতে অন্যের চোখে মেনে নেওয়া তাদের আড়ি বা সম্মানের পক্ষে আরও সহজ হবে।

তনিমার কিন্তু স্বপনদের বাড়ি গিয়ে খুব অস্বিস্তিতা হল।

স্বপন এর মধ্যে অনেক বদলে গেছে। অনু বলে। তনিমাও অবশ্যই 'অনু' বলতে লাগল। তিনি সত্যিই উদ্বাস্তুদের। আসার কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা কম। যেমন, তনিমার পিসিমা পরার শাড়ি পরেই তিনিই প্রথম আপত্তি তুললেন। স্বপনকে ডেকে বললেন, দাখ স্বপন, জানি তনিমা হিন্দুর মেয়ে, কিন্তু মুসলমানের আউলাদ তো বটে। তার কি সিঁদুর পরাটা শোভা পায়।

—অনু তুমি একদম বদলে! মনে নাও না ওটা একটা ফ্যাশনই। দ্যা, পাউডার, ঠোঁট পালিশ, নখ পালিশের মতন।

—তা বললে কী হয়। সিঁদুর-আলতা হিঁদুর ফ্যাশনই। আমাদের নয়।

স্বপন তখনও চাকরি করে না। সদ্য এম. এ পাশটা করে বি.এড পড়ছে। তবুও মেয়েদের থাকতে গেলে স্বামীর আয়টাও হওয়া চলবে না। তাছাড়া তার অনুর মনে কষ্ট দিতেও তার কষ্ট হয়। অনু অনেক কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছে এটা তো ঠিক। তাই সে তনিমাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলে, তনিমা সিঁদুরটা কি না পরলেই নয়। ক্রিশ্চিয়ানিদের তো সিঁদুর পরে না। শুতর মা-কে দেখো নি। হায়দর হোসেনের মহিলা সমিতির ঐ চন্দনাদি...ওরা কেউই তো সিঁদুর পরে না...

—কেন, তোমাদের বাড়িতে আপত্তি উঠেছে বুঝি।

—না মানে পাড়ার লোকের নানা কথা বলছে। তারা চায়...

স্বপনকে থামিয়ে দিয়ে তনিমা বলে উঠেছিল—তুমি কি চাও? সেটাই জানাই আমার পক্ষে জরুরি।

—আমি শাড়ি চাই তনিমা। সিঁদুর। সেন্টাল সিঁদুর।

—বেশ আমার সিঁদুর না পরাতে যদি শাড়ি বজায় থাকে তো আমি পরব

এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তনিমার বুকে একটা হাহাকার উঠেছিল। একটা 'অসেলফশপ্ত'র মৃত্যুর জন্য হাহাকার। কপালে গাঢ় লাল রঙের সিঁদুরের টিপ, সিঁথির সিঁদুর...এসব তার জীবন ভরে রাখত। তার মনে হত সিঁদুরের সঙ্গে বিবাহিতের সৌন্দর্যের একটা নন্দনতাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে। তাদেরই স্বামীর ওজাগুণ এর ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল—এমন সংস্কারকে সে কেন ইচ্ছে করেই বহুকালী তত্ত্ব দিয়ে তাড়াতে চায় নি। এটা নিছক ভাল-লাগা। একান্ত মেয়েলি ভাল লাগা। অবশ্য, স্বপনের সংসারে এ নিয়ে শাড়ি বিদ্রোহী টিহ্ন হিসেবে সে সিঁদুরকে 'হিঁদুর ফ্যাশনী'কে বিসর্জন দিতে এক মুহূর্ত দেরি করে নি।

সাইদা বিবি স্বপনের না। তনিমার শাশুড়ি। ধীর স্থির শান্ত মহিলা। ধর্মপ্রাণ। কোরআন হাদিস জানেন। তবে হবে এমন কোনও জ্ঞান তিনি জাহির করতে চান না। একেবারে 'অপ্রয়োজনে হাসিনা' না হলেও নেহাতই স্বল্পভাষী তিনি। স্বামীর কোনও কথায়। কোনও, পরক্ষণে মোহনপুরের সমস্ত পরনারীই যাতে ফোলা ফোলা তার জন্য তিনি যথা সম্ভব নিয়মনিষ্ঠ থাকতে চান। তার একটা গোপন দুঃখ এই যে, তার স্বামী এবং ছিলেবেলার পুত্র স্বপন বড় অধুনিক। কালক্রমেরা মোহনপুরা তাদের হিঁদু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করে একেবারেই ধর্ম মানে না। ইমান নেই।। নামাজ পড়ে না। রোজা করে না। হজ জাকাত-এ আগ্রহ নেই। এ যেমন ছেলে হল। এমন তো সে ছিল না। তবুও এ নিয়ে সে আর তেমন শোক করে না। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন, যেমনও হিঁদুর জন্য দোর হোরেন। হিঁদুই চিরস্থায়ী নয়। কেউ কাউকে ঠেকে রাখতে পারে না।

স্বপন একে ছেলে তার পুরুষ মানুষ। তার কোনওমি তবু সহ্য হয়। কিন্তু অন্যের আউলাদের কোনওমি যেন্দর্য হওয়াটা মেনে নেওয়া যায় না। যেন্দর্য অর্থে পর্দানশিনতা নয়। কেননা, তার কেউই ঘোমটা পরে না। যেন্দর্যর অর্থ এখানে এই যে, যখন তখন অন্যর থেকে পুরুষ মানুষের সামনে বেরিয়ে আসা। তার ছেলে বা স্বামীকে কেউ ডাকতে এলে, আপ বাড়িয়ে উত্তর করা—এসবই যেন্দর্য, কোনওমি।

স্বপনের মিনি চিচিমা খাতুন তার মা সাইদা বিবিকে তখন প্রথম সমুপদেশটি দিত।—মা, এটা ঘোমাদের ভুলে যাচ্ছ কেন তনিমা ডাক্তারের পড়া মেয়ে। স্বপনেরই সঙ্গে পড়াশিনা করত। এইরু যেন্দর্য হওয়াটা একজন শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে তেমন ঘোমোর নয়।

সাইদা বিবি ধীরস্বরে, অন্তত স্বপনের ভুলটা ভাঙিয়ের ভুলে মেয়েকে ঘোমোর।— তখন তো আউলাদ ছিল না। এখন আউলাদ। মুসলমানের আউলাদ।

সাইদা বিবি আড়াল থেকে তনিমাকে স্বপনের সঙ্গে কথা কইতে দেখেছে।—কেন স্বপন জোরাজবরদস্তি করিয়ে চেষ্টা করছে না। কেন প্রায়ই বি.এড-এর ক্লাস কামাই করে। কেন কবিতাটাও আর ঠিকমতো লিখছে না। কেন কোনও এক নিভৃত প্রহরে তনিমাকে আর সে কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় না...এসব নিয়ে কথা। সাইদা বিবি জেনে যে, এ তার ছেলের মঙ্গলের জন্যই তনিমা বলে থাকে। তবু পুরুষ মানুষের মুখে মুখে ওকে কথা করলে তনাহের ভয় থাকে। "আওলাদে হাসিনা" হওয়া যায় না। আর কেন যা না চায় যে তার ছেলের আউলাদ ছেলেকে ফোলতে করবে এবং "আওলাদে হাসিনা" হয়ে উঠবে। তাহলেই একটু আধটু কোরানি ফোল মেয়েরকম অবশ্যই মাফ করে দেবেন।

তবে বাড়িটাতে একটা অদ্ভুত শিক্ষা ছিল। কারোর মনের অন্তরালে উঁকিঝুঁকি প্রকাশ পেত না। একটা অন্তরঙ্গতাহীন সংসারের আনাচে আনাচে ঘরে বেড়াত। ক্রমে ক্রমে তনিমার মোটেটিকেই ভীষণ অস্বাভাবিক মনে হতে লাগল। একটা অন্তত মো যদি অনু অনু বৃষ্টি দেয় তবে আকাশটা অনেক হালকা লাগে। আর তা যদি না হ তাহলে অস্বস্তিকর ওমোট ঝরতে থাকে। তনিমা এমনটা বুঝতে পেরে স্বপনকে বলেছিল, এই অভিযোগে কেউই আমাকে মেনে নিতে পারছে না।

—কেন?

—সেটা তো আমারও প্রশ্ন। তবে আমার মনে হয় আমি সেভাবে তোমা 'কেমন' হয়ে উঠতে পারছি না বলে।

—সে আপ অপ্রে মোর আমার। তাদের কী?

—আউলাদের ওরা অভিভাবক ভাবে। সম্পত্তি। মোগের সামগ্রী। অবশ্যই সামগ্রী হলেও আমি এই সংসারের অভ্যাগত। সম্পত্তি। কেন মেয়েদের যদি শরীরে মেয়েদের তো এমনই সম্মান দেওয়া হয়েছে।

তনিমার এবারও স্বপন বিরক্ত হয়। বলে, আ থামো।

স্বপন জানেই বুঝতে পারছিল এখানে তার বেশিদিন থাকা হবে না। কেন কতকগুলো মৌলিক তত্ত্ব সে তার বাড়ির মানুষদের অনেকক্ষেত্রেই মেনে নি পারছিল না। কিন্তু, মোক্ষা মোটে। তাদের চাকরিবাকরি নেই। টিউশন করে কোনওক্র নিজেদের হাত-খরচাটা চালিয়ে নিতে পারছে। এখন চট্ করে আলাদা হয়ে গে কলকাতায় গিয়ে বাসা ভাড়া করে থাকলে খরচ অনেক অনেক গুণ বেড়ে যা কী ভাবে চালাবে সেই খরচ! তাছাড়া গিয়ে স্বপনের নাগরি জিন্দিগি করবে। এই খেরি বাড়িটার আইত্তের নিচের এলকেটসের একটা অপরিসর ঘরে সে একরক নিঃশ্বাসকাটে নিজের সংসার পেতেছে। সে, তনিমা আর ছোট্ট মোম। টিউশন ক জমাবার হাতে সে সামান্যই দিতে পারে। নিজের পড়ার খরচ আছে। ডাক্তারার খ আছে। অসুখের ছেলে এবং স্ত্রীর একান্ত অভিমত কিছু খরচ আছে যার জন্য মোটা অঙ্কের অনুরোধ করছে হাত পাতে যায় না। অবশ্য, ধীরে, খুব ধীরে, রাগা নাগর তনিমার ও একটা মুসলিমত্ব জাগিয়ে তোলার যে চেষ্টা চলছে তা স্বপন বিলক্ষণ বুঝতে পারত অবশ্য তনিমার মধ্যে হিঁদুত্বের কোনও আত্মিক প্রকাশ নেই। বিয়ের পর ঘরে লক্ষী আসন সে পাততে যায়নি। শুক্রবারে সন্তোষী মা, সন্তানের কল্যাণার্থে ঔঁদ বষ্ঠী বষ্ঠী ব্রতের ব্রত করা, স্বামীর মঙ্গল কামনায় শিবরাত্রির উপবাস...ইত্যাদি আলাদা তনিমার নেই। ওকে তো মেনে নেওয়া বলে সবই ছিল। অবশ্য কেন যে তা না তা স্বপন কেন বুঝতে পারে। এবং তার মনে হয় এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্প নেই। আত্মীয় বৌ-এর সঙ্গে শাশুড়ি ননদীর যে চিরকালীন দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক—তা ই এক্ষেত্রে কাজ করছে। একটা স্বপনকে টিকিয়ে রাখতে গেলে যে কোনও একটা পক্ষ নেয়ে নিতে হয়। তনিমার অসহিষ্ণুতার মধ্যে এবং স্বপনের মা, পিসি এমনকি কা মধ্যে হয়ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে স্বপন এমনই এক কাজ-চালা গোছ পথ খুঁ পেয়েছিল। যে পথে এই ধরনের দ্বন্দ্বকে টিকিয়ে রাখা সহজ হয়।

এই দ্বন্দ্ব আরও চরমে উঠেছিল স্বপনের বিবির ছিলের পর। পাড়ার এ অভদ্রসাধারণের ছেলের সঙ্গে পিসি বিজিতা খাতুনের বিয়ে হয়েছিল। ছেলেটির না একটা মাঝারোর জ্ঞান আছে। তবুও তার আয় বড় অনিয়মিত। বিজিতা খা অতঃপরিচিতে দু-এক মাস অন্তর কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বাপের বাড়ি এ থাকতে শুরু করল। তার স্বামী পরিস্থিতিটা অবশ্য এই বাড়িতে থাকতে না। মাঝে মা আসত। পরিস্থিতিটাকে তনিমা মেনেনিতেও পছন্দ করত না। বিয়ের আগে থেকেই বি না। বিয়ের আগে থেকেই বিজিতা মনে হালির করত, সে একটু আধটু আসত। স্বপনে শুধু মা সবকিছুই বুঝতে পারছিলেন ওদের পরিস্থিতিটা কেন দিকে যেতে চাইছে

তখন একদিন দুপুরে জামুকে ফেরে দিয়ে দিতে তনিমা চলেছিল, আমার কিন্তু ফেলেটাকে ভাল লাগে না।

ফগনের আর আজী মনিরুজ্জামান তাদ দিয়ে মাথা ভাতের গরাসটা মুখে তুলতে দিয়ে, একটু ফেসে তনিমার দিকে তাকিয়েছিল। তনিমার চোখও ফগনমঞ্জরীর সঙ্গে মিলে যাওয়াতে তনিমা চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। ফগনের মিচের তিনটী ভাইকে নিয়ে ফগনও ফেরে বসেছিল বাবুর পাশে। ফগন খানিকটা অভিমানেই বলে উঠেছিল, মিছেটা তুমি করছ না।

আবু তাঁর দ্বির শান্ত স্বভাবের। ফগনকে আদর দিয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন, আমা তনিমাকে বলবে যে না। কেন তোমার তাল লাগে না মা।

—আপনার কী তাল লাগে।

—আমার কথা আলা। তোমার কথা বল।

—না, মিনির তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। কী-ই বা এমন ফেলপড়ুয়া। মেয়েরা লেখাপড়াটাও তেমন জানে না। মিনি তো অন্তত গ্রাজুয়েট হবেছে।

জাজী মনিরুজ্জামান মাথা নাড়ে। বাঁ-হাত দিয়ে দাড়িতে একটু হাত বুলিয়ে নেন। তারপর বলেন, মা তুমি কিছু মনোবে বল নি।

ফগন ঘরে ফেকে পরে তনিমাকে মৃদু শাসন করেছে।—তোমার কী দরকার ছিল এসি দপর্কে কথা বলার। মিনি তোমার কথা ভাববে। এসির ফেলে পড়বে। এসিকেই বিয়ে করবে। মিনিমা আদুলকে ফেলো নি তুমি। ফেবি। এক গুঁয়ে।

—আহা একটা মেয়ের খারাপ হবে যাচ্ছে দেখে আমি চুপ করে বুঁজো কঙ্কাল হবে বসে থাকবো।

—হাঁ, তাই থাকবে। কথাটা মিনির কানে গেলে মিনি তোমার শত্রু হবে উঠবে।

ফগন একেবারে প্রযুদ্ধক ফলপনা করে নি। কথাটা অবশ্যই মিনির কানে উঠেছিল। মিনি তখন বাড়িতে ছিল না। কিন্তু সইলা মিনি আরে কাছেই ছিল। তনিমার ধারণা তিনিই মেয়েকে কথাটা লাগিয়েছেন।

মিনিমা আদুল একদিন তনিমাকে ওনিয়ে ওনিয়ে পাশের ঘরে সইলা মিনিকে বলেছিল, আমি তো কেয়ারে বিয়ে করছি না ফগনের মতো। হিন্দুর গলায় মালা দিয়ে ছাড়ি না।

ফতের বোনার বাড়ি ফিরলে পর তনিমা ফগনকে মিছাটি বলে নি। বলবে হয়ত ফগন প্রতিবাদ করত। ফলে অপপ্রতিতে আরও ফজটিল হত।

তবিৎ মিনিমা শনিমাদিনের বিয়ের পর অপপ্রতিটা টেকিয়ে রাখা যায় নি। মিপেবর প্রায় ফগন আপের বাড়িতে এসেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল, তখন। শনিবারদিন রাতে রাতে আসত গৌরমুরি পুরি পরে। সাদা হাইনেক ফলাসের পাঞ্জাবি। কানরে ভাবল এমব্রয়ডারি করা থাকত। মুখে পান চিবোতে চিবোতে। ডিভানটাকে দোলা করে। টেবিলের ওপরে পানের ডিবা খেকিয়ে রাখবার মুহূর্তে সুরু করে। তবে সেটা মুখের ভেতরে ঢেলে নিয়ে শনিবারদিন হাসত। একেবারে চিলিমিলি মাকুল ফেলেদের মতো। বজ্জাত আছলটি। তনিমাকে দেখলেই হাসছে পান ভরা দাঁত বের করে সবত, ছাপো কেমন আছেন।

তনিমার মেজাই পাকল হত না তার সম্ভাবণে। প্রতিবে মেত। ফলত, এমনটা তো হবারই জাভাবিক। সবাই তো আর ফগনের মতো তরিবিলি হতে পারে না। সংসারের প্রতি ফোপন ফেত্রে মুক্ত আলোর ফেরিত্র পড়তে পারে না। ফলপর্শ একটার পর একটা কবিতা আবৃত্তি করতে পারে না। হয়ত হাসিনের মতো মেয়ের এটাই চায়। পুরবের পুরুষকারকে উজ্জ্বলে ছায়ার হওয়ার মধ্যেই হয়ত মিনিমা আদুলেরা ফগপতে ঈশ্বরের পরীক্ষা সূত্রের খুঁজ ফেবে। কালরাতটালার সব মিছুই হয়ত তাদের কাছে এর। আজ। সবিাই তো সে আশা আজাতে যায় কোন বজ্জাতে? কিন্তু, তনিমাকে তো ফলা আলাতেই হয়ে।—একদিন আজাদার ফেলা করতে করতে পড়ে গিয়ে মেয়ের ঠাঁট ভড়ে গেল। রক্ত ফেতে লাগল। প্রেম কাঁদতে কাঁদতে তার মাকে কাকতে লাগল, মা বল। মা রক্ত। রক্ত ফেতেছে।

শনিবারদিন কাছেই ছিল। সে মেয়েকে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, আই 'রাড' বলে। 'খুন' বল। হিন্দুরা 'রক্ত' 'রাড' বলে।

কথাটা তনিমার কানে গিয়েছিল। এর আগে মেয়েকে 'পানি' বলতে শেখাতে ফেরেছিল সইলা মিনি। তনিমা আবা দিয়েছিল। মেয়ে 'জল' বলতেই এমন দিয়েছে। খুন খেলে সে জলই চায়। পানি চায় না। অথচ আশ্চর্যের কথা যে, এই ফজিতে ফেউই জামাকে পানি কাকে না। ফগন আজক হয় আজাজাতি তাদের বাড়ির পরিবেশ কালো ফোত ফেবে। অথচ, সংসারের নির্মম রাজনীতিটা বাজতে পারে। যা ফেকে তনিমার হাত বজ্জাল আজাদ হবে যাচ্ছে এই সংসারের আনাচে-কানাচেও উহা গৌরবর্ণ দরীসৃপের মতো দৃষ্টিয়ে আছে। সুযোগ পেলেই তারা বেরিয়ে আসে। ফলা তোলে। ছোবল মারে। ফগন এবে শঙ্কিত হয়। কিন্তু প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্ভাবহারের জন্যে তাদের পরিবারের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টিনা আছে এই গ্রামে। তবু দুর্নিবারিটার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই যে হিন্দুর সংখ্যা বেশি তা নয়। মনিরুজ্জামান কলেজে পড়ার সময় ইলোরা, রতন, সৌমেন, বিজয়, অশোকরা এরা তো ছিলই। তারও আগে স্কুল লাইফেও তার মুসলিম বন্ধুর পাশাপাশি অনেক হিন্দু বন্ধুও ছিল। তারা অনেকেই এই বাড়িতে এসেছে। এই মা, এই বাবু, এমনকি এই বিবিই তাদের আপ্যায়ন করেছে। তারাও বাড়িতেও সে খেয়ে। নানা পার্বণে। পুজোতে। উৎসবে। অবশ্য ফগন মুসলমান বা হিন্দু কেন্দ্র কোন সাথে বন্ধুত্ব পাতায় নি। ফালাদেরকে তার হিন্দু বা মুসলমান। তবে এটা ফগন ঈশ্বার করে যে, বাবজীন মুসলমানদের মেয়েকে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়, মেয়েদের জন্যাধিকারেরই শিকার ঈশ্বার এগিয়ে থাকা অনেক হিন্দু ঘরের মেয়েমেয়েরাই তার মেটি বন্ধু-জন্যবের সিংহভাগ দখল করে রেখেছে। এই সত্যকে অস্বীকার করে সাত নেই। তবে মুসলিম ঘরে জন্ম বলে তার কোনও ফিনমন্যতা নেই। কিন্তু কিন্তু উদ্ধ সে জানে। লিখতে হবেছে। হোস্টেলের প্রতিযোগিতার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক সময়ে এক ওজাবজির আছে ফাঁতলার মনজিদে গিয়ে আজানটাও একটু আধটু দিবেছে। মেজাজের বেশ কিছু সুরা যাজাত তার এখনও মুখস্থ। হাজিসটাও পড়ে দেখেছে। কিন্তু কিন্তু অযাত এখনও তার মনে আছে। কিন্তু ফলাই লেখাপড়ার সাথে সাথে কৃতের সমাজের সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে জাজনীতির সঙ্গে মানব-বন্ধন ঘটে যাওয়ায় ধর্মের প্রতি আগ্রহ ছাত্রির মেসেজ্জ সে। কি হিন্দু, কি মুসলিম, কি বৌদ্ধ, কি ফ্রিস্টান কোনও জন্যেই আর আগ্রহ নেই। এদিক দিয়ে তনিমার সঙ্গে তার একটা মানসিক মিল আছেই। কিন্তু এদের তনিমাকেও তার বাড়িতে এনে যে হাঁৎ পরিবেশে ওঠা ধর্মীয় খোঁচাখুচির সামনে পড়তে হল তা নিয়ে ফগন মধ্যেই চিন্তত ফেব করছে মনে মনে। এবং তাকতে শুরু করেছে তনিমাকে নিয়ে মেলবকে নিয়ে কলকাতাতেই নিজে আলা ভাড়া করে থাকবে। কিন্তু ফোজায় পাওয়া যাবে সস্তায় একটা ঘর। যেখানে সে ঋড় বাচ্চাকে নিয়ে একটু তন্ত্রভাবে জীবনযাপন করতে পারবে।—এসব ভাবতে ভাবতে একদিন মেসেজ মুখে পাশে এ চাত্রের মেবানে যাঁপের চোটাই এর বেকিয়ে বসে ফগন ফেয়েছিল চং ধূলোর সিনারার দিকে। কাঁচের সজাল। কোন উড়েছে। বু-মার্কেট বজ্জ উড়াউড়ি করছিল সেখানে। সাদা সটফটে বক। আর তাদের কলমতে নানাভাবে বিরক্ত করে চলেছিল হিন্দু চিল আ রাকে আর্দার কালো পাখি। শেষমেশ বকগুলো উড়ে চলে গেল বিল ছেড়ে। চল ছেড়ে। অনেক ঘুরে। সব ঘুরে। চিল মাঁসিনারে।

হঠাৎ পিছে একটা হাত পড়তেই ফগন সাধিৎ ফিরে পায়। তপনদা। কলেজে তার কয়েক বছরের সিনিয়র। কমিউনিস্ট পার্টির ছোলা পর্যায়ের রাজনীতির সঙ্গে এখন যুক্ত। ফাজনৈতিক হিসেবে ফগনকে যেমন স্নেহ করে, তেমনই বন্ধুত্বপূর্ণ একটা দোস্তদোস্তা সম্পর্ক ও আছে ফগনের সঙ্গে। ফগন একটু পিছু পানায় গেলে আপারটা খুলে বলে। সাথে সাথে তপনদা কলকাতায় পড়ান এই ছাত্র-নেতার কথা ফগনকে বলে। এবং তাকে চিঠি লিখে যেতে যে ছাত্রনেতা তাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করেছে। সে আসলে একটা অজুহাত করে মেবেই—সত্যকারিত্ব এই মিথ্যেটা তাদাদা ফটাল ধরবে।

ফগন একটা আশার ফুলে ওঠে। কলকাতার ওপর আছে, পানার আছে, ফেভেল আছে—ফাজিনিসের একটা অভাব হয়ে যাবেই। নয়ত চিঠিপানি করছে চুকিয়ে। পাশাপাশি চাকরির চেষ্টা। পারলে তনিমাকেও ফোট ফুই টিউশন করতে বলবে সবোর সময়ে। ফোট সংসার হবে। ফোট আয়োজন। কিন্তু মাথার ওপর আকাশটা থাকবে অনেক বড়। আর তাদের দুটি মন সেই উদার আকাশটার সাথে মানানসাই হয়ে উঠবে। সেখে অফাকের কোনও দর্শির সীমারেখা থাকবে না। সবাই আসবে। সবাই যাবে। ফগন খুশি। ইজে মতো। মেয়েটাও ফেড়ে উঠবে সেই মুক্ত আকাশের দিকের হাওয়ার তাদে তাদে।—এমন এমন সব স্বপ্ন সকতে সেদিন বাড়ি ফিরেছিল।

বাড়ি ফিরেই একটা তুমুল অশান্তি সে টের পেল। মিনি, পাপি, মা সকলেই তনিমাকে তর্ৎসনা করছে। ফগনের শুধু একটা কথাই কানে এসেছিল। "এখানে এসব চলবে না"। শনিবারদিনের গলা।

এত বড় স্পর্ধা শনিবারদিনের। সে এ বাড়ির জামাই। ফেলে নয়। আর জানে সে কাকে, "এখানে এসব চলবে না" সে আজী বাড়ির বড় ফেলের বউ। যাইহোক, বড় ফেলে এখনও ফিলা আছে। এই তুমির তুমিপুত্র সে। একমাত্র তার বাপ কাজী মনিরুজ্জামান আজি তাকে যা তার ফাঁকে এই বাড়ি ছাড়া করতে পারে। আলা করতে পারে। ফগন বাড়ি তুকতেই সব চুপচাপ হয়ে গেল। পাপি একদিনেই ফগনকে একটু

সন্দীহ করে। কেননা, স্বপন সম্পর্কে হেড় হলেও পড়াশিখা জানা ছেলে। জনপদি তার অনেক। অনেক কিতাব পড়ে। তার মুসলমান। তাকে অবজ্ঞা করার কোনও জায়গাই নেই।—স্বপন গভীর হয়ে ভাড়ি মুখে সোজা নিজের ঘরে চলে যায়। দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তনিমা স্বপনের কুকের ওপর মাথাটা নিয়ে কাঁদতে থাকে। মা-কে কাঁদতে দেখে বছরের কলজা ফেটে যেতে চাইছে। কোনও কথা বলছে না। মা-র কাঁচল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্বপন তনিমার মাথায় হাত দিয়ে অনেক স্নেহভরে তনিমা আস্তে আস্তে থামিয়ে স্বপনকে যা বলা তার সার কথা হল—দিদি রিজিয়া খাতুন মোমকে ডেকে একটু পড়তে বসেছিল। তনিমার এতে আপত্তি করার কিছুই ছিল না। কেননা, ইসলামী প্রেম বাড়িতে তার মায়ের কাছে মুখে মুখে যা যা ই ই শিখছিল। সাথে সাথে মা-র অক্ষরগুলি আসছে তেড়ে। মা-র আসটি আমি খুব পেত্নে। ই-তে ইঁদুর ছানা তাতে মরে। উ-তে উপরে পাখি পড়ছে ধরে...ইত্যাদি অক্ষরগুলি মুখস্থও শিখছিল। দিদি মোমকে ডেকে দেখেছিল অনেক জবর যা। যে জবর বা, তে জবর তা। ইত্যাদি। মোম কিছুতেই তা বলতে চাইছে না। মোম জানে, আমি এসব জানি না। আমি যা যা জানি। মা-র অক্ষরগুলি জানি। দিদি তবু তাকে জোর করে বলাচ্ছিল, এসব তোকে জানতেই হবে। বল আলেফকে জবর আ। বে জবর বা। তে জবর তা। মোম ছুটে চলে এসেছিল মায়ের কাছে। তনিমা খুব শান্ত মৃদুস্বরে দিদিকে এসে বলেছিল, আমার মেয়েকে ওসব না শেখালেও চলবে।

ছাত্র তনিমার এ-কথায় দিদি রিজিয়া খাতুন শর্মিষ্ঠাকিন এবং না সহেলা ছিবি একযোগে তনিমাকে ওসেনা করে গেছে।—বলেছে, প্রেম কাজী আড়ির মেয়ে। মুসলমানের মেয়ে। মোম এই সড়ির মতো করেই বড় হয়ে উঠবে। লেখাপড়া যদি শিখতেই হয় তাকে আরবি সাবলি শিখতে হবে। উর্দু শিখতে হবে। পারলপক্ষে ভালো ইংরেজি যা খুশি শিখতে পারে।

দেরা ঘটনাটা বলার পর তনিমা যাবার দাঁড়িয়ে কেঁদে উঠেছিল, আমি আর এক মুহূর্তে এ আড়িতে থাকতে চাই না।

স্বপন সেদিনই তনিমা আর মোমকে নিয়ে তপনদার চিঠি সহ কলকাতায় হরিদাসপুর স্থানে রেখে এসেছিল। তপনদার কথা মুখে বলেছিল। এবং কর্মরতাবস্থায় পরিবারে হরিদাসপুর আড়ির একতলায় এই একটা রোগী ঘরে ঠাঁই মিলেছিল। লম্বা ডান সত্ত্বে চাকরের উপরে একটা ঘর তনিমাকে দিয়েছিল ঠিক কিন্তু একটা শর্তে মুখে দিয়েছিল।—সাবধান। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে তুমি মুসলমান। আমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, পাড়ার লোক, কেউ না। শুধু আমি জানলাম, তুমি কাজী তনিমুর রহমান। আর সবাই জানবে। তুমি 'স্বপন'। স্বপন মজুমদার। পাক্কা হিন্দু।

* * * * *

তা হয়েছে ভালই। বিয়ের পর সাধারণত বউরা স্বামীর পদবী গ্রহণ করে। আর স্বামীরাও স্ত্রীর পদবীটাই তার হৃদয়কে অকপট গ্রহণ করতে বলে। স্বপন এতে বেশ কৌতুক বোধ করে। কৌতুক থেকে আবার কখনও কখনও বিস্ময়তা। একটা ফ্রাস্ট্রেশন। আইডেনটিটি ক্রাইসিস। মর্মে আসল ব্যক্তি নয় সে। তবু হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় ভাড়া বাড়িতে সবচেয়ে স্বপন ছাড়া ছাড়া টের পায়। শেষমেশ সব ছেলেমেয়ে পরে ঘুমোয় কেন স্বপন প্রথম দিন ওর বাড়িতে তার কথা 'ঝিলা দিদির সংসার কেমন চলছে' কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে চুপ করতে বলেছিল।

বাড়িতে এমনিতে হৈ হৈ, হৈ হৈ। ওপরের ফ্লোরের কলজ, প্রিন্স, রাণী, আশেক নিচে হরিদাসপুর মেয়ে রূপালী, ছেলে শিবলু তার এদিকে স্বপন তনিমা...সবকোই খুব আন্তরিকতায় আছে বাড়িটাতে। বাড়িওয়ালা হরিদাসপুরে স্বপন 'কাকু' বলে। ওদের স্ত্রীকে 'কাকিমা'। স্বপনের অতরূপে আলাপচারিতায় এমনকি আড্ডাদিতে জীবনযাপনের কাহিনি তার ছেলেমেয়ে এবং ওপরের ফ্লোরের ছেলেমেয়ে কারও জেরবার কোনও সন্দেহ নেই যে স্বপন আসলে মুসলমান। কিন্তু তার কলেজ ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের খাতায়, চাকরির বয়ানে স্বপন ছাড়া কিছু তার আসল নাম, সৈয়দ নাজ বাসী আনিসুর রহমান। যদিও 'স্বপন' নামটাও নৈমিত্তিক। একার নিজের। আসল কাজী আনিসুর রহমান নামটাও তার। একার তার। এই নাম দুটোর সঙ্গে তার ব্যক্তিসত্তার প্রানের বাড়িতে পাড়ার যো কোনও বিরোধ ছিল না। অন্তত সে লক্ষ্য করেছে হরিদাসপুরে পড়ার সময় থেকে 'স্বপন' নামটা তাকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করছে। কারণ ঐতিহ্যগতভাবে সেই একই। তখনও এবং তার পরবর্তীতেই আজাদি হিন্দুদের নামগুলো হয়ে থাকে। অন্তত 'আনিসুর রহমান' নামটা আরবি থেকে। যা তাকে আজীবনভাবেই মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করে। 'কাজী' পদবীটাও এসেছে বৃত্তি থেকে। পেশাগতভাবে বিয়ের খবরার সঙ্গে যুক্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে 'কাজী' বলা হয়ে। বৃত্তি থেকে সরে এসেও তাদের বাক্যবন্ধে এখনও তাদের নামের আগে 'কাজী' ব্যবহার করে নিজেদের অভিজাত মুসলমান হিসেবে সমাজে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে।—এই বাড়তি স্বপনই একদিন শৈশবের কথা করেছিল। স্বভাবতই শৈশবের মনে প্রশ্ন এসেছিল স্বপনও কি নিজেকে মনে মনে অভিজাত মুসলমান ভাবে। কেননা স্বপন এও বলেছিল, কাজী শেষ সৈয়দ এরা কর্মোদ্ধরিত মুসলমান নয়। অনেক পরবর্তী জমানার মেহ না পরবী জমানার এরা কর্মোদ্ধরিতা মেটে তারা শেষপরতাবী, ঐতিহ্যিক মুসলমান। একদা এদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যজমানের অতিষ্ঠে হয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এরা ছিল যজমানেরীয় হিন্দু। ঘর ফেরা।—স্বপনের কথার মধ্যে অন্তর্ধান যেন একটা আত্মপ্রতিফলন ছলে উঠতে দেখেছে শৈশবন। আবাদবীন পরী হিন্দু মেটিত কলয়ে নিজের পরিচয় গোপন রাখার ছলনাটা তাকে যেন তার আত্মপ্রতিফলন ছিটিয়ে রাখতে সহায়তা করেছিল।

শৈশবকে একদিন একথায় পেয়ে বসেই ফেলল স্বপন, এভাবে পরিচয় গোপন করে কেঁচে থাকতে তার ভালো লাগছে না শৈশবন। দিনের পর দিন এটা অসহ্য হয়ে উঠছে সহ্যের বড় কথা মোম তার মায়ের কিন্তুতে না। বুঝতে না। এখনও ওর মন বোধ হয়েছে। একটু বাড়ি হলে পড়তে পারে। আমার ঘরের ওপর লেখা আনিসুর রহমান নাম দেখে ও আমাকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা তোমার ঘরে এটা কা নাম লেখা? তখন নিজের নামকে অস্বীকার করতে আমার মহা-এ করে। মনে হয়েছি। আমার নাম। মোম তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, তাহলে তোমা নাম তো স্বপন। স্বপন মজুমদি।—আমি তখন হাঁ করেও যথার্থ মাড় নাড়ি। তারপ একটু ভেবে ছলছল চোখে শৈশবনের হাত দুটো ধরে স্বপন বলে ওঠে, বুবা ক তোমার আড়ির ওপরে একটা ঘর দেব। পরিচয়ের আসল নাম কাম আনিয়ে দিবি

> মাহরে তিনি মেলি আজব ঔলন।
> দেড়িল হাক পড়ন্ত চৌদ্দীন।।
> স্বপন মাহরে হরিলা ছেরী।

শৈশবন, আমার মনেই আমার পরিচয় করছে।

শৈশবন জানে চর্যাপদের আদি কবি লুইপাদের এই পংক্তির অর্থ। হরি চতুর্দিকে ছাবরেষ্টিত। তবে নিজের মাঝেই সে নিজের পরে। স্বপন চর্যাপদের পংক্তিটি উল্লেখ করে এটাই বোঝাতে চাইল যে, হরিল যেমন তার সুবাদু মাঝে জন্য তাদের নিকার হয় তেমনি স্বপনও তার পিতৃপ্রদত্ত নামের জন্যই পরিচিতি নিকার হচ্ছে।

শৈশবনের মনে হয় স্বপনের এই দুঃখবোধ আরোপজনিত কারণে উচিত হচ্ছে যুক্তিবোধ প্রকাশে কথাই আসছে। কেননা, স্বপনের আর নাম কী হতে পারত।—এসব আলোচনা, পর্যালোচনা। তাতে কি সমস্যা মিটত? তনিমা মজুমদিকে বিয়ে করে তার যে হো হিন্দুত্ব ফেলে নেয়নি সে। যদিও উচ্চবর্ণহিন্দু হিন্দুদের চর্চা তনিমার নেই। তবু তাকে তো 'বেমানা' বা 'বিধি' করে তোলে নি সে। নিজের বাড়িতেও নয়। এখানে নয়। তবে একটি বাস্তবতা মুখোমুখি অন্তর্মুখরতা বর্মীয় অবস্থান আছে কোনও সময়েই তা আলোচনায় হবে না। মায়ের অবর্তি অথবা তখনও যে খেঁকাই তো আমাদের দেখেই তো স্বপনের এই সমাজ অন্তর্ধারণা থেকে উচিত ছিল।

আমার সমাজ-অন্তর্ধারণা এও যে, স্বপন তার 'স্বপন' নামটির জন্যই আমার পক্ষীর হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় ভাড়াবার জায়গা পেয়েছে। আমরি খেঁকা মুসলমানদের থাকলে তাকে কমিউনিস্ট পর্যন্ত করা হবিবাবু পর্যন্ত তার বাড়িতে ভাড়াতে দিতে চাইত করত। সন্দেহ হয় না:

এদিক থেকে তনিমার মানসিক ভাড়তা যে আরও অনেক বেশি। স্বপন নামে। কেননা, তনিমা একবারেই স্বপনকে তার মুসলমান স্বামী বলে আলিঙ্গনাইয়ে প্রথমের বাড়িতে পরিচিত করিয়েছিল। এবং স্বভাবটিতে বিয়েরও এবং একত্রে হয়েছিল তনিমাদের পেতা পরিচয়কে।

বিয়ের খবরটা শুট গিয়েছিল গোরা আলিয়াইতেই।—অপু তনিমার ফ্রাস্ট ম বিয়ে করেছে এক মোসলমানকে। তনিমার বাড়িতে এই হাঙ্গামাটা খুব সহজে না হলেও মেনে নিয়েছিল। এই মেনে নেওয়াতে যার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তনিমার বাবা। মধ্যবিত্ত স্যালি। তনিমার বাবার বিশেষ বন্ধু। তনিমা ছোট থেকে বাবা তাদের বাড়িতে (অবশ্যই বাইর বাড়িতে) আসতে দেখেছে। বাবার সঙ্গে গ্রামাক্ত দেখেছে। তবে বাবুর ঔরসে এবং মায়ের কাপ ভিন্ন আলাদা করে তাদের ওপর যে থাকত। তখন তনিমার চাঁদুমা বেঁচে ছিল। গুরুতর মহাগি। পৌত্রা হিন্দু। চাঁদুর তনিমা হিন্দু হিন্দু ওরিয়া আমার কথা বলতে দেখেছে অনেকও কলেজ তনিমা

সঙ্গে। তনিমার পূর্বপুরুষেরা অর্থবান মানুষ ওড়িশা ছেড়ে মেদিনীপুরের বালিঘাইতে এসে আস্তানা করেছে। ওড়িয়া ছেড়ে বাংলার জন্যে নিজেদেরকে বদলে নিতে তাদের খুব একটা অসুবিধা হয় নি। কেননা, হিন্দু ধর্মের সনাতন সংস্কৃতিটা তো এক। অবিশ্যি ভাষাগত ভিন্নতাটা ঐ অতিক্রান্তা দিয়ে পূরিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু তাই বলে এ-অঞ্চলের ছেলে মেয়ে অন্য বিধর্মী এক পুরুষকে বিয়ে করবে। তাও আবার মুসলমান। তা নিয়ে তো আপত্তি উঠেছিল। উঠেওছিল। তনিমার মা এ নিয়ে অনেক কান্নাকাটি করেছেন। পিসিরা হতাশ হয়েছে তাদের ছেলেদের বর সম্পর্কে। তাদের সঙ্গে উচ্চ মেল মজিম মেল সম্পর্ক তাদের মানিয়ে নেবে কী ভাবে? সমাধান দিয়েছিল ঐ কানু। মাইমুনিল আলি। তনিমার মা সুবলমেঘকে বুঝিয়েছিল, আমি কি খুব খারাপ ছেলে। বল না কই। তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার কি রক্ত মিলমিশ ছিল। কই আমাদের বাড়ির সামনে, পেছনাকে তো তোমরা দূর দূর ছাই ছাই করে নি। তোমাদের অনু, বিনু, তনুরাও তো তোমাদের বাড়ি খেয়ে। আমরা আদর দিয়েছি তাদের। তারা আমাদের ঘরেরই তো ভাত খায়নি তাদের। তবে অনুর স্বামী...কি যেন নাম ছেলেটির হাঁ 'রতন'...যা ছেলে নয় তো...হিন্দু হিন্দু গন্ধ...হাঁ যে কথা বলছিলাম, অনুর রতনও তোমাদের কাছে হঠাৎ অচ্ছুৎ হতে যাবে কোন দুঃখে।

মাইমুনিল আলি তনিমার মাকে বুঝিয়েছিল যে, তোমার সঙ্গে মাইমুনিল ভাইয়ের যেমনটা হয়েছে তাদের কেউই ভাল চোখে দেখত না। আড়ে ঠারে নানা কথা বলত। এখন তিনি গত হয়েছেন। অনুর রতনেরও আর বেঁচে নেই। তাই হিন্দু মুসলমানের দুরত্বটাও আর অতটা নেই এই মহাদ্বি বাড়িতে।

তনিমাকেও বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে বিদেশের তার মামুরা মাজ ওওয়ার পর থেকে অনুকে আর আসতে কাপে না যেতে দেয় নি। তার ওপোরে আর আলাদা রাখে নি। পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। এই মিলিয়ে দেওয়া কাপড়টা বাদ বেঁচে থাকলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। মামুরমার জন্য তখন তা হয়নি।

অনুর বিয়েতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঝড় বেয়েছিল গ্রামের পঞ্চায়েত। যদ্ধ এই পঞ্চায়েতে ছিল কমিউনিস্টদের প্রভাবিত। আসলে ভেতরের ডাকটিকিট ছিল—পাড়ার এক উঠতি কমরেড অনুকে ভালবেসে ফেলেছিল। তার জন্য পঞ্চায়েতে প্রধান। তারও ইচ্ছে ছিল মহিলা সমিতির অনুর সঙ্গে তার প্রেমের বিয়ে হোক। কিন্তু তা হয়নি। কেননা অনুর ঐ ছেলেটিকে ভাল লাগত না। একটা আন্তর্জাতিক মতাদর্শের কোনও ছেলেকে বিয়ে করতেই হবে—এমন কোনও ওপরা তনিমার ছিল না। অন্তত, চটির দর যাবে। শিকার ধরা যাবে। এসব স্বপনের মতো যা আছে তা ঐ হিন্দু ছেলেটির মধ্যে আদৌ ছিল না। ঐ ছেলেটার প্রধান প্রত্যাখ্যান হচ্ছে ফলকাতার স্ত্রীতাহাতি একটি মুসলিম ছেলেকে বেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে গ্রামে ফেরার পর স্বভাবতই পঞ্চায়েতে প্রধান বিনোদবন্ধু ব্যাপারটা ভালভাবে নেন নি। বিষয়টিকে গ্রামের ছেলের একটা সাম্প্রদায়িক মাত্রা দিতে চেয়েছিলেন। এবং ঘটনাটি এইভাবে হয়েছিল—অনু গ্রামের হিন্দু ছেলেকে প্রত্যাখ্যান করে একটি মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করেছে। এটা ফেলে হিন্দুজাতির অপমান!

কত বড় সাংঘাতিক এই সাম্প্রদায়িক বিষ। আর গ্রামের বেশিরভাগ হিন্দু মানুষ যে কত সহজে এই বিষে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল তা তনিমা দেখেছে। নিজের চোখে দেখেছে। গ্রামের মানুষ খোলা মহাত্মি পরিবারটিকে একঘরে করে দিয়েছিল। পঞ্চায়েতের কর্তাদের মধ্যে এই ঘটনা সম্পর্কে মহাত্মি পরিবারটিই বাঁধা করল। তারা বলল, এই ঘটনায় গ্রামের বাপদার হিন্দু সম্প্রদায়গুলির মনে আঘাত লেগেছে। এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। পঞ্চায়েতে বলল। তার পড়ল অনুর। অনু সেখানে ঘৃণাভরিনভাবে পরিষ্কার বলল, আমি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ক্রিশ্চান কাউকেই বিয়ে করিনি। করেছি একজন বিশ্বিত প্রতিভাবান পুরুষমানুষকে। ঘটনাচক্রে সে মুসলমান। আবার বিয়ে আইনসিদ্ধ। তাছাড়া, আমাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় নি। আমার পদবী পর্যন্ত আমি বদল করিনি। এই ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক মাত্রা দেওয়ার যে অধম চেষ্টার চালাচ্ছে আমি সে বিষয়ে পার্টির উচ্চতম নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট করব। এবং জানতে চাইব আমার অপরাধটা কোথায়।

ঠিক ঠিক শক্ত স্বভাবের তনিমা যেন সেদিন অন্য মূর্তি ধরেছিল। জীবনে সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ কেন এরকমই প্রতিরোধের ক্ষমতা পেয়ে যায়। যা একান্তভাবেই তার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে। তনিমার শ্বশুর হিন্দু আধিপত্য সরকারের কথা শুনে বিদেশের উচ্চতম নেতৃত্বের কাছে রিপোর্টের অরজি শুনে বিনোদবন্ধু এবং তার অনুগত সহকর্মীদের চুপসে দিয়েছিল। কেননা, তাদের মনে হয়েছিল অনু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়ে। তার পক্ষে কলকাতার পার্টির উচ্চতম নেতৃত্বকে বিরোধী জানানো মোটেই অসম্ভব নয়। এবং ব্যাপারটা যে তাদের পক্ষে যাবে না—এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই তারা অতদূর ভেবে ভয় দিয়েছিল।

কিন্তু গ্রামের পুকুরঘাটে, চায়ের দোকানে, হাটে, মাঠে সর্বত্র আলোচনা ছড়িয়ে গিয়েছিল—'অনু মোছলমান বিয়ে করেছে' 'হিঃ ছিঃ ঘেন্না ঘেন্না' 'লোকপক্ষা শিখে এই!'—ইত্যাদি নানা বিষোদ্গার। পঞ্চায়েত দিয়ে হয়ে গেলেও যে বিষ তারা ছড়িয়ে দিয়েছিল তাদা মানুষগুলোর মনে তনিমাদের গোটা গ্রাম একঘরে করে রাখার প্রথা দিয়ে তার প্রতিফলন ঘটাচ্ছিল। ওঞ্চবঞ্চিত কমিউনিস্ট বিনোদবাবু-সহ তার সাকরেদরা এই সাফল্যে মনে মনে তাদেরকেই জয়ী মনে করেছিল।

এই অবস্থাকে নিজের অনুকূলে টেনে আনতে পেরেছিল স্বপন। স্বপনের কথায়—যখন তনিমাদের গ্রামে প্রথম গোলাম তখন তো লজ্জাই যে করে আমাকে দিলতো। একে জামাই তার 'মোছলমান'। সে না জানি কী এক জীব! 'হালুম' করে, না খেঁতোয়, নাকি লাফিয়ে ঘাঁড়ে! কী খায় সে! খুব পেঁয়াজ রসুন খায় (কেননা হুলমানদের খুব পেঁয়াজ রসুন খায় বলে হিন্দুদের মধ্যে ধারণা আছে)। গরু খায়!—এসব আকাশ পাতাল নানা জিজ্ঞাসা গ্রামের মুখচোখে ঘুরে ফিরত। যাওয়া-দুঃখ-ধনিতা নির্বিশেষে। ছেলেরাও একেবারে ঘরের কাছে আসত না। পাছে ভাত খায়। কিন্তু আমি এমন সব গল্প দিয়ে ছেলেদের মাতিয়ে দিলাম, বড়দের সঙ্গে সহজ গ্রাম্য সম্পর্ক পাতিয়ে এমনভাবে আপন করে নিলাম যে তনিমার কাকু মাইমুনিল আলি পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল। সে বলেই ফেলল একদিন, তুমি তো কামাল করলে ভাই। অসম্ভবকে সম্ভব করলে।

স্বপন এই ঘরামাটীর পল্লীতে এসেও ইতিমধ্যে বাড়িতে তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প দিয়ে সকলকে আপন করে নিতে পারছিল ক্রমশ। তনিমা অনেকটা নিশ্চিন্ত এখানে এসে। অনেকটা মাইনে। ফিরোজের দিকে চাকুরিবাকরি এসে বুটা টিউশন করে। মমতা অন্যদের খুজন হাজীকে পড়ায়। তখন স্কুল রাণাদীঘির ঘরে ঘরে। কাকিমা মোমতে ভালবাসেন যথেষ্ট। স্বপন একটা সিলিং ফ্যান্টাকচারের কারখানায় কাজ করে। তার জায়গায় আরেকজন বাড়ি আনায়। ভাল কথায়। স্বপন দেখল নিশ্চিন্তে বেরোনো যাবে সাইকেল নিয়ে ঘুরে ঘুরে। ক'পয়সাই বা দেয়। ঘরে তাই বাঁধা আসবে। তনিমাকে মোমতে একটা ভাল খেতে পরতে দিতে পারে না বলে স্বপন আফসোস করে। তনি এবং পাশাপাশি সরি সাইটে এসে সি এ টি মাহিনার একটা নরম্যর করে স্বপন দু'পয়সা উপরি রোজগারের চেষ্টা করে। কখনও কখনও সিমেন্টের দু'এক বস্তা বেশি হিসেব দেখিয়েও মালিকের থেকে দু'পয়সা কামিয়ে নেয়। তনিমা এসব সবই জানে। এসব তার একদা সয়ে গেছে। কেননা শিকার-টিকার সে তপতীর থেকে পিছিয়ে না থাকলেও জীবনযাত্রার মানে অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। শেতন তাকে নিজের বাড়ি দিয়েছে। যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। পিছি সুখে রেখেছে। কেননা, শেতন তুলিরাজিটিতে পড়ার সময় থেকেই চাকরি করে। সবে একবিন্দু দু'পয়সা কমাই তো স্বাভাবিক। তনিমা যেন তপতীর সংস্পর্শে এসে এইসব টিনমাত্রায় নিজের মনে মনে পড়ে তোলে। তাই স্বপনের একটু আধটু অসৎ পথে পয়সা রোজগারকে সে নীতির বড়শতানি দিয়ে বন্ধ করতে চায় না। মোমতার একটা ইচ্ছিরাৎ আছে। তাদের একটি স্বাচ্ছন্দ্যের পর আছে।

তপতী তনিমাকে বাড়িতে নিভৃতে পেয়ে বলে, হাঁরে মোমের নাম হিন্দু ঠিক করিনি? ভাল নাম তো প্রাবণী। কিন্তু পদবী?

—হাজী প্রাবণী! তনিমা মৃদুভাবে উত্তর দেয় তপতীকে।

—ও ঠিক করে ফেলেছিস। বা বেশ ভালই হয়েছে। কেননা, ওর যে ফলে ওঠি হওয়ার বাঁশ হয়ে এল।

—অভিনিয়ালি ঠিক করে ফেলিনি এখনও। তবে ওর জন্যে এমনই ইচ্ছে। আমাদের জন্য মেয়েদের ভবিষ্যৎ যে কী হবে, জানি না। বলে তনিমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এর উত্তর তপতীর কাছেও জানা নেই। তবে কুজন এই প্রসঙ্গ তুলে সে তনিমাকে খানিকটা মুখচোরের অতলে পৌঁছে দিয়েছে। তাই খানিকটা হালকা করিতে চাইল তপতী—বল তোর স্বপনের কথা বল।

—আমি আর কী বলব। তুই কারু পেরতনের কথা বল।

—তুই-ই তো বলবি রে। তোর মতো আমার তো মুহূর্ত কথা বার নয়। নতুন কথা বলবি আর কী বলব।

তনিমা এ-কথায় লাজুক হাসি হাসে। তারপর ছোট করে তপতীকে একটা চিমটি কেটে ফেলার আগের একটু পুরনো খেলিতে বলে, আহা, মুহূর্তের মধ্য আলাদা নাকি, একই।

তপতী একটু ওকালতির এসে ঠোঁট উল্টে বলে, কী করে বুঝব তাই আমার জন্ম তো পাইনি।

এরপর দু'জনেই সম্বিৎ ফিরে পায়। নিজেদেরকে অনেকটা হালকা মনে হয়। দু'জনেই।

* * * * *

স্বপন পর পর রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। বৃ বৃ ঝলিয়ারি ঝিঝিতে সে একের পর এক মেয়েশরীরের ঘরজোড়া মাপ খুঁড়ে যাচ্ছে। মেয়েশরীর সব সাইজই তার জন্য বড়। আইডিয়ার তবু ঝলিয়ারি ঝিঝিতে তার শরীরটা ভাসা ভাসা হয়ে যাচ্ছে। চুকার ঝিঝি তাকিয়ে আসছে। তবু মেয়েশরীর ঘরজোড়া ফুরাচ্ছে না। এত দুঃখ ঘরের মধ্যে তার মা সাইজ ঝিঝি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। এবার তাকে তার ঝাঁটসহ ফেলে যাওয়ার দিন। তার পৃথিবীটা দুটি স্তন থেকে আজোর দাবায় দুধ এসে পড়তে লাগল স্বপনের মুখে,—ঘুম ভেঙে গেল স্বপনের। দেখল ডক্টরপেশের পাশের জানালাটা খোলা থাকায় বৃষ্টি এসে তার মুখে সারা শরীরে পড়ছিল। স্বপন উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তারপর আবিষ্টের মতো বৃষ্টি থেকে পুনর্বার মুখটা ঘিরিয়ে আনতে চেষ্টা করার পরপরপরি সে রাখতে লাগল, এ ধরনের স্বপ্ন সে দেখল কেন? তবে কি নিজের ধর্ম না মানার জন্য কারণে হিসেবে তার কোনও পাপবোধ আছে? মনের গভীরে কোথা? রক্তকণিকার ক্ষুদ্র বিন্দুর মাঝে?

সেদিন সকাল থেকেই বাড়ির জন্য বড় মন খারাপ হতে লাগল স্বপনের। মা-র কথা ঝিমেরে তার চোখে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনুর অসহায় মেয়ো চোখ দুটির কথা তার সেই মুহূর্তে বড় মনে পড়তে লাগল। দীর্ঘ মেয়ের জন্য মনটা কীরম কারেন্টার হয়ে উঠল। মেয়ে বড় হয়ে গেল সে এই অজপাড়াগাঁ পল্লীর বাড়িতে এসেছে। ঝিমেরকে ছেড়ে, রক্তের সম্পর্কের মানুষদের ছেড়ে দু'দুটা বছর বড় কম নয়। অনেকটা দীর্ঘ। মাঝখানে, তাও মাস দুয়েক আগে একটা পোস্টকার্ড পেয়েছিল সে। তপনদার থেকে খবর পেয়ে ঠিকানা জেনেছিল বোধহয়। লিখেছিল, কীরম অভিমান ভরে লিখেছিল—আমরা আর ক'দিন বাঁচব। যা হবার তো হয়েই গেছে। এখন সব অভিমান ভুলে তোমরা সবাই ফিরে এস। মাসখানেক হল আমি অবসর নিয়েছি। এখন শেষ জীবনটা তোমাদের সবাইকে নিয়ে কাটাতে চাই। মোমের কথা খুব জীবন মনে পড়ছে। তনিমা তুমি মোম সম্বন্ধে কুপণে খেয়ো। আল্লাহ্ তোমাদের ভাল ন করুন। ইতি—তোমার অবু কাকী মনিরুজ্জামান।

চিঠিটা সরজমি তনিমার হাতে পড়েছিল বলে রক্ষা। নইলে এ-বাড়িতে সেদিন জানাজানি হয়ে যেত যে স্বপন মুসলমান। পোস্টকার্ডটা এক ঝলক দেখে তনিমা সেটা স্বপনকে দিয়ে দিয়েছিল। চিঠিটা পড়ে স্বপনের সেই মুহূর্তেই কারুর জন্য মন কেমন করেছিল। তবু খানিকটা মোটামায় পড়ে সে তনিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কি ঘুরিয়েই যাব? তুমি কী বল।

তনিমা স্বপনের মুখের দিকে একবার শুধু তাকিয়েছিল। মুখ দিয়ে কিছু বলে নি। তার মুখের ভাষা স্বপন সে মুহূর্তে বুঝতে পারেনি। চর্যাপদের কবিদের 'সন্ধ্যা ভাষা'-র চেয়েও সে ভাষা জটিল ছিল। তবে স্বপন এটা বুঝতে পেরেছিল বিয়ারটিকে সন্ধ্যার যমেনা-ঝাঁধারির মতো আদিম মায়াবী রেখে তনিমা সরজমি তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক পুনরাস্থাপনের ব্যাপারে কোনও বাধা দিতে চায়নি। স্বপন এতে আরও অসহায় বোধ করেছিল। কিন্তু আজ এই অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনের পর সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল যে, সে বসিরহাট যাবে। এবং এ-ব্যাপারে তনিমার সঙ্গে পরামর্শ করাকে সে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে করল।

স্বপনের অন্তর্বাসহীন পল্লির আসাতে যুনিভার্সিটির অনেক বন্ধু-বান্ধবই আসত। শুভ, মুকুল, বিবেক, দিলীপ, হাফেজ, অনন্তর, সেবু...অনেকেই আসত। শেভন তো ফেরেই। স্বপন মানেই একটা জমাটি আড্ডার উৎস। স্বপন মানেই একটা জমাটি আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু। ঘরে ফিরে পরিধি স্নাত হয়। আবর্তিত হয়। ছড়িয়ে পড়ে। এই বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই স্বপন-তনিমার বাড়িতে খেতে যায়। সুকন হয়ে তেতুলদহতার ন'জন টাঁই পেয়ে যায়। স্বপন বা তনিমা কেউ কখনও বলে না যে, 'টাঁই নেই টাঁই নেই ছোট এ তরী'। ছোট তক্তপোশে আড়াআড়িভাবে কেউ কেউ শোয়। আবার কেউ কেউ ঘরের ভক্তাপোশ জল নিয়ে একখানি মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে পিঁপি ঘুম মারে। তনিমার দাম্পত্য তখন হাঁড়িশিকে জনতার ভিড়ে হারিয়ে যায়। এতে অবশ্য তনিমার কোনও দুঃখ হয় না। কেননা, জীবনের ছবি ছবির অনিশ্চয়তার দুঃখ যে এতে অনিশ্চয়ের জন্য হলেও টাকা পড়ে যায়। ফলে এই হাঁড়িশেলা থেকে এক ধরনের দূরত্ব তনিমা আহরণ করে নেয়। স্বপনও। সমস্যা হয় একতলা অনুঘরে খেতে দেওয়া নিয়ে। যুনিভার্সিটির আবহাওয়া। আগুন। নিজেদেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার আবার শঙ্কর। স্বপনের বেশ নেই শঙ্করের জন্যে। কিন্তু এই শঙ্করদের থেকেই তো অনেক নতুন পৃথিবীর এই খোলার চালা আমলা আতরসে ভরিয়ে দিতে চায়। ফুল ফোটাতে চায়। আকর্ষিক অর্থেই ফুল ফোটাতে চায়। জানালার ঠিক নিচে ঝলিয়ারি ঝিঝিতে ঝিঝিরে ঝিঝিরে কথা দিয়ে পুঁতিয়ে ঘুমন্ত ঘরে গত বর্ষার সময়েই তনিমা একটা মাধবীলতা পুঁতেছিল। তার বড় ভাল লাগে মাধবীলতা। নাজুকতম মাটির ঢেলা দিয়ে জানালার ওপর দিয়ে ঘরের আইডের অংশে লতাটিকে লটিয়ে দিয়েছে সে। এবার মাথে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। একদিন জানালার কাছটা সূর্যের ঘুমের তলে উঠবে এই আশায় সে তখন গাছটার জল বিশিষ্ট এবং অপরপর পরিচর্যা করেছিল। শুভর কথাটা কানে গেল তার। যে, সে চাকরি পেয়েছে। ফুলে। আলো শিক্ষকের চাকরি। তনিমা হাসিমুখে উৎফুল্ল হয়ে ওকে অভিনন্দন জানাতে এসে চা খেতে বলল, মিষ্টি কই?

শুভ ঝিঁড়িয়ে একটা সুসংবাদ দিয়ে বলল, হবে হবে। এই তো সবে জয়েন করেছি। এখনও প্রথম মাইনে পাইনি।

যদিও শুভর মাইনে খেতে সাধে না। তবু মা দু'জনেই ফুলে শিক্ষকতা করেন। নিজেদের বাড়ি আছে সদরঘাটে। একটা অংশে ভাড়া আছে। তার আয় হয়। যুনিভার্সিটির সময় থেকেই ফেলে পেয়ে পরের চাকে একটা অফারটি পরসা আসে। যা দিয়ে ও মফস্সল বলতে পারে। তনিমা-স্বপনের কাছে এসেও ও এটা ওটা ফরমাশ করে। চলে এর কৌটা মাকে দিয়ে এসে তনিমাকে বলে, ছাড়া করা। সকলে মিলে খায়। স্বপন মাখা চুলোয় যায়। কী জবরদস্ত দিন পর যোগ এসব করত। তনিমাও বলে একইভাবে। কিন্তু তাদের সংসারে যে অতিথি মাসে আসে না। মোমটা আসার খুব মোটা ফোর তারা। অথবা সে সবকিছুর নিয়ে আসে। সর্বনিষ্ঠেই। নতুবা দু'পাঁচ দিন এখানে কাটিয়ে যাবার সময় সোপ কাপ স্বপনের হাতে তুলে দিয়ে যেত। তাকে দিয়ে যেত। স্বপন অবাক দিতে চাইত না। পর হাসে, মোমা চাকরি পেয়ে সে হাস, তারপর না হয় শোধ করে দিস।—আর অবশ্যি চাকরি কি আর ইচ্ছেমতন হবে যায়?—স্বপন দুইাত ভরে পেয়েছে জীবন। তাই কথাগুলো চাকরির খবর শুনলে সে যায় আজকাল যেমন খুশি হতে পারে না। বুকের ভেতরটা ভার হয়ে থাকে। কেন কারোকে ফুলে শিক্ষকের পদে ইন্টারভিউতে ডিকেছে সে। হবলি। স্কুল কমিটি টাকা চায়। অনেক টাকা। আমি চাকরি, এত নাখ। সরজমি চায় না। চাকেও আছে। চাকরান আলোর কথাটা ব্যানার্জিডাক্তারের কানে পৌঁছে যায়। এই টাকা নিয়ে কী ভাবে ওরা? আগে ঝাঁটেকোনো করে নিজেদের মাথা? মুখে বলে, স্কুল ম্যানেজের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে। চেকটো ছাত্রদের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা হবে। সেক্রেটারির সুকের ঘরে ঢুকে স্কুল ফান্ড! হাঃ হাঃ কলাম। মাঝাই টাকাটা নিয়ে কী করে ওরা। স্বপন ভেবে পায় না। তবে শিক্ষা কমিটি নিজের নিয়ন্ত্রণে যে একটা প্রচণ্ড শ্রেণীর চক্রান্তের চালাচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারে

অন্ধ শুভর চাকরিটা হয়ে যেত। বাহাদুরপুরে মাদ্রাসাতেই যাই থাকে। ইন্টারভিউ এবং চাকরি। মাঝে টাকা পয়সার কোনও অর্থাদ্যুত নেই। চক্কাবক্কা নেই। নির্বঞ্ঝা নির্ঝিবোধ এক চাকরি। পাঁচজনে অবশ্য বলত, শুভর আর কী। বাপা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শিক্ষা নেতা। পরপর মফস্সলাবাদে ছেলের চাকরি আটকায় কে। কিন্তু স্বপন যতদূর জানে, শুভ বহরমপুরের বাড়িতে গিয়ে মেজোর পরপর মফস্সলাবাদে মাধবীটা একটু ঘন, গাঢ়তে গড়া নিজের ছেলের চাকরির জন্য আদৌ সে মাথা ঘোরাতে রাজি নয় পার্টির আছে। কিন্তু স্বপনের মনে হয়, বৃদ্ধকর্তার ছেলের পার্টি চাকলে যেমন মুখমন্ত্রী পুলিশকে ডেকে ব্যাপারটা না জানলেও এক ধরনের ক্লাসিক্স ঘরোয়িভাব আমলাতান্ত্রিকে অনুগত পুলিশ কেমিস্ট্রারের তৎপর হয়ে ওঠে গাড়িটি খুঁজে বেরার ব্যাপারে, তেমনি হয় শুভর মতো পরপর মফস্সলের নিজের ছেলের চাকরির ব্যাপারে কিছু না বলতেও সার্থি স্কুল কমিটির শিক্ষক নেতারা মুর্শিদাবাদ জেলার শুভ্রবক্সার্মি শিক্ষক নেতার ছেলে চাকরির ব্যাপারে তদ্বির করে তৎকালীনভাবে পরপর মফস্সলাবাদের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে চেয়েছিল।—তোকেই হবে হয়েছে, শুভর চাকরি। কিন্তু তার জীবন হবে। তার জন্য তো শিক্ষক নেতা নয়। সরস্বতি অফিসের সামান্য এক কর্মচারী ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। জীবনকুড়ের এক অজ্ঞাত অনানা ডানাভাঙা সৈনিক।—স্বপনের হঠাৎ মনে পড়ে যায় অনিচ্ছাতে তাদের গ্রামে ছিলের বাবে তার বন্ধুর এক লক্ষের জমি কেনা ছিল। সেই জমি বিক্রি করে কি টাকা ঘোগাড় করা সম্ভব। কি ছিলের গায়ের এই আয়ে জমির দাম কতই বা হবে। স্কুল কমিটির চাহিদা মেটাতে পারে কি ঐ এক টুকরো জমি। কিন্তু ঐ জমি তো তাকে বাবু একা ছেড়ে দেবে না। আর শরিক আছে। তিন ভাই, বিধি।—স্বপনের এই ব্যাপারে কথা বলার পরেও যে জমিটুকু আওয়া মনে করল। অত তাড়াহুড়ি সম্ভব।

* * * * *

যুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় স্বপন শেভনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবেরা আসা

জীবনের যে পরিবর্তন যে সুখ পাবে উন্মেষিত হয়েছিল পরবর্তীকালে অনেকের ক্ষেত্রেই তা পাওনি পেয়ে। উপরে গেছে। যেমন দেবু। মিতালির সঙ্গে তার প্রেম বৈবাহিক পরিণতির দিকে এগোয় নি। ওদের চলার পথে মধ্যবর্তিনী হিসেবে ঢুকে পড়েছিল মিতিনি বলে একটি মেয়ে। সেই জন্যে অনেকেই দেবুর কিরেতে যায় নি। কেননা মিতালি ছিল হাসেরও বন্ধু। মিতালিহীন দেবুকে তারা বর হিসেবে দেখতে চায় নি। কিন্তু একটা তো স্বাভিশপ্ত ব্যাপার। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। অনেকেই কিছু করার ছিল না। যেমন কল্পর ছিল না শুভ পিউকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারটা। এর আগেই মিতু ওকারে প্রত্যাখ্যান করেছিল। জন্তার প্রেমিকের পাদারেই সে মালা দিয়েছিল। তার কিরেতে শুভকে একটা মেসেজারের চিঠি পাঠিয়েছিল।—শুভম, আমি পুলককেই বিয়ে করছি। কিন্তু মনে করো না, প্রিয়, পরদিন বিয়ের দিন একবারটি এলো।—শুভ যায় নি। যেতে পারে নি। কলাও মুনিভার্সিটির কোনও মেয়েকে তার বঁড়শিতে গাঁথতে না পেরে অন্য খেলার্থে চলে গিয়েছিল। এদিকে মুকুল করেছে যেন সাবিনা পর্ব চুকিয়ে দিয়ে অরুণাপুরের মেয়ে শবরীর প্রেমে পড়েছিল। শবরী রায়চৌধুরি খোকনদের মুনিভার্সিটির মেয়ে নয়। আসলে সে যাদের মেয়ে। তার সঙ্গে মুকুলের আলাপ অনাহত সূত্রে। শবরী সম্পর্কে খোকন বিশেষ কিছুই জানতো না। কেননা, মুনিভার্সিটিতে পড়াকালীন সময়ের মতো মুকুলের সঙ্গে আর তেমন নৈকট্যও নেই। তবু কখন কিছুটা খবর রাখে। মাঝে মাঝে অরুণাপুরে ও শুভর বাড়িতে যায়। গিয়ে থাকে সপরিবারে। ওখানে গিয়ে মাঝীনখনের খবর পায়। খবর পেয়ে মুকুল আসে। এমনকুল আসে। আজো মেয়ে যায়। কিন্তু মুকুল যে শবরীকে রেজিস্ট্রি করবে এই খবরটা মুকুল অরুণাপুরে একেবারে চেপে রাখতে চায়। কেননা, শবরীর বাড়িও অরুণাপুরে। মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করবার খবর পেলে ওর বাড়িতে অবশ্যই ঝড় বইবে না। আপত্তি তুলবে। তাই একদম চুপচাপ সেজা কলকাতে এই খোকন বিয়ের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে মুকুল। কলন খোকনকে জানিয়েছে। তারপর শিয়ালদার মাঝেরা রেজিস্ট্রারের অফিসে যোগাযোগ করেছে। এক মাসের নোটিস দিয়েছে। এবং খোকনের বাড়িতে যে সেদিন ছোট করে একটা ঘরোয়া-গণ্ডগা হবে সে খবরও সে খোকনকে জানিয়ে রেখেছে।

ঠিক এক মাসের মাথায় মুকুল শবরী এল। কলনদের বাড়ি। আজই ওদের রেজিস্ট্রির দিন। খোকন উপস্থিত, জামাল মুকুল এবং অবশ্যই কলন তনিজা ছাড়া এই বিয়েতে সাক্ষী দিতে। কিন্তু অন্যের আকাশ সীমা লঙ্ঘনের বিয়ে। মুকুল কি জানে না জামাল-মুকুলকে বিশেষত কলন-তনিমাকে। কীভাবে ওরা দিন কাটাচ্ছে। কতটা দুঃসহ। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক একইসঙ্গে দু'দুটো লড়াই চালাতে হচ্ছে তাদের।—এসব কি জানে না। শবরী সদ্য বি.এ পাশ করেছে। মুকুলও ওকে পড়াচ্ছে। সেই খেকেই প্রেম। শবরীর মুখটা বড় মিষ্টি। আজই খোকন প্রথম দেখল মেয়েটিকে। এই মেয়ের এত প্রেম! কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে কাঁটাতারের বেড়াটাকে এভাবে ঘুমন্ত মুকুলকে ফেলে যাওয়ার এমন সাহসিকতা। বেমানান কিন্তু মনে হয় না। মনে হয় নিতান্ত ঘরোয়ার। পরিমল ঘরোয়াহীন। হয়ত আবেগে তাড়িতও। তাই মুখটা এমন নির্বোধ। ভালোমানুষ। যখন শবরীর মুখটা রেজিস্ট্রির সময় মোটেই এমন নির্বোধ থাকল না। অথবা অপেক্ষমান তনিমাদের কথা ভেবে ওরে আতঙ্কে সে কেমন ঘুমের উচ্ছলতা হারাল। স্বামের রেজিস্ট্রার তন্ত্রমহিলা বয়সে প্রৌঢ়া। গম্ভীর। ভারবারী। তিনি অবশ্যই শবরীকে জেরাতে চাইলেন যে, এ কিন্তু আর পাঁচটা বিয়ের মতো নয়। অন্যদের সময় একশত এ বিয়ে মেনে নেয় নি। বিয়ের পর তোমার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে। ফলিও মুসলিম ছেলেদের সঙ্গে আছে। স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট বলছে, যে কোনও ধর্মের বা বর্ণের প্রায় বয়স্ক নারী-পুরুষ ইচ্ছামত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কোনও বাধা নেই। তোমার মনের সায় আছে তো। সাদুক ভদ্রমহিলা শবরী আড়চোখে একবার মুকুলকে দেখল। তারপর সরাসরির দিকে একবার চোখের তারা ঘুরিয়ে নিল। তারপর ঘাড় ঝিরে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, হাঁ আছে। যখন খোকন মুকুল, সেই মুহূর্তে তার ছাত্রের মুখটা, তার বাড়ির কথা অকস্মাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল শবরীর। মুকুল বাবা-মার সম্মতির কাগজে সেটা জানিয়েছিল। কিন্তু একটা অনিশ্চয়তার আকাশ ছায়া তার মুখেও ঘুলে গিয়েছিল। কেননা, তার বাড়ির কর্তার প্রতাপের কথা তো সে জানে। শবরীকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে তো। শবরী নিজেই বা কতটা মানতে পারবে!

যাক, মুসলমানের ঘরে হিন্দু মেয়ের বিয়ে হলে তাকে মুসলমান হয়ে যেতে হবে কেন? অথবা কোনও মুসলমান মেয়েকে হিন্দুর ঘরে এনে হিন্দু ঘরে উঠলে হবে কেন ধর্মান্তর?—এই প্রশ্নের নিয়ে তো জন্ম মুনিভার্সিটির দিনগুলো কাটায় নি। কলন-তনিমা তো এই নিয়েই লড়াই করছে। লড়ছে জামাল-মুকুলও। একটা নতুন আকাশ পেয়ে ঘুলতে চাইছে ওরা। লাশগুলোর এক নতুন দিগন্ত। সেই দিগন্তকে এই মুকুল-শবরী কি অন্তত সম্ভাবিত করতে পারবে না?—এমন এমন মনে সংশয়ের ঝড় খোকনের মনে আছড়ে পড়তে লাগল।

রেজিস্ট্রি অফিসে সাইনাদুল মেরে ওরা সোজা খোকনের বাড়ি এসে উঠল। খাসবার আগে শিয়ালদা থেকে উপহার এবং মুকুল ওদের পছন্দ মতো ফুল মালা এসব কিনে এনেছিল। কলন এক ঝাঁকে গিয়ে মোমকে এবং জামালের ছেলে মেয়েকে ওর বাবামায়ীনের বাড়ি থেকে নিয়ে এল। বেশ জমজমাটি আসর বসল খোকনদের বাড়িতে। তুমি খুব খুশি হয়ে মানুষ এসে জড়িয়ে। বিদেশের বন্ধুরা এসে। মোমবিদিকে পেয়ে এবং জামালের ছেলে এবং মেয়েকে পেয়ে ও যে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল।

মুকুলই খরচ করে উপহার এবং কলনকে নিয়ে গিয়ে পরিবার কাপড় থেকে মুরগির মাংস এবং অন্যান্য বাজার করে নিয়ে এল। উপহার যে ওর জীবনে আজিজাতা হয়ে এমন এক উদার আভিজাত্যহীন মজলিশি পরিবেশে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারবে তা ভেবে খোকন মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। উপহার চমিনা এবং সুলতানা সাহায্যে একদিকে রান্না সানলাজিস আর একদিকে তাদের আড্ডেমাইন ছেলে মুকুল শবরীর বাসরশয্যার বন্দোবস্ত করছিল। অতনীপন্ডার চেন করে তার মাঝে মাঝে খোলাপ দিয়ে ওরা একটা সুন্দর সুগন্ধের প্রণালি ফুল ফুলদা। শবরী কেশ সাজা পাজিদ এসব দেখে। মুকুলও কিছুটা। কেননা, শবরীর অনাহাতা পরীক্ষের ছাল নিয়ে আইনের হাতপত্র নিয়ে মুকুল আজ যে ঘরে দিন কাটবে সেই ঘরটাকেই প্রথম রাতের উপযুক্ত করে কুসুমসজীর্ণ করতে চাইছে ওরা। কিন্তু মুকুল নিজে যে ঢের জানে তাদের আসলাই পথ মোটেই ফুল ছড়ানো নয়। বরং কাঁটা বিছানো। মোহিনীদাসের পথকেই তার এই সমাজের পক্ষে আদর্শ মনে করল।—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পরুষ
মালীর ঝিরহি কাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।

দুস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে বলে রাধা যেমন অভিসারে যাবার আগে পথে কাঁটা পুঁতে দিয়ে, কলসীর জল ঢেলে দিয়ে পথ পিছল করে হাঁটা প্রায়টিল করত—তারাও তো সেরাকেই কঠিন পথ পেরোনোর জন্য প্রস্তুতি করবার। খানিকটা এই ভাবনাতেই মুকুল উপহারকে বলল, আই উপহার এসব কী করবার ছিল।

—তা বলতে হয়। অন্তত জানটা অন্য বিয়ে পাবি না মুকুল। অন্তত জীবনেও না। আমাকে ঘৃণা করি কিন্তু অন্যদের এই ভাবীর কথা তোদের সাদা জীবন মনে রাখবে।

মুকুলও মনে মনে মনে নেয় কথাটা। এবং আর কিছুর আপত্তি তোলে না। কেননা, কালই তো অরুণাপুরে ফিরে গিয়ে তারা যে যার বাড়ির পথ ধরবে। সমাজ হোই এক আরের লাশগুলো ঘুচে যাবে। এই ক্ষণিক লাশগুলোর স্মৃতি নিয়ে তাদের যে অন্তত কতদিন যন্ত্রণেও করতে হবে কে জানে। দু'জনের বাড়িতেই অভিভাবকের কেউ জানে না। তবু জানে মাস্টার কলকাতায় আছে। শবরীকে সন্টলেকে ওর মাসির বাড়ি সে পৌঁছে দেবে। তাই কালকে একবার সন্টলেকে শবরীর মাসির বাড়ি ঘুরে যেতে হবে। বাড়ির কাছে সমাজের কাছে একটা বিশ্বাস জাল বুনতে বুনতে তার গোপনে কলকাতায় এসে রেজিস্ট্রিটা করে যাবে।

অন্ধকারের ঘাইয়ে দাইয়ে খুব পাড়িয়ে উপহারা সন্ধ্যাই ঘুমে ঢলে এল। ঘুটো বড় বড় মশারি বিছিয়ে এক অন্ধকার চাদরে মিঠে ওরা মজলিশ বসাল। কেউ ওয়ে কেউ বসে কেউ আধশোয়া হয়ে তুনিভার্সিটির মাঠের মেলাসে ওরা আড্ডা শুরু করল। শবরী ওদের তুনিভার্সিটির মেয়ে নয়। সংসদী নয়। ও থাকতে বরা সবাই একটু লাজেক ভেব করতে লাগল। কলন কথাবলিয়ে এবং সমবয়সীদের চট করে 'তুই' সম্বোধন করতে পারে। শবরীকে বলল, আর শবরী তোর এখন বিয়ে হয়ে গেছে। তুই আজকাল তোমাদের কথার কিছু মনে করিস না। তারাও তুইও এখন লাশগুলো লাশগুলোর মতো পড়ে গেছিস। লাশগুলোর একটু আধটু অশ্লীল কথাবার্তা আসেই থাকে।

শবরী তার হাঁটু মুটো পিরামিডাকৃতি করে হাঁটুর ওপর থুতনি ওঁজে বসেছিল। কলনদার কথার হাঁটু থেকে থুতনি তুলে ভেব তুলে একটু লাজুক হাসি হাসল।

জামাল শবরীর কপালে এবং সিঁথিতে ভেব চাইল। চেলিনী ছাড়। সদ্য বিয়ে হয়েছে। তা বলেই রেজিস্ট্রি বিয়ে ভেব। কপালে এবং সিঁথিতে সিঁদুর না পাকতে কেমন

কেন তাঁরা লাগছিল পর্বতীর মুখ-চোখ। কামালের এটা মনে হওয়াতে সে জানে, তাই তপতী তোমরা পর্বতীকে একটু সিঁদুর পরতে পারলে না।

তনিমা একটু আড়চোখে স্বপনকে মেপে নিয়ে বলল, সিঁদুরে কারও কারও আপত্তি থাকতেই পারে। পর্বতী এখন মুসলমানের ঘরে। মুক্তুলের পরিবার যা মুক্তুল সিঁদুর মেনে নেবে কি না, তা তো তপতীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

স্বপন তনিমার ঝাঁঝটা ধরতে পারল। অসিতমুক্তের কড়িতে তার বাবুর আপত্তিতে তনিমাকে যে সিঁদুর পরা ছাড়তে হয়েছে তা তনিমার অজানা নয় মনে থাকাই স্বাভাবিক। যেন ওকে একটা অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এমন এক অপরাধ বোধ থেকে স্বপন বলল, এখন তো তুমি সিঁদুর পরতে পার তনিমা। এখন তো তুমি মুক্ত। আমারও কোনও আপত্তি নেই।

—না। ও পাট চুকিয়ে দিয়েছি।

তনিমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

কামাল বলল, আমি তো রেজিস্ট্রির দিনই সুনন্দাকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছি। তবে হাঁ, একথা বলে নিয়েছিলাম, যদি এই সিঁদুরের মধ্যে হিন্দুত্ব খুঁজতে যাও তবে পায়ের জুতো আঙুল দিয়ে ঐ সিঁদুর মুছিয়ে দেব।

সুনন্দা কামালের কথায় লাল হয়ে মুখ নেড়ে হাঁ বলল লজ্জিতভাবে। ওর কপালে এবং সিঁথিতে এখনও সিঁদুরের উজ্জ্বল উপস্থিতি। যদিও টানা কামাল সিঁদুর মোটেই উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দেখায় না। একটু যেন কালচে। খয়েরি বলা যেতে পারে। তবু সুনন্দার অনুভবের জন্যে যে ওটা এখনও গাঢ় লাল তা জেনেছেই একটা নবনবোদ্ভিন্ন সৌন্দর্যের পরশ যেন সুনন্দার মুখটা এই ঠানদী আলোয় আরও অপরূপ লাগল।

মুক্তুল ওর পারিপার্শ্বিক এবং ধর্মীয় বিধিটি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বন্ধুবধূটির কিরে গেল।—আসলে কাল তো আমাদের আবার ফিরতে হবে। সিঁদুর পরে তা মুক্ত ফেলাটা পর্বতীর কাছে একটা সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি সেটা চাইনি না।

মুক্তুলের কথাটা খুব সন্তোষজনক। সবাই মেনে নিল।

এরই মধ্যে কামালের মেয়েটি আব্বা আব্বা ডাকতে ডাকতে ছুটে উঠে এল। বলল, ঘুম আসছে না আব্বা। তুমি নিচে চল। ভয় করছে।

—ভয় কী জেনি। নিচে গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়। ঘুম এসে যাবে। মামণি ঘুমিয়েছে? তুমি মোম ওয়া?

—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু আমার ঘুম আসছে না।

সুনন্দার কথায় জেনি কিছুতেই হাল ছেড়ে নড়ল না। বড্ড বশ আব্বা ওকে। একেবারে মোম তুমি মামণিদের মতো ওকে ফেলে যেওয়াতে আবেগপ্রবণতার পরিস্থিতির সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে পারছিল না, আবার বড়দের সঙ্গে থাকবার ছুতোও তার ভাল লাগে না।—কামাল জেনির মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন করে। আসলে সে আব্বার একটু সঙ্গ চায়। কামাল মেয়েকে নিয়ে নিচে নেমে গেল।

কামাল চলে যেতেই স্বপন সুনন্দাকে তার ভর্ৎসনার সুরে বলল সুনন্দার উচিত হয়নি ওর মেয়েকে 'আব্বা' বলতে দেওয়া। কেন তার মুসলমান বলেই তাকে 'আব্বা' বলতে হবে। 'বাবা' বলতে দোষটা কোথায়?

খোকন কাউন্টার ছেড়ে বলল, আব্বাতেই বা দোষ কোথায়? বাবা পিতাজী আব্বা সমার্থক শব্দ...এসবই তো সমার্থক শব্দ। একে অপরের প্রতিশব্দ।

স্বপন শেওলদের কথায় প্রতিবাদ করে বলল, শেওল তুই যদি বলে তাহার ছেলে না হইলি তবে তোকে কিন্তু কাতাম না। কিন্তু এটা তোর অন্তত জানা থাকার কথা যে, একটা ভাষাতেই মানুষের সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থান চিহ্নিত হয়ে যায়। চিনিয়ে দিতে পারে। 'আব্বা' শব্দটা পরিষ্কারভাবে মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করে।

—সে তো আব্বা পিতা আব্বার শব্দও কোনও না কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থান জানায়। আর জানায়। অতি কী? শেওল জবাব দেয় স্বপনকে।

সুনন্দা স্বপনকে জেনাতে চায়, ঠিক কোন পরিস্থিতিতে জেনি 'আব্বা' বলতে শিখেছে। বিষয়টা স্বপনেরও জানা। কামালের তখন বাইরের দোকান সবচে। অনিয়মিত যায়। কলহ বাধিয়ে। নিজেরা তখন ঘরময় বসা আড্ডা করে থাকে। জেনির হাগিম তখন কামাল সুনন্দার কাছে থাকে। বড় মেয়ে মেহেরুন্নেসাকে কামালের আব্বা আম্মার কাছে বড় হয়। সেখানে কামালের ভাই এবং আরও আত্মীয়রা থাকে। তাদের আদরে মেহেরুন্নেসা 'আব্বা' বলে তাদের ডাকতে। সেই পরিবেশ থেকে জেনিও আব্বা বলতে শিখেছে। সুনন্দা একটা মিটার না করা বলে, তুমি তো জানো স্বপন কোন পরিস্থিতিতে জেনি তাকে আব্বা বলতে শিখেছে। মামণি তো আরও কম বয়সে।

স্বপনের। তবে ওরা দু'জনেই আমাকে 'মা' বলতে শিখেছে। জেনিটা প্রথম প্রথম আম্মা বলত। এখন কদিন যাবৎই 'মা' বলে।

তনিমা চোখ-মুখ ঘুঁচকে সুনন্দাকে বলে, যাই 'আম্মি'-র থেকে কিন্তু 'আব্বা' ফ্রক ভাল। অনেক মিষ্টিয়ে বেশি। আসলে স্বপনকে তোরা ঠিক ধরতে পারছিস না যে ও ঠিক কী বলতে চাইছে। ওর একটু তাসের শব্দ প্রতি আসক্তি বেশি। এছাড়া শেষক শব্দ, কিন্তু বিদেশি শব্দ ইংরেজি ছাড়া [illegible] আরবি ফার্সির যা কিনা আলো আবার শব্দ ভাণ্ডারে ঢুকে পড়েছে, তার ব্যবহারে সেহেই সচেতনভাবে ও সুখী থাকতে চায়।...

গল্পটা বলার পর তনিমাকে কথা দিয়ে স্বপন বলে ওঠে, আমি দেখেছি এই ভালোবেসেই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আরবি ফারসির অনেক ব্যবহার যা আগে তাদের শব্দ ভাণ্ডারে ঢোকেনি তাই পারসি, বাঙালি হিন্দুদের থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। উর্দুটা আমাদের মাতৃভাষা নয়। হিন্দীর ব্যাকরণ আর সংস্কৃতির ধর্মমালা নিয়ে উর্দু গড়ে উঠেছে। মোগল আমলে এর উৎপত্তি। আরবিও আমাদের ভাষা নয়। বাঙালি মুসলমান এরা বাঙালি হিন্দুর মিলনের চাবিকাঠিটা কোথায় আছে জানিস?—তাদের ভাষায়। "মোমের পরব মোদের আপ, আ মরি বাংলা ভাষা"—র।

তপতী এক গ্লাস জল খেয়ে ফেলেছিল। তার এসব আলোচনা সহ্য হচ্ছিল না। একটু কৌতুক করেই জল ভর্তি গেলাসটা স্বপনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলল, স্যার একটু জল খান। যাচ্ছেতাই ক্লাস নিচ্ছেন।

তপতীর কথায় এবং ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল। স্বপনের জলের প্রয়োজন ছিল। স্বপন গেলাসে চুমুক দিল।

তপতী এবার সুনন্দার প্রশ্ন কানে কানে বলল, ছেলেকে সুন্নত করাও নি।

—না। নিচু স্বরে জবাব দেয় সুনন্দা।

—করাবে না!

'না' শব্দের অর্থে ঘাড় নাড়ে সুনন্দা।

তপতী বলল, তারপরি ওটা আমি খুব সাম্প্রতিকবিরোধী। সুবিধা হয় ওতে।

সুনন্দা তপতীর ইঙ্গিতটা ধরতে পারে। একটু হেসে বলে, ওটা না করেও আমাদের রপ-রক্তাক্তের কথনো প্রতিবিধা হয়েছে বলে শুনিনি! সাম্প্রতিকেরও হবে না এবার একটু উচ্চ হাসে সুনন্দা তপতীকে বলল, আমরা 'মানব ধর্ম' পালন করি ভাই। হিন্দু বা মুসলমান কোনও ধর্মীয় আচারেই, আমরা ওটি করে ঘরে ঢুকাতে দিইনি না।

কামাল জেনিকে ঘুম পাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল। সুনন্দার কথাকে সমর্থন করে কামাল বলে উঠল, হাঁ 'মানব ধর্ম'। সুনন্দা পৌত্তলিকতাকে ভড়িতে চোকায় নি। আমিও নামাজ রোজা, ঈদ...কোনওটাই পালন করি না। শুধু 'কামাল নামটা আমি ছাড়তে পারি নি। ছাড়বও না। নাম তো একটা অর্থহীন জিনিস। কখনো কখনো তার অর্থ অকল্পনেও পারে। তাছাড়া ঐ নামটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। সুনন্দা যে নাম এবং বিশ্বেরও পরবী বিয়ের পর পাল্টায় নি, তনিমার মতো, এতে আমার কোনও আপত্তি ছিল না।

—তোমার আপত্তি না থাকলে কী হবে। দেখলেই তো কত ঝামেলা হতে হয় জেনিকে এবং মামণিকে মাধবপুরে স্কুলে ভর্তির সময়।—সুনন্দা ঝিম ঝিম করে বলল

—সে এক ব্যাপার। মেয়ের নাম জেনি রাখলে কেন?—যাঁদের 'জেনি' নামটি বিদেশি। কার্ল মার্কসের স্ত্রীর নাম। নামটা আমার ভাল লাগে। জেনির অনেক কনট্রিবিউশন ছিল—মার্কসকে মার্কস করে তোলার জন্য...তাই মেয়ের এই নাম রাখায়।—কামাল কেন? আমার নাম কামালউদ্দিন, আই। বাবার নাম কী?—সুনন্দা বলু—এ আবার কী। আপনার নাম কামালউদ্দিন। আপনার স্ত্রীর নাম সুনন্দা বসু এটা কি ম্যাচিং-এর না না আমরা আপনার মেয়েকে ভর্তি নিতে পারি না। স্কুলে পরিবেশ নষ্ট হবে এতে।

তারপর একটু থেমে কামাল বলেছিল, জানতে পারিস একজন হেড মিস্ট্রেস আমাকে একথা বলেছিল:—যার মামণিকে স্কুলে ভর্তি করার সময় আর এক ঝামেলা হয়েছিল। রিলিজিয়নের জায়গায় লেখা দিয়েছিলাম 'হিউম্যানিটি'।—এ আবার কী! এটা আবার কী ধর্ম। স্পষ্ট করে আপনার ধর্ম লিখুন।—আর আমারও জেদ আমি ইসলাম বা হিন্দুইজম কোনওটাই লিখব না। বললাম, 'মানবতা'ই আমার ধর্ম।...এরকম নানা ঝামেলা হতে হয় আমাদের প্রতি মুহূর্তে। লড়াই করেই জেনে এবং মামণিকে স্কুলে ভর্তি করতে পেরেছি। লড়াইটা করতে হত না যদি আমরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দিতাম। ঐসব স্কুলে আলো মুসলমানের মতো হিন্দুয়ানি নেই। কিন্তু অনেক টাকা

সামনে ঐসব ফুলে পড়াতে। অন্তরঙ্গতা আমরা দু'জনেই ভালোবাসি হয়। ভালো বিভিন্নভাবেই বেরুবার করলাম।

অবশ্য রাতের আড্ডাটা মোটেই জমল না। হিন্দু-মুসলমান নিয়ে কতকগুলিকেই ছোট গেল। বড় অতিরিক্ত আলোচনা হল। গুরু গম্ভীর। মাথা ঝিম ঝিম করছিল তপতীর। বেরুবার অত্যন্ত অনুরুদ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু মুকুলই বেশি লোককে জানতে করল করেছিল শেষপর্যন্তরা রক্ষার জন্য। কেননা, বেরুর সঙ্গে আসার আগেরপুরের বিশীপ টিকিটের অবস্থানটির সম্পর্কটা বেশি। স্বপন এসব ব্যাপারে নিরিহাস। বিশেষত জীবনের ব্যাপারে।

মুকুল শবরী নতুন আবাসের জমিয়ে 'জনব ধর্ম' পালনের একটা রূপরেখা যেন পেয়ে গেল। তবে ধর্ম সম্পর্কে স্বপনের যে ব্যাখ্যা তার সঙ্গে সে মেনে নিতে পারে না। ইসলাম ধর্মকে সে যথাযথভাবে মেনে চলে। এই মুসলিম আচার তার ছেলেবেলার অভ্যাস। পরম্পরা থেকে পাওয়া। আচার হিন্দু ধর্মের প্রতিও তার তেমন বিরূপ নেই। তার প্রচুর হিন্দু বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। শবরীও হিন্দু। তাকে সে ভালবাসে।—এই পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। কিন্তু শবরীকে এখন সে বিয়ে করেছে। তাই তার নিজের ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি শবরীর ধর্মকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব নৈতিকভাবে তার ওপর বর্তেছে।—মুকুল নিশ্চুপ থেকে এসব কথাই ভাবছে এখন।

শবরী নির্ঘাৎ জানে তার অজ্ঞাতে এ বিয়ে মেনে নেবে না। অথচ মুকুলকে তখনো তার মুসলমান মনে হয় নি। শুধু মনকে ভালবাসা যায়, স্বামী হিসেবে ধরে ঘর বাঁধা যায়—এমন এক বরণী পুরুষ মনে হয়েছে। শবরীর মনে হয় সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় অবস্থান থেকে মুকুল হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ক্রিশ্চান যা খুশি তাই হতে পারত। তাতে তার ভালবাসার কিছুই যায় আসে না। কিন্তু এই আবেগই তো সব নয়। বাস্তবের জটিল মাটিতে এই আবেগকে বাঁচিয়ে রাখাটাই কঠিনতর কাজ। যখন সিমারি জনসংখ্যা হয়ে যাবে তখন স্বয় সে ভাই যেন সকলকেই তাকে ছাড়তে হবে। বিয়ের পর সিঁথিতে সিঁদুর জামাই ষষ্ঠীতে পুজোতে বা অন্যান্য হিন্দু পার্বণে সে অবশ্যে অনায়ত। আচ্ছা ।—আজ এক চরম মোমান্টিক মুহূর্তেও মুকুল শবরী তাই খোলামেলা হতে পারছে না।

অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর সকলের চোখেই ঘুম ভড়িয়ে এসেছিল। তবু আজ রাতটা শেষ হোক স্বপনের একটা কবিতা আবৃত্তি দিয়ে—এটা প্রায় সবাই মনে করল। শেষমেশ স্বপনকে একটা কবিতা আবৃত্তি করতে বলল। স্বপন বলল, আজকাল আর কবিতা আসে না। তারপর চোখ বুজে খানিকক্ষণ স্মৃতির পাতা হাতড়ে স্বপন মহম্মদ আহসান হবীব-এর একটা কবিতা শুরু করল,—

আজকের রাতে
তুমি ফিরবে আজকে আমিও না
দুঃখের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে
পরকালের কথা কেইবা স্মরণ করে রেখেছে!
পতঙ্গরা
এসে আগুনটুকুন
নিজেরা সীমারেখার একাকার হয়ে গিয়েছে।

হোক হোক
যা না হোক
কে সে খবর রাখে,
হিসেবটা কী। কিন্তু আজকের রাত
কেবলই জানে, আজকের রাত।
আজকের রাত
তুমি ফিরবে আজকে আমিও না।

মুকুল শবরীকে সবটা শুনতেই জড়িয়ে নিচে নেমে এল। মুকুল শবরী অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে রাতের অন্ধকারটাকে নতুন করে দেখতে লাগল।

* * * * *

ফিরোজাবাদে ফিরে স্বপন তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক সহজ করে তুলেছিল। তার মা সবসময়ই খুব ভেঙে পড়েছিল ওর ছেলের সঙ্গে তাদের সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার। স্বপন বিয়ে করার আগের মাসে আম্মার খুশির জন্যে কলমা পড়ে নিয়েছিল। তেমন ধরনের পড়লে বিয়ের মন্ত্রের জটিলতা মেনে নিয়ে ছেলের ফুলের চন্দনীর টাকা মোশান নিজেও কাজী মহিনুদ্দামান আমি এখন মনে মনে মানতে শুরু করেছেন। তিনি যেমন আব্বাবাদীনে স্বপনের সংসার দেখতে আসতে চেয়েছেন, তেমনই আসতে চেয়েছে স্বপনের বিদি বিভিন্না বাবুন। মোমটা কত বড় হল, কী ভাবে এখন, দুষ্টুমী করে কিনা ইত্যাদি মনে স্বপনকে সে জেনে নেবে করবে।

এরপর থেকে স্বপন মাঝেই বসিরহাট যেত। ইতিমধ্যে এল এল বি-টা পাশ করে ফেলেছিল সে। বিশেষত তনিমার ইচ্ছা অনুযায়ী সে থাইন প্রাকটাকেই প্রধান্য দিতে চাইল। সপ্তাহে অন্তত দু'দিন কাজের সন্ধানে তাকে বসিরহাট কোর্টে যেতে হতে লাগল। আর কলকাতায় যেতেই তাকে থাকতে হচ্ছে তাই আদিপুর কোর্টের একটু কাছে থাওয়ার মতো জমির জন্য লড়াই চালাতে হল। সুফোগ্য মেমিনী কেউ ছাড়তে চায় না। এদিকে তার চাকরির জায়গায় জনযোগে কামাই হতে থাকায় চাকরিটা গেল। স্বপন বা তনিমার অবশ্য তাতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। কেননা তনিমা মনে করেছিল সামান্য বেতনের ঐ চাকরি করে স্বপন জীবনে যেমনও দিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল কোর্টে নিয়মিত কাজ না পাওয়ায়। ধার দেনা করে কোর্টে আসার মতো সুট কোট টাই অ্যাটাচি কিনে নিয়মিত জেরুপথে না হওয়াতে পরিবারটি আরও আর্থিক সংকটে পড়ে গেল। সপ্তাহে সপ্তাহে বসিরহাট আওয়ার জন্য খরচটা কম নয়। বাবুর চেনাজানার দু'পাঁচটা অ্যাফিডেভিট, জমির দলিল রেজিস্ট্রির কাজ পেয়েছিল। আর তেমন কাজ নই। আদিপুর কোর্টেও সিনিয়র অ্যাডভোকেটের আন্ডারে না ঢুকতে পারায় তার কোনও পাত্তাই একল না। ওখানে সব মুখ। তার মতো চুয়াই-এর সেখানে ঠাঁই হবার কথাও নয়। ঐ বন্ধুবান্ধবের দেওয়া দু'চারটে অ্যাফিডেভিট-ই ভরসা হয়ে থাকল। ওতে সংসার চলে না। আরও দুটো টিউশন জড়িয়ে নিল স্বপন। তনিমা ঘড়ঞ্জলার থেকে শাড়ি এনে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় পরিজনের মধ্যে বিক্রি করতে লাগল। তাঁত, সিনথেটিক, ছাপা ইত্যাদি সব শাড়ি। মাঝে মাঝে সে মোমকে নিয়ে ওর বাপের বাড়ি বালিঘাইতে শাড়ি বিক্রি করতে যেত। অসুবিধা হত কিছু কিছু। কিন্তু আশানুরূপ নয়। কেননা, শাড়ির বেশি স্টক রাখতে গেলে প্রচুর টাকা চাই, যা তার নেই। অন্যদের প্রচুর শাড়ি অতিরিক্ত থেকে যাচ্ছে। এটাও একটা সমস্যা। টাকাও কেউ এভাবে দিতে চায় না। ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট। কেন কিছু টাকা বাজারে পড়ে থাকছে—তবু তনিমা চেষ্টা করে যাচ্ছে। হাসিমুখে অভাবের চেষ্টা করছে দারিদ্রকে বরণ করে নিতে। তবু মেয়ের জন্য চিন্তা হয় তার। আর্থিক এবং সামাজিক দুটো চিন্তাই। শোভন তাদের বাড়িতে এসে ঘুমে কষে তনিমা। মেয়েটাকে একটু দুধ খাওয়াতে পারে না। একটু ভাল খেতে দিতে পারে না। আসলে ইদানীং কাজ হিসেবে স্বপনের স্বার্থরক্ষাকেই তনিমা ফুসে ধরতে চেষ্টা করে। বিয়ের পর এতগুলো বছরেও ও নিজের পায়ে এখনও দাঁড়াতে পারেনি। কোর্টে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পশাপাশি চাকরির চেষ্টা করার অবেও কেন তনিমা উদ্যমের অভাব লক্ষ্য করে। এক ধরনের লাগামহীন আলস্যভাব। ঘরে ওরে বসে থাকতেই যেন আজকাল ভালবাসে ও। আর আছে আড্ডা। ওপরের মেয়ের ছেলেদের সঙ্গে যেমন তেমন, কী ঘরে তুমি কবুর মেয়ে রূপসীর সঙ্গে আড্ডা দাও। ছিলি মরছ কর? ঐ একফোঁটা মেয়ে। তীক্ষ্ণ চালাকি মেয়ে। শোভনকে এ ব্যাপারে কিছু না বললেও তপতীকে তনিমা বলেছে, ভেতরে রু না পরে একটা পাতলা ম্যাক্সি পরে ও যখন তখন এসে স্বপনের সঙ্গে ঢলি মস্করা করে, গায়ে ঢলে পড়ে। দুরু দুরু ভেতরের সব কিছু দেখা যায়। স্বপন আসছে। ঝাড়িয়ে আর পাঁচটা ছেলে আছে। কী নির্লজ্জ মেয়েরে বাবা!

—কিছু মনে করিস না তনিমা, স্বপনের মেয়ে মেয়ে ব্যাপারটা আজকে নতুন নয়। স্বপন নিজে এড়িয়ে থাকলেই হল।

তপতীর কথায় তনিমা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। তপতী ঠাট্টাও বলে, আসলে ওদের একটু মেয়ে মেয়ে ভাই আছে।

—ওদের মানে?

—মুসলমান পুরুষদের। দেখিস না কোরানেই দাড়ি আছে চারটে বিয়ের কথা।

—আমি অবশ্য তা মানতে পারি না। কেননা, মেয়ে মেয়ে ভাই অনেক হিন্দু ছেলেদের মধ্যেও আমি দেখেছি। ওটা ওর আছে তার আছে। সকলের নয়। আর যদ বিবাহের ব্যাপারে এর সবয় হিন্দুরাও ছিল একঠাই সরেন। বহু বিবাহ বন্ধ করবার জন্য আন্দোলনটা এমনি হয়নি হিন্দু সমাজে। আসলে ওটা ওই আন্দোলনের সময়কার ছিল। অযোধ্যা একা মুসলমানদের দোষ দিয়ে লাভ কী।

তপতীর মুসলিম বিরোধিতায় শোভনও টের পায়। স্বপনকে সাহ করাটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তনিমার সংসারে একটু ঝিক্তি ঘটলেই তপতীর মনের কোণে জমা থাকা, পরম্পরাগতভাবে পাওয়া, মুসলিম বিদ্বেষটা যেন উসকে ওঠে। তখন ফুলে ফুল স্বপন ওরও সহপাঠী। বন্ধু। শোভন তার বিবাহ মাঝে একটু পরীক্ষা

করবার জন্য একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, যে আমি যদি মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করলে তুমি তবে মেনে নিতে পারবে।—মা একটু চুপ থেকে বলেছিল, তোর মুসলমান বন্ধু-বান্ধবের আনার বাড়িতে আসে যায় তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু, তুই মুসলমান মেয়ে ঘরে আনলে মেনে নিতে হয়ত পারতাম না। সাত্তারে বীকারো।—তারপর একটু থেমে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, কী জানি হয়ত তোর মুখের দিকে চেয়ে তাকে হয়ত মেনেই নিতাম। মেনে নিতে হত। যাক বাবা তা তো হয়নি—সে জন্য ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই। সত্যি, ঈশ্বরের করুণা।

বাড়িতে শোভনের জামাইবাবু এসে যদি কখনও তনিমা-স্বপনের সম্বন্ধে ওঠে তো জামাইবাবু বলবে, কে তোমার ঐ বাচ্চা—যে মুসলমান বিয়ে করেছে। কুকুরে, ঐসব মেয়ের চুলবানি বেশি। হিন্দু মেয়ের কি আকাল পড়েছে দেশে।

শোভন তার জামাইবাবুর উগ্র হিন্দুয়ানিতে সম্মতি নয়। তনিমা যেন কিছুটা সময় দেয়। এবং সে যে বিপদগামী হয়নি সে বিষয়ে নিজের বিশ্লেষণকে যেন যাচাই করে মনে মনে। শোভন দেখতে যায়, যাকে-তাকে প্রেম কিন্তু হিন্দু মুসলমানের নয়। প্রেমটা ভালবাসার। একজন পুরুষকে একজন নারীর ভালবাসার। সেই ভালবাসার পাত্র ঘটনাচক্রে মুসলমান।

—ঐ মুসলমান বলেই যত গণ্ডগোল। তুমি জানো আমাদের পাড়ার মমার অবস্থা। একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছিল, দুটো আলসে আছে। এখন তালাক পেয়ে বাপের বাড়িতে। দুদিন মূর্তি মেরে এখন হিন্দুর মেয়েটাকে ঘুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। তুমি দেখো তনিমারও ঐ অবস্থা হবে।

—কেন, হিন্দুর ডিভোর্স নেয় না বউকে? ক্রিশ্চানরা নেয় না? তাহলে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এত ডিভোর্সের সংখ্যা অকল্পনীয় কী ভাবে? জানেন এসব? শুধু মুসলিমদের দোষ দেওয়া কেন।

তোমাদের পার্টি শুধু ভোটের লোভে সংখ্যালঘুদের তোষণ করে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সেকুলার সেকুলার করা থামানো। কেন আমরা কি তো বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটা রাষ্ট্র তৈরি করেছিলাম। আর বাংলাদেশ আমরা করেছিলাম সেকুলার হিসেবে। কিন্তু পরবর্তীকালে কি তা রাখতে পেরেছে? সাবিধান থেকে 'সেকুলারিজম' শব্দটা আর নিয়ে পুরোপুরি ঐসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

—কিন্তু অবশ্যই ভারতবর্ষের সংবিধানে 'সেকুলারিজম' শব্দটা জ্বলজ্বল করে লেখা রয়েছে। এখনও। কারা এখানে জন্মেছে, এ দেশের আলো বাতাস যাদের বড় করে তুলল—তাদীরভাবে তারা হিন্দু নয় বলে এটা কি তাদের দেশ নয়।

—তবে পাকিস্তান ক্রিকেট টিম ভারতকে হেলায় হারিয়ে দিলে এখানে মুসলিম জনসংখ্যা এলাকায় বাড়ি ফাটে কেন। বিজয়োৎসব হয় কেন, বলতে পারো। জানতে পারো কোন্নগরের পার্টির নেতারা?

—সেটা কেউ কেউ করে। সবাই তো নয়। ধরা করে তাদের ক্ষমুন। দেশপ্রেমিতার জন্য তাদের শাস্তি দিন। স্বপন অবশ্য নয়। আমার মুসলমান বন্ধুরা কেউ অমন নয়। যে জল-হাওয়ায় তারা নিজেরা বড় তারা তার তার ওপ পড়ে। যে মাটিতে তাদের জন্ম তা তাদের কাছে মা।

—তোমার পূর্বপুরুষ আজর পূর্বপুরুষ তাদের তো আজকের আফগানিস্তানের মাটিতে জন্মেছিল, মা ছিল...তবে তাদের উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে চলে আসতে হয়েছিল কেন।

—সে তো বহু মুসলিমকেও এদেশ ছেড়ে তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যেতে হয়েছিল।

—হিন্দুরা একলা হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে বাংলাদেশ থেকে মুসলমানদের তাড়া খেয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়ছে। বোঝা। সে খবর রাখো?

—খবর রাখুছেন। অনুছেদন নিয়ে আমি কোনও কথা বলতে চাই না। তার জন্য আলাদা আইন আছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে যেসব মুসলমান এদেশ থেকে গেল, তারপর তাদের সন্তান-সন্ততিরা আজ এখানে জন্মাচ্ছে...তারা তো এদেশের নাগরিক। তাদের হক আছে এদেশে থাকার। স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী তাদের হক আছে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক পাতাবার।

—হ্যাঁ, কিন্তু যদি মুসলমান ছেলেকে মেরে হিন্দুর ঘরে বউ হয়ে আসবে।

—তারও অনেক আগে আলসা। ঐতিহাসিক কারণ আছে। মুসলমান মেয়েদের [illegible] এর কারণ। শিক্ষার দীক্ষার ওরা অনেক পিছিয়ে আছে। তাই তো স্বপনের মতো শিক্ষিত ছেলেদের শিক্ষার দীক্ষার এগিয়ে আসা হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করতে হয়।

আলোচনা চুপ করে আর রকম। আর যেন কিছুই বলার থাকে না। অথচ থাকে। তবু মজার জন্যে থাকা বিষয়টা অত সহজে মুছে ফেলার যে যায়ার নয়, তা জেনে। এবং এও বোঝে যেন বিতাদের মধ্যেই বিষয়ের ঠিক মিহিতে আছে।

আশ্চর্য, তনিমাও মনে মনে একদিন ভাবল এই বিষয়ে বিতর্কে শ্রুপালীর সঙ্গে ঘরে আলোচনায় বসে আসতে হবে। সরাসরি না ফ্রেক আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতে হবে স্বপন মুসলমান। আজিনা যদি জেনে যায় একদম তবে নিশ্চয়ই তিনি শ্রুপালীকে এ ঘরে আসতে দেবেন না। শ্রুপালীরও একটা মনে মনে ঘৃণা জন্মাবে স্বপনের আসল পরিচয় পেলে।

এদিকে দেখতে দেখতে মেয় হয় বছর পূর্ণ করে সাত বছরে পড়ল। এখনও ওকে স্কুলে ভর্তি করা হয়নি। তনিমার আশঙ্কা আমাদের ছেলে-মেয়েদের মতো মোমের ছেলেও স্কুলে ভর্তি নিয়ে একটা কাণ্ড বাধাতে পারে। কাজী প্রাকৃতি নামটা স্বপনের অনুমতি খুব পছন্দ। তিনি নাকি স্বপনকে বলেছেন, তাড়াতাড়ি মেয়ের নাম দান নিয়ে তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিন। অনেক তো ছেড়ে যাচ্ছে। তনিমাও মেয়ে নিয়েছিল 'আজী' প্রাকৃতি' নামটা। কিন্তু নামটায় একটা অ্যাফিডেভিট করতে তবে জন্মশাসনের সিলভার্স সার্টিফিকেটে রেখের নাম আসে না। লেখা থাকে মায়ের নাম একেত্রে তনিমা মহারি। অফার নামটা অ্যাফিডেভিট না করলে কর্পোরেশনের মা সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। আর কর্ম সার্টিফিকেট না পাওয়া গেলে স্কুলে ভর্তি করানো যাবে না।

অ্যাফিডেভিট করতে যাবার ঠিক আগে তনিমা স্বপনকে বলল, আজীর যে একটু সংযোজন হলে ভাল হয় না।

—যেমন?

—মহারি। আজী প্রাকৃতি মহারি।

—বেশ। তাই হবে।

স্বপন মেনে নেয় তনিমার প্রস্তাবটা। ওদের তো মেনে নেওয়াটাই স্বাভাবিক কোনও স্বার্থবিরোধ হলেই চতুর্দিকে রব উঠবে মুসলমানটা হিন্দুর অধিকার খর্ব করে চাইছে। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ওকে ওঠে স্বপন। হঠাৎ তনিমার এ প্রস্তাব কেন? ওকে কি কেউ কিছু বলেছে। সম্প্রতি ঝালিকাই থেকে ঘুরে এসে তনিমা। শান্তি নিয়ে বিশেষভাবে বিচি করছে। তাতে কতটা লাভ হয়েছে সে জা না। কিন্তু একটা লাভ হয়েছে—মহারি পদবীটা কাজীর পাশাপাশি ঝুলে নি পেরেছে।—স্বপনের মনে হল নিশ্চয়ই তাকে কেউ মন্ত্রণা দিয়েছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে (মৃত্যুর পর) প্রাকৃতিকে আর কেউ হিন্দুর গর্ভজাত বলে মনে করবে না। ও তখন মুসলমানের ঔরসেরই হিসেবেই চিহ্নিত হবে। এবং একটি মুসলমা ছেলেকে সঙ্গে বিয়ে হবে পাকাপাকিভাবে মুসলিম আমিরত হিসেবে পরিবর্তিত হ তাই হয়ত 'মহারি'টা নামের পরে যোগ করতে চাইছে। ওর নামটাই হিন্দু মুসলমা সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এই চিন্তার মধ্যে অবশ্য কোনও যু নেই। সত্যিই তো তাদের প্রেম যুগে সম্প্রদায়ের বিভেদের একটা উজ্জ্বল উদাহ হয়ে এই সম্প্রীতির মধ্যে একটা তাৎপর্যময় থাকে। কাজী প্রাকৃতি মহারি। বা নামের ওজনে।—স্বপন ঘর কয়েক নামটা ফোটার পরে যেতে যেতে আটকে গে তাৎপর্যময় না থাকায় কারণের প্রেমে-প্রেমের মাহিন এবং যেমি নয় তার পছন্দ নয়। যদিও নাম ঘুটো মহৎ। তবু আমাদের জল-হাওয়ায় কেমন অসেম্বিলড মনে হয় তার।—কিন্তু একটা প্রশ্ন তার থেকেই যাচ্ছে মনে মনে. আর পদবী জাতী না হয়ে জানা থাকে মিত্র এবনকি বসু মজুম যে সন্ত হত তবে কি তনিমা নামের শেষে তার বাপের বাড়ির পদবীটা যুক্ত ক কথা জানতো? তাই তার মনে হয় আসলে আসলটা পদবীতে নয়, পদবী বিশে ধর্মে নয়, ধর্ম-বিশেষে। কিন্তু, ভ্রুপাস তুমিও।

ফোর্ট গিয়ে স্বপন কথন করে নিজেই ব্লাডটা করে নিয়ে সোশ্যাল সেবা ওপর টাইপ করানোর জন্য একজন পরিচিত টাইপিস্টকে দিয়ে যেত। টাইপি ভদ্রলোক অসমতির জন্য একটু দু খোঁজাজোনে। স্বপন বুঝতে পারে মুখে কি বলতেও ব্লাডটার কিছু অসমতিটা আর কোথাও নয়, নামে। পিতার নাম মহারা এবং কন্যার নামের মধ্যে একটা অসমতি। অবিশ্যি স্বপন জানে, একজন টাইপি চোখে এই অসমতিটা স্বাভাবিক। বিয়া-চেতনার ভর আর আর কতটুকু। এব পরিচয়েও তবুও অসমতিপূর্ণ এবং অস্বাভাবিক বিকৃত হয়েছিল। আর এই প্রশ্নটা হতেই পারে।

ম্যাজিস্ট্রেটের হিসেবে সেই সামান্য ভুলে যখন একজন আইনজীবির মাধ্যমে হলপনামায় ডিফেন্ডার সাব্যস্তিকেটে সহ তার স্ত্রীসহ পেশকার একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেন। সই হবার জন্য কোর্টে যান তিন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। সাধারণত তিনিই সই করে অর্ডারটা দিয়ে দেন। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি কোর্টে গিয়ে নিজের অর্ডার না করে 'হেয়ার ইজ ফিফ্‌থ কোর্ট' লিখে ফেরত দেন।

হলপ একটু অবাক হয় তাতে। কোর্টের ঘড়ি-ঘোড়া তার একটু-আধটু জানা। দূরের পথে কোর্টে যাবতে হয়তো পারবে না। কিন্তু কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে। ফেরার দিনে হিসেবে এবং অ্যাডভোকেটকে হিসেবেও হলপকে ম্যাজিস্ট্রেট আহত ভক্তর ভোল-এর এজলাসে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল।

ম্যাজিস্ট্রেট ফয়াজিউ দু কুঁচকে বলে উঠলেন, এটি? এ কী নাম: কাজী প্রাবণী মহাফি। ফলাফল নেম কাজী আমিনুর রহমান। মাদার তনিমা মহাফি। উফ্‌ফ ফতসব। না না এসব হবে না।

—যদি না হয় লিখে দিন স্যার। এই এই কারণে হবে না।—হলপ বিনীতভাবে বলে।

তবুও, ম্যাজিস্ট্রেট ততক্ষণাৎ কলম তুলে কিছুই লিখলেন না। চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। হলপের পরনেও কালো কোট। সেই কালো কোটের একটা মাছিমতো আসে এসে বসে। ম্যাজিস্ট্রেট সেদিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আপনি বিকে হাফতোরোকে?

—এটা অসম্ভবিক।—হলপ নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেয়।

—কিন্তু এমন নাম তো হয় না। মোশাওত মোসাম্মিব ওনিমি?

—প্রতিটি মানুষেরই জানা এবং শোনার কাপরে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। তাতে কিছু এসে যায় না। আইন কী বলছে বলুন।

—আপনারের তো প্রথমেই পরতোল। বিয়ের পর আপনার ট্রি আপনার পদবী এবং ধর্ম কিছুই গ্রহণ করেনি।

—মুসলমানে কি এর উত্তর পাওয়া যায়।

—তাই যদি হয় তবে আপনাদের বিয়ে হয়েছে কিনা আগে, নাকি আপনার পিতা চুক্তিপত্র তৈরি করার জন্য দিয়েছেন এসব জানা আমার জরুরি। আপনার বিয়ের প্রমাণ দেখাতে পারছেন কি? কোন ম্যাজে আপনাদের বিয়ে হয়েছে?

হলপ একবার চেষ্টা করে। একটু কাশতে কাশতে সে বলে ওঠে, স্যার ওসবের জন্য কিন্তু আপনার পক্ষে জরুরি নয়। দরকারি হলফনামায় ডিফেন্ডার সাব্যস্তিকেটের ফেরত যাতে দিবার নাম লেখা যায়। এবং এভিডেন্সটা রেডিউস করা যায়।

একবার ম্যাজিস্ট্রেট একটু ঘনে ভাবেন। তারপর হলপদের ফিরবে প্রশ্ন আর না কিছু আসবার বলে ওঠেন, কিন্তু এমন নাম হয় না। হয় 'কাজী' প্রথম না হয় 'মহাফি' প্রথম। 'কাজী প্রাবণী' মহাফি। এমন নাম আমি কখনও শুনিনি!

হলপ মনে মনে ভাবল, আপনার মতন মানুষও তো আমি কোনও দিন শুনিনি—আস্ত একটা ভোল—এসব আবার কী নাম!

—হাঁ, কিন্তু ঐ নামটি দুটি ধর্ম সম্প্রদায়ের কোনোটার নয়। আপনার প্রস্তাবিত নামটি তাই।

—স্যার, হিন্দু-মুসলমান ছাপাক্ষরী ফুলে যান। আমি পুরোপুরি একটা নাম—কাজী প্রাবণী মহাফি। নামটি কোনও পদবী আমার ফেটিচ নয়।

—এমন হয় না।

—আইনে বলা করুন যে হয় না। আমার মেয়ের নাম আমি 'মেঘলা' 'আষাঢ়' এমনকি 'ওজোনের ফাটল' রাখতে পারি। এবং সেই নামটাই আমি আফিডেভিট করতে চাই। আইনে আটকালে দু'কলম লিখে ফেরত দিন স্যার।

হলপ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এজলাসে একটা গুঞ্জন ওঠে। আসতে ফেরত পাঠে দিয়ে আরও সব উকিল দাঁড়িয়ে গেছেন। তাদেরও কেস আছে। ম্যাজিস্ট্রেট সবাইকে একটা ধমকই এজলাস সবার নেওয়াতে তারা যার পর নাই বিরক্ত। তবু হলপের দৃঢ়তিক তারা যে সমর্থন করছে তাও পরিষ্কার দাঁড়িয়ে হলপ তাদের আচরণে সেটা বেশ বুঝতে পারছে। হলপ ফেরত 'ওজোনের ফাটল' শব্দটা মোটে দাঁড়িয়ে তার উচ্চারণ ভুল সঠিক হয় নি। কিন্তু সে যে কাউকে পাত্তি দেয় নি। মেয়ের এমন নাম সে রাখতে পারে, যেমন সন্তানদের জন্মটি সে করেছে। তবু হলপ সবসত হয়। এই ফেরাটি তাকে আরও অনেক আসতে হয়। এই ফেরাটি হয়ত তাকে করে খেতে হবে। তাই হলপ একবার সবের হয়। বিনীতভাবে বলে, স্যার আমিরা তবু পাক-এর নাম ওনেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্ত্রী। উনি যে বৈদিক 'ভবু' এবং জার্মান মহিলা 'পাক' পদবী নামের পাশে ব্যবহার করেছেন। এরা মেয়েদের দুটি পদবী সমাজতন্ত্রের দুটি ধর্ম সম্প্রদায়ের, দুটি ভাবিক ব্যবহার পদবী। তবে এক্ষেত্রে কেন হবে না?

ম্যাজিস্ট্রেট এবার গভীর মুখে কী যেন ভাবলেন। তারপর কলম তুলে আদেশ করে সই করে দিলেন। আফিডেভিট হল। অবশেষে।

যদিও এই রায়টুকুই শেষ নয়। অপেক্ষা করতে হবে তিনি। চার্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সই সাদুল দেখেও নাক কুঁচকেছেন। এবং পৃথিবীর যাবতীয় আদালতের মতো হলপেরও মনটি খেয়ে বিচার প্রকল্প করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আটকে সাত গেল না। বার্থ সার্টিফিকেট দিতে হল এবং মোশও স্থানীয় একটি স্কুলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়ে গেল।

* * * * *

মোশ স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর পরই বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেল হলপ মুসলমান। মোশের বাংলাদেশ নামটে আসার ফলাটে 'কাজী প্রাবণী মহাফি' নামটা লিখতেই হল। মোশও অজ্ঞানকাল নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, কাজী প্রাবণী মহাফি। হলপ তনিমা দু'জনেই একটা ভয়ে ভয়ে ছিল ছাপাক্ষরীতে। কী জানি বাড়িওয়ালা আবার উঠে ফেতে বলবে না তো। তাহলেও বাড়িওয়ালা কাকুর পর্যন্ত পুরনা করতে পারে নি তারা। ফলিম পরস্পরার ছাপাক্ষরী ফাঁস হয়ে গিয়েছে। যদিও তনিমা নিজেই ফেসবুকে ছাপাক্ষরী ফাঁস করে দিতে। তাহলে যদি বাড়িওয়ালা কাকুর ফেরে ছাপাক্ষরীর তাদের ঘরে আসা বন্ধ হয়। কিন্তু তনিমা ফলতে পারেনি এক আরব পদ্ম থেকে। যদি জানাজানি হলে পরে তাদের এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়। পাড়া ছেড়ে দিতে হয়—সেই কারণে। বাড়িভাড়া যে হারে ফেড়ে ফেল্লে এত কম ভাড়ায় আর ভদ্রভাবে মাথা গোঁজা যাবে না কোথাও। কিন্তু খুব আশ্চর্যজনকভাবে ছাপাক্ষরী জানাজানি হওয়ায় তনিমা মনে মনে খুশিই হল, পদ্ম পাকা সত্ত্বেও। কেননা, এখানে হলপ কাফিলাই আর ছাপাক্ষরীতে হলপ তখন এখনে আসতে ফেকেন না।

হলপ খুশি হল অন্য কারণে। আশ্চর্য আরণে। যেন এতদিনে নিজের হারিয়ে যাওয়া অস্তিত্বটাকে খুঁজে পেয়েছে সে। মোশ এখন যার তার কাকার বাড়ের কাজী আমিনুর রহমান নামটা বেশে অবাক হয় না। বরং ও যে এখন আবার আগ নামটা জানে সে বিষয়ে সে তার বাবার কাছে আহির করে বলে, আমি জানি এটা তোমার নাম। তোমার আগ নাম।

হলপ ভীষণ খুশি হয় এতে। ওর দাড়ি-গোঁফের মধ্য থেকে দাদা কক্ষকে দাঁতটা বেরিয়ে পড়ে। উজ্জ্বল প্রেম মুক্তো ঝুলিয়ে নেয় ওঠে। আরও উজ্জ্বল হয়।

একদিন তনিমা রান্নাঘরে বসে রান্না করছে। হলপ মেঝের ওজনেশের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে। মোশ মাঝীতে মানুর বিছিয়ে পড়তে বসেছে। বাড়িওলি আন্টিরা এসে তনিমাকে জানতে লাগল, আগে বলতে কী হত তাই। আবার কি আর কিছু ভনে করছুম। হিন্দু মুসলমান আবার কী। মানুষ মানুষ।

কথাটা হলপের কানে আসে। যাসলে হলপকে সোনাধার জন্যই কাকিরা যে একটু ভোরেই কথাটা বলেছে তা হলপ বোঝে। হলপ খুশি হয় কথাটা শুনে। নিজেকে কেমন জরী মনে হয়। ওপরের মেয়ের ঘরের টুংস ঘরী যাওয়ার সময়ের মতোই হলপদের ঘরে আসে। তাদের মধ্যেও কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কোনও ভাজবর নেই। হলপ ভেবেছিল ওরাও হয়ত একবার এসে ঘটনাটা তুলবে। কিন্তু তা না তোলাতে হলপ বুঝল যে, পরিস্থিতিটা মন অবস্থার কথার ওর থেকে চলে না। আসলে পরস্পর পরস্পরের ভেতর প্রাত্যহিক সম্পর্কের নিয়মটা এত দূর মেলে গেছিল, ছবিতে বিরোধিল যে একটা তুচ্ছ কারণে তা ওটিয়ে নেওয়ার কথা কারও মনেই আসে নি।

ছবিবাবু একদিন তাদের ফ্ল্যাটের ভেতর নিচু করে মাথাটা গলিয়ে পরীক্ষা করে ভেতে তার পরমাণুর জন চাতালের অন্তরের ছবি রেখে হলপকে বলে গিয়েছিল, বাঁক সমস্যা মিটিয়ে তো।

হলপ তার চোখের ভাষায় চরিত্র ছবিকে ছবি যেরকম অর্থে অনেকখানি বাড় নেয়েছিল। কিন্তু, আমাদের একনও সমস্যার পড়ে আছে। মুকুলের সবসত্ত্ব মিটতে একনও বা পদ বাকী। তাই সমস্যাটা যেন থেকে উদ্ধার হয়ে গেল একবারে বা কার আগে কী করে। তারপর কী করে। তবু তবু তো কার গেল। এই-ই বা কম কী?

তনিমার ভ্রূবর্ধীনতা আগের মতো ফিরে এসেছে। মুখের একনও উজ্জ্বল অভাব। তবু নিজেকে ভ্রূবর্ধীনতার ভাব। পরের দীর্ঘ নিয়ে নিজেকে আয়নাতে দেখতে তনিমার খুব ভাল লাগল।

আঁটিপুরের খাঁটিবাবা

লাবু ঘোষ

ক্লাব আর মিটিং চলছে। এ মিটিংয়ে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে না চিনলেও অনেককেই চেনে অমল। যেমন ঐযে তিনি এ মিটিংয়ের মধ্যমণি, তিনি হচ্ছেন সুবেশ সেন। একজন প্রোমোটার। আর তার ওপাশে যিনি বসে আছেন উনি হচ্ছেন সদানন্দ সাহা। টিটাগড়ের মালিক হয়েছেন। তার পাশে হরনাথ চক্রবর্তী। বইসমিতির মালিক। হরনাথের পাশে অমল বিশ্বাস। এই অমল বিশ্বাস যে কি করে অমল তা ঠিক জানে না। তবে ওনেছে তার নাকি অন্তরকমের দেদার ব্যাজনেস আছে। অমল বিশ্বাসের উল্টোদিকে আছে অমলের মালিক পরেশ নাথ। পরেশ নাথের পাশে কৃষ্ণবরন বক্সী। কৃষ্ণবরন বক্সী দেশের বাজারের দালাল।

এ মিটিংয়ে অমলের প্রয়োজনিয়তা নেই। প্রয়োজন করেনি সে। তবে যে ছেড়ু তার মালিক পরেশ নাথের অফিসে মিটিংটা হচ্ছে, এবং যেহেতু সে ঐ বস্তিটাতেই থাকে, তাই মিটিংঘরে বসে ছেলেদের সঙ্গে তাকে দিয়ে ওদের পাঠাল। বুঝতে পারছে আজ এখানে যারা মিটিং করছে, ওদের উদ্দেশ্য একটাই, সবাই মিলেমিশে এমন একটা ব্যবস্থা করা, যে ব্যবস্থায় প্রভুর অর্থসম্পদের সঙ্গে-সঙ্গে প্রভুর সামাজিক সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়। এবং অন্যকেও ফাঁকি দেওয়া যায়।

সুবেশ সেনের গলাই বেশি শোনা যাচ্ছে। তিনি ব্যবসার খুঁটিনাটি ব্যাপার বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলছেন। নানা প্রস্তাব উত্থাপন করছেন। আর এরমধ্যেই ব্যবসার আঁটঘাট বাঁধাবাঁধি চলছে।

সেনবাবু বললেন, এখন একজন অলৌকিক ব্যক্তিকে আমদানী করতে হবে। জ্যান্ত ব্যবস্থি নয়। একজন মৃত ব্যক্তিকে আমদানী করবো।

হরনাথ চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন স্যার। জ্যান্ত ব্যবস্থি তো বুঝলাম। কিন্তু মরা ব্যবস্থি। সেটা আবার কি রকম! মরা ব্যবস্থিকে আমদানী করলেন কি করে?

সুবেশ সেন মুচকি হাসলেন। মরা ব্যবস্থি নয়। বছরিন আগে মরে হয়েছেন এমন এক ব্যক্তির ছবি আমদানী করবো। সেই ছবি ভক্তদের সামনে ঝুলিয়ে ছবির মাথায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেবো। তিনি যে কবে হয়ে গিয়েও এখনো মর্তের ভক্তদের ভুলতে পারেননি। স্বপ্নাদেশে এখনো ভক্তদের বিপদ ছেড়ে উদ্ধার করে বেড়ান। এসব কথা আমরা প্রচারের মাধ্যমে ভক্তদের কাছে পৌঁছে দেব। এদেশে ভক্তদের অভাব নেই। ব্যবসা জমে উঠবে। জ্যান্ত ব্যবস্থির চাইতে মরে যাওয়া ব্যবস্থির ছবিতেই বিশ্বাসযোগ্য বেশি। বুঝি পর। ঝরঝামেলা ছাড়ও থাকে না। হেসে কিন্তু মনে হয়, আমরা কি জানি। ব্যবস্থি বলে মেনে আমরা এই বলে বেড়াচ্ছি।

—কিন্তু ব্যবস্থির নাম?

—নাম। নাম একজন জনসাধারণ। তাঁর জন্মস্থান আঁটিপুর। তিনি একদা নিজেকেই বড় মনে করে ছিলেন পরের বার বছর বয়সে হিমালয়ে চলে যান একদা একটি বছর বয়সে ফিরলেন। তারপর দশ বছর ধরে পৃথিবীর সারা তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ান। এরা ইহ জগতে শেষ আটটি বছর তিনি তাঁর জন্মস্থান আঁটিপুর কাটিয়ে যান। তবে তিনি সশরীরে মর্তে চলে গেলেও কিন্তু ভক্তদের জন্যে তাঁর অন্তরবাণী রেখে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, 'ভয় কাকে বলে, ভুলে কখনো ভয় পেয়েছিলুম। বলে নিজেকে সম্মানিত নিয়ে অন্যের বলতে শুরু করলেন। তিনি বলে গেছেন—ভূতে-জলে-জঙ্গলে জন্তুরীকে যেখানেই বিপদে পড়িবে আমার নাম স্মরণ করিলেই উদ্ধার পাইবে।'

অন্তত জায়গায় বিপদ পড়ে কেউ যদি বেঁচে ফিরে আসে, তাহলে তো বাবার নামের মাহাত্ম্য বেড়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ মরে যায়, সে কি এসে বলতে পারবে যে বিপদে পড়ে আমি বাবাকে স্মরণ করেছিলাম, অথচ আমি মরে গেলাম। ব্যাপারটা একটা তলিয়ে দেখুন। কথাটার অন্তরস্থাটা একটু বুঝুন।

সবাই একবাক্যে বলে উঠলো—লজিক-লজিক।

পরেশনাথ মাথা চুলকোয়। তা তো বুঝলাম স্যার। কিন্তু জনসাধারণকে কেমন দেখতে হবে? ব্যবস্থির ছবি কিন্তু দারুণ ব্যবস্থিমার্কা আকর্ষণীয় হওয়া চাই।

সেনবাবু হাসেন। ঠিক-ঠিক, খুব দামী কথাই বলেছেন আপনি। বলে অমলের বিশ্বাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ যে, ঐ ওঁকে যেমন দেওয়া হবে। সাদা ধবধবে লম্বা লম্বা চুলদাড়ি পরিয়ে মাথায় ওপর চুড়া সৃষ্টি করবে। আর একগাদা লম্বা সাদা ধবধবে দাড়ি থাকবে গলা বোরাই। কপালে অসংখ্য রক্তিমবর্ণের ওপর আঁকা থাকবে অর্ধচন্দ্র। উনি যখন গায়ে গেরুয়াবসন জবাহর মুড়িয়ে বসে থাকবেন, তখন হাতেই দেখা যাবে। ওনার ঐ অবস্থার ছবি তুলে, সেই ছবি সত্যের ভক্তদের জন্মমৃত্যুবরণের ছবি হলে আপনারা একটু কল্পনা করে নেবেন। ওনাকে কেন ব্যবস্থি বলবো।

সবাই অমল বিশ্বাসের দিকে তাকায়। সত্যি ওনাকে সেদেবতুল্য। মাওয়া করেছি দাঁড়িয়ে বসলে, কিন্তু সাদা ওরুমাত্র ঘাঁ দেখিয়ে আর নিচে ঐ অক্ষরগুলো লিখলেই কি চলে? অন্যান্য ওরুদেবদের সম্পর্কে তো দেখেছি এ বইপত্তর আছে। তাদের তাঁদের জীবনী লেখা আছে আর অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ আছে।

—হবে, হবে। আমরাও করবো। ব্যবস্থি জীবনী তৈরি করবো।

—কিন্তু অলৌকিক গল্প কি তৈরি করেছেন? যা করে থাকেন তাহলে একটা আমাকে শুনুন।

সেনবাবু হাত তুলে বলেন। অনেকগুলো ঘটনা ওখানে তো চিন্তা করে রেখেছি। তবে তবে মনে হচ্ছে একটা ঘটনার কথা আপনাদের শোনাচ্ছি। যেমন ধরুন—জন্মস্থান আঁটিপুরে একদিন আশ্রমে যান পড়লেন বলে আসুন। জানলে ঈশ্বরের দুই তা প্রতিধ্বনি ও ব্যাকরণের সঙ্গে প্রকাশ করলেন। তা বলতে বলতে বাবা হঠাৎ চোখ বন্ধ করে চুপ হয়ে গেলেন। মনে হল যেন বাবার বড় ঘোরনা লেগেছে। ভক্ত দুজন। পরস্পরের দিকে তাকায় ভাবের বুঝতে বাকি থাকে না কথা আজকে সমাধি হয়েছেন।

মিনিট কয়েক বাদে বাবা সহসা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। চোখ খুললেন।

ভক্ত দুজন বাবার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। কপালে বাবার হাতের বুলিয়ে একটা তরতর কেউ। সদ্য।

বাবা বৃদ্ধ ছেলে সাদাটাকে ঘুরে ঘুঁড়ে ছিলেন বিশ্বাসের শেষ নেই। ভক্ত দুজন অবাক হয়ে দেখলে ছেঁড়াটে সাদাটা মাটিতে পড়ামাত্র একটা ছেলে সাদা হয়ে গেছে। সাদাটা এঁকেবেঁকে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল।

দুজনেই স্তম্ভিত। এসব কি দেখছে। এ জাদুখেলা! তবে কি ব্যবস্থি আসলে একজন জাদুকর

না হলে সাপটা বা আসলের জোড়া থেকে; আর কেউটেরই বা ছেলে হয়ে গেল কি করে।

যৌবনমুহল আর বসতে পারল না। অতিরাম জিজ্ঞাসা করল,—আজ্ঞে, এবার কি আপনার?

কয়েক মুহূর্ত তারা চুপ করে থাকলেন। তারপর জানলেন, তোমাদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম উঠিয়ারার কটকে জেলাবে এক গ্রামে শনবর মন্ত্রে এক ভক্ত ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে কাতর স্বরে আমাকে ডাকছে। দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম তার সামনে একটা কেউটে সাপ ফণা তুলে ছোবল গ্রাহতে উদ্যত। অতি আর স্থির থাকতে পারলাম না। মুহূর্তে পৌঁছে গেলাম সেখানে। ভক্তের সামনে থেকে সাপটাকে সরিয়ে আনলাম। ভক্ত বেঁচে গেল। তোমরা যে সাপটাকে দেখলে, ওটাই ছিল সেই সাপ।

অতিরাম আর বাবাজির মুজনে অবাক হয়ে বাবাজির সব কথা শুনলো। কিন্তু বাবাজির কথা তারা ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারল না। তাদের মনের মধ্যে সংশয়। বাবাজি হয়তো একজন জাদুকর। সন্দেহ নিরসন করতে তাই তারা ঠিক করল বাবাজিকে গোপন করে তারা কটকের সেই গ্রামে যাবে। বাবাজির কাছ থেকে গ্রামের নাম জেনে নিল। যাতে সময় নষ্ট না করে তারা কটকে রওনা দিল। কটকে পৌঁছে তারপর অনেক খুঁজে পেতে সেই গ্রামে হাজির হল দুজনে। একটু খোঁজ করতেই শনবরকেও পেয়ে গেল। অতিরাম শনবরকে জিজ্ঞাসা করল। আচ্ছা গতকাল কি গতকাল সন্ধ্যে আপনি কি কোন বিপদে পড়েছিলেন?

অতিরামের কথা শুনে শনবর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল। তারপর বলল, হ্যাঁ। সেদিন মনের পরম ভুলেই। হঠাৎ সামনে ফণা তুলে দাঁড়াল এক কেউটে সাপ। বুঝতে পারলাম বাঁচবার আর কোন উপায় নেই। তখন কি আর করি, এক মনে জনার্দনবাবুকে ডাকতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি আমার সামনে সাপটাকে মুঠি করে ধরে জনার্দনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বলল, ঐ এক মুহূর্তে দেখা। তারপর দেখি কেউ কোথাও নেই। আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। কথাগুলো শেষ করে মুহূর্তে জন্যে করে বাবার উদ্দেশ্যে সুদেব প্রণাম ঠুকলো শনবর।

এদিকে শনবরের মুখে সব শুনে বাবা জনার্দনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস বেড়ে গেল অতিরাম আর যাদবরায়ের। বাবাকে জাদুকর ভাবার জন্য অনুতপ্ত হল দুজনে।

কথা শেষ করে সুদেব সেন বলে উঠলেন—কি ভেবেন শনবরের গল্পটা?

সবাই এক বাক্যে বলে উঠল—বানান্ত বানান্ত।

সুদেববাবু হাসতে হাসতে বললেন, আরো গল্প আছে। তবে সেসব কথা যখন ছাপার অক্ষরে বইতে দেখবে, তখন দেখবেন বিশ্বাসের কি কথা করে যায়। বইয়ে ছাপার অক্ষরে বেরোনোর আশাতেই আসলা। বইয়ে লেখা আছে, অতএব উহা সত্য না হইয়া যায় না। এ কথাটা তাবতের মতন পাণ্ডিত্যের অভাব নেই। আর সেই সব পাণ্ডিত্যের নিরেই তো আমাদের কারবার।

জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা স্যার, সব ঘটনাগুলিই কি এই পথের পথিক।

সেনবাবুর ঠোঁটের নিচে হাসি। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য বাবাজির কথা।

—কিন্তু গল্প-পুরাণের থাকেনটা।

সেনবাবু হাসলেন। তারে-তারে অত বাবড়াচ্ছেন কেন। পাণ্ডিত্যদের ব্যবহারও তো মন্দ নয়। তবে তার সাদা বাংলা করে বলবেন যা তার কারণ, তারা সেই আমলের কিনু টাকা নিয়ে ঘুরপাক করে হয়তো কালীর পুজো দিয়ে দেবেন। যেন-তেনভাবে সন্তুষ্ট করতে পারলেই সব পাপ মাফসুফ হিসাবে হয়ে যাবে, বুঝলেন। পাপের পুজো তো আপনারা সবাই জানেন, তাহলে আর তফাটা কিসের।

সেনবাবুর কথা শুনে সুবলের হাফিম মিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। ঠগবাজ হাফিম মিয়া পল্লির চাষীদের ঠকিয়ে জমিজমা গ্রাস করাই ছিল তার কাজ। আর এভাবেই বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছিল। ঠগবাজ, চোরাইটিন, লম্পট প্রকৃতির লোক হাফিম মিয়া কত মহিলার যে সর্বনাশ করে ছিল তার হিসাব নেই। জয়নাবা নামে এক মহিলা তো ওর অত্যাচারের জ্বালায় গলি দিয়েছিল। অবশ্য সেই হাফিম মিয়া টাকার জোরে হজ্জে গেল। আর হজ্জে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নাকি সব পাপ এক নিমেষে ফুৎকারে সাফসুফ হিসাবে হয়ে গিয়েছিল। লোক ঠকিয়ে বিশাল সম্পত্তির মালিক হাফিম মিয়া হয়ে গেলেন হাফিজ সাহেব। অবশ্য পরবর্তীকালে হাফিজ হাফিজেরও কম গণ্ডগোলি ছিল না।

সুদেব সেন ঘড়ির দিকে তাকালেন। আজ তাহলে এই পর্যন্ত। আগামী রবিবার আবার কথা যাবে। এখন শুধু তোড়জোড়। তাড়াতাড়ি আজ ওঠা করা যায়।

মিটিং শেষ হল। যারা এসেছিল একে একে সবাই চলে গেল।

এক-দুই করে দিন কাটতে থাকে। মাস চলে যায়। পরেশনাথবের কথামতো সুবল যুবতে পারে খাঁটিপুরে খুব ধুমধামের চলছে।

মাঝে-মধ্যে পরেশনাথ আসলের কাছে জনার্দনবাবার মাহাত্ম্য শোনায়। জনার্দন বাবার আশ্রমের উদ্যোক্তদের মধ্যে যে তিনিও একজন তাও জানান। একদিন পরেশনাথ বলেছেন, আশ্রমে একজন অ্যাকাউন্টেন্টের দরকার। সে আপনাকে আমাদের মিটিংএ ডাকা হবে। তোমাকে ঠিক করেছি। সামনের মাসে তুমি খাঁটিপুরে চলে যাবে। মাইনেকড়িও কিছু বেশি পাবে। আসল চুপচাপ কথাগুলো শুনলো।

অবশেষে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হল। খাঁটিপুরের আশ্রমে হিসাবরক্ষক হিসাবে আসলকে যেতে হল।

খাঁটিপুরে জনার্দনবাবার আশ্রম তৈরি হয়েছে। বিশাল মন্দির তৈরি হয়েছে। মন্দিরে রয়েছে বাবার বিরাট মূর্তি। বাবাজির মাথায় কুচকুচে পাকানো সাদা ঝাবরে চুলে চূড়ো। গায়ে সাদা ঝাবরে দাড়ি। কপালে অনন্ত শক্তিবেরার মধ্যে অর্ধচন্দ্র শোভা পাচ্ছে। সোনালিরঙের কারুকার্য মূর্তিতে বসে আছেন বাবাজি।

আসল মন্দিরচত্বর দিকে তাকায়। সত্যি গায়ল মেরেছে। কে বলবে অনন্ত বিশ্বাসের মূর্তি। কিন্তু বাবাজির চোখের দিকে তাকালেই আসলের যেন কেমন মনে হয়। মনে হয় বাবাজির চোখের ভেতর দিয়ে অনন্ত বিশ্বাসের একজোড়া দুষ্ট চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভক্তের ভক্তি বুঝবার আগে আসিয়ে নিয়েছে সুবল এত ভেবে। চারদিকে শুধু জনার্দনবাবার মূর্তিতে-মূর্তিতে ছয়লাপ। চাদরে, দেওয়াল, পাথরের গায়ে সর্বত্র জনার্দনবাবার মূর্তি। ভেতরে সেই বাবার মূর্তি। বাসের মধ্যেও বাবার মূর্তি, কাপড়েচোপড়েও বাবার মূর্তি, চেনের লকেটেও বাবার মূর্তি পড়ির ক্যালেন্ডারের সামনেও মুলছে বাবার মূর্তি, খবরের কাগজেও বাবাজির মূর্তিসহ বাবার সেই বিখ্যাত অক্ষরবাণী লেখা বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে। এমন কি বাবার নামে সেকেন্ডেরও মাফকরল হওয়া শুরু হয়ে গেছে চারদিকে। জনার্দনবাবার নিষ্ঠায় ভাণ্ডার, জনার্দনবাবা হোমার অফিস সেন্টার, জনার্দনবাবা পানুকলার, জনার্দনবাবা মিষ্টি সল ইত্যাদি-ইত্যাদি। জনার্দন-জনার্দন-জনার্দন। এদেশে এমন কেন লোক নেই, যিনি খাঁটিপুরের খাঁটিবাবা জনার্দনের মূর্তি দেখেননি বা তাঁর অলৌকিক কথা শোনেননি। প্রচার কার্যে জনার্দনবাবাজির ভক্তরা অন্যান্য ওঝাবাজদের যেন ক্রমশঃই জনার্দনময় হয়ে তুলেছে।

প্রতিদিন বাড়তে থাকে। লরি, ট্রাক, ভ্যানগাড়িতে ভেজাই হয়ে দূর-দূরান্তর থেকে খাঁটিপুরে ছুটে আসছে ভক্তকুল। অবাক জনস্থান চারদিক করে পুণ্য সঞ্চয় করতে চায়। তার চাইতেও বড় কথা বাবার পুণ্যধামে এসে অবাকে মনোবাঞ্ছা জানিয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চায়।

এ আশ্রমে ভক্তদের কাছ থেকে দক্ষিণা আদৌ কেন কিনু চাওয়া হয় না। ইংট ভক্তদের পেট ভরে খিচুড়ি ভোগ খাইয়ে দেওয়া হয়। ভক্তরা খিচুড়ি খেতে-খেতে মনে মনে তৃপ্তিবোধ করে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। ভাবে কেমন বিনি পয়সায় খিচুড়ি খাওয়াচ্ছে। কথা-কথা পড়ে যায়। অবশ্য আশ্রমে একটা গোপন বড় প্রণামীবাক্স রাখা আছে। ভক্তরা যদি ইচ্ছা করেন, যে যার খুশি মতন পয়সাকড়ি ঐ প্রণামীবাক্সে ফেলতে পারেন।

আসল লক্ষ্য করেছে এখানে কেউ আসুক, সে ধনীই হোক বা গরিবই হোক প্রণামীবাক্সে পয়সাকড়ি না দিয়ে কিন্তু ফেরে যায় না। এ এক মনস্তত্ত্বের খেলা। আসল দেখেছে অনেক ভক্তই প্রণামী দিতেও যেন খুব একটা খুশি হতে পারছে না, আরো বেশি করে দিতে না পারার জন্যে মনে আফসোস করছে। আসল দেখেছে এমন সব গরিব মানুষ প্রণামীবাক্সে এত সব টাকা ফেলছে, যে টাকায় বাড়িতে হয়তো তাদের অনেক খেলার আয়োজন হয়ে যেত। আসল বুঝতে পারে অনেকেই এসব টাকা খুব কষ্ট করেই জমিয়েছে।

প্রতিদিন ভক্তের মতন আবক্স ফুটছে। আর ওদিকে হিসাবের খাতা খুলে কলম হাতে আসল চেয়ে-চেয়ে উঠছে। বুঝতে পারে নকা-হকা হিসেব। প্রণামীবাক্সের প্রায় টাকার থেকে ওঝ করে ব্যবস্থাপকীয় অতিথদের ভোজনপর্বের খরচে সর্বত্র মেলা হিসাবেনা-হিসাবেনা নামুম-নামুম চলছে। প্রণামীবাক্সে শুধু টাকা কিনা কলকারে খাতায় কলমে। আবার অন্যান্যদের ভোজনপর্বের অঙ্ক ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে খাতায়। এ যেন দেখাও কলমকে ভাজনালয়ের বানানো হচ্ছে আসল দেখাও ভাজনালয়কে বানানো হচ্ছে কথা। আসল দেখায় পেন্সিল করে আর মনে মনে হাসে।

সকলের খরচের আসল পড়ছিল আসল।

জনার্দনবাবুর বিজ্ঞাপনে চোখ বোলাচ্ছিল। হঠাৎ চোখ দুটো বিজ্ঞাপনের নিচে দেওয়া ঠিকানাটার ওপর আটকে গেল। ঠিক দেখছে তো। জনার্দন গাঙ্গুলি—পুরোর জায়গায় ভুল করে গাঙ্গুলি লেখা হয়েছে। এই ছাপার ভুল। বয়ে পড়ে যায় অমল।

দুপুরে অফিসে বসে অন্যমনস্ক নিশ্চিন্দি অমল। সেলসম্যানরা অফিসে ঢুকছে। অমল লক্ষ্য করল সেলসম্যানের হাতে খবরের কাগজ।

সেলস্‌ম্যান খবরের কাগজটা তুলে ধরলেন—আমরা তো আগের থেকেই জানতাম। আজ আপনাকে পড়তেই হবে দেখছি। দুপাতার পত্রিকার মাঝখানে বড় করে বাবলা কেটেছে। এই যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তা দিক। ওকে অবজ্ঞাকরে কিছু নেই। এখনো অফিসের অভাব নেই, তখন আর আপনাদের ভয় কি।

সুবোধ সেন বললেন। অফিস জমজমি আসছে। আমরা কুড়ি বছর তা পালন করব। প্রচার তাদিয়ে দেব। পত্রিকায় পত্রিকায় মাইক লাগিয়ে প্রচার করব। ঘড়ি-ঘড়ি, দোকানে-দোকানে গিয়ে যাবার পুণ্য জমজমি পালনের জন্যে চাঁদা তুলবো। তাতে ইনকামও যেমন বেড়ে যাবে তেমনি পাঁচপুরুষ যে যাবার আসল জন্মস্থান তারও প্রচার হবে। মনে যাবকে টেক্কা দিয়ে আমাদের এক নম্বর হয়ে যাবে।

কয়েক দিনের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল আফিসে। যাবার জমজমি আসছে। পত্রিকায়-পত্রিকায় মাইকে লাগিয়ে যাবার মাহাত্ম্য প্রচার শুরু হল। সেলসম্যানরা বিলাতী হতে ভাল ভাল বেরিয়ে পড়ল কলেকলনে।

জনার্দনবাবু-জনার্দনবাবু শব্দে যেন কান কালাপালা। অনেকদিন ধরেই যেটার অভাব সেটা অমল। মাঝে মাঝে ইনটারমিটেণ্ট নিজে। তবে সেবারও একটা কিছু হয়ে যায় তো অন্তত হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। জনার্দনবাবুর হাত থেকে রেহাই পায়। অমলের মাথার অনেক চিন্তা। একটা ভাল চাকরির প্রয়োজন। ওদিকে যেন যেকার বিয়ের সময় দেওয়ানি চলছে অনেকদিন ধরে। যে কোন দিন ঠিক হয়ে যেতে পারে।

কোলকাতায় একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল অমল। ট্রেন থেকে নেমে ঘাটিপুরের বাস ধরতে হাঁটছিল। হঠাৎ জনার্দনবাবুর প্রচারে বেরনো একটা গাড়ি রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে কয়েকটা ছেলে নামল। একজনের হাতে একটা বিলাতী। অমলকে দেখে ওরা বলে উঠল, আরে অমলদা যে। আমাদের ভিক্টরের তো। চলুন আমরাও বিরব। অনুরোধ এই কয়েকটা দোকানে ফলেকশনের ব্যবস্থা দেয়ার নিই যাবে।

অমল মনে মনে ভাবল ভালই হল। আসার জন্যে আর অপেক্ষাও করতে লাগবে না। তাছাড়া আর থেকে নেমে তো আবার আসতে হবে। এমনিতেই কলকাতা থেকে ফিরে আর পারির মাইতে না।

দোকানেকরা বলল—কই অমলদা আমাদের সঙ্গে একটু চলুন।

আপনাদের যাওয়ার আগ্রহে অমল ইতস্তত করছে। আসার যৌক্তিকতা হয়। দেখাই যাক না অনুরোধ করছে তার কি ভাবে চাঁদা নেয়, আর অনুরোধ না রেখেও মনে তা দেয়।

দোকানে-দোকানে ওরা ঢুকছে চাঁদা আদায়ে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গাড়িতে বসেই অমল ব্যাপার আন্দাজ করতে পারছে। আসল লক্ষ্য কারা চাঁদা দিলেও, অনেকে তা মেনে খুশি মনে দিচ্ছে না।

একটা দোকানে অনেকটা ছেলে ঢুকে যাচ্ছে। দোকানদারের দিকে বিলাতী এগিয়ে দেয় ছেলেরা। দোকানদার বিলাতীর দিকে তাকিয়ে মু কোঁচকালো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফ্লাসটে খেয়ে উঠল—মুখে জয়ে-জয়ন্তী-জয়ন্তীকে দেখানোই দিলে পরিবে আমার নাম সরল করিয়েই উদ্ধার পাবে।

দোকানি বাকীর সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে মাথা দোলাতে লাগল। হাসিই মনে উঠল—হল উদ্ধার পেছে খোলার। চাঁদা তার দেওয়া লাগল না।

দোকানের কথার ভঙ্গিমা অমল বুঝতে পেরে ভাল। দুজনে পারে না দোকানি কি বলছে।

দোকানি হাসে। আমি এই মাত্র জনার্দনবাবুকে স্মরণ করে বললুম, বাবা আমি বিপদে পড়ে গেছি। এরা আমার কাছে চাঁদা চাচ্ছে। কিন্তু আমি দেব না। তুমি আমাকে উদ্ধার করো। বাস সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে কথা শুনতে পেলুম। বাবা বলল, ঠিক আছে দিতে হবে না।

ভদ্রতা কি অমনে বুঝে উঠতে পারে না। চোক গেলে। তোতলায়। তোমো বলতে বলতে বলে, দেবেন না—দেবেন না। কিন্তু....

দোকানে ঘরে থাকা ছেলেদের মধ্যে একজন দোকানদারকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে—এই যে চন্দন তুমি হয়তো জান না যে শহরে কেউ বিপদে পড়লে আর কিন্তু ওকে উদ্ধার করেন না।

চন্দন হাসে।

ছেলেটা বেরিয়ে যাওয়ার দিকে তাকায়। তা আপনাদের জন্মতিথি যখন এসেই উদ্ধার পাইয়ে দেবার ক্ষমতা, তা আপনারা একবার চাঁদা চেয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? বাবার জন্মদিন করছেন, তা ধরে না আমাদের বাগানে বিলাস এক ইঁড়ি পেতে চোখ বন্ধ করে মনে বাবার নাম এক মনে স্মরণ করুন। দেখবেন পরম পরম বিভূতিতে হাঁড়ি যেমন ভরে যায়। ওধু ইচ্ছে। ইচ্ছে করলেই আপনারা সারা পৃথিবীকে খাইয়ে পেট ফাটিয়ে দিতে পারেন। বাবাই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেবেন।

পাশ থেকে আরেকটা ছেলে বলে উঠল—আমার তো ওনাই আপনাদের বাবার নকি মু'জনাগরাত জন্মস্থান। কি ব্যাপার জানু তো। এক ব্যক্তির মু'জনাগরাত জন্মস্থান। কেমন অলৌকিক ব্যাপার। সাক্ষাৎ ঈশ্বর না হলে কি এমনটা পারেন। আর তা যদি না হবে থাকে, তাহলে অবশ্যি কেন তাঁর ভক্তদের এমন বিপদে ফেলছেন। ভক্তদের সঙ্গে কেন এমন দুর্বিপাকি খেলছেন। কেন বার দিয়ে বসে নিচ্ছেন না, তাঁর আসল জন্মস্থান কোথায়। যারা ভুল করছে, তাদের কেন বলে দিচ্ছেন না, ওরে তোরা ভুল করছিস। আসল আমার জন্মস্থান এখুক জায়গায়। তোরা আর মনগড়া করিস নে বাপু। আমার কথা একটু শুনে চল।

ছেলেরা হো হো করে হাসে। অবশ্যির ভক্তরা হিকে খাইয়ে বেরিয়ে আসে। একজন বাঁকা বিদ্রূপি করে। পাগলার মহিমা।

জনার্দনবাবুর জন্মদিন উপলক্ষে ঘাটিপুরে প্রচুর ভিড় হল। বাঁধ ঘাড়ে দূর-দূরান্তর থেকে মিছিল করে বাসি পরে হেঁটে আসতে লাগল ভক্তরা। ফলাকির ঘাম উপরে পড়তে লাগল।

অমল বসে ছিল অফিসে। একটা লোক এসে হাতে একখানা খাম দিয়ে গেল, চিঠিখানা জনকল্যাণ সম্মেলনের ঠিকানায় এসেছিল। আমি ঘাটিপুরে যাচ্ছি শুনে চিঠিখানা আপনাকে দেওয়ার জন্যে দিয়ে গিয়েছিল।

অমল লোকটার হাত থেকে খামটা নিল। ঠিকানাটা দেখল। হাতের লেখা। বাড়ি থেকে এসেছে। খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলল। ভেতর থেকে চিঠি বার করল। একটা ফেরার ভরা আপাত। অপরটা পড়ে ফেলল। অনেক দিন আগে সি এস সি-তে ক্লার্কশিপের পরীক্ষা দিয়েছিল। ইন্টারভিউও দিয়েছিল। তারই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। আগামী মাসের ১লা জয়েনিং। আর সেই সঙ্গে মামার হাতে লেখা একটা চিঠি। যেন বেকার দিয়ে ঠিক হয়েছে। চিঠি দুখানা বারবার পড়ল অমল। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না তার সত্যিকারি চাকরি হয়েছে। ঠিক করে ফেলল কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে যাবে। তারপর এখানে রেজিগনেশন দিয়ে দেবে।

দিন দুয়েক বাদে দেশের পথে রওনা দিল অমল অফিসের বাইরে এসে বুক ভরে বাতাস নিল জনার্দনবাবুর নাগাল ছাড়িয়ে সে পালাতে চায়। হাত তুলে মনে মনে অফিসকে টাটা জানাল। আর না বাবাজান জনার্দন।

বেরা উঠলে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কথাই অমলের প্রথমে মনে হল। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছিল অমল জানলার খারটা বাড়িয়ে রাখছে। না, বৌদিও ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিস পরিবেশন।

বৌদির মুখে হাসি, আঙ্কা জোড়া সুখবর। ছেলেরা বিয়ে ঠিক হয়েছে। এদিকে ভোমারও ভাল চাকরি হয়েছে।

মা কপালে হাত ঠেকান। সবই হয়েছে বাবার কৃপায়। বাবাকে কি আমি কম ভেবেছি।

অমলের চোখে বিস্ময়।—বাবা?

না'র মুখে বিজয়িনীর হাসি। তুই তো এসব বিশ্বাস করিস না। কিন্তু এবার কী কাণ্ড! বাবাকে ভেবেছি হতে হতে ভাল লেগেছে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হল। তোর ভাল চাকরি হল।

অমল মু কোঁচকায়। কি বলছে?

বৌদি হাসে। যাওনা যাও, ও ঘরে গিয়ে প্রণাম করো না অমলের হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে যান। টেবিলের সিংহাসন রাখা একটা ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে মনে ওঠেন—ঐ যে জনার্দনবাবা। ওনার কৃপাতেই সব হয়েছে। বাবাকে প্রণাম কর।

অমল ছবিখানার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। অবিশ্বাসভরে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হল যেন জনার্দনবাবুর হৃদযোগের ভেতর থেকে অমল বিশ্বাস তার দিকে তাকিয়ে মো ভো করে হাসছে।

হঠাৎ অমল চিৎকার করে উঠল—মত সব মিথ্যে মিথ্যে...ভণ্ড-ভণ্ড...আমি ঘাটিপুরে আসতে চাইনি...অমল বিশ্বাসকে যাবজ্জীবন দানানো হয়েছে...অমল খুন...

পাশ থেকে মা তাড়াতাড়ি অমলের মুখের ওপর হাত চাপা দিতে দিতে বলে ওঠেন—ছি ছি ঠাকুরের নিয়ে অমন কথা বলতে নেই। পাপ হবে।

কপোতীর ব্যথা

শুধাংশু পাত্র

ওদের ছেড়ের নীলাকে কিছুদিনই ছেড়ে থাকতে হবে। মাত্র ছ'উনি, কোথায় ছেড়েদের পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা নীল পাতলেন ওরা। এ বছর যে সব ছেলে উঠছে। পড়াশোনায় ভালো হবে। তবে নিয়মিত নিয়ম করে তাকে প্রতিদিন পড়াশোনা করতে হয়।

উপরের মাটির চালাটা দুটো ঘরে ভাগ করা। একদিকে রান্নাঘর আর খাবার ঘর। দক্ষিণের ও পশ্চিমের দুটি জানলা। জানলা দিয়ে দুপুরের চকচকে ছেলের ঠিকটার নীল আকাশের অনেকটা দেখা যায়। তবে বেলা হলে পশ্চিমের দিকেই মাদুর পেতে চালার একটা অংশ।

এ বছর বৈশাখে নীলা খেয়েছে, বোধা ছেলে দুটো অনেক এসে চালার ছেলেদের কাউকেই জানাচ্ছানা ওর করে দিল ঠিক পাঁচ-সাতদিন। নীলা বুঝতে পারল, এ বছর এইখানেই বাসা বাঁধতে ওরা বেশ নতুন লোক নীলা।

অনেক এবং অনেকটা দুটো দেখতে হবে এইরকমের মধ্যে কী হবে নীলা ছেলে কোনটা পুরুষ আর কোনটা মেয়ে। মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে সে শালিকের মেয়েরা বেশ সমস্যাটা পুরুষরা সাহসে ভরপুর। এদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। বোশেখের শেষে নীলাকাশ মেঘে ছাওয়া বেশ কয়েক দিন বিরামহীন শাসনের ভয়ঙ্করী ভয়ঙ্কর দুটিতেও ঘুম উদ্ধত। তুলনায় ওদেরটার পালক হয়ের ছাওয়ালে পাখির মৃত্যুটি সবই যেমন যেন ধূসর বেগুনে মেশানো। এই ধরনের হলেও ফ্যাকাসে হালকাই অপেক্ষা কালোয়ের ছোপগুলোও একটু ভারী ধরনের

কয়েকটা দিন পরেই বাসাটি ও ডিমের সাজানোর সঙ্কল্পনাই শুরু করে দিল বাসা বাঁধতে। নীলার নাওয়া-খাওয়ার এদেরকে বসিয়ে। বাড়ির পোষা ঘরের পাখির ছানা। তবেই ওদের অবহাওয়ায় ওপাওলোর প্রতিকারই ওকিয়ে দিয়েছিল। বলতে ওজনো ওপাওলোর নিয়ন্ত্রণ থেকে নতুন করে পাখনাগুলো গজিয়েছে এবং ওজনো ওপাওলো যেন আপনিই করে পড়ছে, মানুষ করার কোন অসুবিধা নেই।

মাত্র দিনচারেকের ভেতরে দুজনে মিলে সুন্দর একটা বাসা খাড়া করে ফেলল। ওজনো ওজনো প্রথমদিকে লতা এনেও ওঁজে দিল। বাইরে থেকে দেখতে অগোছালো মতো, কিন্তু ভেতরটা ভারি সুন্দর। চমৎকার একটা বাটির মতো।

পাখী দুটো নীলাকে সব সময় দেখতো, তবু বাসা বাঁধতে সাহায্য করেনি। একেবারে নীলার চোখের সামনেই বাসা বেঁধেছিল। নীলা ধরে নিল, পাখী দুটো একলাই তারই ভরসাতে বাসা বেঁধেছে এখানে। ওদের বড় গাছ বাদের খোঁজ এবং দিনের বাঁচাল সাপ এটাকে হানা দেয় সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে এবং বাঁচাল সকালের দিকে। এই দুটি সময় নীলা ঘর ছেড়ে কোথাও যায় না মাঝেমধ্যে অবশ্য ছেলে যায়ে নীলার হিসেবে ভাল, তারপরও মন এবং চলাচল সম্বন্ধে ভালি সচেতন। ছোট্ট না কেন অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী এবং অতি ক্ষুদ্র একটা ঘটনা, ঘরের জন্য মুহূর্তে কারও কিছু হায় আসে না, তবু এই নিরীহ প্রাণী দুটোর ছোট্ট বাসার উপর তার অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি নিয়েছে বর্ষিত হল।

কয়েকটা ঘরে যে ডিম পাড়বে, সেসম্বন্ধে ঠিক পাচ্ছিল নীলা। তবে চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও সন্ধান করেছিল। পরে বাসার ভেতরে একটা না একটাতে ওর

ঘুমতে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল নীলা। তাও ঘরার উপর বিশ্বাস নেই। ঘরার ওরা ঘুমালে ঘরার যেন উপায়ও থাকে না। একমাত্র নীলার গোয়েন্দা দৃষ্টিই ধূসরতে পারতো।

ডিমে তারা তা দিত। পালা করে দুজনে। মাঝের পালা দিল শুধু কপোতীটার। কপোতটা ঘুমায় ঘুমাচ্ছে না। মাঝে মাঝেও নয়। যেন বিশ্রীটা দূরে দাঁড়ানোর পাত্রে এক্কেবারে লেপ্টে থাকতো। পালক ওলিয়ে এমন অদ্ভুতভাবে ওয়ে থাকতো যে, মনে হত দাঁড়ানোর পাত্রে ঘুমের মধ্যেও একখানা মহান নাচকুড়া কে যেন গাঁথে দিয়ে গেছে। ঠোঁট বাটির মত একটা আকারে এমন বড় কপোতীটাও যেমন করে ওয়ে থাকে যে জানে। কে জানে কেমন করে শরীরটাকে ওরা এতখানি সঙ্কুচিত করে তোলে।

ভোর হলেই কপোতটা বেরিয়ে যিয়ে নিতান্তই পদুর চালার উপর গিয়ে বসে। মিষ্টি সুরে ডাক দেয়।

কু-কু-কুরু, কুরুম-কুরুম-কুরুম।

নীলার চোখে তখন শেষ ঘুমের আমেজ জড়ানো। পাতলা ঘুমে কপোতের সে ডাক কানের ফাকে মধু ঢেলে দেয়। আরও আরও ওনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কু-চারবার ডেকেই ডাক দেওয়া বন্ধ করে দেয়। দুষ্টি কপোতীর ঘুম ভাঙানোর জন্য গান। জেগে উঠে কপোতী, আড়মোড়া ভেঙে বাটির উপর বসে নীলারও। আর ঠিক সেই সময় কপোতটা এসে কপোতীর একেবারে পা ঘেঁষে ঠোঁট নাচাতে নাচাতে কী যেন বলে। অমনি উড়ে যায় কপোতী এবং কপোতটা ঢুকে পড়ে বাসার ভেতরে।

দিনগুলি ওরা ঘন্টা তিনেক দেখে যায়। সবচেয়ে ভালভাবটা দেখে আসে। সেও ফিরে এলে প্রথমে নিতান্ত পদুর চালার উপর বসে ডাক দেয় এবং একটু পরেই কপোতের পা ঘেঁষে দাঁড়ায়। কপোতটাও ঠোঁট নাচাতে নাচাতে কী যেন বলে এবং তখনই কপোতটা উড়ে যায়। বাসা খালি করে কপোতী।

দুপুরে খাবারের দিকে মনে হয় সবাই-ভোজ সমাধা করে ফিরে আসে কপোত। এবার কপোতীর আসা অপেক্ষায় থাকে। ততক্ষণে নীলাও স্নানাহার সমাধা করে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে চোখ মেলে। ঘুটির দিকে দুপুরে একটা ঘুম দিলে আর জেগে পড়া যায়।

বিকেল হলেই নীলার চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসে। সে সময় কপোতের ঘুরুর ঘুরুর মিষ্টি আওয়াজটা বিরক্তি উৎপাদন করে। নীলার তখন মনে হয়, সবচেয়ে রহস্যময় দুপুরে একেবারে অচল।

সন্ধ্যের দিকে দুজনেই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। উঠানময় পায়চারি করে, পদে ধুলা মেখে প্রসাধন করে, দুজনে পাখনার আপটা ঘুলে নাচানাচি করে, তারপর দুজনে যেন চুক্তি করাকরি করে ফিরে আসে বাসায়। ঘুমিয়ে পড়ে যে যার জায়গায়। নীলার ঘুমটা ভাল লাগে। তাদের মিল, শান্ত ও সুখী নীড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

পরদিন সকালে তাঁকে তাঁকে নীলা কপোত-কপোতীর সাসারটাকে দেখতো—যখনার বিনোদনের [illegible] দিনগুলির সেই একঘেয়ে ঘটনা, শুধু নীলার চোখে [illegible] দৈনিন্দিন ধরা পড়তো। একটা অভিনবত্ব। তাই পড়ন্ত দুপুরে যখন একঘেয়েমি আসে তখন প্রসাধ চোখ-দুটিকে মেলে ধরে কপোত-কপোতীর দিকের দিকে। চোখের সামনে ধরা পড়ে জীবজগতের করুণ ও মর্মন্তুদ এক চিত্র—সন্তানের জন্যে বেঁচে থাকার প্রচণ্ড প্রয়াস। সন্তানে নয়, অন্যের এক নিয়মে আপনিই পরিচালিত। এর ব্যতিক্রম করার ক্ষেত্রে নেই। এমনকি মানুষের বেলায়ও না।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সকালে নিতান্তই পদুর চালার উপরে কপোতীর কুরুম কুরুম ডাকে ঘুম ভেঙে গেল নীলার। এলার্ম দেওয়া ঘড়ি যেন। রোজ সকালে—একই সময়ে। নীলা উঠে পড়লো। বাসাটার দিকে তাকাতে দেখলো, কপোতীটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মাথা খাড়া করে ওনছে কপোতের ডাক।

ঠিক তখুনি দেখলো, জানা কাপটাতে কাপটাতে চালার উপর থেকে পড়িয়ে পড়লো কপোতটা। নীলা ঘটিতে মুখ ধোয়া ফেলিয়ে এলো। সিড়ি ভেঙে এবং লাফের মোর ঘুলে যখন নিতান্তই পদুর চালার পাশে এসে দাঁড়ালো, তখন দেখলো কপোতের রক্তহীন দেহটা কুরুম ওলটি বিধিয়ে পাখী মারার ওস্তাদ ওপাড়ার গোবরার হাতে।

নীলার মাথার ভেদ আওন ধরে গেল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গোবরার হাত থেকে ওলটিটা ছিনিয়ে নিয়ে সেই ওলটিতে ঘুলে থাকা রক্তমাংস কিতা দিয়ে তাকে পেটাতে শুরু করলো সাঁই সাঁই করে। "মারা গো", "মরলো" বলে চিৎকার করে উঠলেন গোবরা। তবু নীলা তাকে রেহাই দিল না। আরও জোরে জোরে পেটাতে শুরু করলো।

চিৎকার শুনে ছুটে এলেন বাবা, ছুটে এলেন নিতান্ত বাবু। ভয়ে ঘৃত কপোতটাকে পড়ে থাকতে দেখে মুখতে পারলেন সবই। কপোত, কপোতী এবং তাদের ডানার কথা বৈনিক জবানে জানায় নীলা। আজ গোবরা ওদের একটিকে মেরে ফেলায় তার ডানশিটে-জবানে মেজাজ ফেপে উঠেছে। বাবা জোর করে নীলার হাত থেকে ওলটিটা ছিনিয়ে নিলেন। নীলা ছটফট করে একবার তাকালো সবার দিকে। তারপর ছুটে পালিয়ে গেল ঘরে—তার নিজের ঘরে।

বন্ধার মত রক্ত ঘরে এলো নীলার। বালিশে মুখ ওঁজে ওয়ে পড়লো। একবার তাকালো বাসাটার দিকে। দেখলো, কপোতী নেই—শূন্য বাসায় ঘুটো নীলাও ছিল। ঘরে তার ঘরে উঠলো নীলার মন। কপোত-কপোতীর সাসারটা তারবারে ঘরে গেল মনে। ঐ ওলটি বেঁধা কপোতটার মতই নিজেকে ছটফট করতে লাগলো।

এক সময় কপোতের তাবনাকে মন থেকে ঘুরে ফেলার চেষ্টা করলো নীলা। ওরা মরলে পৃথিবীর কতটুকু ক্ষতি হয়? মরতেই তো ওদের জন্ম। মুমানু মানুষের জন্য সবচেয়ে ওরু শত্রু। মানুষ, সাপ, বেড়াল, পেঁচা, বাটাস—সবাই। আর না মরলে কখন আরও না মরার হাতে মরছে। ঐ কপোতীটাও মরবে। মরবে তাদের সাহের বাচ্চাগুলোও।

তবু এই বয়সের তার কোমল বুক থেকে ঘাতটা যেন কিছুতেই নড়তে চায় না। বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায় মন। ভাবে, সে যদি কোনদিন বিচারকের আসনে বসে, তাহলে ঐ গোবরাদেরও ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে দেবে। হ্যা, সে পুলিশ অফিসার হবে। দুর্বৃত্তদের ধরে ধরে জেলে পুরবে। যেন দুর্বৃত্তকে পতপাখীর ঘর ভাঙতে দেখে না।

পরদিন সকালে সেই একই সময়ে কপোতের করুণ কুরুম ডাকেই ঘুম ভাঙলো নীলার। নীলা অবাক হলো। জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলো নিতান্ত পদুর চালার উপরটা। আশ্চর্য তো! এ যে সেই কপোত! গোবরা তাহলে কী জন্য কপোত মেরেছিল! তা কেমন করে হয়। সে যে নিজের চোখে দেখেছে: তাহলে কী বিয়ে আবার আসবে কপোতটা চালার উপর উড়ে গিয়ে তার সঙ্গীটির জন্য সকরুণ আর্তনাদ ঘুলবে?

না, তাও তো নয়! এই তো কপোতীটা এখনও বাসার ওয়ে আছে এবং বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তাহলে কী অন্য কপোত!

একটু পরে কপোতটা কপোতীর পাশে এসে দাঁড়াতেই সন্দেহের নিরসন ঘটলো। হ্যাঁ, অন্য কপোত। একটি পা ওর খোঁড়া। খোবরে আরও ওলটির আঘাতে পা খোঁড়া হয়েছে ওর এবং সঙ্গিনীর সঙ্গে উঠোনে থাকে দু-একবার নীলা দেখেছেও।

কপোতীর প্রতি মমতা বিদ্বেষের রূপে উঠলো নীলার। ঘৃণার মুখটা ফিরিয়ে নিল সে। এ কী ঘৃণিত জীবন এদের? একটা নিরও পত হলেই তারাই অন্যে অপর এক কপোতীর ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিল কপোতটা। লাকি খোঁড়া কপোতের কপোতীটাকে কেউ মেরে ফেলেছে নিকৃষ্ট প্রাণীর একেবারে নিকৃষ্টতম ব্যক্তির।

পরক্ষণে নীলার মনে হলো, সে একটা বোকা। এমন আশ্চর্যজ্ঞেব সে কেমন করে আশা করে ফুলে একটা প্রাণীর কাছে? কতটুকু ওদের বন্ধিত্ব। সেই নিম্নমানের মস্তিষ্ক কী বুঝি, বিবেক ও বিবেচনাশক্তির অধিকারী হতে পারে? ওরা যা করে সবই তো ওদের বলে রক্ষার তাগিদে—ওদের বলেবারার নিয়ামক জিনের নির্দেশে। প্রীতে পড়েছে সে। অতএব দোষ দেওয়া যায় না কপোটিকে। উচ্চ আশ্চর্যবোধ ওধুমাত্র মানুষের জন্য।

ভালই, ভালই হয়েছে। কপোতীটাকে না ফেরে ডিমে তা দিতে দিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগতে হবে না। অকারণ যখন বড় হয়ে উড়ে পালাবে তখন কপোতীটাকে একা একা কাল কাটাতেও হবে না। ওদের জীবনের ছন্দ তো পূরক। মানুষের চোখে কিতার করলে হবে কেন। মানুষ নিয়ে ছোট বাঁচতে হয় না, কেউ কাউকে বোঝপার ভয়ে থাওয়ায় না, ভবিষ্যতের জন্য—সন্তানের জন্য সঞ্চয়ও করতে হয় না। তাই মৃত্যুর আগে বিচ্ছেদও ঘটে না। মৃত্যুতে বিচ্ছেদ যখন ঘটে তখন সেই বিচ্ছেদকে আমলও দেয় না। জনম আর মরণ দুটিই ওদের জন্যে সমান। জন্মের সময় কেউ উলু দেয় না, মৃত্যুতেও শোক মিছিল করে না। যতদিন বাঁচে ততদিন কেবল জোট বেঁধেই থাকতে চায় মর্ম জানে না, নরকও নাম ওরা। নরকের যন্ত্রণা। পতপাখী, কীটপতঙ্গ সবাই। মর্মে শুধু মানুষের অধিকার।

এবারও রোজ সকালে সেই একই পুনরাবৃত্তি ঘটে। দুপুরে এবা বিকেলেও। সেই চালার উপর থেকে ডাক দেওয়া, সেই বাসার ভেতে দুজনের মিলিত হয়ে বসা, সেই বিকেলে প্রসাধন শেষে দুজনের বাসায় ফিরে আসা, কপোতীর বাসা আগলে বসা, সেই পুনরাবৃত্তি। নীলার আশ্চর্যবোধ অনেকটাই ভাটা পড়ে গেল।

একদিন দিন ফুটলো। বৃষ্টি ঝরছে। একেবারে

বিভিন্নরী। গায়ে সামান্য পালক থাকলেও পলা লাল লাল—একটাও পালক নেই। ঠোঁট ছাড়া মাথার অস্তিত্বও যেন নেই। পেটে যেন বিশ্বব্রাণ্ডি ক্ষুধা। সবসময় হাঁ করে থাকে উপরের দিকে।

খোঁড়া কপোত এবং কপোতীর মধ্যে এবার ভর্তি হুড়োহুড়ি। সবসময় খাবার এনে ওদের মুখে ধরতে হয়। একজন যায়, একজন আসে। প্রায় সারাটা দিন এইভাবে কাটে। খোঁড়া কপোত এবং কপোতীর মধ্যে সাক্ষাৎ বড় একটা হয় না। বাচ্চাদের মুখে খাবার গুঁজে দিয়েই হাওয়া হয়ে যায়।

ছাতে বাসাবাও থাকে না কপোতী। বাসায় ঘুমিয়ে সাঁঝবেলার উপর ঘুমিয়ে ঘুমে ঘুমে ছাত কাটায়। ভোর হলেই উড়ে যায়। আগের মত ঘুমের ঘুমের জন্যও বড় একটা ও-হাতে পায় না নীলা।

যন্ত্রণা বড় হলো। একদিন উড়তেও পারলো। এতদিনে ডানা হয়েছিলো তারা সবাই। ঘুমেও কেউ এল না আমার। এমনকি রাত্রি যাপনের জন্যও নয়। ভাত কাটাতো নিমগাছের ডালে নয়তো পোষনে ঘরের গায়ের জানালে। সকালে বিকেলে উঠানে ঘুরে বেড়াতো। কখনও বা চালার উপর বসতো। ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে পড়লে ঘুমের ঘুমের হাকও মিত।

বিকেলে ঘুলো মেখে স্নান কাপটাতো সবাই। ওরাপাশ চার-চারটা বিলে খুব ঘুর ঘুর করতো এখনে ওখনে—চালার উপরে, নিমগাছের ডালে, ঘরের গায়ের জানালে, পুকুর পাড়ে, আম গাছটোতেও। কিন্তু সব দিনে একটা গায়ে হাত বসাতো না। চার-পাঁচদিন পরে পরে সাদনের নিমগাছটাতে দেখা যেত। ওরা বড়ই ঘুরে সরে থেল, তবুই নীলার খুশিটাও কিনে হয়ে উঠলো। আয়নের বোল আনাই ভাটা পড়ে থেল। খোঁজখবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনও অনুভব করলে না। অনেক পাখী বন্ধু হয়ে অনেকটা দিন অতিথি হয়েছিল ওদের, আবার অনে ফিরে গেছে। হয়ত আগামী বছরে এই সময়ে ওদের যেন একটি জোড়াকে ফিরে আসতে দেখা যাবে।

একদিন নীলাকে অবাক করে দিয়ে এলো কপোতীটা। হাঁ, কপোতীই। অনেকদিন পরে সামনাসামনি দেখছে। চিনতে ভুল হয়নি নীলার। ডানা দুটো না হয় সাদাদাদ হয়ে ঘর খাঁচার ঘমুর মেশার মতোল হয়ে ওদের একজন ছেড়ে ঘুরে হয়ে গেছে। কিন্তু খোঁড়া কপোতটা—কপোতীর পরবর্তী জীবনসাথী?

নীলার মনের মধ্যে নতুন করে ঘোলাপানি ওরু হলো। আবার ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো কপোতীটার উপর। একটা ঘটনাও লক্ষ্যনের মনে। তবে কী ঐ গোবরারা বিশে ফাঁদ পেতে ধরা কপোতে ধরে তাদের ধরাও না ধরাও হুতে তিন-তিনটে অরেছে এবং কপোতীটা কোনও রকমে বেঁচে গেছে।

নীলার মনে হলো, গোবরা মরেনি। মারতে পারেও না। নীলা তাকে পরী পরী করে আদর করে নিয়েছে, খাবার খাওয়ার জন্য কল টাকা খুব দিয়েছে, কিনেটে ঘনেকোটও দিয়েছে। তবু সেদিন জিজ্ঞাসা করলো গোবরাকে—চারটে কপোতের একটাকে দেখছি, আর কিনটে গেল কোথায় গো? খুঁটি খা জোরের মতোল কেউ কী ওদের মেরে ফেলেছে!

গোবরা জবাব দিয়ে বলেছে—এই তোমার পা ছুঁয়ে কালি দিবি, আমি মারিনি। মা কালীর দিব্যি, মা সেতলার দিব্যি!

—তাহলে গেল কোথায়? একজন খোঁজ নিয়ে হাত দেখি, কেউ দেখেছে নাকি? দু-খুটো চকেলেটো দেব তোকে!

গোবরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। এক সময় বললো—পাড়ার ঘারা ওলতি চালায় তাদের আরও হাতের টিপ ভাল নয়। একা আকাশই আগে ফাঁদ পেতে কপোত ধরতো। এখনও বিদ্যা চালায়। ফাঁদ পাতে না। মাসখানেকের ভেতরে ওটাকে কপোত মারতে শুনিনি। ওরা সব উড়ে পালিয়েছে নীলাদি।

নীলা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—বলছো।

—হ্যাঁ নীলাদি। সবে মাঠ থেকে ধনে তোলা শেষ হয়েছে, বর্ষাও আসেনি। মাঠঘর এখন ধানের হড়াহড়ি। ওরা যেন দূরে গাঁয়ে পড়ে থাকবে শুনি! ফাঁকা মাঠে, মাঠ পুকুরের বৈ বৈ জল, বাঁধের উপর বাবলা গাছের সারি, পাখীরা কী সে খোঁজ রাখতে পারে নীলাদি!

কথাটা নীলারও মনে ধরলো। কিন্তু ঐ কপোতী। এত খানা, এত সুখ, এত স্বাধীনতা, এত সঙ্গীসাথী থাকা সত্ত্বেও ফেল না কেন? কিসের কিরেও ফিরে এলো কেন? মনে মনে গবেষণা শুরু করলো নীলা। কিন্তু একটাও কারণ খুঁজে পেল না।

কপোতীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো নীলা। সন্ধ্যার দৃষ্টি রাখলো তার গতিবিধির উপর। স্নানের ঘুটি এখনও শেষ হয়নি। তবু পড়া, গাওয়া, ঘুমানো এবং উড়ে এসে ঘুড়ে বসা ঐ কপোত পরিবার। খাবার ঘন্টার আবেদন নীলাকে ঘরের খুটোটিও নাড়তে হয় না। মা বিরক্ত হন। মুখে মাঝে বকাবকা করেন, আদর তুলে রেখেছেন বলে খাবারে ভর্ৎসনা করেন। নীলা মায়ের কথা আদৌ কানে তোলে না। নির্বিকারভাবে তার নিজের জগতেই মগ্ন হয়ে ওঠে।

কপোতীর ডাক শুনে প্রথম প্রথম নীলা ভেবেছিল, কপোতীটা বুঝি তার দ্বিতীয়বারের সঙ্গী খোঁড়া কপোতটাকে ডাকছে। কিন্তু একদিন উঠানে সদ্য ঝরা খোঁড়া কপোতকে দেখে তার মাথায় যেন চাবুক পড়লো। তার আগাগোড়া সমুদ্র ধারণা ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেল। মনে হলো তার সমুদ্র ধারণা মিথ্যে। তার সন্ধ্যের মিথ্যে, তার মনুষ্যত্বের সমুদ্র অহঙ্কার মিথ্যে। সে বইতে পড়েছিল, প্রেমিকরা একমাত্র নীল-ডিমি এবং চিতা বাঘের মেয়েরা অন্যের বৈধমতেও পালন করে? কিন্তু ঐ কপোতীটা? কুত্র ফলে, তুচ্ছ ফলে ওদের খবর তো কেউ রাখে না!

নীলার যেন মনে হলো, পরের ঘর জ্বালিয়ে খোঁড়া কপোতটাকে সে পাকড়াও করেনি, সঙ্গী হিসাবেও নয়। তার চরম বিপদের দিনে খোঁড়া কপোতটার কপোতীই কেন পাঠিয়েছিল। হুকুত তাদের ডানাগুলো বড় হয়ে উঠেছিল এবং ওদের মা একটু সাহসোছিল। এমন নিঃস্বার্থভাবে অপরের সন্তানদের জন্য সেবা মানুষের কাছে গর্বের বিষয় হতে পারে। কিন্তু ওদের জন্যে নিত্যকলোর প্রতি সমবেদনা ও দুঃখ ঘটনা।

কপোতীটা ঘিরে ঘিরে কেমন যেন অসহ্য হয়ে উঠলো নীলার কাছে। প্রতিদিন সকালে সে নিজেই মমুর চালার উপর ছাকে একটানা—অনেকক্ষণ সেই করুণ সুরে। নড়তেই চায় না। যেন সময় একটু ঘোরাফেরা করে পুবায়ার দিয়ে আসতো এবং ডাকতো অনেকটা নিচু করে। দুপুরে রোদের তাপ আসন্ন হয়ে উঠলে উড়ে যেত নিমগাছের মাথায় নয়ত ঘরের গায়ে। বিকেল হলেই ফিরে আসতো চালায় এবং ডাক পাড়তো। ওঠে না, নামে না, গমের ঘুলোর কাণ্ড। লাগায় ধা, নাচে না, নাইতেও যায় না। কখন কী খেতো কি না কে জানে?

নীলার মনে হলো, প্রচণ্ড মর্মবেদনায় কাতর পাখীটা। সঙ্গীহীন অবস্থায় সে যেন আর বাঁচতে চায় না। সেদিন হয়ত সন্তানের জন্য সে মরতে পারেনি। কিন্তু আজ? সন্তানের ভেতরে নিজেদের অস্তিত্বকে চালান করে দিয়ে অমরত্ব অর্জন করে নিয়েছে। এর জন্য সে সাধনা করেছে, প্রণয়ের সাম্রাজ্য ভিক্ষা করেছে, প্রসাদও হলেও সে আপন সত্তার ব্যাবহার করেছে। এখন সমস্ত প্রয়োজন নেই। আত্মিলাটিক মহাসাগরের উপকূলের মত সেও অমৃতলোকের অমৃতের সন্তানের জন্য ব্যাকুল। পার্থিব সব কিছু তার কাছে বাহুল্য এবং অর্থহীন।

আরও অনেকটা দিন কেটে গেল। কপোতীটা আরও যেমন যেন মন মরা এবং উদাস উদাস মনে হলো। খায় না, ঘোরে না, মাথাও যেন তুলতে চায় না। দিনের বেশির ভাগ সময় বসে থাকে চালার উপর। এত দুরান্ত মেয়ে নীলারও ফেটে যেন চৌচির হয়ে যেতে চাইলো। একদিন সে ডেকে পাঠালো সেই গোবরাকে।

সকালে ওলতি ছুড়তেই এসে পড়লো গোবরা। কপোতীটা তখনও নিত্যই মমুর চালার উপর বসে। নীলা ম্লান মুখে গোবরাকে জিজ্ঞাসা করলো—তোর হাতের নিশানা খুব ভাল নয়রে, গোবরা?

গোবরা হি হি করে হাসলো। দাঁত বার করে বললো—সেবার একটা ওলতির ঘায়ে দু-খুটো পায়রাকে ঘায়েল করেছিলাম। হি-হি-হি।

নীলা জানে বোকাসোকা পায়রা এবং কপোতদের ওলতির ঘায়ে মেরে ফেলা কঠিন নয়। ওরা আদৌ চঞ্চল নয়, এক জায়গায় অনেকক্ষণ থাকে নড়ত ঘুত ঘুর করে। বেড়ালও কষ্ট সহজে ধরে ফেলে ওদের। গোবরা তো বন বেড়াল।

নীলা এক সময় গোবরাকে বললো—তুই সেদিনের ঐ কপোতীটাকে মেরে ফেলতে পারবি? ডেকে পাঁচটা চকেলেট খেয়ো এবং পাখীটাকেও নিয়ে যেয়ো।

নীলার মুখের দিকে তাকালো গোবরা। কথাটা যেন বিশ্বাস হলো না তার। পরক্ষণে মুখের দু-পাটি দাঁত মেলে দিয়ে হাসতে হাসতে বললো—তুমি ইয়ার্কি করছো নীলদি।

নীলা গম্ভীর হলো। বললো—না, ঠিক কথাই বলছি। অনেকক্ষণ ধরে পাখীটাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে গোবরারও হাতওলো নিসপিস করছিল। জিজ্ঞাসা করলো—ঠিক বলছো তো?

নীলার উত্তরের আর অপেক্ষা করলো না গোবরা। পলক ফেলতে না ফেলতেই ওলতি ছুটে গেল। আদের সেই কপোতের মতই পাখা ঝাপটিয়ে ডালটাতে কপোতী লুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

নীলা আর দাঁড়ালো না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল ছাদের উপর। আলিসে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেললো ঝর ঝর করে। কেঁদবার জন দুওয়ার পরে যাবার একজন আমুরে মেয়ে নীলাঞ্জনার চোখে এই প্রথম জল এলো।

আলফাঁস দোদে

শেষ পাঠ

অনুবাদ পলাশ ভদ্র

সেই সকালে আমার স্কুলে যেতে দেরী হওয়ার জন্যে খুব পেয়েছিলাম। মঁসিয়ঁ আজ ক্রিয়াপদের ওপর একটা পরীক্ষা নেবেন বলেছিলেন আর এ ব্যাপারটা বিন্দুবিসর্গ জানি বুঝতাম না। প্রথম ভাবলাম স্কুল পালাব। মাঠের ওপর দিয়ে ছুট লাগাব—সুন্দর, উজ্জ্বল এক চৈত্রের দিন। বনের প্রান্তে শ্যামা পাখির সুর আর কসাইকলের পেছনের তৃণভূমিতে প্রুশিয়ানদের যুদ্ধাভ্যাসের অনুশীলন করা যাবে, এসব কিছুই ক্রিয়াপদের তুলনায় ঢের, ঢের আকর্ষণীয় ; কিন্তু এই আবেগের কাছে মাটিবীজায় না করার মত আত্মবিশ্বাস আমার ছিল তাই স্কুল অভিমুখেই দ্রুত পদচারণা করলাম।

টাউন হলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম সেখানে নোটিস বোর্ডের সামনে ছোটখাট ভিড়। শেষ দুই বছর আমাদের যাবতীয় দুঃসংবাদ—পরাজয়, অভিযানে যা সেনাদের অনুজ্ঞা—ওই নোটিস বোর্ডের মাধ্যমেই এসেছে। চলতে চলতেই ভাবলাম এখন আবার কি ঘটতে পারে।

কামারের সামনে মুটিটি তার শিক্ষানবিশকে সদ্য লিখে বিজ্ঞপ্তিটা পড়ছিল। সেই দেখল আমি একাকীত্বে চলতে দেখেছি, অমনি চেঁচিয়ে উঠল।

"তাড়াহুড়ো কিছু নেই ছোট্ট খোকা ; হুকুম সময় পরে", ভাবলাম, ঠাট্টা করছে আমার। তাই আরও তাড়াতাড়ি চললাম খেলার মাঠ পেরোনোর পর আমি হাঁটিবার ঘোষণা।

স্কুল তখন আমে ক্লাসরুমে এমন একটা হৈ চৈ হয় যে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়েও তা শুনতে পাবে। ডেস্ক বন্ধ করার আর খোলার শব্দ। গলাগলি ভিকারের জন্যে, মুখস্থে আঙুল দিয়ে পাঠ পড়ার হট্টগোল। একটানা বার্তাবাহকদের ট্রাফিকলোর্ডের ওপর তলায় দিয়ে আসতে করে যাবতীয় শব্দ বন্ধ করতে নির্দেশ। এসবের ওপর বিরক্ত হয়েই আমি ভেবেছিলাম নিজের ডেস্কে সবার আগেভাগে পৌঁছে যাব, কিন্তু এদিনের সকালে সব কিছুই আমার শত্রু। যেন এটা প্রতিদিন মতিও খোলা জানলা দিয়ে আমার সংক্ষিপ্তিদের নিজেদের নিজেদের ডেস্কে এবং হাতে সেই সবীহ জাগানো তলায় নিয়ে মঁসিয় আমলকে বিবর্তিহীন পায়চারি করতে দেখেছিলাম। সবজা খুলে পা দিলে টাটিল সেই বৃদ্ধা ধরতে প্রচণ্ড ফরলাম। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কি রকম ধাক্কা নিয়েছিলাম আর কি রকম লজ্জিতও ছিলাম।

কিন্তু ওর পাওয়ার মত কিছুই ছিল না। মঁসিয় আমল আমার দিকে তাকালেন সম্পূর্ণ ধাতস্থীন চোখে এবং মন্তব্যও করলেন—"তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় যাও ফ্রানজ; আমরা তোমাকে ছাড়াই শুরু করে দিয়েছিলাম।"

বেঞ্চ টিঙিয়ে নিজের ডেস্কে গিয়ে বসলাম। সরকারের প্রথম ধাপ ডিঙিয়ে উঠে, তখনই লক্ষ করলাম মঁসিয় আমল সবুজ কোট পরে, ঝুঁটিওলিও চকচকে ইস্ত্রি করা, নিজের ব্যক্তিগত কয়া ফল পাজামা—এগুলো সাজঘরের পুরস্কার বিতরণ বা বিদ্যালয় পরিদর্শনের মত বিশেষদিনেই উনি পরতেন। সারা ক্লাসটা অস্বাভাবিকরকম গুরুগম্ভীর। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের হল সাধারণ খালি জায়গা বেঞ্চগুলোতে অচেনাজন গ্রামবাসীকে দেখে, অন্যদের মত আমিও অবাক হয়ে গেলাম, বৃদ্ধ ওয়েস্ত তিন কোণা টুপি পরিহিত, ভূতপূর্ব মেয়র, প্রাক্তন ডাকহরকরা এবং আরও অনেকে। এদেরকেই বিশেষ অভিব্যক্তিতে। ওদের একটা জীর্ণ, পুরনোদে বানান-বই নিজের হাঁটুর ওপর খেলেছে। পাতার ওপর আর চশমা নিচু।

বকমসকম দেখে যখন আমি হতভম্ব, মঁসিয় আমল তাঁর ওপর উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই একই নম্র অথচ বিষণ্ণ সুরে বললেন "ছেলেরা, তোমাদের শেষবার এটাই আমার শেষ পাঠ। অর্ডিনি থেকে আদেশ জারী হয়েছে যে আলসাস এবং লোরেনের প্রদেশের স্কুলে শুধুমাত্র জার্মান শেখান হবে। তোমাদের নতুন শিক্ষক ও কাল এসে পৌঁছবেন। সুতরাং এটাই তোমাদের শেষ ফরাসী অধ্যায়। তোমাদের মনোযোগী হতে অনুরোধ করছি।"

আমার শেষ ফরাসী পাঠ। অথচ এখনও আমি ঠিক মত লিখতে পারি না ; আর কখনও শেখা হবে না এর মধ্যে আর ফুরসতের হবে না! কি দুঃখ আমি, কত সময় নষ্ট করেছি পাখির ছানা খোঁজা কিংবা এবকমভাবে ছুটির ওপর পড়াশুনি ফেলে। ব্যাকরণ আবার পরিত্র ইতিহাস—এখন মনে হচ্ছে ভয়ঙ্করের পুরোনো বন্ধু—কিছুতেই হাতছাড়ি করতে প্রস্তুত নয়।

যেমনি মঁসিয় আমল ; তিনি ক্লাস যাবেন, তাঁকে তার দেখতে লাগ না, এই চিন্তাই তিনি তা না নিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর ফলারের বাড়িওলো অবধি ঘুলিয়ে গিল।

যোগ্য। শেষ ক্লাসের গৌরবে সম্ভবতে সুন্দর পোশাকে তিনি সজ্জিত। এমনকে মুক্তোর বৃদ্ধ গ্রামবাসীরাও আবার পেছনদিকে কেন বসে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল একটি সবাই নিজে বলে উঠতে চায়ই, ভুলে না আসতে পারার জন্য আমাদের মাপ করছেন। চরিত্র সময় ধরে নিজেদের পরিত্রাণ করে যাওয়া এক শিক্ষকের প্রতি এই ছিল তাদের সম্মান জানানোর রীতি ; থেকে অন্য জানালার একটি তাদের পড়তি—খুব শীঘ্রই যে দেশের সাথে কিছুর তাদের হবেছে।

এই সব চিন্তাই আমাদের আমার নাম না ডাকা অবধি—এবার আমার পালা বলার পালা। সম্পূর্ণ ক্রিয়াপদটি আমার মুখ। উচ্চ কণ্ঠে বিবর্তি বিস্তীর্ণভাবে বলা উচিত ছিল। কিন্তু শেলাতেই হোঁচট খেলাম, দাঁ নড়বড়ে করে উঠল লজ্জায়, বিক্ষোভে, বাধা তুলে তাকানোর সাহস অবধি পেলাম না। ওলাম মঁসিয় আমলকে বিবর্তিহীন পায়চারি করতে দেখেছিলাম। সবজা খুলে পা দিলে টাটিল সেই বৃদ্ধা ধরতে প্রচণ্ড ফরলাম। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কি রকম ধাক্কা নিয়েছিলাম আর কি রকম লজ্জিতও ছিলাম।

"তোমার ভিকারের করব না, ফ্রানজ, এটাই তোমার যথেষ্ট শাস্তি। প্রতিদিন আমরা—অনেক সময় আমে, কাল নিয়ে নেব। এখন নেব কি ভাল। এটাই চরমতর শাস্তি। আলসাস আমাদেরদিল—তাই কালকের জন্য সব কাজ আমরা ফেলে দিতার এখন এই লোকগুলো আমাদের বলছে—'কি? তুমি নিজেকে ফরাসী বলে দাবি কর, তোমরা আর নিজেদের ভাষা পড়তে বা লিখতে পারবে না।' ফ্রানজ, এ জন্যে তোমার কোন দোষ নেই। আমাদের সবাইকেই চিরদুঃ হওয়া উচিত এ কারণে। তোমার মা-বাবা তোমাদের স্কুল পাঠানো উৎসাহী ছিলেন না। তারা এর পরিবর্তে তোমাকে মাঠে বা কারখানায় কাজ করাতে চাইলেন। অবশ্য তাতে তাড়তি কিছু পড়ার আসত। আমি নিজেও কি নিজের কর্তব্যে অবহেলা করি নি? আমি তোমাদের পড়ানোর সময়ে আমার আঙ্গনে ফল দিতে বলি নি? টাউট বাগ বলতে অবশ্য সময়, তোমাদের খেলা দিন ছুটি দিতে কি ইতস্তত করতাম?"

এরপর মঁসিয় আমল ফরাসী ভাষা সম্পর্কে কথা শুরু করলেন, দুনিয়ার সুন্দরতম ভাষা, সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং প্রাঞ্জল ; আমাদের নিজেদের ভাষাই এক মজা করতে হবে। এ ভাষা তোমার মন, কখন ক্রীতদাসের হাতে তার তালাগুলোর চাবির মতই মূল্যবান তার নিজের ভাষাকে রক্ষা কর। ব্যাকরণ পরবের পর এল লেখার প্রশ্ন। মঁসিয় আমল তাদেরও একটি করে পাতা দিলেন হাতের লেখা চর্চার নমুনা হিসেবে। পাতা জুড়ে লেখা, "ফ্রান্স, আলসাস, আলসাস," মুক্তোর মত গোটা গোটা অক্ষরে। আমের ঘরে ঘরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমাদের প্রতি ডেস্কের ওপর ঝোলান ঝুলছিল, সুন্দরিন হেলিকপ্টার, তোমরা যদি দেখতে কি যত্ন আমরা নিয়েছিলাম। আর নীরবতা! তুমি শুধু পেনের খসখস শব্দ ছাড়া আর শব্দ শুনতে না। একটা সময় দুটো বড় পোকাই ভোঁ-ভোঁ করতে করতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আমের কেউ ভ্রুক্ষেপ নেই এমনকি সবচেয়ে ছোট পড়ুয়ার মনও অঙ্কন মনোনিবেশে লিখছে, যেন তারা ভাবনাই লেখার ইতিমধ্যে সড়পড়। ছাদে পায়রার দল বকবকম করছে ফেমে ফিসফিসে আমার ফুক চিরে ফেরিয়ে এল—"এদের কি আমাদের করম করম লিখতে হবে!" যখনই চোখ তুলে তাকাচ্ছি—সেখানি মঁসিয় আমল চেয়ারে স্থির নিবদ্ধ হয়ে বসে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন ; যেন এই ছোট্ট স্কুলবাড়ির খোটাটাই উনি স্মৃতিতে নিয়ে যাচ্ছেন। ভাবছে দেখি—পনর বছরে ধরে একই শ্রেণীকক্ষের একই জায়গায় বসে আর নিজ পেয়ে। দৃষ্টি প্রসারিত করলে সড়কের সামনের খোলার মাঠটা বছরে আসছে।

খুব কমই পরিবর্তন ঘটেছে ; বেঞ্চ আর ডেস্ক ঘসি চকচকে মসৃণ করসের ব্যবে জীর্ণ, আইবের প্রবেশদ্বার পথগুলো বড় হয়েছে, তাঁর ছাড়ে খোওা লতাগুলো বেয়ে উঠেছে—জানালা বেয়ে তা এখন ঘরে ঢুকে পড়ছে। বেচারা বৃদ্ধের এসব ছেড়ে যেতে বুক ভেঙে আসছে—শুনতে পাচ্ছেন তাঁর যেন ভাববার করছেন ঝিলিমিলগুলো পেরোচ্ছেন, কল তাঁদের চলে যেতেই হবে, এই শেষ ছেড়ে করসরের মত।

তা সত্ত্বেও, ক্লাস শেষ করার ধৈর্য তাঁর ছিল। শেষের পর ইতিহাস, তারপর ফুদেবের ঘান, "আ, ব, বি, যে দুঃ একসঙ্গে সমস্বরে গেয়ে উঠল।

তবের পেছনে বৃদ্ধ ওলার চলছে পরে, মুক্তোতে আমার বই-টা তবে যখন পড়ে আছে। বেঞ্চলে মুক্তোর, তারও কি প্রাণপণ চেষ্টা ; আবেগে গলা ঝাঁপছে। আমরা যত হেসে ফেলেছিলাম তাকে দেখে ; প্রথর তত্ত্বাও যায় যাচ্ছিলনা। শেষ ক্লাসের একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল যা আমি কোনদিন ভুলব না।

হঠাৎ গীর্জার ঘড়িতে বারটা বাজল, ওক হল জুমার্স মেরীর ভজনগান। একই সঙ্গে প্রুশিয়ানরা, তাদেরও কুচকাওয়াজ সমাপ্ত। আমাদের জানলার নীচেই তাদের ট্রাম্পের শব্দ। বিবর্ণ, কিন্তু মঁসিয় আমল উঠে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে এত বিশ্বর্তে দেখি নি। মনে হচ্ছে, বলছেন, "আমি...আমি" তোর একটা ভার তাঁর আছে, তবে শেষ তবের হোঁচট খাচ্ছেন।

তোর তবে ব্লাকবোর্ডের নিচে ঘুরে গেলেন, এর খড় চক হাতে, সর্বশক্তি সাহস তবে, লিখলেন, গোটা অক্ষরে "ফ্রান্স চিরজীবী হোক।" বেয়ারাদের দিক মুখ ফিরিয়েই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, কথা না বলে, আমাদের দিকে হাত নেড়ে নির্দেশ দিলেন, "শেষ, এবার তোমরা যেতে পার।"

আলফাঁস দোদে (1840-97) বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক, নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা উপন্যাস 'লেত্র দ মঁ মুলাঁ' (Lettres de mon moulin) জনপ্রিয়তার।

আতঙ্ক

পালাসিও ভালদেসক
অনুবাদ আশীষ দাস

"এখানে, অন্তত যেন দেখেছেন, অন্তরাত্মা সমস্ত একজন খুনী।" "সেটা বিবেচ্য, তবে ইলিয়াস।" তার গ্রামে ফিরে যাওয়ার ঠিক আগে ফ্রেড এসে হাজির হলেন।

টেক্সিকো অপারেশনের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তারক্ষী এবং অবশ্যই নতুন মানুষ হলেন জন ইলিয়াস। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যে সে কি ওভাল পার্কে বেড়ে ওঠেনি? তার আচরণ (উপস্থাপনা) ভঙ্গি তাকে ওভাল পরিবারের করার ক্ষমতা রাখে।

"হ্যাঁ, মানব, জীবনে এক একটা মুহূর্ত আসে যখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ও

"বেশ, বেশ আমাকে বলুন।" আমি বললাম, মুখে হেসে বেশ গর্বের এবং কৌতূহলের ভাব ফুটিয়ে তুললাম।

সময়টা ছিল '৭৮-এর শীতকাল। চাকরী খুইয়ে সুযুপ চিন্তায় আমার এক বিবাহিতা বোনের কাছে গিয়ে বসবাস শুরু করতে হল। কাজ খুঁজতে গিয়ে, ভবিষ্যতের মতো ঘুরে বেড়ানো, নিউনিসিপ্যাল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারীর অনুলিপিকারের চাকরীটা জোগাড় করে সপ্তাহ কয়েক আগে ঘুরে। প্রতিদিন নিয়ে ওরে সপ্ত অফিসে নৈশভোজ শেষ তিন বছরের নবনৈতিক বিদ্যালয় ওটাকে তখনও শব অন্তরাত্মা অবসর

ডোনা নিভ্রস, হুবেওতের পরীক্ষিতা, প্রথম সন্তানী বিবেচ্য নহিলা, একটা বয় স্কাউটের বর্তমান-হয়েই সম্পর্কিত প্রতিবেশী। বাড়িতে ঢোকবার মুখে হাতলওয়ালা পাথরের সিঁড়ি, অন্ধকার। ঠিকানা সাড়ে নটায় আসতে ওই বাড়িতে পাওয়া যাবেই। তন জিজ্ঞাসু দিচ্ছেন—নিয়োগটা বিকেলে শুধু বিশ্বাসের লোকেন অফিসার। প্রতিদিনই নিয়ম করে ঠিক বাড় নটায় আসতেন। সাড়ে বারটায় পর বাড় ১২টা বা আরো বেশ কিছু সময় একসাথে আসতেই ওখানে পাওয়া যেত ডোনা নিভ্রসের বাড়ির গেটের কাছ বেরোতেই তাঁর চাকরানী আরেকটা মিটিয়ে দিল। এটা রোজ ওদের নিয়ম। ডেমুখর সামনে প্রথম অন্ধকার। বাস্তায় লাম্পপোস্টের থেকে টিমটিমের মতো আলো ঝলমলে ছিটিয়ে চেয়ে দেখেছে।

বাস্তায় লা ফেললাম। বলতে কি মাথার টুপির উপর এত জোরে কি একটা যেন আঘাত পাওয়া। টুপিটা নজের ওপর এসে পড়ল। আমি ভয়েতে অসাড় হয়ে ফেওয়ালের ওপর পড়ে গেলাম। একটা চাপা হাসির শব্দ কানে এল। ভয় কাটানোর জন্য নজের ওপর থেকে টুপিটা টেনে নিলাম। "ওখানে কে হয়ে" জোরে ভয় দেখানো মরে চীৎকার করলাম। কোন উত্তর নেই। মাথার অনেক ওপরে সন্তর্পণের কথা এল।

"আমি কি অন্যায়ের পাত্রার পড়েছি?"

"কয়েক দরজার ছেলেরা আমার পাশের আনন্দ সৃষ্টি করতে চায়।"

"ইয়াঙ্কি নেবে কেন বন্ধু ঠাট্টা করছে।"

ডোনা নিভ্রসের বাড়ির গেটের কাছে আসতেই উপরে ছাদ জোরে আঘাত অনুভব করলাম। আর পাঁচ-ছজনের এক দল লোক বেরোবার রাস্তা আটকে দাঁড়াল।

"হেল্প!" উচ্চ আর্তনাদে চীৎকার করলাম। ফেওলো বন্ধুদের মতন আমার সামনে উচ্ছল ও

করলাম। উঃ। কি আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থা আমার।

"এই সময় দেখার মতিলি, তোর?" একজন জিজ্ঞাসা করল।

"তলিন্সকাই মরা মানুষ চুরি করতে যাচ্ছে, ও একজন ডাক্তার।" আরেকজন বলল।

কুকলম্যা ওরা যা দেখেছে, চিৎকার করলাম, "বেরোও—কুকুর। আমাকে যেতে দে ; নতুবা তোদের খুন করব।"

রোজ রাত্রিরে বেরোবার সময় ছোট লোহার মুগুর খানা সঙ্গে নিয়ে বেরোতাম। মুগুরটা তৈরির কারখানার চাকরী করবার সময় বেরবারে নিয়েছিলাম। মুগুর খানির ধরবার পরেও কিন্তু উত্তেজনা চলতে থাকল। লম্বাটে ছোট্ট সোজা দেখতে সাদাদেহির, নিশ্চল, মীরোট পাথরের মতো দাঁড়িয়ে, জানালীরা তার নিচনে আমার নিয়েছে।

"রাস্তা ছেড়ে দে।" চিৎকার করলাম।

"কেলে দে, কুকুর।" উত্তেজনা না করিয়েই তারা উত্তর করল। ওরা মরা দেখেছেই। মৃত বিজ্ঞানী হলাম। সোজা রাস্তায় এস।" বিশ্বাসের মত তাদের মোকাবেলা চেষ্টা করলাম।

"যা যা কুকুর। তুই কি মরা মানুষের রক্ত শুষতে চাহিলি? কারো পা কেটে নিতে চাহিস? নাক কান চোখ নিয়ে খুবলে কেটে নিতে চাহিস?"

—অনুযোগ প্রত্যুত্তর এল। ঠিক ঐ সময় পিছনের দিক থেকে অনেকজন আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমার নাক চাঁবড়ে ধরে এমন বিভৎস ভাবে টানাটানি আরম্ভ করল যে যন্ত্রণায় আমি চেঁচিয়ে ফেললাম। পরণের দিকে ওদের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে মৃতদেহটি ভুলে সামনের লোকটার মাথার ওপর সজোরে পতিয়ে দিতে যাচ্ছিতে পড়ে গেল। কোন আঘাত হানতে হল না। বাঙালীরা পালিয়ে গেল।

লোকটা একটুও আর্তনাদ করছে না। এমনকি বিশ্বাসের নড়চড়া তা-ও না। মৃতদেহটা সত্যিই ভারী। আমি হয়তো তাকে খুন করেছি। কাঁপা কাঁপা হাতে তাড়াতাড়ি সেলাইটি বার করে একটা ঘড়ি জ্বালালাম_অবশ্যিই।

টন-টন ভারে মাটিতে পড়ে আছে একজন মৃত মানুষ। মুখটা ওপরের দিকে। বিবর্ণ মুখের ওপর 'মৃত' শব্দটা পরিষ্কার পড়লাম। হাত থেকে সেলাইটা পড়ে গেল। আবার অন্ধকার। এক পলকের জন্য আমি লোকটার দিকে তাকালাম। সুস্পষ্টতার জন্য অন্ধকারও সমস্ত কর্দমাক্ত ছড়িয়ে যায়। লোকটা খুব মোটা, অনেক ভাঁজ পড়েছে গায়ে, পাখীর ঠোঁটের মত লম্বা নাক, পরনে নীল রঙের সার্ট, রঙিন ট্রাউজার এবং চমল। মাথায় কালচেরঙ্গ টুপি। মনে হচ্ছিল সে যেন কোন অন্ধ নির্মান কারখানার কদাকার নির্মাতা। অন্ধকারের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যে যা দেখেছিলাম এখন আমি সাদাদিন হলেও তা আবছে পারি না।

পরক্ষণে সেই লোকটার মৃত্যুর কথা ফাঁস হয়ে গেল। আমাকে পুলিসে ধরল ; আমার জন্য-আজন্মের আতঙ্ক; নারকীয় আর্তনাদ। তারপর কারাবাস। রাশিয়াবিদেশ সরকার বছরের পর বছর রাজবন্দির ভাবে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দিন কাটালো, আমাদের জন্য করা হয়েছে-এরকম কোন কারণ ছাড়াই সাধারণত। এই ধরনের মামলাগুলোতে যা ঘটে থাকে জেলা আদালতে অভিযোগ গুরুতরক নামে চিহ্নিত। আমার উকিলের আন্তরিক সমর্থনের কারণ বিচার পূর্বক আদালতের বিচারে নির্দোষী প্রমে রাষ্ট পাওয়া অবস্থা অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে জেলে যাওয়া।

এরমধ্যে আমি রাস্তার ওপর চলে এসে কোনাকুনি দৌড়লাম, কিছুক্ষন পর মুখতে পারলাম টুলি রাস্তা চলে এসেছি, আবার ফিরে গেলাম। সেলাই জ্বললাম। এক পলক পাশের লিকারের দিকে তাকালাম—হাত ওলে নিশ্বাস নিচ্ছে। কিন্তু না! —ঐ একই অবস্থায় অটিল এবং চলনেটে মুখমণ্ডলের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ও হয়নি। তাকালাম সে হয়তো মারা গেছে মস্তিষ্কে প্রবল রক্তক্ষরণের জন্য। টুপিটা দেখতে পেলাম। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ঠিক করে রাখার পরলাম। কিন্তুমাত্র দৌড়লাম না। চিতার যাবড়া কৌশলে এড়ানোর জন্য আক্রান্তদের পদ্ধতি এবং প্রবৃত্তির কথা মনে ভাবতে থাকলাম। হাত্যা করার মূহুর্তে দেখেছিল আঁকড়ে ধরে নিশ্চয়ই মত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্লাশ জেলা খুইনে পড়বার জন্য পারসিনুইত্যা ষ্ট্রিটে এর দোকানটি চললাম। কেন আক্রমণকারীর ভূমিকায় আমি নেমেছি কোন প্রশ্নের জন্য চলেনি—

"জন ইলিয়াস ; আপনি আমার কথা বলে জানেন কি—।" আলবাতিনা ষ্ট্রিটে পড়লামই অত্যন্তনিতভাবে সিটি হল থেকে একজন পুলিশ অফিসার।

মুহূর্তের মধ্যে এত দূরে লাফ দিলাম যে অফিসারের থেকে আমার দূরত্ব অনেক গজ হয়ে গেল। উর্ধশ্বাসে দৌড়তে থাকলাম। ভলস্টেকটা আমাকে চেনে। সম্বরের গ্রেপ্তে এসে থামলাম। হাঁফাচ্ছিলাম, ঘামছিলাম। হঠাৎ চেতনা ফিরল। কি পাগলামিই না আমি করলাম। আমার এই অদ্ভুত আচরণে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির কথাও সে ভাবতে পারে। কিন্তু সকালবেলা যখন অপরাধের কথা জানা যাবে সে নিশ্চয়ই অনুমান করতে শুরু করবে, তার সন্দেহের কথা বিচারককে জানাবে। বরফের মত ঠান্ডা অনুভব করলাম।

ধাক্কিকিরেই সোজা আমার ঘরে গেলাম। পকেট থেকে লোহার মুগুরটা বের করে নিতৃত আয়নায় দেখে আরো একটা ছোট্ট লোহার মুগুর নিয়ে বেরোলাম। দরজায় ঘুঘে আমার মেয়ে-অত্যন্ত বিশ্বিতাবস্থায়। ক্যাসিনোতে আমার বন্ধুর সঙ্গে একটা এনগেজমেন্ট আছে, এই অছিলাতে বন্ধুত পক্ষে ক্ষমতার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

বিলিয়ার্ড রুমের পাশের ঘরে তখনও পর্যন্ত কেন বিন্দুলোক জমেনা ঘরে আছে। ওরা অবশ্য অনেক রাত পর্যন্ত নিজেদের জন্যে আড্ডাঘরায়। প্রেমিকা ও আত্মসম্পর্কার জন্য ঘরে ওদের আসর জমজমা হয়ে থাকলাম। হাতের মুগুর ছড়িটাকে বেরিয়ে এনে পোশাক আমার ট্রাউজারের থেকে লম্বা করে ফেললাম। ঢকের মতো ঝোলালাম। আসলে ছড়ির দিকে মজর ঝোলাবার জন্য কিন্তু আমি রাখলাম না।

ক্যাসিনো প্রায় ফাঁকা হয়ে এল। রাস্তার বেরিয়ে আমার সঙ্গীদের থেকে নিজেকে আলাদা করে নিলাম। বেশ শান্ত লাগছিল। ছড়িতে ফিরেই আমার সেই প্রেমাকাঙ্ক্ষী মুখ, অনুভব করলাম এই ছলনা তাদের কেন নিজেকে অপরাধী হিসেবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুগুরের সেবাকে রাখলাম। মুগুরটা নিয়ে বিছানার ধারে বসে রইলাম। অনেক সময় পর প্রস্তুতীতে জল হয়ে বিছানায় শুতে গেলাম।

চোখ বন্ধ করতে পারলাম না। গোটা বিছানার ঘরে ধরবার এপাশ ওপাশ করতে থাকলাম। আমি নিজে এখন নিকার, উৎকণ্ঠা, ভয়, নিঃসঙ্গতা এবং নিসহায়তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে আশা করছি দরজায় করাঘাত, সিঁড়িতে জলস্টেবলের পায়ের আওয়াজ—।

"বাবা, ঘন্টা বেজে গেছে তো," সকালবেলা মেয়ের ডাকে আমার ঘুম ভাঙল। "তোমার চোখদুটো কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে! রাত্রে কি তোমার ঘুম হয় নি?"

"ঠিক উল্টে, আমার ভালো ঘুম হয়েছে," সকালবেলা মেয়ের ডাকে আমার ঘুম ভাঙল। "তোমার চোখদুটো কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে!" খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম।

এমনকি আমি আমার মেয়েকে ও বিশ্বাস করি না তারপর মর্মান্তিক উদাসঃ" "Echo o Coincidence" এখনো আসেনি?"

"কি জানি। আমি কি ভাবে বলব?

"আমাকে এনে যাও।"

মেয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কাঁপ কাঁপা হাতে খবরের কাগজের ভাঁজ খুললাম। উৎকণ্ঠার সঙ্গে চোখ বুলোলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না।

হঠাৎ ফ্রেডেরিকোর ডান দিকে লাইন কাগজে চো পড়ল "পারসিনুইত্যা ষ্ট্রিট—এ জলঘোলাজনক ভাবজন্তু ঘনীভূত।" তখনে একটা প্রবন্ধের নামকরণ করা হয়েছে, "পারীদের ভিতর ব্যবস্থার দেশের হা হইবিল," আমাকে নিজেকে সাবধে করবার জন্য চো করলাম। যোগবরণ কলমটা পড়তে গিয়ে একটা ঘরে চোখ পড়ল, তবু গ্রহণযোগ্য ঘটনা!"

একটি হাসপাতালের পুরুষ বাসীরা হাসপাতাল লালে পাগলা পরণের কিছু নিবীহ ব্যবা গোরা লোকেরে প্রায়ই সাধারণকম প্রয়োজনাব মাধ্যমে বিভিন্নরূপ অসামাজিক কার্যকলাপ যেমন মর্গে শবদেহ পাচা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত করে থাকে। পরবর্তমে ঐরব বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সন্ধানে চতুর্দিকে গোপনে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া যে নি। খবরে প্রকাশ, রাত একবার সময় ঐ উদ্ভট চরিত্র লোক শব্দমাত্র হাড়াই হাসপাতালে ফিরে আসে পরেপারে সিনুইত্যা ষ্ট্রিটের জোনা নিত্রস মেনেনাসের র বাড়ীর প্রবেশ পথের ভিতর থেকে পাহারারত শবদেহটি খুঁজে পায়।

এই ধরনের আরও পূর্ণ ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি ঘটে সেইজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে কর্তৃ হাসপাতালের উর্ধ'র তরফ আমরা সনির্বন্ধ অনুরো জানিয়েছি।

ঘাসগুলো আমার হাত থেকে পড়ে গেল। হিস্টিরিয়া গ্রস্থ লোকের মত নিজেকে আহত মনে করলাম। কিন্তু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম।

"ধ্যাঁ ; আসলে, আপনি তাহলে সত্যি একজন মৃ মানুষকে খুন করেছেন?"

"পাঁচটাই।"

বেগম

উর্দু ঘরানার গল্প

এ্যানিস হাণ্ড অনুবাদ
শি প্রা রা হা

শহর থেকে অনেক মাইল দূরে মরুভূমির রাজত্বে বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অর্থ হল ইসলাম ধর্মের হিয় বিশ্বাসী ঐতিহ্যবাহী এক চরিত্রের মুখোমুখী হওয়া যাওয়াই ; পাহাড়ের ওপর পা রেখে দেখিলাম প্রাচ বছরে হুয়া একটি দুর্গের মত চৌকা ঘরের পলেস্তারা খসতে শুরু করেছে। বিশাল প্রাসাদ থেকে 'হারেমে' কথা হত বাইরে এবা ভিতরে জনশূন্য হয়ে পড়িয়ে আছে। এমন কি প্রাসাদে রমযানের সময় যখন সেহরীতে জাগানো জরুরত হত, সেটা ছিল বেগমের জগৎ—তিনি সোনার খাঁচার বিন কাটিয়েছেন। বেগম তখন খাঁচার বাইরে কোনদিন পা রাখেননি, এখনও নয়। কর্তৃপক্ষ কেউ বেগমকে ডেকেছে। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠাননি। তিনি অদৃশ্য মানুষের মত প্রাসাদে থাকতেন যেন কেনও রহস্যকে পাহারা দিচ্ছেন।

একটা পুরনো ছোট সোফায় তিনি বসলেন, ছবি তোলার জন্যে। ফুলার ব্রাশ শাড়ি। ওজনায় শরীরের বেশিটা অংশ ঢাকা, সাদা ঘিটে কাপড় মরুভূমির গরম হাওয়ায় দুলছে, ওড়নাও সরে গিয়ে মেহেদী চোখানো লম্বচুলে চুল দেখা যাচ্ছে। আঙ্গুলগুলি রঙ্গ আর চুনির পাথর বসানো জড়োয়া ব্রেসলেটের ভারে মনে করিয়ে দিচ্ছে মণি মুক্তা রত্নখচিত অলঙ্কারের যুগকে যা নারীদের প্রকৃত ভূষণ ছিল এবং যেগুলি প্রাসাদের মর্যাদা বাড়াত। একদা প্রাসাদের চাকচিক্য ফিরে গিয়ে শুধু কঙ্কালটাই পড়ে আছে।

দৃষ্টি কিশোরী, আধুনিক আলা শহরে পোষাকে এল আমাকে আপ্যায়নের জন্য। হাতের ট্রেতে অতি বিস্কুট আর ছলদে জলের ছড়া। ওরা বেগমের তাইঝি। খেতপাথরের টিপয়ে ট্রেটি বসিয়ে আমাদের নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। খুব সামান্য খাবার খানাপানি পরিবেশিত হল। তবে বেগম এসবের ঊর্ধ্বে। তাঁর চালচলনে আভিজাত্য আভিজাত্য যা এ ধরণের রাজকীয় রীতি এখন যা তাঁর শতবছর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সাতাশি বছর বয়সের এক সময়ের মহিলা নবাব বংশের শেষ উত্তরাধিকারী তিনি ক্ষমতা, অর্থ এবং অহেতুক জাঁকজমকের জগৎ থেকে দেখেছেন। ভারতের অন্যান্য নবাবদের মত তাঁর স্বামীও পরবর্তী সময়ে উপমহাদেশ রাজনীতিতে যা অনেক সুযোগসুবিধে থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। স্বামীর রাজ্য ছিনে ছিনে বিস্মৃতির অন্ধকারে চলে গেলেও তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একই প্রাসাদে নিঃসঙ্গ দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু এই আর্থিক বা অন্য অভাব বেগমকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি সহজভাবে আমায় জানালেন—এই হল ইসলাম ধর্ম যা আমাদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আর জানবার ইচ্ছা জাগায়। এই ধর্ম আমার সারাজীবন পথ নির্দেশ করেছে। কথা বলার সময় তাঁকে গভীর মগ্ন এবং অন্যমনস্ক শোনাচ্ছিল, তিনি যান্ত্রিক ভাষীতে কথা শোনাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর অন্তর্মুখী জীবনধারাকে তুলে ধরছিলেন যা ইসলামী যান আরবার প্রতিবিম্ব। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে নিজের জীবন আর এই প্রাসাদের কাহিনী আমায় শোনাচ্ছিলেন। পঞ্চাশ বছরের রাজকীয় জীবন থেকে সরে এসে তিনি তাঁর মৈশবে ডুব দিলেন যে দিনগুলি কেটেছে ছোট্ট শহরে ধরীর গভীরে। যৌবনের স্মৃতি তাঁর কাছে যৌথমিশ্রিত হলেও উজ্জ্বলস্থিত। এর সঙ্গে প্রাসাদের জীবন মিলেমিশে আছে। সবটুকু সংক্ষেপে বললে সঞ্চিত প্রতিভাতা যা কখনো বেগমকে নিষ্ক্রিয় করেনি। বরঞ্চ তিনি সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র থেকেছেন।

শুদ্ধ ভাষার ভাষীতে তিনি শুরু করলেন—আমার জীবন কেটেছে মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারে। আমার বাবা এবং মামা খোঁড়া ধার্মিক ছিলেন। আমার মা অশিক্ষিত হলেও কিছুটা ছিল। সাংসারিক খুটিনাটি বিষয়কে যা মূলত নিজের বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতা দিয়ে। যখন চার বছর বয়সে মা আমায় নামাজ শিখিয়েছিলেন। মাঝে কেলে ভেবে আমি মেয়েদের জায়গাগুলো আলাদাভাবে নির্দেশিলাম। বাড়িতে পুরুষ শিক্ষকের প্রবেশ ছিল প্রতিবিন্ধক। পরবর্তীকালে বেগমকে মেয়েদের মেখানোর জন্য অবশ্য একজন মৌলভী নিযুক্ত হয়েছিল কিন্তু বয়সের ভারে তিনি পেখানোর চেয়ে ঘুমোতেন বেশি। বেগম সম্পূর্ণ পর্দানশীন হয়ে জীবন কাটিয়েছেন একেবারে একা। একজন মেখানে বাদ্যবী বা চাচা চাচীর ছেলেমেয়েও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল পাছে তাদের সাম্পর্কে বেগম নষ্ট হয়ে যায়। বাবা তাঁর মেয়েদের ভালভাবেও আমরা অবহেলে ঘরের মত ভয় পেতাম। আমি ঘরের অন্তরঙ্গ ছিলাম। আমার মা আমায় মূল্যবোধ শিখিয়েছিল, যা নিয়ে বিশ্বাস করত—ভদ্রতা সংযম প্রতীক্ষা এবং ব্যবহার—ধিনের ভরে গরীব যা দুঃখিত মানুষের প্রতি নরম সহানুভূতিশীল ব্যবহার।

মায়ের স্মৃতিচারণ করলেন বেগম আবেগজড়িত হলেও তার কথার গুরুত্ব নষ্ট ভাষীতে। তাঁর কথা থেকে আমি বেগমের ছোটবেলার ঝড়ি উঠোন ওদের পোষ্টীবদ্ধ পরিবারকে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। আমারও মা ঠাকুমার স্মৃতি ভেসে উঠল। বেগমের চোখেও সেই পাঠান মহিলার ছবি যে পোরাণী, যার সর্বাঙ্গ সাদা কা ঘোমটে চাদরে মোড়া—যে ইটের তৈরি ফুলফুলির এপাশে দাঁড়িয়ে আছে আর ওপাশে দাঁড়ান পাঠান মেয়েরা কয়লা বোরখায় ঢেকে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের মাঝখানে জমিয়েই মা হারাধনের দিকে পা বাড়াও, ছোট মাথে চটপট চলা ঘুমুরি, নূন, লঙ্কা গুরে আনত, বলত—এই মেয়ে তুমি বরফের কাছে কি রেখে গেছ নিয়ে যাও। একথা বলে মায়ের গহণ নিজের রাখা খাদটা দেখাত।

মেয়েরা খাদগুলো ভর্তি নিয়ে চলে যেত ওদের অন্দরমহলের কাছে যারা কিছু খাবারের অপেক্ষায় বসে আছে। পাঠান পুরুষেরা আমাদের বাড়ি হৈচৈ করতে এসে আমার মা পান খেয়ে বাইরে পাঠাত। প্রতি পানের ভিতর মা একখানা করে কপোর টাকা ঢুকিয়ে দিত আর পরাধান দিয়ে বলে পাঠাত—ওদের জন্য পানখানা খেয়ে যেতে কিম্বা বাড়ি দিয়ে যেতে। পানের ভিতর কি পাঠান আউকে জানতে দিত না। মায়ের কৃপা ছাড়া গ্রহণ করার সুযোগ কেন ওদের মা কেনওভাবে বিপর্যস্ত করতে চাইত না। বেগম জানালেন—এটাই ছিল মায়ের দান করার ধরন, এক হাত দিয়ে যা দেবে অন্য হাত তা জানবে না।—এ নাকি জোরাসের নীতিবাক্য। মাকে দেখে বাস্তবিকভাবে আমরা সেই নীতিবাক্য শিখেছি।

ঈদের ভীতির পরিবেশ থেকে বেগম বধী অলস নবাবের প্রাসাদে স্থানান্তরিত হল। বিয়ের আগে বেগম স্বামীকে এক পলকের জন্য দেখেননি। যেদিন প্রথম স্বামীর ঘরে ঢুকলেন, স্বামীকে দেখে আধা পা পর্যন্ত উঠানো হিম হয়ে গেল। ছ'মাস পরেও উনি কথা বলতে সাহস পাননি। একদিন পরে একদা নির্বিকার ভীকার করলেন যে স্বামীকে অপছন্দ নয় তিনি ভয়ই পেয়েন।—এমনকি যখন কথা বলা শুরু করলেন তারি ওর মনে কখনও একা খুজিনি। আমার জন্য নিনে রয়ে পাহারা নিযুক্ত হল এবং তারা সবাই মেয়ে। প্রাসাদের ভিতরে পুরুষ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি একজন আলমগলবা মহিলাকে কর্তৃপক্ষের আটকে দেওয়া হয়েছিল অনেক পরে এর কথার ওর পর্যন্ত সন্তানটি ছেলে।

—এমন কঠোর পর্দা আপনি সমর্থন করেন?

—হাঁ, আমাকে ভক্তির করে বেগম মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন। আমি মূলতায় নিরাপত্তা থেকে উনি এভাবে আত্মসমর্পণ করতে শিখেছেন। উনি কখনও প্রশ্ন করেননি, মেনে নিয়েছেন। নিজের বিশ্বাসকে জোরদার করতে আমাকে একথা গুরু শোনালেন।

খলিফা ওমর সিকে রাস্তা দিয়ে ছুটে আসতে একটি লোক দেখল। খলিফার মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—

—কি হল? আপনি তো মেয়েকে দেখতে গেলেন।

—আমার মেয়ে যে ঘরে এল আছে। খলিফা উত্তর দিল।

—তাতে কি হল, ও তো আপনার মেয়ে।

—ও একা ছিল। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা দানব লুকিয়ে আছে। সেজন্য আমি পালিয়ে এসেছি, নিজেকে এবং মেয়েকে রক্ষা করতে।

বেগম পুনরুক্তি করলেন—মত ভালই হোক, মেয়েদের প্রবেশ আছে জায়গায় আছে। সেজন্য ওদের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এরপর তিনি জোর গলায় বললেন—প্রকৃত মেয়েরা যদি রক্ষিত না হয়, পুরুষরা এক পাও এগোতে সাহস পাবে না। এই পৃথিবীকে নিরাপদ করা, খুঁটি শক্তিশালী মেয়েদের আছে।

বেগম কখনও মেয়েদের জগতের বাইরে যাননি। ছোটবেলায় মায়ের সাহায্যে তিনি বড় হয়েছেন।

বিয়ের পরে যাদের দেখেছেন ওরা বাদীর বিবি। তাদের অন্তে কেউ কেউ বেগম অন্যান্য স্ত্রীর মর্যাদা থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন নবাবের অনুকূল হারিয়ে। রাজ্য পরিচালন বিভাগ থেকে অনেক পরীর মেয়েদের নবাবের প্রসাদে পাঠানো হত। সুন্দরী হলে অবশ্য কেউ কেউ সাময়িকভাবে নবাবের বিবি হতে পারত। সামান্য নিকে অনুষ্ঠানের পর ঐ মেয়েদের কেউ বা নবাবের বিবি হলে তাদের বাদীরা ও ইজলাসকক্ষের তার নিতেন নবাব কিছুদিনের জন্য। কেউ বা মজলিসের মজরে পড়ার জন্য নির্বাসন অপেক্ষা করত। কেউ বা বাদী সন্তান কিছু না পেয়ে রুক্ষকায় ক্ষীণ এবং রুক্ষ হয়ে পড়ত। কবিও বেগম মনে করতেন তাদের যান্ত্রিক প্রকৃতিকে চাপা দেওয়া পাপ, কিন্তু এমন ঘটনা ঘটলে তিনি হাল করতে রাজি নন।—তবি পুরুষ সন্তান হয় যা মেয়েদের প্রতি সম্মান আচরণ করে তবে তাদের একের বেশি বিবি বেওয়ার অধিকার আছে। এরপর তিনি জোরে নিশ্বাস নিয়ে আসেন—ঘাসের ওপরও সমান ভাবে চিন্তাতে হয়, চার বিবিকেও সমান আদর দিতে হবে। আমি আমার বাদীর চিত্র দেখে হয়েছিলাম, কিন্তু আমি চাইতাম ও ওদের প্রতিও সমান ব্যবহার করুক, আমরা ওর চারপাশে এসে ও প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলুক। আমার বাদী আমায় প্রশ্ন করেছিল—

তুমি এতে আঘাত পাও না?

—না, আমি ওকে নিশ্চিন্ত করেছিলাম। আমার আঘাতের চেয়েও আল্লার নির্দেশ জরুরি। আমি একথা জানি যা যে আমায় আঘাত লাগবে না, কিন্তু আঘাত সহ্য করার শিক্ষা আমি পেয়েছি।

বেগম একলা থাকলে একলাটি বেশ ভাঁয় ছিল না। সারা বছরই প্রাসাদ থাকত কর্মমুখর। সারা বছরই অনুষ্ঠান উৎসব লেগে থাকত তাস-বাজার প্রতিযোগিতা, কবির লড়াই, সন্ধ্যা সঙ্গীত পরের আসর অন্যদিকে শিকার, ভ্রমণ, নদীতীরে ভোজন এমন আরও কতকি। চারদিক চাকা পাখীদের বেগমরাও কখনো সুযোগ পেলে ঘাটের যাওয়ার যা বিলাসবহুল তাঁবুতে থাকবার যায় চারদিকে থাকত নিশ্ছিদ্র সার্টিনের পর্দা। রাতভোর অতিবাহন চলত—হাসি ঠাট্টা ফুল প্রতিযোগিতা আসর হাসিতে একে অন্যকে ঘায়েল আক্রমণ। এমন রঙিন আনন্দময় বর্ণালী উৎসবের তলায় তলায় থাকত সূক্ষ্ম হিসেবে। বেগমকে অংশগ্রহণ করতে হলেও তিনি থাকতেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি বলতেন—আমি হাঁসের মত জলে ভাসতাম। ওনার মা উপদেশ দিয়েছিল—যখন ঢেউ উঠতে থাকে, জলের নিচু তলায় থাকে না।

অনেক মেয়েরাই বেগমকে অসম্মান করেছে আঘাত, হিংসে করেছে, কেউ বা ক্ষতি করারও চেষ্টা করেছে। অনেকে বেগমকে নাটকের অনেক চরিত্র প্রমাণ করতে চেয়েছে, কেউ বা শিক্ষণ থেকে আক্রমণের চেষ্টা করেছে, তুক তাকও করে নি। এমন কি পরিচারকের মেয়েদেরও বেগমের বিরুদ্ধে একে অন্যের কাছে বলাবলি করেছে।—আমার কোনও সন্তান হয়নি। বেগম উঁকার করলেন। আমার গর্ভে সন্তান এলেই কেন অদৃশ্য কারণে প্রথমেই গর্ভপাত ঘটত। আমি অনুমান করতে পারি কিন্তু তাঁকে দোষারোপ করব না। কিন্তু যে ঘটনাটি পাটি গাঁতকে ঘিরে মতভেদ্য করে মুখের সামে, আমি সেখানে তাদা নিয়েছি। আমার কথাই নির্দেশ হতে পারত কিন্তু আমি কখনো তা প্রয়োগ করি নি। মহলের কারোকে কখনো অভিযোগ করি নি। সব দুঃখ অভিমান আমার মধ্যে জড় করে জমে জমে নিজে উঁকতাম। আল্লার সামনে মনপ্রাণ খুলে উঁকতাম কিন্তু মানুষের সামনে কখনো নয়। নবাবের চোখে পড়লে জিজ্ঞাসা করত—মেঘ লাল কেন? আমি উত্তর দিতাম—দূর দূর তাব। নবাব বুঝতে পেরে বলত—এমন সাহস নিয়লে কোথা থেকে?

—কোনও গরীব যা দুঃখী লোককে যদি তুমি একটা চড় মার, সেটা সাহস নয়। কিন্তু যদি তোমার সমান কাউকে মার, যে তোমার চড়টি ফিরিয়ে দিতে পারে সেই হল সাহস।

কোনও কোনও বেগম অসম্মান অনুভবও করত। ওদের একজন খুবই ধার্মিক ছিল। সে বেশিদিন পেরে একটা ঘরে মসজিদ যা উপাসনা স্থান বানিয়েছে। আর একজন মহিলা তাওয়ায় পরে সরাইখানা বানিয়ে নিয়েছিল। আমি কিছু যা করে কিছুই সৃষ্টি করি নি। আমার যা বলত—এমন মিষ্টি স্বভাব হবে না যে অন্যরা দিলে খাবে আবার এমন তেঁতোমুখ নয় যে মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দেবে। আমি সবার কাছ থেকে অসম্মান থাকতাম কিন্তু সম্মানের সঙ্গে অসম্মান ছিলাম। মোটা ছিল অন্যায় ব্যবহার।

—নবাব আমার প্রেমায় এসেছিল তার চতুর্থ এবং চূড়ান্ত বেগম হিসাবে। আমি অনেক উপাধি পুরস্কার পেয়েছিলাম, তবে নবাবের মৃত্যুতে সব শেষ। আমার বাদীর মৃত্যুর পর তার বাদী নবাব হল এবং আমি হলাম তার বিতীয় বিবি। আমি তাকেও কোনও সন্তান দিতে পারিনি কিন্তু মুজনেরই প্রিয়পাত্রী ছিলাম। বেগম তাঁর মর্যাদা, বিচক্ষণতা এবং নীরবতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা উঁচু অক্ষেছিলেন।

—পঞ্চাশ বছরের নীরবতা একজন নারীকে কি দিতে পারে?

—আমি এখন বৃদ্ধা। অনেক স্মৃতি হারিয়ে গেছে। বেগমের পদার ঘর ছুড়ে এল আমি যে আল্লা সহ্য করেছি, তাতে আমার দেখা হবে যাওয়ার কথা অনেক আগে। কিন্তু আমার প্রার্থনাই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি বেগম হয়েই বেঁচে আছি। আমাদের কালে যো মহলের পোর্ট তৈরি হয়েছিল। আমি এখানে এসেছি অন্যের মেহেরবানী হয়ে। আমি রাজপরিবারের কর্মচারীও নই, আর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাও করব না জীবনে যে জীবন আমার অন্তর্নীরবে পেয়েছি। এ হয়তো আমার আত্মিক দুর্বলতা আত্মিক বর্ণিত। একজন বিদুষেই আমাদের যতে নিজেকে শাঁপে রেখে না শুধু পরিবর্তনের জন্য নীরবে অপেক্ষা করবে পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করবে বিচক্ষণ হয়ে।

উনি আবার জোরাস থেকে গল্প শোনালেন—একবার ওনাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ইচ্ছে কোথায়?

—আল্লার অধীনে, ওনার উত্তর দিলেন।

—আপে তোমার অন্তরাত্মা যা আছে, তাকে ডাকে লাগাও। উটকে বেঁধে রাখো। তারপর আমায় দেখা চাইবে।

এই হল তাঁর 'উর্দুতে' বেগম কথাটা বললেন—তোমার যখনই চোখ ভর যাবিটা আল্লার ওপর নির্ভর কর। উনি আমাদের যা নিয়েছেন তাই আমাদের সঙ্গে গ্রহণ করব, সুখী হব। যদি তিনি নৌলত নেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব আবার যদি নিজে রাখার কথা বলেন, সেটাও মেনে নেব মাথা পেতে। তবে মন দিয়ে কোনও অবস্থায় যেন আল্লার না ঘুমন্তাত হয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাই থাকবে, যাকি সব অস্থায়ী মনুষ্য পদমর্যাদার এই শেষ কথা।

আমি এবার প্রশ্ন করি—যদি আপনার আল্লা আপনাকে আর একবার এই জগতে একটি বয়নের জীবন নির্বাচন করে নেন, আপনি মেনে নেবেন?

—আমি বিশ্বাস করি না, উনি মাথা নেড়ে জোর গলায় জানালেন।

—সেক্ষেত্রে আমি জানব না, কেননের স্পষ্ট জোরালো উত্তর।

—একটি মানুষকে আপনি সাক্ষী হিসাবে পেতে চান না? এবারে অনেক জোরে উনি না বললেন। এতজনের অভিজাতে আল্লা নির্ভর মানুষটির ভিতর থেকে কবার মুহূর্তের জন্য প্রতিবাদী নারী চরিত্রের প্রকাশ ঘটল। তাঁর উজ্জ্বল বিপর্যয়ে চুপ্ত মেখাচ্ছিল। আসমানী আর চুনী পাথরের অলঙ্কার ঝলমল লক্ষ্যে তাঁর উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে পারছে না।

—কিন্তু এখন আমি কোথায় যাব? তারী পর্দা তে করে বেগম বাইরের উন্মুক্ত পৃথিবী দেখতে চাইলেন

—একেত্তবাসী হবে মাতৃত্বমাটিরা হয়ে গেছে আমার তবু আমি নির্জনতা চাই। আমি একেবারে পর্দার হয় অদৃশ্য থাকতে চাই। আমি কিছু করতে পারিনি। ও সময়ের স্রোতে ভেসে গেছি।

দেওয়াল ঘড়িতে সময় জানান দিলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। প্রসাদের ঘড়িঘরে ঘুঙুরের তাক দোনা যায়ে জায়গাটা একেবারে পরিত্যক্ত। মোহাজ্জল মাস্তার আ একটি প্রকোষ্ঠলয় যা আসে হয়ে গেছে সাদা মসলিনে পোষাকে পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। সেই ব বর্তমান নবাব। আগের নবাবের সন্তানরা না থাকায় প একের থেকে অন্য হয়ে হস্তান্তর হয়ে গেছে, এখন সাধারণ মানুষের কাছে। তার না আছে অর্থ, না আ না লোকবল। এখানের আরো অনেকের মত শাহে রচনা করে আর নদীতে মাছ ধরে এই নবাব দিন কাটা ঘটি হওয়ায় আমীর ওমরায় এই নবাবের রাজত্বের সা জড়িয়ে আছে কঠিন সূত্রে তাদের দাসে সে কখন দাসত্বে তবে পরিবারিক সমস্যা বিষয়ে বা আমি সাহায্য নিয়ে কথাবার্তা বলে। বেশির বিস্তৃতির অত্য দক্ষ পরিবর্তনগুলি খোলাখুলা বা গুপ্তী আয়োজনগুলোর জন্য নিলিত হত। পুরুষদের ঝলমলানী পোষাকে নবাবীখানা মসলিনের কুর্তা পাজামা পরে সুপন্ডী আর সুপন্ডী পান মলালা সব কর্পূরের মত উবে গেছে নেতারা অবশ্য একইভাবে ঘরে বসী থেকে তাস-পা খেলছে। পরে প্রজন্ম এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটি গেছে। দু-একজন অবশ্য রাজপ্রাসাদ ছেড়ে অন্য ব্যবসায়ীর উপপত্নী বা রক্ষিতা হয়েছে বড় শহরে কিছু

আমি ফিরে এলাম বাদামী এক্সপ্রেসে ক্লান্তি পেছি এ সবই একসময়ে বেগমের রাজত্ব ছিল। বেগমে একজনের উপাধি ছিল আর জেবে যিনি শাসনক নবাবদের জন্য কর্তৃত্বকারী সৈন্যদের অভিযানে গু করতেন। কিন্তু এখন কেউ ওঁর দিকে ফিরেও তাব না। তাঁর প্রাসাদের কাছে যিনি এক অরৌকিক গল্পের কিংবদন্তীর চরিত্র।

মনের ভেতর মনের মানুষ

কল্পনা ভট্টাচার্য

নিজের জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে নিতাইয়ের। চা-র দোকানের টুলটায় বসে নিজের ভাগ্যের ওপর বিধা টিপ্পনী করতে থাকে,—শালা, একটা আস্ত চামুচের জেবন! শালচুমুরের মত লোকের ঘরে চুরি করতে ঢুকে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে বেঁচে আছে। নিতাইয়ের রাগ গিয়ে পড়ে ওর মা-র ওপর। বুড়ি মরবার আগে তার সইয়ের মেয়ে ঘুমরাকে তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। একে নিজের চলে না তার আবার বৌ।

নিতাইয়ের বৌ ঘুমরা অবশ্য সাতজন্মেও না কলতো না। ইদানীং বছর খানেক নিতাইয়ের সাথে ঝগড়া করে। পা ঝুলিয়ে কাপড়ী মেরে মুখের ওপর বলে,—'পুরুষ-মানুষ না পারে করাতে, না পারে খাওয়াতে। অমন পুরুষ না থাকাই ভাল।' বৌয়ের খোঁচা মারা কথার মরমে বেঁধে নিতাই। বিয়ের পর বছরেও বৌয়ের কোলে কোন ছাবাল না আসায় বৌয়ের অত জেদ। তাকে পুরুষ বলেই মনে করে না। বৌয়ের মুখের ওপর জবাব দিতে ছাড়ে না সে। ঠোঁট উল্টে বলে,—রাতের চোর হলেও জেনে রাখ ঔষ আমার ভালই ছায়লা, তোর জমি খারাপ। তাই ওই জমিতে গাছ জন্মেনি।

মাঝির কথায় সেদিন ভেতরেই চুপ করে গিয়েছিল ঘুমরা। নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে মেরিয়েছিল বাবুর বাড়ি ঠিকে বিয়ের কাজে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ঘরে ফিরে সে নিতাইয়ের পায়ে ঘসে ওর গায়ে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে গলায় সোহাগ এনে বলে—তোমাকে আর রাতেরবেলা চুরি করতে যেতে আমি দেব না। ওবাড়ির বাবুকে বলে তোমার একটা রিক্সা কিনে দেব। উনি যা ধার দেবেন তা আমি কাজ করে সুদে দেব, ঘরের মানুষ ঘরে দিনে-রাতে ঘরে থাকবে, দেখবে আমাদের সংসার কেমন করে উঠবে। ঝট করে বৌয়ের হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিতাই খেঁকিয়ে ওঠে,—ছুৎ তড়িকন। সারাদিন তোর ঐ এক কথার কথন, এযেড়া কী অন্য কথা জানিস নাই। ঘুমো বয়সে থেকে চোপ শালা...।

বৌকে গালমন্দ করতে করতেই নিতাই হোট অল্পখানা কোমরে গুঁজে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

মস্ত বাড়ির ব্যাপারই এমন। চারদিক ওমশান, নতুন ফ্ল্যাটবাড়িটার আলো জ্বলছে। টিভি চলছে, একটা বিশ্রি হেয়ার ওর মুখ দিয়ে—শালারা সারারাত কেমনে টিভি দ্যাখে কে জানে!

বাড়ির বার থেকে অন্ধকার পথ মিশিয়ে হাঁটতে থাকে নিতাই। আজও রোজগারপাতি কিছু না হলে পরার বৌটা ফাটাতে হবে। ইদানীং মা পরাই তার ভরসা। বাড়িতে ফিরে যেতেও ইচ্ছে করে না। নিজেকে পুরুষ বলে মনে হয় না তার। নিজেকে নিজেই গালাগাল দিয়ে বলে—হি, বৌ গা গতরে খেটে বড়া করে রাখবে ঘরে সে আজ একটা আবদারও মরদ তা হবে। না, না এ সে কিছুতেই পারবে না। এতে ঘুমরার চেয়ে সে আরো ছোট হয়ে যাবে। বেদিন কমাতে পারবে সেদিন চাল, মাছ কিনে ঘরে ঢুকবে—না পারলে ঘরে ফিরবে না। রাতটা পরার ঘরে কাটিয়ে ভোরে দু-গ্লাস ঢোলাই গলায় ঢেলে ওতে পড়বে ঘন্টির ঘটনিতে।

আজও বোধহয় কিছু হবে না। রাত দু-প্রহর। পরার ঘরেই রাত কাটাতে হবে ভেবে নিতাই হাঁটতে থাকে। অন্ধকার আবছাটা পার হতে গিয়ে হঠাৎ নিতাইয়ের চোখে পড়ে আধো অন্ধকারে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ও স্পষ্ট শুনতে পেল মেয়েটা ডাকল,—এই শোনো। নিতাই থমকে দাঁড়ায়। মেয়েটা পায়ে পায়ে নিতাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। দাঁত বের করে হাসে। নিতাই ভ্যাবড়াকা খেয়ে পিছু ফিরে যাবে তার পেছনে আর কেউ আছে না কী। ঘাড় ফেরে মেয়েটা হাসবে। নিতাইয়ের ভরম দেখে মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠে বলে,—কেউ নেই, চল না—পাঁচ টাকা দিলেই হবে আমি হাসি মাসি।

ঘট করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিতাই রাগতস্বরে বলে,—এই তুই কে রে? হাত ধরে টানতেছিস?

—আমি গো আমি, রূপসা। তোমারে ভালবাসব, সারারাত গল্পো করব, মাত্র টিপে দেব, তবু পাঁচ টাকা দিলেই...।

—এাই চুপ কর। এক ঘুসিতে মুখ ভেঙে দেব। নিতাইয়ের রাগ দেখে রূপসা কালনাগিনীর মত ফুঁসে ওঠে,—ঘলি তুমি কী এমন তমন লোক গো—যে রাতের বেলা রাস্তায়...?

—আমি চোর। রাতের বেলা পেরস্তবাড়ি চুরি করি।

—তা চোর ব্যাবাজি? আজ কী পেরস্তবাড়ি জোটেনি, না ঘর থেকে বৌ বের করে দিয়েছে?

রূপসার কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে নিতাই। বলে,—কী আর হলো! বাবুরা সারারাত টিভি দেখেছেন যে—।

এবার খিলখিল শব্দে হেসে গড়িয়ে পড়ে রূপসা, মুখের কাছে মুখ এনে বলে,—আর বৌ? সে বুঝি চরিত্রহীন লোকটাকে ঘরে ঢোকে নি?

—এাই, ওর কথা তুই কেন তুলতেছিস? আমাকে সে ভালই বাসে। চোর বলে ঘেন্না করে না। লজ্জা পায়। ভাল ঘরের মেয়ে যে—তবে, আমিও ঠ্যা—বলে রাখলুম এই নেতাই নওল নিজে না জানিয়ে বৌয়ের রোজগারে খাব না। আজ হয়নি তাই যাইনি, হলে যেতাম—

কথাটা শেষ না করেই নিতাইয়ের খেয়াল হয়, এই রাতের বেলা অচেনা মেয়েটার সাথে সে কেনই বা কথা বলছে, আর ওর সাথে কথা কইতে তার এত ভালই বা লাগছে কেন! মেয়েদের সে কোনদিনও বেশি আমল দিতে চায় না, তবে আজ যেন...। নিতাই রূপসার দিকে তাকায়। ও যেন ওর বড় জলো দুটো চোখ দিয়ে

তাকে নিলয়ে, ওরে নিচ্ছে ঘুমের ঘর।

—হাঁগরে, তুই তো আমার সাহেবের জন্য ঘরে নিলি। তুই যা কেন ঘরের কোণ ঝাড়ায় দুরুরেছিস, ঘরে মরদ নাই?

—আমাদের ঘরে রোজ মরদ পালটায়, আজ ছেমটিনি তাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।

নিতাই কয়েক পা পিটিয়ে এসে। নাক সিঁটকে বলে,—থু-থু তুই কচ্ছে মেইছেলেরে? যা-যা দূর হ। না ছেলে তোর সাথে কত না মনের কথা বলে আসলাম, এই জন্যই তরে মেয়েমানুষের চরিত্রি নিয়েও বুঝতে পারেন না। যাই ঘরের দিকেই যাই—। বলে তিনটি পা বাড়াতেই কপসা ওর হাত চেপে ধরে।—আমি কি তোমার বন্ধু হতে পারি না? টাকা দিতে হবে না। এমনিই আমার ঘরে চল, ঘরে লোক না থাকলে মহল্লাতে বদনাম হবে। সবাই হসবে, জানতে আমি বুড়ি হয়ে গেছি, তাই ঘরে লোক জমে না। নিতাই ধাক্কে শেষ কথাটা বলার সময় কপসার চোখ জলে ভরে ওঠে। নিতাই তবে রাতদুপুরে পথে আসার চেয়ে রাতটা ওর ঘরে কাটিয়ে সকালবেলাই কেটে পড়বে। জীবনে নিতাই দুজন মেয়েমানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছে—তার মা আর বৌ ফুলবাসকে। বৌয়ের অতিমান নিতাই সাধারণ নয়। নিতাই যেকে মেয়েমানুষ সর্বনেশের জাত, নাই দিলেই মাথায় চেপে যাও, খেয়ে যাও, আটা যাও, চাল যাও,—খুব খুব ওদের মহলে কে আর জেনেশুনে পড়তে চায়। চুরি করে সে যেন নিজেকটা নিজেই চরিয়ে নিলিল, সন্ধ্যেবেলা দু'জন খেলাম হলেই হল। রাতভর জাগ। ফিরে খুব—দুপুর চাল ভরে ক'টা ভাত খেলা, এই তো খেল ছিল সে, তা নয় মা তার সব কবে ছেলেটাকে সাধারী করে সঙ্গে দিয়ে তাকে ভোর আবে ছাড়লে। ঘাপাটা ভাবতেই নিতাই বিশেষায় হয়ে পড়ে।

৩

কপসা নিতাইয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মুহূর্তে ওর দিকে চোখ পড়তেই নিতাইয়ের বুকের ভেতর সে একটা মোচড় অনুভব করে। ওর চোখে সাগরের ঢেউ। মন্ত্রমুগ্ধ বালকের মত নিতাই ওর সঙ্গে চলতে থাকে। খানিকটা দূরে একটা বস্তির মধ্যে কপসা নিয়ে ঢোকে। মাঝরাতের পর সারা বস্তিটাই চুপচাপ। নিতাইয়ের হাত ধরে কপসা ঘরে ঢোকে। হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে নিতাইয়ের মুখটা একবার ভাল করে দেখে, যেন চেনা মনে হয়, কোন জন্মজন্মান্তরের চেনা। মুখ টিপে হেসে মাটি থেকে পানিভরা পেড়ে নুইয়ে দেয় নিতাইয়ের বর্ষাতি শার্টটা।

নিতাইয়ের মনের ভেতর অজানা অশান্ত, বুকের ভেতর উথালপাথাল ঝড়, কপসা আসতে হাতে নুইয়ে দেয় নিতাইয়ের মুখটা। ঘটি ভরে এক ঘটি জল দেয়। হাফসের তৃষ্ণা নিয়ে নিমিষে জলটুকু শেষ করে নিতাই।

—নাও ওরে পড়। আমি মাথার হাত বুলয়ে দিই। ভোরে ভেকে দেব যৌয়ের কাছে চলে যেও। কথা বলতে কপসার অভিমান ঝরা পড়ে। পাশ ফুরলে নিতাই তো পাখি হলেই চলে যায়।

অনেক রাতে অন্যের বিছানায় নিতাইয়ের ঘুম আসে না। সে জানলায় তাকিয়ে থাকে। কপসা চুল খোলে, জামা ছেড়ে, শাড়ি পালটিয়ে বাইরে গিয়ে বসে। আর চোখে একবার দেখেই চোখ সরাতে নিতাই।

বাইরের মশার কামড় সহ্য করতে না পেরে কপিক পরে ঘরে ঢোকে কপসা। পাশে নিতাই ঘুমাচ্ছে, মরদের মত চেহারাটা বিছানা জুড়ে। কপসা মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে এতদিন এত লোকের সাথে রাত কাটিয়েছে তবু এমন পাগল লোক সে জীবনে দেখেনি। হাতের কাছে বিনিপয়সায় এমন দৃষ্টি ভরার জিনিস পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছে লোকটা! অনেকটা ভয় কপসাকে নড়া দেয়, ওর বৌ কী খুব সুন্দরী, না কী সে খারাপ মেয়ে হলে চোর লোকটা ওকে ভোগ করছে! মুহূর্তে রাগ চড়ে যায় মাথায়। ধাক্কা দিয়ে জাগায় নিতাইকে,—এই যে ভালমানুষের পো, তার ঘরে রয়েছো তাকে তোমার পাশে শুতাতে পর্যন্ত ডাকলে না, মশার কামড় খেয়ে মরল তবে তুমি নাক ডাকাবে?

—কে ঢোকে বাইরে থাকতে বলেছে? আর কে-ই বা ঢোকে আমাকে সেরাগ করে ঘরে আনতে বলেছে? তুই না পাপে ধরলে আমার তারী বয়েই গেছিল একলে আসতে।

কপসা ফুঁসে ওঠে,—কে আনার—পায়ে ধরেছি না ছাই। রাত দিয়েছে পুলিশে ধরবে তাই...

—সে ওরে পড়। তোর ফপড়া করতি হবে না। আমি পাল ফিরে শুতি। পরশে শুতেও কপসার রাগ করে না। তবে লোকটা মানুষ না কেউটে। আবার ওকে ডাকে,—এত ঘুম কিসের গো? আমার সঙ্গে দুবত গল্প করতে পারছো না?

এবার নিতাই ভেংচে ওঠে, বিছানা থেকে উঠে বলে বসে,—মেয়েমানুষের জাতটাই এমন, ভয়ার জ্বালায় ঘর ছেড়েছি, এ পাপী আবার এল গল্প করতে, ভাল জ্বালে পাল ভর, পরও বলবে...।

—থাক, থাক। তোমার আর ফর্দ দিতে হবে না। তোমার খেবরটা আমি জুকেছি! তুমি ঘুমো, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

কপসার নরম হাতের স্পর্শে নিতাই আর কথা ছাড়তুই এপাশ ওপাশ করেনি। সকালে ঘুম ভেঙেছিল কপসার ডাকে। সদ্য স্নান সেরে এক গ্লাস গরম চা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। কপসার চলচল মুখটা নিজের আচলায় আবো একবার হাতে নিতাই। এমন মুখই তো মনের ভেতরলুকিয়ে রেখেছিল সে। এই মুখ। এই চোখ সে যেন জন্মজন্মান্তর থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মুহূর্তে সে তার খুজলো প্রেম খুঁজে পায়, নিজের অজান্তে কপসার হাতটা টেনে এনে মুখটা কাছে এনে বলে—না, তোর খরিদ্দার কোথাও পাল লাগেনি। তুই পদ্মের মত নির্মল। তোকে এখন থেকে আমি নিয়ে যাব। যাবি আমার সঙ্গে? নিতাইয়ের কথায় কপসা শিওর মত কুকরে ওঠে, বলে—এমন কথা এর আগে আবার কেউ বলেনি গো।

—বলতে কি করতে? তুই তো আমার পথ চেয়েই বসে ছিলি।

কপসা চোখের জলে নিজেকে হালকা করে। নিতাই টানা থেকে খোঁজা বিড়িটা বার করে ধরিয়ে মুখ দিতে দিতে বলে—তোর এত রূপ। জোয়ান মরদকে ভালবেসে ঘর ভাঙলেই তো লাগি ছুকে যেত। মুটো পয়সার জন্য রাস্তার কুকুরের মত এর ওর তার কাছে হাত পাততে শরীর ঘুলে নিয়ে হত না।

নিতাইয়ের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে কপসা খুজোয় বসে। নিতাই ওর পুজো করা দেখে। শেষে হেসে গয়না জামাটা পরতে পরতে বলে ফেলে যাকি ছিল তা ওই পাষণ্ডের লোকটাকেই দিলি। আমার রইল কী?

কপসা হেসে নিতাইয়ের হাতটা ধরে বলে, তুমি আমার পরম ঈশ্বর।

এরপর থেকেই নিতাইয়ের প্রতিদিনের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল কপসার ঘরে যাওয়া। কপসাও আজকাল বাইরে রাস্তুরের ঘরে ডাকে না। জমানো পয়সা দিয়েই খরচ চলায়। নিতাই মাঝে মধ্যে চুরি করতে যেতো। কপসা তাকে বোঝায়, চুরি করা ছেড়ে অন্য কাজার মন দাও। ফুলবাও বাড়িতে পাপে পোলে সেই এক কথাই বোঝাতে চায়। ওদের কথায় নিতাই হসে বলে, ভাত তোরকে কে আর ঘরে ডেকে ভাত দেবে। ইলশী চুরির পয়সা নিতাই দু'ভাগ করে। এক ভাগ যেয় ফুলবাসকে ঘর চালাতে আর এক ভাগের টাকায় কপসার জন্য নতুন শাড়ি, সিপের পাতা বাল চনাচুর এনে দেয়। এসব জানলে কপসা রাগ করে বলে, টাকা নষ্ট করতে নাই। জমায়ে রাখ, পরে কাজে লাগবে। পরের ব্যাপারে বিশ্বাস নেই নিতাইয়ের। ঘরে বন্দিনী অহিসে থেকে পরে সে। আজ মহলে ভাল পুলিস।

নিতাই কপসার কাছে গল্প করে তাদের পাড়ার বেলাবাবুর কথা। কী ভালই না মানুষ ছিলেন। ছুটি করে বুকের বাথার মধ্যে গেলেন—রাতে আর শুটি পড়ি কত কি।

কপসার আলমারিতে নতুন শাড়িটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে নিতাই বলে—সে যা তার নিকি। একটু ঘুরে আসি;

চা খেয়ে নিতাই পুরনো ইয়ার বন্ধুদের খোঁজখবর নিতে জোরপড়ার দিকে পা বাড়ায়। বহুদিন এদিকে আসা হয়নি। কপসা যেন তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে অদৃশ্য সিঁদুরিয়ে।

৪

ক'মাস যেতেই ফুলবাস লক্ষ্য করছে তার স্বামীর মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। সারাক্ষণ ঘরে থাকে। কপসার ওরে থাকে। তার সাথে কথাও বিশেষ জমতে চায় না। একঘরে থেকেও যেন অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে থাকে। কথাটা কানাঘুষো ফুলবাসের কা 2 এসেছে। নিতাই চুরি করতে যাবার নামে ঘর ঘাওয়াতেও অনেক দিনই চুরি করতে না গিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে রাত কাটায়। নিতাইকে ওরে থাকতে দেখে ফুলবাস খা জ্বালা করে। একদিন সে লোকটাকে ধরটা সহজ সরল ভেবেছিল আজ বুঝেছে লোকটা তা নয়। ছুটির দিন সেজে ফুলবাস নিতাইয়ের পাশে গিয়ে বসে, মাঁকালো গলায় বলে—যা শুনছি সব সত্যি?—কি শুনছিস। বলে নিতাই মুখ ঘুরিয়ে বসে। স্বামীর অসাধারণ সাজা

থেকে ফুলরা সরাসরি এল ঘরে,—ওই যে কপসা, না ফুলসা তার সঙ্গে তোমার চলাচলির কথা জানতে বস্তির আর কারুর বাকি নেই মুকুলে? ফুলরার কথায় এবার হো হো করে হেসে ওঠে নিতাই,—দূর পাগলি, তুই ওকে হিংসে করিস কেন? তোকে তো আমি সব মিষ্টি, ঘর মিষ্টি, সংসার মিষ্টি, এমন কী বাস চোদ্দপুরুষের পোয়া পাখী সব মিষ্টি। ওকে কিন্তুটি নেই মাই। নেই শুধু মনের তাপ। গায়ের জ্বালা। তুই যেমন আমার বৌ। ও তেমনই আমার পর জনের বৌ। আর তাছাড়া ভালবাসা যার মধ্যে থাকে সেই তো পরকে তাতে ডুবে থাকতে। ভালবাসা পাপ নয়। অন্যায় নয়, তারে প্রতিষ্ঠার করাটাই পাপ।

নিতাইয়ের ঘুমের কথাগুলো শুনতে শুনতে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না ফুলরা, হৃদয়ের মধ্যে রাখা পুরিটা পলাশে ফুঁড়ে মনে নিতাইয়ের কপালে। তিনটি বিন্দু রক্ত ফিটকে বেরোয় ওর কপাল দিয়ে। নিতাই কপাল চেপে বসে পড়ে। বিশেষ্যরা ফুলরা নিতাইয়ের ঘরে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলে, —তুমি আমার এত বড় অপমান করতে পারলে? এই ক'বছরে একদিনের তরে আমার গোয়াল ফেলে যাই তবে তোমনি আর আজ তুমি.....। ফুলরা ফুলে ফুলে কাঁদছে। তার এক নাগাড়ে কান্নার কোনো সারা ঘরটাকে তরঙ্গিত করছে। ফুলরার দিকে তাকিয়ে নিতাইয়ের মায়া হয়, তবুও কী করেছে ফুলরাকে বোঝায় যে রূপসা তার কে। কেন সে নিজেই জানেনা শুধু বোঝে একদিনও রূপসাকে না দেখলে সে ভাল থাকে না। ফুলরার কথা মিথ্যে নয়, ফুলরার ঘর সেও তো কোন দিন রূপসাকেও বলতে পারিনি যে তাকে সে ভালবাসে সোয়ামীর মত। অনেকক্ষণ ফুলরা কাঁদছে। নিতাই খোলা জানলার দিকে চোখ রাখে। ফুলরার এত জ্বালা কিসের, নিতাই বেশি ভাবতে পারে না। মাথার যন্ত্রণাটা চনচন করছে। নিজেকে নিয়ে সে কোনদিন এত ভাবেনি, চিরকালের বাউণ্ডুলে এত বাড়ি ভালোবাস পড়বে তা তার ঘরের ও বাইরে ছিল। হাসি পায় নিতাইয়ের। বড় জোনার সে হাসি। জোনাকী যা ছিল এত প্রেম, এত ভাবনা! ফুলরার কান্না থেমে ওর কষ্ট হয়। ফুলরাকে তুলে ধরে। নিতাইয়ের আদর মুকে আসছে ফুলরা। অর্থ অচৈতন্যের মত ফুলরা স্বামীর মুকে ঢলে পড়ে। নিতাই প্রথম আলতো করে। ফুলরাকে মুকের অবকাশনে রেখে প্রশ্নভরে আদর করে। এ যেন তার শেষ হিসেব মেলানোর খেলা। ফুলরার মধ্যেই সে রূপসাকে খুঁজে পায়। নিতাইকে কয়েকদিন আর ঘর থেকে বেরোতে দেখেনা ফুলরা। সারাদিন দিনে জোঁকের মত পায়রা দেয়। অনিবচনের সঙ্গে সে আকণ্ঠ দেয় আর সংসারের পুরুষটাকে। একদিনেই নিজের সাথে মোকাবিলা করে নিজেকে নিতাই। দু'জনকে নিতাই সে আকড়তে চায়। যদি ফুলরা তা না জানে তবে সে চির অতলের জন্য রূপসায় আবারই ফিরে যাবে। রূপসাকে দেখার জন্য তার প্রাণটা ছ ছ করে ওঠে। নিজে এমন মনে হয় নিজেকে।

৬

একপক্ষ ঘুরে গেল। নিতাইয়ের দেখা নেই। সন্ধে থেকেই সেতারুয়ে ওর পথ চেয়ে বসে থাকে রূপসা। কদিন তার শরীরও ভাল নেই। গায়ে জ্বর। এ সময় অন্যের মানুষ অন্যে এসে শুধু কিছুটা ভাল লাগে। পাগল লোকটার কি হল কোনটার। যে তাকে একদিন ও মা মেখে সে এতদিন.....তবে কী তুমি অন্যে সে ধরা পড়েছে। মানুষের মাঝখানে.....কাঁদবে ওঠে ভরে রূপসা। মনে মনে ঠিক করে তার এভাবে বসে থাকা চলবে না। জোক জ্বর, তবুও সে নিতাইয়ের খোঁজে বেরোবেই। সরলদের তার বাড়িও যাবে। পরে পরে কখন কেন সে নিজের অজান্তেই পৌঁছে গিয়েছিল নিতাইয়ের বস্তির কাছাকাছি। পরক্ষণেই ওর ছেলের কথা মনে পড়তেই সে শিহর খেয়ে। জোরে পা চালিয়ে বাসায় এসে থামে। কড়কাবু। একবার ওদের মহল্লাতে অতোগোল আসতে মেতে হয়েছিল, ওই অন্যায় ও ছিল তখন সেরা সুন্দরী। লোক জমিয়ে কড়কাবু চোখ তোলে,—কিন্তে এই তরমুজেবেলা আবার কেন রে? কেউ আসে খুকি? কড়কাবুর খোঁচা মারা কথা গায়ে না মেখে সে ধীর গলায় বলে,

—কেন চোর ধরা পড়েছে কিনা জানতে এলাম।

—কেন রে! চোররাও তোর বাবু খুকি আজকাল! ভালই হয়েছে চোর আর খ্যাংকোটা একঘরে।

কড়কাবুর খোঁচানোরা কথার জবাব তালরাখেই নিতে জানে রূপসা। শুধু নিজেকে সামলে শুধু মনে মনে গজরায়, পরক্ষণে সব শালাকেই, সে চোর পুলিশ, মহাজন যেই হোক না, গায়ের জ্বালা কমাতে আমারের কাছেই আসতে হয়।

কানার কড়কাবু অজগরের মত মুখ করে রূপসার দিকে তাকিয়ে আছে, তা লক্ষ করে সে মাথার ঘোমটাটা আরো খানিকটা নামিয়ে বলে—নিতাই নামে কেন চোর ধরা পড়েছে নাকী বাবু?

—নিতাই কে! তোর মরদ না কাকী নাতি কানার লোক? এবার আর চুপ থাকতে পারে না রূপসা ফুঁসে ওঠে কালসাপিনীর মত। —কেন বাবু, আমরা কেন্তা হলে কি ভালবাসার লোক থাকতে পারে না।

—ও ভালবাসার,—না, ওনামে কেউ ধরা পড়েনি। কথাটা শোনার পর থেকেই রূপসার বুকের ভেতরটা টনটন করতে থাকে। নিতাইয়ের চিন্তায় সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিল না। আসন মনে এসে দাঁড়ায় নিতাইয়ের প্রিয় গলার ঘাটে। একপাশে মনে থাকে তার মনের মানুষের আসার অপেক্ষায়।

৭

সকাল থেকেই রূপসার জন্য নিতাইয়ের মন খারাপ। দুপুরে ফুলরা ঘুমিয়ে পড়তেই নিতাই পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। রূপসার ঘর বন্ধ দেখে নিতাইয়ের মনে সন্দেহ হয়। গেল কোথায় রূপসা। বিকেল থেকে সন্ধে হয়ে গেল। রূপসার দেখা নেই। অপেক্ষায় থেকে থেকে নিতাইয়ের রাগের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। একটার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে সে অন্ধকারে ছুড়ে থাকে। অন্ধকারে নিতাইয়ের চোখ জোনাকির আগুনে বাঘের মত জ্বলতে থাকে। কোন রাতে ঘরে রূপসা ঘরে ফেরে, সাথে নিতাই বসে আছে। ওকে দেখে নিতাই মায়ের মত ওর গায়ে কাঁপিয়ে পড়ে বলে,-বৌয়ের মেই দেখলি আমি নেই, অমনি বাইরে ঘাবু বরাতে বেরিয়েছিলি? —চুপ কর। যাচ্ছে তাই বোল না। শরীর ভাল নেই। রূপসার ধরজাব ভালা খুলে ঘরে ঢুকিয়েন ভূতলে। নিতাইয়ের মুখের বিরাম নেই, সে চিৎকার করে রূপসাকে চেয় গলিগালাজ করে চলেছে।

বিকেলের পর থেকেই রূপসার জ্বর বেড়েছিল। দু'দিন দু'রাত সে নিতাইয়ের ভাবনাতে চোখের পাতা এক করতে পারেনি। পাগল লোকটার জন্য সারারাত জেগে বসে ছিল। ঘুমিয়ে পড়লে যদি সে ফিরে যায়, সেই ভয়ে জেগেই কাটিয়েছে রূপসা।

রূপসাকে চুপ করে থাকতে দেখে নিতাইয়ের রাগ চরমে ওঠে। রূপসার চুল ধরে পাগলের মত ঝাঁকাতে থাকে সে। রূপসা তবুও নীরবে নিতাইয়ের হাতে মার খায়। সাদাসা প্রতিবাদে টুঁশব্দ করে না। রূপসাকে অসহিষ্ণুতে মেরে শান্ত হয় নিতাই। ছলছল চোখ নিয়ে রূপসা নিতাইয়ের হাত টেনে ধরে ওকে যেতে দেয় না। গায়ে হাত পড়তেই নিতাই বুঝতে পারে রূপসার জ্বর। রূপসাকে বুকের ভেতর নিয়ে বলে,—ধর, ধর, তোরা আমার মেরে ফ্যাল। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। নিতাইয়ের বুকে মাথা রেখে সে স্থির হয়ে থাকে। দু'মুহূর্তের ক্লান্তি সে এক নিমিষেই ভুলে যায়।

নিতাইকে আজ কথা বলা অপেক্ষাকৃত পেয়েছে। নিজের অদৃষ্টকে শাপ দিয়ে নিতে বলে—শালা চেয়ের ছেলে চোর। তার আবার প্রেম পিরিতি কিসের? তোকে ভালবেসে আমার সব গেল। কেন তুই আমার সব কিছু কেড়ে নিলি।

নিতাইয়ের শত প্রশ্নেও রূপসার সাড়া নেই। রূপসার মাথাটা বালিশে রেখে হারিকেনটা তুলে রূপসার মুখটা দেখে নিতাই। ওর পাগলামো দেখে হেসে ফেলে রূপসা। চোখের কোনে জমেথাকা জলের জমা জল শুকিয়ে দাগ হয়ে গিয়েছে। নিতাই গামছা দিয়ে রূপসার মুখটা মুছিয়ে দেয়, সেহচুম্বনের চিহ্ন এঁকে দেয় ওর গালে। রূপসা মনের মানুষের চোখে চোখ রাখে। নিতাই জামার পকেট থেকে বের করে আনে ঝিনিসটা, কালিঘাটের কালীর প্রসাদ। রূপসার মুখে একটু প্রসাদ দেয়। সিঁদুরটা পরিয়ে দেয় ওর সিঁথিতে। সন্ধে উতরে গেলেও কোথাও কেন শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। নিতাই জানলার পর্দা সরিয়ে দেয়। ফাল্গুন হাওয়া আসে। ঘুঘের বাড়িটায় হয়তো বিয়ে হচ্ছে। মিষ্টি হাওয়া আর সানাইয়ের সুরের মিশ্রনে বেনারস বিভোর হয় নিতাইয়ের পুরুষত্ব।

কাঁপাকণ্ঠে নিতাইকে কাছে ডেকে রূপসা বলে—আমার কিছু চাইনা গো, এ সম্মান আমি চিরদিন বাঁচিয়ে রাখব। চোখের জলে বিছনা বালিশ ভিজিয়ে রূপসা তার পায়ের প্রতিশ্রুতি করে। নিতাইয়ের পায়ে প্রণাম করে বলে—তুমি শুধু আমার।

—চলনা রূপসা এখান থেকে আমরা পালাই। অনেক দূরে চলে যাই। তোকে এ অবস্থায় রেখে আমার ঘর ছেড়ে মন চায় না। আমার মনে সন্দেহের পাঁঠা আসে। চলনা এটাকে মেরে চলে যাই দু'জনে। চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে রূপসা বলে—এভাবে তোমার

কে আছে, তবে আছে। বাঁচানোর তাগিদ ছাড়তে পারছে না। সব সময় বুকে আগলে আগলে রাখতে হবে। কি পারবে তো।

ছলনার কথাগুলো মাথা নীচু করে শুনছিল নিতাই। মাথার ওপর হাত থাকলেই ঘর হয়না। সে মেয়েকে সবসময় বাড়ে মেয়ে বলে গালমন্দ করে, মেয়ের মেয়ে বলে মেনে নেবে কেন?

—উখন তো আর ছলনা নামে আসব না, তুমি ভাল একটা নাম দিও, তা হলেই হবে।

—ও সব কথা পুই রাখ। আমার সঙ্গে ছেলে চল, দু'জনে একটু বাঁচি।

নিতাইয়ের শেষ কথাটা ছলনার কানে যায় না। ঘরের ভেতর অচৈতন্য হয়ে পড়ে। নিতাই ঘটির জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ওর মাথার জলপট্টি দেয়। ডাক্তার আনতে চাইলে ছলনা মানা করে না বলে। ছলনাকে অবহায় একা ছেড়ে যেতে নিতাইয়ের প্রাণ চাইছিল না। ঘরে না ফিরলে ঘুমুরা আশান্তি করবে। সেটিনার পড়ে নিতাই, ঠিক করে আজ সে কিছুতেই ছলনাকে এ অবহায় একা রেখে যাবে না। সে ছলনার মাথার হাত বুলিয়ে দিতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে পরম নিশ্চিন্তে।

শান্ত ঘরে নিতাইয়ের ভাবনাগুলো মাথা চাড়া দেয়। ঘুমুরাকে আর সে ভয় করে না। মনের কথা সে মুখে বলে এসেছে। এবার যা বোঝার যা করবার ঘুমুরা করুক। সে তার মার পছন্দ করা বৌ, তা বলে ছলনাও তার যে করা বৌ।

খুব ভোরে নিতাই ছলনার ঘর থেকে বেরোয়। বেরোবার আগে ছলনার গায়ে হাত দিয়ে দেখে জ্বর কিছুটা কমের দিকে।

—আজ, বিকালে একবার কষ্ট করে থানা রাস্তাটে যান রিক্সা করে, তোর এই না কে একবার হাঁ করতে হবে। কথাটা বলেই নিতাই হনহন করে বেরিয়ে পড়ে।

সারাদিন নিতাই এ-ঘটি সে-ঘটিতে থৈজ করে ছলনার জন্য একটা ঘর ঠিক করে। নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করে ঠিক করেছে ঘুমুরার জন্য সে এর বেশি অত্যাচার করতে পারবে না। ছলনাকে অন্য কোথাও রাখার ভার অন্যেই সে এনে রাখবে। ঘুমুরা যদি ছলনাকে মেনে না নেয় সতীন বলে তবে সে ছলনাকে নিয়ে ঘটির এই ঘরেই রাখবে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় ছলনা আসে না, অপেক্ষায় বসে থাকে নিতাই। দুপুরে এক বাঁধকে কলাপাতে পুজো নিয়ে এসেছিল ঘুমুরা মেয়েকে ছলনার জন্য। সন্ধ্যে থেকে রাত বাড়ে। ছলনা আসে না। চিন্তায় অধির হয়ে ওঠে নিতাই। অনেকদিন বাদে মোবাইলটার ঢোকে। কবেকে ফোন তোলাই পলায় চলনা। অসুস্থ শরীরে মাতলের জন্য। ছলনার অভিমান পড় হয়। কিছুতেই যেন স্থির হতে পারে না নিতাই। যে একদা দোষ সে করেছে তার জন্য ছলনা তাকে বার বার ধিক্কার দিয়েছে। কথাটা বিঁধে থাকে নিতাইয়ের বুকে।

উজ্জ্বল পরে মনস্থির করে নিতাই ঘরে ফেরে। গরম ফেনা ভেবে ঘুমুরা ভেবে ওঠেছিল। সারাদিন পরে ঘুমুরা ভেবেই ছিল নিতাইকে ওই অবহায় ভেবে বেরিয়ে ওঠে—ঘটি যে ছলনার ছিল সেখানেই তো রাখতে পারতে।

—পরানের আর খাই। সে তো আমাকে জানয়া অবধি রাখতে চায়।

—ঢং দেখে বাঁচি না। ভেবের ঘুনি ফেলেছে পাল ভেবে। লজ্জা করে না?

আরো অত কী কত কত কথাছিল ঘুমুরা তার কোন কথাটাই নিতাইয়ের শ্রবনে ঢুকছিল না। মাথে মাথে ঘুমুরা মেয়ের ভেবে মুখ চাপড়ে কেঁদেও উঠছিল।

খুব ভোরে আলো ফুটতেই নিতাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। মাথাটা তার হাল্কা হয়েছে, তবু যেন বিস্তর পথ ভাঙতেই সে চলেছে। ছলনার সঙ্গে এবার সে শেষ বোঝাপড়াটা করবে।

ছলনার ঘরের পরদা ফেলা। নিতাই ভিড় ঠেলে ছলনার ঘরে ঢোকে। ঘুটি মালি ছলনার বিছানার পাশে বসে ঔষধ দিচ্ছে। ঘরের মাল ঘরেই নিতাই এ-অভিজ্ঞতে আসছে। সবাই ঘুরেফিরে নিতাইয়ের সঙ্গে ছলনার একটা বিশেষ সম্পর্ক হয়ে উঠেছে। ঘরে উপস্থিত সবার চোখেই ছলন হালকার আভা। নিতাইকে ঢুকতে ভেবে মেয়ে মেয়ে সরে দাঁড়ায়। নিতাই ভেবে ছলনাকে সুস্থ ঘরে লাগলো হয়েছে। রাতীর মত ছলনা ওরে। ঘুমুরার ধারণা আর শাঁখা সিঁদুরে ছলনা যেন অন্যা। হাত ভেবে হলার আগেই ছলনা পুতিদীর ছায়া ভেবে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যতেজকে যাত্রা করেছে। কালো চুলে ঢুলঢুল করছে নিতাইয়ের দেয় ভালবাসার লাল লাল সিঁদুর। ছলনাকে ঘিরে নিয়ে ঘটির মেয়েরা যখন উঠলো খল হাসি, হাসি ভেল—

৯

ছলনাকে ঘিরে নিয়ে গল্প করতে ভেলেছে নিতাই। ছলনা যেন নিতাইয়ের সব ভার হালকা করে মুক্ত হয়ে চলেছে অন্যতেজকে। মুখের ভাবে নিতাই পুরে ঘাই হয়ে যাচ্ছে। মাথার ঘাম পায়ে এসে পড়তেও ছলনা উঠে বসে গামছাখানা নিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে না। ঝরিয়ে দিচ্ছে না এক ঘটি জল।

ছলনা-ছলনা আজ হাট হাট করে কেঁদে ওঠে নিতাই। বুকের মধ্যে ভেলেনো ভোখের জলে ভাসিয়ে ভেসে ছলনার মুখখানা।

ছলনার ভেবকৃত্য করে আর ঘরে ফেরেনি নিতাই। সারাদিন আজ গলারঘাটে বসে থাকে।

কথাটা ঘুমুরার কানে আসতে দেরী হয় নি। লোকমুখে সে ওনেছিল তার স্বামীর ভালবাসার মানুষটা আর নেই। মনে মনে খুশি পেয়েছিল সে। পথের কাঁটা পথ থেকে আপদটা সরেছে। দিন কয়েক বাদে নিতাই নিজে থেকেই বাড়ি ফিরে আসে। সারাদিন ঘরের ভেবে উপুড় হয়ে ওয়ে থাকে। ওর ভোখাও অসুখ করে যেন খাবার ভাড়া নেই। মাথে মাথে ঘরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবাবের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এই সময় ঘুমুরার মনে ভেসে যায় আসবাপালা ঘরের অনুঘটকে আঠাপুটে ভালবাসার ভেসে থাকতে থাকে। ভালবাসার সংসারে নিজেকে উজাড় করে দিতে থাকে ঘুমুরা।

কিছুদিন পরে বৌয়ের অন্য ভালবাসায় নিতাই কিছুটা সুস্থ হয়। অনেকদিন ছলনার কথা ভেবে ভাত খাইয়ে ভাত আবার বেরিয়ে পড়ে গলারঘাটের দিকে। মাথে যেন খোঁজে, মনে মনে বিড় বিড় করে কাকে ডাকে, তারপর আবার ফিরে আসে গলারঘাটে।

দু'দিন পর আবার ফিরে আসে নিতাই। ঘরে ঢুকে দেখে ঘুমুরা ওয়ে আছে। শরীরে যেন কোন জল নেই। অসুস্থার মূর্তি নিয়ে নিতাইয়ের অপেক্ষায়। নিতাই ঘরে ঢুকতেই ঘুমুরা নিতাইয়ের হাতখানা ধরে বলে,—এদিনে ভগবান মুখ তুলেছেন, তুমি ভাল হবে গো,—। নিতাই ভাল হবে। কথাটা কানে যাওয়ার পর নিজেকে সে আর ঠিক রাখতে পারে না। সে কী করে ভাল হবে। তবে কী ছলনার কথাই সত্যি হল! ঘুমুরাকে কাছে টেনে নিতাই বলে, যা কালি তা আর একবার বল।

—হাঁ গো হাঁ। ডাক্তারবাবু তো তাই বললেন।

—এরপর নিতাই যে অন্য মানুষ হয়ে গেল। সারাক্ষণ ঘুমুরাকে ঢেকে চোখে রাখে। ঘুমুরার গর্ভে তার ছলনা ফিরেই আসছে। সে তো নিতাইকে ছুটে থাকতে পারে না। সে বিশ্বাসে ভর করেই নিতাই বেঁচে আছে। মাথে মাথে নিতাই মনের কথাটা ঘুমুরাকে বলে,—মেয়েটা ঠিক তোর মেয়ে হবে। উঁচুদের মন দেখতে।

স্বামীর কথায় ঘুমুরা হেসে। বলে,—এতদিন পরে ছেলেমেয়ের খাই ছেকে সে হবে আমার চোখের মনি।

ঘুমুরার কথায় হাসে নিতাই বলে, হাঁ ঠিক বলেছিস। একবার ওধু হতে দে। আর কথা ভাববো না।

এইভাবে এক এক মাস করে দশ মাস পরে ঘুমুরা। শরীরটা যেন বিওন হয়েছে তার এই ক'মাসে অবাবস্থার ভেতরে ঘুমুরার মাথা উঁচানো। যতবার ঘুমুরা মত জানায় নিতাই তত খুশি হয়। ঘুমুরাকে চুলশাতাসে ভর্তি করে রাস্তার দাঁড়িয়ে রইল। ভৈ করতে তার কষ্ট। অধিক পরেই সে খবর পেল ঘুমুরা মেয়ে হয়েছে। সকলের খুশি এড়িয়ে নিতাই ধীর পায়ে উঠে গেল ওপরে। সব চুপচাপ। অন্যমনস্কতা জন্য নিতে ঘুমুরা ঘুমে আচ্ছন্ন। এ-পাশ সে-পাশ দেখে ঘিরে ঘিরে সে এসে দাঁড়ায় ঘুমুরার বিছানার সামনে বাচাটিকে দেখে। ওমা, এ কে। পাশের পাশে ছোট তিলফুলকে নিয়ে অপেক্ষে মেয়েটা। বুকের মধ্যে আঁচিল দেখে নিতাই তার ছলনাকে। আর দেরী নয় ভেবে নিতাই তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে ভেলে বাচাটিকে। এখুনি পালাতে হবে। ছলনাকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না। বাঁচতেও পারবে না। এই বাচা যে ছলনারই তাতে যেন সন্দেহই নেই নিতাইয়ের মনের সঙ্গে আর একবার যুদ্ধ করে। ঘুমুরা সন্ধ্যা ছায়া হয়ে জাগবে। পালার পড়ি দেবে। নিতাইকে ঢোর বলে শনাক্তকরণ করবে আজ। তবু সে কিছুতেই ফুল ছাতে ফিরে আসে না।

নিতাইকে বুকের মধ্যে নিয়ে পালাতে হবে হাঁপাতে সে চিৎকার করে ডেকে ওঠে। নিতার ডাকে ঘুমুরা ভেগে ওঠে। পাল হাতড়ায়। নিতাইকে দেখে ঘুমুরা কঠল ভেবে নিতাইয়ের হাতটা টেনে ধরে। জল ভেল নিতাই ধরা পড়ে যা মেয়ের মেহ বন্ধনে।

গানের মানুষ

শৈলেন চক্রবর্তী

উঠোনের কোণাকোণে বৃষ্টি, টুপুস টুপুস। সারারাত। গভীর রাত, ব্যাঙের ব্যাঙ-ডাক। শেষ রাতে নরনারদের পাড়ির গাইয়ে ডেকেছিল ক'বার। ভোরের বেলায় ঝিমি ডাকল একটানা। এবার এইসবের পর সকাল দেখল অমল।

রান্নাঘরে লোহার অমলের সারারাত। মাঝরাতে কলি এসেছিল একবার, সারারাত জাগি রইব ও। ঠাণ্ডা লাগি যিব, ঘরকু আস।

অমল ওঠে না। খড়ির লোহার বসে থাকে। ঘুমে চোখে ঘুম নেই তার। বৃষ্টিমেদ রাত সঙ্গীতের মতো মনে হয়। একটানা টাপুস টুপুস কুপুস ঘুপুস। ভেরেণ্ডাকোল, লালশাক, রাঙ্গালীলতা, বেগুনগাছ পুইমাচার উঠোনে কর্মরত নদীর ছড়িয়ে যায় ঘুঙুরনয়। চরাচর জুড়ে সুর। অমল আচ্ছন্ন। সুর তার অস্তিত্বজুড়ে। বৃষ্টি-ঝাপটে মাঝে মাঝে ভিজে যায়। ভিজে ওঠে তার কেতর, বহুদিন পর। গান গাইতে ইচ্ছে করে তার, গান হতে। চারপাশে বিস্তৃত অস্তিত্ব ভুলে অমল গুনগুনিয়ে ওঠে। এবং তার কুকে জমানো জলি উৎসব গাহে গলায়। অমল কণে।

পুবের ঘর থেকে অমলের মার আবোঘুম ভেঙে যায়। অস্ফুট এক নিঃসঙ্গ ক্লান্তি ওঁর গলায়, কটিয়ারে ঘরকু যা। আবার কলি উঠলা কেনে? ও অইনা—

অমলের বুকে হাত বুলিয়ে দেয় কলি। ঘরকু চল। বর্ষা ভিজনে জলি যাবকু ঘর যাবকু।

বিছানা টানা দু'মাস। নতুন করে তার কী শরীর খারাপ হবে! গানের জন্য সবকিছু ছেড়েছিল একদিন। আজ দু'মাস গান গাইতে পারেনি সে।

ছাড়ীর গান গাওয়া জানা নি। গলাকু ফ্রেস্ট দেইতে হব। আর এই পুরিয়া ওলা গাইনে ঠিক যেই দিব।

নীলু ডাক্তারের ওষুধ এক সপ্তাহের বেশি খেতে পারেনি অমল। মাথা ঘুরেনি। গানের টিউশনি বন্ধ। হারমোনিয়াম নিয়ে খেলে বসেছে। কলিই নিয়ে দিয়েছে। কলিকে লুকিয়ে দু'দিন তানপুরার ধুলো মুছেছে অমল। ধুলো মুছতে মুছতে আবেগে পরম মমতায় হাত বুলিয়েছে তানপুরার তারে। গাইতে চেয়েছে। গান তার ভেতরজুড়ে। নিজেকে চেপে রাখতে পারেনি। ওনগুনিয়ে উঠেছে নিজেরই গলে সুরে ফুলটা আছে তো ঠিক ফুলের মতো পাখিরাও আছে ঠিক পাখির মতো তবু মানুষ আজ মানুষের মতো আর নেই— এবং ভাবতে ভাবতে হতা পড়ে গেছে।

—ঘুমে আমার কণ্ঠ ওনব নি ত। খাও খাও আমাকে। কলি চেপেছে অমলের কেঁদেছে।

অমল অপরাধীর মতো মুখড়ে পড়েছে বিছানে। মেয়েদের গোপা পৃথুলতিনের মতো ফুল করে ভেবেছে, যা খেই খোলন—এই সংসারের জন্য তার সুর হয়ে ওঠা খুব জরুরী। বিছানায় শুয়ে কেবলই মনে হয়েছে, এই গানহীন মৃতজীবনে সে কি বেঁচে আছে।

অমল ঘরে যায়নি। কলি অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিয়েছে অমলের মাথায়। কলির লম্বা হাতের কর্কশ তালু ওকনো ঝরা কাঁটা আঙুল মনে মনে কবি হয়েছে তার মুঠোয়। কলি আশ্বেষহীন।

: অমল সকালে বৃষ্টিবাদলায় কতকু খেলে বৃষ্টিজল লয়া ঘর তুলুচি। দরজা জানালায় যদি আমপাছ টা লগে, কিন্তু টাকা খেইতে লবে।

অমল উদাসীন। কলির শরীরে কোন উত্তাপ নেই। যাও ওই পড়। টিকে বসি এইটি, ভালা লাগউচি।

কাঁপা গলার রাগ ঢাকে ভোরা-পাড়ে। সর্বারাতে ঘাহেরা জাগরে। চারপাশজুড়ে এমন পরিপূর্ণ জীবনের খেলা। এই মমতাময় মানবের পৃথিবী। জীবনের সুর গান হয়ে আকাশে গান করতে থাকে অমল। ভুলে যেতে চায় সাংসারিক হিসেব অপূর্ণতা অভাব টানাপোড়েন গলে মোটাদানা ঘুণা চালের ভাত শাকভাজি একবেলা। এই মুহূর্তে ভুলতে চায় মার মুখ, কলি, খোকনের অস্তিত্ব। এই সাংসারিক জীবনে কোন গান নেই। গানে কী হিসেব থাকে! পঞ্চমটা না পাওয়ার হিসেব: সা-রে-গা-মা-আবিষ্ট হয়ে কী মনে থাকে টিউশনি কি কত মেয়ে! কিংবা তিনমাস বাকি পড়েছে মি, দিয়ে যাস তো বাবা-কলতে পারে অমল? কাগজ কলমে হিসেবগুলি নিয়ে নিখুঁ গাইয়ে যা গানের মানুষ—পারে না সে।

অথচ অমল তো নিজেই গান হতে চায়। ভুল হিসেব গুলিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে সেই যৌবনেই। গানের জন্য অমল কিংবা অমলের জন্য গান—এমনই স্বপ্নময় ভাবনা তখন। তার ভেতরজুড়ে সেই গান সেই ঘর আজও। কিন্তু নিরন্ত এ ঘর ভাঙে, অমল গান হয় না, হয়ে উঠতে পারে না। চারপাশের হিসেবী চোখমুখ হিসেবী চাহিদা তাকে ওড়িয়ে দেয়। পালাতে পারে না, সংসারের জোয়াল কাঁধে অমল হাঁটে মৃতবৎ। বলা হয়।

কলি একদিন চাদর জড়িয়ে নিয়ে যায়। অমল তখন সামলে নিয়েছে কলি। বাবা, সকালেই বাবা, তুমারকার দুবারু। আবগটার ভালা বাস নেই পারে। যাও ওই পড়।

তারপর রাতি রাত, সারারাত। সাংসারিক ভাবনাগুলি বেশিক্ষণ ছড়িয়ে থাকতে পারে না অমলকে। তার নিজস্ব মন থেকে সরে পড়ে বরাবরের মত। অমলে সংসারের কথা সে কোনদিনই ভাবেনি। ভাবতে চায়নি, পারে ও নি। বাবাকে দেখে কষ্ট হত তার। সারা মেদিনীপুর চিনত তার বাবাকে। কলকাতার বাড়াদলে ঘুরে ঘুরে জোমর জোগায়। তখন তো বাড়ায় থাকতনোর মতো গাইক ছিল না, বর্ষাস সিনেমা তেলেকি বাড়ি জলু সবকিছু মিলেমিশে যাবনি বাড়ায়। নিজস্বতা ছিল, বাড়ায় নিজস্ব জগৎ। বাড়া-শিল্পী হিসেবে অন্য পরিচিতি। সিনেমার মাহত নায়িকারা মুখে মেখে মুখ দেখিয়ে লোক টানতে না। বাড়াশিল্পীরও নিজস্ব অহংকার ছিল। সেই অহংকারে অমলের আবারও। সবাই বলত, সুরসাগর মরমী লাল। ট্রাপজম থেকে শুরু করতেন। গলা ছাড়তে ছাড়তে মঞ্চে। হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের বসত। গান থেমে যেত, বাজায় তাজা মেলা তালি চিরোনও।

সেই মরমী লাল বড়ির উঠোনে কেমন আটপৌরে সংসারী। মুখ কচুমাচু সকাল সন্ধে। অমল দেখত, মায়ার আবাজীবন। এই বর্ষায় উনুনে স্যাঁতসেতে নারকেল পাতায় ফুঁ দিতে দিতে চোখ চিকে উঠত। বহু গুণগ্রাহী মানুষজন, গানের ছাত্রছাত্রী আসত প্রচুরিনই। অতিথিকে না খাইয়ে ছাড়তেন না মরমী। অমলের একলাঘরে পারত না। উঠোনে কাজুবাদামের গাছগুলি ছিল সেখানে। সেই ছায়ায় বসে ঘাই দিয়ে বসে বসে চুনামাছের ঝাল ঝাড়িয়ে ঝুঁকে সাজাত করতেন মরমী। আদাবেড়িয়া মার্কেট সমুদ্রের মাছ উঠত খুব, দু'টাকার মাছেই একবেলা হয়ে যেত।

ভোরবেলায় গলা সাধতেন মরমী। যেন সাধনা, এবং বলতেনও, এসব তো সাধনাই। অমল একটু আর লিকি, ধর, ধব, আমার সাঙর। গলা ঝাড়ব।

রান্নাঘরের বাওয়ায় কাঁঠালপাতায় তেল মাখিয়ে পেতলের ঘটিবাজা ঘষিয়ে অমলের মা বলত, আর কটিয়ার মাথাটা খাওনি, দু'মুঠ ভাতের সিদ্ধ দাও। গলা লিখুচি, গান গাইনে পেট ভরব? ঘটিয়া, যা ত রে বাপ, অজনার মা ভকরে পটে রেখু আনবু।

অমল দেখত, সে সময় কেমন যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ লাগত বাবাকে।

সংসার মানুষ তৈরি করে, নাকি মানুষ সংসার গড়ে। সংসারের জন্য মানুষ, নাকি মানুষের জন্য সংসার। মেয়ে ভাজা জোছনার মতো ম্লান হয়ে ছেলেন মরমী।

সাধারণ একটি মানুষের দু'চোখ জুড়ে ঘর গেরস্থালী। মনের ভেতরে হিসেব, ঘোরপাঁচ; মরমীর দু'চোখে নিথর অনর্থক সরলতা। একটি ফুলের সংসার একটিতে গান। আর দুধরজুড়ে কেবলই সুর, অনন্ত সাধনা।

মরমী মারা যাওয়ার পর ঔষধির কাগজে খুঁজিল খবর। খবর পেয়ে চায় পাশের গ্রাম ভেঙে লোক আসছে। কলকাতার বাড়াদল থেকে কত চিঠি, ক'মাস ধরে। আবার সেই দুর্দান্তই মেদিনের দলের বন্ধুর অমলকে আনবনা করে পুষ্টি ধরে। ভুলে-মানুষ উঠোনের ঘটিয়ার বাবা, রাজার মতো। চোখমুখে তাঁর ঈশ্বরের অহংকার। দু'ঠোঁটে লেগে আছে অদ্ভুত হাসি। যেন উঠোনবর্তি লোককে কলছে

চাইছেন, এ কোন সংসারীর মৃত্যুবাসর নয়। এতো অনন্তবাসরের গানের আসর। এই মানুষ, এদের তোমরা আজকালকার ভালবাসা দিয়ে। গান শুনতে পাচ্ছো? অমৃতের গান জীবনের গান ভালবাসার গান। প্রেমী গান করেছেনেহি গান গেয়েছি। তোমরা গান শুনে ভালবাসা দিয়েছ ভালবাসতে শিখেছ। সেই টানেই তো এসেছ এখানে। ভালবেসে আমা। ভালবেসে ফিরতে পারো, সেই তো জীবনের প্রাপ্তি। আর চারপাশের জীবনছুড়েই রয়েছে গান, জীবনের পটভূমিই তো গানের সুর। কান পাতো, সেই সুর খুঁজে নাও। দেখো, সুর শুধু ভালবাসার কথা বলে, অনন্ত বিস্তৃত উদার পরীর গভীর ভালবাসা। যেন সুরেই মিলে সেই সত্যোত সেই হিসেব নেই। সুর খোঁজ সমৃদ্ধ হও, চারপাশকে সমৃদ্ধ কর।

আবার জন্ম হয় অমলের। সেই মৃত্যুবাসরেই যেন নতুন করে ফিরল জীবনে। রক্তের সম্পর্কহীন অচেনা অজানা শত শত মানুষকে কে টেনে এনেছে তাদের উঠোনে? বাবা মাকি কারার গান! গানই তো এইসব মানুষজনকে আত্মীয় করে তুলেছে, আপনজন সব। এই অমলিন সম্পর্কে পরিবারিক রক্তস্রোত নেই জাত নেই সম্ভ্রান্ত নেই ধনী-গরীব নেই গ্রাম-গঞ্জা ভিতেদ নেই।

স্মৃতি-আকাশে অমলের হাসির তারা ফোটে। বৃষ্টি ঝরতে থুঁজতে থাকে সুর। সারারাত। ঘরে ওঠে হিসেবহীন আনন্দের মানুষ।

বৃষ্টি আসল না সকালেও।

বেলা বাড়ে, বৃষ্টি আসে না।

একদল আসল বেলা তারি, ওরিআন্তরী নদীর মতো। কলিও এমনি ছিল, কাঁদলে থামতে জানতে না। সে কি কান্না বিশেষত্বীর। অমল আর কোন মেয়েকে গান শেখাতে পারবে না। অদ্ভুত আবার, বড়লোক ঘরের আদুরে মেয়ে। অমল কুবেছিল, ও মেয়ের হবে না। তবু বাপের সখ, ও অমল, মেয়েটাকে টিকে দেখবু তা আসলকা আসর টিকে গান টান ন হেইনে—

আবার ফেলে আওয়া হারমোনিয়াম নিয়ে অমল তখন গানের মাস্টার। পাড়ার ফেপড়ায় তিনখানে, কাঁসিতেও দু-তিনজন ছাত্র। টিউশনির কি না, গান নিয়ে মাটানো সারাদিন। তার মা পাইত না, তবু এমনই সময়ের তালমান বিন্যাসন অমলের।

এবং সেই সময়ই তার জেতরজুড়ে অন্যরকম তাপ্তুর, অমল, বহতা স্রোত। কৃষ্ণকলি ফেলেই 'কলি' ছাড়া এবং অনেক বছরের মধ্যেই বউ। প্রথম ছেড়ে ইঁচিয়ে-কাশে হারেন, তাদের হয়ে সেই প্রথম। সংসার বিষয়ে তাদিকে অমল পাত্তা দেনি। মনে হত, কলিই তো গান, কলির জন্যই গাইতে পারে অমল। কলিকে না পেলে কি হবে এই গানে এই জীবনে।

কলি ছিল। নিশ্চয়ই পুলিয় (স্ব) কলি কি সোল ভাইনে সেট ভরব। তুবারকার গুরাপু বাইতে কইলে তার বেলা সময় হোলনি। রাগভরাবে বিছুড়ির থালাটি আসন পিড়ির সামনে নাছিয়ে দিল কলি।

গ্রাম তোলে আকা। কাঁচা-মুগুরে গরম ভাপওঠা বিছুড়ি খড় দিয়ে, ভালো লাগে। মাখা নিয়ু করে খায়। বিচ্ছুক্ষণ অপরাধী লাগে। বিস্ময়ে চলে আসে মেঘ থেকে ভাল, এই দু'মাস বিস্ময়ে চলিয়ে আসে কলি, সে জানে না। তার মধ্যে কেবলই ঘ্রাণহীন। কলির জন্য এখন অমলের গান, নয় অমলের সংসার। অজান্তে স্বার্থপরের মতো তাই ভেবেছে যেন। কলির ওপর থেকে গায়ের নির্ভরতা। গান নয় ভালবাসা নয়, কলি এখন শুধুই প্রয়োজন, নিরাপত্তা। কলিকে ঘিরে আর যেন মেয়েদের অনুভব নেই তার মধ্যে। অথবা হয়তো সে অনুভব নেই কলির আয়ত্তে। অমল স্থিরে হয়, এক একটি গ্রাস তার গলায় আটকে যায়, ফেলে ইচ্ছে করে না।

ঠিক তখুনি এল মেহেটি, তারতী। অমলের সামনেই অমল, কিছে দাওয়ার লজ্জাহীন। আমু এই বর্ষার বিছুড়ি। বৌদি অবিও থাকে কিন্তু। মর্যাদ সিঁদুরে ইটির মতো ঝলমল করে মেয়ে।

: কলকাতা নু ফেরে আইলু তাক? ঘরর সব ভালা ত।

: এই তো একটু আগে। কি বৃষ্টি বাপরে বাপ।

: ভুমে ভালা?

: তারতী শাড়ির আঁচল জড়াতে আঙুলে, জড়াতে ফেলে।

: আপনার শরীর অন্য খারাপ হল কেন? আজ ফেরুর হোলে, সহজ হওয়ার চেষ্টা করে।

কলি সইতে পারত না তারতীকে। তুমে যাব পি, ও মেয়েকে গান শিখিয়েব নি। ভালা না, ও মেয়ের চরিত্তির ভালা না।

তারতীর বয় অনেক। পড়া বেপাড়ায় সবাই জানে। তাকে এই মেয়েটিই এক বিকেলে জীবনপুরুরের ঘাট থেকে উঠে এল। অমল কিরছিল কলি থেকে। সোনাঝুরি গাছের তলায় মেয়েটি দাঁড়াল তার মুখোমুখি, কি সাহস! পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সরাসরি বলল, আমি আপনার কাছে গান শিখব, আমাকে ফেরাবেন না মাস্টারমশাই। আমি ভাল হতে চাই। অমলে অবাক হল মেয়ে।

কলির চাহিদা তখন। গান নয়, সংসারেই সুখ তার। টিউশনির টাকা পয়সা সেই তুলেনে নেয়। নতুন গান নয়, তার প্রয়োজন নতুন টিউশনি।

তারতী মেয়েটির সংসারের চাহিদা। প্রথম দিনই পাঞ্জাবীর ছিট কলির জন্য শাড়ি। অমলের পায়ের কাছে একশ টাকার নোট রেখে বলল, এটা আপনার।

আপত্তি তুলে নিয়েছিল কলি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কলে যায় ভালবাসার উৎস, উৎসমুখ। কমে যায় স্রোত গতি। এক সময়ের ভালবাসা মোহহীন প্রয়োজন হয়ে ওঠে। কেবলই প্রয়োজন। মানুষ হিসেব কষে প্রয়োজন মেটায়। এখন জীবনের বাস্তা সে অকে বিলোবে? তার কষ্ট-কল্পনাগুলি কার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবে? কার কাছে গান হবে? ভালবাসার স্রোতহীন প্রয়োজন হয়ে উঠলে সে-জীবন অনুভবহীন কাঙাল হয়, ভালবাসার কাঙাল, ভিখিরি। জীবন আবার উৎস খোঁজে, খোঁজে উৎসমুখ। নিজেকে ভাষ করে নিতে চায় পেতেও চায়।

অমলের কাছে তারতীও একদিন 'তীর' হল। যেন একটি হবারই কথা ছিল। সেই অন্তরঙ্গতারই নিনে অমলও আজার পেল। তার মধ্যে আবার কখন আবার স্রোত, নতুন কথা নতুন সুর নতুন গান।

তারতীর গলাটি বেশ। তার ভেতরে গানের বীজ ছিল। অমল শুধু সুর তুলে নয় বেঁধেছিল, গলায় মিশিয়ে দিল তানপুরার সুর। ভেতরের বীজগান উঠে এল তারতীর গলায়। আজই, সেই পরপ্রাথর।

আশ্চর্যভাবে ক' বছরেই তারতীও সামান্যিন নাই, ঘিরে ছটিছিট ঘর। এখন আকাতার বাসাবাড়ি তারতী চেষ্টা করছে, আকাতা থেকে অমলের গানের একখানা আসেই যদি করা যায়।

আকাশ হালকা হয়েছে একটু। টিপিস টিপি বৃষ্টি-দুপুর। তারতীর এসে দেওয়া গন্ধ পেকে অমলের মা কেন খুশি হয়ে ওঠেছে। ফুলকোলা মাংস নিয়ে মোকলের কৌতূহল। তারী শিপুকে তার ভাত লাগে। অতো চকো-বিস্কুট আনে। কলিও নির্ভ অনেকটা। তারতী এলে তার পরি, ঘোঁটে জল পে সেইটি যারা হয়ে, মেয়েটি ভালো।

অমলের উজিয়ই যাবার কলি, বিকেলের ক চাপাচ্ছে তারতী। যেন দু'জনে পালাপালি। হাসি পা হচ্ছে-হচ্ছে পায়রামুখ।

সুর হয়ে উঠেছে অমল। ভেতরে তারতীদিয়ে জমে থাকা মমতে ভরে যাচ্ছে। অন্তর নিখাদ সুরে সে পুষ্ট হচ্ছে। অনর্গল শব্দ এসে যাচ্ছে নতুন নতুন শব্দমালা। কথা তৈরি হচ্ছে, সুর উপর কবিতা এবং গান। সুরে সুরে শব্দ-কথা, গান গান তৈরি হচ্ছে ঘরলিপি।

সকালে উঠেনের জল ঘরে ঢাকিল ভোজ এখন তোথা উপড়ে ফেলে বাচ্ছে উঠোন। মাঝারী জ ঝুমঝুমে ভোর। মেয়েরা ভেসে বাচ্ছে ঘরটের। সেই ভে অমলের ভেতরে বাইরে। তার দু'চোখ দুই নারী, দু নদী। সত্যিই বৃষ্টি চোখ মেলে দা, হৃদপিণ্ডের বৃষ্টি ঝরি একজন সংসার অন্যজন সুর। একজন প্রেমে অন্যজন ভালবাসা। বৃষ্টি-এ মিলে অমলের সাধনা পে যেন। সে ক্রমশ বেঁচে উঠছে।

বাইরের বারান্দাটিতেই মাদুর বিছিয়ে তারতী। অমলের মাথার কাছে কলি, পায়ের ক উঁচু। ওরি ওরি বৃষ্টিছাট। কলি শাড়ির আঁচলটি ঢেকে দেয় অমলের বুক। উঁচুর তারি ইচ্ছে, ব অমল ছড়িয়ে দেয় অমলের গায়ে। পারে না। ে এক অদৃশ্য দেয়াল সে আটকে যায়ে। ভাটটুকু পুরি নিতে চায়, একটা গান অমল না মাস্টার মশাই। ন দেখা গান।

: গান গাইনে যে অমল কলি হয় তারতী। এ বাড়ি। কলি বলল...

: আজারবাবুর জাপকটা তো নিয়েছি, ও নিয়ে আসব বিকেলে, গান না গেয়ে মাস্টারম আসেন কি করে।

অমলের এই মুহূর্তে কলি এক গান খুশি ইচ্ছে করে প্রণয়নে কলি চেপে গান গেয়ে ওঠে। অনুচ্চারিত গানের বীজটিকে তুলে আনে গলায়, পল্লি করে। বৃষ্টি দুপুর মিষ্টি-সুর। অনন্ত সুর করিয়ে যা তা হচ্ছে। অসংখ্য কথা-সুর গান-পাখার মুকুলে পা অমল যেন তরা-মানুষ আকাঙ্ক্ষার আকাশ হতে ই করে তার। ইচ্ছে করে সকলকে ডেকে ডেকে সীমাহীন সুখ বৃষ্টিফোঁটার মতো বিলিয়ে দি প্রেমের নাভিকুণ্ড থেকে উঠে আসছে গান। গান গানের কুকুল, বৃষ্টি। গলায় তরঙ্গ বরাবর সেই সুর মেঘে উঠে আসে জিভে ঠোঁটে অবশ্যম্ভাবীভাবে ফেটে পড়ে কলি হয়ে। অমল ক কলতে থাকে।

কর্মী

মেকাইল রহমান

সূর্য ডোবে নি তখন। কল কেলার প্রকাণ্ড মাঠে একদল কিশোরের মধ্যে ফোরের তুমিকার ব্যস্ত আবু। এই ছাড়া এ বছরে বিউটির কিছু তার মাথায় নেই তার তা সেই মাঠে বিয়েই আবুকে ধরে জামাত। পূবপাড়ার ক্রমী জামাতে ব্যাপারী। কথামালা, সন্ধেবেলা সবাই আসবে। একজনার একটু বসা দরকার। ঠিক হয়েছে, তোমার বাড়িই বসা হবে। বেড়ি ছেলে কিন্তু।

অন্তিম কিছু জানাব সুযোগ পায় নি আবু। সাইকেল ছেড়ে তার নামেও নি জানাত। ইশারায় কথা ছেড়ে তড়বড় করে কাজের কথাটুকু বলে তখনি। লগবগ করে উঠাও হয়ে গিয়েছিল। আবু ভেবেছিল, ছোটের আগে ক্রমীসভা-টিবা হবে। ভাবনা তার মিথ্যে হিল না।

তবু মনের মধ্যে একটা খুতখুতানি তার কিছুতেই যাচ্ছিল না। 'তোমার বাড়িই বসা হবে। বেড়ি ছেলে— তখনি হুকুম করলেই হলো। অনেক মিটিং হয়েছে। কোনদিন আপত্তি করে নি আবু। কেন ওজর দেয় নি। কিন্তু আজ লাইন তো অনেক ছেলেছে সে। সব মালের বেতোরা ক্রমীরা গ্রামের সাধারণ অভিভাবকেরা ওরু তার কথার উপরে ভরসা করে তাদের অভিভ ছেলেগুলোর মুখর মেড়ে ওঠার তার ছেড়ে দিয়েছে তার উপর। আজ আবু কেন সভায় নয়। এই অবস্থায় বাড়িতে পার্টির মিটিং বসানো মানে নতুন লাইন-টাকেও অচল করে ফেলা।

জামাতটা মুসড়ে বিয় ছেয়ে দাঁড়ালো, সব ওনে বুঝে আবু বলে দিতে পারতো, ও হবে না, অসম্ভব। এখন হয় সন্ধেবেলা বাড়ি আসা হবে না, নয় চাটা পাততে হবে, চা করতে হবে, পুরোদস্তুর ক্রমী হতে হবে। কী করবে ভাবতে ভাবতে জামাতের খবরদারিকরা কথাগুলো বারবার মনেমনে আওড়াতে থাকে। জামাত মনে পেয়ে, 'সবাই আসবে'। সবাই মানে এল. সি. এম. অটীন বাবু, সভাপতি সাহেব। সবাই মানে ছবিল মেম্বার ছেলেতে কমরেড। ওরা সবাই। আরো সামান্য ভাবনা চিন্তার শেষে হিসেবটা নিখুঁত করে ছাক নেয় আবু। তারপর মাঠ থেকে সোজা বাড়ি।

চাটা পাতা মলো আবুর বেড়ুমেরা ঘরখানায়। জরুরী চিঠি পাওয়া ক্রমীরা বসেছে ঘেঁষাঘেঁষি করে। অনাহুত আগন্তুক কিল হিল জন ঘিক ঘিক করছে নীচে ঘাবতলায়। তেমন একটা নড়াচড়াই করছে না আবু। বসেছে নেতাদের মুখর সামনে। তার হাতে কাগজটা বসেছে আবুর দু'চোখ—মজিল ও মজিদ।

জামাত প্রস্তাব পিলো, মজিল চা-ই সভাপতি হোক আজ মিটিং-এ। বিউটির কেউ সমর্থন করলো এ কথাটি প্রস্তাব পেল মজিল চার ছেলেল। পাশ থেকে একজন বললো, নেতারা সবাই থাকতে মজিল-চা মজিদের ছেল? তাদিক থেকেই একজন হেসে না। আমনি জামাত প্রস্তাব করলো অটীনবাবুর নাম। বাকিরা সমর্থন দিলো একজন।

জামাতত মিটেছে আবুকে সন্তুষ্ট করার প্রাস করলো। ভাবলেন, সভাপতির আসনটা তার বাড়ির কাউকে দিতে ছেয়ে সে খুশী করবে আবুকে। এ ওদের গোছানো চাল। আবু আর অত বোঝা নেই যে, আজ এই কর্মিটুকুও বয়তে পারবে না। সে কেবল ঘটনার গতিপ্রকৃতির দিকে সতর্ক নজর রাখবে। সুযোগ মত আজ সব কথা তুলবে: তুলোধোনা করে ছেবে সব।

কিন্তু আর অবশিষ্ট চাবে নি আবু। সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে সে পার্টির জন্যে। কাল, যৌবন। প্রাণ, সমর্থ সব। পার্টিকে ভালোবেসে! আর সামান্য ছেলেন একটা ফছলের আশায়। আজ এক-ইয়ারে পাস করা ওরা কেউ প্রাইমারিতে, কেউ হেলথে, কেউ অর্গেনাইজেশনে। নিতি আছে। আপাতমন আশার বাসনাটুকু পেরিয়ে ছেল। আন্তর্জাতিকের বিরিশি আবুর এখন ক্রুদ্ধ ছেলে, ফরমটা কেউ কমিয়ে দিতে পারবে তার! কেউ পারবে ওরা!

পেয়ে তো সব, তবে সুযোগ যখন আজ নিজেরে, কাউকে ছাড়বে না আবু।

ছেলেরা কমিটির সেক্রেটারি মহাশয় এই মুহূর্তে সংগঠনের অতীত ইতিহাস ঃ-হিত সকলকে ঘরল কমিয়ে দিতে মুখ খুলেছেন। মূল মিটিং শুরু করার আগে সেদিনের ঐতিহাসিক লড়াই-এর প্রসঙ্গে একটু জোর দিতে চান তিনি। জানাবেন, সব। অটীনবাবু বলে চলেছেন—সেদিন কিন্তু এত ক্রমী আমাদের ছিল না। গাঁ-গ্রামের এত মানুষ ছিল না আমাদের পাশে। ওদের ভালো করেভাবিতে হবে কমরেডস, আজ সাধারণ মানুষ আমাদের পক্ষে, তবু কেন চাসা হচ্ছে না সংগঠন।

ছুতনুড় করে আবু। ইচ্ছে করে তার, কেন সংগঠন চাসা হচ্ছে না তার আসল কারণটা খুলে বলে দেয় সেক্রেটারিকে ঘাবিয়েই। কিন্তু কথার মধ্যে ঢুকে পড়ার কোন ফাঁক পায় না আবু।

অটীনবাবু বলে চলেন—আমাদের সংগ্রাম, কৃষকের সংগ্রাম। এ সংগ্রাম, ক্ষেতমজুরের সংগ্রাম। সমস্ত মেহনতী মানুষ, কমরেডস্, সামিল হয়েছে এই লড়াই-এ। শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে তাই শক্তিত হয়েছে এ লড়াই। কিন্তু বড়ো দুঃখের বিষয়, কমরেডস্। আজ—

সতর্ক ছেলের এক আওনে হৈচৈই জামাত ঘবিয়ে দেয় তার অটীন বা কে। এতদিন আছে পাড়ার ক্রমীরা এই সব বক্তাপচা মাল নিলবে না। আর ক'টা মাত্র দিন। সামনে বুধবার নাম জমা দেবারাব শেষ তারিখ। আজ রবিবার। একদণ্ড পর্যন্ত প্রার্থীর নাম ঠিক হলো না। কর্মীদের মধ্যেই ওরু হয়ে গেছে দলাদলি। পশ্চিমপাড়ার ১৩ নং মুখে প্রার্থী কে হবে, সেই কথাটা আগে জানতে চায় সবাই।

জামাতের ছেলেরা ওতো ছেয়ে নিজের বক্তব্যকে অতীত থেকে বর্তমানের দিকে ফিরিয়ে আনতে হয় সেক্রেটারী মহাশয়ের। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতকে তালিয়ে মিলিয়ে লম্বা বক্তব্য ফেড় সকলকে আচ্ছন্ন করার টিকমতো সুযোগ তিনি পেলেন না। কেননা পাড়ার নাড়ি ওই জামাতের হাতে। তার ইঙ্গিত অবান্য করলেই ভরাডুবি। দুঃখের বিষয় কথাটা ফিরে থামলেন অটীন বাবু। ১৩ নং-এর প্রার্থীর ব্যাপারে কথাটা ঘীরাবে ঘীরাবে পাড়া যায়, তা জানতে সময় নিয়ন্ত্রন সামান্য।

প্রমনি ক'জন অধৈর্য কর্মী জামাতের বাস্তামিকে বেয়াদবি অগ্রাহ্য করে ম্যাচাস করে তাদির মেয়, কী হলো, থামলেন কেন। আমাদের প্রার্থীর ব্যাপারে কী হবে তাই বলুন।

—তা বাঁড়া বাপ। ঐ জন্যেই তো আসা। আগে আসতে সে সে আমাদার। পরিস্থিতি সামাল দিতে একমাত্রই কথা বলেন অটীনবাবু। এ ব্যাপারে তাঁর ছুটি নেই।

আজ মজিল চা বলে, একারে কিন্তু ছেকরে দাঁড় করাতি হবে।

জামাত মনিটারি করে, আলোচনাটা ছুতে যাও। ক'জন দাঁড়াবে একটা মিটে। একমত হতে হবে তো সবাই, না কি।

এখানেই একটা হোঁচট খেল সভার কথা।

অঞ্চল চা তা আবদার জানাতেই, আরো ক'জন তাদের পছন্দের লোকদেরই প্রার্থী করার দাবি জানাল।

চেষ্টা দূর করে ও-কথা ভাববে, তাতেও পরে নি আবু। তার মতামত না নিয়েই কথাটা বলে দিলো চেয়ে গেলেও সে ছোটো দাঁড়াবে না। অনেক করেছে আবু। আমা ঘরে থেকে তার ও পার্টি আর রাজনীতিতে।

কর্পোরেশনে প্যানেলটাও পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। আবু নিশ্চিন্ত জানতো, চাকরিটা তার হবেই। কিন্তু ওপর লেভেলের যোগাযোগটুকু আর কেলেঙ্কারিই হলো না। হেরেছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে ওরা। কর্পোরেশন অফিস ও পার্টি অফিসের সুসম্ভ থাকার মানুষ মতো পাক খেয়েছে আবু। একবার মেয়ার, একবার মন্ত্রীদের। কেলেই হেঁটেছে। ওদের নির্দেশ পালন করেছে। অপমান, অবিরাম। প্যানেল যখন হয়েছে, প্যানেলে না যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই হবে। আজ, নয় কাল। তবে হয়েই। আবু কল্পনাই করতে পারলো না যে, নামটা তার প্যানেলে থেকেই যাবে, কিন্তু ফাইনাল আর থাকবে না।

আজ আবু আন্দাজ করে বসবে না ওই সেক্রেটারি।

জামাতের মনিটরিতে সন্তাব্য শান্ত হলে সেক্রেটারি প্রবেশিক ভূমিকা ছেড়ে সটান চলে আসেন প্রার্থী প্রসঙ্গে। এ প্রসঙ্গের আলোচনার ওপটা তিনি ধরে নিলেন। দায়িত্বের বলবেন এবার সভাপতি সাহেব। নিজের আরথার আসেই ওঠ করলেন সভাপতি—আপনারা সবাই জানেন যে, প্রতি নির্বাচনেই প্রার্থী বাছাই-এর ব্যাপারটা পল্লার কমীরাই দেখেন। পার্টি অফিস থেকে জাউকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। কমীরা পার্টির সমর্থক-ভোটারদের সঙ্গে পল্লার পাড়ায় বসে আলোচনা করেন, সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরাই পার্টি অফিসে জানিয়ে দেন প্রার্থীর নাম। পার্টি-অফিস থেকে সেক্রেটারি এরপর নমিনেশন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এতদিন তাই হয়ে আসছে। কিন্তু কমরেডস্, এবার আমাদের কাছে খবর এসেছে যে, কমীরা নিজেদের মধ্যেই কানাকানি করছে, যে আর যাকে প্রার্থী বাছাই নিয়ে এই যে জটিলা, তাকে পরিষ্কার করবেই আজ এই জরুরী মিটিং। আমি চাইব, যেনি সময় নষ্ট না করে, এখনে যেই আপনারা এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন। কমুন আপনারা।

আবু ভাবে, এই মোক্ষম সুযোগ। ও সভাপতির বিরুদ্ধেও কথার অনেক কিছু আছে তার। পল্লীবিলির কথাটাই তোলা যায়। নিতান্ত স্বার্থপরের মতো আর কথাটা বলে নি আবু। সামনা পাড়া চেয়েছিল সে। এখন পড়ার পল্লীবিলির ঢিঢ়িক। মৃতদেহের সহজের অনুরোধরা আর অনুরূপ অর্থসাহায্যে আব্দুল এ অফিস সে অফিস করে জমি বের করে আনলো দু'শের বিঘের উপর। পাড়ার সে নিজেই বিলি করতে লাগলো জমি। বিলিবন্টনের তালিকা বানালো সে। বাদে মাঝে বাদিল করে দিলো সে। পার্টি তো তাকেই পরিষ্কার দিলো সব।

আবুর চাকরির সম্ভাবনা তখন আর নেই। লেভেলের পচটা পরসা সে দিতে পারে না। লেভেলের আর নেতাই আর বই-এর অ্যাসোসেয়েটরির সৈয়দের মোকাবেলার মাত্র সমর্থের সংসারে মূর্তন অবতরণ। দুটো পাঁচটা টাকা হাত খরচ পায় আবু। অন্য লজ্জায় দিন। ছড়ো অপমানের আর আত্মগ্লানির। আবু ভেবেছিল, বল দিন অর্থাৎ পাড়া জমি ফেলে দু'টোর মধ্যে করে দিতে পারে তবে আরে, তবে তাদের যা অন্তত খুশী হবে একটু। অন্তত এটুকু বুঝবে যে, একদিনের পার্টিকর্মা একেবারে পুরো বিফলে যায় নি। এরকম সাতপাঁচ অনবরতিন্ন ভেবে, শেষে সভাপতিকে দিয়ে ফেলেছিল আবু। বলেছিল, আব্দুল ওলিদ করে বিলিবন্টন করছে। ওকে বলে সামান্য কিছু জমি করে দিন আমার ছেলে দু'টোর নামে। সে ছিল আব্দুর নিজেকেই তাবিদ।

সভাপতি বলেছেন, পাড়া তিনি হওয়া উচিত সাধারণ কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে। কেন পার্টিকর্মী পাড়া দিলে সাধারণের চোখে সেটা ভালো দেখাবে না। দুর্নীতির কথা উঠবে। বস্তুনিষ্ঠপোল নীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। আর ছেলের মতো একটা সাধারণ কর্মীর নামে এ জিনিস জমাজমানি হলে, তা একটা লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে।

কিন্তুই দৃষ্টান্ত হয় নি। আবু আজ সভাপতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে, তার মতো খুনরো কর্মী একজনও বাদ পড়ে নি। প্রত্যেকে নিয়েছে পাড়া। কেউ কেউ তিন সাতেও পর্যন্ত।

উপযুক্ত অবে আবু। কথা বলার এই সুযোগ। ও সেক্রেটারিকে, ও সভাপতিকে ঘুরে দিতে হবে আজ। কাকে রাখে ধরা যায়—সেক্রেটারিকে, না সভাপতিকে এটুকু মনে মনে ঠিক করে নিতে না নিতে কথা বলার সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে গেল আবার।

মূল আলোচনার আগে নিয়ে ও প্রশ্ন তোলে একজন জানায়, প্রার্থী আবদুল্লাই হোক। আজ অতটা জমি নিজের চেবটার সে বাদাস করে আনালো। একতলো পরিষ্কার হাতীর মতো বিলি বন্টন করে দিলো। সভাস বলার আ হয় নি, আব্দুল তা তবে দেখিয়েছে। আবদুল্লাই পারবে পরিষ্কার মেয় হয়ে লড়াই করতে। ও-ই হোক প্রার্থী।

প্রস্তাব শুনে আবু ঘাড়ির দিকে ঝুঁকে গেল অতীনবাবুর। হবিল এবং তোকে এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। সভাপতি জানালেন—কিন্তু আবদুল্লার নামে আজে বিপোর্ট এসেছে আমাদের কাছে। নানা সময়ে নানা কারণ দেখিয়ে বহু চাঁদার কেকে ও কেন কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে আত্মসাৎ করেছে। আব্দুল প্রার্থী হলে কর্মীদের অনেকে আপত্তি করবে। ও হবে না। আমরা চাই সর্বসম্মত প্রার্থী।

কেন অভোকজনের অন্য আর একজন কর্মী সম্বন্ধে আক্রমণাত্মক হলেও আবু কেন করে রাখতে পারে না নিজেকে। পার্টি তার মনে যৌথালি করেছে। নেতারা কেন প্রতিক্রিয়াই রাখে নি। ওরাই একটা অভের তার ক্ষমতা করে দেবে, এই আশাতে থেকে, শেষপর্যন্ত নিজের ভিতরের শক্তিটুকুকেও সে নিজেরে করে ফেলেছে। মেয়ের দিকে হতোদ্যম আবু সব ঝাঁপে আরো আরো ঝিম করছিল। ওরাও কেন পাল্টা বিদ্রিল না আর। কমী সভা হচ্ছিল, অথচ কেন খবরই পাচ্ছিল না সে। আজ মনের আরো পুরো লাইনটাই বদলে ফেলেছে আবু। ঠিক করেছে আর যে কদিন বাঁচে, বিদোর ছেলেদুটোকে নিয়েই চুপ চাপ করে নির্ভাবনায় কাটিয়ে দেবে জামাতে। এখন সে মুখাপেক্ষী নয় কারোই নয়। পার্টিরে, রাজনীতিরে তার সালাম।

কিন্তুরা এমন হয় কেন! আব্দুলের প্রার্থী হওয়া নিয়ে কর্মীদের মধ্যে দু'পক্ষের দু'রকমের বিস্ফোরণের টানাপোড়েন জড়িয়ে যায় কেন আবু। আবুর মনে হয়, প্রার্থী কে হবে না হবে, সে বিষয় সে-ও কি একটা পক্ষ।

কিন্তু এমন হয় কেন! অত্যন্তাবিক চাপান উতোর, এবং কিন্তুক্ষণ তর্কবিতর্কে অতীনবাবুর প্রস্তাব হওয়ার উপক্রম। জামায়াই ঘোষিত করে উঠে দোড়ালো।

সভাপতি সাহেবের অনুরোধ জানাল, উত্তেজিত হবে না। সভার শান্তি বজায় রাখুন। ধন্যবাদ।

সকলেই পুনরায় আলোচনার মেজাজে ফেরে

আবুর বা-পাশ থেকে মজিদ-ভা বললো, প্রার্থী জামাত ঠিক করেন হয়? সভাপতি বলেন, বলু আপনার।

—গতবার জামাত দিয়েছে। মেয়া প্রার্থী আমি চাই নে।

—একটু গোলাকলা ক্যান্ডিডেট যাহাতে হবে কিন্তু লেখাপড়া জানে। যদি অন্তত কেন কিন্তু ছোট হবে। এইরাম দেখে।

—ও আবদুল বা জামাত দু'জনেই বাদ যান এর মধ্যি যে নতুন অরে নাম ঠিক করা হোক।

প্রস্তাব মতামত এইভাবে আসতে লাগলো। সর্বসম্মত পৌঁছানোই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। সেক্রেটারি বিরুদ্ধ সভাপতি বিরুদ্ধ। এ রকম পরস্পরবিরোধী প্রার্থী ঠিক করা হবে। অন্ত এই দায়িত্ব এল. সি. এস. অতীনবাবুর ওঁর নাওয়া নেই। খাওয়া নেই। তাঁর এভাবেই চ একটানা। তবু ১৩নং-এর প্রার্থী নিয়ে আঁতাতে প থাকলে তাঁর চলে না।

জামাতও চুপসে গেছে। পুরনাড়ার ১২নং কেন চান না পেয়ে, ১২ নং কে নিয়ে নতুন আশ মুক বেঁধেছিল জামাত। সেই উদ্যোগ নিয়ে ডেকে এই মিটিং। কিন্তু তার প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা নাকচ হ গেছে। কে-একজন বিরোধও ছোটেছে তার নাম মিটিং-এ আর কলহেই মন চায় না তার।

এবার অন্তত আবুর কিছু বলা দরকার। কি বলবে সে? তার তো আলাদা একটা হিসেব কি আলাদা একটা হক ছিল। মনে মনে এই মিটিংটা আবু তার অগ্রন্থ অভাব-অভিযোগের, পরিস কেন বিক্ষোভের বিস্ফোরণ হল বর্ণনিয়ে রেখেছি সেক্রেটারি বিরুদ্ধে, চেয়ার-কমরেডের বিরু অভিযোগের ফর্দাতালিকে সে ভিতরে ভিতরে নাড়ি ওছিয়ে শানিত করে নিচ্ছিল। কেমন একটু ঘ খুঁজছিল।

কিন্তু সে অভিযোগগুলি আবুর কেন্দ্রে কমজোর হয়ে যাচ্ছে যেন। এখন তার মনে হচ্ছে, এই মিটি এ নিজের ওসব অভাব-অভিযোগ কেন বিক্ষোভে কথা অত্যন্তাবিক হয়ে যাবে। আজ প্রার্থীর ব্যাপার নিয়েই সবাই মগ্ন। এতক্ষনে কেন আবু জানতে পারে যে, তার বাড়িতে আজ সেই কর্মীসভা বসেনি, কেন সে অমি কেন ওদের সবাইকে ঘুরে ফেরে দি পারবে।

বিপক্ষীয় আবু তখন যে মিটিং-এর মূল বিষয়ের মধ্যে ডুবে গেল, তা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারবে না। তার মনে পড়ে, প্রতিটি নির্বাচনের আগে, সাংগঠনিক যোগেন ঘরে এরকম কত মিটিং হয়েছে তার হেড়াঘেরা রেটে ধারণার। মনে পড়ে, জোটের হয়ে অহর্নিশ কত রাত তার কেটেছে পার্টির কর্মসূচী ঝালাতে। চাকরির কথা, সালামের কথা কোথায় চলে গেছে। সকালবেলা মর্নপক্তি নিয়ে শাঁতে শাঁত এঁটে লড়াই দিয়েছে আবু আজবিশ্বাসভাবে, অকুণ্ঠিতভাবে। দুটিকল ঠিক আবু সেদিন রাজনীতির মধ্যে পশ্চিমপাকায় কেত। সব মনে পড়ে। মনে পড়ে, তার পরে পরে যায় আবু।

এই ক'দিনে জমীনের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলা! ক'দিন আর হবে, নিজেকে ওটিয়ে নিয়েছে আবু। এরই মধ্যে এই ভাঙন। এত মত বিরোধ! তিন দিন আগেও প্রার্থী ঠিক হয় না। কোথায় যেন অসম্ভব টান লাগে নির্মল। বিপুল আবু সেক্রেটারি, সভাপতি, মুকিল, নেতৃত্ব ওদের সবার দিকে সকরুণ তাকায়। কিছুই বোঝ নি ওরা। নীতিবোধ বীকৃতিটিকও না। তবু আবু ভয় পেয়েছে। পাল্লা না পেয়েও অবেছে। ভয়েছে নেশার টানে।

প্রার্থী বাছাই-এর কাজ শুরু হবে খেলা আবুর মাথায়। সবদিক বিবেচনা করে দেখেছে সে। এমন একজনের নাম প্রস্তাব করতে হবে, তা যেন কেউ অর ধরিয়া করতে না পারে। নির্বাচন করার সে এমনি গ্রাম নেই তার। তবু আবু ভাবে, প্রার্থী নিয়ে এই ছটটুকু সে ছড়াতে পারে কি না, দেখবে একবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ কে-একজন শিছন থেকে ডেকে নিলো আবুকে। আবু উঠে গেল।

চা খেনিয়েছে আমেনা।

চা ছিল কি না, চিনি ছিল কি না, পেটারের ছেয়েদিন ছিল কি না, কিছুই জানতো না আবু। জানতো না বলেই মিটিং-এ কথার আগে চা করার জন্যে বলতে পারে নি।

আবু ম্যানেজ করেছে আমেনা। পার্টি তার জমীকে চাকরি দিতে পারলো না। কিন্তু তবু যে পরিবারটা তাদের ভেসে যায় নি, নেতারা তা বুঝে থাক। আমেনা পরীক্ষা হলেও মনের মতন-জনালাপেনী তাদের বন্ধ হয়ে যায় নি। এমন যোগ্যতার পরিচয় প্রতিদিন অনাদৃত ছেলে আমেনা নিয়ে আসছে তার বাবার কাছে।

আমেনার এমন উন্নয় ম্যানেজমেন্টে পরিচয় হয় আবু।

বিপুলের ফেব্রুয়ারীর আইস ক্রিমের কথা একটা পড়াশনি করছে। বড়ো ছেলেটা আমরিন ওই করে। আবু বেরার নিয়ে ঢেলে নিয়ে ঘনিয়ে রাখে বাজারী।

ছেলেটা ফাইনাল ইয়ারে। সে-ই দুপুরে এনেছিল বড়ো বড়ো আমলার গাছ। সব গাঁছে নি আমেনা। ভয়ে কাছে ফেলে রেখেছে মাঝারগুলো পড় ভয়াছে।

ইঁড়ি থেকে চা ঢেলে চায়ের চালা হয়েছে। গামলায় আমেনা ঢেলে রিয়েছে এক ট্রেরা ওজনো মুড়ি।

আবু দু'আর হিসাবে করে মুড়ি আর চা সব পৌঁছে দেয় ও দিকে।

মিটিং-এর ভয়ংকর ভারটা পরম নিশ্চয়তের জাগলো না।

আবদুল মিছে অনুপস্থিত। কিন্তু তার অনুরাগী-ভক্তরা ভীড়িকে রিয়েছে জমায়েতকে। জমায়েতে যারা পছন্দ করে, তারা ঘাঁটিতে নিলো আবদুলকে। নেতৃত্ব এমন উপযুক্ত একজন তৃতীয় লাইকে ঠিক করে নিলে, দলাদলিটা খুবি করে। এমনই অবস্থা।

অনেকক্ষনটাকে দেব পর্যন্ত কিছুতেই ছেড়ে ছেড়ে দেবে না, এমনই তার চেপিয়ে ধেতে ছেলেগে জমায়ে. প্রস্তাব একটা দিতে পারি। সেটা করলে, আলাকবি করো আর কেন আপত্তি থাকবে না।

সকলে কমবেড লোতের মুখের দিকে তাকিয়ে।

সেক্রেটারি অউলবাবু প্রস্তুত দিলেন, বলো, কী তোমার প্রস্তাব।

আর কোন কিন্তুকতা না হেখে লোতে জানায়, আবু আমাদের পুরনো কর্মী। ইপলীং ও বেলাইনে চলে গেছে। ওকে বলে বুঝিয়ে ফেরানো হোক।

—আমারও এই একই মত। আবুকেই খাঁড় করানো হোক। হাবিল মিজার সমর্থনে কমরেডের প্রস্তাবটা মজবুত করে দেয়।

বিস্ময়ে হতবাক আবু। এই লোভে হাবিল ওরাই তো তাকে লাথ মারছিল পরেপরে। আলাদা আচরণে পার্টির ওই ব্যক্তিগুলো এমনভাবে দেখতে আরেক করেছিল, যেন ওরা খাঁদের তুচ্ছ নড়। ঘাড়া ধরে দিয়েছিল আবুর ওদের প্রতি। আজ ওরাই আবুকে ফেরাতে চায়! ওরাই নিয়ে চায় তার মনোকষ্ট ও অভিমানের মূল্য।

সেক্রেটারি এবং সভাপতি নিশ্চুপ। জমীনের প্রতিক্রিয়া বুঝে নিতান্ত জানাবেন তাঁরা।

আবুর চাচা বলে, তাই হোক। খোকা হলিই ভালো হবে।

মিটিং-এর মেঠো ঘাসে ঢলে গেল আবুর পক্ষে। যারা অবদুল আবদুল করছিল, তারা তাকালো, উপযুক্ত এক তৃতীয় ব্যক্তি মিলেছে। আবুর নিঃস্বার্থ কর্মতৎপরতা, এবং বিনেবত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার নির্ভিক লড়াকু মনোভাব সকলকে আকৃষ্ট করে। কোন আপত্তি, কোন বিরোধিতা তাই আবুর বিরুদ্ধে ওঠে না।

উপরওয়ালা নেতাদের মধ্যে এতক্ষণে একটু স্বস্তির ভাব এলো। তা আবু যদি হয়, তাহে আর অসিত কী। বিশেষত আবুর বিনম্রতা নিয়ে বিরোধীরাও কোন ভুল ধরতে পারবে না। হসপিটালে রোগী নিয়ে দাওড়া। মাধ্যমিক-উত্তীর্ণ দরিদ্র মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্যে স্যালারা অনারশিপ বা ওয়াক্ফ ফেন্ডের অর্থ এনে দেওয়া। অন্যান্যগ্রস্থ শিক্ষার জন্যে পারা থেকে যোজনা থেকে মাঝারত টাকা তুলে দেওয়া। এমন হাজারো কাজে আবুর অগ্রাধিকার এবং নিরপেক্ষতা খুঁজে পাবে। আজ আবু বিরোধী মাঠ ধরণেরও অনেকটা কমাবেই। এবং ফেরিং সূত্রে সাধারণের আনুকূল্য তার নিজেই যাবে। এ এক্ষেত্রে পাল্লা হিসেব। সুতরাং আবু হলে আর অসিত কী। বরং এই সিটিকে সে যদি সভা দিয়ে আসে, আবার পুরোদস্তুর কর্মী হয়ে যায়, তবে লোকসানের কিছু নেই।

কেবল একটাই অসন্তুষ্ট এখন নেতাদের। প্রার্থী হবে কি আবু? তার সম্মতি ছাড়া তো সব হাঙ্গামই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

—সবাই তো তোমাকেই চাইছে। কী বলছো, আবু। বলো। দাবেক্ষের শিক্ষক টিপে সেক্রেটারি প্রাণুকে তেন অনুরোধ করেন সম্মতি দিতে।

অন্ত চাচা অনুরোধ করে, রাজী হয়ে যা, খোকা।

পরবর্তিক চোখ মেলে ধরেছে আবুর শুদ্ধ ঠিবুকে। তার উদ্ভ্রান্ত খোঁজ খোঁজা মেরে মেরে পড়েছে নিচের ঠোঁটে। অসম্ভাট মাথার তার রোপ্রেডগণের হাত। নির্ভিক চোখ দু'টো যেন আগুনের গোলা।

এবার যেন বিস্ফোরিত শোনা যায়। আসাদের কথা আবুর তদিয়ে যাচ্ছে পেটের ভিতরে। অনেক কষ্টে তুলে আনা দু'টো-চারটে কথা, অনুকথা অনবরত জমছে তার দাঁতের চাপে।

সেক্রেটারি স্বয়ং তাকে পাল্লা দিয়েছে আজ। আবু ব'লে যে কেউ একজন আছে, তা আজ মনে পড়েছে ওদের। লাইনটা বদলে ফেলার আগে ঠিক এটুকুই চাইছিল আবু। আর কিছুই সে চায় নি। চাকরি না পেলেও মানুষ মরে না। কিন্তু একেবারে ফেলাস্ত করে দিলে?

মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা টান লাগে অজ্ঞা। মনের সে একান্ত নিভৃতকোণে কত মতবিরোধ, কত কথাকাটাকাটি, কত সংঘর্ষ, কত আপনের অভিমান ইতিহাস। কত অভাবের কথা, কত অভিযোগের কথা। কত ক্ষোভ-বিক্ষোভ আর অভিমান ফেটার কথা। এত সব কিছুই বলা যাবে না এখন। এখন কেবল একটা কথাই জানাতে হবে। বলতে হবে, সে রাজী, কি না।

আবুর জবাব নিতে দেরি হচ্ছে দেখে, কিছু অভ্যুৎসাহী কর্মী বলে ওঠে, ওই কথা। আবুই হবে। আবুর নাম লিখেই নিতান্ত করা হোক।

—তাই করাই তাহলে। কমরেডস্, সবাই আপনারা একমত তো?

হাঁ হাঁ। তাই হোক। অনুমিবে নেই।

মুহূর্তে নিস্তব্ধ পাল হয়ে গেল। আবুকে ঘিরে সকল কর্মী, আমজনতার বিপুল অবাধামতি। আবু পুনরায় মূলমেহতে ফিরেছে, এটাই নেতাদের জন্যে বড়ো স্বস্তির। কলাই তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দেবেন আবুর নামে।

জমায়েত এবে আবুকে ঘলে ফেল, দলের বাইরে থেকে লড়াই করা যায় না।

চিত্রটা আবুর বাপসাহয় হয়ে আসছে। কত কথা তার বলার ছিল। কত ক্ষোভ-বিক্ষোভ আর অভিযোগের কথা। চুকি তার টিপে ধরছে কণ্ঠনালী।

ভেসে যাচ্ছে আবু। জোপনের মধ্যে, ফেলাফেলার মধ্যে, আনন্দ-হাসনে ভেসে যাচ্ছে। মত খেলার মাঠে সে সকলের কেন্দ্র, দলের সমর্থক-কর্মী সকল গ্রামবাসী যেন তার ফেরিং-এর উদ্গ্রীব প্রতীক্ষী। নিরবিচ্ছি ভয়ে তার মাথার মধ্যে আনন্দে, ফেলনায়।

সেক্রেটারী, সভাপতি, তারা চলে যাওয়ার আগে প্রতিনিধন জানালেন আবুকে। সেক্রেটারি ভয়ে এসে কললেন, ঘটো পরিমল মোপাড় করে নিয়ে ম'টার ঘরে চলে তার পার্টি অফিসে।

আবুর দুই চিবুকে গড়গড়িয়ে চিবটিক ভয়ে দুই ফলের ধারা। আনন্দের, ফেলনার।

সীমান্ত

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

ঘরটার রাইফেলটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রেখে মাটির উপর শুয়ে আছে গৌতিলাল। তার নিম্নাঙ্গে পাইন গাছের গুঁড়ি। একটা পা গুঁড়ির মোটা বিভাজের উপর ফেলে রেখেছে। অন্ধকারের সূর্য এর গাছপালার আড়ালে নেমে এসেছে। এই সময়কে অন্ধকার গৌতিলাল বড় ভালোবাসে-ভালবাসার লগনে এই একটু একটু করে আলো কমে যাবার সময়কে। পৃথিবীর দৃশ্য চরাচর যেন অন্য আর অন্য সৌন্দর্য নিয়ে চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরে। মনে হয় তখন পৃথিবী মহিমা এক দূরত্ব জাগায়। এই অপার্থিবীর সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষের অস্তিত্বকে যেন এক বিচিত্র রহস্য।

দূরের বাঁকা রাস্তার দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল। পকেট থেকে রুমাল বের করে এনে অকারণে মুখ মুছল। গোঁফ জোড়া একবার মুচড়ে দেবার ইচ্ছা জাগল কিন্তু হেলেদুলল না। আবার চোখ পাঠিয়ে দিল দূরের বাঁকা পথে চলা রাস্তার দিকে। পড়ন্ত বেলার নরম রোদের নীচে রাস্তার বাঁক একটা জায়গা জুড়ে ঘুমের মত শুয়ে আছে। বাঁকে ঢুকে কোন মানুষ বা ছাগল ছানা কোন কিছু দেখা গেল না। গৌতিলালের বুক বড় খালি খালি মনে হল, এতখানি মনে হল যে এক ফোঁটা থুথু না ফেলে পারল না। এখন অপরাহ্নের নিস্তব্ধতার মধ্যে তার একক অবস্থানে রাইফেলটাকে আর সঙ্গী মনে করতে পারছে না। থুথু ফেলার অছিলায় ভিতর দিয়ে মুখগহ্বর লোহন করার মধ্য থেকে নিজের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে—নাছোড় বুকের এই খালি খালি লাগা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়।

গৌতিলাল এখন নোম্যানস ল্যান্ড থেকে যেন দূরত্ব রক্ষা করে ঘরটার রাইফেলটা বুকে চেপে শুয়ে আছে। অন্ধকারে প্রসারিত হয়ে আছে পথ আরও সীমানা। বড় বড় লোহার বিম পুঁতে দু'দিকে সীমানা চিহ্নিত করা আছে। লোহার বিম জড়িয়ে কাঁটাতারের দীর্ঘ রেখা ডান দিকের উঁচু উঁচু বনের মধ্য দিয়ে দূর-দূরান্তরের দিকে চলে গেছে। দু'দেশের 'ফরবাদের কাঁটাতারের বেড় অতদূর প্রসারিত গৌতিলাল জানে না।

তার বাঁপাশে রোপকাপের একটা বিস্তৃত আড়াল আছে। এই আড়াল তার আত্মরক্ষার আত্মরক্ষণের উপায়। ঘরটার রাইফেল এমনভাবে স্থাপিত আছে, দূর থেকে তাকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। রাইফেলের নালটা একটু বাঁকা করে রেখেছে যাতে তার গুলি সমতলেই সীমান্তের ওপারে চলে যাবে। নোম্যানস ল্যান্ডের মাঝখানের দীর্ঘ পাকটা তাকে নিশ্চিন্ত আড়ালে আগলে নিয়ে রেখেছে। পাকটাও বড় অদ্ভুত রেখায়। ডানের মধ্যে থেকে উঠে বুটো জল দু'দিকে নেমে গেছে। দু'দিকের দুটো ডাল প্রায় সোজা। একটু উপরে উঠে অনেক ডালপালা ছড়িয়ে সবুজ পাতা মেলে রয়েছে। পাকটার একটা ডাল পশ্চিমে অনেকটা ঝুঁকে। পশ্চিমের অরণ্যের আড়ালে সূর্য আছে বলে তার গায়ে উপর হলুদ। ছায়ার শীতলতার স্পর্শে তার শরীরে ঘনায়মান আলো বিস্তার করছে। পাকটা সত্যিকারের অদ্ভুত। গৌতিলাল মাথা তুলে পাকটাকে একবার দেখে নিল। দূর থেকে দেখলে পাকটাকে মনে হতে পারে—একটা মানুষ নোম্যানস ল্যান্ডের ঠিক মাঝখানে আকাশের দিকে দুটো হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

যে পাথরের পাশে শুয়ে আছে গৌতিলাল সেই পাথর থেকে এক সরু সোনা চলছে। গৌতিলাল তাকিয়ে থাকল অনেক সময়। আর কিই বা সে করবে। এখন ঘরটার রাইফেলটা সরিয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। এ যে বিরক্তিকর এক পরিস্থিতি তার পক্ষে ভোলাও সম্ভব নয়। অনেক সময় তাকিয়ে থাকার পর গৌতিলালের অসহ্য মনে হল গৌতিলালের। ওরা পুরুলা না-ফেলে একটা সরলরেখার মধ্যে এটাই আসল হয়ে ওঠার কারণ। পানিকটা থুথু ঢিলিয়ে দিল গোকাতলার ঘাস। গোকাসের লাইন ফেলে দিয়ে আবার পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল।

আবার মাথা তুলে দূরের বাঁকা একবার দেখে নিল। পাথরের পাশ থেকে পায়ে চলার পথ একটা বড় পাথরের আড়ালে বাঁক খেয়ে হারিয়ে গেছে। বড় পাথরখানার পেছনে অনেক পাথর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এর দূর থেকে পাথরগুলি চেনা যায় না। পাথরগুলি অচেনা হলেও সীমান্তের ওপারের বাঁকা পথ তার কাছে অনেক পরিচিত পথ। কখনো কখনো মনে হয় বাড়াটা হাঁটতে হাঁটতে এসে তার বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

পথের বাঁক এক্ষেত্রে পরিষ্কার, কোন মানুষকে দেখা যাচ্ছে না। এখন তার পরিচিত পথের বাঁক নিঃসঙ্গ অসহ্য বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। কিসের যে অপেক্ষায় হয়ে পড়ছে। এখন সে স্পষ্টতই বিরা বিরক্ত। একটা কাল কালছে সেই ছাগলছানাটা ছুটে আসুক আর তার পেছনে পেছনে সেই মেয়েটি। অন্য মন কালছে, না, এখন নয়। আজ, আজ, পরশু তার না-আসাই ভাল।

সূর্য অস্তাচলের দিকে যেন তার নামছে না। সময়কে এখন বড় বেশি দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে তার অস্তাচলে লাল আভা মাখানো গৌতিলাল ভাবী গাঢ় অস্তাচল লাল হয়ে উঠলে কোপের মধ্যের ছায়া ঘনে ঘনে হয়ে উঠবে। তারপর অন্ধকারের একটা গৌড়িক ভাঁজ হয়ে আবার আর একটা দিনের আলো অপেক্ষা করবে একেবারে তার মত। ঘরটার রাইফেলটা সরিয়ে নিয়ে এই ভেবে থাকা বড় বিরক্তিকর। আরো বিরক্তিকর আলোর অন্ধকার পথের বাঁকে চোখ ফেলে রাখা আর তারপরেই হতাশ হয়ে ওঠা। অন্তত সে চাইছে না একটা ছাগলছানা আর সেই মেয়েটির আবির্ভাব।

বুটো পা ফাঁক করে ফেলে রাখার মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্য এসে ভর করল। মোটা প্যান্টের মধ্য থেকেও নরম শরীরের স্পর্শ অনুভব করতে পারছে গৌতিলাল একটুকুও নড়ল না। ঘরণেসটা নিজের আরামটা খুঁজে পাচ্ছে না যে ঘুরতে পারল সে। নিজের ভিতর জৈবিক অনুভূতি জাগল। ঘরণেসটা হঠাৎ ঘুরে পরিণত গেল। অপরূপ জন্য, ঘরটার রাইফেল আর টোটার ধাতব বিশ্বে তাকে চিনিয়ে দিয়েছে, কোন স্বাভাবিক অবস্থানে সে বসে নেই।

দেখতে দেখতে কয়েকটি মাস পার হয়ে গেল গৌতিলাল মনে মনে সময়ের হিসেব কষছে গৌতিলাল পাঁড়িয়ে ছিল ডান দিকে একটু দূরে রেখে হয়ে ঘরটার রাইফেলটা নিয়ে। সারাদিন রোদে হয়ে একটা কাঁকা জায়গায় পাঁড়িয়ে থেকে থেকে মা ঝিম ঝিম করছিল। পা দুটো তখন প্রায় অবশ, মাটি ভিতর পেঁথে বসে গেছে যেন। মাথার উপর সোজা নিবন্ধন ভরানক গুরুভার মনে হয়েছিল। শান্ত নোকরী ভুলে সে একটা ভারীল পলি উজাড় করে দিয়ে থমকে দিয়েছিল। গৌতিলালের চোখ পড়েছি কাঁটাতারের বেড়ায়। নোম্যানস ল্যান্ডের কাঁটাতারে বেড়ার সামনে ছেলেটি অসহায়ভাবে পাঁড়িয়ে আছে কী করবে বুঝতে পারছে না। দৃষ্টি তার সীমান্ত এপারে।

নিয়মমাফিক গৌতিলাল নিরাপত্তা শব্দ বার পাঁড়িয়ে পড়েছিল। অভ্যাসমত হাত চলে গিয়েছি ঘরটার রাইফেলে। আবার মেয়েটিকে দেখল। কয় পেয়ে হাত ধরে হয়ে পড়েছিল আপনা থেকে। সীমান্তে সীমানা রক্ষা করা, অন্যের পরপার খাল তার নোকরী

অন্যতম শর্ত। সেই শর্ত যে সৌজিলাল ভাঙতে পারে না। কর্তব্যের অনিবার্য তাগিদে চিৎকার করে উঠেছিল—মাও আসা।

নেই, নেই বলে পা, মেয়েটির গলায় আওয়াজ আবেগ টেনে দেয়েছিল কৌজিলাল। মেয়েটি কঁদতে আরম্ভ করা প্রথম করতে পারছে না। তার ফলে তার নেই নেই শব্দ আরও দুর্বল শোনাল। কঁটাতারের বেড়া থেকে দূরেও সরে যায় কি হাইকেল হাতে সেপাইকে। দেখে। একসঙ্গে অসহায় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থেকে ডানে-বাঁয়ে দু'দিকে বারবার বিধি তাকাচ্ছিল। কি যেন সে খুঁজছিল।

কৌজিলাল হাতের হাইকেল শক্ত করে ধরবার যথেষ্ট প্রয়াস সতর্কতায়। আচমকা অসহায় মেয়েটিকে দেখে লজ্জা পেল। সেই লজ্জা ঢাকতেই কল করে একটা বিড়ি ধরিয়েছিল। ঠিক সেই সময় মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠেছিল, আ-আ-বন্দুক-আ-ইশ্বর মা—

ঘুরে দাঁড়াতেই হাসপাতালটিকে দেখতে পেয়েছিল কৌজিলাল। নোম্যানস ল্যান্ড থেকে খানিকটা দূরে তারতের মধ্যে ঘুরে বেরাচ্ছে একটা হাসপাতাল। লম্বা গাছের মাঝ ঘুসর কিন্তু কম বুটো সাদা। নরম পা ফেলে কচি ঘাস পিষে পিষে যাচ্ছে। অদ্ভুত মনে হয়েছিল কৌজিলালের, পাকিস্তানের হাসপাতাল ঘাস খাচ্ছে তারতের! যদি হাসপাতাল না-হয়ে মানুষ হত তাকে ধরে বন্দী করতে হত। আর যদি অস্ত্র হত তবে একটা গুলি বুকের ঠিক মাঝখানে গেঁথে না দেবার কোন উপায় থাকত না। হাসপাতাল, পাখী, গাছের ছায়া এদের কোন সীমান্ত নেই—কৌজিলাল অনেক আশ্চর্য হয়েছিল প্রচুর কথাটা তার এর আগে আর কখনও মনে হয়নি।

ঘুমার বন্দী, কৌজিলাল জিজ্ঞাসা করে নিজেকে সহজ করতে চেয়েছিল।

জী, জীয়, অপরাধীর মত গলা মেয়েটির।

বন্দী নেবে আসা? কৌজিলাল ততক্ষণে নরম হয়ে পড়েছে।

জী, মেয়েটি কঁটাতারের বেড়ার গা থেকে দাঁড়িয়ে অসহায় গলায় বলেছিল।

মেয়েটি চুপচাপ একভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আর হাসপাতালটাকে তারতের তারসা পাচ্ছিল না কোথায়। অপরাধীর মত তার মাথা আনত। ডান হাত উপরে তুলে নিজের নখ নিজে খুঁটছিল আর মাঝে মাঝে বিপন্ন চোখে হাসপাতালটিকে দেখছিল। ঠোঁট নিচে ঠোঁট চেপে চেপে হাতের ঠেলে ওঠা কান্না আটকে করে রাখতে চাইছিল। সন্ধ্যার আনত সূর্যের নম্র আলোতে মেয়েটিকে বিষণ্ণ প্রতিমার মনে হয়েছিল।

চোখ ফেরাতে পারছিল না কৌজিলাল। মেয়েরা যখন বিষণ্ণতার ছদ্মে সমস্ত তখন তারা পৃথিবীর সীমন্ত প্রতিরূপ করে অজানা আতঙ্কেতে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। কৌজিলালের মনে পড়েছিল নিজের গ্রামে আধবয়সী দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে প্রতিমার কথা। পূজা সমাপ্ত করে সকলেই চলে গেছে নিজেদের ঘরে। মেয়ে প্রতিমা তার ঐশ্বর্য নিয়ে পড়েছে নিচে একা, নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারা গা থেকে অপার্থিব এক আলো ছড়িয়ে নিজে আপন পরিমণ্ডল। সে আলো বিষণ্ণতার আলো। বিদায় প্রতিমার কথা মনে আসতে কৌজিলাল আর চোখ ফিরিয়ে আনতে পারে নি মেয়েটির মুখ থেকে। কাঁধের পাশ থেকে দু'দিকে ঘুরে পিছে নেমে এসেছে কালো চুল, বাঁয়ের মাঝের দু'পাশে দুটি বিষণ্ণ কালো চোখ। দুই ভুরুর মাঝখানে কঁচপোকা টিপ। কৌজিলাল আর নিজেকে সেপাইজী বুঝিয়ে রাখতে পারে নি। ভিতরের মানুষটা নরম হতে হতে একটা কান্নার বড় মতে নিচু হয়ে পড়েছিল। বলেছিল, সে যাও ঘুমায়া বন্দী।

উপায় ছাড়েগা? মেয়েটি বিশ্বাস করতে পারছিল না কৌজিলালের কথা। সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক আছে জিজ্ঞাসা করেছিল।

আও, আও, কৌজিলাল আশ্বাস দিয়েছিল। আগলা থেকে তার হাত ধরে এসেছিল ভয়ঙ্কর লালিত পোষে।

ঘাঁই ডর নেই? বিশ্বাসহীন আরও আবার প্রশ্ন করেছিল মেয়েটি। বুঝতে পারছিল না কৌজিলালকে বিশ্বাস করা যায় কি না।

ক্যায়া? কৌ ডর নেই, কৌজিলাল ভরসা দিয়েছিল।

ডীক পরে তার কাঁটাতার কাঁক গলে চলে এসেছিল মেয়েটি। নোম্যানস ল্যান্ড পার হতে পারে নি। তার আগেই কোপের মধ্যে বসে পড়তে হয়েছিল কৌজিলালের সতর্ক সাবধান চিৎকার।

চলিয়াও, চাপা গলায় কৌজিলালের সতর্কতা। এক মুহূর্তে কোপের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল মেয়েটি।

হঠাৎ মোড়ের আধা থেকে ছিল এসে পড়েছিল। ইলপেক্টরের ভিপথানা ২-৩ বুট এসেই ঘুরো উড়িয়ে। দাঁড়ায়নি। সোজা চলে গিয়েছিল সীমন্তের পাশের রাস্তা ধরে জল নিচের উপত্যকার পথ ধরে গ্রামের দিকে।

কৌজিলাল সুখের বিড়ি ফেলে দিয়ে তাকিয়ে ছিল ভিপের দিকে। ছিপ অদৃশ্য হয়ে যাবার পর স্বাভাবিক হতে পেরেছিল। মনে মনে একটা বিড়ি নিয়ে ছিল ছিপ লম্বা করে, শালা—

হাসপাতালটা ততক্ষণে ভয় পেয়ে দৌড়ে সরে ঢুকে পড়েছে তারতের জমির অনেক ভিতরে।

মেয়েটিকে আর সীমন্ত পার হতে বলে দি কৌজিলাল। নিজে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালটি ধরতে। হাইকেলটা ঝুলিয়ে কাঁধের উপর। মেয়েটা পিছনালী নাবিয়ে রেখে যেতে ভুল করেনি। হাসপাতালের কাছে যেতে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। তাকে না নিয়ে পেছন থেকে উঁচু হয়ে থাকা নল ফাঁকে তার পক্ষে প্রবেশ ঢুকতে পারে নি কৌজিলাল। আবার পা টিপে টিপে হাসপাতালের বারান্দার কাছে গিয়েছিল। আবার সে দৌড় দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত কাঁধের হাইফেল মাটিতে নামিয়ে রাখতে বাধ্য হল। আবার পা টিপে টিপে হাসপাতালের ঢাঁটা তারসায় দৌড়তে হয়েছিল। সে দিনের দৃশ্য তারসে কৌজিলালের হাসি পায়। একজন সীমন্তের সেপাই, হাতের অস্ত্র মাটিতে রেখে একটা হাসপাতালের পেছন পেছন দৌড়চ্ছে—অদ্ভুত সে দৃশ্য ভাবতে কোন সন্দেহ নেই। পরিস্থিতি সময় যেন হেটোমুটি করতে। শেষ পর্যন্ত নিজীব জীবটি জবরদস্ত প্রতিপক্ষের হাতে ধরা পড়তে বাধ্য হল। হাসপাতালটিকে সে জাপটে ধরে নিয়ে এসেছিল। হাসপাতালের বুক আতঙ্কে ধরধর করে কাঁপছিল তখন। সে কাঁপুনী ছড়িয়ে পড়ছিল সারা শরীরে। কৌজিলাল ভীত, সন্ত্রস্ত প্রাণের কাঁপুনী অনুভব করেছিল নিজের মধ্যে। তখন সে হাসপাতালের সঙ্গে একরকমের একাত্মতা অনুভব করেছিল। এমনি এক আতঙ্কে তারের পেরে মনে যখন অক্রমণ করার জন্য সীমান্তের কোন প্রান্তে যেতে হয়। তখন প্রতিরোধের জন্য অপেক্ষা করতে হয় তখন একইরকমের অনুভূতি পেয়ে বসে। নিজের সবচে প্রথম একটা জানুষকে মেরে ফেলার বিপরীতমুখী দুটি তাজের মধ্যে একরকমের অনুভূতি থাকে। তারপর একটা সময় অনুভূমিমতর চরিত্র বদলে যায়। গুলির শব্দ এলেই সমস্ত শরীর টান টান হয়ে ওঠে। অমনি মানুষ মারার মত উত্তেজনা ছড়িয়ে একরকমের উল্লাসনো এনে দেয়—তখন মানুষ মেরে ফেলা হয়ে ওঠে সব থেকে সহজ কাজ।

হাসপাতাল ধরতে গিয়ে কৌজিলাল নিজেও জখম হয়ে পড়েছিল। তাকে হাসপাতালের সিঁড়ি সিঁড়ি কম দৌড়তে হয় নি। ঘুম গলার গান মিয়েছিল, শালা হারামির বাচ্চা।

তার গালি শুনে নোম্যানস ল্যান্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলেছিল মেয়েটি। বিরক্ত হয় নি তখন কৌজিলাল, বরং ভাল লেগেছিল। তারপর এবার হতে মেয়েটির সহজ হাসি এসে বুকে বেজেছিল। বলেছিল, আও, সে যাও ঘুমায়া বন্দী

সীমানা ডিঙিয়ে নিজের সঙ্গে তারত ঘুরতে চলে এসেছিল মেয়েটি। কৌজিলালের হাত থেকে হাসপাতাল কোপের উপর তুলে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে পারে নি। দুটি চোখের অবার কৃতজ্ঞতার আলো ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল।

কৌজিলাল নিজের মধ্যে মুক্ত বিস্ময় অনুভব করেছিল। নিজের আবেগ গোপন করার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিল, ঘর কাঁহা?

আঙুল তুলে দূরের গ্রাম দেখিয়ে দিয়েছিল মেয়েটি।

কৌজিলাল আবার প্রশ্ন করেছিল, মুলুক কাঁহা?

কৌজিলালের অদ্ভুত হাসতকর প্রশ্ন শুনে মেয়েটি লাজুক ঠোঁট ছেপেছিল। প্রশ্নের কোন জবাব হয় না বলে জবাব দেয়নি। পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, ঘুমায়া কাঁহা পর?

হাপরা।

হাপরা।

জী।

পাকার মুলুক আরা কিট?

নোকরীকে লিয়ে।

তারসা মালুম ছোতা?

আচ্ছা নেহী।

আরে?

জবাব দিতে পারেনি কৌজিলাল, অথবা জবাব দেবার কথা মনে আসেনি। অপলক চোখে দেখছিল মেয়েটিকে। হাসপাতাল বুকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। কাঁধের দু'পাশ থেকে চুল নিচের

উপর নেমে এসেছে। হাওয়ার স্পর্শে বয়স চুল থেকে থেকে কাঁপছিল। পড়ন্ত বেলার আলোতে মেয়েটিকে মনে হয়েছিল রহস্যময় এক নদীর মত—যে কোন মুহূর্তে ঢেউ তুলতে পারে।

আর কেন কথা হয় নি। মেয়েটি উঁচু পাথরে নেমে আসার পর হাত বাড়িয়ে কাঁটাতারের বাঁক পথে ঢুকে গিয়েছিল পাকিস্তানের জমিতে। তারপরেই আবার পেছনে চুল উড়িয়ে দৌড় লাগিয়ে দিল গাঁয়ের পথে।

ঘটার সাইকেলের আওয়াজ আসতেই কৌজিলাল সতর্ক হল। সীমান্তের ওপারের পথ দিয়ে একটা ঘটার সাইকেল দ্রুত চলে গেল। ঘটার সাইকেলে দু'জন সেপাই ছিল। দু'জনেই সেপাই, লিটের উপর বন্দুক দুটো ঝুলিয়ে নিয়েছে। মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ। ঘটার সাইকেল দাঁড়াল না, পথের বাঁকে মিশে পাথরের আড়ালে হারিয়ে গেল, আর ঘটার সাইকেলের শব্দ শোনা গেল না।

নতুন করে আক্রমণের প্রস্তুতি যে চলছে বুঝতে পারল কৌজিলাল। ঘরাফ্রির রাইফেলের কার্তুজগুলো ঠাণ্ডা, ভয়ানক ঠাণ্ডা মনে হল তার। আরও নিজেকে খালি খালি মনে হল। আবার চোখ চলে গেল দূরের রাস্তার বাঁকে। জনমানবহীন পথের বাঁক তার বুক আরো খালি করে দিল। আবার সে মুখের ভিতর ঘিয়ে পাক খাইয়ে তামাকটা থুথু ফেলল। একটা বিড়ি ধরাল। দুখ নীচু করে সতর্কভাবে বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে আবার পথের বাঁকে চোখ ফেলল। মনে পড়ল কয়েকদিন আগে আবার ঐখানে কদমুক নাড়িয়ে মেপে গুলগুলানো ধরাতে হয়েছিল কৌজিলালকে।

হিন্দুস্থানের মাটির সবুজ ঘাস তাকে ঠাণ্ডা করে ফেলেছিল। আবার তারা দু'জনে মুখোমুখি। মেয়েটি কৃষ্ণকান্তার মাঠানের মত নরম হয়ে গলেছিল, অত ছেলেমানুষী।

স্ত্রী, অন্য আর কোন কথা সেদিন কৌজিলালের মুখে আসে নি।

দুখ হিন্দুস্থানী। এর মেয়েটির।

স্ত্রী, কৌজিলালের আবার সংক্ষিপ্ত জবাব।

দু'দুটো ঘন্টা আবার এসে পড়ল কৌজিলালের সামনে। সামনে এসে ঘন ঘন ঝড়া করে দেখল কৌজিলালকে। জনলের পাশে একখানা পাথরের আড়ালে একটা মানুষকে শুয়ে থাকতে দেখে আশ্বস্ত হল। দৌড় সম্বিত ফিরিয়ে দিল। আবার চোখ পড়ল সীমান্তের ওপারে। না, পথের বাঁক থেকে একটি মেয়ে ছুটে আসছে সীমান্তের দিকে। অবশ্য এখন মেয়েটি আসুক চায় না কৌজিলাল। তবু দুর্বার আশা তাকে আর বার আচ্ছন্ন করে ফেলল। অনিবার্য সীমান্ত সংঘর্ষের মুখোমুখি আর যারা আসে আসুক অতীতের জন্য। দুর্ভিক্ষের সময় ছাপরা থেকে কুড়ো খাল তার বোনকে নিয়ে আসামে চলে এসেছিল এলাহাবাদ। তারপর এল সেই সর্বনাশ হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। মেয়েটি দূরে হয়ে যে কোথায় হারিয়ে গেল জানে না কৌজিলাল। কুড়ো বলেছিল মুখের লাল অবশ্য যায় কলার মতোন হয়েছিল। আবার ভাসতে ভাসতে মিরী। আজগাঁয় যেন যায় মানুষ খুন করতে পারার সেপাইয়ের চাকরী। একটু একটু করে জীবনের দুঃখের কাহিনীর বলেছিল মেয়েটিকে। মেয়েটি দুটি জলে ভেজা চোখ মেলে মেলে শুনেছে কৌজিলালের দুঃখের কাহিনী। মুখ ফিরে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে এসেছে, হাত রেখেছে কৌজিলালের বুকে, হাত রেখে যেন বুকে জমে থাকা সব দুঃখ তুলে নিয়ে গেছে।

একদিন মেয়েটির কোলে ফেলেছিল। তার জলজল নেই। বাসায় গ্রাস দিয়েছে। এই তো সীমান্ত থেকে অল্পকয়েকটা গ্রামের পর ছিল তাদের বাড়ি। তাড়াতাড়ি সব ফেলে পালিয়ে আসতে হল পাকিস্তানে। নিজের দেশ, জন্মভূমি বিদেশ হয়ে গেল! সব কথা বলে দু'জন দু'জনার দিকে নীরব চোখে তাকিয়ে থাকত। কোথায় সীমান্তের মোসাফির লাগত ভয়ানক ভারী হয়ে উঠত। হাসনবানা যার তার একভাবে সীমানা লঙ্ঘন করছিল। দু'জনে মনে থাকত মোসাফির লাগতের মাফকালীন। কোপের আড়ালে পথটা নীচে মনে দেখত একজন আর একজনকে। মেয়েটির কোলের ছেলে মনে থাকার আগেই হাসনবানা যার করছে সীমান্তের কোন অর্থ নেই।

আর পাকিস্তানী, হল হল চেহারে কতবার আসে মেয়েটি।

দুটি বাজ, কৌজিলালের জবাব।

দু হিন্দুস্থানী, মেয়েটির মুখ ভাঙা আর্তনাদ।

দুটি বাজ, কৌজিলালের জবাব।

আবার পরীর নির্জনতা নেমে আসতো দু'জনের আড়ালে। মেয়েটির দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে আসত। কৌজিলালের বুকের মধ্যে কি রকম যেন এক কষ্ট—এ কষ্টের কোন ব্যাখ্যা নেই। বুক এমন শূন্য হয়ে যায় যে মানুষ অদ্ভুত আচরণ করে, না করে উপায় থাকে না। কৌজিলাল আর অপেক্ষা করতে পারেনি। বুকের ভিতর টেনে নিয়েছিল মেয়েটিকে নরম শূন্যতার যেমনায় সে ভরে যেত। মেয়েটিও ধরা দেয়ার জন্য ছিল উন্মুখ হয়ে। মুখ তুলে নিয়েছিল কৌজিলালের মুখের মধ্যে। তারপরে সেই আদর, হিন্দু পাওয়া আর না পাওয়ার দুঃখদুঃখবোধের যেমনা ভরানো মুখের ভিতর আলোড়ন তুলেছিল। যেমনার সঙ্গে পাওয়ার আবর্তময় আহ্বানে পিঠ তুলে দুলে উঠেছিল। সেই সুযোগে হাসনবানা মাথা ঝাড়া করে আবার লাগতে লাগতে চলে এসেছিল সীমানা লঙ্ঘন করে আমার মুখতে।

সম্বিত এসেছিল বিপদের বাস্তব আওয়াজে। পাকিস্তানের দিক থেকে প্রথম কয়েকটা গুলির শব্দ এসে নিস্তব্ধতা খান খান করে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর দূরে বোমার সেই দুঃখ কাঁপানো বিস্ফোরণ। দু'জনে দিকে পড়েছিল দু'দিকে। মিশটা আবেগ ছুটে গিয়েছিল পশ্চিম দিকে। এবার পাল্টা গুলির শব্দ। আবার হাসনবানার লিপনে ছুটে ওকে ধরতে পারার এক নাটকীয় অধ্যায়। সীমানা পাড়ি দিয়ে আসিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে ফিরে এসেছিল কৌজিলাল।

পরের দিন পরপর দুখ দুখড়ে পড়েছিল এগারের পাঁচটি গান। অব্যর্থ নিশানায় গুলি চালিয়েছে পাকিস্তানি সৌজ। আজনি গ্রাম হয়ে উঠল সীমান্ত। সে গ্রাম ছুটিয়ে ভেলের মত একটা কড়াইতে ছুটিয়ে ছুটতে ছুটতেই ভাগ আড়াচ্ছে। ভেল বাসন হয়ে উঠে সীমান্তরেখা ধরে ওপর-নীচে উড়াল হাঁটিয়ে যাচ্ছে। পর পর চারদিন ধরে সমস্ত সারে গুলি বিনিময় হয়েছে। অনেকজন সেপাই প্রাণ দিয়েছে। পাকিস্তানী সেপাইরা মাটি খুঁড়ে ছিন্ন তৈরি করেছে।

ভতর পাঁচের এখন। আকাশে সৈনাদা ছিন্ন খোঁড়ার ঠকঠকুনি তৈরি করে ফেলে অপেক্ষা করে আছে। কৌজিলাল পাথরের গুঁড়ির উপর লম্বা হয়ে পা ওইয়ে রেখে পাথরের উপর টানটান হয়ে আছে। তার হাতে ছিন্ন হয়ে আছে ঘরাফ্রির রাইফেলের উপর। বিকেলের আলো দ্রুত নিভে যাচ্ছে। এই সময় পৃথিবীর বুকে একরকমের বিষণ্ণতা নেমে আসে। সবার বুক খালি খালি মনে হতে থাকে। কৌজিলাল সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারছে না। সীমান্তের ওপারের পথের বাঁক সেই শূন্যতাকে বাড়িয়ে দিয়ে বুকের উপর পাথর হয়ে চেপে বসে আছে। একটা হাসনবানা ফোন একটা মেয়ের এক মুহূর্তের জন্য পথের বাঁকে দেখা এখন এই সূর্যাস্ত, হাতের কুড়োর জন্য ঘরাফ্রির রাইফেল এ. টি'র লক্ষ্যমান এগিয়ে যাচ্ছে চৌদ্দ, কাঁটাতারের বেড়ার বাতের উজ্জ্বলতা থেকেও অনেক বেশি সত্য। আবার কৌজিলাল মুখ ফেলে সামনের দিকে তাকাল।

কৌজিলাল চমকে গেল এবার। তার অসতর্কতার মধ্যে অনেকজন সেপাই কখন কোন জনলের আড়ালে আড়ালে চলে এসেছে সীমান্তের কাছে। পথের শেষের তারা দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের হাতে ঘরাফ্রির রাইফেল, অন্য জনজনার হাতে বন্দুক। বিকেলের ম্লান আলোতে মাথার লৌহ শিরস্ত্রাণ চকচক করছে। কৌজিলালের বুক আবার খালি হয়ে গেল। সে জানে তার শেষের দাঁড়িকের পাথরের পাশে অনেকজন ভারতীয় সেপাই তার মত ওরে থেকে ঘরাফ্রির রাইফেল নিয়ে অতর্কিত পাল্টা আক্রমণ করছে। তারা তার পার্শ্ব দেশ ভঙ্গ করবে। তবু তার ডিসিপ্লিন একেবারে শূন্য ও ও করে হাওয়া যাইয়ে। তার হাত-পা ঠাণ্ডা হাতের আঙুল অবশ হয়ে উঠছে। একটু কাঠ বেড়ালী পায় থেকে নেমে এসে সামনের পাথরখান বেয়ে উঠে মিঠে মিঠু আওয়াজ করল। তারপর দেখতে পেল তাকে। একমুহূর্তে আবার পাথর থেকে নেমে লৌহ লাগলো মিশ মিশ করে। প্রতিটি মিশ মিশ শব্দ তার বুকে হাতুড়ীর ঘা দিতে থাকল।

আবার চোখ পেল তার সীমান্তের ওপারে বাঁক পথের উপর। এক অন্তে উঠল তার বুক ফেল একটি গুলি এসে মিশে পেল বুকের মধ্যে। হাসনবানা ফেলে মেয়েটিকে দেখতে পেল কৌজিলাল। অমনি সে ঘামতে শুরু করল। কৌজিলাল মর মর করে যাচ্ছে। যে মুখ এতক্ষণ দেখতে চাইছিল সেই আকাঙ্ক্ষিত মুখ এক চোখের সামনে। আজ সে যাবে, কুলকুল করে যাবে অন্য আর আসছে। বুকের মধ্যে কি রকম একটি কষ্ট—কেন তার নিয়ে বুকখানা শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। বুক শক্ত বাঁধনে পেটি চৌচির হয়ে যেতে চাইছে।

মেয়েটি পাথরের আড়াল থেকে বাঁদরের মাথার এসে ঘরকে বাঁকিয়ে তাল বা দুশিক মেপে নিচ্ছে আসবে কিনা সীমান্তের দিকে তাই ভাবছে। তার কৌজিলাল অন্য আওয়াজে ঘরাফ্রির রাইফেলের উপর গাল চেপে ঘরে ফেলছে—না, না, পালিয়ে যাও। যাও পাথরখানার আড়ালে চলে যাও। যে ঠাকুর মেয়েটিকে ফিরে ছেড়ে ফল, আল্লা, ঈশ্বর, ফিলিয়া, ভগবান যে যেখানে আছ—মেয়েটিকে পাথরের আড়ালে চলে যেতে বল। আর আমার কোন প্রার্থনা নেই তোমাদের কাছে।

নান্যপন্থা

মোহন নস্কর

বিনা মেঘে বজ্রপাত কথাটা নেহাতে প্রবচন বাক্য। কিন্তু সাহিত্যিক বিষ্ণুপদ বাসনবীর ক্ষেত্রে এমন নজির নয়। সাহিত্যের তরা যৌবনে চাকরি ছেড়ে দিল মাত্র তেইশটি টিফিনকে। বেইমান, হৃদয়বিহীন, নিষ্ঠুর ছাড়াও। রহস্যময়ী হয়েছিল পরিচালনা কেন্দ্রের মাত্র সব কর্মচারীদের উপলব্ধি। কয়েকদিন বেজার হয়ে থাকে পরে দুর্ঘটনা। ভেঙে এনে কাজ নিয়েছিলেন বিষ্ণুপদ বাসনবী। কলমে পেলে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। এই তার প্রতিদিন। মানুষ তার আপন হয়ে নেই।

বিষ্ণুপদ বাসনবী ভালো সাহিত্যের নিরপেক্ষ লেখক। নতুন একা নতুন। সাহিত্যের সব কটি শাখা চলাফেরা তাঁর সাবলীল ছিলো। কবিতা, বক্তিম, একেবারে, বিজ্ঞানকথা দুহাতের তাঁর পকেটে। জানলীয় এখনও পরিমি আলো করছেন ছড়িয়েই পেয়ে যাবে নিশ্চিত লাইনে ধরাছোঁয়া করছেন।

পুজার কয়েকজন বাকি। বাজারে পুজার বাজনা এখনও বাজেনি। কিন্তু সাহিত্যের বাজারে ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরুকরেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা থেকে অর্ডার নেওয়া হয়ে গেছে। অগ্রিম ও পেয়ে গেছেন।

দুটি উপন্যাস, চল্লিশটি ছোট গল্প। পাঁচটি বড় গল্প। কবিতাটি এখনও পর্যন্ত পাঁচটি অর্ডার পেয়েছেন। অগ্রিম এর টাকা ইতিমধ্যে হজম। আশা করছেন আরও আরও কিছু অর্ডার আসবে। নির্দিষ্ট সময়ে লেখাগুলো সরবরাহ করতে না পারলে মান ইজ্জত থাকবে না। অসুস্থতার অজুহাতে দু'একজনকে টুপি পরানো যেতে পারে অন্যের ক্ষেত্রে কি হবে! কিন্তু তাঁদের সম্পাদক আসেন সরাসরি বাড়িতে এসে তাগাদা দেবে। অন্যথায় ও টেলিফোন করবে। বিরক্ত হয়ে পারেছেন বিষ্ণুপদ বাসনবী। সাধারণত তিনি আলাপ করেন না। টেলিফোনে বিপর্যস্ত হয়েছেন বলে মেজাজ করেন। গত তিনদিন ধরে পড়ছি হয়ে করতে পেরে পারে ঢোকে সমস্যার মূল খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

বিষ্ণুপদ বাসনবী বিখ্যাত লেখক কিন্তু নিজের কলম চেনেন চলে না। কলম না চালুক, বিখ্যাত হতে নিজের চেষ্টা। পড়ুয়া জমিদারের বংশধর। কেন্দ্রাতীত পেয়ে, হাতে নগদ টাকা এবং জমিজমার অনেক পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। কলেজজীবন থেকে লেখক হবার বাসনা ছিল। লিখতেনও। কলেজ ম্যাগাজিনে দু'একটা লেখা ছাপা হয়েছে। ব্যস ওই পর্যন্ত। বাজারি পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপার যোগ্য হয়ে ওঠেনি। তাকে পাঠাতেন। কয়েকমাস পরে ফেরৎ আসতো লেখাগুলো।

লেখক হবার ঘটনা প্রায় মাসখানেক এগোচ্ছিল। একদিন কলকাতার দুটি লক্ষে ইটা দুজন ছোটো চলুমের কথা উপলব্ধি হলেন। একজন অন্যজনকে ফলে-পাকা খবর জবলে মনের সুখ পাওয়া যায়। বুদ্ধি খুলে ঠিক জায়গায় টাকা লাগাতে পারলে সব কাজ হয়ে যায়।

লেকমুটির কথোপকথনে বিষ্ণুপদ বাসনবীর মনকে চমকে উঠলো মতলব। পরের দিনই নিউজ ম্যাগাজিনের ঠিকানা লেখে লেখে সম্পাদকের পত্র লিখলেন। নবীন লেখক লেখিকারা নিয়মিত ঠিকানায় বিষ্ণুপদ বাসনবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উপকৃত হলেন। কম হয়ে হয়ে মিলেছে। পরিচিত লেখক বন্ধুরাই নবীন লেখকরা যোগাযোগ করলো বিষ্ণুপদ বাসনবীর ঠিকানায়। কেউ ছোটো কেউ বোগা। কেউ পাগল, কেউ ভাবলাপাগল। কারও চোখে চশমা, কারও ঘড়ি, কেউ বুশ শার্টপরা। দুটো মেয়েও এলো। তারা অবশ্য মেয়েলি ঢঙে মেয়েতেই এলো। চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, পরে পুতুর

—তুমি কেন লেখো?

প্রশ্নটা শুনে বাসনবী

প্রশ্নটি

প্রশ্নের জন্য।

প্রশ্ন তিনি কী?

—সে জেনে শক্ত না নয়ে।

—শক্ত নয়। নরমও নয়। ভবিষ্যতের নির্দেশন।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ লেখনটীর পুথিটি পড়তে চাই। সাহিত্যিকের মতবস্তুতে

বিষ্ণুপদ বাসনবী মনে মনে বললেন—আর বোঝাও। অর্থাৎ খুঃ আসলে লক্ষ্মী হলো অর্থ।

তিনজনের উত্তর পড়ল হলো বিষ্ণুপদ বাসনবীর। তারা বললো—কাজ নেই তাই সাহিত্য করি।

—চাকরি থেকে কী করবে?

—লেখা ছেড়ে ঘর সংসারে মন দেবে।

—বিয়ে করবে?

—হুঁ।

—লেখার চাকরি পেলে ওরা বেতন কম করবে।

—হাজার দুই পেলে চলবে।

—ঠিক আছে কাল সকাল সাতটার মধ্যে এখানে হলে আসবে। কাজ করিয়ে নেব।

পরেরদিন যথাসময়ে তিনজনই এলো।

—কী কাজ করতে হবে?

চোখের চাঁক দিয়ে দেখে বিষ্ণুপদ বাসনবী বললেন-

—তোমাদের লেখার, কাজই বিষয় এখানে বসিয়ে বসে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা লিখবে। বেতন দু'হাজার টাকা। প্রতিদিন চা টিফিন দুপুরে খোরাক

ও পারে। কিন্তু সেখান থেকে সাদা হাতের দেখা মেলে না। আশপাশ থেকেও আসছে না।

সেখানে ইতস্তত ছড়ানো সেকেলের ঘুড়ির মধ্যে থেকে খুঁজে বার করা অনেক। কিন্তু আসলে ওরকম পাওয়া যাবে না। আর নিজেদের মাপমতোই তৈরি করে নিতে হবে। আজকের ডিজাইন সেকেলে ঘুড়ির বিজ্ঞান বাস্তবানীর মধ্যে পরিণত হয়েছে। তবুও এখন এদের সেখা বড় আকাশের সম্পাদকরা ছাপতে চাইছেন না। কিন্তু টাকা যখন আছে আকাশের সম্পাদককে দিয়ে দিয়ে ছাপানোটা হলো না বিজ্ঞান ব্যাপারটার। নিজেরও কেমনে একটা পরিচয় সাধারণের তখন করানোর। আকাশটুকি একজনের একটা প্রকাশনীয় ফুল কেলেছেন। মহাজনদের চালচলনের দেখেও পরে তখনো ভাল চলছে আর করছেন। সেখা তখনের মুখের ছড়াও লখন দেখেন দেয়ে সেখকদের হয়ে ঔদাসবাবে ফুল দেন। নিজির পরদের সেখা দেকে তক করলো সেকেলদুক সেখকদের কাছ থেকে। সেখা যত ভাল হচ্ছে নাম ছড়াচ্ছে বিজ্ঞান ব্যাপারটার। এখন আর সম্পাদকরা তাঁর লখার লাইন নিয়ে ছাপেন পাতুলিপির আগে। দুজন চার পাঁচ মাস পূর্বে সেখেই অগ্রিমের চেক নিয়ে উপস্থিত হয় নাম্নী দামী পত্র পত্রিকার সম্পাদক বা তাঁর প্রতিনিধিরা। অবশ্য বিজ্ঞান ব্যাপারটার সেখা তখনো অর্থ মৌলিকতা পরিচায়ক।

হাতে তিন সেখক নিয়ে মোটিলে চলেছি ছেয়ে পনেরোয়। মানুষ ঠকে। এখন ঠকে ঠকে সেখে। পরিচালক বন্ধু। তাদের মুখলে তখনের সেখা নিয়ে বিজ্ঞান ব্যাপারটার এত বড় সেখক। এত সম্মান, এত পুরস্কার। এর অর্থ। অনেকেরই সন্দেহ জন্মেছে তখনো। বন্ধুদের তরফে তখনের নিজের বিজ্ঞান ব্যাপারটার মত তারাও পেতে পারে সম্মান। পুরস্কার, অর্থ, এমনকি সেকেল না নিয়েই চলতি ছেয়ে নিল সেকেলরা।

তিন দিন, সময় চলে যাচ্ছে। অগ্রিমের আসছে পরবর্তীর উদ্যোগ। ছেয়ে হয়ে আসছে সময়ের দূরত্ব। মান সম্মান বৃদ্ধি পেল, তাদের পেল সুনাম প্রতিষ্ঠা। এখন ও সময় আছে। চেষ্টা করলে হয়তো শেষ রক্ষা হতে পারে। ভাবছে কিন্তু ঔদাসবাবে বিজ্ঞান ব্যাপারটার। পূর্বের মত সেখক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিলেন। আবার ছেয়ের এবং ছেলেদের। নিয়মিত প্রতিদিন আসছে সাধারণের অনেকেরই নাম এটিতে চাইছেন। ছেয়ে ছেলেরা অনুসারে। গল্প, উপন্যাস, কবিতার সাধারণের মধ্যে থেকে বাছাইয়ের। সম্পাদনার অতিজ্ঞতায় অবশ্যে পরিচালক সেখকরা ছিলেন গল্প হবে।

সেখে যে সেখক তখনো মধু সেকেলের ভুলনে নেই। আসেনের পত্র তার সেখে দেয়। একারণে আসেন একটি আসেনের এসেছে। আড়াই মাসেই তখনো আসেনের ইতিমধ্যে নিজের বিজ্ঞান ব্যাপারটার। ছেলেদের ছেয়ে নিজের পরিচালক পরিচিত আসেনে। নিজনের সেখকরা। ইতিপূর্বে ছেলে ছেলে পত্র পত্রিকার যে যে সেখে প্রকাশিত হয়েছে। সবাই তার ছেয়ে ভাল সেখে। ছেয়ে নিজির এসে জানালেন একটি সবচে পরিচিতি ছেলেদের পরিচয় নিয়ে। সাতটি সেখে ভাল পত্রপত্রের ছেয়েদের মধ্যে। দুটি ছেলে পরে হয়ে বিজ্ঞান ব্যাপারটার এসেছে, সেখে চলতে পারে।

•

প্রথম পরিচিতি । পরিচয় সাধারণ—সেখক । পরিচয় সাধারণ

আমি এখন পাশের প্রতিমা বাজার ও. টি. অফিসারের আসুন। মুখলবন্দের আর আসেনি। চলুন সেখিনি। ও. টি. হয়ে চলুন সেখিনি ছেলে মুখলবন্দের পরিচয়ে। পাশের প্রতিমা আর আসেও দুজির মানুষরা আসে ওধু পাশের। না ছেলে ছেলির পাশের নয়। ভাল আসেনে আরা দুর্দির এসেছে, ওখানে নিয়ে ছেলেরা পরি নিয়েই এখানে পাঠানো হয়, আমার ছেয়ে পাঠে না। এ আরা ছেলির আসি। আরা আসেনে নিয়ে পরে পরে আসেন চলায়। নিজির প্রতিমা মুখলবন্দের। এখন আর আসুনদের।

দ্বিতীয় নাম নীলাকাশপুর, দুজনের নাম ইন্দ্রপুর। ছেট একটি আসেন আছে। সবচেয়ে বড় আসেনটি ছেলেদের দুটি হয়েছে। দুটি না আসে আসেনি আসি ছেল। পাশের ছেয়ে আসেনে টাকা এবং পরিল পত্র নিয়ে পরিচালকে ছেল। আসেনে সবচে বেশি—মুখলবন্দ হাজার পাঁচেক টাকা এবং কিন্তু আসেনের ছেলে ছেলে। ছেলেরাও সেখেনে আসেনে। অর্থাৎ, তাই একেবে টাকার ছেল পুরিয়ে আইনটি নিয়ে আসে ছেলে ছেলেরে।

পুলিশ ছেলে কিন্তু ছৌধুরানী আসুন আসেনের ঘিরে দাঁড়ালো। আসেনটা ছেলের এসে আসেনেও নিল। মুখলবন্দের আসেনে আসে আসুন। আসুন পা, মস্ত পা, দাঁড়টানা দেশীবিদেশ পত্র সমর্থ পরিচয়। আসেনে হাত পাঞ্জাবাসার ছিল। সেদিন ছিল পাশের বর্ষার হাত। মাঝির ছিল উৎসব-পরিধান ঢেউ আসেনে ছিল আসেন আসেন ছেলেন। হাত পাঞ্জাবাসার ছেকে পাঠালার। আসে ছেলে আসে পরিচয়ের এক মুখল আসেন সামনে এসে দাঁড়ালো। পুলিশী ছেল নিয়ে আসিল আসে মুখলবন্দ এর আসেন দুটি সম্ভব নয়। পুলিশী আইনি ছেখে আসেন—কী নাম ছেলে?

—এ-এসে আইনি হয় ঠাঁন।

—দুটির মধ্যে ছেলের ডিগ্রিন?

—এসে আর আসে ছড়িন...আমি_____

—মুছলিনিন। আসে আসে ছেয়ে ছেলেরা আইনি।

—এসে না। আমি ইন্দ্রনিলের মুখলবন্দ আসেন পরিচয় দিলুম।

—ছেলে যে ছেলেরে পাসনী?

—এসে আ।

—নিজের আসেন আসিতে পুরে ছেল। পুলবন্দ আইনি ছেয়ে ছেলেরা।

—নিজের আসিনি ছে আসেনে আসু।

—আমে ছেলে নিন দুটি হয়েছে?

—এসে আ।

আসেনের ছেলেআসেন ও আসুন, আমে আসেনে দুটি হয়নি এই আসেনে। আইনি ছে আসেন—ছেলে পরিচয়ে ছেলেআসেনের আইনিআসেন যান ছেয়ে আসে। দুটি হলে আসে আসেনে ছেল। আসেনের নিজেরও আসেন আসে নেই কিন্তু আসে নিজে। সবাই নিজেরা। ছেট ছেলেটি।

—দুটি হয়েছে ছে ছেলেরে এখন?

আসেনের ছেয়ে একজন আসেনে—এসে আইনির আসি। ছেলেআসেনও আসেনের আইনির আসি এখন আসেনে সংজ্ঞা ছেল।

—আইনির আসিটি ছে?

—এসে আসেনে আইনির।

—আর ছেট আইনির আসিনিকে ছেকে আসো।

পুলিশ আসেন আসেনে আইনিরের দুজিবন্দ। ছেট ছেলে, পুলিশ আইনিকে বিশ্বাস আসে না। আইনিরের সম্পর্কে অনেক ছোর বরা পড়েছে ইতিপূর্বে। পুলিশের আইনিকে ছেল সবাইকে সন্দেহের এবিধার রাখবে। আসার এসেনও হতে পারে আইনির ছোরেআর আসেনুসন্ধান। হয় পড়তে আসার সময় ছেলেআসের সবাসা আসা ছেয়ে ছেলিনিকে সাবধান দিয়েছে।

আসেনের আসেনা ছেলেআসেনের এসেনাকে নিজের আসেনা আসেনা আসে। পরে ওদিনের আসেন আসিয়ে নিজেরা। আইনিক সাই আসেনে পারে না। তিন দিন ইতিআসে হয়ে একজনটা আইনিরের আসেনে না ছেয়ে আসেনে—আই যে ছেলেআসের আইনির ছেলে ছেলেরা?

যে ছেলেরা আসেনে বিয়েছিল সে আসেনা-আসেনা আসে নেই। ইতিমিকে আসে এসুন। এসেই ছেয়ে পারে ছেয়ে। আসেনে ছৈর্যচ্যুতি ঘটেছে।

—কী ব্যাপার আসেনো। ছেলেআসের আইনির পুলি ছেয়ে যে ছেলেআসে আসে আসেনে একেবারে ছেট আসে ছেখে আসে ফিরলেন কিনা। হাঁন একজন চিংকার আসে আসেনো-কী আইনির এসেছে।

প্রাসেনে ছেটো পথ আসিয়ে ছেটে আসছে, একজন মানুষ। ছোগা, লম্বা, কালো, আসুক পা। মাসকৈঁচা ছেঁ ধুতি পরনে। হাতে ওপর আসেনরঙা একটা গামছা আসানো। আসেনসের মা আসেনো পাসা-আসেনো আসি ছেঁচা পাকার ছেলানো রুক এসেআসেনো দুজন। আইনি আমি হতবাক। এ ছেলেন আইনির। আমার চিরকাল চিরাচরিত আইনিরের একটা ধারি আসিন আসে। পাকিয়া ঢর্না ধুতি পাঞ্জাবি পরনে। নেয়ুক পরে ইন্ত্রি ও ফুলপাটি পরে ছেলেআসুরি চরন, আমার কাঁধে পাসা চুল ছেখে ছেটোন ছেলেরা বেশি পাসাআসের চলন। চলন আড়চোখে আসিয়ে ছেলা দুটি ছোখ। ছেলেআ একন আইনিরকে ছেখবো কল্পনা আসিনায়। সামনে যা ছেখি এ আমার আসেনার আইনির নয়। তবু তো আইনি আসেনায়-বন্ধুর। আইনির হাতেআসে ধরে আসো—ওঁ কি যে বলেন, আপনার সামনে আমি বসবো। পুরুষ আমাক হলাম হতের আইনিরের বিনয় ছেখে। যা আমার ছেয়ে বয়ঃই ছবে, তবু এত বিনয়। আইনির মানুষরা এরকমই হয়। নিজের পণ্ডিতা ছোপন রাখে আসার আড়া ছেয়ে ছেল আইনিরকে ছেখে।

নিজের মত কিন্তু হয়ে বসলাম। আইনির ঐ-ট্যা নিয়ে উঠতে ছেখার চেষ্টা আসেনেন। বুঝতে পারবি আইনি হয় পারেন। আমি অবশ্য বিনয়ে।

—তোমের কিন্তু নেই আইনির আসেনি। এসে আসেনের নিয়মের মধ্যে পড়ে, ছরকারী হবে। ছ দিনের আসতে পারেন। এরমধ্যে নিয়ে পড়ে ধমি আসেনে একটনে একটা সই আসেন।

—সই? মুখলি আসেনে হয়ে ছেল আইনিরে

—ঠিন দিনে হয়নি। আমি ছেসে ফেললাম।

—আইনির ছেয়ে। আপনি ঠিন ছেখেন যে

দুধের। সিন এখানে সই করে দিন।

আমার জন্য ঘরিয়ে দিলাম মাস্টারের হাতে। তবুও মাস্টারের ইতস্তত ভাব। জগদ্বেতের একজন বললো—

—আপনি যা মাস্টার একটা সই করে।

মাস্টার জগদ্বেতের মুখগুলো দেখে আমাকে বললেন·

—সই করবো?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় করবেন।

একজন মাস্টার মাথা দুলিয়ে বললেন—কিন্তু আপনের ছওটা যে ছোট হবে।

—ছোট? ছোট কেন? আমি বিস্মিত হলাম।

—না মানে আমার সই একটু বড়ো তো।

—তাতে কী হয়েছে। এত বড় ভাববি, হয়ে যাবে। তুবও মাস্টারের মুখ কাঁদু-মাদু। আমি অবাক হচ্ছি। মাস্টার মানুষ। সই করতে কুণ্ঠা কেন। তবে কি হাতের লেখা খারাপ? তা হোক না। একটা মাত্র সই। সব মানুষের হাতের লেখা ভাল হয়না।

—সিন সই করুন।

জগদ্বা কালবরে মাস্টার আমার ডায়েরির পাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছোটো ছোটো অক্ষরে ভুল জানানে লিখলেন—সিরি কলো করতে হাঁড়ি। সময় নিলেন অবশ্যে মিনিট। আমি হতবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম—আপনি তো মাস্টার মশাই? লোকটি তেমনি মুখ কাঁদু-মাদু করে বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

●

বিতীয় কাহিনী । আজকাল হলেও সত্যি। লেখক। অবশিল পাটনি।

সত্যবাবু পেশায় ভুল শিক্ষক। ভুল শব্দের কারবার নেই। লোকে সৎ শিক্ষক হিসাবে মানা করে। মোটামুটি স্বচ্ছল সংসার। রাজনৈতিক বিশ্বাসে, জনগণের কাছাকাছি থাকার অভিপ্রায়ে তাদের সুখ দুখের সমব্যথী হওয়ার জন্য পঞ্চায়েত এসেছেন। পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে তাবলেন গ্রামের চষি মজুর মানুষ গুলোর ভাল করবেন। বিকেন্দ্রীকৃত শাসন যন্ত্র মাটির কাছাকাছি এসেছে। গোটা মানুষের উপকারে লাগাবেন। বিশ্বে আপনে তাদের পাশে দাঁড়াবেন। সাহায্য করবেন। তিনিও জানেন পঞ্চায়েতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানুষের সার্বিক চাহিদা পূরণ করা যাবে না। সবসময় আঙুল সমাধান করা যাবে না। তবুও যেটুকু ক্ষমতা পাওয়া যাবে সেটাই সঠিক প্রয়োগ হলে মানুষ উপকৃত হবে।

চারবছর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দায়িত্ব পালন করে সত্যবাবুর অভিজ্ঞতা ভাবনা চিন্তার বিপরীত। তিনি গ্রামের মানুষ, থাকেন মাটির কাছাকাছি। চেনেন যেতেন গ্রামীন চরিত্রের খুটিনাটি। তবুও হতাশা মানুষকে দেখে। অবাক হচ্ছেন অদ্ভুতসৃষ্ট বিচিত্র সমস্যার রূপ দেখে। এমন কিছু সমস্যা যা আদি সামান্য। পরিবারিক সমাধান সম্ভব। তবুও তারা আসছে পঞ্চায়েতে। আসলে পরিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন নির্ভরতা কমছে। বিশ্বাস কমছে। আস্থা কমছে। ছোট ছোট সমস্যাকে জটিল করে তুলছে। পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে মানুষ আসছে সমাধানের আশা নিয়ে। পঞ্চায়েতের আইনে এ ক্ষমতা কোন লিখিত নির্দেশ নেই। তবুও সত্যবাবু মানুষের কথা ভাবেন। গ্রামের গরীব মানুষগুলো আইন আদালতে যেতে পারে না। একটু আন্তরিকতা, একটু সহিষ্ণুতা নিয়ে অনেক সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব।

আবার পারিবারিক সমস্যা। আবার মাস্তান সমস্যা, আবার বা বৈবাহিক সমস্যা সালিশী করেন সত্যবাবু। আবার বাড়ি কর্মার ছেড়ে পড়েছে, মেরামতের জন্য পঞ্চায়েতের সাহায্য চায়। আবার মেয়ে জামাই ঘর করতে পারছে না। সালিশী করে ফেন। হাজার হাজার আবেদন আসে। সত্যবাবু আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেন সকলকেরই সমাধান করতে। কোনটা সফল হন। কোনটা পারেন না। এই ব্যর্থতা যা না পারার আজন অনুসন্ধান করে বিচিত্র হয়েছেন। গ্রামের মানুষগুলো তার আগের মত সোজা সরল নেই। চালাক হয়েছে। অকারণে সমস্যা সৃষ্টি করছে। একটু সচলশীল হলে সাধারণ এড়ানো যায় জেনেও সাধারণ তৈরি করছে। পূর্বে গ্রামের পদ্যব্যয় ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রামের বোলো আনার সালিশী আসন্ন করলে ফোলাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি হতো। জল ছলে হতো। ঘোলে ডুবানো, ঘোল নদিয়ে ঘর হতো। সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হতো। বিয়ে আর অন্নপ্রাশনে, যা পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হলেও ঘোল দিয়ে যা খেতে। জরিমানা হতো। সে জরিমানা কখন ও আর্থদণ্ডে, কখনও বা দান চাল নারকেল সুপারির মত কখন ফসলে। তা দিতে না পারলে জোর পূর্বক নিয়ে যেত আদায় করতে। ভয়ের কারণে। জরিমানার টাকায় গ্রামের বারোয়ারী পূজার অনুষ্ঠান হতো। তখন যেনো আমার গাপটি ছিল। মানুষ যেনো আমাকে মানতে বাধ্য হতো। ভয় করতো। নির্ভর করতো যেনো আমার সালিশী বিনা প্রতিবাদে মেনে নিত।

পঞ্চায়েত যেনো আমার বিচার নয়। রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতা হাতে থাকলেও গাপটি দেখাতে পারেন না সত্যবাবু। যুগের পরিবর্তন হয়েছে। সালিশী আমেকে মেনে নেয়। অনেকে মেনে নেয় না। সত্যবাবু অসহায়বোধ করেন। বিব্রত হন। আমর্শবাদী ভুল শিক্ষক হিসাবে যে সম্মান পেয়েছিলেন। পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে সে সম্মান খোয়া গেছে। তুবও মানুষের অভাব অভিযোগ শোনেন। শোনার সাধ্যি নিয়েই তিনি ভোটে জিতেছেন। প্রধান হয়েছেন।

●

রাতে ভারী বর্ষণ হয়ে গেছে। ভোরের আকাশ নির্মল। মেঘহীন। চিরকাল সত্যবাবুর সূর্য না ওঠা ভোরে শয্যা ত্যাগ করা অভ্যাস। ভোর ছয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত একঘন্টা মেঠো রাস্তায় পায়চারি করেন। সঙ্গে নিজের পাঁচন নিয়ে পাঁচ মাথার জমাটাও চলে। সূর্যোদয়ের আগেই কিছু মানুষ আসে তাদের নানান অর্জি নিয়ে। সত্যবাবু পাঁচান। শোনেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা পরামর্শ দেন। অফিসে পঞ্চায়েতের অফিসে যোগাযোগ করতে বলেন। পুনরায় হাঁটা শুরু করেন। আজ বাড়ি ফিরে দেখলেন একজন মুবতী বসে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। বেলা মাস চল্লিশের কাছ দাছাকাছি। সত্যবাবু মেয়েটিকে বললেন—বৈঠকখানায় একটু বসো আমি মুখ ধুয়ে আসছি। ঘরের ভেতর চলে গেলেন। মিনিট পনেরো পরে এসে বসলেন বৈঠকখানায়। নিজের অফিস করতে পারেন নি। বৈঠকখানায় আসা মানুষের কথা শোনেন। এগারোটা নাগাদ পঞ্চায়েতে অফিসে যান।

মেয়েটি মলমুখে বসে আছে বৈঠকখানার ভেতরে। সত্যবাবু কাজ জমা নেই। অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চায়। এরকম অনেকেই আসে। পঞ্চায়েতের যত রকম সুযোগ সুবিধা আছে ব্যবস্থা করে দেন। অনেক সময় নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।

—বলো মা কী বলবে? ছেলের অসুখ?

—মেয়েটি মাথা নেড়ে জানালো—না।

—স্বামী মর খায়? কলহ করেছে? তাড়িয়ে দিয়েছে?

—এরকমও মেয়েটি বললো—না।

সত্যবাবু অবাক হলেন—এই বয়সের মেয়েরা সাধারণত দুটি সমস্যা নিয়ে আসে। ছেলে মেয়ে অথবা ছেলের অসুখ। নয়তো স্বামীর সঙ্গে কলহ বিবাদ। অথবা স্বামী বিতীয় করেছে।'

—তাহলে কেন এসেছে?

মেয়েটি নির্বাক। মাথাটা ঝুলে এলো বুকের কাছে। নিশ্চয় এমন কিছু কথা যা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। সত্যবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছেন মেয়েটিকে।

—বলো। লজ্জা কী? তুমি আমার মেয়ের মত।

এবার যেন আঁচারে একটু আলো দেখলো মেয়েটি। মুখ তুলে বললো। অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখলো সত্যবাবুকে। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বললো—প্রধানবাবু, আপনারা আমার ছেলেটা মরে যাবে।

—কেন? মরবে কেন? বললে তো অসুখ নয়।

সত্যবাবু বিস্মিত। কিছুক্ষণ নীরব থেকে মেয়েটি বললো—

—ছেলেটা না খেতে পেয়ে মরে যাবে বাবু।

সত্যবাবু ভাবলেন ছেলেটির বাপ বেকার। অভাবের সংসার।

—ওর বাপ কী করে?

—ফেরীর নৌকা চালায়।

—তাহলে ছেলে না খেয়ে মরবে কেন?

—ওর দুধ ওর বাপ খেয়ে নেয়।

সত্যবাবু হেসে ফেলে মুখে হেসে উঠলেন। এটা কী ধরনের অভিযোগ। এর জন্য আসতে হলো প্রধানের কাছে! তাও এই সাত সকালে। আশ্চর্য। হাসি থামিয়ে সত্যবাবু বললেন—এর জন্যে তুমি ছেলের বেলা আমার কাছে এলে মা। ওর বাপ দুধ খেয়ে নিচ্ছে? নিক। সেই তো দিনে দেবে।

সত্যবাবু আমার মানুষ। অভিজ্ঞ মানুষ। মানব চরিত্রের বিচিত্র গতিবিধি তাঁর অজানা নয়। তবাবতই তিনি ভেবে নিলেন বৌটার দুধ যেমন পিতব্যয় ছেলেকে খাওয়ার ভেতে নিষেধ নেই। ভেতেও সুধায়। পুনরায় বললেন—

—বাপ খায় খাক। দুধিয়ে যাবার আগেই কিনে আনতে বলবে।

মেয়েটির মাথা পুনরায় ঝুঁকে পড়লো বুকের কাছে। লজ্জা ভেজা কণ্ঠে বললো—

—বৌটার দুধ না। বুকের দুধ খেয়ে নিচ্ছে ওর বাপ।

সত্যবাবু ভাবলেন, পরিপাক করতে সময় নিলেন কয়েক মিনিট। কিন্তু কোন কথা যুটলো না তাঁর মুখে।

ঘুম আসছে না

নির্মলেন্দু গৌতম

তাতাইকে নেমে যেতেই সিঁড়ি ছেড়ে উঠে আসা পায়ের শব্দ শুনে জরিতা দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েও বন্ধ করলো না।

সুবিমল উঠে আসছে। পায়ের শব্দ সুবিমলের।

সিঁড়ির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলো জরিতা।

দ্রুত পায়েই সুবিমল উঠে এসে জরিতার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কার জন্যে সিঁড়ির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছো? আমার উঠে আসবার জন্যে, না তাতাইয়ের নেমে যাবার জন্যে?'

হাসলো জরিতা। বললো, 'দুটোই ঠিক।'

'সত্যি বলছো তো?' ইজি চেয়ারটা বসলো সুবিমল।

'না, মিথ্যে বলছি।' বলে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো জরিতা। হেসে দরজা পেরিয়ে ঘরের ভেতর এলো সুবিমল।

জরিতা দরজা বন্ধ করে ফিরলো সুবিমলের দিকে। বললো, 'সত্যি, তাতাই কিন্তু তারি সুন্দর গুছিয়ে গল্প করতে পারে।'

'বোধহয় তোমাকেই বেশি গল্প শোনায় তাতাই।' সুবিমল বললো।

জরিতা হাসলো। বললো, 'শোনাবে না কেন বলো তো? তোমাদের তো বৌদিই নেই। তোমাদের গল্প শুনিয়ে ওর ভালো লাগবে কেন?'

'ঠিকই বলেছো।' বলে হেসে এটাচিটা সোফার ওপর রাখা খুঁজে দিয়ে ভেতর ঘরের দিকে পা বাড়ালো সুবিমল।

এগিয়ে এসে এটাচিটা তুলে নিয়ে ঠিক জায়গায় রেখে ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে হাতাতে এলো জরিতা।

মাস ছয়েক হলো এই ফ্ল্যাটে এসেছে সুবিমল আর জরিতা। অফিস থেকেই নিয়েছে ফ্ল্যাটটা।

দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে ভাবছিলো। একরকম ফ্ল্যাট খুঁজছিলো জরিতার পছন্দ। আসলে ভিড়, হৈ হট্টগোল জরিতার একেবারে পছন্দ নয়।

তাতাইয়ের জন্যেই দোতলার চার নম্বর ফ্ল্যাটের সুবিধাটা সঙ্গে জরিতার সম্পর্কটা একটু বেশি। সুবিমার বন্ধুবান্ধবের ছেলে তাতাই। এখনে আসবার পরই, হঠাৎ তাতাই জরিতাকে পছন্দ করে ফেলেছিলো। তার কারণটা অবশ্য জরিতা বুঝতে পারে। জরিতার ফ্ল্যাটে তাতাইয়ের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। নিশ্চিন্তে জরিতার ফ্ল্যাটে সে তার অধিকারটা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সবিতাই অবশ্য কথাটা একদিন বলেছিলো জরিতাকে। জরিতাও সেটা বুঝতে পারে।

সত্যি, তাতাইয়ের জন্য জরিতার সময় আরি চমৎকারভাবে কেটে যায়। সুবিমলের অফিস যাওয়া আর অফিস থেকে ফেরার তো কোন জটিল নেই। তবু মাঝখানে আরার ব্যবস্থা আছে, যতক্ষণ সেই আড়ি রেখে অফিসে যেতে ফেরার।

সুবিমল বলে, 'তাতাই যখন আসে, তখন তোমার সময় কাটাবার জন্য আর কিছু দরকার নেই।'

কথাটা অবশ্য ভুল নয়। তাতাই থাকলে সুবিমলের কোথায় যাওয়াটা ভাববার সময় পায় না জরিতা।

সবিতাও তাতাইকে জরিতার কাছে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। সবিতা জরিতাকে বলে, 'তোমার কাছে থাকলেই ওর দুরন্তপনা যেন কমে যায়। মিতি থাকে তোমার কাছে।'

জরিতা হেসে সবিতার কথা শুনে। কিন্তু বলে না।

সুবিমলের সঙ্গেও তাতাইয়ের খুব ভাব। তাতাই তাতাইয়ের জন্যে চকোলেট আনে সুবিমল। সময় পেলে গল্পটল্পও হয় তাতাইয়ের সঙ্গে। জরিতা বুঝতে পারে, তাতাইয়ের জন্য সুবিমলের মনের মধ্যে একটা দুর্বল জায়গা আছে। বাইরে থেকে অবশ্য সেটা কখনও বুঝতে পারবে না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই জরিতা চা করলো।

নিজের জন্যে এই সময়ই চা করে জরিতা। আসলে কেবল এক নিজের জন্যে চা করতে জরিতার ইচ্ছে করে না। একটা ভেবে দুজনের চায়ের কাপ দুটো নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ড্রইংরুমে এসে জরিতা দেখলো, সুবিমল এরই মধ্যে পোশাক টোশাক পাল্টে চায়ের জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। কাপ দুটো নিয়ে সুবিমলের পাশে এসে বসলো জরিতা।

জরিতার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে সুবিমল বললো, 'আমি একটা কথা ভাবছি জরিতা।'

জরিতা কথাটা শোনার জন্য সুবিমলের দিকে তাকালো।

সুবিমল বললো, 'তাতাইকে যদি তোমার ছেড়ে যেতে হয়, তাহলে কি করবে?'

'কি আর করবো, ছেড়ে দেবো। কিন্তু তুমি এই প্রশ্নটা করলে কেন?' খানিকটা অসহায় হয়েই প্রশ্ন করলো জরিতা।

সুবিমল বললো, 'আসলে এ বাড়িটা ছেড়ে দিতে অফিস। তিন বছরের জন্য লিজ নিয়েছিলো। লিজ শেষ হয়ে গেছে। না, লিজ আর রিনিউ হচ্ছে না। আমাদের এখানে থাকা হচ্ছে, তাদের একেকজনকে একেক জায়গায় ফ্ল্যাট দিচ্ছে।'

চমকে উঠে জরিতা বললো, 'সত্যি বলছো?'

সুবিমল বললো, 'সত্যিই বলছি। আজই খবরটা শোনাম অফিসে। তখন থেকেই শুধু তোমার কথাটাই ভাবছি।'

জরিতা কিন্তু বললো না। আসলে কিছু বলতে ইচ্ছে করলো না জরিতার। কি রকম যেন একটা শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ছে মনের ভেতর।

সুবিমল একটু সময় নিঃশব্দ থেকে ধীর বললো, 'ভালই হলো। বেশি মায়ার জড়িয়ে পড়াটা ঠিক নয়। বলো, ঠিক বলেছি কিনা।'

অসহায় গলায় জরিতা বললো, 'ঠিক বলছো।'

ফ্ল্যাট ছেড়ে যাওয়াটা যে সুবিমলেরও খুব খারাপ লাগছে, সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারছে জরিতা। আসলে, জরিতার শূন্যতাটুকু সে তার অফিস দিয়ে অনুভব করতে পারে সুবিমল।

তাতাইকে ছেড়ে যেতে হলে সত্যিই যে এক শূন্যতার ভরে উঠবে জরিতা, সুবিমল নিশ্চয়ই সেটাই ভাবছে।

এই ফ্ল্যাটে আসবার পর যেদিন তাতাই এসে ঘুরে গেছিলো জরিতাকে, সেদিন সুবিমলের মুখ লক্ষ্য একটা ঘুশিতে ভরে উঠেছিলো।

কিন্তু সত্যিই যদি চলে যেতে হয় এই ফ্ল্যাট থেকে, তাহলে তো তাতাইকে আর এভাবে পাবে না জরিতা। কি জানি, কোথায় কতদূরে ফ্ল্যাট নেবে। হয়তো তাতাইয়ের ফ্ল্যাট এতদূরে নেবে যে দেখা করতে যাবার মতো সময় আর সুযোগও পাওয়া যাবে না সব সময়।

চায়ে চুমুক দিলো জরিতা। না, চা খেতে ইচ্ছে করছে না।

সমস্ত শরীর জুড়ে নিঃসঙ্গ বেদনার একটা ভার যেন ভীষণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। নিজেকে খুবি আর সামলে রাখতে পারছে না জরিতা।

সুবিমল যাতে কিছু বুঝতে না পারে তার জন্য চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে এলো জরিতা। নিঃশব্দে পুরো কাপটা সিঙ্কে ঢেলে দিয়ে কাপটা ধুয়ে নিলো।

তারপর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো জানালার দিকে।

পরদিন বিকেল বেলা নীচের ফ্ল্যাটের গুণ্ডা আর অলক উঠে এলো জরিতার ঘরে। তাতাইয়ের সঙ্গে তখন গল্প করছিলো জরিতা। ফ্ল্যাট যে ছাড়তে হবে সবাই তা জেনে গেছে। সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় তাতাইকে কোলে নিয়ে জরিতার দিকে ফিরে গুণ্ডা বললো, 'তোমার এই ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে জরিতা?'

জরিতা বুঝতে পারলো, গুণ্ডা কেন বললো কথাটা। তবু ইচ্ছে করেই বললো, 'কেন?'

'ঐ যে, ওর জন্য।' তাতাইয়ের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলো গুণ্ডা।

অলক বললো, 'এই ফ্ল্যাট আমাদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে, তাই কথাটা জানছি আমরা।'

হাসলো জরিতা।

'কি জানো, তাতাইকে নিয়ে তবু তুমি তোমার মনের সাধটুকু মেটাতে পারছিলে।' গুণ্ডা বললো জরিতার দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে।

মুহূর্তে এক কি রকম যেন অসহায় হয়ে গেলো জরিতা।

তাতাইকে নিয়ে কি জরিতা তার মনের সাধ মেটায়। ওরা তাহলে এতদিন এরাবরই ভেবেছে তবে আর তাতাইকে নিয়ে!

সত্যিই কি তাতাইকে নিয়ে জরিতা তার মনের সাধটুকু মেটায়? নিজেরই বুকি প্রশ্ন করলো জরিতা।

না, কখনোই এমনি একটা ভাবনা ভেবে নি

জরিতা। এরকম ফুটফুটে একটা শিশুকে ভালোবাসতে কোনদিন সবারই ইচ্ছে করে। তারই মধ্যেই বুঝি একটা ভালোবাসা। জরিতা তাই তাতাইকে ভালো না বেসে পারেনি।

মুহূর্তে এসব কথা ভেবে অসহায়ভাবেই তাতার দিকে তাকালো জরিতা।

তাতা যেন জানলো, 'আমরা তাই বলি, এই ফ্ল্যাটে এসে তাতাইয়ের জন্যেই তুমি ভালো আছো।'

'হয়তো কেউ এসে দেখলে কিছু তাতাইয়ের মা বলেই তোমায় ভাববে।' অলকা বললো।

তাতা বললো, 'অলকা কিন্তু ঠিক বলেছে জরিতা।'

দু'মুহূর্তে ভেবে অলকা এবার বললো, 'কিন্তু নতুন ফ্ল্যাটে গেলে কি আর তাতাইয়ের জন্যে কাউকে পাবে?'

জরিতা কোন উত্তর দিলো না।

তাতা বললো, 'তাতাইয়ের মতোও বলতে হয়। মিঠি তোমার কাছে ছেড়ে গিয়েছে তাতাইকে।'

'জরিতার কষ্টটুকু নিশ্চয়ই বুঝেছে সবিতা।' অলকা বললো।

না, আর শুনতে পারছে না জরিতা।

তবু যেন অনেক কিছু শুনতে হলো জরিতাকে।

এক সময় দু'জন উঠলো। জরিতার মনে হলো যেন অন্তহীন কাল ধরে তারা বসেছিলো জরিতার সামনে।

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে জরিতার দিকে হঠাৎ ফিরে তাতা বললো, 'সখি, এভাবে একেকজনকে একেকবার ভালো বেসে তুমি শুধু কষ্টই পাবে।'

'আমরা তাই বলি, এভাবে কাউকে যেন ভালবাসা উচিত না যেন।'

না, আর কিছু বললো না তাতা আর অলকা। দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে অসহায়ভাবে দরজাটা বন্ধ করলো জরিতা। তারপর নিঃশব্দে দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েই রইলো।

চেনা পৃথিবীটাকে এখন অচেনা মনে হচ্ছে জরিতার। নিজেকে মনে হচ্ছে নিজেরই।

কতক্ষণে যে সুবিমল ফিরবে কে জানে।

ভোর বেলা বাজলো। নিশ্চয়ই তাতাই। আইয়োলে চোখ রাখলো। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তার মানেই তাতাই। তাতাই ছোয়াবেল বাজালে আইয়োল দিয়ে তাতাইকে দেখা যায় না।

দরজা খুললো জরিতা।

উঁ উঁ করে তাতাই ঢুকলো ভেতরে। মনে হলো অনেক কথা নিয়ে এসেছে তাতাই।

জরিতা তাতাইয়ের দিকে তাকালো। তাতা আর অলকার কথা কতো শুনে ছেড়ে থাকলো মনের মধ্যে। তারপর বিস্ময়, তারপর অসহায় মনে হতে থাকলো নিজেকে।

তাতাই হঠাৎ নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে থাকা জরিতার চোখে চোখ রাখলো। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেলো তাতাই।

জরিতাকে ঠিক এরকম চেহারায় তাতাই কখনো দেখেনি। আর সেজন্যেই বুঝি তাতাই ভয় পেলো। শক্ত হয়ে উঠলো ঠোঁট দুটো।

জরিতা তাতাইয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে গেলো।

তার আগেই 'আমি একটু মার কাছে যাচ্ছি।' বলেই ছুটে চলে গেলো তাতাই।

দরজাটা বন্ধ করতে পারলো না জরিতা। খোলা দরজার সামনেই স্থির চোখে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

রাত করে ফিরলো সুবিমল।

জরিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমাকে যেন কি রকম গম্ভীর মনে হচ্ছে।'

জরিতা যেন উত্তর দিলো না।

সুবিমল যেন বললো, 'তাতাই আজ আসেনি।'

তাতা আর অলকার কথাগুলো মুহূর্তে জরিতার মনে ভেসে এলো। ম্লান মনে চীৎ হয়ে উঠলো জরিতা। বললো, 'তাতাই এলেই আমি খুশি-খুশি থাকবো, একথা তোমার মনে হলো কেন বলো তো?'

খুশি অবাক হলো সুবিমল। তারপর তাকালো জরিতার দিকে। জানলো, 'কী হয়েছে বলো তো, হঠাৎ এরকমভাবে কথা তো তুমি বলো না।'

জরিতা সামলে নিলো নিজেকে। বললো, 'কিছু হয়নি।'

সুবিমল কিছু বললো না।

জরিতা বুঝতে পারলো, সুবিমল জরিতার কথায় অসহায়বোধ করছে।

না, জরিতা ভেবে পাচ্ছে না কি করবে। আসলে তাতা আর অলকার কথাগুলো সুবিমলকে বলতে পারবে না জরিতা। বলা যায়ও না।

কিন্তু চোখের নিজেকে সহজ করে তুলতে চেষ্টা করতে থাকলো জরিতা।

রাতে কিছুতেই আর ঘুম আসছে না জরিতার।

সুবিমলও যে জেগে আছে, জরিতা স্পষ্টই সেটা অনুভব করতে পারছে। আসলে, জরিতা বুঝতে পারছে, কি ঘটেছে সেটা জানতে না পারলে সুবিমলের ঘুম আসবে না কিছুতেই।

অথচ সমস্ত সুবিমল অবাক জরিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে কিছু। বুঝতে পারেনি। কেন জানি কেনো প্রশ্নও করেনি আর।

সেই যে তখন মা'র কাছে চলে গিয়েছিলো তাতাই, আর আসেনি। যদি কের তাতাই আসতো, হয়তো সহজ হতে পারতো জরিতা। এবার থেকে তাতাই সন্তর্পণে আসবে। কি জানি, আর আসতেও চাইবে না হয়তো।

আচ্ছা, সত্যিই কি তাতাইকে নিয়ে মনের সাধটুকু মেটাতে জরিতা? সেজন্যেই কি ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে জরিতার কষ্ট হচ্ছে? তাতাইয়ের মতো কেউ কেমনদিন জরিতার সামনে আসবে না আর জরিতার বুকের ভেতর বেজে আছে সত্যি, কিন্তু তা জরিতার একান্ত নিজস্ব বেদনা। সেই বেদনা কেন কিছু দিয়েই কি কখনও মুছে ফেলা যায়? না, তাতাইকে নিয়ে সাধটুকু মেটানোর কথা কখনোই ভাবেনি জরিতা।

জরিতা দারুণ একটা অস্থিরতার ঘুমে ওলো। একটা হাত রাখলো সুবিমলের শরীরে।

সুবিমল মৃদুস্বরে বললো, 'আমি কিন্তু জেগেই আছি।'

জরিতা বললো, 'জানি।'

'কিছু বলবে?' জানতে চাইলো সুবিমল।

বার কয়েক নিঃশব্দ রইলো জরিতা। তারপর বললো, 'বিশ্বাস করো, আমার মন ভালো নেই বলেই তখন অমনিভাবে বলেছি তোমায়।'

'জানি।' সুবিমল বললো।

জরিতা বললো, 'জিজ্ঞেস করলে না, কেন মন ভালো নেই?'

'তাতাইকে নিয়ে নিশ্চয়ই কেউ কিছু বলেছে তোমায়।' সুবিমল বললো।

ঘরে মুহূর্তের জন্য থেমে ফের বললো, 'ফ্ল্যাটের কেউ এসেছিলো আজ?'

চুপ করে রইলো জরিতা। সুবিমল বোধহয় ব্যাপারটা করে ফেলেছে। সুবিমল তো জানে, তাতাইয়ের সঙ্গে জরিতার সম্পর্কটা নিয়ে নানান কথা হয়। সেই কথা যে জরিতাকে হঠাৎ কেন মুহূর্তে বিপন্ন করে দিতে পারে, সেটাও জানে সুবিমল।

সুবিমল বুঝি খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। কিছু ভাবলো খানিকটা সময়। তারপর বললো, 'তোমায় একটা কথা বলবো জরিতা?'

জরিতা অস্ফুট গলায় বললো, 'বলো।'

'তাতাইকে নিয়ে ফ্ল্যাটের কেউ কিছু তোমায় বলেছে নিশ্চয়ই।' সুবিমল বললো।

নিরুত্তর রইলো জরিতা।

সুবিমল যেন বললো, 'সে জরিতা, এরা কি বলেছে, তা আমি শুনতে চাই না। আমরা কারুর নিজের ব্যাপারে ছোট করে এটা চাই না আমি।'

ঠিক কি ভাবে জরিতা বুঝি ভেবে পেলো না। সুবিমল কি বলতে চাইছে স্পষ্টই বুঝতে পারছে জরিতা। তাকে তো একটা কথা বলেই সবটা বলা হয়ে যায়। সে কথাটা কি, সুবিমল তা জানে। এক এক সময় জরিতার মনে হয়, সে কথাটা শুনলে তার চাইতে অনেক বেশি কষ্ট পায় সুবিমল। কষ্ট পায় জরিতার জন্য।

না বলেও জরিতাকে এ নিয়ে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করেনি সুবিমল। জরিতা বললেও কিছু বলতে গেলেও শোনে না।

এসব ভাবতে ভাবতেই জরিতা বুঝি নিবিড় একটা কান্নার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলো।

ঠিক তখনি সুবিমল বললো, 'কি হলো, কিছু বলছো না যে।'

জরিতা কান্নায় রুদ্ধ গলায় বললো, 'আমার, আমি আমার মেয়ে তার পেয়েছে তাতাই। আর আসেনি।'

মুহূর্তে জরিতার দিকে ফিরলো সুবিমল। তাকিয়ে জরিতাকে। তারপর নিবিড় গলায় বললো, 'ঐ যে, ওদের কথা শুনে তুমি নিজের কথাই নিজেকে ছোট করে ফেলেছো। ছোট করে ফেলেছো বলে নিজের ওপর নিজের অধিকারটাও হারিয়ে ফেলেছো। এরকম হলে তোমার চেয়ারা তো ভয়ের চেয়ারাই হবে। তাই-ই হয়। তাতাই যে তোমার ভয় পেয়েছে, সে জন্যে সত্যিই—'

না, আর পারলো না জরিতা। কিছুতেই পারলো না।

'আমি আর কখ্খনো—কখ্খনো—' কান্নায় কান্নায় জরিতা ভেঙে পড়লো।

হ্যাঁ, এখন অনেকটা সময় ঘরে জরিতা কাঁদবে।

আটকে রাখো

বিমল দাস

একটি শিশুকে জামা পরাতে গেলে সে কেঁদে ওঠে। বাধা দেয়। কারণ সে কোনরকম বন্ধন চায় না। সে চায় মুক্তি। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষের জন্মগত। শিশুটি যখন পরিণত বয়স্ক হয়, পূর্ণ-মানুষে পরিবেশিত হয় তখনও তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাটি বর্তমান থেকে। সে চেয়ে সার্বিক মুক্তি, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যে পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন—খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ও শিক্ষা, সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে সে দেখে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বিশ্বের সম্পদে সে তার ন্যায্য ভাগ পাচ্ছে না। তার শ্রমের ফলকে কেড়ে নিচ্ছে অন্যে। তারাই সংখ্যায় বেশি অথচ যারা তাদের শ্রমকে চুরি করছে, শোষণ করছে, নিংড়ে নিচ্ছে তারা সংখ্যায় নগণ্য কিন্তু ক্ষমতায় শক্তিধর। তাদের শোষণ যন্ত্রটির নাম দিয়েছে—'রাষ্ট্র'। আর রাষ্ট্রের দোহাই পেড়ে পুরো সভ্যতা জুড়ে। অস্ত্র ও গুণ্ডাদের তারাই অধিকারী। আর শোষিত মানুষ অস্ত্র হাতে নিতে পারে না। সেটা রাষ্ট্রবিরোধী, আইন-বিরোধী কাজ। শোষিত মানুষ মুখে মুক্তির কথা দেখে—শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তি। মুক্তির জন্য সে সংগঠিত হতে চায়—সংগ্রাম করতে চায়।

যুগের শোষক শ্রেণীর সমর্থনে নানান উপায় অবলম্বন করে, সর্ববিধ কৌশল প্রয়োগ করে মানুষকে আটকে রাখতে চায় যাতে তারা প্রকৃত সংগ্রামের পথে—শ্রেণীসংগ্রাম বিরোধে সংগ্রামের পথে পা না বাড়ায়। বিভাবে ওরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সেটাই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। তাদের এই কৌশলগুলি যখন আর কাজে লাগে না তখন তারা নগ্নভাবে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে।

বিভ্র বিভ্র মানুষের মানসিক গঠন ভিন্ন। তাই শোষক শ্রেণী যে কৌশল নিয়েছে তা হল—সে অর্থনীতি উপাদান নিয়ে শোষিত মানুষের কাছে হাজির তাকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্য। তেমনি আসলে তাকে সংগ্রাম থেকে বিরত করে।

অথবা সে যন্ত্রিন 'লক্ষ্মীপদ্ম' নিয়ে আসে তাকে গ্রহণীয় করে রাখার জন্য।

কৌশল—১। সংস্কারের মেকিবাজার

প্রথমেই তারা যেটা করেছে তা হল কুসংস্কারের পাঁকে সমাজকে ডুবিয়েছে, নানান রীতি-নীতির জোয়ালে শোষিত মানুষকে তাঁবা বেঁধেছে, আর আমদানি করেছে ভাগ্য ও ভগবানের তত্ত্ব। একটু লক্ষ্য করলে কিন্তু দেখা যাবে অর্থবান শোষক শ্রেণী কিন্তু এগুলি নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে না। মানুষকে শেখান হল, তোমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে—তুমি ভাগ্য নির্ভর, তোমার করার কিছু নেই। কিন্তু মানুষ তা মানল আর স্বভাবতই শোষণ মুক্তির সংগ্রামের চিন্তা থেকে বিরত রইল। কিন্তু মানুষকে আটকে রাখা গেল। মানুষকে বলা হল, আসল মুক্তি হল আত্মার মুক্তি—পার্থিব সুখের পিছনে ছোটবার দরকার নেই। যা জুটিয়ে তাতেই সন্তুষ্ট থাকো—ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করো। তোমার পরিত্র হচ্ছে ঈশ্বরের পরীক্ষা—ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। কিন্তু মানুষ তা বিশ্বাস করল; দলবদ্ধভাবে নাম কীর্তনে আত্ম নিয়োগ করল। আরও কিছু মানুষ আটকে পড়ল। শোষণ মুক্তির চিন্তা থেকে সরে গেল।

কৌশল—২। ভুলো সমাজ সেবা

এতো গেল এক সাধারণ প্রক্রিয়া যা বিশ্বের বহু সেই সব মানুষকে আটকে রাখার জন্যে শিকার অবলো পৌঁছানো তাদেরকে ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু যারা একটু শিক্ষিত, মানুষের জন্য কিছু করার উপায় যাদের আছে, তারা যাতে শোষণ মুক্তির সংগ্রামের দিকে পা না ফেলে তার জন্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয় 'সমাজ সেবার মহান ব্রত'। সমস্ত শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য তাঁরা যাবে শোষণ মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে না ফেলে তার জন্য ওটি কয়েক মানুষের 'সেবার' ভার তাদের আকড় করে রাখা হয়। এই কাজের জন্য শোষণ শ্রেণী তাদের উৎসাহ দেয়, সাহায্য দেয়। আদর্শবাদী, ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত মানুষের মনগুলিকে কলা পলি মতো ঢেলে দেয়। এমনভাবে তাদের পিঠ চাপড়ানি দিতে থাকে ও পত্র-পত্রিকায় তাদের মহান কীর্তন করতে থাকে যে এই বিভ্রান্ত মানুষগুলি মনে করে এটাই একমা মহান ব্রত। তাদের তাতে ভুলিয়ে দেওয়া হয় যে এ দ্বারা কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না। তাদে ভুলিয়ে দেওয়া হয় যে এই শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা ভাঙতে না পারলে তামাম বঞ্চিত মানুষদের সেবা ক যায় না। এইভাবে আর একটি শোষীত মানুষ যারা ঘর করতে চায় তাদের আটকে রাখা হয়।

কৌশল—৩। খেলা শুধু খেলা

কৌশলের বর্ষাই হল চাতুর্য্য, স্বভাবতই তা খেলাতে ভালবাসে খেলতে চায়। খেলা শরীর ও ম উন্নয়নেই পঠন করে। কিন্তু সরকার পাড়ায় পাড়ায় এ যুবকদের খেলার কোন ব্যবস্থা করে না। ৫০ বছরে করেনি। তার ফলে তারা যুবকদের খেলা দেখ শিখিয়েছে। সারা বছর খেলা দেখিয়ে তাদের মস্তিষ্ক বাসতে চায়। কেউ কেউ টিকা নিয়ে খেলা দেখানে জন্য স্টেডিয়াম বানায় কিন্তু পাড়ার ছেলেদের খেল জন্য একটিও মাঠ বানায় না। প্রতিটি ছেলে যা খেলতে পায় তারা কোন পরিকল্পনা নেই, ওরা তা চায় না। কারণ তা না হলে 'রকবাজ' তৈরি হবে কি ক্ষে শোষণ নিয়ে শোষক শ্রেণী তার ধারণা তুলবে। প পত্রিকার বিশেষ করে যুবকল্যাণ সাপ্লিমেন্ট যবে কো খেলার প্রচার হয় সেগুলি হল ধনীর দুলালদের খে যেমন ক্রিকেট, লন-টেনিস এমনকি বিলিয়ার্ডও ত সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের কোন যোগ নেই। ব ধনীর দুলাল খেলবে। তুমি দেখবে আর বাজে ফুটবল খেলা এখন আর তত দেখানো হয় না ক তা সাধারণ মানুষের খেলা। একটু লক্ষ্য করলেই বে যাবে ২০/২৫ বছর আগেও খেলার এত বহর ছিল এখন সারা বছরই ক্রিকেট খেলা চলছে—চলছে যে যা বিদেশে। আছে লন টেনিস—ফ্লক ওদের। ত

সব সেরকারের হেলোয়াড়। ওরা খেলছে খেলার জন্য নয়, পয়সা রোজগারের জন্য। আমার এই খেলার বাজারেও ঢুকে অর্থনীতির প্রভাব। দুই মার্কিন সাহা সেপলি ও কোলম্বকোলা খেলার জগতে ঢুকে পড়েছে স্পনসর করছে। তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে তারা খেলোয়াড় কিনছে—প্রচারের জন্যে লাগাচ্ছে। ওটি কয়েক বিদেশি খেলোয়াড় খেলছে আর খুব সমাজের একটি ভাল অংশ তাতে আটকে রয়েছে এপথে আরও কিছু মানুষকে বিষ্ট্রির করে রাখা খেলা।

কৌশল—৪ ঃ লটারী-সট্টা-জুয়া

এতক্ষণ দেখা গেল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি একটা আকর্ষণীয় বাতাবরণ বজায় রেখে নানান কৌশলে মানুষকে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে যাতে তাদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ না ঘটে। চেতনাই যদি উন্মেষ না ঘটে তবে বিপ্লবের তো আর প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তারা মানুষকে আটকে রাখতে পারে না। একের তারা নয়ন্তরেই নেমে পড়ে। তারও কিছু কৌশল নিয়ে হাজির হয়।

সমাজে আসে লটারী-সট্টা-জুয়া। যে মানসিকতা মানুষকে জুয়ার দিকে ঠেলে দেয় তা হল—সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। জীবিকা অর্জনের সুযোগের অভাব আর কমপিটিটিভনিজম (তোলাবাজ)-এর বাজার তেজের নিপাতে এর এ সব কিছুই কিনা পরিমাপে হঠাৎ ধনী হয়ে নিতে চেয়েছে চায়। এটাই মনস্তত্ত্বে লটারী, সট্টা, জুয়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়। লটারীর হল সরকার অনুমোদিত জুয়া, গরীব মানুষকে পরোক্ষ শোষণের এক প্রক্রিয়াও বটে। একজন মানুষ এর পিছনে ছুটেছে তাদের সমস্যার যৌক্তিক সমাধানের কথা চিন্তা না করে তারা মনে করছে এটাই বাঁচার সহজলভ্য পথ। এরকমে লটারী, সট্টা, জুয়ার জগতে আরও কিছু মানুষকে তো জড়িয়ে রাখা খেলা। আরও একটি মজার ব্যাপার হল, এগুলি সমাজে মানুষের মনে যাতে পাপবোধ না আসে, এটা মানুষের কি অতি করছে সে চিন্তা যাতে মানুষের মনে না আসে তার জন্য এগুলির সাথে 'খেলা' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ 'খেলা' একটি নিষ্পাপ বস্তু। 'জুয়া' শব্দটির সাথে 'খেলা' শব্দটি জুড়ে দিয়ে ব্যবসা যাবে একে 'জুয়া খেলা' বলা হয়। ইংলিশিবাজে তেমনি 'লটারী' শব্দটির সাথেও 'খেলা' শব্দটি যোগ করে দিয়ে একে বলা হচ্ছে 'লটারী খেলা'। তেমনি বলা হচ্ছে সট্টা খেলা।

কৌশল—৫ ঃ যৌনতা-নগ্নতা দিয়ে ঘরে রাখা।

এতেও হচ্ছে না। আটকে রাখা যাচ্ছে না। মানুষকে ঘরে রাখ যৌনতা-নগ্নতা দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্য পুনর্দখলের নেশায় ও বিদেশী চ্যানেলগুলিতে যৌনতার প্রচারের পত্র-পত্রিকাগুলিও সিনিয়র নেই। ব্যবসার শেয়ারই অর্থনৈতিক নাড়ীর ছবি। এমন কি সংবাদপত্রেও কখনও কখনও এমন ছবি ছাপা হয় যে সেই কাগজটি পুরুষের ঘরে রাখাই মুস্কিল হয়ে পড়ে। এছাড়া ব্যবসায়ী মহল নিত্য নূতন ডিজাইনের পোশাক বাজারে ছাড়ছে যে 'ডিজাইনের' লক্ষ্যই হল কিভাবে যৌনতা-নগ্নতাকে আরও বেশি করে প্রকট করে তোলা যায়। বিজ্ঞাপনের নামেও সর্বত্র যৌনতা-নগ্নতার ছড়াছড়ি। এদের উদ্দেশ্য হল—সমাজকে যৌনতা-নগ্নতার ঘরে রাখা। কিন্তু মানুষ প্রতারিত হবে—আটকে থাকবে সংগ্রামের পথে পা বাড়াবে না।

কৌশল—৬ ঃ জ্ঞানে ভোলাও

না, একটা বেলাই যথেষ্ট নয়। এসেছে তারা মদ, ড্রাগ, পাঁজা, আরিক আরও কত কিছু। মদ খেলা বাজারে আর ড্রাগ আন্তর্জাতিক বিষ্ট্রি হয়। আর পাঁচটা সামগ্রীর মতই মদেরও চলছে প্রচার। শুধু তাই নয়, সংবাদে প্রকাশ বাজারে আসতে চলেছে—'রামরজ্ঞ' ও—'জিন-কোক'। ভবিষ্যতে দোকানে লক্ষ্মেল চকোলেটের সাথে 'রাম ও' জিন' (মদ বিশেষ) দিয়ে তৈরি হজমীগুলির চেয়ে মানে কিছু বড় 'রামরজ্ঞ' ও চকোলেটের মত কোক-এর আকারে 'জিন কোক' বিক্রি হবে। স্মরণ করা যেতে পারে '৬৭-র পরে শ্রীমতীকুলার সাবলিলভাবে বিপ্লবের মেতে উঠলে সেক্ষেত্রে তখনকার বিনামূল্যে মদ বিতরণ করা হতে থাকে। শুধু মদ দিয়ে কমপিনি হচ্ছে না। তাই ওরা 'ইতিহাস থেকে শিক্ষা (?) নেয়'। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিন তার শোষণের স্বার্থে চীনের মানুষদের আফিমের নেশা ধরিয়ে দেয়। ওরা এখন তেমনি খুব সমাজকে পশু করতে এনেছে 'ড্রাগ'। ফুল কলেজের সামনে নানাকরে পান-সিগারেট ও খাবারের সাথে ড্রাগ মিশিয়ে দিয়ে ছেলে-মেয়েদের নেশার শিকার করা হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এরাকেও কিছু ছেলেকে আটকে রাখা যাবে।

কৌশল—৭ ঃ ভোটের তোজবাজী

মুক্তিকামী রাজনীতি সচেতন (আংশিক) মানুষদের বিপ্লবমুখী হওয়ার জন্য শোষক শ্রেণী আমলারা করেছে ভোটের তোজবাজী। তারা মানুষকে বোঝাচ্ছে তোমাদের ভোটে নির্বাচিত সরকার তো তোমাদেরই। তাহলে বিপ্লবের পথে যাবার দরকার নেই। একথা তারা বলে না যে, ভোটের মাধ্যমে যে সরকারই আসুক না কেন তা ঐ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে বাধ্য। আর যদি সে তা না করে কি হচ্ছে, কি ক্ষেত্রে বা পৃথিবীর দেশে দেশে তাকে সেই মুহূর্তেই বরিষ্ক করে দেওয়া হবে। গণতন্ত্রের ধাত্রীভূমি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৭ সালে কেরলে নির্বাচিত কম্যুনিস্ট সরকারকে ১৯৫৮ সালে বরিষ্ক করে দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে ভোটে জিতেও মুজিবর রহমান ক্ষমতা পাননি। শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানকে লড়তে সংগ্রামের পথে হেতে হয়—জন্ম নেয় বাংলাদেশ। এই পাকিস্তানেও ১৯৭৭-র পর একাধিকবার নির্বাচিত সরকারকে বরিষ্ক করে দেওয়া হয়। পৃথিবীতে এমন ঘুরি ঘুরি দৃষ্টান্ত আছে। আমরা দেখেছি চিলেতেও ভোটের প্রহসন করে নিজেদের আজ্ঞাবহ এক সিফটি খাড়া করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেমন একদিকে লুটন চালিয়ে গেছে অন্যদিকে তেমনি চিলেনদের জনগণ তাদের সমর্থনের সাথে তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পর্যুদস্ত করে বিতাড়িত করে। তবে ওরা যতক্ষণ পারে গণতন্ত্রের খোলসটি বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তার জন্য এত ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে হয়, নেয়। শেষ পর্যন্ত তারা রিগিং-এর পথ ধরে। ভারতে তার প্রথমতম নাম—'রিগিং' ভারতীয়রা নাম—'আয়া'। তার আর্থনৈতিক ভিত্তি হল—সমাজের সম্পদ আহরণ হয়ে সঞ্চিত। এইভাবে তারা মানুষের এক বৃহৎ অংশকে ভোটের খেলায় মাতিয়ে রেখে বিপ্লবীর আসর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

শোষক শ্রেণীর প্রকৃত সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে আটকে রাখে। তবু লাখায় কম হলেও ভারতসহ পৃথিবীর দেশে দেশে রাজনৈতিক সচেতন আর একটি অংশ এই ভোটের তাঁতাবাজীর মুখোশ খুলে দিতে ময়দানে অবতীর্ণ।

কৌশল—৮ ঃ মেকী বামপন্থা

এত কৌশলের বেড়া ডিঙিয়েও যে শত সহস্র যুবক সমাজ পরিবর্তনের ঘর দেখে—সামন্তত্ত্বের ঘর দেখে সংগ্রামের পথে চলতে হয় তাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এক বৈজ্ঞানিক কৌশল। তৈরী হয়েছে মেকী বামপন্থা পার্টি। বামপন্থী কথা বলে কাজে আমলাদার বিরোধিতা করা—বিপ্লবের কথা বলে প্রতিবিপ্লবী কাজ করা—সমাজতন্ত্রের কথা বলে পুঁজিবাদের পূজা করা—স্বাধীনতার কথা বলে সাম্রাজ্যবাদীদের সেবাদুর সৃষ্টি করা। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভুল তত্ত্ব আমদানি করাকেই বলে সংশোধনবাদ। তাই বলা হয়েছে 'আজকের দিনে সংশোধনবাদই প্রধান বিপদ'। এই সব পার্টিগুলির বক্তব্যকে সাম্রাজ্যের কয় (হোলটাইমার) আছে ; তারা পার্টি থেকে মাসমাহা পেয়ে পার্টির পথে নীতিকে বিসর্জন দেয়। পার্টি নীতিহীন হলেও তাদের পার্টি ত্যাগ করার উপায় নেই। পার্টি ত্যাগ করলে খাবে কি? সংসার চলবে কি করে? পার্টি নেতৃত্বের সাথে এদের সম্পর্ক প্রভুক-মালিকের সম্পর্কের পর্যবেসিত হয়। নিম্ন-মধ্যবিত্তরা তবু টেক ইউনিয়ন করতে পারে, তাদের খানিকটা স্বাধীনতা আছে এদের তাও নেই। কি করুণ অবস্থা এদের। নীতিহীন এই হোলটাইমারদের সঙ্গে ইতিহাসের পেকেটগো বাহিনী বিশেষ কেন তফাৎ নেই।

কৌশল—৯ ঃ মাথা নাড়া

মেকী বামপন্থা দলগুলির বিপ্লবিদের ছাপ মেরে বেরিয়ে আসা বা আসলী যারা তাঁদের পা দেখেনি সেই সব মুক্তিকামী যুব দেখা ছেলেদের অন্যের প্রাণ-আকুলি-বিকুলি করছে ব্যাঙ্গের প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে আটকে রাখার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে বহু ব্যক্তি-মানুষ। তার হলেও কিছু সর্বত্যাগী ছেলেদের তারা আটকে রাখে। কেউ শোনান জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের কথা—কেউ শোনান কম্যুনিস্ট বিপ্লবেই দেশের মুক্তি—কেউ শোনান নেতাজী, নেতাজী আসলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ বা আবার নকশালবাড়ির কথা বলেন। কারণ এটাই আজকের দিনের ছয়ালু সর্বত্যাগী যুবকদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। কিছু বলে যাওয়া বা মেকী নকশালপন্থী নেতাও এই দলে নাম লিখিয়েছে। কেউ কেউ আবার নরম-গরম পরিস্থিতি বুঝে কথা করে। উদ্দেশ্য প্রচারেই এক। ছেলেগুলিকে অবর্ষণ (লক্ষ্য) করে রাখা। এইভাবে যে কটা খাঁটি যুবককে আটকে রাখা।

এত কৌশলের মূল লক্ষ্য একটাই। মেকী শত্রুকে চিনতে না দেওয়া। মেকী শত্রুকে যদি চিহ্নিতই না করা গেল তবে তার বিরুদ্ধে আর সংগ্রামটা হবে কি করে?

সুখের বিষয় এই যে, এত কৌশল করেও কিন্তু যুবসমাজকে আটকে রাখা যাচ্ছে না। তবু যে সব তরুণ চেয়ে যায়, হৃদয়ে আত্মত্যাগ আর মস্তিষ্কে সমস্যার নিয়ে পথ চলতে শুরু করেছে তাদেরই এই সব কৌশলগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে—এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে—বিপ্লব করে আজকের নিয়ে প্রধান বিপ্লব—সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

"আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"

কলকাতা হয়তো এখনও ঝাঁ চক্‌চকে হয়ে ওঠেনি,
তবে আগের থেকে হয়েছে অনেক, অনেক বেশী সুন্দর।
এ শহর আমার, আপনার, সবার।
আসুন সবাই মিলে কলকাতাকে আরো সুন্দর করে তুলি।

উৎসবের দিনগুলি খুশির আলোয় ভরে উঠুক

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসংস্থা

With Best Compliments From

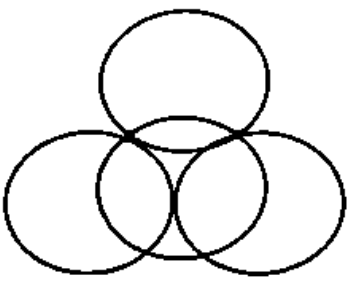

GONTERMANN-PEIPERS (INDIA) LITIMED

D.H. Road, P.O. PAILAN
24 PARGANAS (S), W.B.

With Best Compliments From

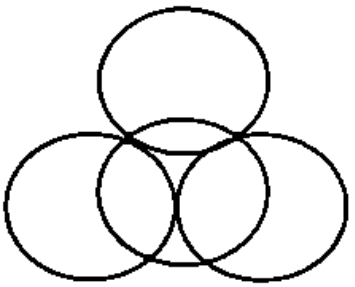

VENUS ELECTRONICS

103, PADMA PUKUR ROAD,
24 PGS (N), PIN. 743129

MANUFACTURER OF SOLID STATE SURGICAL DIATHERMY & SHORT WAVE DIATHERMY (VALVE)

SPACE
DONATED
BY

M/S. S. K. SARKAR
M/S. SANDIP & CO.
M/S. SANJIB SARKAR

49, Abdul Zabbar Road,
Kanchrapara, North 24 Parganas

Ph : (Res) 851316
(Mobile) 9831031096

1998 : VMR-এর নিবেদন

পুজোয় বাচ্চাদের মন মাতাতে আসছে
আনসার উল হকের ছড়া অবলম্বনে

আইকম বাইকম
(ছড়ার গান ও আবৃত্তির ক্যাসেট)

উপস্থাপনা ❑ মধুমন্তী মৈত্র
গান ❑ বহ্নিশিখা চ্যাটার্জী, সঞ্জীব ভট্টাচার্য্য
সুর ❑ অনিতা চ্যাটার্জী
● আবৃত্তি ●
নীলাদ্রি বিশ্বাস, ছন্দের দল, ঋত্বিকা রায়
বিনয় সরদার ও মুনমুন ব্যানার্জী

এই ক্যাসেটটি সমস্ত ডিলারের কাছে পাওয়া যাবে।

VOICE MASTER RECORDS
18, Sarat Ghosh Garden Road,
Calcutta-700 031

থ্যালাসেমিয়া রোগাক্রান্ত মানুষের
রক্ত সঙ্কট মেটাতে
এগিয়ে আসুন

লাইফ কেয়ার ব্লাড ব্যাঙ্ক

২০৪/১বি, লিণ্টন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১৪
ফোন : ২৪৪ ৬৯৪০

১/২, হাজরা রোড
কলিকাতা-৭০০ ০২৬
ফোন : ৪৭৫ ৪৬২৮

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রামবাংলার উন্নতিতে নিয়োজিত

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়ার সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

টেলিফান নং : ২৪০-১১৩৮, ২৪৭-৭৮৮২ ফ্যাক্স নং : ২৪৭-৭১২৮

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ উন্নতিতে শুধু কৃষিতেই নয়—কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে কৃষিজ পরিবহনের ক্ষেত্রে ও গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ঋণ আজ অল্প সুদে সহজলভ্য। বর্তমান আর্থিক বছরে ১১৭.২৫ কোটি টাকা ঋণের পরিকল্পনা বিভিন্ন উন্নতিখাতে দেওয়া হচ্ছে। নবতম সংযোজন আমানত গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি ছুতে—সাথে আছে অধিক সুদের সুবিধা।

Space donated by

A

Well

Wisher

With Best Compliments of

Phone 5592883

R. K. Enterprise

DEVELOPER CONSULTING AND CONSTRUCTION ENGINEERS, GOVT. CONTRACTOR

EB-19, Deshbandhu Nagar,
Baguiati, Calcutta-700 059

শুধু ঘর নয়, ঘরের সাজসজ্জাই আসল

রুচিসম্মত ফার্ণিচার (কাঠ ও স্টীল)
পরিবেশনায়

শ্রী বিষ্ণু ফার্ণিচার

১ নং রেলগেট যশোহর রোড
হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

Space donated by

A

Well

Wisher

প্রতিক্ষণের জীবনের শব্দাবলী—
এই ধর্ম, এই বাজারের দিনে :
প্রভাত মিশ্র প্রণীত কবিতাগ্রন্থ
ভোরে একদিন

ক্রান্তিক প্রকাশনী

গৌতম দে-র
দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ
'কড়ি চুম্বন'
আগামী বইমেলায় প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রথম গল্পগ্রন্থ
'আত্মরতি'
প্রায় নিঃশেষিত।

আমি মাসিক "ক্রান্তিক"-এর গ্রাহক হতে চাই। ষাণ্মাসিক / বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা হিসাবে পঞ্চাশ টাকা / একশ টাকা / আজীবন সদস্য হিসাবে এক হাজার টাকা এই সঙ্গে পাঠালাম। _____
মাস থেকে আমাকে বারটি সংখ্যার গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে নেবেন।

স্বাক্ষর

নাম

ঠিকানা

Priya

NICE-T
BISCUITS

মেরী পসন্দ
কি তো
বাতই কুছ
আওর হ্যায়

EYE LEVEL